তামৃত হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে
প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রায় ৫০০ বছর আগে পরমেশ্বর ভগবান
গের অধঃপতিত মানুষদের কৃষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা দান করার
শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন
স করছিলেন, তখন ভারতের সমস্ত মনীষী ও পণ্ডিতেরা
ভগবানরূপে চিনতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন।
ারত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত
আনন্দে মগ্ন হয়েছিল।
দাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"
অনুবাদ করে সারা পৃথিবীকে আজ ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ
তন্য মহাপ্রভুরই এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
ণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। এই গ্রন্থটি শ্রীল
ত ***Sri Caitanya Caritamrita***-এর বাংলা অনুবাদ।
ামৃতের প্রতিটি শ্লোকের শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য
াষায় প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে
. এই গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর
প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

আদিলীলা

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

আদিলীলা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ
গীতার গান
শ্রীমদ্ভাগবত (বারো খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (চার খণ্ড)
গীতার রহস্য
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
শ্রীঈশোপনিষদ
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
জ্ঞান কথা
ভক্তি কথা
ভক্তি রত্নাবলী
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
বুদ্ধিযোগ
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (মাসিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর (৭৪১ ৩১৩)
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

অজন্তা অ্যাপার্টমেণ্ট, ফ্ল্যাট ১ঈ,
দোতলা, ১০ গুরুসদয় রোড,
কলকাতা ৭০০ ০১৯

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

আদিলীলা

(১ম-১৭শ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

কর্তৃক

মূল বাংলা শ্লোকের শ্লোকার্থ, সংস্কৃত শ্লোকের শব্দার্থ ও অনুবাদ
এবং বিশদ তাৎপর্য সহ ইংরেজী **Sri Caitanya-Caritamrita**-এর বাংলা অনুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

Sri Chaitanya Caritamrita

Adi Lila (Bengali)

প্রকাশক :
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	:	১৯৮৮—৩,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	:	১৯৮৯—২,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	:	১৯৯১—৩,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	:	১৯৯৩—৩,৫০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	:	১৯৯৪—৪,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	:	১৯৯৫—৩,০০০ কপি
সংশোধিত সপ্তম সংস্করণ	:	২০০২—২,০০০ কপি

মুদ্রণ :
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর ৭৪১ ৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

E-mail : shyamrup@pamho.net
Web : www. krishna.com

উৎসর্গ

আমার যে সমস্ত সুহৃদবর্গ ও অনুগত জনেরা আমার গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে ভালবাসেন এবং যাঁরা আমাকে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি সমর্পিত হল।

—অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

সূচীপত্র

প্রাসঙ্গিক তথ্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রতিটি তথ্য ও সিদ্ধান্ত বৈদিক সাহিত্যের প্রামাণিক শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং গ্রন্থের ভাষ্য রচনায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রমাণ হিসাবে যে সমস্ত শাস্ত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধারায় বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল।

অথর্ববেদ-সংহিতা
অদ্বৈত-চরিত
অনন্ত-সংহিতা
অনুভাষ্য
অমৃতপ্রবাহভাষ্য
আদি পুরাণ
ঈশোপনিষদ
উপদেশামৃত
উপনিষদ
উজ্জ্বল-নীলমণি
ঋক্-সংহিতা
ঋগ্বেদ
ঐতরেয় উপনিষদ
কঠোপনিষদ
কলিসন্তরণ উপনিষদ
কূর্ম পুরাণ
কৃষ্ণকর্ণামৃত
কৃষ্ণযামল
কৃষ্ণসন্দর্ভ
ক্রমসন্দর্ভ
গোপীপ্রেমামৃত
গোবিন্দ-লীলামৃত
গৌরচন্দ্রোদয়
চৈতন্য উপনিষদ
চৈতন্যচন্দ্রামৃত
বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বেদার্থ-সংগ্রহ

চৈতন্যচরিত মহাকাব্য
ছান্দোগ্য উপনিষদ
তত্ত্বসন্দর্ভ
তৈত্তিরীয় উপনিষদ
দানকেলি কৌমুদী
নামার্থ সুধাবিধ
নারদ-পঞ্চরাত্র
নারায়ণ উপনিষদ
নারায়ণাথর্বশির উপনিষদ
নারায়ণ-সংহিতা
নরোত্তম-বিলাস
পদ্ম পুরাণ
পরম-সংহিতা
পরমাত্মা-সন্দর্ভ
প্রমেয়-রত্নাবলী
প্রশ্ন উপনিষদ
প্রেম-বিলাস
পৌষ্কর-সংহিতা
বামন পুরাণ
বায়ু পুরাণ
বিদগ্ধমাধব
বিষ্ণু পুরাণ
বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র
বৃহদারণ্যক উপনিষদ
বৃহদ্ভাগবতামৃত
মুণ্ডক উপনিষদ
লঘুভাগবতামৃত

বেদান্তসূত্র
বৈষ্ণব-মঞ্জুষা
ব্রহ্মতর্ক
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
ব্রহ্মযামল
ব্রহ্মসংহিতা
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
ভক্তিরত্নাকর
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
ভক্তিসন্দর্ভ
ভগবৎ-সন্দর্ভ
ভাবার্থ-দীপিকা
মহাভারত
মহাবরাহ পুরাণ
মহা-সংহিতা
মনুস্মৃতি
মাণ্ডুক্য উপনিষদ
মুকুন্দমালা-স্তোত্র
ললিতমাধব
শিব পুরাণ
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
শ্রীমদ্ভাগবত
স্কন্দ পুরাণ
সামুদ্রিকা
স্বায়ম্ভুব তন্ত্র
সীতোপনিষদ
স্তবমালা
সাত্বততন্ত্র
স্তোত্ররত্ন
হরিভক্তিবিলাস
হরিভক্তিসুধোদয়
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র
হয়শীর্ষীয়-শ্রীনারায়ণ-ব্যূহস্তব

মুখবন্ধ

এখানে বর্ণিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার সঙ্গে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার কোন পার্থক্য নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যবহারিক আচরণ। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ হচ্ছে, প্রত্যেকের উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। তা হলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, সেই ধরনের শরণাগত ব্যক্তিদের সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর মাধ্যমে সমগ্র জড় জগতের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন, কিন্তু সেটি তিনি প্রত্যক্ষভাবে করছেন না। কিন্তু ভগবান যখন বলেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্তের দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে পালন করেন। শিশু-সন্তান যেমন সর্বতোভাবে তার পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল হয় অথবা একটি গৃহপালিত পশু যেমন তার প্রভুর উপর নির্ভরশীল হয়, ঠিক তেমনই কেউ যখন সেভাবেই ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হন, তখন তাঁকে বলা হয় শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শরণাগত হওয়ার পন্থা হচ্ছে—১) ভগবদ্ভক্তির অনুকূল সব কিছু গ্রহণ করা, ২) ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল সব কিছু বর্জন করা, ৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন, সেই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করা, ৪) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা, ৫) ভগবানের স্বার্থ থেকে আলাদাভাবে নিজের স্বার্থ না থাকা এবং ৬) সর্বদা নিজেকে অত্যন্ত দীন ও বিনীত বলে মনে করা।

ভগবান চান যে, এই ছয়টি পন্থা অনুশীলন করে আমরা যেন তাঁর শরণাগত হই, কিন্তু অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন এই জগতের তথাকথিত পণ্ডিতেরা এই নির্দেশের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, জনসাধারণকে সেগুলি বর্জন করতে শিক্ষা দেয়। *ভগবদ্গীতায়* নবম অধ্যায়ের উপসংহারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সরাসরিভাবে আদেশ করেছেন, "সর্বদা আমাকে চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমার উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন কর।" এভাবেই সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকার ফলে, ভগবান বলছেন, সে নিশ্চিতভাবে তাঁর অপ্রাকৃত ধামে তাঁর কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু আসুরিক মনোভাবাপন্ন পণ্ডিতেরা মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের দিকে পরিচালিত না করে নির্বিশেষ, অব্যক্ত, অদ্বয়-তত্ত্বের দিকে পরিচালিত করে তাদের বিপথগামী করছে। নির্বিশেষপন্থী মায়াবাদী দার্শনিকেরা স্বীকার করে না যে, পরম-তত্ত্বের চরম প্রকাশ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কেউ যদি যথাযথভাবে সূর্যকে জানতে চায়, তা হলে তাকে প্রথমে সূর্যালোকের সম্মুখীন হতে হবে, তারপর সূর্যমণ্ডল এবং অবশেষে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করতে সক্ষম হলে, তখন সে সূর্যলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মুখোমুখি আসতে পারে। যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে মায়াবাদী দার্শনিকেরা ব্রহ্মজ্যোতির ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। এই ব্রহ্মজ্যোতিকে সূর্যরশ্মির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *উপনিষদে* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, চোখ ঝলসানো ব্রহ্মজ্যোতির আবরণ অতিক্রম করতে না পারলে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত মুখমণ্ডল দর্শন করা যায় না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই সরাসরিভাবে ব্রজরাজসুত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণেরই সমান, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, তিনি এবং তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, ধাম ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম প্রকৃতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, ব্রজবধূরা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছেন, সেটিই হচ্ছে সর্বোত্তম সিদ্ধির স্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। এই ব্রজবধূরা (গোপিকারা অথবা গোপবালিকারা) সব রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে দিব্যজ্ঞান সমন্বিত অমল *পুরাণ* এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে অনন্য প্রেমভক্তি লাভ করাই হচ্ছে মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা *সাংখ্য-যোগের* মূল প্রণেতা শ্রীকপিলদেবের শিক্ষা থেকে অভিন্ন। এই প্রামাণিক যোগপদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের রূপের উপর ধ্যান করতে। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এমন কি আসন, প্রাণায়াম আদি যোগের অতি কঠোর পন্থাগুলি অনুশীলন না করেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান করা যায়। এই ধ্যানকে বলা হয় পূর্ণ সমাধি। এই ধ্যানই যে পূর্ণ সমাধি তা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্‌গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে যে প্রেম ও ভক্তি সহকারে তার হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করে, সেই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জনসাধারণকে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ*-তত্ত্ব রূপ সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যাতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান যুগপৎভাবে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে এক ও ভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে, সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সাংখ্যযোগ ধ্যান অনুশীলনের ব্যবহারিক পন্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভগবানের দিব্যনাম হচ্ছে ভগবানের শব্দ অবতার এবং যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর দিব্যনাম ও দিব্য রূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এভাবেই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গের দ্বারা সরাসরিভাবে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ কীর্তনকারী ব্যক্তি অপরাধযুক্ত, নামাভাস ও শুদ্ধনাম বা চিন্ময় স্তর—এই তিনটি স্তরে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করতে পারেন। অপরাধযুক্ত স্তরে কীর্তনকারীর জড় জগতে নানা রকমের সুখভোগ করার বাসনা থাকতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সব চাইতে আকাঙ্ক্ষিত পদ—ভগবৎ-প্রেমের স্তর লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে, এটিই হচ্ছে মানব-জীবনের সিদ্ধির পরম স্তর।

যোগ অনুশীলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম করা। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হচ্ছে মন; তাই সর্বপ্রথমে মনকে কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত করে তা সংযত করার অনুশীলন করতে হয়। মনের স্থূল কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় বহিরেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং তা হয় জ্ঞান অর্জন করার প্রচেষ্টায় অথবা ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপের মাধ্যমে। মনের সূক্ষ্ম কার্যকলাপগুলি হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা। চেতনার বৃত্তি অনুসারে জীব কলুষিত অথবা নির্মল হয়। মন যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ হয় (শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ও বৈশিষ্ট্য), তখন সূক্ষ্ম ও স্থূল সমস্ত কার্যকলাপ অনুকূল হয়। *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ অনুসারে চিত্তবৃত্তি নির্মল করার পন্থা হচ্ছে মনকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের চিন্তায় মগ্ন করা, তাঁর মন্দির মার্জন করা, তাঁর মন্দিরে গমন করা, অপূর্ব সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করা, তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করা, ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করা, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করা, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত ফুল-তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করা, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কার্য করা, ভক্ত-বিদ্বেষীদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া প্রভৃতি। মন ও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ কখনই স্তব্ধ করা যায় না, তবে চেতনার পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে এই সমস্ত কার্যকলাপগুলি পবিত্র করা যায়। *ভগবদ্‌গীতায়* (২/৩৯) সেই পবিত্রীকরণের নির্দেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা দান করে বলেছেন—"হে পার্থ! এই ধরনের বুদ্ধিতে যুক্ত হয়ে তুমি যখন কর্ম করবে, তখন তুমি সব রকমের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে।" রোগাদির ফলে কখনও কখনও মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যাহত হয়, কিন্তু সাময়িকভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হলেও রোগমুক্তির পর মানুষ আবার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রচেষ্টায় যুক্ত হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করার প্রকৃত উপায় না জানার ফলে, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা জোর করে ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া বন্ধ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পরিশেষে তারা ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বরণ করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবাহে প্রবাহিত হয়।

যোগের আটটি পদ্ধতি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি তাদেরই জন্য নির্দেশিত হয়েছে, যারা অত্যন্ত গভীরভাবে দেহাত্ম-বুদ্ধিযুক্ত। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের জোর করে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হয় না। পক্ষান্তরে, তাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করেন। একটি শিশুকে নিষ্ক্রিয় করে তার খেলা করার প্রবণতা বন্ধ করা যায় না। কিন্তু উন্নত ধরনের কার্যকলাপে নিযুক্ত করার মাধ্যমে তার দুষ্টুমি বন্ধ করা যায়। সেই রকম যোগের আটটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জোর করে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ দমন করার পন্থা নিকৃষ্ট স্তরের মানুষদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে উন্নত স্তরের মানুষেরা স্বাভাবিকভাবেই নিকৃষ্ট স্তরের জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হন।

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সেই বিজ্ঞান হচ্ছে পরমতত্ত্ব। মনোধর্মী শুষ্ক জ্ঞানীরা জড় আসক্তি থেকে নিজেদেরকে দমন করার চেষ্টা করে; কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, মন অত্যন্ত বলবান হওয়ার দরুন তাকে দমন করা যায় না। পক্ষান্তরে, কৃত্রিমভাবে মনের প্রবৃত্তি দমন করার চেষ্টা করা হলে তা মানুষকে আরও বেশি করে ভোগ-বাসনায় লিপ্ত করে। কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত মানুষের এই বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। তাই, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে যুক্ত করতে হয় এবং কিভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে তা করতে হয়, সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নামে পরিচিত ছিলেন। *বিশ্বম্ভর* শব্দটি তাঁকে উল্লেখ করে, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন এবং যিনি সমস্ত জীবদের পরিচালনা করেন। সমগ্র বিশ্বের এই পালনকর্তা ও পরিচালক মনুষ্যজাতিকে এই অনুপম শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন জীবনের পরম প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার আদর্শ শিক্ষক। তিনি হচ্ছেন মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। তিনি হচ্ছেন সমগ্র করুণা ও সৌভাগ্যের পূর্ণ আধার। *শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভগবদ্গীতা*, *মহাভারত* ও *উপনিষদ* আদি শাস্ত্রসমূহে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই কলহের যুগ কলিযুগে তিনিই সকলের আরাধ্য। সকলেই তাঁর এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। সেই জন্য কোনও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার মাধ্যমে যে কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে। কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে তার জীবন সার্থক। পক্ষান্তরে বলা যায়, যারা পরমার্থ সাধনের প্রয়াসী, তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা গ্রহণ করার মাধ্যমে অনায়াসে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা এই গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে অভিন্ন।

জড় দেহে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তাদের সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা মানব-সমাজকে এই ধরনের অনর্থক এবং অনিত্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে সাহায্য করবে। এই শিক্ষার প্রভাবে মানব-সমাজ পারমার্থিক কার্যকলাপের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর। কৃষ্ণভাবনাময় এই ধরনের কার্যকলাপই হচ্ছে মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। জড় জগতের উপর আধিপত্য করার মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা অর্জনের যে প্রচেষ্টা, তা অলীক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় এবং এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

সকলকেই তার কর্মের ফল অনুসারে সুখ অথবা দুঃখভোগ করতে হয়; জড়া-প্রকৃতির এই নিয়মকে কেউই প্রতিহত করতে পারে না। যতক্ষণ কেউ সকাম কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে জীবনের চরম উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হবে। আমি ঐকান্তিকভাবে কামনা করি যে, এই *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে সমগ্র মানব-সমাজ পারমার্থিক জীবনের জ্যোতির্ময় জ্ঞান লাভ করবে, যা শুদ্ধ আত্মার কর্মক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করবে।

ওঁ তৎ সৎ

অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

১৪ই মার্চ, ১৯৬৮

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি

শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ মন্দির

নিউ ইয়র্ক

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনালেখ্য ও শিক্ষার এক প্রধান অবদান। প্রায় পাঁচশো বছর পূর্বে ভারতে যে মহান সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তার অগ্রদূত। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরবর্তী গতিকে প্রভাবিত করেছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাবের এত বিস্তৃতির জন্য সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছেন বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদক ও টীকাকার এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য (পারমার্থিক পথপ্রদর্শক) কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন এক মহান ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যাই হোক, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে আমাদের প্রচলিত রীতিগত পদ্ধতি—সময়ের ফসল হিসাবে মানুষকে দেখা—এখানে ব্যর্থ, কেন না শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যা উৎকর্ষতায় ঐতিহাসিক বিন্যাসের সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে।

পাশ্চাত্যের মানুষ যখন তার আবিষ্কারী শক্তিকে জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি অনুধাবনের প্রতি মনোনিবেশ করেছিল এবং নতুন সমুদ্র ও মহাদেশের অন্বেষণে জলপথে বিশ্ব-পরিভ্রমণ করছিল, প্রাচ্যে তখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানুষের চিন্ময় প্রকৃতির সর্বোত্তম জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির এক অন্তর্মুখী বিপ্লবের সূত্রপাত ও পরিকল্পনা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনীর মুখ্য ঐতিহাসিক উৎসগুলি হচ্ছে মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কর্তৃক রক্ষিত কড়চা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও বৈদ্য মুরারিগুপ্ত শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত প্রথম চব্বিশ বছরের জীবনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আটচল্লিশ বছরের জীবনের অবশিষ্ট সময়ের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা ছিল তাঁর অপর এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর নথিভুক্ত কড়চায়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং এই ভাগগুলিকে বলা হয় *লীলা*—*আদিলীলা*, *মধ্যলীলা* ও *অন্ত্যলীলা*। মুরারিগুপ্তের কড়চা হচ্ছে *আদিলীলার* ভিত্তি এবং *মধ্যলীলা* ও *অন্ত্যলীলার* পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে স্বরূপ দামোদরের কড়চা থেকে।

আদিলীলার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে সমগ্র রচনাকার্যের ভূমিকা। বৈদিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন বর্তমান কলিযুগে ভগবানের অবতার। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই যুগের সূচনা হয়েছে এবং জড়বাদ, ভণ্ডামি ও কলহ আদি হচ্ছে এই যুগের বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার আরও প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অধঃ-পতিত যুগের পতিত জীবাত্মাদের সংকীর্তন প্রচারের দ্বারা মুক্ত হস্তে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম দানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। সংকীর্তনের

আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'ঈশ্বরের মহিমা প্রচার'—বিশেষ করে বিরাট জনসমাগমে মহামন্ত্র কীর্তন করা। অধিকন্তু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সম্বলিত প্রস্তাবনায় ভগবান শ্রীচৈতন্যের ধরাধামে অবতীর্ণের গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁর সহযোগী অবতারদের ও প্রধান প্রধান ভক্তদের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর শিক্ষার সার-সংক্ষেপ করেছেন। *আদিলীলার* অবশিষ্টাংশে, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদে, গ্রন্থকার ভগবান শ্রীচৈতন্যের দিব্য জন্মকাহিনী থেকে সন্ন্যাস পর্যন্ত সংক্ষেপে নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মধ্যে তাঁর বাল্যকালের অলৌকিক ঘটনাবলী, অধ্যয়ন, বিবাহ ও প্রাথমিক দর্শন বিষয়ক তর্কযুদ্ধ সহ তাঁর সুদূরব্যাপ্ত সংকীর্তন আন্দোলন প্রতিষ্ঠান এবং মুসলমান শাসকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর আইন অমান্য আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত।

তিনটি বিভাগের মধ্যে দীর্ঘতম *মধ্যলীলায়* সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, শিক্ষক, দার্শনিক, গুরু ও যোগীরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সারা ভারত পরিভ্রমণ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ছয় বৎসর কাল ব্যাপী সময়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা সঞ্চার করেছেন। তিনি বিতর্কের দ্বারা তাঁর সময়ের শঙ্করাচার্যবাদী, বৌদ্ধ ও মুসলমান সহ বহু খ্যাতিমান দার্শনিক ও ব্রহ্মবাদীদের মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং তাদের হাজার হাজার অনুগামী ও শিষ্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাঁর আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ভক্তসংখ্যা আরও বাড়িয়েছিলেন। এই অংশে গ্রন্থকার উড়িষ্যার জগন্নাথপুরীতে বিশাল রথযাত্রা উৎসবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কীর্তির অনেক চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

অন্ত্যলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের নিকট নিভৃতে যেভাবে কাটিয়েছেন তার বর্ণনা আছে। জীবনের এই অন্তিম পর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চিদানন্দের ভাব-সমাধিতে গভীর থেকে গভীরে নিমজ্জিত হয়েছেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের সব ধর্মীয় বা সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই। তাঁর চিরস্থায়ী ও নিত্যবর্ধিত ধর্মীয় দিব্যসুখ এই সময়ে তাঁর নিরন্তর সঙ্গী স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর চাক্ষুষ বর্ণনা লেখচিত্রের মতো বর্ণিত হয়েছে। তিনি আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও ধর্মীয় ভূয়োদর্শনের প্রপঞ্চবাদীদের তদন্ত ও বর্ণনামূলক ক্ষমতার স্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন।

এই মহাকাব্যের প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ষোড়শ শতাব্দীর আশেপাশে কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত অনুগামী, রঘুনাথ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। খ্যাতনামা কঠোর বৈরাগ্যশীল তপস্বী রঘুনাথ দাস স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কথিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা-কাহিনী শুনে স্মৃতিপটে ধরে রেখেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর রঘুনাথ দাস তাঁর পূর্ণ ভক্তি-ভাজনদের বিচ্ছেদ-ব্যথা সহ্য করতে না পেরে গোবর্ধন পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহনন মানসে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। যেভাবেই হোক, বৃন্দাবনে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুই অতি বিশ্বস্ত পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ

পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর আত্মহননের পরিকল্পনা থেকে তাঁকে বিরত করেছিলেন এবং তাঁকে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ জীবনের প্রেরণাদায়ক অপ্রাকৃত ঘটনাবলী তাঁদের কাছে প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের পূর্ণ ধারণা প্রদান করে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে সমসাময়িক ও প্রায় সমসাময়িক কিছু পণ্ডিত ও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কতিপয় জীবনীমূলক রচনা লিখেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে মুরারি-গুপ্তের *শ্রীচৈতন্যচরিত*, লোচন দাস ঠাকুরের *চৈতন্যমঙ্গল* এবং *চৈতন্যভাগবত*। সর্বশেষ গ্রন্থটি রচনা করেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-চরিতের মুখ্য প্রণেতারূপে বিবেচিত হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ রচনার সময়, বৃন্দাবন দাস ভয় করেছিলেন যে, এই গ্রন্থটি খুবই বৃহৎ আকারের হবে। তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের বহু ঘটনার বিশদ বর্ণনা পরিহার করেছিলেন, বিশেষ করে *অন্ত্যলীলা*। মহাপ্রভুর *অন্ত্যলীলা* কাহিনী শ্রবণে উদ্‌গ্রীব হয়ে, বৃন্দাবনের ভক্তরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে এই মনোরম লীলা-কাহিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে একটি পুস্তক প্রণয়নে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা কবিরাজ গোস্বামীকে মহাত্মা ও পণ্ডিত বলে শ্রদ্ধা করতেন। এই অনুরোধ বশে এবং বৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহন বিগ্রহের অনুমতি ও আশীর্বাদ ক্রমে তিনি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনাকার্যটি আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থটি সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষতায় এবং দর্শনের ব্যাপকতায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার ওপর আজকের দিনে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে সর্বজন-গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী খুবই পরিণত বয়সে ও ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় এই গ্রন্থখানা রচনা শুরু করেন। তাঁর এই গ্রন্থে তিনি সেই কথার স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন—"আমি এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ ও অসমর্থ হয়ে পড়েছি। লেখার সময় এখন আমার হাত কাঁপে। আমি কিছুই স্মরণ করতে পারি না, ভালভাবে আমি দেখতে ও শুনতে পাই না। তবুও আমি লিখি এবং এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর।" এমত দুর্বল অবস্থায় মধ্যযুগীয় ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি সম্পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্যতম বিস্ময়।

এই গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ ও তাৎপর্য রচনা করেছেন বিশ্বে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-চিন্তার ক্ষেত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষক শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদের এই তাৎপর্য দুটি বাংলা টীকা গ্রন্থকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। একটি টীকার রচয়িতা হচ্ছেন তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত, শিক্ষক ও শুদ্ধ ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী । তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "এমন সময় আসবে যখন বিশ্বের লোকেরা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পড়ার জন্যই বাংলা ভাষা শিখবে।" অন্য টীকাটি রচনা করেছেন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের পিতা যিনি আধুনিক যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজে ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরা ধারার অন্তর্গত একজন মহাভাগবত এবং তিনিই প্রথম পণ্ডিত যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগামীদের লিখিত প্রধান প্রধান সাহিত্য-কর্মের ধারাবাহিক ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মানুশাসনের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতির এমন সুচারু মেলবন্ধন ঘটেছে যে, বিশ্বের ইংরেজী ভাষাভাষীদের তিনি এই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রচনা-শিল্পটি যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছেন। অনায়াসে ও স্পষ্টভাবে তিনি কঠিন দার্শনিক ধারণাগুলি এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন যাতে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত পাঠকও এই গভীর জ্ঞানসম্ভারপূর্ণ বৃহদায়তন সাহিত্যকর্ম বুঝতে এবং এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট বহুল চিত্র শোভিত সাত খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ করে, সমসাময়িক মানুষের বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ও পারমার্থিক জীবনের প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এর মুখ্য গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

বিনীত
—প্রকাশক

ভূমিকা

(১৯৬৭ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দিরে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রামাণিক জীবন-চরিত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের উপর শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত পাঁচটি প্রাতঃকালীন বক্তৃতার উদ্ধৃতি।)

চৈতন্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'জীবনী-শক্তি', *চরিত* অর্থ 'চরিত্র' এবং অমৃত অর্থ 'অমরত্ব।' জীব হিসাবে আমরা চলাফেরা করতে পারি, কিন্তু একটি টেবিল তা পারে না, কারণ তার জীবনীশক্তি নেই। কোন রকম ক্রিয়া করার ক্ষমতা হচ্ছে জীবনীশক্তির লক্ষণ। সেই সূত্রে বলা যায় যে, জীবনীশক্তি ব্যতীত কোন ক্রিয়া হতে পারে না। প্রাকৃত অবস্থায় জীবনীশক্তি থাকলেও তা অমৃত নয়, অর্থাৎ তাতে অমরত্ব নেই। সুতরাং, *চৈতন্য-চরিতামৃত* বলতে বোঝায়, 'বিভু-চৈতন্যের অমৃতময় জীবন-চরিত'।

কিন্তু জীবনীশক্তির এই অমরত্ব প্রদর্শিত হয় কিভাবে? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন মানুষ অথবা প্রাণীর দ্বারা প্রদর্শিত হয় না, কেন না এই দেহে আমরা কেউই অমর নই। আমাদের জীবনীশক্তি আছে, আমাদের ক্রিয়া আছে এবং আমাদের স্বরূপে আমরা অমর। কিন্তু এই জড় জগতের যে বদ্ধ অবস্থায় আমরা পতিত হয়েছি, তার ফলে আমরা অমরত্ব প্রদর্শন করতে পারি না। *কঠ উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, জীব ও ভগবান উভয়ই নিত্য ও চেতন বস্তু। কিন্তু জীব ও ভগবান উভয়ই অবিনশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জীবরূপে আমরা অনেক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করি, কিন্তু আমাদের জড়াপ্রকৃতিতে অধঃপতনের প্রবণতা রয়েছে। ভগবানের এই ধরনের কোন প্রবণতা নেই। যেহেতু তিনি সর্ব শক্তিমান, তাই তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর জড়া প্রকৃতি হচ্ছে বহুবিধ অচিন্ত্য শক্তির একটি প্রকাশ।

ভগবান ও আমাদের মধ্যে কি পার্থক্য তা হৃদয়ঙ্গম করতে এই উদাহরণটি আমাদের সাহায্য করবে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে আমরা আপাতদৃষ্টিতে কেবল মেঘ দেখতে পাই, কিন্তু সেই মেঘের আবরণ ভেদ করে আমরা যদি আরও উপরে যাই, তা হলে উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ দেখতে পাব। এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে : যখন আমি সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে বিমানে নিউ ইয়র্কে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের বিমানটি মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার ফলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন আমরা মেঘের নীচে নেমে এলাম, তখন আর সূর্যকে দেখতে পেলাম না, তখন সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেঘের উপরিভাগে সূর্য তখন প্রবলভাবে তার কিরণ বিতরণ করছিল। একটি মেঘ সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করতে পারে না, কারণ সেটি এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় পরমাণু-সদৃশ, এমন কি তা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকেও আবৃত করতে পারে না। বিমান থেকে

শহরের গগনচুম্বী বাড়িগুলিকে অত্যন্ত ছোট দেখায়; তেমনই, ভগবানের কাছে সমগ্র জাগতিক সৃষ্টি অত্যন্ত তুচ্ছ। বদ্ধ জীবের মায়াবদ্ধ হবার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবানের সেই রকম প্রবণতা নেই। সূর্য যেমন মেঘের দ্বারা আবৃত হয় না, তেমনই ভগবানও মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন না। ভগবান যেহেতু কখনও মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হন না, তাই তিনি নিত্যমুক্ত। অতি ক্ষুদ্র জীব হওয়ার ফলে আমাদের মায়াবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমাদের বলা হয় বদ্ধ জীব। নির্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই জগতে আমরা যেহেতু মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই ভগবানও যখন এখানে আসেন, তখন তিনিও মায়ার অধীন হয়ে পড়েন। এটিই হচ্ছে তাদের দর্শনের ভ্রান্তি।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমাদের মতো একজন মনে করা উচিত নয়। তিনি হচ্ছেন পরম জীবসত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি কখনও মায়ারূপী মেঘের দ্বারা আবৃত হন না। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অংশ-প্রকাশ, এমন কি তাঁর শুদ্ধ ভক্তরাও কখনও মায়ার কবলে পতিত হন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার জন্য। পক্ষান্তরে বলা যায়, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং জীবদের শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। ঠিক যেমন একজন শিক্ষক তাঁর অক্ষম ছাত্রকে হাতে ধরে শিক্ষা দেন, "এভাবে লেখ—অ, আ, ই।" তা দেখে আমাদের বোকার মতো কখনই মনে করা উচিত নয় যে, শিক্ষক অ, আ, ই, ঈ লিখছেন। তেমনই, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের বোকার মতো মনে করা উচিত নয় যে, তিনি হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ; আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং তিনি আমাদের কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই আলোকেই তাঁকে বিশ্লেষণ করা।

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে রক্ষা করব।"

আমরা বলি, "শরণাগত হতে হবে? কিন্তু আমার কত দায়িত্ব রয়েছে।"

আর মায়া আমাদের বলছে, "সেটি কখনও করো না, তা হলে তো তুমি আমার কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমার অধীনে থাক, আর আমি তোমাকে অনবরত পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করব।"

এটি সত্য যে, মায়া আমাদের সব সময় পদাঘাত করছে। এখন মায়া যে কিভাবে পদাঘাত করে সেটি আমাদের বোঝা দরকার। গর্দভ যখন গর্দভীর সঙ্গে মৈথুন করতে যায়, তখন গর্দভী তার মুখে পদাঘাত করে। এভাবেই কুকুর, বিড়াল ও অন্য সমস্ত পশুরা মৈথুনের সময় মারামারি করে এবং কোলাহল করে। পোষা স্ত্রী-হাতির সাহায্যে জঙ্গলের বুনো হাতি ধরা হয়। স্ত্রী-হাতি পুরুষ-হাতিটিকে ভুলিয়ে এনে ফাঁদে ফেলে। প্রকৃতির এই সমস্ত কৌশল পর্যবেক্ষণ করে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য মায়ার বিবিধ রকমের কার্যকলাপ রয়েছে এবং এই জড় প্রকৃতিতে মায়ার সব চাইতে শক্তিশালী শৃঙ্খল হচ্ছে স্ত্রীজাতি। স্ত্রী, পুরুষ বলতে অবশ্য বাইরের পোশাক দেহটিকে বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা স্ত্রীও নই, পুরুষও নই।

আমরা সকলেই হচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের সেবক। আমাদের বদ্ধ জীবনে আমরা সকলে সুন্দরী রমণীরূপী শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। এভাবেই প্রতিটি পুরুষই যৌন জীবনের দ্বারা আবদ্ধ, তাই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে যৌন বেগকে দমন করার শিক্ষা লাভ করতে হবে। অসংযত যৌন জীবন জীবকে সম্পূর্ণভাবে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। কিভাবে মায়ামুক্ত হতে হয়, সেই শিক্ষা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর এবং মায়ের বয়স সত্তর। আর তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুরুষ। যদিও তিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ধনী ছিলেন না, তবুও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই তিনি পরিবারের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন।

আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে চাই, তা হলে আমাদের মায়ার শৃঙ্খলকে ত্যাগ করতে হবে। আর যদি আমরা মায়ার রাজ্যেই থাকতে চাই, তা হলে আমাদের এমনভাবে জীবন যাপন করতে হবে, যাতে আমরা মায়ার অধীন হয়ে না পড়ি। সকলকেই যে সংসার ত্যাগ করতে হবে তা নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গৃহস্থ। যেটি পরিত্যাগ করতে হবে, তা হচ্ছে জড় জগৎকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও নিয়ন্ত্রিত শুদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনকে অনুমোদন করেছেন, কিন্তু যাঁরা সব কিছু পরিত্যাগ করে ত্যাগীর ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের ভোগ-বাসনাকে তিনি কখনই অনুমোদন করেননি। সেই বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। তাঁর এক সর্বত্যাগী ভক্ত ছোট হরিদাস একবার কামার্ত দৃষ্টিতে এক রমণীর প্রতি তাকিয়েছিলেন বলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং বলেন, "তুমি আমার সঙ্গে থেকে ত্যাগীর জীবন যাপন করছ, আর কামার্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের দিকে তাকাচ্ছ?" তিনি আর কখনও ছোট হরিদাসকে গ্রহণ করেননি। ছোট হরিদাস পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরহে ব্যথিত হয়ে আত্মবিসর্জন দেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তরা তাঁর কাছে গিয়ে ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দেন, "তোমরা সকলে তাকে ক্ষমা করে তার সঙ্গে থাকতে পার, আমি একলাই থাকব।" আর ছোট হরিদাসের আত্ম-বিসর্জনের সংবাদ যখন মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছয় (মহাপ্রভু অবশ্য অন্তর্যামী-সূত্রে সমস্ত ঘটনা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন), তখন তিনি বলেছিলেন, "ভালই হয়েছে।" আবার দেখা যায়, মহাপ্রভু একবার যখন শুনলেন যে, তাঁর এক গৃহস্থ ভক্তের স্ত্রী গর্ভবতী, তখন তিনি সেই ভক্তটিকে একটি বিশেষ নাম দিয়ে নির্দেশ দেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হলে যেন তাকে সেই বিশেষ নামটি দেওয়া হয়। এভাবেই তিনি গৃহস্থদের নিয়ন্ত্রিত জীবন অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু ত্যাগের জীবন গ্রহণ করে যারা 'উপবাসের দিনে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার' মতো ভোগ করার চেষ্টা করে, তাদের প্রতি তিনি ছিলেন বজ্রের থেকেও কঠোর। পক্ষান্তরে বলা যায়, তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কোন রকম ভণ্ডামি তিনি বরদাস্ত করতেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব লাভের শিক্ষা দান করেছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* বলতে বোঝায়, 'বিভু-চৈতন্যের অমৃতময় চরিত-সুধা'। বিভু-চৈতন্য হচ্ছেন

পরমেশ্বর ভগবান। তিনি হচ্ছেন পরম সত্তাসম্পন্ন। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তারা সকলেই স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন। এই কথা বোঝা খুবই সহজ যে, আমাদের চিন্তা ধারায় এবং আকাঙ্ক্ষায় আমরা সকলে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পরমেশ্বর ভগবানও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। তিনি হচ্ছেন সর্বময় কর্তা, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ কেউই নেই। ভগবানের সৃষ্ট অতি ক্ষুদ্র জীবদের মধ্যে যোগ্যতা বিচারে একজন আর একজনের চেয়ে বড় হতে পারে বা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে। বিভিন্ন জীবদের মতো ভগবানও স্বতন্ত্র, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে, তিনি হচ্ছেন পরম স্বতন্ত্র। ভগবান হচ্ছেন অভ্রান্ত, তাই *ভগবদ্গীতায়* তাঁকে অচ্যুত নামে অভিহিত করা হয়েছে। *অচ্যুত* শব্দের অর্থ 'যাঁর পতন হয় না।' এই নামটি যুক্তিযুক্ত হয়েছে, কারণ *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনকে মোহগ্রস্ত হতে দেখা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ যে অচ্যুত তা তিনি নিজে ব্যক্ত করেছেন যখন তিনি অর্জুনকে বলেন, "আমি যখন এই জগতে আবির্ভূত হই, তখন আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আমি সেই কার্য সাধন করি।" (*ভঃ গীঃ* ৪/৬)

এভাবেই আমাদের চিন্তা করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির অধীন হয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অবতারগণ কখনই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হন না। তাঁরা সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত। বাস্তবিকপক্ষে *শ্রীমদ্ভাগবতে* দৈবী গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, জড়া প্রকৃতির মধ্যে থাকলেও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। এমন কি ভগবানের ভক্তও যদি এই রকম মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারেন, তা হলে ভগবানের সম্বন্ধে কি আর বলার থাকতে পারে?

মূল প্রশ্ন হচ্ছে, জড় জগতের মধ্যে বাস করেও কিভাবে আমরা জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারি? শ্রীল রূপ গোস্বামী এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এই জগতে বাস করলেও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে আমরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত থাকতে পারি। এখন ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে, "কিভাবে আমি সেবা করতে পারি?" এটি কেবল ধ্যানের বিষয় নয়, ধ্যান হচ্ছে মনের ক্রিয়া। কিন্তু সেবা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবহারিক কার্যের অনুশীলন। কৃষ্ণসেবায় সব কিছু ব্যবহার করতে হবে। আমাদের যা কিছু রয়েছে, যা কিছু ব্যবহার্য, সেই সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবহার করা উচিৎ। কৃষ্ণসেবায় কোন কিছুই অব্যবহৃত রাখা উচিত নয়। আমরা আমাদের সব কিছুই ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারি—টাইপ-রাইটার, এরোপ্লেন, গাড়ি, এমন কি ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত। মানুষের কাছে যখন শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করা হয়, সেটিও ভগবানের সেবা। যখন আমাদের মন, ইন্দ্রিয়, বাক্য, অর্থ ও শক্তি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন আমরা আর জড়া প্রকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থাকি না। পারমার্থিক চেতনা বা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাবে আমরা জড়া প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করতে পারি। এটি সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অংশসমূহ এবং তাঁর সেবাপরায়ণ ভক্তরা কেউই এই জড়া প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নন, যদিও অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, তাঁরা জড়া প্রকৃতিতে রয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আমাদের শিক্ষা দান করে যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং চিৎ-জগতে আমাদের কার্যকলাপও অবিনশ্বর। মায়াবাদীরা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ,

নিরাকার। তারা তর্ক করে যে, সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির পর মুক্ত আত্মার আর কথা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্তদের মতানুসারে, যখন কেউ সেই উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়, তখনই যথার্থ কথা বলা শুরু হয়। তাঁরা বলেন, "পূর্বে আমরা যে সমস্ত কথা বলেছি, সেই সবই অর্থহীন ও অবান্তর। এখন আমরা প্রকৃত কথা বলতে শুরু করব, সেই কথা হচ্ছে কৃষ্ণকথা।" 'আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী মৌন অবলম্বন করে' তাদের এই যুক্তির সমর্থনে মায়াবাদীরা এই সম্বন্ধে জলপাত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে। যখন জলপাত্রটি জলপূর্ণ থাকে না, তখন তাতে শব্দ হয়, আর যখন তা জলে পরিপূর্ণ থাকে, তখন তাতে কোন শব্দ হয় না। কিন্তু আমরা কি কলসি? জলের পাত্রের সঙ্গে আমাদের কি তুলনা করা যায়? তর্কশাস্ত্র মতে সদৃশ বস্তুর দ্বারাই সাদৃশ্য বিচার করা যায় এবং যে দুটি বস্তুর মধ্যে সব চাইতে বেশি সাদৃশ্য রয়েছে, সেটিই হচ্ছে সব চাইতে ভাল দৃষ্টান্ত। একটি জলের কলসি সজীব বস্তু নয়। তা চলাফেরা করতে পারে না। সুতরাং, একটি জলের পাত্রের সঙ্গে একজন পূর্ণ চেতন মানুষের তুলনা করা যায় না। তাই নীরব ধ্যানপদ্ধতি যথেষ্ট নয়। কেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের এত কিছু বলার আছে যে, কেবলমাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সমন্বিত এক-একটি দিন সেই জন্য পর্যাপ্ত নয়। মূর্খ যতক্ষণ নীরব থাকে ততক্ষণই সম্মান পায়। যখনই সে মুখ খোলে, তখনই তার মূর্খতা প্রকাশ পায়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* আমরা দেখতে পাই যে, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে অনাবিষ্কৃত অপূর্ব সমস্ত বিষয় উন্মোচিত হয়।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রারম্ভে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন, "আমি আমার গুরুবর্গকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।" গুরু-পরম্পরার সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করার জন্য তিনি এখানে বহুবচন প্রয়োগ করেছেন। এমন নয় যে, তিনি কেবল তাঁর গুরুদেবকেই প্রণতি নিবেদন করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে সমগ্র গুরু-পরম্পরাকেই তিনি প্রণতি নিবেদন করেছেন। এভাবেই পূর্বতন সমস্ত বৈষ্ণবগণকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করার জন্য গ্রন্থকার গুরুদেবের বেলায় বহুবচন প্রয়োগ করেছেন। গুরু-পরম্পরাকে প্রণতি নিবেদন করার পর গ্রন্থকার ভগবানের ভক্তদের, স্বয়ং ভগবানকে, তাঁর অবতারগণকে, ভগবানের প্রকাশদেরকে এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তিকে প্রণতি নিবেদন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একাধারে ভগবান, গুরু, ভক্ত, অবতার, অন্তরঙ্গা শক্তি ও অংশ-প্রকাশের মূর্তিমান পুরুষ। তাঁর ভক্ত-স্বরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন ভগবানের প্রথম প্রকাশ; অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন ভক্ত-অবতার; গদাধর হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তি; এবং ভক্তরূপে তটস্থা জীবশক্তি হচ্ছেন শ্রীবাস। তাই রামানুজাচার্যের বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও এককভাবে চিন্তা করা হয় না, তাঁকে সমস্ত প্রকাশসহ সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতে হয়। *বিশিষ্টাদ্বৈত* দর্শনে ভগবানের শক্তি, প্রকাশ ও অবতারদের বৈচিত্র্যের মধ্যে এক বলে বিবেচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান এগুলি থেকে ভিন্ন নন—সমস্ত কিছু নিয়েই ভগবান।

প্রকৃতপক্ষে, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* শিক্ষানবিসদের জন্য নয়, তা হচ্ছে পরা বিদ্যার স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ। আদর্শগতভাবে, *ভগবদ্গীতা* থেকে এই পাঠ শুরু হয় এবং

তারপর *শ্রীমদ্ভাগবত* হয়ে অবশেষে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত*তে প্রবেশ করতে হয়। যদিও এই সমস্ত মহৎ গ্রন্থ একই পরম স্তরে অধিষ্ঠিত, তবুও তুলনামূলকভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের। এর প্রতিটি শ্লোকই নিখুঁতভাবে রচিত।

চৈতন্য-চরিতামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন। তিনি তাঁদেরকে জড় জগতের অন্ধকার বিনাশকারী সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই লীলায় সূর্য ও চন্দ্র একই সঙ্গে উদিত হয়েছেন।

পাশ্চাত্য দেশে, যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণমহিমা সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে অজ্ঞাত, সেখানে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, "কে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য?" *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থাকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সাধারণত, *উপনিষদে* সেই পরমতত্ত্বকে নির্বিশেষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু *ঈশোপনিষদে* পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

"হে প্রভু! হে সর্বজীবের পালক। আপনার প্রকৃত মুখারবিন্দ উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে। দয়া করে সেই আবরণ উন্মোচন করে আপনার শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশ করুন।" (*শ্রীঈশোপনিষদ* ১৫) নির্বিশেষবাদীদের ভগবানের দেহনির্গত ব্রহ্মজ্যোতির ঊর্ধ্বে গমন করে তাঁর সবিশেষ রূপ দর্শন করার ক্ষমতা নেই। *ঈশোপনিষদ* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তবগান। এই নয় যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে অস্বীকার করা হয়েছে। *উপনিষদে* নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও বর্ণনা রয়েছে। তবে সেই ব্রহ্মকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি বলা হয়েছে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* আমরা জানতে পারি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। পক্ষান্তরে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস। পরমাত্মা, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে এবং বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে বিরাজ করেন, তিনি শ্রীচৈতন্যেরই আংশিক প্রকাশ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেহেতু ব্রহ্ম ও সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মার উৎস, তাই তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই হেতু, তিনি হচ্ছেন সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সমন্বিত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। সংক্ষেপে আমাদের জানতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর সমান বা তাঁর থেকে মহৎ কেউ নেই। তাঁর থেকে মহৎ কোন তত্ত্ব উপলব্ধি করার নেই। তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম।

শ্রীল রূপ গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁর পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভে মহাপ্রভু তাঁকে ক্রমান্বয়ে দশ দিন ধরে শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি একটি সুন্দর শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লিখেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি, যিনি অন্য সমস্ত অবতার, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিকতর উদার, কেন না তিনি নির্বিচারে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন, যা পূর্বে কেউ কখনও দান করেননি।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা শুরু হয়েছে। তিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ বা হঠযোগের পন্থাকে অবলম্বন করার জন্য শিক্ষা দেননি। তিনি তাঁর শিক্ষা শুরু করেছেন জড় অস্তিত্বের পরিসমাপ্তিতে, যেখানে সব রকম জড় আসক্তি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা হয়, সেখান থেকে। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ শুরু করেছেন জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি শেষ করেছেন সেখানেই, যেখানে আত্মা ভক্তি সহকারে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মায়াবাদীরা এখন সমস্ত রকম কথাবার্তা বর্জন করার কথা বলে। কিন্তু সেখান থেকেই প্রকৃত আলোচনা কেবলমাত্র শুরু হয়। *বেদান্ত-সূত্রের* শুরুতেই বলা হয়েছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*— "এখন আমাদের পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করা উচিত।" শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সমস্ত অবতারের মধ্যে সবচেয়ে উদার অবতার বলে প্রশংসা করেছেন, কেন না ভগবদ্ভক্তির মহান শিক্ষা দান করে তিনি মহত্তম উপহার প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, তিনি সমস্ত লোকের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তর দান করেছেন।

ভগবানের সেবা এবং তাঁকে উপলব্ধি করার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, যিনি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবান মহান—এই তত্ত্বটি স্বীকার করা ভাল, কিন্তু ভগবৎ-উপলব্ধির জন্য সেটি যথেষ্ট নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন আচার্যরূপে, একজন মহান শিক্ষকরূপে শিক্ষা দান করেছেন যে, আমরা ভগবানের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারি এবং ভগবানের বন্ধু, পিতা-মাতা অথবা প্রেমিকা হতে পারি। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা ছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে দর্শন করে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বন্ধুর মতো আচরণ করেছিলেন, সেই জন্য অর্জুন বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু আরও উচ্চতর তত্ত্ব প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সখ্য লাভ করতে পারি এবং তা লাভ হয় অন্তহীনভাবে। এই সখ্য সম্ভ্রম-মিশ্রিত সখ্য নয়, তা হচ্ছে বিধি-নিষেধের বন্ধনের অতীত স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের সখ্য। আমরা ভগবানের সঙ্গে তাঁর পিতা অথবা মাতারূপে সম্পর্কযুক্ত হতে পারি। এটি কেবল *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেরই* নয়, *শ্রীমদ্ভাগবতেরও* দর্শন। পৃথিবীতে এমন আর কোন শাস্ত্র নেই, যেখানে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে পুত্ররূপে আচরণ করেন। সাধারণত ভগবানকে সর্বশক্তিমান পিতারূপে দর্শন করা হয়, যিনি তাঁর সন্তানদের সমস্ত দাবি পূরণ করেন। সাধারণত, মহান ভক্তরাই তাঁদের ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন কালে কখনও কখনও ভগবানের সঙ্গে পুত্ররূপে আচরণ করেন। তখন পুত্ররূপী ভগবান হয়ত কোন কিছুর জন্য আবদার করেন, আর পিতা অথবা মাতারূপে ভক্ত তাঁর সেই আবদার পূরণ করেন এবং এভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের পিতা অথবা মাতা হতে পারেন। তখন ভগবানের কাছ থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তিনি ভগবানকে দান করেন।

ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে মা যশোদা, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, "তুমি ভাল করে খাও, তা না হলে তুমি বাঁচবে না।" এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ যদিও সব কিছুর অধীশ্বর, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের কৃপার উপর নির্ভর করে রয়েছেন। এটি ভগবৎ-প্রীতির এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত, যে স্তরে ভক্ত মনে করেন যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা অথবা মাতা।

যাই হোক, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহত্তম দান হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিকরূপে লাভ করার অনুপম শিক্ষা। এই স্তরে ভগবান তাঁর ভক্তের প্রেমে এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি তাঁদের সেই ভালবাসার প্রতিদান দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপিকাদের প্রতি এমনই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের সেই প্রেমের প্রতিদান দিতে অক্ষম হয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের ভালবাসার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি; তোমাদের দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই।" ভগবদ্ভক্তির এই রকম অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত স্তর একমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দান করে গিয়েছেন, পূর্বে অন্য কোন অবতার অথবা আচার্য এই অমূল্য বস্তুটি দান করেননি। তাই রূপ গোস্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পীতবর্ণ ধারণ করে শচীমাতার তনয়রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মহান দাতা, কেন না সকলকে শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম দান করবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আপনারা সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আপনাদের হৃদয়ে ধারণ করুন। তাঁর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানা সহজ হবে।"

'ভগবৎ-প্রেম' কথাটি আমরা বহুবার শুনেছি। এই ভগবৎ-প্রেম কোন স্তর পর্যন্ত বিকশিত হতে পারে তা আমরা বৈষ্ণব-দর্শন থেকে জানতে পারি। ভগবৎ-প্রেমের তাত্ত্বিক জ্ঞান নানা স্থানে ও নানা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রেম যে কি, কিভাবে তাকে বিকশিত করা যায়, তা একমাত্র বৈষ্ণব-সাহিত্যেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে ভগবৎ-প্রেম দান করে গিয়েছেন, তা হচ্ছে সর্বোত্তম ও অতুলনীয়।

এমন কি এই জড় জগতে প্রেম সম্বন্ধে আমাদের স্বল্প ধারণা রয়েছে। সেই ধারণা এসেছে কোথা থেকে? ভগবানের প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক প্রেম রয়েছে, এটি তারই প্রকাশ। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সেই সবই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান, যিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস। আমাদের স্বরূপে ভগবানের সঙ্গে যে নিত্য প্রেমের সম্পর্ক, সেটিই হচ্ছে যথার্থ প্রেম। আর জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় যে প্রেমের প্রকাশ দেখা যায়, তা কেবল প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। আমাদের যথার্থ প্রেম নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী। কিন্তু সেই প্রেম যেহেতু এই প্রাকৃত জগতে বিকৃত আকারে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই তা নিরবচ্ছিন্ন নয়, আর চিরস্থায়ীও নয়। আমরা যদি যথার্থ অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করতে চাই, তা হলে আমাদের প্রেমকে পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পণ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের মূলনীতি।

এই জড় চেতনায় আমরা সেই সমস্ত বস্তুকে ভালবাসার চেষ্টা করছি, যা ভালবাসার যোগ্য নয়। আমরা এখন আমাদের ভালবাসা কুকুর ও বিড়ালের উপর অর্পণ করছি। তার ফলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে যে, কুকুর-বিড়ালের প্রতি অত্যধিক আসক্তির ফলে মৃত্যুর সময় তাদের চিন্তায় মগ্ন থাকলে, পরের জন্মে আমাদের কুকুর অথবা বিড়ালের পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর সময় আমাদের চেতনা আমাদের পরবর্তী জীবনকে নির্ধারিত করে। বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর কেন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এটি তার একটি কারণ। স্ত্রী যদি তার পতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়, তা হলে মৃত্যুর সময় সে তার কথা স্মরণ করবে এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি পুরুষ শরীরে উন্নীত হবে। সাধারণত একজন পুরুষের জীবন একজন স্ত্রীর থেকে উন্নত, কারণ পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পক্ষে পুরুষের শরীর অনেক বেশি অনুকূল।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত এতই অনুপম যে, তাতে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কেউ যদি আমার শরণাগত হয়, তা সে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য অথবা নিম্নযোনির অন্তর্গত যেই হোক না কেন, সে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে আমার সান্নিধ্য লাভ করবে।" এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি শাস্ত্রেই ভগবৎ-প্রেমের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম যে কি, তা কেউ জানে না। সেটিই হচ্ছে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে বৈদিক শাস্ত্রের পার্থক্য। বৈদিক শাস্ত্রগুলি ভগবৎ-প্রেম লাভের জন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। অন্যান্য শাস্ত্রগুলি কিভাবে ভগবানকে প্রেম নিবেদন করতে হয়, সেই সম্বন্ধে কোন সংবাদ দান করেনি, এমন কি প্রকৃতপক্ষে ভগবান কে, তাও বর্ণনা করেনি। যদিও তারা তত্ত্বগতভাবে ভগবৎ-প্রেমের কথা প্রচার করে, কিন্তু সেই ভগবৎ-প্রেম যে কিভাবে সম্পাদন করতে হয়, সেই সম্বন্ধে তাদের কিছুই ধারণা নেই। কিন্তু এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহারিকভাবে মাধুর্যমণ্ডিত ভগবৎ-প্রেমের পন্থা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারাণীর ভূমিকা অবলম্বন করে রাধারাণী যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবেসেছিলেন, সেভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার চেষ্টা করেছেন। রাধারাণী যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন তা কৃষ্ণও বুঝতে পারেননি। তাই, রাধারাণীর সেই প্রেম অনুভব করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে তা জানবার চেষ্টা করেছেন। সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের মূল রহস্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে প্রেম নিবেদন করতে হয়, তা আমাদের প্রদর্শনের জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। এভাবেই গ্রন্থকার পঞ্চম শ্লোকে লিখেছেন, "আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি রাধারাণীর চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন।"

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শ্রীমতী রাধারাণী কে? এবং রাধা-কৃষ্ণ কি? রাধা-কৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমের বিনিময়—কিন্তু সাধারণ প্রেম নয়। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তার মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা শক্তির আবার তিনটি ভাগ রয়েছে—সম্বিৎ, হ্লাদিনী ও সন্ধিনী। হ্লাদিনী শক্তি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি। সমস্ত জীবের এই আনন্দ আস্বাদন করার ক্ষমতা রয়েছে, কেন না সকলেই আনন্দ লাভের

চেষ্টা করছে। সেটিই হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বর্তমানে আমরা এই জড় বদ্ধ অবস্থায় আনন্দদায়িনী শক্তিকে উপভোগের চেষ্টা করছি জড় দেহের মাধ্যমে। দেহের সংযোগের ফলে জড় ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে আমরা আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা করছি। আমাদের কখনই হৃদয়ে পোষণ করা উচিত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন নিত্য চিন্ময়, তিনিও এই জড় স্তরের আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করছেন। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগৎকে অনিত্য ও দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। তা হলে কেন তিনি এই জড় স্তরে আনন্দের অনুসন্ধান করতে যাবেন? তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, পরম চেতন এবং তাঁর আনন্দ জড় ধারণার অতীত।

শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে আনন্দ দান করা যায়, তা জানতে হলে আমাদের অবশ্যই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম নয়টি স্কন্ধ এবং তার পরে দশম স্কন্ধটি পাঠ করতে হবে। দশম স্কন্ধে শ্রীমতী রাধারাণী ও অন্যান্য ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের মাধ্যমে তাঁর হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা প্রথমেই *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হ্লাদিনী শক্তি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলায় প্রবেশ করতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের রাধারাণীকে আলিঙ্গন অথবা ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর রাসনৃত্যের বর্ণনা পাঠ করে তার মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তারা ভগবানের সেই অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসকে জাগতিক কামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। ভ্রান্তিবশত তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের মতো সাধারণ একজন মানুষ এবং একজন সাধারণ মানুষ যেমন কামার্ত হয়ে একজন যুবতীকে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণও বুঝি সেই রকম ব্রজগোপিকাদের আলিঙ্গন করেন। এভাবেই কিছু মানুষও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কারণ তারা মনে করে যে, এটি এমনই একটি ধর্ম যেখানে নির্দ্বিধায় অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে লিপ্ত হওয়া যায়। সেটি কৃষ্ণভক্তি নয়, সেটিকে বলা হয় প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়-জাগতিক কাম।

এই ধরনের ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব ভালভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তিতে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সম্পাদিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তিসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ। শ্রীকৃষ্ণ যে কে তা না জানা হলে, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিকে জানা অসম্ভব। এই জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণ কোন রকম আনন্দ উপভোগ করেন না, কিন্তু তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রয়েছে। আমরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাই এই হ্লাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু আমরা জড়ের মাধ্যমে সেই শক্তিকে আস্বাদন করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কৃষ্ণ এই রকম বৃথা প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বিষয় হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এই শক্তি প্রকাশ করেন রাধারাণীরূপে এবং তারপর তাঁর সঙ্গে প্রেম বিনিময় করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন না। কিন্তু তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে রাধারাণীরূপে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তিকে উপভোগ করাবার জন্য নিজেকে রাধারাণীরূপে প্রকাশ করেন। ভগবানের বহু অংশ-প্রকাশ ও অবতারদের মধ্যে এই হ্লাদিনী শক্তি হচ্ছে সর্বোত্তম ও প্রধান।

এমন নয় যে, রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। রাধারাণীও শ্রীকৃষ্ণ, কেন না শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নেই। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই এবং শক্তিমান ব্যতীত শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। তেমনই, রাধারাণী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত রাধারাণীর কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই কারণে, বৈষ্ণব-দর্শনে সর্বপ্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির আরাধনা করা হয়। এভাবেই ভগবান ও তাঁর শক্তিকে সর্বদাই রাধা-কৃষ্ণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনই, নারায়ণের উপাসকেরা প্রথমে লক্ষ্মীদেবীর নাম উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ; তেমনই, রামচন্দ্রের উপাসকেরা প্রথমে সীতাদেবীর নাম উচ্চারণ করেন। সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ—সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রথমে শক্তিকে সম্বোধন করা হয়।

রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একই তত্ত্ব, কিন্তু কৃষ্ণ যখন আনন্দ উপভোগ করতে চান, তিনি তখন নিজেকে রাধারাণীরূপে প্রকাশ করেন। রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময়ই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির প্রকৃত প্রকাশ। আমরা যদিও বলি যে, 'যখন' শ্রীকৃষ্ণ সেই বাসনা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কখন বাসনা করেন তা কেউই বলতে পারে না। আমরা এভাবেই বলি তার কারণ হচ্ছে, জড় জগতের বদ্ধ জীবনে আমরা মনে করি যে, সব কিছুরই একটা শুরু রয়েছে; কিন্তু চিন্ময় জীবনে সব কিছুই পূর্ণ এবং তাই শুরুও নেই, শেষও নেই। কিন্তু তবুও রাধা ও কৃষ্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে দুই রূপে প্রকাশিত হয়েছেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই 'কখন' এই প্রশ্নটি আপনা থেকেই মনে আসে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর হ্লাদিনী শক্তিকে উপভোগ করতে চান, তখন তিনি নিজেকে রাধারাণীরূপে প্রকাশ করেন। আর যখন তিনি রাধারাণীর মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান, তখন তিনি রাধারাণীর সঙ্গে আবার এক হয়ে যান এবং সেই সম্মিলিত রূপ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* পঞ্চম শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সমস্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ গ্রহণ করেন, তা পরবর্তী শ্লোকে গ্রন্থকার পুনরায় ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর প্রণয়ের মহিমা কি রকম তা জানতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতে চেয়েছিলেন, "শ্রীমতী রাধারাণী কেন আমাকে এত ভালবাসে? আমার মধ্যে কি এমন বিশেষ গুণ রয়েছে, যা তাকে এভাবে আকৃষ্ট করে? আর কিভাবেই বা সে আমাকে ভালবাসে?" পরমেশ্বর ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কারও ভালবাসার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, তা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে মনে হয়। আমরা স্ত্রী অথবা পুরুষের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ আমরা অপূর্ণ এবং আমাদের মধ্যে কোন-না-কোন কিছুর অভাব রয়েছে। পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রেম, শক্তি ও আনন্দ অনুপস্থিত, তাই একজন পুরুষ একজন স্ত্রীকে চায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বেলায় তেমন হয় না। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময় প্রকাশ করেন, "কেন আমি রাধারাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হই? আর রাধারাণী যখন আমার প্রেম অনুভব করেন, তখন সেটি প্রকৃতপক্ষে কি রকম?" সেই প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে সমুদ্রের দিগন্ত থেকে চন্দ্রের উদয় হয়। সমুদ্র-মন্থনের ফলে

চন্দ্র উত্থিত হয়েছিল, সেভাবেই চিন্ময় প্রেম মন্থন করে শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয় হয়েছে। বাস্তবিকই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি ছিল চন্দ্রকিরণের মতো তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব প্রসঙ্গে এটি একটি অর্থব্যঞ্জক উপমা। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ণ তাৎপর্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সাতটি শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করেছেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর উৎস বলরাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার বলদেবরূপে, তাঁর অংশ সঙ্কর্ষণরূপে এবং সঙ্কর্ষণের অংশ প্রদ্যুম্নরূপে প্রকাশিত হয়। এভাবেই বহু অংশ-প্রকাশের বিস্তার হয়। বহুরূপে প্রকাশিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ, সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি হচ্ছেন মূল প্রদীপের মতো, যার থেকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো যায়। অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো হলেও প্রথম যে প্রদীপটি থেকে সমস্ত প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়েছিল, সেটিই হচ্ছে মূল প্রদীপ। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে নিজেকে বিস্তার করেন এবং সেই সমস্ত প্রকাশকদের বলা হয় বিষ্ণুতত্ত্ব। বিষ্ণু হচ্ছেন বিশাল প্রদীপ, আর আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ, কিন্তু সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার।

যখন জড় জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন বৈকুণ্ঠের সঙ্কর্ষণ নিজেকে মহাবিষ্ণু-রূপে প্রকাশিত করেন। এই মহাবিষ্ণু কারণ-সমুদ্রে শায়িত হন এবং তাঁর নিঃশ্বাসের প্রভাবে নাসিকারন্ধ্র থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়। এভাবেই মহাবিষ্ণু থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয় এবং সেগুলি কারণ-সমুদ্রে ভাসমান থাকে। এই সম্বন্ধে বামনদেবের লীলা-বিলাসের একটি কাহিনী রয়েছে। বামনদেব যখন তিনটি পদক্ষেপে বলি মহারাজের সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছিলেন, তখন তাঁর পদবিক্ষেপের ফলে নখের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয় এবং সেই ছিদ্রপথে কারণ-সমুদ্র থেকে কারণ-বারি প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে এবং কারণ-বারির সেই জলস্রোতই হচ্ছে গঙ্গানদী। তাই গঙ্গার জল হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম ধৌতকারী মহাপবিত্র জল এবং হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হয়।

কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু হচ্ছেন বলরামের প্রকাশ, আর বলরাম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ এবং বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—ষোড়শ অক্ষর সমন্বিত এই মহামন্ত্রে রাম শব্দ দ্বারা বলরামকে সম্বোধন করা হয়। নিত্যানন্দ প্রভু যেহেতু স্বয়ং বলরাম, তাই রাম শব্দে নিত্যানন্দ প্রভুকেও বোঝানো হয়। এভাবেই হরে কৃষ্ণ, হরে রাম কেবল কৃষ্ণ ও বলরামকেই সম্বোধন করে না, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেও সম্বোধন করে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* বিষয়বস্তু মুখ্যত জাগতিক সৃষ্টির অতীত তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করে। এই জড় সৃষ্টিকে বলা হয় মায়া, কারণ এর কোন নিত্য অস্তিত্ব নেই। কারণ, তা কখনও প্রকাশিত এবং কখনও অপ্রকাশিত, তাই তার নাম মায়া। কিন্তু অনিত্য এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে এক পরা প্রকৃতি রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/২০) বলা হয়েছে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

"তবুও আর একটি প্রকৃতি রয়েছে যা নিত্য এবং এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের অতীত। তা হচ্ছে পরা প্রকৃতি এবং তার কখনও বিনাশ হয় না। এই জগতের সব কিছু বিনাশ হলেও সেই জগৎ অপরিবর্তনীয় থাকে।" এই জড় জগৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমন্বিত, কিন্তু পরা প্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত অপরা প্রকৃতির অতীত। সৃষ্টি ও বিনাশের অতীত সেই পরা প্রকৃতি হচ্ছে চিৎ-শক্তি, যা সমস্ত জীবের মধ্যেই প্রকাশিত। জড় দেহ নিকৃষ্টা প্রকৃতিজাত জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি। কিন্তু পরা প্রকৃতি সেই দেহকে সক্রিয় করে রেখেছে। এই পরা প্রকৃতির লক্ষণ হচ্ছে চেতনা। এভাবেই চিৎ জগতের সব কিছু পরা প্রকৃতির দ্বারা গঠিত, তাই সেখানে সব কিছুই চেতন। এই জড় জগতে জড় বস্তুগুলি চেতন নয়, কিন্তু চিৎ-জগতে প্রতিটি অণু-পরমাণু হচ্ছে চেতন। সেখানে একটি টেবিলও চেতন, ভূমি চেতন, গাছপালা চেতন—সমস্ত কিছুই চেতন।

জড় জগৎ যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এই জড় জগতে সব কিছুই গণনা করা হয় কল্পনার দ্বারা অথবা কোন ত্রুটিযুক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা, কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে জড়াতীত জগতের সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু পরীক্ষামূলক উপায়ে জড়া প্রকৃতির অতীত কোন তথ্য লাভ করা সম্ভব নয়, তাই যারা পরীক্ষামূলক গবেষণালব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস করে, তারা বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারে, কেন না এই ধরনের মানুষেরা এমন কি হিসাব করতে পারে না যে, এই ব্রহ্মাণ্ড কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; তারা এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় সম্বন্ধেও অবগত নয়। পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির অতীত যে চিৎ-জগৎ, সেখানকার তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। যা আমাদের ধারণার অতীত, তা অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্য সম্বন্ধে তর্ক করা অথবা কল্পনা করা নিরর্থক। কোন কিছু যদি সত্যিই অচিন্ত্য হয়, তা হলে তা জল্পনা-কল্পনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়। আমাদের শক্তি ও ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সীমিত। তাই সেই অচিন্ত্য বস্তুর বিষয়ে জানার জন্য আমাদের বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হবে। পরা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে হয়। যে বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, সেই সম্বন্ধে সংশয়গ্রস্ত হয়ে তর্ক করা কি করে সম্ভব? অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* প্রদর্শন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে অর্জুনকে বলেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥

"আমি এই অব্যয় যোগ সূর্যদেব বিবস্বানকে বলেছিলাম। বিবস্বান তা মানব-জাতির পিতা মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।" (*গীতা* ৪/১) এটিই হচ্ছে পরম্পরার পন্থা। তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্টজীব ব্রহ্মার হৃদয়ে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা তা তাঁর শিষ্য নারদকে দান করেন, নারদ সেই জ্ঞান তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবকে দান করেন এবং ব্যাসদেব তা দান করেন

মধ্বাচার্যকে। তারপর মধ্বাচার্যের ধারায় এই জ্ঞান মাধবেন্দ্র পুরী প্রাপ্ত হন, মাধবেন্দ্র পুরী তা ঈশ্বর পুরীকে দান করেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই জ্ঞান শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়ার লীলাবিলাস করেন।

কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হন, তা হলে তাঁর গুরু গ্রহণ করার কি প্রয়োজন? তাঁর অবশ্যই গুরু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যেহেতু তিনি আচার্যরূপে (যিনি আচরণ করার মাধ্যমে শিক্ষা দান করেন) লীলাবিলাস করছিলেন, তাই তিনি গুরু গ্রহণ করেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণও গুরু গ্রহণ করেছিলেন, কেন না সেটিই হচ্ছে দিব্যজ্ঞান লাভের পন্থা। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান মানুষের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তবে আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে, ভগবানের জ্ঞানের অভাব ছিল বলে তিনি গুরু গ্রহণ করেছেন। এভাবেই গুরু গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি কেবল পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরু গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। এভাবেই পরম্পরার ধারায় যে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আসছে পরমেশ্বর ভগবান থেকে এবং সেই জ্ঞান যদি অবিকৃত থাকে, তা হলে তা পূর্ণ। এই জ্ঞান যিনি প্রথমে দান করেছিলেন, সেই আদিপুরুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সংযোগ না থাকলেও, গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় আমরা সেই একই জ্ঞান লাভ করতে পারি। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে এই দিব্যজ্ঞান সঞ্চার করেছিলেন। তবে এটি জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার একটি পন্থা, যা হৃদয়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এভাবেই জ্ঞান লাভের দুটি পন্থা রয়েছে—তার একটি হচ্ছে, সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং অন্যটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীগুরুদেবের উপর নির্ভরশীল হওয়া। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ বাইরে থেকে এবং অন্তর থেকে এই জ্ঞান প্রদান করেন। আমাদের কেবল তা গ্রহণ করতে হবে। এভাবেই যদি জ্ঞান লাভ করা হয়, তখন তা অচিন্ত্য কি চিন্ত্য, সেটি আর বিচার করার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই জড় জগতের অতীত বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তেমনই, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থেও বহু অচিন্ত্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ পর্যবসিত হয়, তা কেবল যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্রমতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে শব্দ-প্রমাণ। *বেদ* উপলব্ধির জন্য শব্দ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না তা শুদ্ধ; সেই কথা প্রামাণ্য অনুসারে স্বীকৃত। এমন কি এই জড় জগতে আমরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে টেলিফোন অথবা রেডিওর মাধ্যমে প্রেরিত নানা রকম সংবাদ আমরা গ্রহণ করি। এভাবেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা শব্দ-প্রমাণকে স্বীকার করি। সংবাদ প্রেরণকারী ব্যক্তিকে আমরা চাক্ষুষ দর্শন করতে না পারলেও শব্দের মাধ্যমে তার প্রেরিত সংবাদ আমরা গ্রহণ করে থাকি। তাই, বৈদিক জ্ঞান আহরণের বিষয়ে শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে অসংখ্য চিন্ময় লোকে পূর্ণ চিদাকাশ। এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ

মাত্র। কেবল এই ব্রহ্মাণ্ড নিয়েই জড় জগৎ গঠিত নয়। এই জগতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। কিন্তু সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে গঠিত যে জড় জগৎ, তা ভগবানের সমগ্র সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। বাকি তিন-চতুর্থাংশ স্থান রয়েছে চিদাকাশে। সেই চিদাকাশে অসংখ্য গ্রহলোক ভাসছে এবং তাদের বলা হয় বৈকুণ্ঠলোক। প্রতিটি বৈকুণ্ঠেই নারায়ণ তাঁর চতুর্ব্যূহ প্রকাশ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে অধ্যক্ষতা করছেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* অষ্টম শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, এই সঙ্কর্ষণই হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাবিষ্ণুরূপে ভগবান এই জড় জগৎ প্রকাশ করেন। সন্তান উৎপাদনের জন্য যেমন স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হয়, তেমনই এই জড় জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য মহাবিষ্ণু তাঁর মায়াশক্তি অথবা জড়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/৪) প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥

"হে কৌন্তেয়! এই জড় জগতে বিভিন্ন যোনিতে যে সমস্ত জীবের জন্ম হয়েছে, ব্রহ্মরূপী প্রকৃতিতে তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা হচ্ছি আমি।" বিষ্ণু কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমেই মায়ার গর্ভসঞ্চার করেন। সেটিই হচ্ছে চিন্ময় প্রক্রিয়া। জড় জগতে জীব তার দেহের বিশেষ কোন অঙ্গের দ্বারা গর্ভসঞ্চার করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা মহাবিষ্ণু যে কোন অঙ্গের দ্বারা গর্ভসঞ্চার করতে পারেন। কেবলমাত্র দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে ভগবান শ্রীবিষ্ণু জড়া প্রকৃতির গর্ভে অসংখ্য জীব উৎপাদন করতে পারেন। *ব্রহ্ম-সংহিতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় দেহ এতই শক্তিসম্পন্ন যে, সেই শরীরের যে কোন অঙ্গের দ্বারা তিনি অন্য যে কোন অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। আমরা কেবল আমাদের হাত বা ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করতে পারি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারাই স্পর্শ করতে পারেন। আমরা আমাদের চক্ষুর দ্বারা কেবল দর্শন করতে পারি, তার দ্বারা স্পর্শ বা ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চক্ষুর দ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ করতে এবং আহার্য গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকে যখন ভোগ নিবেদন করা হয়, তখন আমরা তাঁকে তা আহার করতে দেখি না; কিন্তু তিনি কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। চিৎ-জগতে যেখানে সব কিছুই চিন্ময়, সেখানে সমস্ত কার্য যে কিভাবে সম্পাদিত হয়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ আহার করেন না, অথবা আমরা কল্পনা করি যে, তিনি আহার করেন; তিনি প্রকৃতপক্ষে আহার করেন, কিন্তু তাঁর আহার আমাদের আহারের থেকে ভিন্ন ধরনের। আমরা যখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হব, তখন আমাদের আহারও তাঁর আহারের মতো হবে। সেই স্তরে দেহের প্রতিটি অঙ্গ অন্য যে কোন অঙ্গের কার্য সম্পাদন করতে পারে।

সৃষ্টির জন্য ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মাকে জন্মদান করার জন্য তাঁর লক্ষ্মীর প্রয়োজন হয় না, কেন না বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত এক পদ্মের

মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম হয়। লক্ষ্মীদেবী ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আসীন থেকে তাঁর সেবা করেন। এই জড় জগতে সন্তান উৎপাদনের জন্য মৈথুনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিৎ-জগতে পত্নীর সাহায্য ব্যতীত যত ইচ্ছা সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করা যায়। সুতরাং, সেখানে কোন রকম যৌনসঙ্গ নেই। যেহেতু চিৎ-শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই আমরা মনে করি যে, ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম কেবল একটি বানানো গল্প মাত্র। আমরা অবগত নই যে, ভগবানের চিন্ময় শক্তি এতই প্রবল যে, তার দ্বারা যে কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব। জড় শক্তি কতকগুলি নিয়মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু চিৎ-শক্তি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।

মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বীজরূপে অবস্থান করে এবং তিনি যখন শ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাদের প্রকাশ হয়। এই জড় জগতে সেই রকম কোন কিছুর অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, তবে এই প্রপঞ্চে ঘর্ম ত্যাগের মতো বিকৃত প্রতিবিম্বের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। মহাবিষ্ণুর এক-একটি নিঃশ্বাস যে কত দীর্ঘস্থায়ী, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাঁর এক-একটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং লয় হয়। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* তার বর্ণনা রয়েছে। ব্রহ্মার আয়ু হচ্ছে ভগবানের এক-একটি নিঃশ্বাসের সমান; আর আমাদের হিসাবে ৪৩২,০০,০০,০০০ বছরে ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা হয় এবং সেই হিসাবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল একশো বছর। আর এই আয়ুষ্কাল হচ্ছে মহাবিষ্ণুর এক-একটি নিঃশ্বাসের স্থিতিকালের সমান। তাই মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের শক্তির কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একটি অংশ-প্রকাশ মাত্র। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার নবম শ্লোকে এটি ব্যাখ্যা করেছেন।

দশম ও একাদশ শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাবিষ্ণুর অংশ-প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও তাঁর অংশ-প্রকাশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বর্ণনা করেছেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত একটি পদ্মের উপর ব্রহ্মা আবির্ভূত হন এবং সেই পদ্মফুলের নালের মধ্যে ছিল বহু গ্রহমণ্ডলী। তারপর ব্রহ্মা সমগ্র মানব-জাতি, পশুজাতি—সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত থাকেন এবং তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ও পালনকর্তা। এভাবেই ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্তা এবং ধ্বংসের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, শিব তখন সমস্ত কিছু ধ্বংস করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথম এগারো শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আলোচনা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরাম। তারপর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে তিনি অদ্বৈত আচার্যের বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর একজন মুখ্য অনুগামী এবং মহাবিষ্ণুর অবতার। এভাবেই অদ্বৈত আচার্যও ভগবান বা ভগবানের অংশ-প্রকাশ। অদ্বৈত শব্দটির অর্থ হচ্ছে যা দ্বৈত নয়, এবং তাঁর নাম এই প্রকার, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তিনি আচার্য নামেও অভিহিত, কারণ তিনি কৃষ্ণভাবনার শিক্ষা প্রচার করেন। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তিনি

ঠিক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, কিন্তু তিনি জনসাধারণকে কৃষ্ণপ্রেমের শিক্ষা দান করার জন্য ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তেমনই, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যদিও ভগবান, তবুও তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় জ্ঞান দান করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। এভাবেই তিনিও ভগবানের ভক্ত-অবতার।

শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* চতুর্দশ শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চতত্ত্বকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদেরা যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতি ভগবানের ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সর্ব অবস্থাতেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তাঁর ভক্তদের শক্তির উৎস। তাই, আমরা যদি যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ সম্পাদন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হই, তা হলে আমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥"

পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ছিলেন বৃন্দাবনবাসী একজন মহান ভক্ত। প্রথম জীবনে তিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে গৌরবঙ্গের বর্ধমান জেলায় কাটোয়া নামক একটি ছোট শহরে বসবাস করতেন। তাঁর পরিবারে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা হত এবং একবার যখন ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তাঁর পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়, তখন স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ পেয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান। তখন যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, কিন্তু তিনি সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি যখন বৃন্দাবনে পৌঁছান, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকজন প্রধান পার্ষদ গোস্বামীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবনবাসী ভক্তরা তাঁকে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* লিখতে অনুরোধ করেন। যদিও তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে এই কাজ শুরু করেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি তা সম্পূর্ণ করেন। আজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-চরিত ও দর্শন সম্বন্ধে এটিই হচ্ছে সব চাইতে প্রামাণিক গ্রন্থ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে বেশি মন্দির ছিল না। সেই সময় মদনমোহনজী, গোবিন্দজী ও গোপীনাথজীর মন্দির —এই তিনটি ছিল প্রধান। বৃন্দাবনবাসী রূপে তিনি তিনটি মন্দিরের আরাধিত বিগ্রহত্রয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে বলেন, "আমি পঙ্গু, তাই পারমার্থিক জীবনে আমার প্রগতি অত্যন্ত মন্দ; তাই আমি আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করছি।" *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* পঞ্চদশ শ্লোকে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মদনমোহন বিগ্রহকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন, যে বিগ্রহ আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃতে

অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। কৃষ্ণভাবনাময় সেবা সম্পাদনে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণকে জানার অর্থ নিজেকে জানা এবং নিজেকে জানার অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা। যেহেতু শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহকে আরাধনা করার মাধ্যমে এই সম্পর্ক জানা যায়, তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রথমে এই বিগ্রহের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ষোড়শ শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অভিধেয় বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোবিন্দজীকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেন। গোবিন্দজীকে বলা হয় অভিধেয় বিগ্রহ, কারণ কিভাবে রাধা ও কৃষ্ণের সেবা করতে হয় তা তিনি আমাদের প্রদর্শন করেন। মদনমোহন বিগ্রহ "আমি তোমার নিত্য দাস" কেবল এটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দজীই আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। গোবিন্দজী নিত্যকাল বৃন্দাবনে বিরাজ করেন। বৃন্দাবনের চিন্ময় ধামে সমস্ত গৃহগুলি চিন্তামণি রত্ন দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানকার গাভীগুলি হচ্ছে অপর্যাপ্ত দুধ প্রদানকারী সুরভি গাভী এবং সেখানকার বৃক্ষগুলি হচ্ছে যে কোন বাসনা পূরণকারী কল্পবৃক্ষ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সুরভি গাভীদের নিয়ে বিচরণ করেন এবং তিনি শত-সহস্র গোপিকাদের দ্বারা সেবিত হন, যাঁরা সকলেই হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। শ্রীকৃষ্ণ যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর ধাম বৃন্দাবনও তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেন, ঠিক যেমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তার পরিকরবর্গ অনুসরণ করে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ধামও অবতীর্ণ হয়, তাই বৃন্দাবন এই জড় জগতের কোন স্থান নয়। ভক্তরা তাই ভারতবর্ষে অবস্থিত অভিন্ন গোলোক বৃন্দাবন-স্বরূপ এই বৃন্দাবনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেউ অবশ্য বলতে পারে যে, সেখানকার বৃক্ষগুলি তো কল্পবৃক্ষ নয়; কিন্তু গোস্বামীরা যখন সেখানে ছিলেন, তখন সেখানকার বৃক্ষগুলি ছিল কল্পবৃক্ষ। এখনও সেগুলি কল্পবৃক্ষই আছে, তবে সকলের পক্ষে তা দর্শন করা সম্ভব নয়। এমন নয় যে, আমরা সেই বৃক্ষগুলির কাছে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই দাবি করলেই সেই বৃক্ষগুলি আমাদের দাবি পূরণ করবে; ভগবানের ভক্ত না হলে কল্পবৃক্ষের স্বরূপ দর্শন করা যায় না। গোস্বামীরা এক-এক রাত্রে এক-একটি বৃক্ষের নীচে অবস্থান করতেন এবং সেই বৃক্ষগুলি তাঁদের সমস্ত প্রয়োজন চরিতার্থ করত। সাধারণ মানুষের কাছে তা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হলে সেই সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যে সমস্ত মানুষ জড় জগতের সুখ ভোগ করার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন, তাঁরাই প্রকৃত বৃন্দাবন দর্শন করতে পারবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

আমরা যতই কৃষ্ণভাবনাময় হই, ততই আমাদের উন্নতি হয়। তখন ততই সব কিছু চিন্ময়রূপে প্রকাশিত হয়। এভাবেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভারতবর্ষস্থিত এই

বৃন্দাবনকে চিৎ-জগতের গোলোক বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন বলে জানতেন এবং *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* ষোড়শ শ্লোকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে মণি-মাণিক্য খচিত ময়ূর-সিংহাসনে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা গোপিকারা নৃত্য-কীর্তনের মাধ্যমে, তাম্বুল ও সুস্বাদু আহার্য নিবেদন করার মাধ্যমে এবং তাঁদের ফুলমালায় সজ্জিত করার মাধ্যমে তাঁদের সেবা করছেন। আজও ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তেরা ভাদ্র মাসে ঝুলন উৎসব উপলক্ষে সুদৃশ্য সিংহাসনস্থিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ ফুল দিয়ে সাজিয়ে নৃত্য-গীতাদির মাধ্যমে এই উৎসব পালন করেন। সাধারণত বহু মানুষ সেই সময় ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য বৃন্দাবনে যান।

পরিশেষে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গোপীনাথ বিগ্রহের নামে তাঁর পাঠকদের কাছে তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। শ্রীগোপীনাথজীর বিগ্রহ হচ্ছেন ব্রজগোপিকাদের প্রাণনাথরূপে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন সমস্ত গোপিকারা সেই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের গৃহস্থালির কাজ পরিত্যাগ করে যখন তাঁর কাছে আসেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে রাসনৃত্যে লিপ্ত হন। ভগবানের এই সমস্ত লীলা-বিলাসের কাহিনী *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে। সমস্ত গোপিকারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের খেলার সাথী এবং অনেকেই ছিলেন বিবাহিতা, কেন না প্রাচীন ভারতবর্ষে বারো বছর বয়স অতিক্রম করার আগেই বালিকাদের বিবাহ হয়ে যেত। ছেলেদের অবশ্য আঠারো বছরের আগে বিবাহ হত না। সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন পনেরো-ষোল হওয়ায় তখনও তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তা সত্ত্বেও, তিনি সেই সমস্ত গৃহবধূদের তাঁদের ঘর থেকে ডেকে আনতেন এবং তাঁর সঙ্গে নৃত্য করার জন্য তাঁদের অনুপ্রাণিত করতেন। এই নৃত্যকে বলা হয় রাসনৃত্য এবং তা হচ্ছে বৃন্দাবনের সর্বোত্তম লীলাবিলাস। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় গোপীনাথ, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গোপিকাদের প্রিয় প্রাণনাথ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদের জন্য গোপীনাথজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেছেন, "ব্রজগোপিকাদের প্রাণনাথ শ্রীগোপীনাথজী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্বাদ করুন। তোমরা গোপীনাথের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও।" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রণেতা প্রার্থনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে তাঁর মধুর মুরলীধ্বনির দ্বারা ব্রজগোপিকাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন, তিনিও যেন সেভাবেই তাঁর অপ্রাকৃত ধ্বনির দ্বারা এই গ্রন্থের পাঠকদের মন আকর্ষণ করেন।
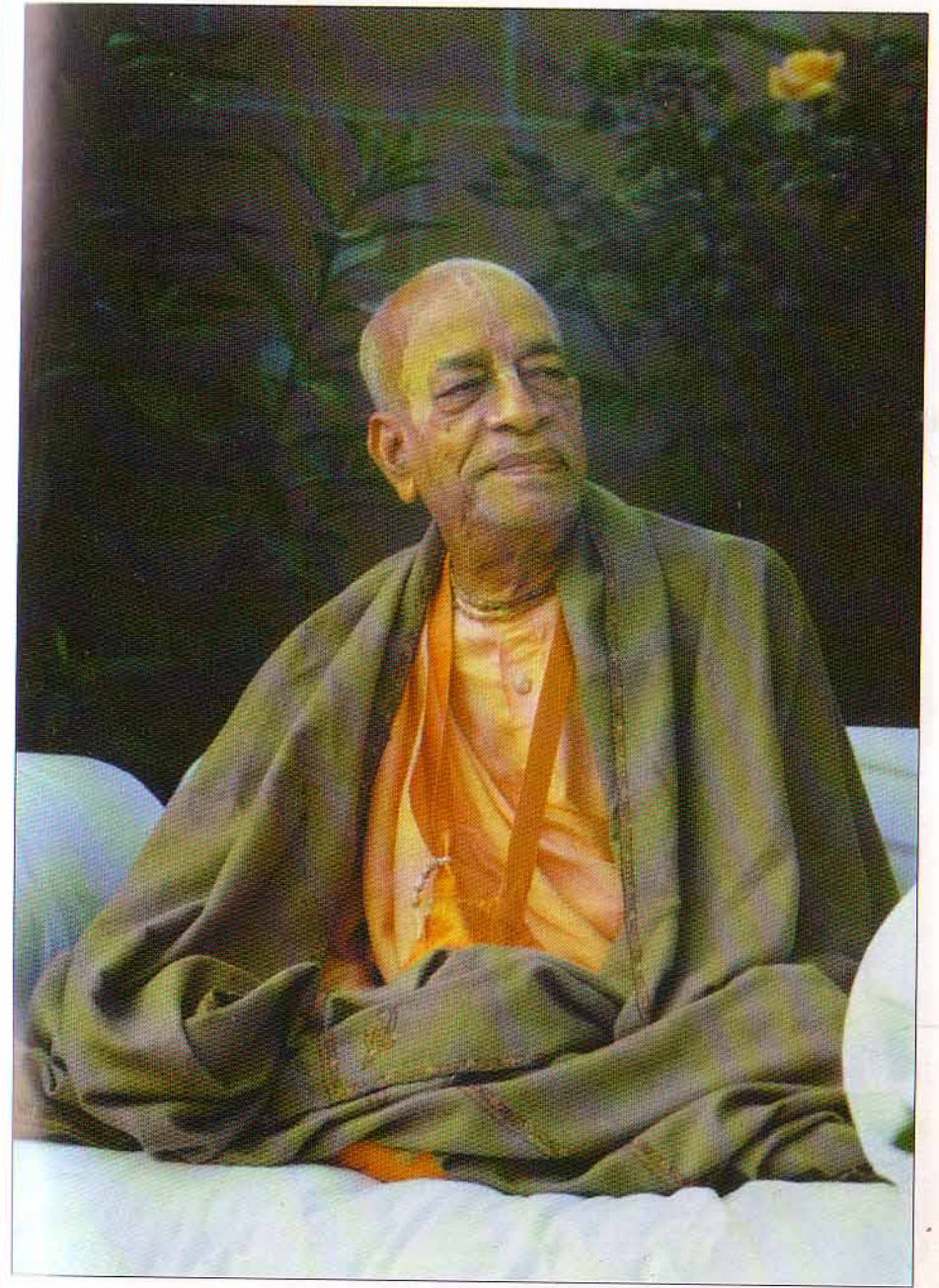
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
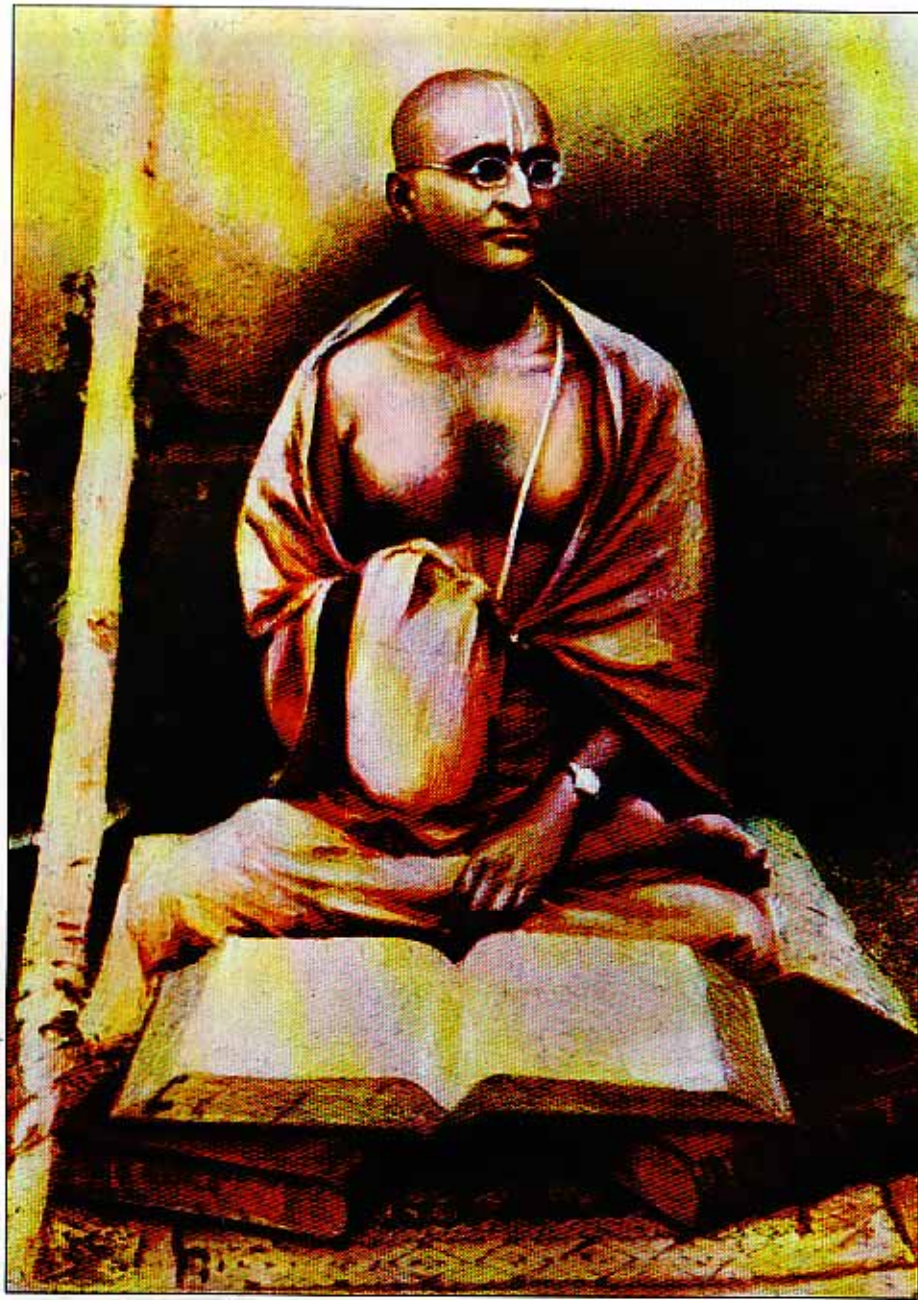
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের পরমারাধ্য গুরুদেব। সারা ভারত জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর পুনরভ্যুত্থানের কর্ণধার এবং চৌষট্টিটি গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য।
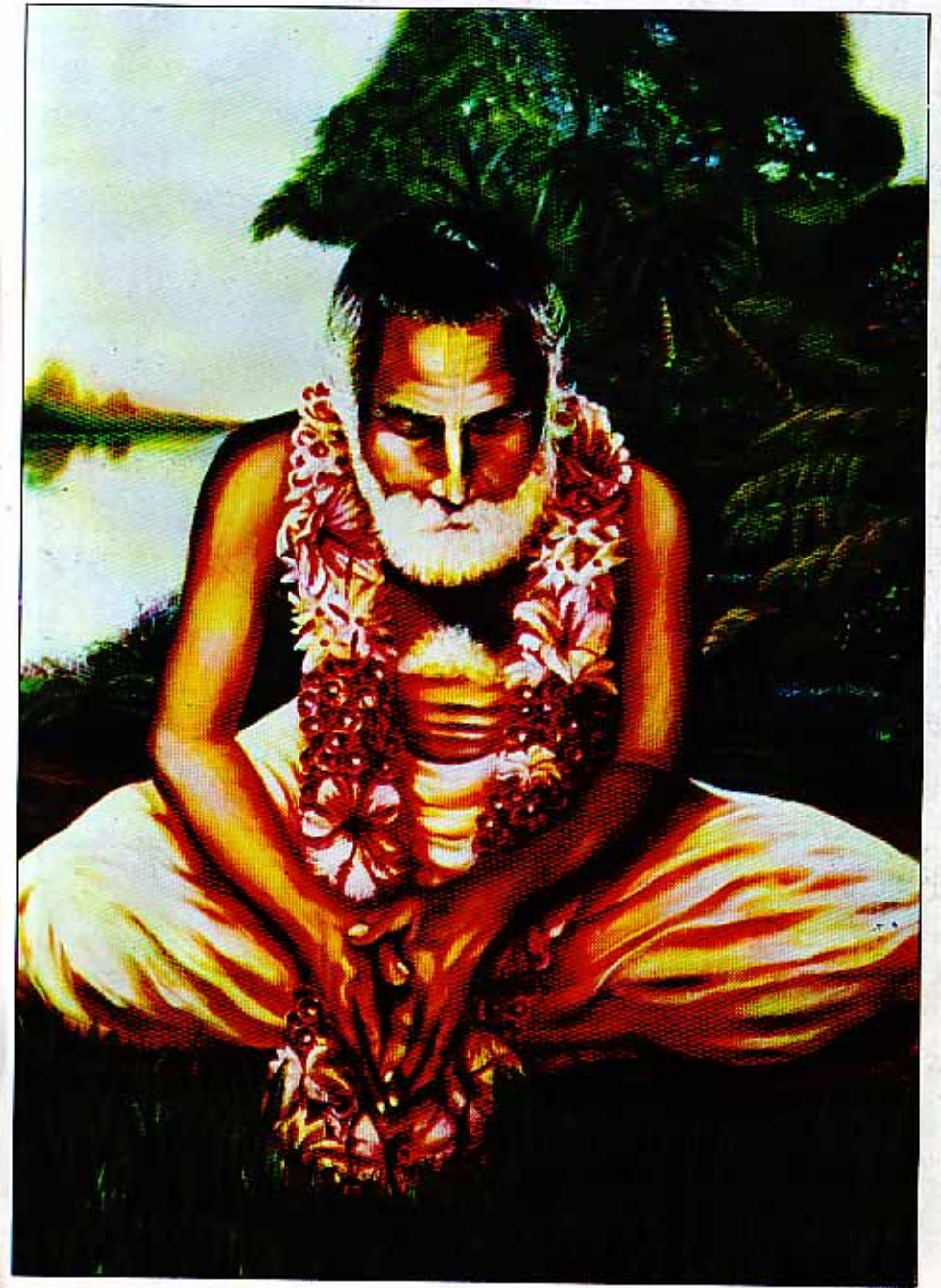
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পরমারাধ্য গুরুদেব।
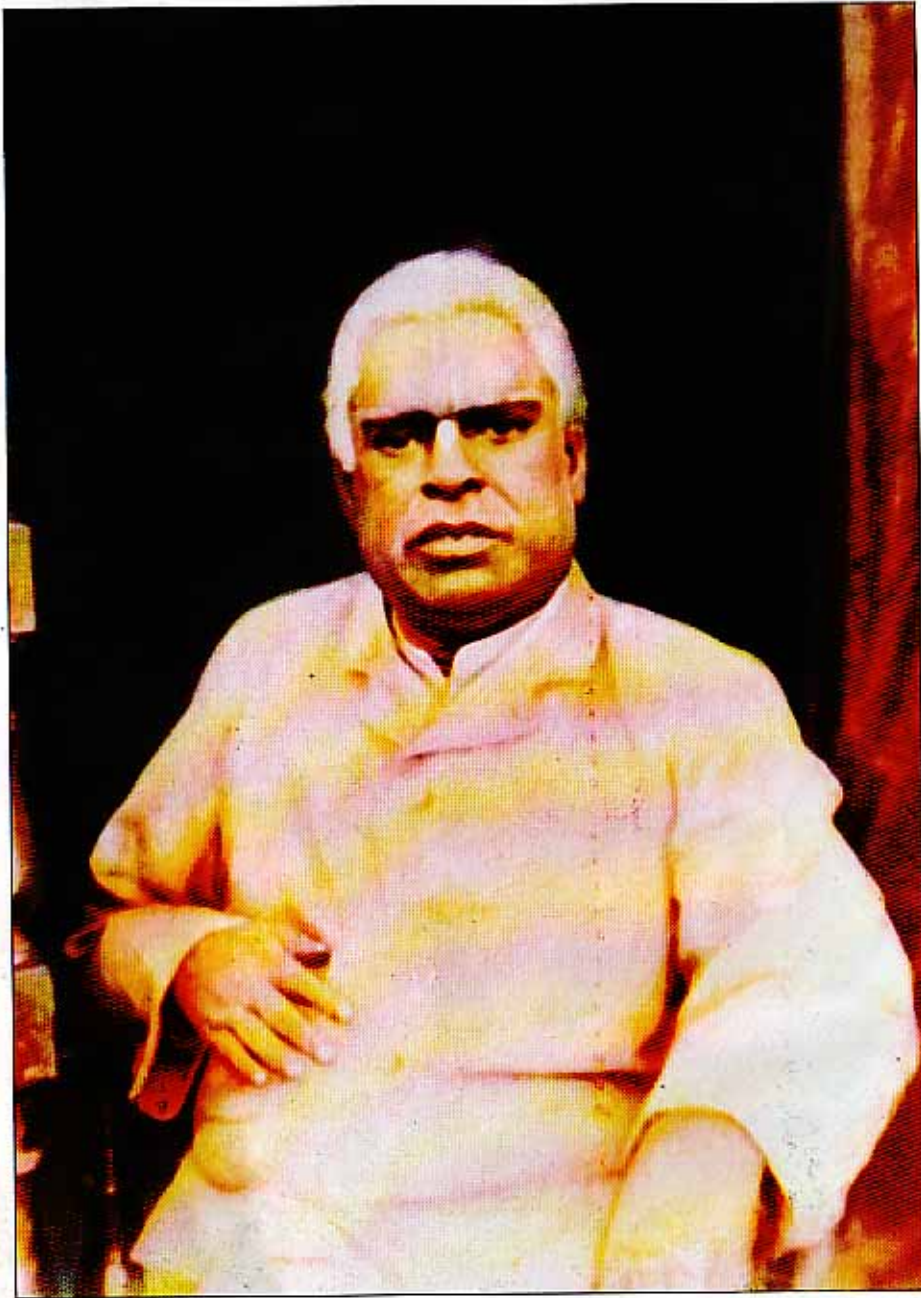
সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণের প্রধান পথ-প্রদর্শক।
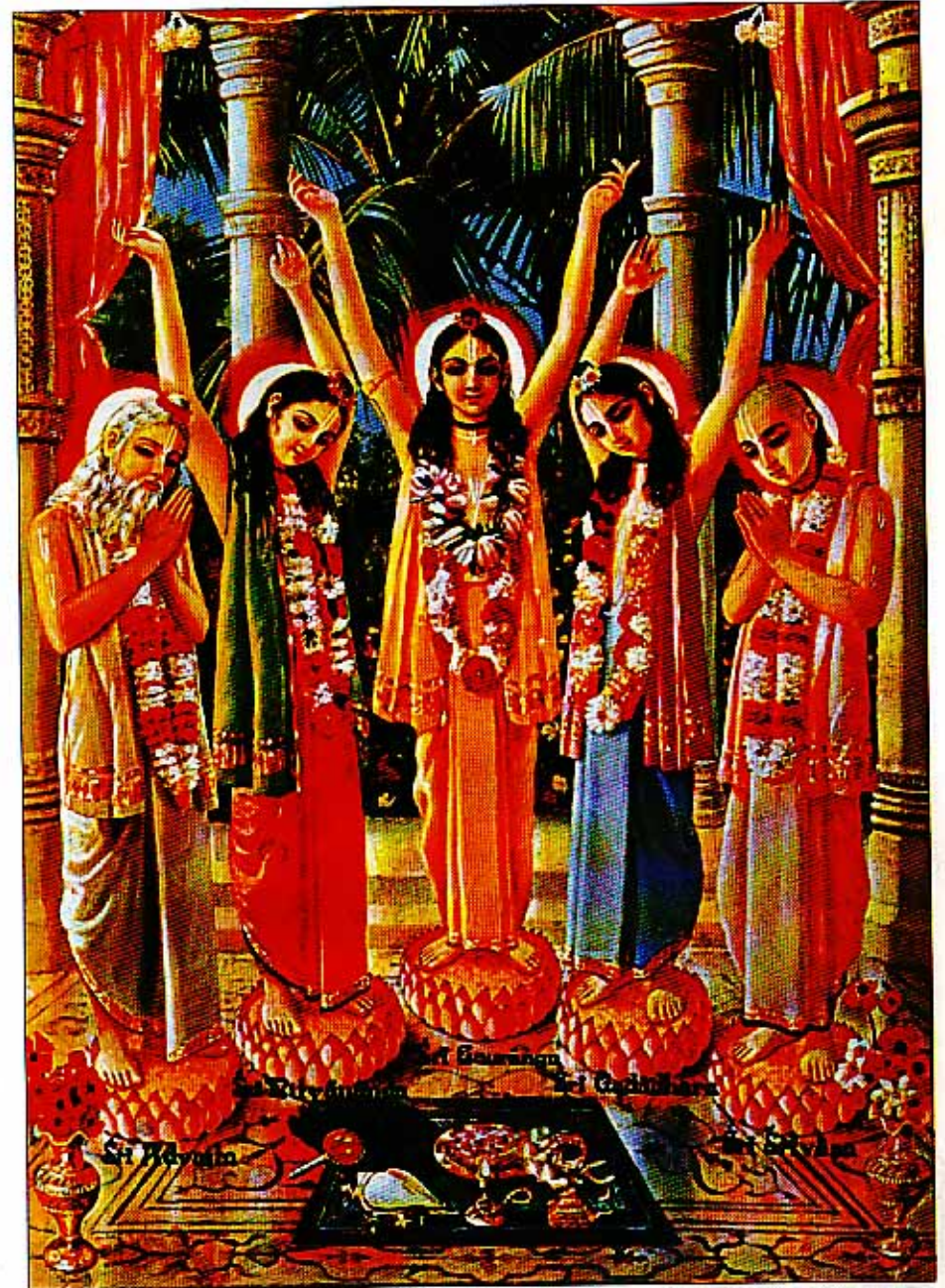
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু), ভক্তস্বরূপ (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু), ভক্তাবতার (শ্রীঅদ্বৈত প্রভু), ভক্তশক্তি (গদাধর প্রভু), শুদ্ধ ভক্ত (শ্রীবাস প্রভু)—এই পঞ্চতত্ত্ব-আত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করি।
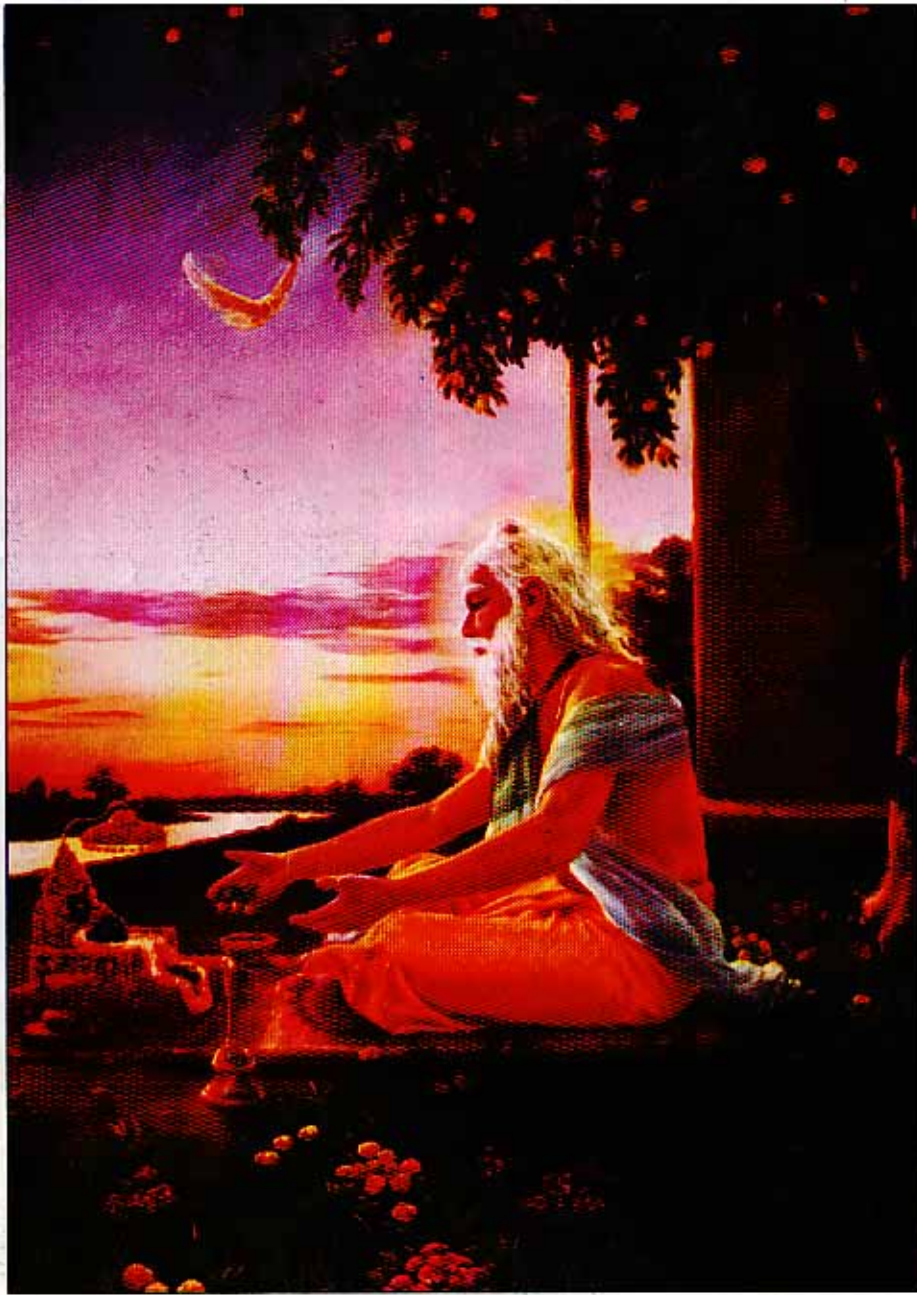
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই জগতে অবতরণ করার আহ্বান জানিয়ে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল অর্পণ করতেন।
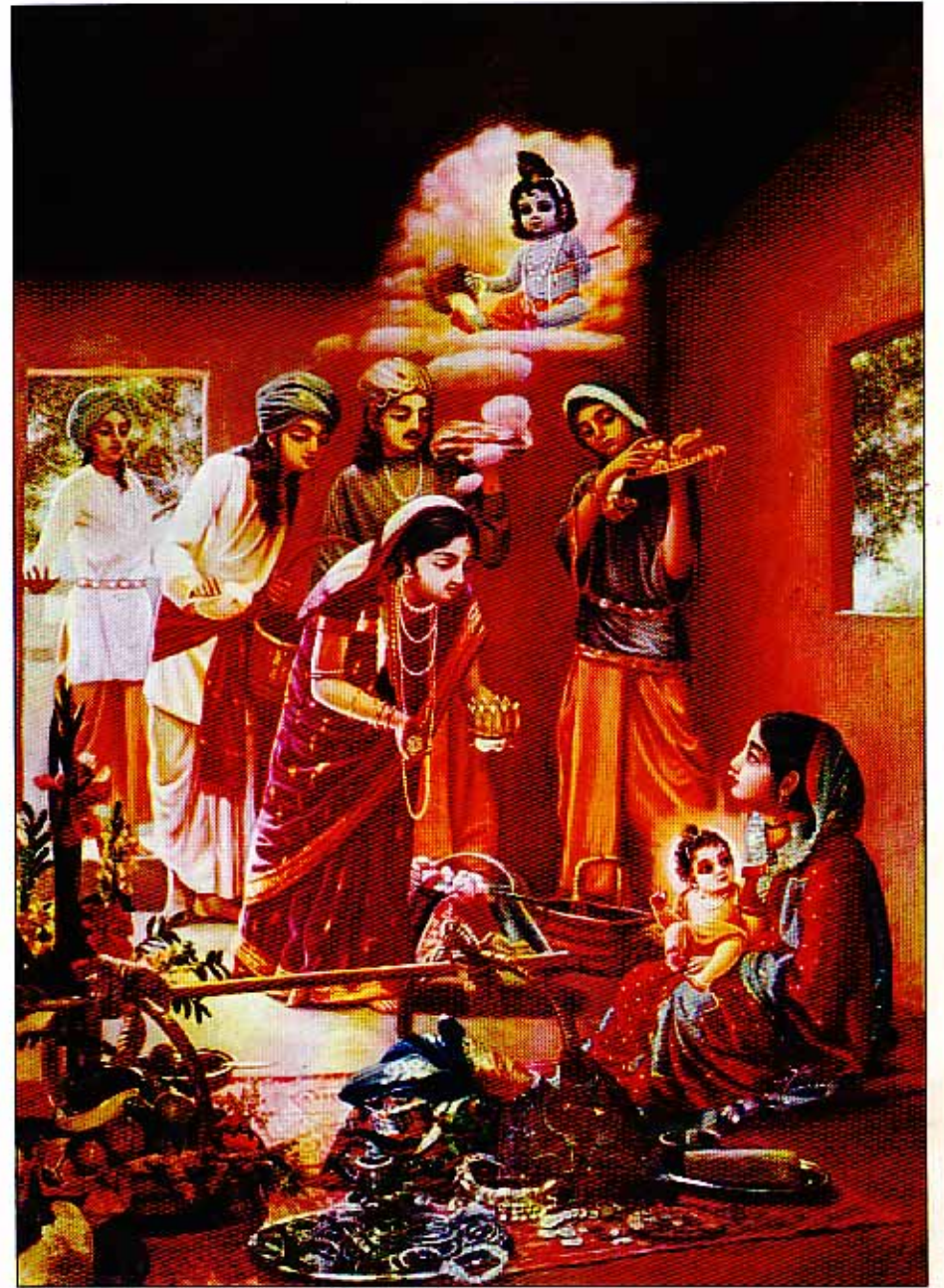
সীতা ঠাকুরাণী নানাবিধ আহার্য-বসন-ভূষণাদি নিয়ে শচীগৃহে এলেন। নবজাত শচীপুত্রকে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। কারণ তিনি দেখলেন শিশুটি অঙ্গবর্ণ ব্যতীত হুবহু গোকুলের কৃষ্ণের মতো।

শিশু নিমাইয়ের হাত থেকে মাটি কেড়ে নিয়ে শচীমাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন 'মাটি কেন খাচ্ছ'?

মা যশোদা কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করতেন না, সম্পূর্ণ অসহায় দুর্বল পুত্র জ্ঞানে কৃষ্ণের লালন-পালন করতেন।
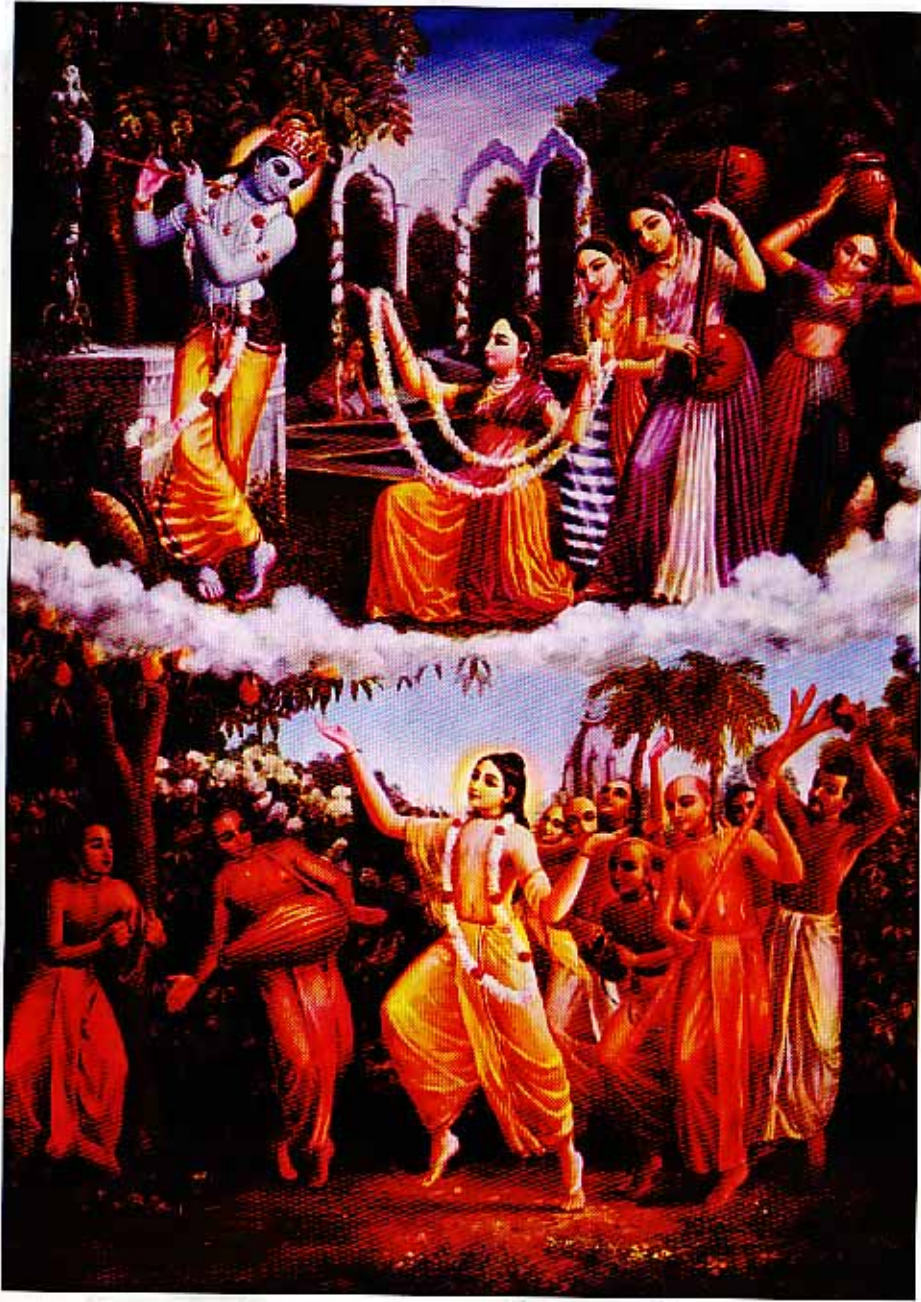
শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন এবং শুদ্ধ ভগবৎপ্রেম প্রচার করেছেন।
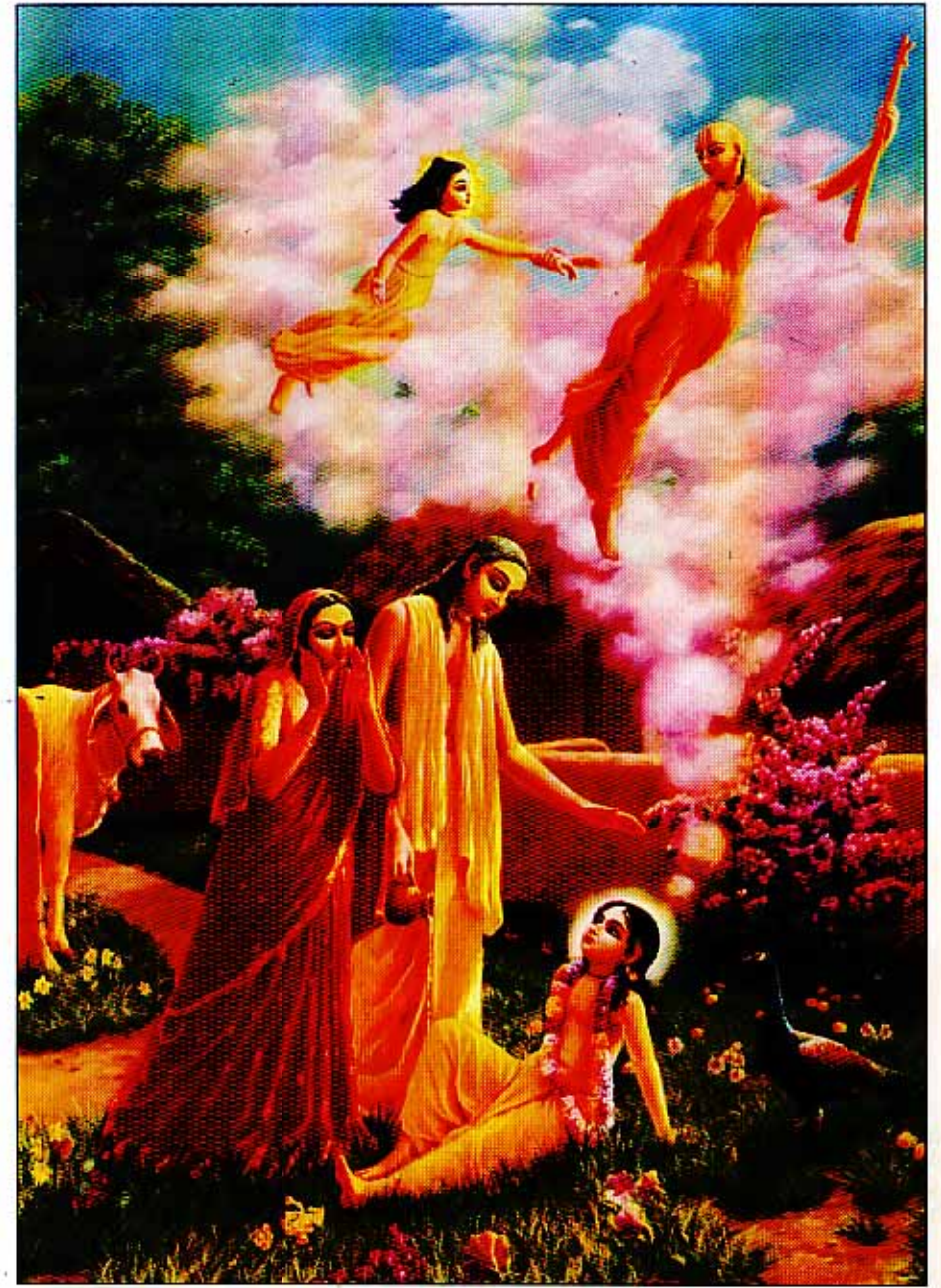
বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিমাই মা-বাবাকে বলতে লাগলেন, "বিশ্বরূপ দাদা এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। আমাকে সন্ন্যাস নিতে বলল। আমি বললাম গৃহস্থ হয়ে মা-বাবার সেবা করব, তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণ তুষ্ট হবেন। এই কথা শুনে দাদা জানালো, 'মাকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিও।"
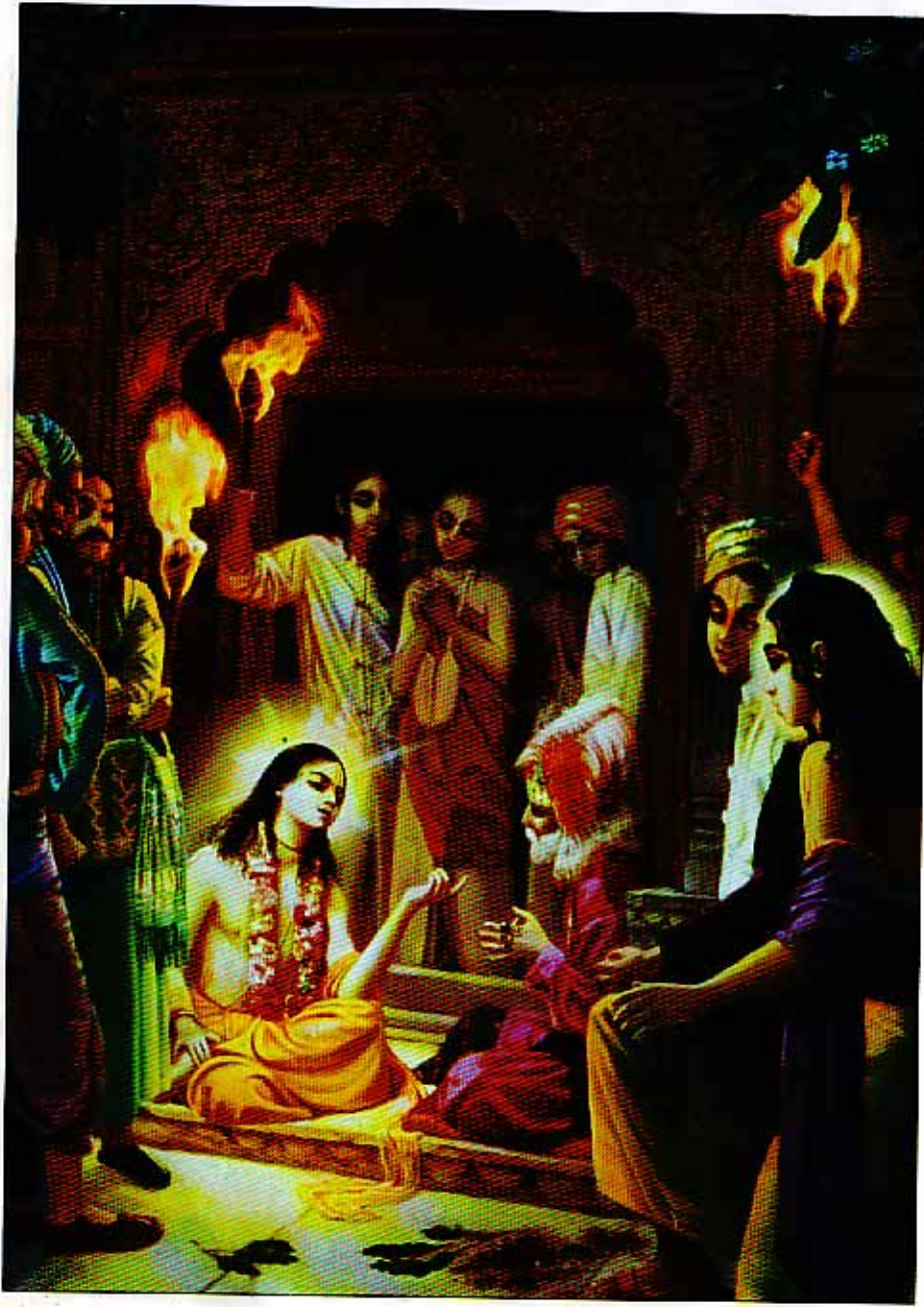
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে জানালেন, "আপনি যেহেতু 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেছেন তাই নিঃসন্দেহে আপনি পরম ভাগ্যবান এবং পুণ্যবান।"
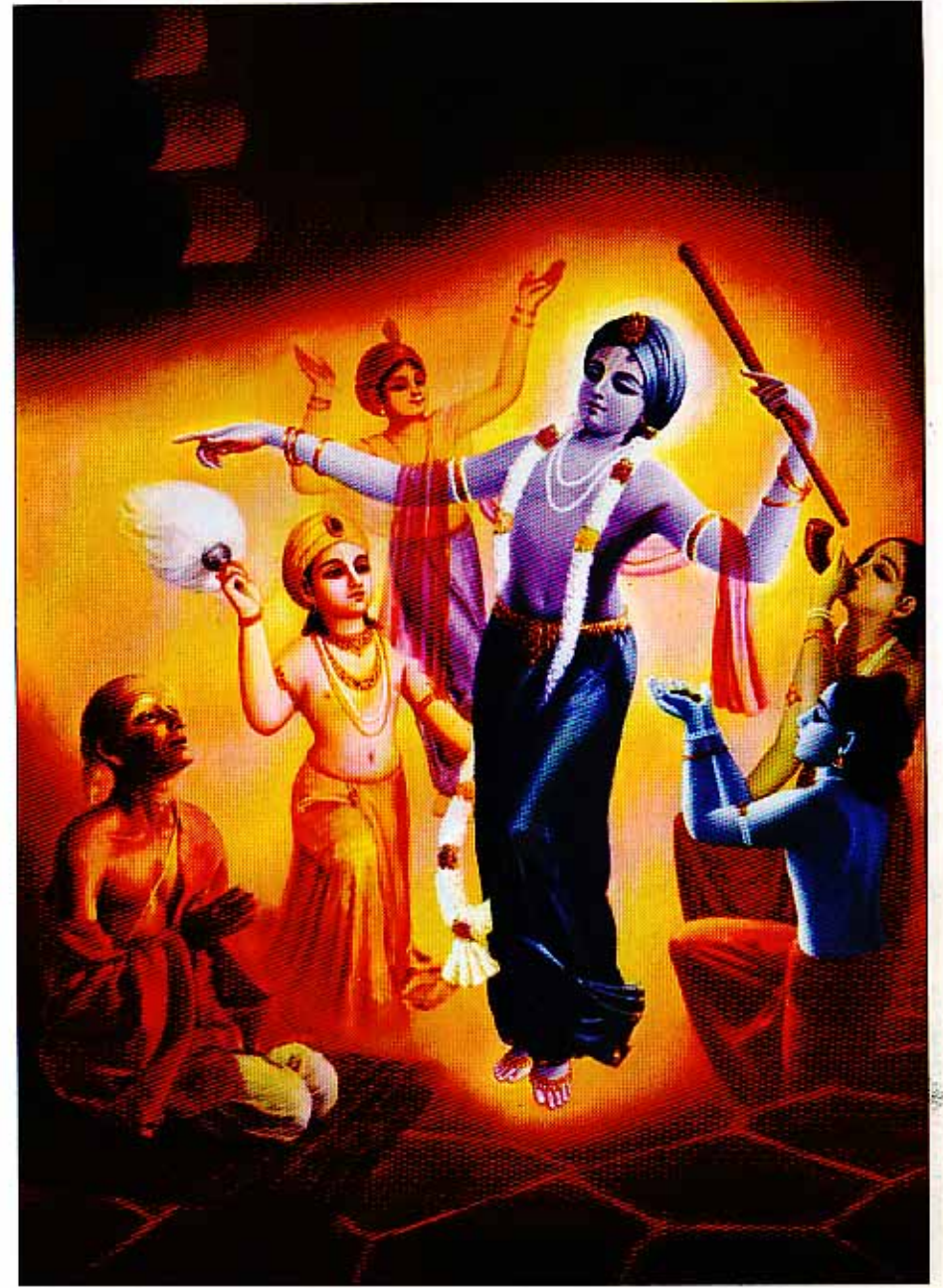
দিব্যস্বপ্নযোগে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে নির্দেশ দিলেন, "কৃষ্ণদাস, ভয় কর না। বৃন্দাবনে যাও, সেখানে তোমার সবকিছু লাভ হবে।"
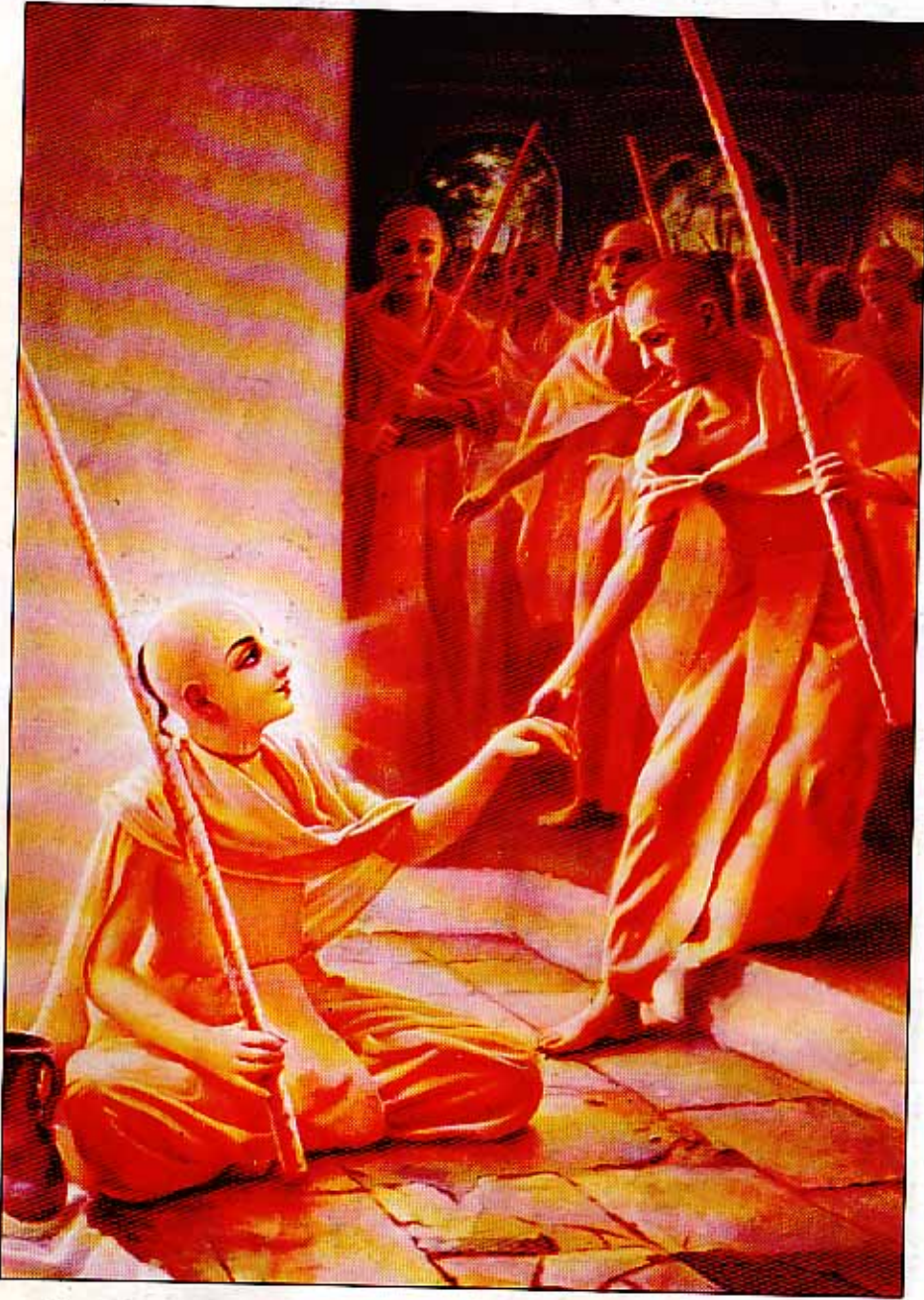
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অপবিত্র স্থানে উপবেশন করতে দেখে প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে সবার মধ্যে এনে বসালেন।
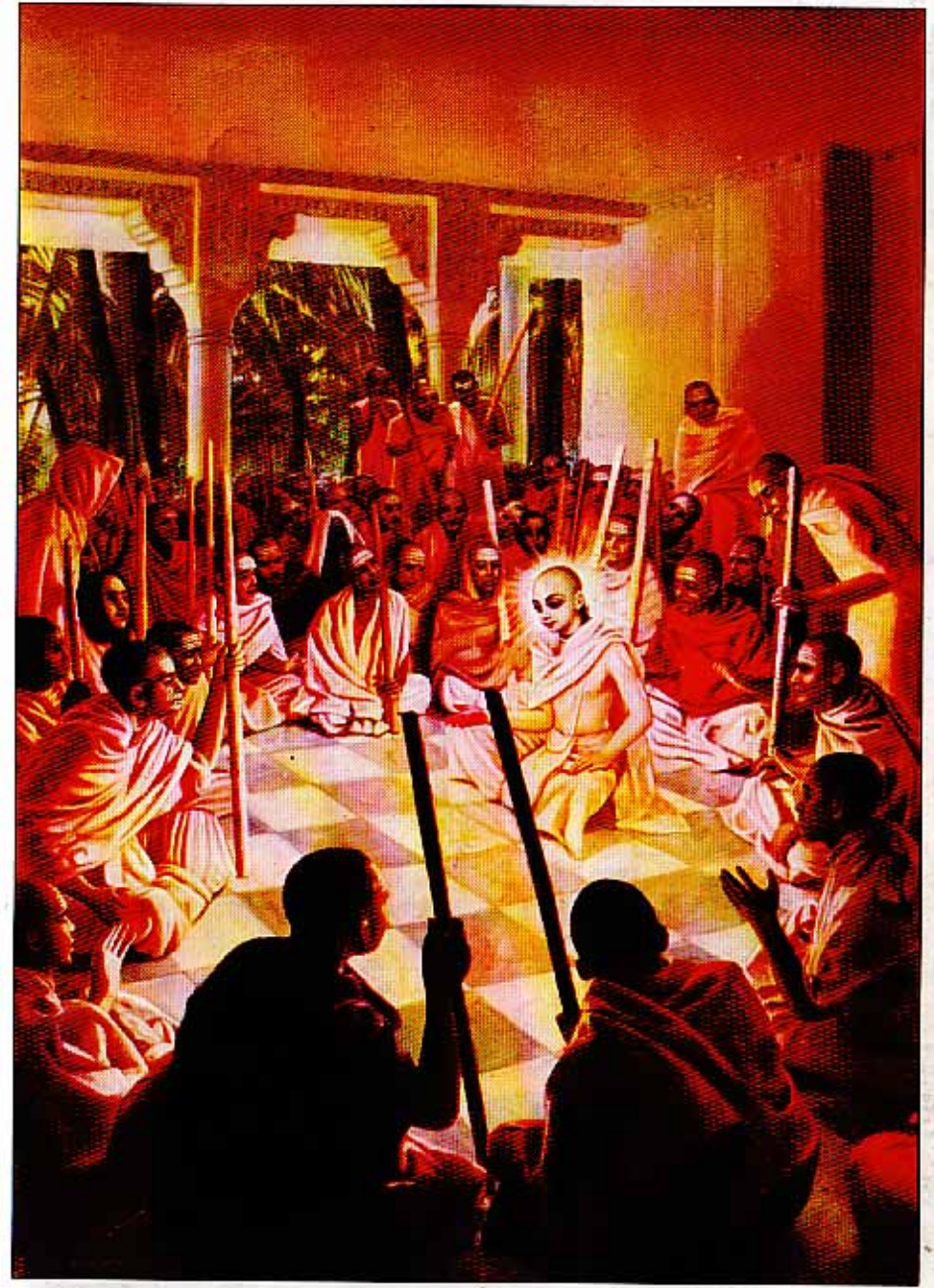
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার পর থেকেই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে তাঁরাও নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে লাগলেন।
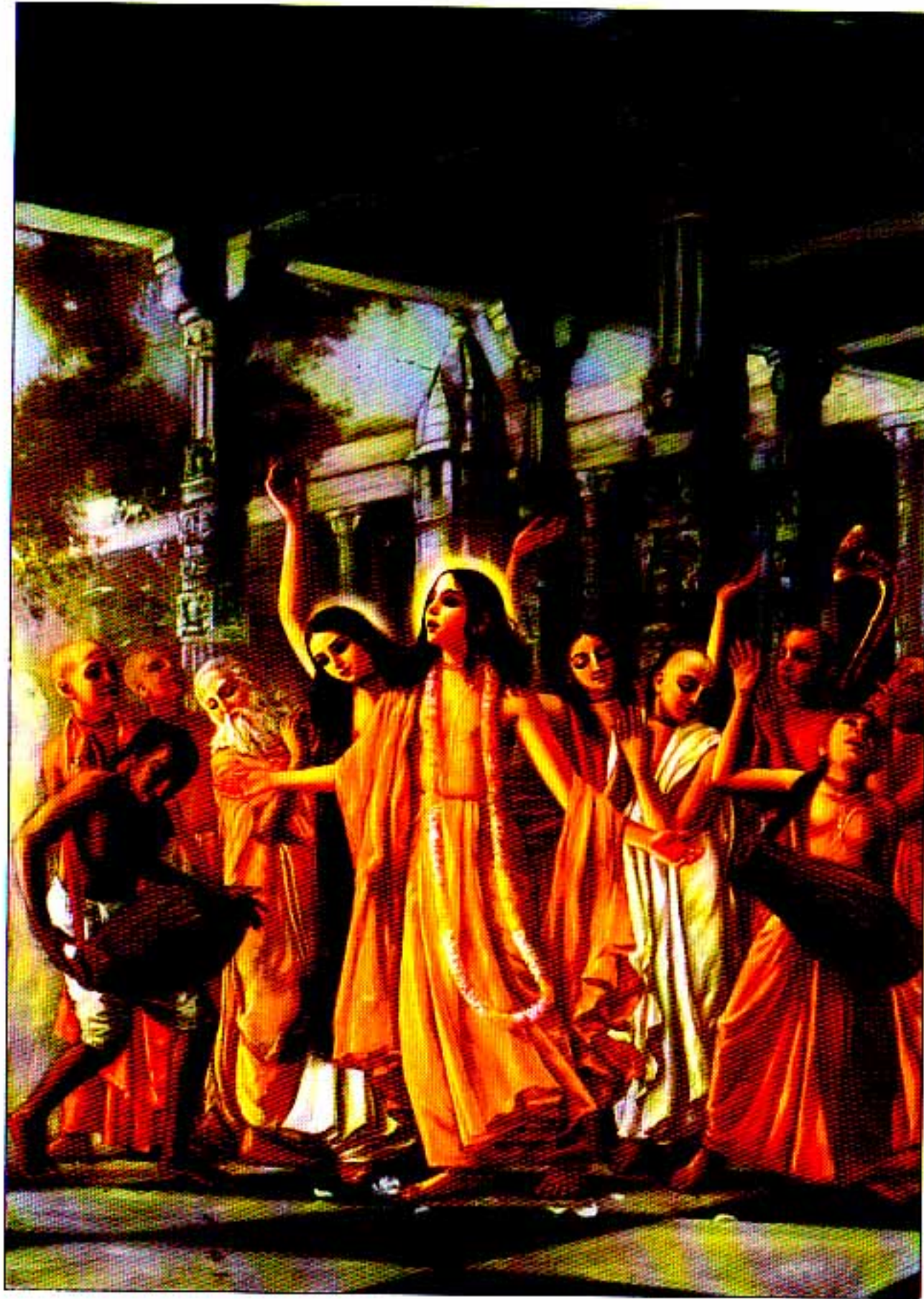
কেবল অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়েই ভগবান তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন, প্রেমরস আস্বাদন করেন এবং জনসাধারণকে প্রেমধন দান করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুর্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু। তিনি হচ্ছেন গভীর নিষ্ঠা সহকারে শ্রীল রূপ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভক্তদের জীবন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর দুজন মুখ্য অনুগামী। শ্রীল রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, যিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকে তাঁর সেবকরূপে স্বীকার করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে শিষ্যরূপে স্বীকার করেছিলেন, যিনি ছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুরুদেব। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে শিষ্যত্বে বরণ করেছিলেন।

আমরা যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত, তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এই সংস্করণে ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপ্রসূত নতুন কোন কিছু থাকবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিগুণাত্মিকা এই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বদ্ধ জীবের অগোচর অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্ব। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের শরণাগতি ব্যতীত জড় বিষয়ের মহাপণ্ডিতেরাও সেই অপ্রাকৃত জগতের নাগাল পেতে পারে না, কেন না শ্রদ্ধাবনত চিত্তেই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই এখানে যা বর্ণনা করা হবে, তাতে জড় মনের জল্পনা-কল্পনাপ্রসূত পরীক্ষামূলক চিন্তার কোন অবকাশ নেই। এই গ্রন্থে মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার কোন স্থান নেই, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে বাস্তব চিন্ময় অভিজ্ঞতা, যা পূর্বোক্ত গুরু-পরম্পরার ধারা স্বীকার করলেই কেবল হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই পরম্পরার ধারা থেকে স্বল্প বিচ্যুত হলেও পাঠক *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, যা হচ্ছে *উপনিষদ, পুরাণ, বেদান্ত* এবং *বেদান্তের* যথার্থ ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্ববেত্তা পরমার্থবাদীদের সর্বোচ্চ স্তরের পাঠ্যপুস্তক।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই সংস্করণটি তাঁদের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করা হয়েছে, যাঁরা হচ্ছেন পরমতত্ত্বের অন্বেষণকারী আদর্শ জ্ঞানী ও গুণী পণ্ডিত। এটি মনোধর্মীদের অহমিকা-প্রসূত পাণ্ডিত্য নয়, পক্ষান্তরে এটি হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের আদেশ শিরোধার্য করে তাঁদের সেবা করার এক বিনীত প্রচেষ্টা। কারণ, তাঁদের সেবা করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থটি ভগবৎ-কৃপায় প্রকাশিত শাস্ত্রসমূহ থেকে একটুও পৃথক নয়। তাই, গুরু-পরম্পরার ধারা অনুসরণকারী যে কোন ভগবদ্ভক্ত কেবলমাত্র শ্রবণের মাধ্যমে এই গ্রন্থের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথম পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে চোদ্দটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে, যেগুলির মাধ্যমে পরমতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী তিনটি সংস্কৃত শ্লোকে বৃন্দাবনের তিন মুখ্য বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেব ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথজীর বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম চোদ্দটি শ্লোকের প্রথমটি হচ্ছে পরমতত্ত্বের প্রতীক প্রকাশ এবং প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ প্রথম পরিচ্ছেদটি এই একটি শ্লোকে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছয়টি অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রকাশিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

তাঁর প্রথম প্রকাশকে শ্রীগুরুদেব রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু রূপে আবির্ভূত হন। তাঁরা উভয়ই অভিন্ন, কেন না তাঁরা উভয়ই হচ্ছেন পরমতত্ত্বের প্রকাশ। তারপর ভগবদ্ভক্তদের বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত দুই প্রকারের—সাধক ভক্ত ও ভগবৎ-পার্ষদ। তারপর ভগবানের অবতার, যাঁদের ভগবানের থেকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অবতারদের আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—অংশ-অবতার, গুণ-অবতার ও শক্ত্যাবেশ-অবতার। এই সূত্রে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশ এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসের উদ্দেশ্যে ভিন্নরূপে বিলাস-বিগ্রহ প্রকাশের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ভগবানের শক্তির আলোচনা করা হয়েছে। ভগবানের এই শক্তি তিন প্রকার—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, দ্বারকার মহিষী এবং তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্রজধামের গোপিকারা। চরমে হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, যিনি এই সমস্ত প্রকাশের মূল উৎস।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অংশ-প্রকাশসমূহ সবই ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত এবং শক্তিমান পরমতত্ত্ব; কিন্তু তাঁর ভক্তরা, তাঁর নিত্য পার্ষদেরা হচ্ছেন তাঁর শক্তি। শক্তি এবং শক্তিমান মূলত এক হলেও, যেহেতু তাঁদের কার্যকলাপ ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়, তাই তাঁরা যুগপৎ ভিন্ন। এভাবেই পরমতত্ত্ব একই তত্ত্বে বৈচিত্র্যরূপে প্রকাশিত হন। *বেদান্তসূত্র* অনুসারে এই দার্শনিক তত্ত্বকে বলা হয় *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* বা যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন তত্ত্ব। এই পরিচ্ছেদের শেষ দিকে উপরোক্ত সবিশেষ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত স্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **গুরূন্**—গুরুবর্গকে; **ঈশ-ভক্তান্**—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দকে; **ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ঈশ-অবতারকান্**—পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণকে; **তৎ**—সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রকাশান্**—প্রকাশসমূহকে; **চ**—এবং; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শক্তীঃ**—শক্তিসমূহকে; **কৃষ্ণচৈতন্য**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; **সংজ্ঞকম্**—নামক।

অনুবাদ

আমি দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে গুরুবর্গের, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের (শ্রীবাস আদি), পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণের (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আদি), পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশসমূহের (শ্রীনিত্যানন্দ আদি), পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিসমূহের (শ্রীগদাধর আদি) এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করি।

শ্লোক ২

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **নিত্যানন্দৌ**—এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে; **সহ-উদিতৌ**—একই সময়ে উদিত; **গৌড়-উদয়ে**—গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে; **পুষ্পবন্তৌ**—সূর্য ও চন্দ্র একত্রে; **চিত্রৌ**—বিস্ময়করভাবে; **শন্দৌ**—মঙ্গলপ্রদাতা; **তমঃ-নুদৌ**—অন্ধকার-নাশক।

অনুবাদ

গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে একই সময়ে অতি বিস্ময়করভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যাঁরা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গলপ্রদাতা এবং অজ্ঞান ও অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ৩

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

যৎ—যা; **অদ্বৈতম্**—অদ্বৈত; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **উপনিষদি**—উপনিষদে; **তৎ**—তা; **অপি**—অবশ্যই; **অস্য**—তাঁর; **তনুভা**—দিব্য দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা; **যঃ**—যিনি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **অন্তর্যামী**—অন্তর্যামী; **পুরুষঃ**—পরম ভোক্তা; **ইতি**—এভাবেই; **সঃ**—তিনি; **অস্য**—তাঁর; **অংশ-বিভবঃ**—অংশ-বৈভব; **ষড়ৈশ্বর্যৈঃ**—ষড়ৈশ্বর্যের দ্বারা; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **যঃ**—যিনি; **ইহ**—এখানে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **চৈতন্যাৎ**—চৈতন্য থেকে; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **জগতি**—জগতে; **পর**—শ্রেষ্ঠ; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **পরম্**—ভিন্ন; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই

(এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ-বৈভব। তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।

শ্লোক ৪

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অনর্পিত—যা অর্পিত হয়নি; **চরীম্**—পূর্বে; **চিরাৎ**—বহুকাল পর্যন্ত; **করুণয়া**—করুণাবশত; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **কলৌ**—কলিযুগে; **সমর্পয়িতুম্**—দান করার জন্য; **উন্নত**—উন্নত; **উজ্জ্বল-রসাম্**—উজ্জ্বল রসময়ী; **স্বভক্তি**—স্বীয় ভক্তি; **শ্রিয়ম্**—সম্পদ; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরট**—স্বর্ণ থেকেও; **সুন্দর**—সুন্দরতর; **দ্যুতি**—দ্যুতি; **কদম্ব**—সমূহ; **সন্দীপিতঃ**—সমুদ্ভাসিত; **সদা**—সর্বদা; **হৃদয়-কন্দরে**—হৃদয়ের গুহাতে; **স্ফুরতু**—প্রকাশিত হোন; **বঃ**—তোমাদের; **শচীনন্দনঃ**—শচীমাতার পুত্র।

অনুবাদ

পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত যা অর্পিত হয়নি এবং উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তিসম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহদ্বারা সমুদ্ভাসিত, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।

শ্লোক ৫

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রণয়**—প্রণয়ের; **বিকৃতিঃ**—বিকার; **হ্লাদিনী শক্তিঃ**—হ্লাদিনী শক্তি; **অস্মাৎ**—এই হেতু; **এক-আত্মানৌ**—স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন; **অপি**—হওয়া সত্ত্বেও; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **পুরা**—অনাদিকাল থেকে; **দেহ-ভেদম্**—ভিন্ন দেহ; **গতৌ**—ধারণ করেছেন; **তৌ**—রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে; **চৈতন্য-আখ্যম্**—শ্রীচৈতন্য নামে; **প্রকটম্**—প্রকটিত হয়েছেন; **অধুনা**—এখন; **তৎ-দ্বয়ম্**—সেই দুই দেহ; **চ**—এবং; **ঐক্যম্**—একত্রে; **আপ্তম্**—যুক্ত হয়ে; **রাধা**—শ্রীমতী রাধারাণীর; **ভাব**—ভাব; **দ্যুতি**—কান্তি; **সুবলিতম্**—বিভূষিত; **নৌমি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **কৃষ্ণ-স্বরূপম্**—যিনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ তাঁকে।

অনুবাদ

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা, সুতরাং শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এই জন্য শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৬

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর; **প্রণয়-মহিমা**—প্রেমের মাহাত্ম্য; **কীদৃশঃ**—কি রকম; **বা**—অথবা; **অনয়া**—তাঁর (শ্রীমতী রাধারাণীর) দ্বারাই; **এব**—কেবল; **আস্বাদ্যঃ**—আস্বাদনীয়; **যেন**—সেই প্রেমের দ্বারা; **অদ্ভুত-মধুরিমা**—অত্যাশ্চর্য মাধুর্য; **কীদৃশঃ**—কি রকম; **বা**—অথবা; **মদীয়ঃ**—আমার; **সৌখ্যম্**—সুখ; **চ**—এবং; **অস্যাঃ**—শ্রীরাধার; **মৎ-অনুভবতঃ**—আমার মাধুর্যের অনুভব-বশত; **কীদৃশম্**—কি রকম; **বা**—অথবা; **ইতি**—এভাবেই; **লোভাৎ**—লোভবশত; **তৎ**—তাঁর (শ্রীমতী রাধারাণীর); **ভাব-আঢ্যঃ**—ভাবযুক্ত হয়ে; **সমজনি**—আবির্ভূত হয়েছেন; **শচী-গর্ভ-সিন্ধৌ**—শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে; **হরি**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র।

অনুবাদ

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কি রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কি রকম—এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৭

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী ।

শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণের দ্বিতীয় ব্যূহ মহাসঙ্কর্ষণ; **কারণ-তোয়শায়ী**—কারণ-সমুদ্রের জলে শায়িত প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণু; **গর্ভোদশায়ী**—গর্ভোদক-সমুদ্রে শায়িত দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; **চ**—এবং; **পয়োব্ধিশায়ী**—ক্ষীর-সমুদ্রে শায়িত তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু; **শেষঃ**—শেষনাগ, অনন্তদেব; চ—এবং; **যস্য**—যাঁর; **অংশ**—অংশ; **কলাঃ**—অংশের অংশ; **সঃ**—তিনি; **নিত্যানন্দাখ্য**—শ্রীনিত্যানন্দ নামক; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **শরণম্**—আশ্রয়; **মম**—আমার; **অস্তু**—হোন।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও অনন্তদেব যাঁর অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরাম আমার আশ্রয় হোন।

শ্লোক ৮

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

মায়া-অতীতে—মায়াসৃষ্টির অতীত; **ব্যাপি**—সর্বব্যাপক; **বৈকুণ্ঠ-লোকে**—চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে; **পূর্ণ-ঐশ্বর্যে**—সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত; **শ্রীচতুর্ব্যূহ-মধ্যে**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে; **রূপম্**—রূপ; **যস্য**—যাঁর; **উদ্ভাতি**—প্রকাশ পাচ্ছে; **সঙ্কর্ষণ-আখ্যম্**—সঙ্কর্ষণ নামক; **তম্**—তাঁকে; **শ্রীনিত্যানন্দ-রামম্**—শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামকে; **প্রপদ্যে**—প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

মায়াতীত, সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বিত চতুর্ব্যূহের মধ্যে যিনি সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

শ্লোক ৯

মায়াভর্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে ।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

মায়াভর্তা—মায়াশক্তির পতি; **অজাণ্ড-সংঘ**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; **আশ্রয়**—আশ্রয়; **অঙ্গঃ**—যাঁর শ্রীঅঙ্গ; **শেতে**—তিনি শয়ন করেন; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎভাবে; **কারণ-অম্ভোধি-মধ্যে**—কারণ-সমুদ্রের মাঝখানে; **যস্য**—যাঁর; **এক-অংশঃ**—এক অংশ; **শ্রীপুমান্**—পরম পুরুষ; **আদি-দেবঃ**—আদি পুরুষাবতার; **তম্**—তাঁকে; **শ্রীনিত্যানন্দ-রামম্**—শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামকে; **প্রপদ্যে**—আমি প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ এবং মায়াশক্তির অধীশ্বর কারণ-সমুদ্রে শায়িত আদিপুরুষ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর এক অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

শ্লোক ১০

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্ ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥

যস্য—যাঁর; **অংশ-অংশঃ**—অংশের অংশ; **শ্রীল-গর্ভ-উদ-শায়ী**—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; **যৎ**—যাঁর; **নাভি-অব্জম্**—নাভিপদ্ম; **লোক-সংঘাত**—লোকসমূহের; **নালম্**—নাল, যা বিশ্রামস্থান; **লোক-স্রষ্টুঃ**—লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার; **সূতিকা-ধাম**—জন্মস্থান; **ধাতুঃ**—সৃষ্টিকর্তার; **তম্**—সেই; **শ্রী-নিত্যানন্দ-রামম্**—শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামকে; **প্রপদ্যে**—আমি প্রণাম করি।

অনুবাদ

যাঁর নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১১

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

যস্য—যাঁর; **অংশ-অংশ-অংশঃ**—অংশাতি-অংশের অংশ; **পর-আত্মা**—পরমাত্মা; **অখিলানাম্**—সমস্ত জীবের; **পোষ্টা**—পালনকর্তা; **বিষ্ণুঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **ভাতি**—প্রতিভাত হন; **দুগ্ধ-অব্ধি-শায়ী**—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু; **ক্ষৌণীভর্তা**—পৃথিবী ধারণকারী; **যৎ**—যাঁর; **কলা**—

অংশের অংশ; সঃ—তিনি; অপি—অবশ্যই; অনন্তঃ—শেষনাগ; তম্—সেই; শ্রীনিত্যানন্দ-রামম্—শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামকে; প্রপদ্যে—আমি প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

যাঁর অংশাতি-অংশের অংশ হচ্ছেন ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা এবং পৃথিবী ধারণকারী শেষনাগ হচ্ছেন যাঁর কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

শ্লোক ১২

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

মহাবিষ্ণুঃ—নিমিত্ত কারণের আশ্রয় মহাবিষ্ণু; জগৎ-কর্তা—জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা; মায়য়া—মায়া-শক্তির দ্বারা; যঃ—যিনি; সৃজতি—সৃষ্টি করেন; অদঃ—সেই ব্রহ্মাণ্ড; তস্য—তাঁর; অবতারঃ—অবতার; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই; অদ্বৈত-আচার্যঃ—অদ্বৈত আচার্য; ঈশ্বরঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যে মহাবিষ্ণু মায়াশক্তির দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ঈশ্বর তাঁরই অবতার।

শ্লোক ১৩

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

অদ্বৈতম্—অদ্বৈত; হরিণা—শ্রীহরির সঙ্গে; অদ্বৈতাৎ—অভিন্ন তত্ত্ব হওয়ার জন্য; আচার্যম্—আচার্য নামে খ্যাত; ভক্তি-শংসনাৎ—ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য; ভক্ত-অবতারম্—ভক্তরূপে অবতার; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; তম্—তাঁকে; অদ্বৈত-আচার্যম্—শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে; আশ্রয়ে—আমি আশ্রয় করি।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব বলে তাঁর নাম অদ্বৈত এবং ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন বলে তিনি আচার্য নামে খ্যাত, সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্লোক ১৪

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চ-তত্ত্ব-আত্মকম্—পাঁচটি অপ্রাকৃত তত্ত্ব সমন্বিত; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; ভক্ত-রূপ—ভক্তরূপে; স্বরূপকম্—ভক্তের স্বরূপে; ভক্ত-অবতারম্—ভক্ত-অবতারে; ভক্ত-আখ্যম্—ভক্তরূপে খ্যাত; নমামি—প্রণতি নিবেদন করি; ভক্ত-শক্তিকম্—ভক্তকে প্রদত্ত পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি।

অনুবাদ

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ১৫

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥

জয়তাম্—জয়যুক্ত হোন; সুরতৌ—পরম কৃপালু; পঙ্গোঃ—পঙ্গু; মম—আমার; মন্দ-মতেঃ—মন্দমতি-সম্পন্ন; গতী—আশ্রয়; মৎ—আমার; সর্বস্ব—সব কিছু; পদ-অম্ভোজৌ—যাঁদের পাদপদ্ম; রাধা-মদন-মোহনৌ—শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীমদনমোহন।

অনুবাদ

আমি পঙ্গু ও মন্দমতি; যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের পাদপদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ১৬

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

দীব্যৎ—জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট; বৃন্দা-অরণ্য—বৃন্দাবনের অরণ্যে; কল্প-দ্রুম—কল্পবৃক্ষ; অধঃ—তলে; শ্রীমৎ—শোভাবিশিষ্ট; রত্ন-আগার—রত্নমন্দিরে; সিংহা-সনস্থৌ—সিংহাসনে উপবিষ্ট; শ্রীমৎ—শোভাবিশিষ্ট; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ—এবং শ্রীল গোবিন্দদেব; প্রেষ্ঠ-আলীভিঃ—অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের দ্বারা; সেব্যমানৌ—সেবিত হচ্ছেন; স্মরামি—আমি স্মরণ করি।

অনুবাদ

জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের অরণ্যে কল্পবৃক্ষতলে রত্ন-মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ (সখীগণ) কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি তাঁদের স্মরণ করি।

শ্লোক ১৭

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমান্—পরম সুন্দর; **রাস**—রাসনৃত্য; **রস**—রসের; **আরম্ভী**—প্রবর্তক; **বংশীবট**—বংশীবট; **তট**—তটে; **স্থিতঃ**—স্থিত; **কর্ষন্**—আকর্ষণ করেন; **বেণু**—বেণুর; **স্বনৈঃ**—ধ্বনির দ্বারা; **গোপীঃ**—গোপবালিকারা; **গোপীনাথঃ**—শ্রীগোপীনাথ; **শ্রিয়ে**—মঙ্গল; **অস্তু**—বিধান করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

রাসনৃত্য রসের প্রবর্তক বংশীবট-তটস্থিত পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক ১৮

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ১৯

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনের এই তিন বিগ্রহ (মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের) হৃদয় জয় করেছেন। আমি তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি, কেন না তাঁরা আমার হৃদয়ের দেবতা।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রণেতা বৃন্দাবনের তিন প্রধান বিগ্রহ শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দদেব ও শ্রীরাধা-গোপীনাথজীকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। এই তিন ঠাকুর হচ্ছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জীবন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বৃন্দাবনে বাস করার এক স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তার প্রভাবেই ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ভক্তিরসের

বিকাশ হয় এবং চরমে তা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে পর্যবসিত হয়। ভক্তির ক্রম-বিকাশের তিনটি স্তরে এই তিন ঠাকুরের আরাধনা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সেই পন্থা অনুসরণ করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অষ্টাদশাক্ষর বৈদিক মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ যে মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভ রূপে আরাধিত হন, তা হচ্ছে তাঁদের পরম সাধ্য বস্তু। যিনি কামদেব মদনকে মোহিত করেন, তিনি হচ্ছেন মদনমোহন, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে ও গাভীদের আনন্দ দান করেন, তিনি হচ্ছেন গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভ হচ্ছেন ব্রজগোপিকাদের অপ্রাকৃত প্রেমিক। ভক্তদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অনুসারে তাঁর মদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ আদি অসংখ্য নাম রয়েছে।

এই তিন ঠাকুর—মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীজনবল্লভের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সময় মদনমোহনের আরাধনা হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কোন রকম ধারণাই বর্তমান বদ্ধ অবস্থায় আমাদের নেই। যে নিজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না, তাকে বলা হয় *পঙ্গোঃ*; আর জড় কার্যকলাপে অত্যন্ত গভীরভাবে মগ্ন হওয়ার ফলে যার বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়েছে, তাকে বলা হয় *মন্দমতেঃ*। এই ধরনের মানুষদের কর্তব্য হচ্ছে, মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান অথবা সকাম কর্ম প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের চেষ্টা না করে, কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া। পরমেশ্বরের কাছে এই শরণাগতিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায়। পারমার্থিক জীবনের প্রারম্ভে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মদনমোহনের আরাধনা করা, যাতে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আসক্তি থেকে মুক্ত করে আমাদের আকর্ষণ করেন। প্রারম্ভিক স্তরের ভক্তদের মদনমোহনের সঙ্গে এভাবেই সম্পর্কিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কেউ যখন গভীর আসক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করার বাসনা করেন, তখন তিনি অপ্রাকৃত সেবার স্তরে শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা করেন। গোবিন্দ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তদের কৃপায় কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির শুদ্ধ স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি ব্রজাঙ্গনাদের আনন্দবিগ্রহ গোপীজনবল্লভ রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ভগবদ্ভক্তির এই ভাবকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাই বিভিন্ন গোস্বামীগণ বৃন্দাবনে পরমারাধ্য এই বিগ্রহত্রয়ের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই তিন বিগ্রহ সেখানকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়, তাই তাঁরা দিনে অন্তত একবার তাঁদের দর্শন করতে যান। এই তিনটি মন্দির ছাড়াও বৃন্দাবনে অন্য বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন শ্রীল জীব গোস্বামীর রাধা-দামোদর মন্দির, শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামীর শ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর গোকুলানন্দ মন্দির এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রাধারমণ মন্দির। বৃন্দাবনের পাঁচ হাজার মন্দিরের মধ্যে সাতটি মন্দির হচ্ছে মুখ্য, এগুলি চারশ বছরেরও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশ থেকে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর ভাগ পর্যন্ত ভারতের এই

অঞ্চলকে গৌড়ীয়রূপে চিহ্নিত করা হয়। এই অঞ্চলটিকে বলা হয় আর্যাবর্ত বা আর্যদের বসতির স্থান। ভারতবর্ষের এই অংশটিকে পাঁচটি প্রদেশে (পঞ্চ-গৌড়দেশ) ভাগ করা হয়েছে—সারস্বত (কাশ্মীর ও পঞ্জাব), কান্যকুব্জ (বর্তমান লক্ষ্ণৌ শহরসহ সমস্ত উত্তরপ্রদেশ), মধ্যগৌড় (মধ্যপ্রদেশ), মৈথিল (বিহার ও বঙ্গভূমির কিয়দংশ) এবং উৎকল (বঙ্গভূমির কিয়দংশ ও সমগ্র উড়িষ্যা)। বঙ্গদেশকে কখনও কখনও গৌড়দেশ বলা হয়। প্রথমত এর কিয়দংশ মিথিলার অন্তর্ভুক্ত আর দ্বিতীয়ত এটি ছিল হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী, যার নাম ছিল গৌড়। পরবর্তীকালে এই প্রাচীন রাজধানী গৌড়পুর নামে পরিচিত হয় এবং কালক্রমে তা মায়াপুর নাম ধারণ করে।

উড়িষ্যার ভক্তদের বলা হয় উড়িয়া, বঙ্গদেশের ভক্তদের বলা হয় গৌড়ীয় এবং দক্ষিণ ভারতের ভক্তদের বলা হয় দ্রাবিড় ভক্ত। আর্যাবর্তকে যেমন পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে, তেমনই দাক্ষিণাত্যকেও পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে, যাদের বলা হয় পঞ্চদ্রাবিড়। চারটি শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধারক চারজন বৈষ্ণব আচার্য এবং মায়াবাদী সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য এই পঞ্চদ্রাবিড় প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক স্বীকৃত এই চারজন বৈষ্ণব আচার্যের মধ্যে শ্রীরামানুজাচার্য আবির্ভূত হন অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে মহাভূতপুরী নামক স্থানে, শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হন ম্যাঙ্গালোর জেলার বিমানগিরির সন্নিকটে পাজকম্ অঞ্চলে, শ্রীবিষ্ণু স্বামী আবির্ভূত হন পাণ্ড্য অঞ্চলে এবং নিম্বার্কাচার্য আবির্ভূত হন দক্ষিণ প্রান্তে মুঙ্গেরপতন অঞ্চলে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মধ্বাচার্যের ধারায় দীক্ষাগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর অনুগামী বৈষ্ণবেরা তত্ত্ববাদীদের স্বীকার করেন না, যারা নিজেদের মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলে দাবি করে। মধ্বানুগ তত্ত্ববাদীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান করার জন্য বঙ্গদেশের বৈষ্ণবেরা নিজেদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে পরিচয় দেন। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ নামেও পরিচিত এবং তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তগণ মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় নামেও পরিচিত হতে পারেন। আমাদের পরমারাধ্য গুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২০

গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে আমি শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণববৃন্দ ও পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ করছি।

শ্লোক ২১

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিন বিগ্রহের স্মরণে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয় এবং অনায়াসে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

শ্লোক ২২

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দেশ, আশীর্বাদ, নমস্কার ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

এই মঙ্গলাচরণ হচ্ছে তিন প্রকার—তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে নির্দেশ, আশীর্বাদ ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শ্লোক ২৩

প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব-নমস্কার।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত' প্রকার ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথম দুটি শ্লোকের মাধ্যমে ইষ্টদেবকে সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে প্রণতি নিবেদন করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দেশ।
যাহা হইতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় শ্লোকে পরম তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এই বর্ণনার মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ২৫

চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্বাদ।
সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সকলের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, চতুর্থ শ্লোকে আমি সমগ্র জগতের প্রতি ভগবানের করুণার কথা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৬

সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল-প্রয়োজন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্লোকে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্য কারণ বর্ণনা করেছি। কিন্তু পঞ্চ ও ষষ্ঠ শ্লোকে তাঁর অবতরণের মুখ্য কারণ বিশ্লেষণ করেছি।

শ্লোক ২৭

এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব ।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই ছয়টি শ্লোকে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছি এবং তার পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ২৮

আর দুই শ্লোকে অদ্বৈত-তত্ত্বাখ্যান ।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দুটি শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছি এবং তার পরের শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের (ভগবান, ভগবানের স্বাংশ-প্রকাশ, অবতার, শক্তি ও ভক্ত) বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৯

এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ ।
তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই চোদ্দটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে নিরূপণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩০

সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে করি' নমস্কার ।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সমস্ত বৈষ্ণব শ্রোতাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে এই সমস্ত শ্লোকের নিগূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করছি।

শ্লোক ৩১

সকল বৈষ্ণব, শুন করি' একমন ।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্র-মত-নিরূপণ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সমস্ত বৈষ্ণব পাঠককে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন একাগ্র চিত্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিরূপিত এই সমস্ত মতামত পাঠ করেন এবং শ্রবণ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। সেই তত্ত্ব প্রামাণিক শাস্ত্রপ্রমাণের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়েছে। কখনও কখনও মানুষ শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত তাদের খামখেয়ালী আবেগ-প্রবণতার ভিত্তিতে কোন মানুষকে ভগবান বলে গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা শাস্ত্রপ্রমাণ উল্লেখ করে তাঁর সমস্ত উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন। এভাবেই তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩২

কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ ।
কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ, গুরুদেব, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও অংশ-প্রকাশ—এই ছয়টি রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলাবিলাস করেন। এই ছয়টি তত্ত্বই এক।

শ্লোক ৩৩

এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন ।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সর্বপ্রথমে এই ছয় তত্ত্বের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি এবং তাঁদের শুভ আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মঙ্গলাচরণ করি।

শ্লোক ৩৪

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৪ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **গুরূন্**—গুরুবর্গকে; **ঈশভক্তান্**—পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দকে; **ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ঈশ-অবতারকান্**—পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণকে; **তৎ**—সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রকাশান্**—প্রকাশসমূহকে; **চ**—এবং; তৎ—পরমেশ্বর ভগবানের; **শক্তীঃ**—শক্তিসমূহকে; **কৃষ্ণচৈতন্য**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; **সংজ্ঞকম্**—নামক।

অনুবাদ

আমি দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে গুরুবর্গের, (শ্রীবাস আদি) পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের, (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আদি) পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণের, (শ্রীনিত্যানন্দ আদি) পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশসমূহের, (শ্রীগদাধর আদি) পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিসমূহের এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করি।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থের সূচনাস্বরূপ এই সংস্কৃত শ্লোকটি রচনা করেছেন এবং এখন তিনি সবিস্তারে তার বিশ্লেষণ করবেন। এই শ্লোকে তিনি পরম সত্যের ছয়টি মুখ্য তত্ত্বের উদ্দেশ্যে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। *গুরূন্* শব্দটি বহুবচন, কারণ শাস্ত্রের ভিত্তিতে যিনিই পারমার্থিক উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই হচ্ছেন গুরু। যদিও অন্যরা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পারমার্থিক পথ প্রদর্শন করেন, কিন্তু যিনি প্রথমে মহামন্ত্র দীক্ষা দান করেন, তাঁকে বলা হয় দীক্ষাগুরু এবং যে সমস্ত মহাত্মারা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা দান করেন, তাঁদের বলা হয় শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সমপর্যায়ভুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে শিষ্যের সঙ্গে তাঁদের আচরণ ভিন্ন বলে মনে হতে পারে। তাঁরা বদ্ধ জীবদের ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করেন। সেই জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের গুরু বলে গ্রহণ করেছেন।

ঈশভক্তান্ বলতে শ্রীবাস আদি ভগবদ্ভক্তদের বোঝানো হয়েছে, যাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শক্তি এবং গুণগতভাবে ভগবান থেকে অভিন্ন। *ঈশাবতারকান্* শব্দে অদ্বৈত প্রভু আদি আচার্যদের বোঝানো হয়েছে, যাঁরা হচ্ছেন ভগবানের অবতার। *তৎপ্রকাশান্* শব্দে ভগবানের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং দীক্ষাগুরুকে বোঝানো হয়েছে। *তচ্ছক্তীঃ* শব্দে গদাধর, দামোদর, জগদানন্দ আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শক্তিদের বোঝানো হয়েছে।

এই ছয় তত্ত্ব বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হলেও তাঁরা সকলেই সমানভাবে পূজনীয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থের শুরুতেই তাঁদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণতি নিবেদন করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া কখনই ভগবানের সঙ্গ করতে পারে না, ঠিক যেমন অন্ধকার আলোকের কাছে আসতে পারে না। কিন্তু তবুও অন্ধকার আলোকের ক্ষণস্থায়ী ও অলীক আবরণ হওয়ার ফলে আলোক থেকেই তার উৎপত্তি। কিন্তু আলোক থেকে স্বতন্ত্র তার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

শ্লোক ৩৫

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

মন্ত্রগুরু ও সমস্ত শিক্ষাগুরুর শ্রীপাদপদ্মে আমি সর্বপ্রথমে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে (২০২) উল্লেখ করেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি যাজন করাই হচ্ছে শুদ্ধ বৈষ্ণবদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং ভক্তসঙ্গে তা সাধন করতে হয়। কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করার ফলে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি অনুরাগের উদয় হয়। ভগবদ্ভক্তির প্রতি ধীরে ধীরে অনুরাগ বিকাশের মাধ্যমে ভগবানের প্রতি অগ্রসর হওয়ার এটিই হচ্ছে পন্থা। কেউ যদি ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করতে অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গ করতে হবে। কারণ, এই প্রকার সঙ্গের প্রভাবের ফলেই কেবল বদ্ধ জীব অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এবং তার ফলে স্বরূপগত স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসারে ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনর্বিকাশ সাধিত হয়।

কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের মাধ্যমে যখন কারও চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হয়, তখন সে পরমতত্ত্বকে জানতে পারে, কিন্তু কেউ যদি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে ভগবানকে জানার চেষ্টা করে, তা হলে সে কোন দিনই ভগবানকে জানতে পারবে না এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। ভগবানকে জানার রহস্য হচ্ছে যে, ভক্তকে ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদের কাছে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানের কথা শুনতে হবে এবং পূর্বতন আচার্যদের প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের সেবা করতে হবে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ আদির প্রতি আসক্ত ভগবদ্ভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর বিশেষ সেবা সম্পাদন করেন; যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে ভগবানকে জানার চেষ্টায় তিনি তাঁর সময়ের অপচয় করেন না। সদ্‌গুরু জানেন কিভাবে তাঁর শিষ্যের কর্মক্ষমতাকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হয় এবং এভাবেই শিষ্যের বিশেষ প্রবণতা অনুসারে তিনি তাকে ভগবানের বিশেষ সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্তকে কেবল একজন গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, কারণ শাস্ত্রে একাধিক দীক্ষাগুরু গ্রহণ করতে সর্বদা নিষেধ করা হয়েছে। তবে শিক্ষাগুরু বহু হতে পারেন। সাধারণত যে গুরুদেব শিষ্যকে পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিরন্তর উপদেশ প্রদান করে থাকেন, তিনিই পরবর্তীকালে তার দীক্ষাগুরু হন।

আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যদি সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ না করি, তা হলে আমাদের ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার সব রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। যথাযথভাবে সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে কেউ নিজেকে

মহান ভক্ত বলে জাহির করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে তাকে বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। তার ফলে তার ভবযন্ত্রণা প্রশমিত না হয়ে ক্রমাগত বর্ধিতই হতে থাকবে। এই ধরনের অসহায় মানুষদের হালবিহীন নৌকার সঙ্গে তুলনা করা চলে, কেন না সেই নৌকা কখনই তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে। সদ্‌গুরুর সেবা না করে কখনই পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। সরাসরিভাবে সদ্‌গুরুর সেবা করার সুযোগ পাওয়া না গেলে, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা তাঁর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে তাঁর সেবা করা। গুরুদেবের বাণী ও বপুর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তাই, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাণী শিষ্যের পরম পাথেয় হওয়া উচিত। কেউ যদি মনে করে যে, কারও নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন তার নেই, এমন কি গুরুদেবেরও নির্দেশ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, তা হলে সে ভগবানের চরণে অপরাধী হয়। এ ধরনের অপরাধী ব্যক্তি কখনই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে না। এটি একান্ত প্রয়োজনীয় যে, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয়। শ্রীল জীব গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন, বংশানুক্রমিকভাবে সামাজিক প্রথার বশবর্তী হয়ে কুলগুরু গ্রহণ না করতে। পারমার্থিক জীবনে যথার্থভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৩৬

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমার শিক্ষাগুরু হচ্ছেন শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

শ্লোক ৩৭

এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার ।
তাঁ' সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই ছয়জন হচ্ছেন আমার শিক্ষাগুরু এবং তাই তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই ছয় গোস্বামীকে তাঁর শিক্ষাগুরু রূপে স্বীকার করে এই গ্রন্থের প্রণেতা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের আনুগত্য ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলে স্বীকৃতি লাভ করা যায় না।

শ্লোক ৩৮

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান ।
তাঁ' সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের অসংখ্য ভক্ত রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে শ্রীবাস ঠাকুর হচ্ছেন প্রধান। আমি তাঁদের সকলের পাদপদ্মে আমার সহস্র প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৯

অদ্বৈত আচার্য—প্রভুর অংশ-অবতার ।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন ভগবানের অংশ-অবতার। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪০

নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ রায় হচ্ছেন ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশ। আমি তাঁর দ্বারা দীক্ষিত হয়েছি, তাই আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা করি।

শ্লোক ৪১

গদাধর পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি ।
তাঁ' সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিদের শ্রীপাদপদ্মে আমি শত-সহস্র প্রণতি নিবেদন করি, যাঁদের মধ্যে শ্রীগদাধর প্রভু হচ্ছেন প্রধান।

শ্লোক ৪২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং তাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমি আমার অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করি।

শ্লোক ৪৩

সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার ।
এই ছয় তেঁহো যৈছে—করিয়ে বিচার ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত পার্ষদসহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, আমি এখন এই ছয় তত্ত্বের বিচারপূর্বক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

ভগবানের বহু শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন, যাঁরা হচ্ছেন ভগবানের পার্ষদ। ভক্তসহ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। এই সমস্ত ভক্তরূপী ভগবানের প্রকাশ হচ্ছেন ভগবানের নিত্য পরিকর, যাঁদের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের সমীপবর্তী হওয়া যায়।

শ্লোক ৪৪

যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস ।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও আমি জানি যে, আমার গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, তবুও তিনি হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকাশ।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবক এবং শ্রীগুরুদেবও তাঁর সেবক। কিন্তু তবুও, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশ। এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে, শিষ্য কৃষ্ণভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে পারেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ।

যিনি স্বয়ং বলরাম, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ এবং তিনি হচ্ছেন আদিগুরু। তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলায় তাঁকে সহায়তা করেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক।

প্রতিটি জীবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসেবক; তাই শ্রীগুরুদেবও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক ছাড়া অন্য কেউ নন। গুরুদেবের নিত্যবৃত্তি হচ্ছে শিষ্যদের ভগবৎ-সেবার শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে ভগবানের সেবা বৃদ্ধি করা। গুরুদেব কখনও নিজেকে ভগবান বলে জাহির করেন না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন। শাস্ত্রে এই বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, কেউ যেন নিজেকে ভগবান বলে জাহির না করে। কিন্তু গুরুদেব যেহেতু ভগবানের সব চাইতে অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবক, তাই তাঁকেও শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

শ্লোক ৪৫

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কৃপাপূর্বক উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের মতো। গুরুদেব সর্বদাই মনে করেন যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অতি দীন সেবক, কিন্তু শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে সর্বদাই ভগবানের প্রতিনিধি রূপে দর্শন করা।

শ্লোক ৪৬

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৪৬ ॥

আচার্যম্—আচার্যকে; মাম্—আমার শ্রেষ্ঠ; **বিজানীয়াৎ**—জানা উচিত; **ন অবমন্যেত**—অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **ন**—নয়; **মর্ত্য-বুদ্ধ্যা**—একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা; **অসূয়েত**—ঈর্ষান্বিত হওয়া; **সর্ব-দেব**—সমস্ত দেবতার; **ময়ঃ**—অধিষ্ঠান; **গুরুঃ**—গুরুদেব।

অনুবাদ

"আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে জানা উচিত এবং কখনও কোনওভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়, কেন না তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান আছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৭/২৭) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছিলেন। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মচারীর কিভাবে আচরণ করা উচিত, সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুদেব কখনও তাঁর শিষ্যের সেবা উপভোগ করেন না। তিনি ঠিক একজন পিতার মতো। পিতার স্নেহপূর্ণ তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিশু যেমন বড় হতে পারে না, ঠিক তেমনই সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধান ব্যতীত শিষ্য ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

গুরুদেবকে আচার্য বলেও সম্বোধন করা হয়। আচার্য কথাটির অর্থ হচ্ছে, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রাকৃত শিক্ষক। *মনুসংহিতায়* (২/১৪০) আচার্যের কর্তব্য বিশ্লেষণ করে

বলা হয়েছে যে, তিনি শিষ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপূর্বক শিষ্যকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন এবং এভাবেই তাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান অধ্যয়নে শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে বলা হয় উপনয়ন, অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান শিষ্যকে গুরুর নিকটে (উপ) আনয়ন করে। যে গুরুর সন্নিকটে আসতে পারে না, সে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয়, তাই সে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের শরীরে যজ্ঞোপবীত গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণের প্রতীক; তা যদি কেবল উচ্চ-বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য ধারণ করা হয়ে থাকে, তা হলে তার কোনও মূল্য নেই। সদ্‌গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দীক্ষা দান করা এবং এই সংস্কার বা পবিত্রীকরণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে, গুরুদেব শিষ্যকে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত মানুষও সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে। কারণ, উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রাহ্মণত্ব দান করার অধিকার সদ্‌গুরুর রয়েছে। *বায়ু পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, আচার্য হচ্ছেন তিনি, যিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য সম্বন্ধে অবগত, যিনি *বেদের* উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে পারেন, যিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ পালন করেন এবং শিষ্যকে সেই অনুসারে আচরণ করতে শিক্ষা দেন।

অহৈতুকী করুণার প্রভাবেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান গুরুরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই, আচার্যের আচরণে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কার্যকলাপ দেখা যায় না। তিনি হচ্ছেন সেবক ভগবান। ভগবানের আশ্রয়-বিগ্রহ নামক এই ধরনের ঐকান্তিক ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক।

কেউ যদি ভগবানের সেবা না করে নিজেকে আচার্য বলে জাহির করার চেষ্টা করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে অপরাধী এবং তার আচার্য হওয়ার যোগ্যতা নেই। সদ্‌গুরু সর্বদাই অনন্য ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। এই লক্ষণগুলির মাধ্যমে তাঁকে ভগবানের প্রকাশরূপে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যথার্থ প্রতিনিধি রূপে জানা যায়। এই ধরনের গুরুদেবকে বলা হয় আচার্যদেব। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিষয়াসক্ত মানুষেরা আচার্যের সমালোচনা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যথার্থ আচার্য পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন এবং তাই এই ধরনের আচার্যকে ঈর্ষা করা মানে স্বয়ং ভগবানকে ঈর্ষা করা। তার ফলে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধনে বিঘ্ন ঘটে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে আচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলে জেনে সর্বদা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; কিন্তু সেই সঙ্গে এটিও সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, গুরু বা আচার্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের অনুকরণ করেন না। ভণ্ড গুরুরা নিজেদের সর্বতোভাবে কৃষ্ণ বলে জাহির করে শিষ্যদের প্রতারণা করে। কিন্তু এই ধরনের নির্বিশেষবাদীরা কেবল তাদের শিষ্যদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, কেন না চরমে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ভক্তিমার্গে এই ধরনের মনোভাবের কোন স্থান নেই।

বৈদিক দর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব, যা প্রতিপন্ন করে যে, সব কিছুই যুগপৎভাবে ভগবানের থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন যে, সেটিই হচ্ছে আদর্শ গুরুর প্রকৃত স্থিতি এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর অন্তরঙ্গ সেবকরূপে দর্শন করা। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভক্তিসন্দর্ভে* (২১৩) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, শুদ্ধ ভক্ত যে গুরুদেব ও মহাদেবকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তার কারণ হচ্ছে তাঁরা ভগবানের অতি প্রিয়। কিন্তু এমন নয় যে, তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরা পরবর্তীকালে এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন। গুরুদেবের বন্দনায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত সেবক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে গুরুদেবের আরাধনা করেন। ভক্তিমূলক সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের রচিত গীতিসমূহে গুরুদেবকে সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরঙ্গ পরিকর অথবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৭

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শিক্ষাগুরুকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলে জানতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ও শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, শিক্ষাগুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ প্রতিনিধি। শিক্ষাগুরু রূপে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অন্তরে ও বাইরে শিক্ষা দেন। অন্তর থেকে তিনি আমাদের নিত্য সহচর পরমাত্মা রূপে শিক্ষা দেন এবং বাইরে শিক্ষাগুরু রূপে *ভগবদ্‌গীতার* জ্ঞান দান করেন। দুই রকমের শিক্ষাগুরু রয়েছেন—১) মুক্ত পুরুষ, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় মগ্ন এবং ২) যিনি যথাযথ নির্দেশ প্রদান করার মাধ্যমে শিষ্যের হৃদয়ে কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করেন। এভাবেই ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে অধ্যাত্মগত ও বস্তুগত—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ, তা চিন্ময় অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়-চেতনা উভয়ের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। যথার্থ আচার্য বলতে তাঁকেই বোঝায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন এবং শিষ্যকে পূর্ণ জ্ঞান দান করে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত করেন।

কেউ যখন কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে যথার্থভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত হন, তখন ব্যবহারিক ভাবে তাঁর ভগবদ্ভক্তি শুরু হয়। ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাকে বলা হয় অভিধেয়, অর্থাৎ কর্তব্যস্বরূপ যে কার্য সম্পাদিত হয়। আমাদের একমাত্র আশ্রয় হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যিনি আমাদের শিক্ষা দেন কিভাবে সেই ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের মূর্ত প্রকাশ শ্রীগুরুদেব। আশ্রয়দাতা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুর কোন রকম পার্থক্য নেই। কেউ যদি মূর্খের মতো তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নিরূপণ করে, তা হলে তা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অপরাধজনক।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী হচ্ছেন আদর্শ গুরু, কেন না তিনি বদ্ধ জীবকে মদনমোহনজীর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় দান করেন। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্মৃত হবার ফলে কেউ হয়ত বৃন্দাবনের যথার্থ রূপ দর্শন করতে অসমর্থ হতে পারে, কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপায় সে বৃন্দাবনে বসবাস করে প্রভূত সুকৃতি অর্জন করার সুযোগ লাভ করতে পারে। অর্জুনকে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা দান করে শ্রীগোবিন্দজী ঠিক শিক্ষাগুরুর মতো আচরণ করেছেন। তিনিই হচ্ছেন আদিগুরু, কেন না তিনিই আমাদের শিক্ষা দেন এবং তাঁকে সেবা করার সুযোগ দেন। দীক্ষাগুরু হচ্ছেন শ্রীমদনমোহন বিগ্রহের মূর্ত প্রকাশ, আর শিক্ষাগুরু শ্রীগোবিন্দদেব বিগ্রহের মূর্ত প্রকাশ। এই দুটি বিগ্রহ আজও বৃন্দাবনে পূজিত হচ্ছেন। শ্রীগোপীনাথজী হচ্ছেন পারমার্থিক উপলব্ধির চরম আকর্ষণ।

শ্লোক ৪৮

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

ন এব—হন না; **উপযন্তি**—ব্যক্ত করতে সমর্থ; **অপচিতিম্**—তাঁদের কৃতজ্ঞতা; কবয়ঃ—অভিজ্ঞ ভক্তরা; তব—আপনার; ঈশ—হে ভগবান; **ব্রহ্ম-আয়ুষা**—ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন; **অপি**—সত্ত্বেও; **কৃতম্**—উদার কার্যকলাপ; **ঋদ্ধ**—বর্ধিত; **মুদঃ**—আনন্দ; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; যঃ—যিনি; **অন্তঃ**—অন্তরে; **বহিঃ**—বাইরে; **তনু-ভৃতাম্**—দেহধারী জীবদের; **অশুভম্**—অশুভ; **বিধুন্বন্**—বিদূরিত করে; আচার্য—আচার্যের; চৈত্ত্য—পরমাত্মার; **বপুষাঃ**—বপুর দ্বারা; **স্ব**—স্বীয়; **গতিম্**—গতি; **ব্যনক্তি**—প্রদর্শন করেন।

অনুবাদ

"হে ভগবান! পরমার্থ-বিজ্ঞানের কবি ও অভিজ্ঞ ভক্তরা ব্রহ্মার মতো দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়েও আপনার কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে সমর্থ হন না। কারণ, আপনি দেহধারী জীবদের সমস্ত অশুভ বিদূরিত করে আপনার কাছে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করে বাইরে আচার্যরূপে ও অন্তরে পরমাত্মা রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২৯/৬) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর উদ্ধব এই উক্তিটি করেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ৪৯ ॥

তেষাম্—তাদের; **সতত-যুক্তানাম্**—নিরন্তর যুক্ত; **ভজতাম্**—ভগবৎ-সেবায়; **প্রীতি-পূর্বকম্**—প্রীতি সহকারে; **দদামি**—আমি দান করি; **বুদ্ধি-যোগম্**—যথার্থ বুদ্ধিমত্তা; **তম্**—সেই; **যেন**—যার দ্বারা; **মাম্**—আমার কাছে; **উপযান্তি**—ফিরে আসে; **তে**—তারা।

অনুবাদ

"যারা প্রীতি সহকারে সর্বদা আমার ভজনা করে, আমি তাদের যথার্থ বুদ্ধিমত্তা দান করি, যার দ্বারা তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।"

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার (১০/১০) এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে গোবিন্দদেব তাঁর যথার্থ ভক্তকে শিক্ষা দান করেন। ভগবান এখানে ঘোষণা করেছেন যে, যাঁরা নিরন্তর তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁদের তিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের আলোকের দ্বারা তাঁর প্রতি অনুরাগ প্রদান করেন। এই দিব্য চেতনার বিকাশের ফলে ভক্ত দাসত্বে পরিণত হয় এবং এভাবেই তিনি তাঁর নিত্য অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেন। এই চেতনার উন্মেষ তাঁদেরই হয়, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তাঁরা জানেন যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন চিদানন্দময়, সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ; তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমন্বিত। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং সর্ব কারণের পরম কারণ। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের অনুভূতিলব্ধ ভাবের আদান-প্রদান করেন, ঠিক যেমন জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এই সমস্ত ভাবের বিনিময় ভগবানকে আনন্দ দান করে এবং তার ফলে তিনি সেই সমস্ত ভক্তদের কৃপাপূর্বক আনুকূল্য প্রদান করে তাঁদের কৃষ্ণভাবনার আলোকে উদ্ভাসিত করেন।

শ্লোক ৫০

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥ ৫০ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; উপদিশ্য—উপদেশ দান করে; **অনুভাবিতবান্**—অনুভব করিয়েছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে উপদেশ দান করে তাঁকে অনুভব করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

God helps those who help themselves (ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে), এই ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটি পারমার্থিক বিষয়েও প্রযোজ্য। অন্তর থেকে ভগবানের গুরুরূপে সাহায্য করার বহু নিদর্শন শাস্ত্রে রয়েছে। গুরুরূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে উপদেশ দান করেছিলেন। ব্রহ্মার যখন জন্ম হয়, তখন তিনি জানতেন না কিভাবে তাঁর সৃজনী-শক্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করবেন। আদিতে কেবল শব্দ ছিল, সেই শব্দ *তপ* কথাটি স্পন্দিত করছিল, যার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তপশ্চর্যা করা। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সুখের চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে সব রকমের অসুবিধা স্বীকার করতে হয়। তাকেই বলা হয় তপস্যা। ইন্দ্রিয় উপভোগকারীরা কখনই ভগবান, ভগবদ্ভক্তি ও তত্ত্ববিজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ব্রহ্মা যখন *তপ* শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তপশ্চর্যা শুরু করেছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে চিন্ময় জগৎ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার প্রভৃতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে জাগতিক সব কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তপশ্চর্যার মাধ্যমে মানবজাতির আদি পিতা ব্রহ্মা যে বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন, তা ছিল আরও সূক্ষ্ম। এমন একদিন সময় আসবে যখন জড় বৈজ্ঞানিকেরাও জানতে পারবে কিভাবে আমরা বৈকুণ্ঠজগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারি। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি সম্বন্ধে জানতে অনুসন্ধিৎসু হয়েছিলেন এবং ভগবান তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে। পরম গুরুরূপে পরমেশ্বর ভগবানের দেওয়া এই জ্ঞান *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৯/৩১-৩৬) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫১

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্ ।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৫১ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **পরম**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **মে**—আমার; **যৎ**—যা; **বিজ্ঞান**—বিজ্ঞান; **সমন্বিতম্**—সমন্বিত; **সরহস্যম্**—রহস্যপূর্ণ; **তৎ**—তার; **অঙ্গম্**—অঙ্গ; **চ**—এবং; **গৃহাণ**—গ্রহণ করার চেষ্টা কর; **গদিতম্**—বিশ্লেষিত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

"আমি যা বলব, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর; কেন না আমার সম্বন্ধীয় এই দিব্য জ্ঞান কেবল বিজ্ঞানসম্মতই নয়, তা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণও।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় দিব্যজ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের থেকেও অনেক গভীরতর। কারণ, সেই জ্ঞান কেবল তাঁর রূপ ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেই তথ্য প্রদান করে না, তা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে। সৃষ্টিতে এমন কিছু নেই, যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কোন কিছুই নেই, আবার তিনি ছাড়া অন্য কোন কিছুই শ্রীকৃষ্ণ নয়। এই জ্ঞান হচ্ছে চিন্ময় বিজ্ঞান এবং শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাজীকে পূর্ণরূপে এই বিজ্ঞান দান করতে চেয়েছিলেন। এই বিজ্ঞানের রহস্য চরমে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার আসক্তিতে পর্যবসিত হয়, ফলে তখন কৃষ্ণ-বহির্ভূত সব কিছুর প্রতি অনাসক্তি আসে। এই স্তর প্রাপ্ত হওয়ার নয়টি উপায় রয়েছে—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এগুলি হচ্ছে একই ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ, যা দিব্য রহস্যে পরিপূর্ণ। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছিলেন যে, তিনি যেহেতু তাঁর প্রতি প্রীত হয়েছেন, তাই তাঁর কৃপায় এই রহস্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

শ্লোক ৫২

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৫২ ॥

যাবান্—আমার নিত্য স্বরূপে আমি যে রকম; **অহম্**—আমি; **যথা**—যেভাবে; **ভাবঃ**—দিব্য ভাব; **যৎ**—যা কিছু; **রূপ**—বিভিন্ন রূপ ও বর্ণ; **গুণ**—গুণ; **কর্মকঃ**—কার্যকলাপ; **তথা এব**—ঠিক সেই রকম; **তত্ত্ব-বিজ্ঞানম্**—তত্ত্ববিজ্ঞান; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার; **মৎ**—আমার; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহে।

অনুবাদ

"আমার অনুগ্রহে তুমি আমার রূপ, গুণ ও লীলা সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর।

তাৎপর্য

ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ এক অতি গোপনীয় রহস্য এবং তাঁর সেই রূপের লক্ষণগুলি জড় উপাদান-সম্ভূত সমস্ত বস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। শ্যামসুন্দর, নারায়ণ, রাম, গৌরসুন্দর আদি ভগবানের অনন্ত রূপ এবং তাঁর বিভিন্ন রূপের বর্ণগুলি হচ্ছে—শ্বেত, রক্ত, পীত, ঘনশ্যাম প্রভৃতি। শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানরূপে এবং শুষ্ক জ্ঞানীদের কাছে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে তাঁর গুণাবলী, গিরি-গোবর্ধন ধারণ করার মতো অসাধারণ কার্যকলাপ, দ্বারকায় ষোল হাজারেরও অধিক মহিষীকে বিবাহ, ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে রাসনৃত্য এবং সেই নৃত্যে উপস্থিত প্রতিটি গোপিকার সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে নৃত্য করার জন্য নিজেকে বিস্তার—এই রকম অসংখ্য এবং অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। এই লীলাসমূহের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের

প্রকাশ। এই *ভগবদ্গীতা* সারা পৃথিবীর সমস্ত স্তরের পণ্ডিতমণ্ডলী শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন এবং যত জন মনোধর্মী জ্ঞানী রয়েছেন ততভাবে তার বিশ্লেষণ হয়। এই রহস্যাবৃত তত্ত্ব অবরোহ পন্থায় ব্রহ্মার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। আরোহ পন্থায় এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। ভগবানের মহৎ অনুগ্রহের ফলে ব্রহ্মার মতো ভক্তের কাছে এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাসদেব, ব্যাসদেব থেকে শুকদেব এবং এভাবেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। আমাদের জড় প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা কখনই ভগবানের এই রহস্যাবৃত তত্ত্ব জানতে পারব না; তা কেবল তাঁর কৃপার প্রভাবেই যথার্থ ভক্তের কাছে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ভক্তের সেবার বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে তাঁদের কাছে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, নির্বিশেষবাদীরা, যারা শ্রবণ, কীর্তন আদি পূর্বোক্ত ভক্ত্যঙ্গের মাধ্যমে বিনীতভাবে ভগবৎ-সেবা ব্যতীত তাদের সীমিত জ্ঞান ও রোগগ্রস্ত জল্পনা-কল্পনার উপর নির্ভর করে ভগবানকে জানতে চায়, তারা কখনই অপ্রাকৃত জগতের রহস্য ভেদ করতে পারে না, যেখানে জড়াতীত পরম সত্য তাঁর দিব্য সবিশেষ রূপে বিরাজমান। যে সমস্ত সাধারণ অধ্যাত্মবাদী জড় স্তর থেকে চিন্ময় স্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, তারা সেই পরম সত্যকে নির্বিশেষ বলে মনে করে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় যখন সেই রহস্য উন্মোচিত হয়, তখন এই নির্বিশেষ ধারণার নিরসন হয়।

শ্লোক ৫৩

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥

অহম্—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—অবশ্যই; **আসম্**—স্থিত ছিলাম; **এব**—কেবলমাত্র; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **ন**—কখনই নয়; **অন্যৎ**—অন্য যা কিছু; **যৎ**—যা; **সৎ**—কার্য; **অসৎ**—কারণ; **পরম্**—পরম; **পশ্চাৎ**—অন্তে; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—যা; **এতৎ**—এই সৃষ্টি; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **অবশিষ্যেত**—অবশিষ্ট থাকে; **সঃ**—সে; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

"সৃষ্টির পূর্বে কেবল আমিই ছিলাম এবং সৎ, অসৎ ও অনির্বচনীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরে এ সমুদয় স্বরূপে আমিই বিরাজ করি এবং প্রলয়ের পর আমিই কেবল অবশিষ্ট থাকব।

তাৎপর্য

অহম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'আমি'; তাই বক্তা যখন বলছেন *অহম্* বা 'আমি', তখন নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিত্ব রয়েছে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলে যে, এই *অহম্* হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। মায়াবাদীরা ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের খুব গর্ব করে, কিন্তু ব্যাকরণ সম্বন্ধে

যারই কিছু ধারণা রয়েছে, সেই বুঝতে পারবে যে, *অহম্* মানে হচ্ছে 'আমি' এবং 'আমি' বলতে কোন ব্যক্তিকেই বোঝায়। তাই পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মার কাছে তাঁর অপ্রাকৃত রূপ বর্ণনা করার সময়ে *অহম্* শব্দটি ব্যবহার করে তাঁর সবিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন। *অহম্* শব্দটি বিশেষ অর্থবাচক; এটি অস্পষ্ট কোন উক্তি নয় যে, আমরা আমাদের খেয়ালখুশি মতো তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন *অহম্*, তখন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর সবিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পর কেবল পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর নিত্য পার্ষদেরাই বর্তমান থাকেন; তখন কোন জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। *বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।* অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্বে কেবল বিষ্ণুই ছিলেন, এমন কি ব্রহ্মা বা শিবও ছিলেন না। শ্রীবিষ্ণু তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোকেই শ্রীবিষ্ণু তাঁর পার্ষদ ও পরিকর সহ বিরাজ করেন। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কালের প্রভাবে এই জড় সৃষ্টি লয় হয়ে যায়, কিন্তু আর একটি জগৎ রয়েছে, যা কখনও লয়প্রাপ্ত হয় না। 'সৃষ্টি' বলতে জড় সৃষ্টিকেই বোঝায়, কারণ চিৎ-জগতে সব কিছুই নিত্য বিরাজমান এবং সেখানে কোন সৃষ্টি বা লয় নেই।

ভগবান এখানে বলেছেন যে, জড় সৃষ্টির পূর্বে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য সহকারে তিনি বিরাজমান ছিলেন। যখন কোন রাজার কথা চিন্তা করা হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই রাজার সচিব, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির কথাও মনে আসে। কোন রাজার যদি এই রকম ঐশ্বর্য থাকতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য যে কি বিশাল হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই ভগবান যখন বলেন *অহম্*, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর সমগ্র ঐশ্বর্য ও শক্তিসহ পূর্ণরূপে বিরাজমান।

যৎ শব্দটির দ্বারা ব্রহ্ম বা ভগবানের নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটাকে বোঝানো হয়েছে। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে, *তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্*—ব্রহ্মজ্যোতি অন্তহীনভাবে বিচ্ছুরিত হয়। সূর্য যেমন একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করলেও তার রশ্মি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তেমনই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর শক্তি বা রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্ম অন্তহীনভাবে বিচ্ছুরিত হয়। ব্রহ্ম থেকে জড় জগতের প্রকাশ হয়, ঠিক যেমন সূর্যরশ্মি থেকে মেঘের প্রকাশ হয়। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে গাছপালা জন্মায় এবং গাছপালা থেকে ফল-মূল, শাকসবজি উৎপন্ন হয়, যা আহার করে অন্য সমস্ত প্রাণীরা জীবন ধারণ করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ। ব্রহ্মজ্যোতি নির্বিশেষ, কিন্তু সেই শক্তির উৎস হচ্ছেন সবিশেষ ভগবান। তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠে তাঁর থেকে নির্গত এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। তিনি কখনই নির্বিশেষ নন। যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মের উৎস সম্বন্ধে অবগত

নয়, তাই তারা ভ্রমবশত মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই হচ্ছে চরম বা পরম লক্ষ্য। কিন্তু *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটার আবরণ ভেদ করে পরমেশ্বর ভগবানের রূপ দর্শন করতে হয়। কেউ যদি সূর্যকিরণের উৎস সম্বন্ধে জানতে চায়, তা হলে তাকে সূর্যকিরণের স্তর অতিক্রম করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করতে হবে এবং তারপর সেখানকার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যদেবকে দর্শন করতে হবে। পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* সেই তত্ত্বই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সৎ মানে 'কার্য', *অসৎ* মানে 'কারণ' এবং *পরম* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পরমতত্ত্ব', যিনি হচ্ছেন কার্য ও কারণের অতীত। সৃষ্টির কারণ হচ্ছে *মহৎ-তত্ত্ব* বা জড় শক্তির সমষ্টি এবং তার কার্য হচ্ছে সৃষ্টি। কিন্তু আদিতে কার্য অথবা কারণ কোনটিই ছিল না; তার প্রকাশ হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবান থেকে, ঠিক যেভাবে পরমেশ্বর ভগবান থেকে কালের প্রকাশ হয়েছিল। তা *বেদান্তসূত্রে* (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) বর্ণিত হয়েছে। জড় সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ বা *মহৎ-তত্ত্বের* উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সেই তত্ত্ব *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতায়* সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি হচ্ছি সব কিছুর উৎস।" জড় সৃষ্টি অনিত্য হওয়ার ফলে কখনও তার প্রকাশ হয় এবং কখনও তা অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু তার শক্তির উৎপত্তি হয় পরমেশ্বর ভগবান থেকে। সৃষ্টির পূর্বে কার্য বা কারণ কিছুই ছিল না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পূর্ণ ঐশ্বর্য ও পূর্ণ শক্তিসহ বর্তমান ছিলেন।

পশ্চাদ্ অহম্ শব্দ দুটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, প্রলয়ের পরেও ভগবান বর্তমান থাকেন। জড় সৃষ্টি যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনও ভগবান স্বয়ং তাঁর বৈকুণ্ঠলোকসমূহে বিরাজ করেন। সৃষ্টির সময়েও ভগবান অনন্ত বৈকুণ্ঠলোকে বর্তমান থাকেন, আবার একই সঙ্গে তিনি জড় জগতের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেও পরমাত্মারূপে বর্তমান থাকেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৭) তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *গোলোক এব নিবসতি*—যদিও তিনি পূর্ণরূপে গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, কিন্তু তবুও সর্বব্যাপ্ত (*অখিলাত্মভূতঃ*)। ভগবানের এই সর্বব্যাপ্ত রূপকে বলা হয় পরমাত্মা। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৬) বলা হয়েছে, *অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ*—জড় সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির একটি প্রকাশ। জড় উপাদানগুলি (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) হচ্ছে ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি এবং জীব হচ্ছে তাঁর উৎকৃষ্ট শক্তি। যেহেতু ভগবানের শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ প্রকাশ। সূর্যরশ্মি, সূর্যালোক ও তাপ সূর্য থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সূর্য নয়, তারা হচ্ছে সূর্যের বিভিন্ন শক্তি। তেমনই, জড় সৃষ্টি ও জীব হচ্ছে ভগবানের শক্তি এবং তারা ভগবানের থেকে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। তাই ভগবান বলেছেন, "আমিই সব," কারণ সব কিছুই তাঁর শক্তি এবং তাই তাঁর থেকে অভিন্ন।

যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার পর একমাত্র ভগবানই বর্তমান থাকেন। চিৎ-জগতের কখনও বিনাশ হয় না। তা ভগবানের অন্তরঙ্গা

শক্তিসম্ভূত এবং নিত্য। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকাশ বা জড় জগতের লয় হয়ে যাওয়ার পরেও গোলোক বৃন্দাবন ও বৈকুণ্ঠলোকসমূহে ভগবানের চিন্ময় লীলাবিলাস অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। তা কালের দ্বারা প্রতিহত হয় না, কেন না চিৎ-জগতে কালের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৬) বলা হয়েছে, *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*—"যেখানে একবার গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না, সেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ধাম।"

শ্লোক ৫৪

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৫৪ ॥

ঋতে—ব্যতীত; **অর্থম্**—অর্থ; **যৎ**—যা; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **ন**—না; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **চ**—অবশ্যই; **আত্মনি**—আমার সম্পর্কে সম্পর্কিত; **তৎ**—সেই; **বিদ্যাৎ**—তোমার অবশ্যই জানা উচিত; **আত্মনঃ**—আমার; **মায়াম্**—মায়াশক্তি; **যথা**—ঠিক যেমন; **আভাসঃ**—আভাস; **যথা**—ঠিক যেমন; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

"আমি ব্যতীত যা কিছু সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, তা হচ্ছে আমার মায়াশক্তি, কেন না আমি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এটি ঠিক অন্ধকারে প্রকৃত আলোকের প্রতিফলনের মতো, কেন না আলোকে ছায়াও নেই, প্রতিফলনও নেই।

তাৎপর্য

পূর্বের শ্লোকটিতে পরমতত্ত্ব এবং তাঁর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরম সত্যকে যথাযথভাবে জানতে হলে আপেক্ষিক সত্যকেও জানতে হবে। আপেক্ষিক সত্য, যাকে মায়া বা জড়া প্রকৃতি বলা হয়, তার বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে। মায়ার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। যারা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন, তারাই মায়ার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, এই সমস্ত কার্যকলাপের পিছনে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনা। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অধ্যক্ষতায় কার্যকরী হচ্ছে এবং স্থাবর ও জঙ্গম বস্তুসমূহ সৃষ্টি করছে।

মায়ার প্রকৃত রূপ অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির মোহময়ী প্রকাশের কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। পরমতত্ত্ব হচ্ছেন বাস্তব বস্তু এবং আপেক্ষিক সত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে পরমতত্ত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের উপর। *মায়ার* অর্থ হচ্ছে শক্তি; তাই আপেক্ষিক সত্যকে পরমতত্ত্বের শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়। যেহেতু পরমতত্ত্ব ও আপেক্ষিক সত্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, তাই তা সরলভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। পরমতত্ত্ব হচ্ছেন অনেকটা সূর্যের মতো, যার উপর নির্ভর করে দুটি

আপেক্ষিক সত্য—অন্ধকার ও প্রতিফলন। অন্ধকার হচ্ছে সূর্যালোকের অনুপস্থিতি এবং প্রতিফলন হচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে সূর্যালোকের প্রকাশ। অন্ধকার অথবা প্রতিফলন—এই দুয়েরই কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সূর্যের আলোক যখন প্রতিহত হয়, তখন অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। যেমন, কেউ যখন সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, তখন অন্ধকার থাকে তার পশ্চাৎ ভাগে। যেহেতু সূর্যের অনুপস্থিতিতে অন্ধকারের উদয় হয়, তাই তা সূর্যের উপর নির্ভরশীল আপেক্ষিক সত্য। চিৎ-জগৎকে প্রকৃত সূর্যরশ্মির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর জড় জগৎকে সূর্যালোকবিহীন অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

জড় জগৎকে যে খুব সুন্দর বলে মনে হয়, তার কারণ হচ্ছে, তা সূর্যালোকের মতো উজ্জ্বল পরমতত্ত্বের বিকৃত প্রতিফলন। *বেদান্তসূত্রে* এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। এখানে যা কিছু দেখা যায়, তার বাস্তব বস্তু রয়েছে পরমে। অন্ধকার যেমন সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত, তেমনই জড় জগৎও চিৎ-জগৎ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। বৈদিক শাস্ত্র আমাদের নির্দেশ প্রদান করে যে, আমরা যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন (*তমঃ*) রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পরমতত্ত্বের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রাজ্যে (*যোগীধামে*) উন্নীত হই।

চিৎ-জগৎ উজ্জ্বল জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত, কিন্তু জড় জগৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেহেতু জড় জগৎ হচ্ছে অন্ধকারময়, তাই অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য সূর্যের রশ্মি, চন্দ্রের কিরণ বা অন্যান্য বিভিন্ন রকমের কৃত্রিম আলোকের প্রয়োজন হয়। তাই, পরমেশ্বর ভগবান সূর্যরশ্মি বা চন্দ্রকিরণের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর ধামে এই ধরনের কোন সূর্যরশ্মি, চন্দ্রকিরণ বা কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না, কারণ সেই ধাম স্ব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

যা আপেক্ষিক, অনিত্য এবং পরমতত্ত্ব থেকে বহু দূরে অবস্থিত, তাকে বলা হয় মায়া বা অজ্ঞান। এই মায়া দুভাবে প্রকাশিত হয়, যা *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত হয়েছে। নিকৃষ্ট স্তরের মায়া হচ্ছে জড় পদার্থ এবং উৎকৃষ্ট স্তরের মায়া হচ্ছে জীব। এখানে জীবকে মায়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তারা জড় জগতের মোহাচ্ছন্ন পরিকাঠামোয় বা কার্যকলাপে বিজড়িত হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীব মায়া নয়, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানের উৎকৃষ্ট শক্তির অংশ এবং তারা যদি না চায়, তা হলে তাদের মায়াচ্ছন্ন হতে হয় না। চিন্ময় রাজ্যে জীবের কার্যকলাপ মায়াচ্ছন্ন নয়, তা হচ্ছে মুক্ত আত্মাদের প্রকৃত ও নিত্য কার্যকলাপ।

শ্লোক ৫৫

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু ।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৫৫ ॥

যথা—যেমন; **মহান্তি**—মহা; **ভূতানি**—ভূতসমূহ; **ভূতেষু**—প্রাণীসমূহে; **উচ্চ-অবচেষু**—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয়; **অনু**—পরবর্তী; **প্রবিষ্টানি**—ভিতরে প্রবিষ্ট বা অন্তঃস্থিত; **অপ্রবিষ্টানি**—বাইরে প্রবিষ্ট বা বহিঃস্থিত; **তথা**—তেমনই; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **ন**—না; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

"মহাভূতসমূহ যেমন সমস্ত প্রাণীর ভিতরে প্রবিষ্ট হয়েও বাইরে অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্তমান থাকে, তেমনই আমি সমস্ত জড় সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েও তার মধ্যে অবস্থিত নই।

তাৎপর্য

স্থূল জড় উপাদানগুলি (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) সূক্ষ্ম জড় উপাদানগুলির (মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) সঙ্গে মিলিত হয়ে এই জড় জগতের দেহসমূহ সৃষ্টি করে, কিন্তু তা হলেও এই উপাদানগুলি এই দেহগুলির থেকে স্বতন্ত্র। যে কোন জড় পরিকাঠামো জড় উপাদানগুলির বিভিন্ন মাত্রার সমন্বয় মাত্র। এই উপাদানগুলি দেহের ভিতরে ও বাইরে উভয় স্থানেই রয়েছে। যেমন, আকাশ যদিও অন্তরীক্ষে অবস্থিত, কিন্তু তবুও তা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। তেমনই, সমস্ত জড় শক্তির পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের ভিতরে ও বাইরে বিরাজ করেন। এই জড় জগতে তাঁর উপস্থিতি ব্যতীত সৃষ্টির বিকাশ সম্ভব নয়, ঠিক যেমন আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত দেহের বিকাশ সম্ভব নয়। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে সমস্ত জড় সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হন, তাই এই জড় সৃষ্টির অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সর্বব্যাপক পরমাত্মা রূপে মহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সমস্ত সত্তার মধ্যেই প্রবিষ্ট হন। যাঁরা বিনয়ের মহৎ গুণের দ্বারা ভূষিত এবং তার ফলে ভগবানের শরণাগত, তাঁরাই সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। শরণাগতির মাত্রা অনুসারে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধ হয় এবং তার ফলে চরমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা যায়, ঠিক যেমন দুজন মানুষের মধ্যে পরস্পর মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হয়।

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দিব্য আসক্তির বিকাশ হওয়ার ফলে শরণাগত জীব সর্বত্রই তাঁর প্রিয়জনের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন এবং তখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় দিব্য বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শনে যুক্ত হয়, তাঁর নাসিকা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সৌরভ গ্রহণে মগ্ন হয়, তাঁর কর্ণদ্বয় বৈকুণ্ঠের বাণী শ্রবণে মগ্ন হয় এবং তাঁর হস্তদ্বয় পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদদের চরণকমল আলিঙ্গনে নিযুক্ত হয়। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের অন্তরে ও বাইরে প্রকাশিত হন। এটি ভগবদ্ভক্তির অন্যতম একটি রহস্য, যার মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবান স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই প্রেম লাভ করাই প্রতিটি জীবের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

শ্লোক ৫৬

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা ॥ ৫৬ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **এব**—অবশ্যই; **জিজ্ঞাস্যম্**—জিজ্ঞাস্য; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্বের; **জিজ্ঞাসুনা**—জিজ্ঞাসুর দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অন্বয়**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্যতিরেকা-ভ্যাম্**—ও পরোক্ষভাবে; **যৎ**—যা; **স্যাৎ**—বিদ্যমান থাকে; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্বদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

"তত্ত্বজ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে সেই জন্য সর্বব্যাপ্ত সত্যকে জানার জন্য সর্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুসন্ধান করতে হবে।"

তাৎপর্য

যারা জড় জগতের অতীত চিন্ময় জগতের জ্ঞান লাভে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানার জন্য অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে। সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে উভয় পন্থাই শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং সেই পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক রয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধেও অবগত হতে হয়। সদ্‌গুরু জানেন কিভাবে নব্য দীক্ষিত শিষ্যের অভ্যাস ও প্রবণতাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তাই, নিষ্ঠাবান শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে সেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করা।

উন্নতির বিভিন্ন মান ও স্তর রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে সাধারণত মানুষ যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তা হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের সুখ, কেন না তা জড় দেহভিত্তিক। এই ধরনের সকাম কর্মীরা সব চাইতে উন্নত দৈহিক সুখ লাভ করতে পারে পুণ্যকর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার মাধ্যমে, যা হচ্ছে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদের রাজ্য। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দের সুখের তুলনায় এই স্বর্গসুখ অত্যন্ত নগণ্য; আর এই ব্রহ্মানন্দ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপলব্ধির আনন্দ ভগবৎ-প্রেমানন্দরূপী সমুদ্রের কাছে গোষ্পদে সঞ্চিত জলের মতো। কেউ যখন ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমভক্তির বিকাশ সাধন করে, তখন সে পরম পুরুষ ভগবানের সঙ্গ লাভের ফলে অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্র লাভ করে। এই স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করাই হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা।

প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য একটি টিকিট খরিদ করা। আর এই টিকিটের মূল্য হচ্ছে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুল বাসনা, যা সহজে জাগরিত হয় না, এমন কি বহু জন্মের পুণ্যকর্মের ফলেও নয়। জড়-জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধ কালের প্রভাবে একদিন অবশ্যই ছিন্ন হবে, কিন্তু কেউ যখন একটি বিশেষ রসের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেই সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় না, এমন কি জড় জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও নয়।

সদ্‌গুরুর মাধ্যমে আমাদের জানতে চেষ্টা করা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় প্রকৃতিতে সর্বত্র বিরাজমান এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বত্রই বর্তমান, এমন কি এই জড় জগতেও। চিৎ-জগতে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচ রকমের সম্পর্ক বর্তমান। এই

সমস্ত রসের বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগতে দেখা যায়। জমি, গৃহ, আসবাবপত্র এবং অন্য সমস্ত স্থাবর বস্তুসমূহ শান্তরসে সম্পর্কিত। তেমনই, ভৃত্য তাঁর সেবা করে দাস্যরসে সম্পর্কিত হয়। বন্ধুত্বের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে বলা হয় সখ্যরস। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে স্নেহ, তাকে বাৎসল্য রস বলা হয় এবং প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যে প্রেম বিনিময় হয়, তাকে বলা হয় মাধুর্য রস। জড় জগতে যে এই পাঁচটি সম্পর্ক দেখা যায়, তা প্রকৃত বিশুদ্ধ রসের বিকৃত প্রতিফলন। সেই বিশুদ্ধ রস উপলব্ধি করতে হয় সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেই সমস্ত রসে সম্পর্কিত হওয়ার মাধ্যমে। জড় জগতের বিকৃত রসগুলি নৈরাশ্য আনে। কিন্তু সেই রসগুলির মাধ্যমে যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তার ফলে নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে উদ্ধৃত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এই শ্লোকটি এবং তার পূর্ববর্তী তিনটি শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য লীলাবিলাসের যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* আঠারো হাজার শ্লোক রয়েছে এবং সেই আঠারো হাজার শ্লোকের সারাংশ হচ্ছে *অহমেবাসমেবাগ্রে* (৫৩) থেকে শুরু করে *যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা* (৫৬) পর্যন্ত এই চারটি শ্লোক। এই শ্লোকগুলির প্রথমটিতে (৫৩) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে (৫৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান জড়া প্রকৃতি বা মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। জীবসমূহ যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তবুও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে; তাই যদিও তারা চিন্ময়, তবুও এই জড় জগতে তারা জড়া প্রকৃতি প্রদত্ত জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে (৫৫) বর্ণিত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে জীব ও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। এই জ্ঞানকে বলা হয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। স্বতন্ত্র জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার স্বাভাবিক দিব্য প্রেম বিকশিত হয়। এই শরণাগতির পন্থাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পরবর্তী শ্লোকে (৫৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বদ্ধ জীবকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়ে যথাযথভাবে জড় ও চিন্ময় জগতের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। *অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্,* অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের ভগবদ্ভক্তির পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে দুভাবেই—প্রত্যক্ষভাবে সাধন-ভক্তির অনুশীলন করতে হবে এবং পরোক্ষভাবে ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে প্রতিবন্ধকগুলি পরিহার করতে হবে।

শ্লোক ৫৭

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ ।

যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ৫৭ ॥

চিন্তামণিঃ জয়তি—চিন্তামণির জয় হোক; **সোমগিরিঃ**—সোমগিরি (দীক্ষাগুরু); **গুরুঃ**—শ্রীগুরুদেব; **মে**—আমার; **শিক্ষাগুরুঃ**—শিক্ষাগুরু; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শিখি-পিঞ্ছ**—ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা; **মৌলিঃ**—যাঁর মস্তক শোভাযুক্ত; **যৎ**—যাঁর; **পাদ**—শ্রীপাদপদ্মের; **কল্পতরু**—কল্পতরুর; **পল্লব**—পল্লবের মতো; **শেখরেষু**—শ্রীচরণ-নখাগ্রে; **লীলা-স্বয়ম্বর**—মাধুর্যলীলার; **রসম্**—রস; **লভতে**—লাভ করেন; **জয়-শ্রীঃ**—শ্রীমতী রাধারাণী।

অনুবাদ

"চিন্তামণি ও আমার দীক্ষাগুরু সোমগিরি জয়যুক্ত হোন। মাথায় ময়ূরপুচ্ছধারী আমার শিক্ষাগুরু পরমেশ্বর ভগবান জয়যুক্ত হোন। কল্পতরুর পল্লবরূপ তাঁর শ্রীচরণ-নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হয়ে জয়শ্রী (শ্রীরাধিকা) স্বয়ম্বর সুখ (মাধুর্য রস) আস্বাদন করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি মহান বৈষ্ণব আচার্য শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত *কৃষ্ণকর্ণামৃত* নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর লীলাশুক নামেও পরিচিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করার ঐকান্তিক বাসনা করেছিলেন। তিনি বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে সাতশ বছর অবস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ড নামক এই পুষ্করিণীটি এখনও বর্তমান আছে। *শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়* নামক গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবন-চরিত পাওয়া যায়। অষ্টম শকাব্দে দ্রবিড় প্রদেশে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি ছিলেন বিষ্ণু স্বামীর প্রধান শিষ্য। দ্বারকায় শঙ্করাচার্যের মঠ-মন্দিরের তালিকায় দ্বারকাধীশ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর আরাধ্য শ্রীবিগ্রহের সেবার ভার হরি ব্রহ্মচারী নামক বল্লভ ভট্টের এক শিষ্যের উপর ন্যস্ত করে যান।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেছিলেন। *কৃষ্ণকর্ণামৃত* নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর অপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি তাঁর বিভিন্ন গুরুবর্গের উদ্দেশ্যে প্রণতি নিবেদন করেছেন এবং এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যেই সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তিনি চিন্তামণিকে তাঁর প্রথম গুরুরূপে উল্লেখ করেছেন, যিনি ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। কারণ তিনিই তাঁকে প্রথম পারমার্থিক পথ প্রদর্শন করেন। চিন্তামণি ছিলেন একজন ব্যভিচারিণী, যাঁর প্রতি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর প্রথম জীবনে আসক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম তাঁকে ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে প্রেরণা দেন এবং যেহেতু তিনি তাঁকে জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেন, তাই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রথমে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তারপর তিনি তাঁর দীক্ষাগুরু সোমগিরিকে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকেও তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখানে বিশেষভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়। কারণ বৃন্দাবনে গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন এবং তাঁকে দুধ দিয়ে যেতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, জয়শ্রী শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করে অপ্রাকৃত মাধুর্য রস আস্বাদন করেন। *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থটি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সর্বোচ্চ স্তরের কৃষ্ণভক্তেরাই কেবল এই গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ৫৮

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে ।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায় না, তাই তিনি নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্তরূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন। এই গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্ন বিগ্রহ।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হয়ে সচেতনতার সঙ্গে ভগবৎ-সেবা সম্পাদন করে, তা হলে ভগবান তার প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করে একজন শিক্ষাগুরুকে প্রেরণ করেন এবং তার হৃদয়ের সুপ্ত ভগবদ্ভক্তিকে জাগরিত করেন। গুরুদেব সেই ভাগ্যবান বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন এবং সেই সঙ্গে চৈত্যগুরু রূপে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তর থেকে তাকে পথ প্রদর্শন করেন। চৈত্যগুরু রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৫৯

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ৫৯ ॥

ততঃ—সুতরাং; **দুঃসঙ্গম্**—অসৎসঙ্গ; **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **সৎসু**—ভক্তদের সঙ্গে; **সজ্জেত**—সঙ্গ করা উচিত; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **সন্তঃ**—ভগবদ্ভক্তেরা; **এব**—অবশ্যই; **অস্য**—একজনের; **ছিন্দন্তি**—ছেদন করেন; **মনঃ-ব্যাসঙ্গম্**—বিরুদ্ধ আসক্তি; **উক্তিভিঃ**—তাঁদের উপদেশের দ্বারা।

অনুবাদ

"অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে সৎসঙ্গ করবেন। সেই মহাপুরুষেরাই সৎ উপদেশ প্রদান করে ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত বাসনা-বন্ধন ছেদন করবেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/২৬/২৬) থেকে উদ্ধৃত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* উদ্ধব-গীতা নামক অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। স্বর্গের নর্তকী উর্বশী ও পুরূরবার কথা প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে। উর্বশী যখন পুরূরবাকে ছেড়ে চলে যায়, পুরূরবা তখন অত্যন্ত বিরহকাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু পরে বিবেক লাভ হলে সঙ্গদোষের ফল উপলব্ধি করেন এবং এভাবেই মানসিক দুর্বলতা জয় করতে সক্ষম হন।

এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হলে সর্বদা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে পারমার্থিক জ্ঞানদানে সক্ষম সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গ করা উচিত। এই ধরনের তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত সৎ উপদেশাবলী হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করে জন্ম-জন্মান্তরের অসৎ সঙ্গজনিত কলুষ দূর করতে পারে। অনুন্নত ভক্তদের পক্ষে দুই রকমের সঙ্গ বিশেষভাবে পরিত্যজ্য—১) নিরন্তর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টায় রত ঘোর বিষয়ী বা জড়বাদীর সঙ্গ এবং ২) ইন্দ্রিয় ও মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরিচালিত ভগবৎ-সেবাবিমুখ অভক্ত। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাদের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই ধরনের অসৎসঙ্গ বর্জন করে চলা উচিত।

শ্লোক ৬০

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

সতাম্—ভগবদ্ভক্তদের; **প্রসঙ্গাৎ**—ঘনিষ্ঠ সঙ্গের প্রভাবে; **মম**—আমার; **বীর্য-সংবিদঃ**—জ্ঞানপূর্ণ আলোচনা; **ভবন্তি**—হয়; **হৃৎ**—হৃদয়ের; **কর্ণ**—এবং কর্ণের; **রসায়নাঃ**—তৃপ্তিজনক; **কথাঃ**—কথা; **তৎ-জোষণাৎ**—সেই কথার অনুশীলন থেকে; **আশু**—শীঘ্র; **অপবর্গ**—মুক্তির; **বর্ত্মনি**—পথস্বরূপ; **শ্রদ্ধা**—শ্রদ্ধা; **রতিঃ**—অনুরাগ; **ভক্তিঃ**—প্রেমভক্তি; **অনুক্রমিষ্যতি**—ক্রমে ক্রমে উদিত হয়।

অনুবাদ

"পারমার্থিক মহিমামণ্ডিত ভগবানের কথা ভক্তসঙ্গেই কেবল যথাযথভাবে আলোচনা করা যায় এবং সেই কথা শ্রবণে হৃদয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। ভক্তসঙ্গে সেই বাণী প্রীতিপূর্বক শ্রবণ করতে করতে শীঘ্রই মুক্তির বর্ত্মস্বরূপ আমার প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উদিত হয়।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (৩/২৫/২৫) এই শ্লোকটিতে ভগবান কপিলদেব ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তাঁর মাতা দেবহূতির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ভগবদ্ভক্তির মার্গে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, সেই পন্থা ততই স্বচ্ছ ও উৎসাহোদ্দীপক হয়। গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে এই পারমার্থিক

অনুপ্রেরণা লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই সদ্গুরুর নির্দেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠার প্রগাঢ়তা অনুসারে ভক্তের ভগবদ্ভক্তির স্তর নিরূপণ করা যায়। সর্বপ্রথমে সদ্গুরুর কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তারপর যতই সে ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গ করে এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, ততই তার অনর্থ ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকগুলি দূর হয়ে যায়। ভগবানের বাণী শ্রবণ করার ফলে তার চিত্তে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মায়। সে যদি নিষ্ঠা সহকারে সেই পথে অগ্রসর হতে থাকে, তা হলে অবশ্যই সে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম লাভ করবে।

শ্লোক ৬১

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান ।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবানেরই স্বরূপ এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তাই তিনি সর্ব শক্তিমান। তাঁর শক্তি অচিন্ত্য ও অনন্ত, তবে তাদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে মুখ্য। ভক্তকে এই সমস্ত শক্তির একটি বলে বিবেচনা করা হয়, ভক্ত কখনও শক্তিমান তত্ত্ব নন। সর্ব অবস্থাতেই শক্তিমান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর শক্তিগুলি নিত্য সেবার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত। বদ্ধ অবস্থায় জীব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেবের কৃপার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তার সেবাপ্রবৃত্তি বিকশিত করতে পারে। তখন ভগবান তার হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন এবং সে তখন জানতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়েই বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়েই বিরাজ করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তই কেবল তা উপলব্ধি করতে পারেন।

শ্লোক ৬২

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৬২ ॥

সাধবঃ—মহাত্মাগণ; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **মহ্যম্**—আমার; **সাধূনাম্**—মহাত্মাদের; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **তু**—বাস্তবিকই; **অহম্**—আমি; **মৎ**—আমাকে ছাড়া; **অন্যৎ**—অন্য কাউকে; **তে**—তাঁরা; **ন**—না; **জানন্তি**—জানেন; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **তেভ্যঃ**—তাঁদের ছাড়া; **মনাক্**—অল্প মাত্রায়; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

"সাধু-মহাত্মারা আমার হৃদয় এবং আমিও তাঁদের হৃদয়। তাঁরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানেন না এবং আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে আমার বলে জানি না।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/৬৮) দুর্বাসা মুনি ও মহারাজ অম্বরীষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ঘটনায় এই শ্লোকটির উল্লেখ হয়েছে। এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে দুর্বাসা মুনি অম্বরীষ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তখন ভগবানের ভক্ত অম্বরীষ মহারাজকে রক্ষা করার জন্য সেখানে ভগবানের দিব্য অস্ত্র সুদর্শন চক্রের আবির্ভাব হয়। সুদর্শন চক্র যখন দুর্বাসা মুনিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন ভয়ে দুর্বাসা মুনি পালিয়ে গিয়ে স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিলেন না এবং তাই অবশেষে দুর্বাসা মুনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শ্রীবিষ্ণু তখন তাঁকে উপদেশ দেন যে, যেহেতু তাঁর ভক্তের চরণে তিনি অপরাধ করেছেন, তাই তিনি যদি তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে চান, তা হলে তা তাঁকে করতে হবে অম্বরীষ মহারাজের কাছে। ভক্তের চরণে অপরাধ হলে ভগবানও তা খণ্ডন করতে পারেন না। সেই প্রসঙ্গে ভগবান এই শ্লোকটি উল্লেখ করেন।

ভগবান পূর্ণ এবং সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত, তাই তিনি সর্বান্তঃকরণে তাঁর ভক্তদের পালন করতে পারেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কিভাবে তিনি তাঁর চরণে সমর্পিতাত্মা ভক্তদের রক্ষা করবেন এবং ভক্তিমার্গে তাদের উন্নতি বিধান করবেন। শ্রীগুরুদেবের উপরেও এই দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে। সদ্‌গুরুর একমাত্র চিন্তা হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে কিভাবে তিনি তাঁর চরণে সমর্পিতাত্মা ভক্তদের ভক্তিমার্গে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সমর্পিতাত্মা যে সমস্ত ভক্ত তাঁকে জানতে সর্বদা উদ্‌গ্রীব, তিনি তাঁদের সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন।

শ্লোক ৬৩

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো ।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৬৩ ॥

ভবৎ—আপনার; **বিধাঃ**—মতো; **ভাগবতাঃ**—ভগবদ্ভক্তগণ; **তীর্থ**—তীর্থসমূহ; **ভূতাঃ**—অবস্থিত; **স্বয়ম্**—নিজেরাই; **বিভো**—হে সর্ব শক্তিমান; **তীর্থীকুর্বন্তী**—তীর্থে পরিণত করেন; **তীর্থানি**—তীর্থসমূহকে; **স্বান্তঃস্থেন**—তাঁদের স্বীয় হৃদয়স্থিত; **গদাভৃতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা।

অনুবাদ

"আপনার মতো ভাগবতেরা নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। তাঁদের পবিত্রতার জন্য ভগবান সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাই তাঁরা পাপীগণের পাপ দ্বারা মলিন তীর্থস্থানগুলিকে পবিত্র করেন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৩/১০) মহারাজ যুধিষ্ঠির কথা প্রসঙ্গে বিদুরকে এই শ্লোকটি বলেন। বহুকাল তীর্থপর্যটন করার পর বিদুর যখন হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর মহাত্মা খুল্লতাতকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এই কথাগুলি বলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলেন যে, তাঁর মতো শুদ্ধ ভক্তরা নিজেরাই তীর্থস্থানগুলির মূর্ত প্রকাশ, কারণ পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান। তাঁদের সঙ্গপ্রভাবে পাপীরা পাপমুক্ত হয় এবং তাই শুদ্ধ ভক্তরা যেখানেই যান, সেই স্থানই তীর্থে পরিণত হয়। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের উপস্থিতির জন্যই তীর্থস্থানগুলি এত মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ৬৪

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার ।
পারিষদ্‌গণ এক, সাধকগণ আর ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

দুই শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন—ভগবানের নিত্য পার্ষদ ও সাধক ভক্ত।

তাৎপর্য

নিত্যমুক্ত ভগবৎ-সেবকেরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ এবং জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির চেষ্টা করছেন যে সমস্ত ভক্ত, তাঁদের বলা হয় সাধক। পার্ষদদের মধ্যে কেউ কেউ ভগবানের ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং অন্যরা ভগবানের মাধুর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন। ভগবানের ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট ভক্তরা সম্ভ্রম সহকারে ভগবানের সেবা করার জন্য বৈকুণ্ঠলোকে স্থান লাভ করেন, আর মাধুর্যপর ভক্তরা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য বৃন্দাবনে স্থান লাভ করেন।

শ্লোক ৬৫-৬৬

ঈশ্বরের অবতার এ-তিন প্রকার ।
অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার ॥ ৬৫ ॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার—তৃতীয় এমত ।
অংশ-অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের অবতার তিন প্রকার—অংশ-অবতার, গুণ-অবতার ও শক্ত্যাবেশ-অবতার। পুরুষ-অবতার ও মৎস্য আদি অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ-অবতারের দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৬৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতারে গণি ।
শক্ত্যাবেশ—সনকাদি, পৃথু, ব্যাসমুনি ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হচ্ছেন ভগবানের গুণ-অবতার। আর শক্ত্যাবেশ-অবতার হচ্ছেন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার—এই চতুঃসন, পৃথু মহারাজ ও মহামুনি ব্যাসদেব।

শ্লোক ৬৮

দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ ।
একে ত' প্রকাশ হয়, আরে ত' বিলাস ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন দুই রূপে—প্রকাশ ও বিলাস।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সবিশেষ রূপকে *প্রকাশ* ও *বিলাস* নামক দুটি ভিন্ন রূপে প্রকট করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসের জন্য তাঁর *প্রকাশ-বিগ্রহদের* প্রকট করেন এবং তাঁদের রূপ ঠিক তাঁরই মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ষোল হাজার *প্রকাশ-বিগ্রহে* নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তেমনই, রাসনৃত্যের সময়ে প্রতিটি গোপিকার সঙ্গে যুগপৎভাবে নৃত্য করার জন্য তিনি নিজেকে তাঁর *প্রকাশ-বিগ্রহে* বিস্তার করেছিলেন। ভগবান যখন *বিলাস* রূপে নিজেকে বিস্তার করেন, তখন তাঁদের আকৃতির মধ্যে কিছু না কিছু ভেদ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীবলরাম হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম *বিলাস-বিগ্রহ* এবং বৈকুণ্ঠলোকে চতুর্ভুজ নারায়ণ প্রকাশিত হন বলরাম থেকে। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের রূপের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই, কেবল তাঁদের গায়ের রঙ ভিন্ন। তেমনই, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ চতুর্ভুজ, আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ। ভগবানের যে সমস্ত প্রকাশে এই রকম দৈহিক পার্থক্য থাকে, সেই সমস্ত প্রকাশকে বলা হয় ভগবানের *বিলাস-বিগ্রহ।*

শ্লোক ৬৯-৭০

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ ।
আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥
মহিষী-বিবাহে, যৈছে যৈছে কৈল রাস ।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য 'প্রকাশ' ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান যখন অভিন্ন রূপে নিজেকে বহুভাবে প্রকাশ করেন, তখন সেই সমস্ত রূপকে বলা হয় প্রকাশ-বিগ্রহ। যেমন, ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করার সময়ে এবং রাসনৃত্যের সময়ে তিনি নিজেকে একই রূপে বহুগুণে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ৭১

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৭১ ॥

চিত্রম্—আশ্চর্যজনক; **বত**—আহা; **এতৎ**—এই; **একেন**—এক; **বপুষা**—রূপ; **যুগপৎ**—যুগপৎ; **পৃথক্**—পৃথক; **গৃহেষু**—গৃহে; **দ্বি-অষ্ট-সাহস্রম্**—ষোল হাজার; **স্ত্রিয়ঃ**—মহিষীকে; **একঃ**—এক শ্রীকৃষ্ণ; **উদাবহৎ**—বিবাহ করেছিলেন।

অনুবাদ

"এটি পরম আশ্চর্যজনক যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ষোল হাজার একই রূপে প্রকাশ করে ষোল হাজার মহিষীকে তাঁদের নিজ নিজ প্রাসাদে বিবাহ করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৬৯/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭২

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৭২ ॥

রাস-উৎসবঃ—রাসনৃত্যের উৎসব; **সংপ্রবৃত্তঃ**—শুরু হয়েছিল; **গোপীমণ্ডল**—গোপীমণ্ডলের দ্বারা; **মণ্ডিতঃ**—পরিশোভিত হয়ে; **যোগ-ঈশ্বরেণ**—যোগেশ্বর; **কৃষ্ণেন**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **তাসাম্**—তাঁদের; **মধ্যে**—মধ্যে; **দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ**—প্রতি দুজনের।

অনুবাদ

"যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তি বলে প্রতি দুজন গোপিকার মধ্যে তাঁর এক-একটি মূর্তি প্রকাশ করে গোপীমণ্ডল পরিশোভিত হয়ে রাসোৎসবে নৃত্য করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৩/৩) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৭৩-৭৪

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥ ৭৩ ॥
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্ ।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

প্রবিষ্টেন—প্রবিষ্ট হয়ে; **গৃহীতানাম্**—যাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিলেন; **কণ্ঠে**—কণ্ঠে; **স্ব-নিকটম্**—সন্নিকটে; **স্ত্রিয়ঃ**—ব্রজগোপিকারা; **যম্**—যাঁকে; **মন্যেরন্**—মনে করতেন; **নভঃ**

—আকাশ; তাবৎ—তৎক্ষণাৎ; বিমান—বিমানে; শত—শত শত; সঙ্কুলম্—সমবেত হয়েছিলেন; দিব-ওকসাম্—দেবতাদের; স-দারাণাম্—তাঁদের পত্নীদের সঙ্গে; অত্যৌৎসুক্য—ঔৎসুক্য সহকারে; ভৃত-আত্মনাম্—পরিপূর্ণ হৃদয়ে; ততঃ—তখন; দুন্দুভয়ঃ—দুন্দুভি; নেদুঃ—ধ্বনিত হয়েছিল; নিপেতুঃ—বর্ষিত হয়েছিল; পুষ্প-বৃষ্টয়ঃ—পুষ্পবৃষ্টি।

অনুবাদ

"এভাবেই যখন গোপিকারা ও শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্যে মিলিত হয়েছিলেন, তখন প্রতিটি গোপিকা অনুভব করেছিলেন যে, গভীর অনুরাগে কণ্ঠ ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ যেন কেবল তাঁকেই আলিঙ্গন করছেন। ভগবানের এই অতি অদ্ভুত লীলা দর্শন করার জন্য স্বর্গের দেবতারা সস্ত্রীক শত শত বিমানে করে গভীর ঔৎসুক্য সহকারে গগনপথে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর স্বরে দুন্দুভি বাদ্য বাজিয়েছিলেন।"

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোকও *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৩/৪-৫) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৭৫

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা ।
সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্যতে ॥ ৭৫ ॥

অনেকত্র—বহু স্থানে; প্রকটতা—প্রকাশ; রূপস্য—রূপের; একস্য—এক; যা—যা; একদা—কোন এক সময়ে; সর্বথা—সর্বতোভাবে; তৎ—তাঁর; স্বরূপ—স্বরূপ; এব—অবশ্যই; সঃ—সেই; প্রকাশঃ—প্রকাশিত রূপ; ইতি—এভাবেই; ঈর্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

"একই রূপের অসংখ্য বিগ্রহ যখন অভিন্নভাবে একই সময়ে প্রকাশিত হয়, তখন ভগবানের সেই প্রকাশকে বলা হয় প্রকাশ-বিগ্রহ।"

তাৎপর্য

এটি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ রচিত *লঘুভাগবতামৃত* (১/২১) থেকে উদ্ধৃত একটি শ্লোক।

শ্লোক ৭৬

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন ।
অনেক প্রকাশ হয়, 'বিলাস' তার নাম ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

একই বিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অসংখ্য রূপের পরস্পরের মধ্যে যখন অল্প পার্থক্য থাকে, তখন তাঁদের বলা হয় বিলাস-বিগ্রহ।

শ্লোক ৭৭

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৭৭ ॥

স্বরূপম্—ভগবানের স্বরূপ; অন্য—অন্য; আকারম্—আকার; যৎ—যে; তস্য—তাঁর; ভাতি—প্রকাশ পায়; বিলাসতঃ—লীলাবশত; প্রায়েণ—প্রায়; আত্ম-সমম্—আত্মসম; শক্ত্যা—তাঁর শক্তির দ্বারা; সঃ—সেই; বিলাসঃ—বিলাস-বিগ্রহ; নিগদ্যতে—বলা হয়।

অনুবাদ

"ভগবানের স্বরূপ যখন তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে লীলাবশত আত্মসদৃশ-প্রায় অন্য বহু রূপে প্রকটিত হন, তখন তাঁদের বলা হয় বিলাস-বিগ্রহ।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও *লঘুভাগবতামৃত* (১/১৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৮

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই ধরনের বিলাস-বিগ্রহের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বলদেব, বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ এবং চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

শ্লোক ৭৯-৮০

ঈশ্বরের শক্তি হয় এ-তিন প্রকার ।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৯ ॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবেতে প্রধান ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি (লীলাসঙ্গিনী) তিন প্রকার—বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ এবং বৃন্দাবনে গোপিকাগণ। তাঁদের সকলের মধ্যে ব্রজ-গোপিকারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা, কেন না তাঁরা স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

শ্লোক ৮১

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ—তাঁর সম ।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদেরা হচ্ছেন তাঁর ভক্ত, যাঁরা তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবান তাঁর ভক্ত-পরিকর দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর বিভিন্ন স্বরূপ-প্রকাশ তাঁর থেকে অভিন্ন। এই স্বরূপ-প্রকাশসমূহ আবার নিজেদের বিস্তার করেন এবং তাঁরা হচ্ছেন তাঁদের পার্ষদ বা সেবক-প্রকাশ, যাঁদের বলা হয় ভক্ত।

শ্লোক ৮২

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন ।
এ-সবার বন্দন সর্বশুভের কারণ ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রম অনুসারে আমি সমস্ত ভক্তের বন্দনা করেছি। তাঁদের বন্দনা করা হলে সর্বতোভাবে মঙ্গল হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের বন্দনা করতে হলে প্রথমে তাঁর ভক্তবৃন্দের ও পার্ষদবৃন্দের বন্দনা করতে হয়।

শ্লোক ৮৩

প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথম শ্লোকে আমি সামান্য মঙ্গলাচরণ করেছি, কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকে আমি বিশেষভাবে ভগবানের বন্দনা করেছি।

শ্লোক ৮৪

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ৮৪ ॥

বন্দে—বন্দনা করি; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে; নিত্যানন্দৌ—এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে; সহ-উদিতৌ—একই সময়ে সমুদিত; গৌড়-উদয়ে—গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে; পুষ্পবন্তৌ—সূর্য ও চন্দ্র একত্রে; চিত্রৌ—বিস্ময়করভাবে; শন্দৌ—মঙ্গলপ্রদাতা; তমঃ-নুদৌ—অন্ধকারনাশক।

অনুবাদ

"গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে একই সময়ে অতি বিস্ময়করভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যাঁরা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গলপ্রদাতা এবং অজ্ঞান ও অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি।"

শ্লোক ৮৫-৮৬

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ-বলরাম ।
কোটি সূর্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥ ৮৫ ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয় ।
গৌড়দেশে পূর্ব-শৈলে করিলা উদয় ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, যাঁরা পূর্বে বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করেছিলেন এবং যাঁদের ধাম কোটি কোটি সূর্য এবং চন্দ্রের থেকেও উজ্জ্বল, তাঁরা এই জগতের প্রতি সদয় হয়ে গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছেন।

শ্লোক ৮৭

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব জগৎ আনন্দ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের ফলে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শ্লোক ৮৮-৮৯

সূর্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার ।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার ॥ ৮৮ ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান- ।
তমোনাশ করি' কৈল তত্ত্ববস্তু-দান ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

সূর্য ও চন্দ্র যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সব কিছুর যথার্থ রূপ প্রকাশ করে, তেমনই এই দুই ভাই জীবের অজ্ঞানতারূপী অন্ধকার দূর করে তাদের পরম তত্ত্বজ্ঞানের আলোক দান করেছেন।

শ্লোক ৯০

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

অজ্ঞানতার অন্ধকারকে বলা হয় কৈতব বা প্রতারণার পন্থা, যা শুরু হয় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদির মাধ্যমে।

শ্লোক ৯১

ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্‌।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯১ ॥

ধর্মঃ—ধর্ম; **প্রোজ্‌ঝিত**—সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে; **কৈতবঃ**—ভুক্তি-মুক্তি বাসনাযুক্ত; **অত্র**—এখানে; **পরমঃ**—সর্বোচ্চ; **নির্মৎসরাণাম্‌**—যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়েছে; **সতাম্‌**—ভক্তরা; **বেদ্যম্‌**—বোধগম্য; **বাস্তবম্‌**—বাস্তব; **অত্র**—এখানে; **বস্তু**—বস্তু; **শিবদম্‌**—পরম মঙ্গলময়; **তাপত্রয়**—ত্রিতাপ ক্লেশ; **উন্মূলনম্‌**—সমূলে উৎপাটিত করে; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **ভাগবতে**—ভাগবত পুরাণ; **মহামুনি**—মহামুনি (ব্যাসদেব); **কৃতে**—রচিত; **কিম্‌**—কি; **বা**—প্রয়োজন; **পরৈঃ**—অন্য কিছু; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **সদ্যঃ**—অবিলম্বে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **অবরুধ্যতে**—অবরুদ্ধ হয়; **অত্র**—এখানে; **কৃতিভিঃ**—সুকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **শুশ্রূষুভিঃ**—শ্রবণ করতে ইচ্ছুক; **তৎক্ষণাৎ**—অবিলম্বে।

অনুবাদ

"জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই ভাগবত পুরাণ পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে নির্মৎসর ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছেন পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়। মহামুনি বেদব্যাস (উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায়) এই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন এবং ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে এই গ্রন্থটিই যথেষ্ট। সুতরাং অন্য কোনও শাস্ত্রগ্রন্থের আর কি প্রয়োজন? কেউ যখন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ও একাগ্রতা সহকারে এই ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১/২) থেকে উদ্ধৃত। *মহামুনি-কৃতে* শব্দ দুটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* সংকলন করেছেন মহামুনি বেদব্যাস। যেহেতু তিনি

নারায়ণের অবতার, তাই তিনি নারায়ণ মহামুনি নামেও পরিচিত। তাই ব্যাসদের একজন সাধারণ মানুষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্তদের দিব্য লীলাবিলাস বর্ণনা করে তিনি এই *শ্রীমদ্ভাগবত* সংকলন করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ধর্ম ও কৈতব (ছল) ধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়েছে। *বেদান্তসূত্রের* এই মূল ভাষ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কতিপয় কপট ধর্ম রয়েছে, যেগুলিকে ধর্ম বলে প্রচার করা হয়, কিন্তু সেগুলি যথার্থ ধর্মের সমস্ত বিধি-নিষেধ ও মূল শিক্ষাকে অবহেলা করে। জীবের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু কৈতব ধর্মগুলি হচ্ছে এক ধরনের অজ্ঞানতা, যা কৃত্রিমভাবে জীবের শুদ্ধ চেতনাকে কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখে। মনের স্তরে এই কৃত্রিম ধর্ম যখন আধিপত্য বিস্তার করে, তখন প্রকৃত ধর্ম সুপ্ত থাকে। জীব নির্মল হৃদয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে তার এই সুপ্ত স্বাভাবিক ধর্মকে পুনর্জাগরিত করতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম বর্ণিত হয়েছে, তা সব রকমের অপূর্ণ ও কৈতব ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্মকে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১) সকাম কর্ম বা কর্মকাণ্ড, ২) জ্ঞান ও যোগের পন্থা বা জ্ঞানকাণ্ড এবং ৩) প্রেমময়ী সেবার দ্বারা ভগবানের আরাধনা বা উপাসনা-কাণ্ড।

কর্মকাণ্ড ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা অলঙ্কৃত হলেও তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব অবস্থার উন্নতি। এই পন্থাটি কপট বা প্রতারণাপূর্ণ, কারণ তা কখনই জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমার্থ প্রদান করতে পারে না। জীব জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে, কিন্তু কর্মকাণ্ড অনুশীলন করার মাধ্যমে সে কেবল জড় জগতের সাময়িক সুখ অথবা সাময়িক দুঃখই লাভ করে। পুণ্যকর্মের ফলে সে ক্ষণস্থায়ী জড় সুখ ভোগ করে এবং পাপকর্মের ফলে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তাই জড় জগতের সর্বোচ্চ সুখভোগের স্তরে অধিষ্ঠিত মানুষেরাও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, যা সকাম কর্মের তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা কখনই লাভ করতে পারে না।

জ্ঞান আহরণের পন্থা (জ্ঞানমার্গ) এবং যোগসিদ্ধির পন্থাও (যোগমার্গ) সমানভাবে বিপজ্জনক, কেন না এই অনিশ্চিত পন্থা অবলম্বন করে মানুষ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তা কেউ জানে না। জ্ঞানী বহু জন্ম-জন্মান্তরে পারমার্থিক জ্ঞানের অন্বেষণ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত না সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হচ্ছে, অর্থাৎ মনোধর্ম-প্রসূত প্রান্তিবিলাসের স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মতেই জানতে পারে না যে, সব কিছুই প্রকাশিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব থেকে। পরমেশ্বর ভগবানের নির্বিশেষ রূপের প্রতি তার আসক্তির ফলে, সে *বাসুদেব* উপলব্ধির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে না এবং তাই তার কলুষিত মনোবৃত্তি তাকে আবার জড় জগতে অধঃপতিত হতে বাধ্য করে, এমন কি মুক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়ার পরেও। ভগবানের

সেবারূপ পরম আশ্রয় লাভ করতে পারে না বলেই তাকে এভাবেই অধঃপতিত হতে হয়।

যোগীদের যোগসিদ্ধির পন্থাও পারমার্থিক উপলব্ধির পথে এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। একজন জার্মান পণ্ডিত, যিনি ভারতবর্ষে এসে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, জড় বিজ্ঞান ইতিমধ্যে যৌগিক সিদ্ধিগুলি আয়ত্ত করেছে। তাই তিনি ভারতবর্ষে যৌগিক সিদ্ধি লাভের পন্থা অনুশীলন করার জন্য আসেননি, পক্ষান্তরে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করার জন্যই তাঁর এদেশে আগমন। যোগসিদ্ধির প্রভাবে যোগী প্রভৃত শক্তি লাভ করে এবং তার ফলে সাময়িকভাবে সে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হতে পারে, যা আধুনিক বিজ্ঞানও কিছু মাত্রায় আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের যৌগিক শক্তি জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষকে চিরতরে মুক্তি দিতে পারে না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* ধর্ম অনুশীলনের এই পন্থাকেও কপট ধর্ম বা ছল ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি নিরন্তর তাঁর হৃদয়ে ভগবানের চিন্তা করেন এবং ঐকান্তিক প্রীতি সহকারে ভগবানের সেবা করেন।

বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করার পন্থা পূর্বোক্ত কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের পন্থা থেকেও অধিক বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত। দুর্গা, শিব, গণেশ, সূর্য আদি দেব-দেবীর আরাধনা বা বিষ্ণুর নির্বিশেষ রূপের ধ্যানের পন্থা কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা অত্যধিক কামনা-বাসনার প্রভাবে অন্ধ হয়ে পড়েছে। এই অভাবের যুগে দেব-দেবীদের পূজা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শাস্ত্র-নির্ধারিত পন্থায় কেউ যদি যথাযথভাবে দেব-দেবীদের পূজা করতে পারে, তা হলে তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা চরিতার্থ হবে ঠিকই, তবে এই সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই পন্থা অবলম্বন করে। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথাই বলা হয়েছে। কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী সুখভোগে সন্তুষ্ট হতে পারবে না।

পূর্বোক্ত তিনটি পন্থার কোনটিই জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে না। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ নিজের দেহ ও মনজাত দুঃখ; আধিভৌতিক, অর্থাৎ অন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ; এবং আধিদৈবিক, অর্থাৎ বিভিন্ন দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তা এই ত্রিতাপ দুঃখকে সমূলে উৎপাটিত করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ, সকাম কর্ম এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার নির্বিশেষ জ্ঞান আদি সব রকমের বাসনাশূন্য হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হওয়ার ধর্ম।

স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, যে কোন রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগভিত্তিক যে ধর্ম, তাই হচ্ছে কপট ধর্ম। কারণ, এই প্রকার ধর্মের অনুগামীরা কখনই ওই ধর্মাচরণগুলির মাধ্যমে জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না। এই সম্পর্কে *প্রোজ্‌ঝিত*

কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *প্র* মানে হচ্ছে 'পূর্ণরূপে' এবং *উজ্‌ঝিত* মানে হচ্ছে 'বর্জন'। কর্মকাণ্ডীয় ধর্ম সরাসরিভাবে স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের পন্থা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে জ্ঞানমার্গীয় পন্থা, তা হচ্ছে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। এই ধরনের সমস্ত কৈতব ধর্মগুলি স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত। *ভাগবত-ধর্মে* এই সমস্ত কৈতব ধর্মগুলি সর্বতোভাবে বর্জন করে ভগবদ্ভক্তিরূপী সনাতন ধর্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি।

ভাগবত-ধর্ম বা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ধর্ম, যার প্রাথমিক পাঠ হচ্ছে *ভগবদ্গীতা*, তা তাঁরাই অনুশীলন করেন যাঁরা হচ্ছেন সর্বোচ্চ স্তরের মুক্ত পুরুষ এবং যাঁদের কাছে কৈতব ধর্মমূলক সব রকমের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। সকাম কর্মপরায়ণ ভোগী, যোগী, জ্ঞানী ও মুক্তিকামীদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। কিন্তু ভগবদ্ভক্তদের এই ধরনের কোনও বাসনা নেই। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তথাকথিত অহিংসা ও পুণ্যের কথা চিন্তা করে অর্জুন স্থির করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ করবেন না। কিন্তু তিনি যখন সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে সম্পূর্ণরূপে *ভাগবত-ধর্মের* মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

"হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে। তোমার কৃপায় আমি আমার স্মৃতি লাভ করেছি। আমার সন্দেহ দূর হয়েছে এবং আমি এখন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানে স্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার নির্দেশ অনুসারে কর্ম করতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৭৩) এই বিশুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়াই হচ্ছে জীবের ধর্ম। তথাকথিত যে সমস্ত ধর্ম এই পরম নির্মল পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে বাধা দেয়, সেগুলি হচ্ছে কপট ধর্ম বা ছল ধর্ম।

প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবানের সেবা করা। জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য সেবক। আর এভাবে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে তার নিত্য ধর্ম। পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে *বস্তু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবকে *বাস্তব* বা বস্তুর অসংখ্য আপেক্ষিক অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম বস্তুর সঙ্গে আপেক্ষিক বাস্তবাংশের সম্পর্ক কখনই বিনষ্ট হয় না, কেন না তা হচ্ছে বাস্তবাংশের স্বাভাবিক ধর্ম।

জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে জীব ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ভবরোগের নিরাময়ই হচ্ছে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য। এই রোগের শুশ্রূষা হচ্ছে *ভাগবত-*

ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই, কেউ যদি তাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* অমৃতময় বাণী শ্রবণে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁর জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৯২

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান ।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি কৈতব ধর্মগুলির মধ্যে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মোক্ষবাসনা হচ্ছে সব চাইতে বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, কেন না তার ফলে কৃষ্ণভক্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

নিরাকার ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা হচ্ছে সব চাইতে সূক্ষ্ম ধরনের নাস্তিকতা। মোক্ষবাঞ্ছার আবরণে আচ্ছাদিত এই ধরনের নাস্তিকতাকে যখনই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তখনই ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৯৩

"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" ইতি ॥ ৯৩ ॥

প্র-শব্দেন—প্র-শব্দের দ্বারা; **মোক্ষ-অভিসন্ধিঃ**—মোক্ষ লাভের কুবাসনা; **অপি**—অবশ্যই; **নিরস্তঃ**—নিরস্ত; **ইতি**—এভাবে।

অনুবাদ

"প্র-শব্দের দ্বারা (শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে) মোক্ষবাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়েছে।"

তাৎপর্য

এটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীকৃত একটি টীকা।

শ্লোক ৯৪

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম ।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক যে সমস্ত কর্ম, তা শুভই হোক অথবা অশুভ হোক, সেই সমস্ত জীবের তমোগুণজাত অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাৎপর্য

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে যে সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জীব হচ্ছে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ এবং কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে তার স্বরূপগত ধর্ম। তথাকথিত পুণ্যকর্ম ও নানা রকমের সংস্কার, পুণ্য অথবা পাপকর্ম, এমন কি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা, এই সব কিছুই চিৎ-স্ফুলিঙ্গের আবরণ বলে বিবেচনা করা হয়। জীবকে অবশ্যই এই সমস্ত অনাবশ্যক আবরণ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার এই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা। তাঁদের আবির্ভাবের পূর্বে, এই সমস্ত অনাবশ্যক কার্যকলাপ জীবের কৃষ্ণভাবনামৃতকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। কিন্তু এই দুই ভাইয়ের অবির্ভাবের পর থেকে মানুষের হৃদয় ক্রমশ নির্মল হচ্ছে এবং তারা পুনরায় তাদের কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্লোক ৯৫

যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয় এবং সত্যের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৯৬

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ ।
নাম-সংকীর্তন—সর্ব আনন্দস্বরূপ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

পরম তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমজনিত ভক্তি লাভ হয় তাঁর দিব্য নাম-সংকীর্তন করার মাধ্যমে। আর এই নাম-সংকীর্তন হচ্ছে সমস্ত আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

শ্লোক ৯৭

সূর্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে ।
বহির্বস্তু ঘট-পট-আদি সে প্রকাশে ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

সূর্য ও চন্দ্র জড় জগতের অন্ধকার বিনাশ করে ঘট, পট আদি সমস্ত বহির্বস্তু প্রকাশ করে।

শ্লোক ৯৮

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার ।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই ভাই (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু) হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করেন এবং এভাবেই তাঁরা দুই ভাগবতের (শাস্ত্র-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত) সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎ করান।

শ্লোক ৯৯

এক ভাগবত বড়—ভাগবত-শাস্ত্র ।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

এক ভাগবত হচ্ছেন মহান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যজন হচ্ছেন ভক্তিরসে মগ্ন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত।

শ্লোক ১০০

দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস ।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই ভাগবতের দ্বারা ভগবান জীবের হৃদয়ে ভক্তিরস দান করেন এবং এভাবেই ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তাঁর প্রেমের বশীভূত হন।

শ্লোক ১০১

এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই ভাই একই সময়ে প্রকাশিত হন, তা পরম আশ্চর্যজনক এবং তাঁরা যে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করে তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেন, তাও অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

শ্লোক ১০২

এই চন্দ্র সূর্য দুই পরম সদয় ।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই সূর্য ও চন্দ্র জগতের মানুষের প্রতি অত্যন্ত সদয়। সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁরা গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

বিখ্যাত সেন রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী গৌড়দেশ বা গৌড় ছিল বর্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত। পরবর্তীকালে এই রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয় গঙ্গার তটে নবদ্বীপের কেন্দ্রীয় দ্বীপ মায়াপুরে, যা সেই সময় গৌড়পুর নামে পরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াপুরে আবির্ভূত হন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বীরভূম থেকে এসে সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছিলেন কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, সূর্য ও চন্দ্র যেমন ধীরে ধীরে পশ্চিম অভিমুখে গমন করে, তেমনই পাঁচশ বছর পূর্বে তাঁদের প্রবর্তিত এই আন্দোলন তাঁদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বদ্ধ জীবের পাঁচটি অজ্ঞানতা দূর করেন। *মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের* ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায়ে এই পাঁচ প্রকার অজ্ঞানতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে ১) দেহকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা, ২) জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে আনন্দ লাভের উপায় বলে মনে করা, ৩) জড়-জাগতিক আসক্তিজনিত উৎকণ্ঠা, ৪) শোক এবং ৫) পরম-তত্ত্বেরও অতীত কিছু আছে বলে মনে করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এই পাঁচ প্রকার অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করে। আমরা যা কিছু দেখি অথবা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেই সবই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রদর্শন বলে জানতে হবে। সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ।

শ্লোক ১০৩

সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন ।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমরা সেই দুই প্রভুর শ্রীচরণ-কমলের বন্দনা করি। তার ফলে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয় এবং সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়।

শ্লোক ১০৪

এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল-বন্দন ।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্বজন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

আমি এই দুই শ্লোকের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি। এখন আপনারা দয়া করে তৃতীয় শ্লোকের অর্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১০৫

বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে ।
বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়ে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা না করে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে তার সারার্থ বর্ণনা করব।

শ্লোক ১০৬

"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" ইতি ॥ ১০৬ ॥

মিতম্—সংক্ষিপ্ত; চ—এবং; সারম্—সার; চ—এবং; বচঃ—বচন ; হি—অবশ্যই; বাগ্মিতা—বাগ্মিতা; ইতি—এভাবে।

অনুবাদ

"মূল সত্য যদি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায়, তা হলে তাকেই যথার্থ বাগ্মিতা বলা হয়।"

শ্লোক ১০৭

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সন্তোষ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

কেবলমাত্র বিনীতভাবে তা শ্রবণ করলেই অজ্ঞানতা জনিত হৃদয়ের সমস্ত দোষ খণ্ডন হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ হয়। এটিই হচ্ছে শান্তি লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্লোক ১০৮-১০৯

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব ।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রসতত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার ।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

যদি ধৈর্য সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা এবং তাঁদের ভক্ত, ভক্তি, নাম, যশ ও তাঁদের প্রেমময়ী সম্পর্কের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা হয়, তা হলে সমস্ত তত্ত্ববস্তুর সার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই, আমি যুক্তি ও বিচারপূর্বক এই সমস্ত বিষয় (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে) বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১১০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'গুর্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বস্তুনির্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণ

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশ। এই সূত্রে পুরুষাবতার তত্ত্বেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহাবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধ জীবের উৎস। কিন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অংশ-অবতার এমন কি বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণেরও আদি উৎস, যাঁকে মায়াবাদী দার্শনিকেরা পরমতত্ত্ব বলে মনে করেন। ভগবানের প্রাভব ও বৈভব প্রকাশ, তাঁর অংশ-অবতার এবং শক্ত্যাবেশ অবতারেরও বিশ্লেষণ এই পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং কৈশোরলীলার আলোচনাও এখানে করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তাঁর নবযৌবন-সম্পন্ন রূপই হচ্ছে তাঁর নিত্যরূপ।

চিদাকাশে অনন্ত চিন্ময়লোক বা বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, যেগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। তেমনই, তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে অনন্ত কোটি জড় ব্রহ্মাণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে এবং জীব তাঁর তটস্থা শক্তিসম্ভূত। যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তাই তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ; তাঁর অতীত আর কোনও কারণ নেই। তিনি নিত্য এবং তাঁর রূপ চিন্ময়। সমস্ত শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এই পরিচ্ছেদে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করার জন্য ভক্তকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁর তিনটি প্রধান শক্তি, তাঁর লীলাবিলাস এবং জীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হতে হবে।

শ্লোক ১

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রভুম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **বালঃ**—অনভিজ্ঞ শিশু; **অপি**—এমন কি; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহের প্রভাবে; **তরেৎ**—অতিক্রম করতে পারে; **নানা**—বিবিধ; **মত**—মতবাদরূপী; **গ্রাহ**—কুমীর; **ব্যাপ্তম্**—পরিপূর্ণ; **সিদ্ধান্ত**—সিদ্ধান্ত; **সাগরম্**—সাগর।

অনুবাদ

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যাঁর কৃপার প্রভাবে এমন কি অনভিজ্ঞ শিশুও বিবিধ মতবাদরূপী কুমীরে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সাগর অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে অজ্ঞান এবং অনভিজ্ঞ শিশুও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদরূপী ভয়ংকর জলচর প্রাণীসঙ্কুল অজ্ঞানের সমুদ্র অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। বৌদ্ধ-দর্শন, তার্কিকদের জ্ঞানপদ্ধতি, পতঞ্জলি ও গৌতমের যোগপদ্ধতি এবং কণাদ, কপিল, দত্তাত্রেয় আদি দার্শনিকদের মতবাদগুলি হচ্ছে অজ্ঞান-সমুদ্রের ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীসমূহ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই সমস্ত সংকীর্ণ মতবাদের প্রভাব অতিক্রম করে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম জীবনের পরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা যায়। তাই বদ্ধ জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করে আমরা তাঁর বন্দনা করি।

শ্লোক ২

কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্তনকলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্ ।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বধুনী ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম; **উৎকীর্তন**—উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন; **গান**—গান; **নর্তন**—নর্তন; **কলা**—অন্যান্য শিল্পকলা; **পাথোজনি**—কমল দ্বারা; **ভ্রাজিতা**—পরিশোভিত; **সৎ-ভক্ত**—শুদ্ধ ভক্তদের; **আবলি**—সারি; **হংস**—হংসের; **চক্র**—চক্রবাক পক্ষীরা; **মধুপ**—ভ্রমরেরা; **শ্রেণী**—শ্রেণী; **বিহার**—বিচরণ; **আস্পদম্**—স্থল; **কর্ণ-আনন্দি**—শ্রুতিমধুর; **কল**—মধুর ছন্দে; **ধ্বনিঃ**—ধ্বনি; **বহতু**—প্রবাহিত হোক; **মে**—আমার; **জিহ্বা**—জিহ্বার; **মরু**—মরুভূমি-সদৃশ; **প্রাঙ্গণে**—প্রাঙ্গণে; **শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে**—দয়ার সমুদ্রস্বরূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **তব**—আপনার; **লসৎ**—উজ্জ্বল; **লীলা-সুধা**—লীলামৃতের; **স্বধুনী**—গঙ্গা।

অনুবাদ

হে দয়ার সমুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গঙ্গার অমৃতময় ধারাসদৃশ আপনার অপ্রাকৃত লীলামৃত আমার মরুভূমি-সদৃশ জিহ্বায় প্রবাহিত হোক। এই অমৃতের ধারাকে পরিশোভিত করেছে গান, উচ্চ সংকীর্তন ও নর্তনরূপ পদ্মসমূহ, যা শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরসমূহের বিহারস্থল। এই অমৃতরূপ নদীর প্রবাহ এক মধুর ধ্বনি সৃষ্টি করছে, যা তাঁদের শ্রবণযুগলের পক্ষে পরম আনন্দদায়ক।

তাৎপর্য

আমাদের জিহ্বা নিরন্তর অর্থহীন প্রলাপে নিয়োজিত থাকার ফলে আমাদের পারমার্থিক প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এখানে জিহ্বাকে মরুভূমির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ মরুভূমিকে উর্বর করতে হলে নিরন্তর জলসেচনের প্রয়োজন হয়। মরুভূমিতে জলের প্রয়োজন সব চাইতে বেশি। শিল্পকলা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, নিরস দর্শন,

কাব্য প্রভৃতির মাধ্যমে যে ক্ষণিকের সুখ আস্বাদন করা হয়, তাকে একবিন্দু জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ, যদিও এই সমস্ত বিষয়ে পারমার্থিক আনন্দের আভাস রয়েছে, কিন্তু সেগুলি জড়া প্রকৃতির কলুষের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই, এককভাবেই হোক অথবা সমষ্টিগতভাবেই হোক, তা আমাদের জিহ্বারূপী মরুভূমির অন্তহীন তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে পারে না। তাই, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে এই সমস্ত বিষয়ের বহু আলোচনা হলেও আমাদের মরুভূমি-সদৃশ জিহ্বা শুষ্কই থেকে যায়। এই কারণে, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের চতুর্দিকে সন্তরণকারী হংসের মতো অথবা গুঞ্জনরত মধুলোভী মধুকরের মতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনন্য ভক্তদের সঙ্গ করতে হবে। ব্রহ্মবাদী, মোক্ষকামী অথবা এই ধরনের শুষ্ক মনোধর্মী তথাকথিত দার্শনিকেরা মানুষকে সেই অমৃতের সন্ধান দান করতে পারে না। জীব নিরন্তর সেই চিন্ময় আনন্দের অন্বেষণ করছে। তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কৃপাতেই কেবল যথাযথভাবে তৃপ্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা কখনও মহাপ্রভু হওয়ার বাসনায় মহাপ্রভুর অনুকরণ করে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন না। পক্ষান্তরে, মধুলোভী মধুকরেরা যেমন কখনই মধুপূর্ণ কমলকে পরিত্যাগ করে কোথাও যায় না, তেমনই তাঁরাও কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-কমল পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় লীলার আনন্দসম্ভূত নৃত্য ও সঙ্গীতে পূর্ণ। এখানে গঙ্গার নির্মল জলধারার সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে, যে জলধারা সর্বদা পদ্মফুলে পরিপূর্ণ থাকে। এই পদ্মের সৌরভ ও মধু আস্বাদন করেন হংস ও মধুকর-সদৃশ শুদ্ধ ভক্তরা। তাঁদের কীর্তন সুরধুনী গঙ্গার প্রবাহের মতো শ্রুতিমধুর। এই গ্রন্থের প্রণেতা এখানে বাসনা করেছেন যে, সেই মধুর প্রবাহ যেন তাঁর জিহ্বাকে সিক্ত ও মধুময় করে। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজেকে জড় জগতের বিষয়ে আসক্ত মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যারা সর্বদাই শুষ্ক জড় বিষয়ের আলোচনায় ব্যস্ত থেকে ভগবৎ-প্রেমরূপী অমৃতের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়। তারা যদি **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তনে তাদের মরুভূমি-সদৃশ জিহ্বাকে নিয়োজিত করে, তা হলে তারা দিব্য অমৃতের স্বাদ লাভ করতে পারবে এবং তাদের জীবন যথার্থ আনন্দময় হয়ে উঠবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের আচরণের মাধ্যমে সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন।

শ্লোক ৩

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় হোক। জয় হোক শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৪

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ ।
বস্তু-নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

এখন আমি (প্রথম চোদ্দটি শ্লোকের) তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করছি। তা হচ্ছে পরমতত্ত্বকে নির্দেশ করে তাঁর উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণ।

শ্লোক ৫

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৫ ॥

যৎ—যা; **অদ্বৈতম্**—অদ্বৈত; **ব্রহ্ম**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **উপনিষদি**—উপনিষদে; **তৎ**—সেই; **অপি**—অবশ্যই; **অস্য**—তাঁর; **তনুভা**—দিব্য দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা; **যঃ**—যিনি; **আত্মা**—পরমাত্মা; **অন্তর্যামী**—অন্তর্যামী; **পুরুষঃ**—পরম ভোক্তা; **ইতি**—এভাবেই; **সঃ**—তিনি; **অস্য**—তাঁর; **অংশ-বিভবঃ**—অংশ-বৈভব; **ষড়ৈশ্বর্যৈঃ**—ষড়ৈশ্বর্যের দ্বারা; **পূর্ণঃ**—পূর্ণ; **যঃ**—যিনি; **ইহ**—এখানে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **চৈতন্যাৎ**—চৈতন্যরূপী; **কৃষ্ণাৎ**—শ্রীকৃষ্ণ থেকে; **জগতি**—জগতে; **পর**—শ্রেষ্ঠ; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **পরম্**—ভিন্ন; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ-বৈভব। তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।

তাৎপর্য

উপনিষদের প্রণেতারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তন করেন। *উপনিষদ,* যাকে বৈদিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিবেচনা করা হয়, তা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিকামী সমস্ত মানুষদের জন্য। এই সমস্ত মানুষেরা যথার্থ জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হন। *উপ* উপসর্গটি নির্ণয় করছে যে, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হয়। সদ্‌গুরুর প্রতি যাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে, তিনি পারমার্থিক উপদেশ লাভ করেন এবং জড় জগতের প্রতি তাঁর আসক্তি শিথিল হয়।

তখন তিনি পারমার্থিক মার্গে অগ্রসর হতে সমর্থ হন। *উপনিষদের* চিন্ময় জ্ঞান জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে এবং এভাবেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করা যায়।

পারমার্থিক উপলব্ধির প্রথম সোপান হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। বৈচিত্র্যময় জড় বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে বর্জন করার ফলে এই উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি হচ্ছে দূর থেকে দৃষ্ট পরমতত্ত্বের আংশিক অভিজ্ঞতা, যা যুক্তি-তর্কের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে লাভ হয়। দূর থেকে পাহাড়কে যেমন মেঘ বলে মনে হয়, এটি হচ্ছে অনেকটা সেই রকম। পাহাড় মেঘ নয়, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ভ্রান্ত বলে তাকে দূর থেকে মেঘ বলে মনে হয়। পরমতত্ত্বের ভ্রান্ত দর্শনের ফলে তাঁর চিন্ময় বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করা যায় না। তাই এই দর্শনকে বলা হয় *অদ্বৈতবাদ,* অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে উপলব্ধি করা।

নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে সবিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর চিন্ময় দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা।

তেমনই, পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আংশিক প্রকাশ। অন্তর্যামী বা পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি।" *ভগবদ্‌গীতায়* (৫/২৯) আরও বলা হয়েছে, *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।* অর্থাৎ, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুরই অধীশ্বর। তেমনই, *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) বলা হয়েছে, *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্।* ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। তিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে এবং প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেই অবস্থান করছেন। এভাবেই পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বব্যাপ্ত।

অধিকন্তু, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্যের অধীশ্বর, কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে তাঁকে পূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবান হচ্ছেন আদর্শ ত্যাগী, ঠিক যেমন শ্রীরামচন্দ্ররূপে তিনি হচ্ছেন একজন আদর্শ রাজা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে সমস্ত বিধি-নিষেধ নিজের জীবনে যথাযথভাবে আচরণ করার মাধ্যমে অপূর্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়ে গিয়েছেন। সন্ন্যাসীরূপে তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। যদিও কলিযুগে সন্ন্যাস গ্রহণ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সমগ্র বৈরাগ্যের আধার, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কেউ তাঁকে অনুকরণ করতে পারে না, তবে যতটা সম্ভব তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। যারা এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণে অযোগ্য, শাস্ত্রে তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে এই আশ্রম

গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ঐশ্বর্যের মতো বৈরাগ্যও পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাই তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্বের চরম প্রকাশ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন; তাঁর চেয়ে মহৎ কেউ নেই, এমন কি তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*— "হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! আমার থেকে শ্রেষ্ঠতর কোন তত্ত্ব নেই।" এভাবেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে *পরতর* তত্ত্ব আর কিছুই নেই।

যারা জ্ঞানের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানার চেষ্টা করে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। আর যারা যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে লাভ করতে চায়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পরমাত্মা। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন তিনি ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও পরমাত্মা-উপলব্ধি, এই দুটি স্তরই অতিক্রম করেছেন। কারণ, পারমার্থিক জ্ঞানের চরম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবান-উপলব্ধি।

পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় (নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় ও আনন্দময়) রূপই হচ্ছে তাঁর পূর্ণ প্রকাশ। পরম পূর্ণের *সৎ* উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করা যায় এবং *চিৎ* উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁকে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই দুটি আংশিক উপলব্ধির কোনটির দ্বারাই পূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায় না। এই আনন্দের উপলব্ধি ব্যতীত পরমতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এই শ্লোকটি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রণীত তত্ত্বসন্দর্ভের একটি উক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে। *তত্ত্বসন্দর্ভের* নবম খণ্ডে বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব কখনও কখনও নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপেও উপলব্ধ হন, যা চিন্ময় হলেও পরমতত্ত্বের আংশিক প্রকাশ মাত্র। বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব; তিনি সমস্ত জীবের পরম প্রেমাস্পদ।

শ্লোক ৬

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন ।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্বের তিনটি উদ্দেশ্য বা অনুবাদ এবং অঙ্গপ্রভা, অংশ-প্রকাশ ও স্বরূপ হচ্ছে যথাক্রমে এই তিন উদ্দেশ্যের বিধেয়।

শ্লোক ৭

অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন ।
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্র-বিবরণ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

উদ্দেশ্য বা অনুবাদ পূর্বে আলোচিত হয় এবং বিধেয় থাকে তার পরে। এখন আমি শাস্ত্রের বিবরণ অনুসারে এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করব। দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৮

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং পরম বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি হচ্ছেন পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণানন্দ সমন্বিত পরম মহত্ত্ব।

শ্লোক ৯

'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই ।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীচৈতন্য (মহাপ্রভু) গোঁসাইরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

সাহিত্যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে উদ্দেশ্য অংশের উল্লেখ হয় বিধেয়র পূর্বে। বৈদিক শাস্ত্রে প্রায়শই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই এই তিনটি শব্দ পারমার্থিক উপলব্ধির বিষয় হিসাবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য অঙ্গের কান্তি, অথবা পরমাত্মা যে স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অংশ, সেই সম্বন্ধে অনেকেই অবগত নয়। তাই ব্রহ্ম যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যে তাঁর অংশ-প্রকাশ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে অভিন্ন, তা প্রামাণিক বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণের দ্বারা অবশ্যই প্রতিপন্ন করা আবশ্যক।

গ্রন্থকার প্রথমে প্রমাণ করতে চান যে, সমস্ত *বেদের* মূলতত্ত্ব হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব বা সর্বব্যাপ্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বিষ্ণুতত্ত্বের বিভিন্ন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে *শ্রীমদ্ভাগবতে* নন্দসুত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, সেই নন্দসুত আবার আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে। কারণ বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেই তত্ত্ব গ্রন্থকার প্রমাণ করবেন। যদি

প্রমাণ করা যায় যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই সমস্ত তত্ত্বেরই মূল উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তা হলে আর বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন এই সমস্ত তত্ত্বেরই মূল উৎস। সেই পরমতত্ত্ব সাধনার স্তর অনুসারে সাধকের কাছে নিজেকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানরূপে প্রকাশিত করেন।

শ্লোক ১০

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে পরিচিত হন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভগবৎ-সন্দর্ভ* গ্রন্থে *ভগবান্* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। সমস্ত চিন্ত্য ও অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন হওয়ার ফলে ভগবান হচ্ছেন অখণ্ড পূর্ণ তত্ত্ব। তাঁর পূর্ণ শক্তিমত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হেতু আমাদের কাছে এই পরমতত্ত্বের আংশিক প্রকাশ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন। *ভগবান্* শব্দের আদ্যাক্ষর ভ কারের অর্থ হচ্ছে 'সম্ভর্তা' ও 'ভর্তা'। পরবর্তী শব্দ *গ* কারের অর্থ 'নেতা', 'গময়িতা' ও 'স্রষ্টা'। *ব* কারের অর্থ 'বাস করা' (সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানে বাস করে এবং পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বাস করেন)। এই সমস্ত শব্দগুলির সমন্বয়ে *ভগবান্* শব্দের অর্থ হচ্ছে অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, প্রতিপত্তি—এই অচিন্ত্য শক্তি সব রকমের নিকৃষ্ট গুণ বর্জিত হয়ে যাঁর মধ্যে নিত্য বিরাজমান। এই অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত পূর্ণরূপে ধারণ বা পালন করা যায় না। আধুনিক সমাজ প্রতিপালিত হচ্ছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মস্তিষ্কপ্রসূত বৈজ্ঞানিক আয়োজনের মাধ্যমে। সুতরাং, আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, যিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির মাধ্যমে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করে অন্তহীন আকাশে তাদের ভাসিয়ে রেখেছেন, তাঁর মস্তিষ্কের ক্ষমতা কি অপরিসীম। মানুষের তৈরি একটি উপগ্রহকে ভাসিয়ে রাখতে যে কি পরিমাণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, তা যদি একটু বিবেচনা করে দেখা হয়, তা হলে নিতান্ত নির্বোধ না হলে কেউই বলবে না যে, মহাশূন্যে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে কোন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণ করছে না। বিশাল বিশাল গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে মহাশূন্যে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনার পিছনে যে এক অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৩) পরমেশ্বর ভগবান এই সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমি প্রতিটি গ্রহে প্রবেশ করি এবং আমার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রহগুলি কক্ষপথে স্থিত থাকে।" ভগবান যদি গ্রহগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে না রাখতেন, তা হলে তারা বায়ুতে ধূলিকণার মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ভগবানের এই অচিন্ত্য শক্তিকে তাদের মনগড়া নানা রকম জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের সেই বিশ্লেষণ অবাস্তব ও অসমীচীন।

ভগবান শব্দের ভ, *গ* ও *ব* অক্ষরগুলি বিভিন্ন অর্থবাচক। তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে ভগবান সব কিছু রক্ষা করেন এবং পালন করেন। কিন্তু তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কেবল তাঁর ভক্তদের পালন করেন এবং রক্ষা করেন। যেমন, রাজা বিভিন্ন রাজপুরুষ এবং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাঁর রাজ্যকে প্রতিপালন ও রক্ষা করেন, কিন্তু নিজে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পুত্র-কন্যাদের পালন করেন। ভগবান হচ্ছেন তাঁর ভক্তদের পরিচালক। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, ভগবান স্বয়ং তাঁর প্রিয় ভক্তদের নির্দেশ দেন যে, কিভাবে তাঁরা ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করে নিশ্চিতভাবে ভগবৎ-রাজ্যে অগ্রসর হতে পারেন। ভগবান তাঁর ভক্তের নিবেদিত প্রেমভক্তি গ্রহণ করেন, যাঁদের কাছে তিনিই হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ। তাঁর প্রতি ভক্তদের দিব্য প্রেম বিকশিত করার জন্য ভগবান অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর ভক্তের সব রকম জড়-জাগতিক আসক্তি বলপূর্বক ছিন্ন করেন এবং তাঁর সব রকম জড় প্রচেষ্টাগুলিকে প্রতিহত করেন, যাতে ভক্ত সম্পূর্ণভাবে তাঁর শরণাগত হন। এভাবেই ভগবান তাঁর ভক্তদের পরিচালকরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন।

এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসকার্যে ভগবান সরাসরিভাবে যুক্ত নন, কেন না ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিত্যকাল ধরে দিব্য আনন্দ উপভোগে ব্যস্ত। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর বহিরঙ্গা জড় শক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তির প্রবর্তক, তাই তিনি নিজেকে পুরুষাবতার রূপে বিস্তার করেন এবং তাঁরাও তাঁর মতো পূর্ণ শক্তি সমন্বিত। পুরুষাবতারেরাও হচ্ছেন ভগবৎ-তত্ত্ব, কেন না তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদিরূপ থেকে অভিন্ন। জীব হচ্ছে তাঁর অণুসদৃশ অংশ এবং তারা গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক। তারা জড় জগতে প্রক্ষিপ্ত হয়, যাতে তারা স্বতন্ত্রভাবে জড় সুখভোগ করার বাসনা চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু তবুও তারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার অধীন। পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করে ভগবান তাদের এই জড় সুখভোগের আয়োজনগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। এই সম্পর্কে একটি অস্থায়ী মেলার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য নাগরিকেরা কোন মেলায় আনন্দ উপভোগ করতে যায় এবং তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনা করার জন্য সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটির হাতে সব রকম সরকারি ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে এবং তাই তিনি সরকার থেকে অভিন্ন। তারপর যখন মেলা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটির আর কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন তিনি বাড়ি ফিরে যান। এই উচ্চপদস্থ কর্মচারীটির সঙ্গে পরমাত্মার তুলনা করা যায়।

জীব সর্বেসর্বা নয়। তারা নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ অংশ এবং গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক, তবুও তারা সর্বতোভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু

তারা ভগবানের অধীন, তাই তারা কখনই ভগবানের সমান হতে পারে না অথবা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। পরমাত্মারূপে ভগবান জীবের সঙ্গে অবস্থান করেন। তাই, কোন অবস্থাতেই কারও মনে করা উচিত নয় যে, অণুসদৃশ জীব পরম ঈশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত।

সর্বব্যাপ্ত যে সত্য জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সময় বর্তমান থাকে এবং যার মধ্যে জীব সমাধিমগ্ন হয়ে বিরাজ করে, তাকে বলা হয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

শ্লোক ১১

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥

বদন্তি—বলেন; **তৎ**—তাঁকে; **তত্ত্ববিদঃ**—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; **তত্ত্বম্**—পরমতত্ত্ব; **যৎ**—যা; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অদ্বয়ম্**—অদ্বয়; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **ইতি**—এই নামে; **পরমাত্মা**—পরমাত্মা; **ইতি**—এই নামে; **ভগবান্**—ভগবান; **ইতি**—এই নামে; **শব্দ্যতে**—অভিহিত হন।

অনুবাদ

"যা অদ্বয়জ্ঞান, অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত হন।"

তাৎপর্য

এই সংস্কৃত শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশতম শ্লোক। এখানে শ্রীল সূত গোস্বামী সমস্ত শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় শৌনক ঋষি প্রমুখ মহাত্মাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। *তত্ত্ববিদঃ* বলতে তাঁকেই বোঝায় যিনি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত। তাঁরা অদ্বয়জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, কেন না তাঁরা পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত। পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা জানেন যে, কেউ যদি মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে সেই পরম তত্ত্ববস্তুকে জানবার চেষ্টা করেন, তা হলে তাঁর কাছে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হবেন। আর কেউ যদি তাঁকে জানবার জন্য যোগপ্রণালী অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি পরমাত্মারূপে তাঁকে দর্শন করতে পারবেন। কিন্তু যিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং পারমার্থিক অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দিব্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবেন।

পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা জানেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নিরূপণ করেন না। আর কেউ যদি স্বয়ং ভগবান থেকে ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে, তা হলে বুঝতে হবে তার পারমার্থিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, তিনি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দিব্য শব্দতরঙ্গ রূপে সেখানে বিরাজ করেন। তাই, তিনি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে ভগবানের নাম কীর্তন করে থাকেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করেন, তখন তিনি সেই বিগ্রহকে অভিন্ন কৃষ্ণ জ্ঞানেই দর্শন করে থাকেন। কিন্তু সেই দর্শন যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যতীত অন্য কোনভাবে করা হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, দর্শনকারী ব্যক্তি পারমার্থিক জীবনে যথেষ্ট উন্নত নয়। পারমার্থিক জ্ঞানের অভাব হেতু তারা পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না। আর এই পারমার্থিক জ্ঞানের অভাবই হচ্ছে মায়া। যারা কৃষ্ণভাবনাময় নয়, জ্ঞানের অভাববশত তারা মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরম স্তরে ভগবানের সমস্ত প্রকাশই হচ্ছে অদ্বয়তত্ত্ব, ঠিক যেমন মায়ার নিয়ন্তা শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত রূপই হচ্ছে অদ্বয়তত্ত্ব। মায়াবাদী দার্শনিকেরা, যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তারা মনে করে যে, অণুচৈতন্য-বিশিষ্ট জীব বিভুচৈতন্য-বিশিষ্ট ভগবান থেকে অভিন্ন। আবার যোগ-সাধনকারী পরমার্থবাদীরা, যারা পরমাত্মাকে দর্শন করার চেষ্টা করে, তারা মনে করে যে, জীবাত্মা যখন শুদ্ধ চেতনাসম্পন্ন হয়, তখন সেই শুদ্ধ স্তরে তারা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একজন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত অনুভূতিলব্ধ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তার মাধ্যমে তিনি সব কিছুকে কৃষ্ণসম্বন্ধে দর্শন করতে সমর্থ হন এবং তাই তাঁর জ্ঞান পূর্ণ।

শ্লোক ১২

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল ।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই পরম পুরুষের অঙ্গপ্রভা।

তাৎপর্য

মুণ্ডক উপনিষদে প্রদত্ত তিনটি শ্লোকে (২/২/১০-১২) পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গপ্রভা বা দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ।

অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈ-
বেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥

"জড় আবরণের ঊর্ধ্বে চিৎ-জগতে অন্তহীন ব্রহ্মজ্যোতি রয়েছে, যা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত। সেই জ্যোতির্ময় শুভ্র আলোককে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি বলে জানেন। সেই চিন্ময় লোককে উদ্ভাসিত করার জন্য সূর্যরশ্মি, চন্দ্রকিরণ, অগ্নি অথবা বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না। বাস্তবিকই, জড় জগতে যে আলোক দেখা যায়, তা সেই পরম জ্যোতির প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই ব্রহ্ম সম্মুখে ও পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে এবং উপরে ও নীচে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, সেই ব্রহ্মজ্যোতি জড় ও চেতন আকাশের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত।"

শ্লোক ১৩

চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

চর্মচক্ষে যেমন সূর্যকে এক নির্বিশেষ জ্যোতির্মণ্ডল বলে মনে হয়, অর্থাৎ সূর্যের সবিশেষ বৈচিত্র্য দর্শন হয় না, তেমনই মনোধর্ম-প্রসূত দার্শনিক জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

শ্লোক ১৪

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৪ ॥

যস্য—যাঁর; **প্রভা**—কান্তি; **প্রভবতঃ**—প্রভাবযুক্ত; **জগৎ-অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; **কোটি-কোটিষু**—কোটি কোটি; **অশেষ**—অনন্ত; **বসুধা-আদি**—বসুধা আদি; **বিভূতি**—বিভূতি; **ভিন্নম্**—বৈচিত্র্যপূর্ণ; **তৎ**—সেই; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **নিষ্কলম্**—অখণ্ড; **অনন্তম্**—অনন্ত; **অশেষ-ভূতম্**—পূর্ণরূপে; **গোবিন্দম্**—ভগবান শ্রীগোবিন্দ; **আদি-পুরুষম্**—আদিপুরুষ; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

অনুবাদ

"অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতি থেকে যা পৃথক, সেই অখণ্ড, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁর প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে (৫/৪০) উদ্ধৃত। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডই

বিভিন্ন আকৃতি ও পরিবেশ সমন্বিত অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রে পূর্ণ। সে সমস্তই প্রকাশিত হয়েছে অনন্ত অদ্বয়ব্রহ্ম বা পরম পূর্ণ থেকে, যা পূর্ণ জ্ঞানে বিরাজমান। সেই অন্তহীন ব্রহ্মজ্যোতির উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগোবিন্দের চিন্ময় দেহ এবং সেই গোবিন্দই আদিপুরুষ রূপে বন্দিত হয়েছেন।

শ্লোক ১৫

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি ।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

(ব্রহ্মা বললেন—) "যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিভূতি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্ম হচ্ছেন গোবিন্দের অঙ্গকান্তি।

শ্লোক ১৬

সেই গোবিন্দ ভজি আমি, তেহোঁ মোর পতি ।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি (ব্রহ্মা) গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি আমার পতি। তাঁর কৃপাতেই আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি লাভ করেছি।"

তাৎপর্য

সূর্য যদিও সমস্ত গ্রহগুলি থেকে বহু দূরে অবস্থিত, তবুও তার কিরণ সমস্ত গ্রহগুলিকে পালন করে। বাস্তবিকপক্ষে, সূর্য তার তাপ ও আলোক সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিতরণ করে। তেমনই, পরম সূর্য গোবিন্দ তাঁর বিভিন্ন শক্তিরূপে সর্বত্র তাপ ও আলোক বিতরণ করেন। সূর্যের তাপ ও আলোক সূর্য থেকে অভিন্ন। তেমনই, গোবিন্দের অনন্ত শক্তিও স্বয়ং গোবিন্দ থেকে অভিন্ন। তাই, সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত গোবিন্দ। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৪/২৭) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় হচ্ছেন গোবিন্দ। সেটিই হচ্ছে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান।

শ্লোক ১৭

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ১৭ ॥

মুনয়ঃ—মুনিগণ; **বাত-বসনাঃ**—দিগম্বর; **শ্রমণাঃ**—শ্রমশীল; **ঊর্ধ্বমন্থিনঃ**—ঊর্ধ্বরেতা; **ব্রহ্ম-আখ্যম্**—ব্রহ্মলোক নামক; **ধাম**—ধাম; **তে**—তাঁরা; **যান্তি**—গমন করেন; **শান্তাঃ**—শান্ত; **সন্ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীরা; **অমলাঃ**—বিমল চিত্ত।

অনুবাদ

"দিগম্বর, শ্রমশীল ও ঊর্ধ্বরেতা মুনিগণ এবং শান্ত ও বিমল চিত্ত সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মলোক নামক ধাম প্রাপ্ত হন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/৬/৪৭) এই শ্লোকটিতে *বাতবসনাঃ* শব্দটি সেই সমস্ত পরমার্থবাদীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, যাঁরা কোন রকম জড় বস্তুর উপর নির্ভর করেন না। এমন কি তাঁদের দেহকে আবৃত করার জন্য তাঁরা বস্ত্র পরিধান করারও প্রয়োজন বোধ করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা সর্বতোভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করেন। এই ধরনের তপশ্চর্যা-পরায়ণ সাধুরা প্রচণ্ড শীতে অথবা উত্তপ্ত গ্রীষ্মে তাঁদের দেহ আবৃত করেন না। সব রকম দৈহিক কষ্ট উপেক্ষা করে তাঁরা কঠোর তপশ্চর্যা পালন করেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁরা কখনও বীর্যপাত করেন না। এভাবেই কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করার ফলে তাঁরা ঊর্ধ্বরেতা হন। তার ফলে তাঁদের বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। তাঁদের মন কখনও পরমতত্ত্বের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হয় না এবং তাঁরা কখনই জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার দ্বারা কলুষিত হন না। এভাবেই কঠোর তপশ্চর্যা পালন করার মাধ্যমে এই ধরনের তপস্বীরা জড়া প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করেন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ করে সেখানে স্থিত হন।

শ্লোক ১৮

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয় ।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

যোগশাস্ত্রে যাঁকে আত্মান্তর্যামী বা পরমাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন গোবিন্দের অংশ-বিভূতি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দময়। তাঁর আনন্দ উপভোগ বা লীলাবিলাস সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তিনি সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের অতীত। এই জড় জগতের সব কিছুই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার দ্বারা পরিমাপ করা হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, দেহ ও অস্তিত্ব অন্তহীন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জড় জগতের কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত নন। জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তাঁর পুরুষাবতারের মাধ্যমে, যিনি মহৎ-তত্ত্ব ও সমস্ত বদ্ধ জীবদের পরিচালনা করেন। তিন পুরুষাবতারের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে জীব জড়া প্রকৃতির চব্বিশটি উপাদানের দ্বারা গঠিত এই জড় জগতের স্তর অতিক্রম করতে পারে।

মহাবিষ্ণুর একটি বিস্তার হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। আর সমষ্টিগত জীবের পরমাত্মা বা দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছেন

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। জড় জগতের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন কারণ-সমুদ্রে শায়িত প্রথম পুরুষাবতার। তাঁকে বলা হয় মহাবিষ্ণু। এই তিন পুরুষাবতার জড় জগতের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রামাণিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি জীব যেন পরমাত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। বাস্তবিকই, যোগপদ্ধতি অবলম্বন করে পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যিনি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তিনি অতি সহজেই জানতে পারেন যে, এই পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ।

শ্লোক ১৯

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে ।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এক সূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকে প্রতিফলিত হয়ে বহুগুণে প্রকাশিত হয়, তেমনই গোবিন্দ নিজেকে (পরমাত্মারূপে) সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

সূর্য একটি বিশেষ স্থানে অবস্থিত হলেও অন্তহীন মণি-রত্নে তার প্রতিফলন হয় এবং তখন মনে হয় সূর্য যেন সেই মণিগুলির মধ্যে অসংখ্য রূপে অবস্থান করছে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যদিও নিত্যকাল ধরে তাঁর চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজমান, তবুও তিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে প্রতিফলিত হন। *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বৃক্ষে উপবিষ্ট দুটি পক্ষীর মতো। পরমাত্মা জীবকে তার পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে সকাম কর্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু জীবের এই কর্মের সঙ্গে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই। জীব যখনই সকাম কর্ম ত্যাগ করে ভগবানের (পরমাত্মার) শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর সেবায় যুক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ সে সব রকমের জড় উপাধিমুক্ত হয় এবং সেই শুদ্ধ অবস্থায় সে বৈকুণ্ঠ নামক ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করে।

প্রতিটি জীবের পথপ্রদর্শক পরমাত্মা কখনই জীবের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার কাজে যুক্ত হন না, কিন্তু জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার আয়োজন তিনি করেন। জীব যখনই পরমাত্মার সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে তাঁর দিকে অবলোকন করে, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। খ্রিস্টান দার্শনিকেরা, যারা কর্মফলে বিশ্বাস করে না, তর্কচ্ছলে তারা বলে যে, পূর্বকৃত যে কর্ম সম্বন্ধে কোন রকম ধারণাই আমাদের নেই, তার ফল কিভাবে এই জীবনে ভোগ করা সম্ভব? আদালতে প্রথমে সাক্ষীর মাধ্যমে কয়েদিকে তার অপরাধ সম্বন্ধে অবগত করানো হয় এবং তারপর তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। মৃত্যু যদি পূর্ণ বিস্মৃতি হয়, তা হলে তার পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য দণ্ডভোগ করতে হবে কেন? এই ধরনের ভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের

উত্তর পরমাত্মা-উপলব্ধির মাধ্যমে যথাযথভাবে পাওয়া যায়। পরমাত্মা হচ্ছেন জীবের পূর্বকৃত কার্যকলাপের সাক্ষী। কোন মানুষের হয়ত ছোটবেলার কথা মনে না থাকতে পারে, কিন্তু তার পিতা, যিনি তাকে ধীরে ধীরে বড় হতে দেখেছেন, তাঁর অবশ্যই মনে থাকে। তেমনই, জীব বিভিন্ন জীবনে বিভিন্ন দেহ পরিবর্তন করলেও পরমাত্মা সর্বদাই তার সঙ্গে অবস্থান করে তার সমস্ত কার্যকলাপের কথা মনে রাখেন।

শ্লোক ২০

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ২০ ॥

অথবা—অথবা; **বহুনা**—বহু; **এতেন**—এর দ্বারা; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **জ্ঞাতেন**—জানা হলে; **তব**—তোমার দ্বারা; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **বিষ্টভ্য**—ব্যাপ্ত; **অহম্**—আমি; **ইদম্**—এই; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **এক-অংশেন**—এক অংশের দ্বারা; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—) "হে অর্জুন! এর থেকে বেশি আর কি বলব? আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকি।"

তাৎপর্য

অর্জুনকে নিজের শক্তি বর্ণনা করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* (১০/৪২) এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

শ্লোক ২১

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ২১ ॥

তম্—তাঁকে; **ইমম্**—এই; **অহম্**—আমি; **অজম্**—জন্মরহিত; **শরীর-ভাজাম্**—দেহধারী বদ্ধ জীবের; **হৃদি হৃদি**—প্রত্যেকের হৃদয়ে; **ধিষ্ঠিতম্**—অধিষ্ঠিত; **আত্ম**—তাদের নিজেদের দ্বারা; **কল্পিতানাম্**—কল্পিত; **প্রতিদৃশম্**—প্রতিটি চক্ষুর; **ইব**—মতো; **ন এক-ধা**—একভাবে নয়; **অর্কম্**—সূর্য; **একম্**—এক; **সমধিগতঃ**—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন; **অস্মি**—আমি হই; **বিধূত**—দূরীকৃত; **ভেদ-মোহঃ**—বিভেদরূপ মোহ।

অনুবাদ

(পিতামহ ভীষ্ম বললেন—) "একই সূর্য যেমন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন দ্রষ্টার নিকট পৃথক পৃথক সূর্যরূপে দৃষ্ট হয়, তেমনই দেহধারী প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে জন্মরহিত তোমাকে পৃথক পৃথক তত্ত্ব বলে ভ্রম হয়। কিন্তু দ্রষ্টা যখন নিজেকে তোমার একজন সেবকরূপে জানতে পারেন, তখন তাঁর বিভেদরূপ মোহ আর থাকে না। এভাবেই পরমাত্মাকে তোমার অংশ জেনে আমি এখন তোমার শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৯/৪২) থেকে উদ্ধৃত। পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহ ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়ে জীবনের অন্তিম সময়ে এই শ্লোকটি পাঠ করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মৃত্যুর পথযাত্রী ভীষ্মদেবের কাছ থেকে নৈতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও অগণিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, মুনি-ঋষি সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত হলে, ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে এই শ্লোকটি পাঠ করেছিলেন।

বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে একই সূর্যকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সূর্য বলে মনে হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের একাংশ পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করায় তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন পরমাত্মা বলে মনে হয়। কেউ যখন ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত হন, তখন তিনি পরমাত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশরূপে দর্শন করেন। ভীষ্মদেব জানতেন যে, পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ এবং তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জন্মরহিত, চিন্ময় পরম পুরুষ।

শ্লোক ২২

সেইত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গোবিন্দ স্বয়ং চৈতন্য গোসাঞিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর মতো এমন দয়ালু আর কেউ নেই।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রকাশের মাধ্যমে গোবিন্দের তত্ত্ব বর্ণনা করে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা এখন প্রমাণ করছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সেই গোবিন্দ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা প্রদান করা সত্ত্বেও যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা তাঁর সেই শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে তাঁকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি স্বয়ং কৃষ্ণভক্ত রূপে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর অংশ-প্রকাশ। তাই সমস্ত

মানুষদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব রকমের জড় মতবাদগুলি বর্জন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করতে। ভগবানের চরণে অপরাধী মানুষেরা তাদের অজ্ঞতার জন্য এই উপদেশ কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না। তাই তাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ আবার অবতীর্ণ হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা তা ধ্রুব সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের *প্রকাশ* বা *বিলাস* বিগ্রহ নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ংরূপ গোবিন্দ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সেই সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দেওয়া শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) *চৈতন্য উপনিষদে* (৫) বলা হয়েছে—*গৌরঃ সর্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতি।* "শ্রীগৌর, যিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান, তিনি মহাযোগী ও মহাত্মারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রকৃতির তিন গুণের অতীত এবং তিনি সত্ত্বরূপ। তিনি সমস্ত জগৎ জুড়ে ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন করেন।"

(২) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৭ ও ৩/১২) বলা হয়েছে—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

"হে পরমেশ্বর! আপনি পরম মহেশ্বর, সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য এবং সমস্ত ঈশ্বরদের মধ্যে পরম ঈশ্বর। আপনি সমস্ত পতিদের পতি, পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত আরাধ্য পুরুষদের মধ্যে আরাধ্য।"

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মহাপ্রভু, যিনি দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। তাঁর সংস্পর্শে আসার অর্থই হচ্ছে অব্যয় ব্রহ্মজ্যোতির সংস্পর্শে আসা।"

(৩) *মুণ্ডক উপনিষদে* (৩/১/৩) বলা হয়েছে—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

"পরম ভোক্তা, পরম কর্তা, পরমব্রহ্মের উৎস সেই গৌরকান্তি পরম পুরুষকে যিনি দর্শন করেছেন, তিনি মুক্ত।"

(৪) *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩৩-৩৪ ও ৭/৯/৩৮) বলা হয়েছে—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

"সকলের পরম ধ্যেয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণারবিন্দে আমরা আমাদের প্রণতি নিবেদন করি। তিনি তাঁর ভক্তদের অমর্যাদা ধ্বংস করেন, তিনি তাঁর ভক্তদের ক্লেশ দূর করেন এবং তাঁদের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করে তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান করেন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত তীর্থের উৎস এবং সমস্ত মুনি-ঋষিদের আশ্রয়। তিনি শিব, বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) আদিরও আরাধ্য। তিনি হচ্ছেন ভবসমুদ্র পার হওয়ার তরণি।"

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

"আমরা সেই মহাপুরুষের চরণারবিন্দের বন্দনা করি, যিনি হচ্ছেন সকলের ধ্যেয়। তিনি তাঁর গৃহস্থাশ্রম এবং স্বর্গের দেবতাদেরও আরাধ্য তাঁর নিত্য সহচরী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে ত্যাগ করে মায়াচ্ছন্ন অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন।"

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥

"হে ভগবান! আপনি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, জলচর জীব আদি বিভিন্ন কুলে অবতীর্ণ হয়ে জগতের সমস্ত শত্রুদের সংহার করেন। এভাবেই আপনি জগৎকে দিব্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। হে মহাপুরুষ! কলিযুগে আপনি কখনও কখনও নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অবতরণ করেন। তাই আপনার আর এক নাম ত্রিযুগ (যিনি কেবল তিন যুগে আবির্ভূত হন)।"

(৫) *কৃষ্ণযামলে* বলা হয়েছে—*পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।* "পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে আমি শচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হব।"

(৬) *বায়ু পুরাণে* বলা হয়েছে—*কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।* "কলিযুগে যখন সংকীর্তন আন্দোলন আরম্ভ হবে, তখন আমি শচীদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হব।"

(৭) *ব্রহ্মযামলে* বলা হয়েছে—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্ ।
মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্তনাগমে ॥

"কখনও কখনও আমি ভক্তরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হই। বিশেষ করে কলিযুগে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করার জন্য আমি শচীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হই।"

(৮) *অনন্ত-সংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—

য এব ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকাপ্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসীন্মহেশ্বরি ॥

"হে মহেশ্বরী। যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রাণধন এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর, সেই জগতের নাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরসুন্দর রূপে আবির্ভূত হন।"

শ্লোক ২৩

পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবীর পতি শ্রীনারায়ণ পরব্যোম বা চিৎ-জগতে অবস্থান করেন। তিনি ঐশ্বর্য, বল, শ্রী, জ্ঞান, যশ ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

বেদ, ভাগবত, উপনিষৎ, আগম।
'পূর্ণতত্ত্ব' যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন তিনি, যাঁকে সমস্ত বেদ, ভাগবত, উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পূর্ণতত্ত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমান আর কেউ নেই।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপ বর্ণনা করে *বেদে* প্রচুর প্রামাণিক তত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

১) *ঋক্-সংহিতায়* (১/২২/২০) উল্লেখ করা হয়েছে—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, যাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার জন্য সমস্ত দেবতারা সর্বদা উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। সূর্যকিরণের মতো তিনি তাঁর শক্তির কিরণের মাধ্যমে সর্বব্যাপ্ত। বিকৃত দর্শনের ফলে তাঁকে নির্বিশেষ বলে মনে হয়।"

২) *নারায়ণাথর্বশির উপনিষদে* (১-২) উল্লেখ করা হয়েছে—*নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে নারায়ণাৎ প্রবর্তন্তে নারায়ণে প্রলীয়ন্তে..... অথ নিত্যো নারায়ণঃ.... নারায়ণ এবেদং সর্বং*

যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্.... শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। "নারায়ণের থেকে সব কিছুর উদ্ভব হয়েছে, তাঁর দ্বারাই সব কিছু প্রতিপালিত হয় এবং চরমে সব কিছু তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। তাই নারায়ণ নিত্য। যা কিছুর অস্তিত্ব এখন রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে, সে সবই নারায়ণ ব্যতীত আর কিছু নয়। তাঁর শ্রীবিগ্রহ পরম বিশুদ্ধ। সেই নারায়ণ এক এবং অদ্বিতীয়।"

৩) *নারায়ণ উপনিষদে* (১/৪) উল্লেখ করা হয়েছে—*যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতা।* "সমস্ত জগৎ যাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেই নারায়ণ হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস।"

৪) *হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—*পরমাত্মা হরির্দেবঃ।* "শ্রীহরিই হচ্ছেন পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান।"

৫) *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৩/৩৪-৩৫) বলা হয়েছে—

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥

"হে মুনিগণ! আপনারা যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য আপনারা কৃপা করে আমাদের কাছে নারায়ণের স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করুন, যে নারায়ণকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।"

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥

"হে রাজন্, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু, কিন্তু স্বয়ং হেতুরহিত, তিনি নারায়ণ নামে পরমতত্ত্ব রূপে জ্ঞাতব্য। যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি দশায় এবং তারও ঊর্ধ্বে সমাধি প্রভৃতি স্তরে সর্বত্র সদ্রূপে অনুবর্তনশীল, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব রূপে জ্ঞাতব্য। এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়—এগুলি যাঁর শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই পরমাত্মা জ্ঞাপক পরমতত্ত্ব রূপে জ্ঞাতব্য।"

শ্লোক ২৫

ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বর্গের দেবতারা যেমন সূর্যদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন, ভক্তিযোগে ভগবদ্ভক্তও সেই রকমভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য, শাশ্বত রূপ রয়েছে, যা জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না

অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কেবলমাত্র দিব্য ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে ভগবানের চিন্ময় রূপ উপলব্ধি করা যায়। এখানে সূর্যদেবের সবিশেষ রূপ দর্শনের সঙ্গে ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শনের তুলনা করা হয়েছে। আমরা যদিও আমাদের জড় চক্ষুর মাধ্যমে সূর্যদেবের সবিশেষ রূপ দর্শন করতে পারি না, কিন্তু তিনি সবিশেষ সত্তাসম্পন্ন এবং স্বর্গের দেবতারা তাঁর রূপ দর্শন করতে পারেন। কারণ, সূর্যদেবের দেহনির্গত যে রশ্মিচ্ছটা তাঁকে আবৃত করে রেখেছে, সেই রশ্মিচ্ছটার আবরণ ভেদ করে সূর্যদেবকে দর্শন করার উপযুক্ত চক্ষু তাঁদের রয়েছে। জড়া প্রকৃতির নির্দেশনায় পরিচালিত প্রতিটি গ্রহেরই নিজস্ব একটি পরিবেশ রয়েছে। তাই, কোন বিশেষ গ্রহে যেতে হলে সেখানকার পরিবেশের উপযোগী একটি বিশেষ দেহের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর মানুষেরা হয়ত চন্দ্রলোকে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা অনায়াসে অগ্নিময় সূর্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে যা অসাধ্য, স্বর্গের দেবতাদের কাছে তা সহজলভ্য, কেন না তাঁদের শরীর ভিন্ন ধরনের এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার জন্য ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জনে রঞ্জিত চিন্ময় চক্ষুর প্রয়োজন। যারা অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গের সাহায্য ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করে, তারা কখনই তাঁকে জানতে পারে না। আরোহ পন্থায় পরমতত্ত্বকে জানার চরম সীমা হচ্ছে ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও পরমাত্মা-উপলব্ধি, কিন্তু সেই পন্থায় কখনও সবিশেষ ভগবানকে জানা যায় না।

শ্লোক ২৬

জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব ।
ব্রহ্ম-আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

জ্ঞানমার্গে অথবা যোগমার্গে যারা তাঁর ভজনা করে, তারা তাঁকে যথাক্রমে ব্রহ্মরূপে ও পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করে।

তাৎপর্য

যারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে পরমতত্ত্বকে জানার চেষ্টা করে, অথবা অষ্টাঙ্গযোগের মাধ্যমে পরমতত্ত্বের ধ্যান করে, তারা যথাক্রমে পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটারূপ নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এই ধরনের অধ্যাত্মবাদীরা কখনই ভগবানের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ দর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ২৭

উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা ।
অতএব সূর্য তাঁর দিয়ে ত' উপমা ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিভিন্ন উপাসনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্নভাবে ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা হয়। তাই তাঁর সঙ্গে সূর্যের উপমা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২৮

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একই পরমেশ্বর ভগবান। যদিও তাঁরা একই বিগ্রহ, কিন্তু তাঁদের আকার ভিন্ন।

শ্লোক ২৯

ইহোঁত দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাত ।
ইহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ এবং তাঁর সেই ভুজদ্বয়ে তিনি বংশী ধারণ করেন। আর তাঁর নারায়ণ রূপে তিনি চতুর্ভুজ এবং সেই ভুজচতুষ্টয়ে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন।

তাৎপর্য

নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাঁরা একই পুরুষ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। উচ্চ আদালতের (হাইকোর্টের) বিচারপতি যেমন আদালতে অবস্থানকালে একভাবে এবং তাঁর বাড়িতে অবস্থানকালে ভিন্নভাবে জীবন যাপন করেন, এটি অনেকটা সেই রকম। নারায়ণ রূপে ভগবান চতুর্ভুজ, কিন্তু কৃষ্ণরূপে তিনি দ্বিভুজ।

শ্লোক ৩০

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

নারায়ণঃ—ভগবান শ্রীনারায়ণ; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **সর্ব**—সমস্ত; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবদের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **অসি**—তুমি হও; **অধীশ**—হে অধীশ্বর; **অখিল-লোক**—সমস্ত জগতের; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ নামে অভিহিত;

অঙ্গম্—অংশ-প্রকাশ; নর—নরের; ভূ—জন্ম; জল—জলে; অয়নাৎ—আশ্রয়স্থল হওয়ার ফলে; তৎ—সেই; চ—এবং; অপি—অবশ্যই; সত্যম্—পরম সত্য; ন—না; তবৈব—তোমারই; মায়া—মায়াশক্তি।

অনুবাদ

"হে অধীশ্বর, তুমি অখিল লোকসাক্ষী। তুমি হচ্ছ সকলের প্রিয় আত্মা, তাই তুমি কি আমার পিতা নারায়ণ নও? নর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু) জাত জল হচ্ছে নার, তাতে যাঁর অয়ন (আশ্রয়স্থল), তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু কেউই মায়ার অধীন নন। তাঁরা সকলেই মায়াধীশ, মায়াতীত পরম সত্য।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/১৪) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্যের কাছে পরাভূত হয়ে ব্রহ্মা যখন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন, তখন দৈন্যতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করার সময়ে তিনি এই উক্তিটি করেন। ব্রহ্মা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন যে, গোপবালক রূপে লীলাবিলাসকারী শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান কি না। ব্রহ্মা গোচারণভূমি থেকে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গাভীদের এবং গোপবালকদের অপহরণ করে নিয়ে যান। কিন্তু তারপর তিনি যখন গোচারণভূমিতে ফিরে আসেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, তাঁর অপহৃত সমস্ত গোপবালক ও গাভীরা সেখানে ঠিক আগের মতোই বিরাজ করছে, কেন না শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁদের সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের এই যোগৈশ্বর্য দর্শন করেন, তখন তিনি নিজের পরাজয় স্বীকার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছুর পরম অধীশ্বর, লোকসাক্ষী এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপী পরম প্রিয় প্রভু বলে সম্বোধন করে তাঁর বন্দনা করেন। এই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ব্রহ্মার পিতা নারায়ণ, কারণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু গর্ভসমুদ্রে শয়ন করে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ-সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুও এই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় অংশ-প্রকাশ।

শ্লোক ৩১

শিশু বৎস হরি' ব্রহ্মা করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথী ও গো-বৎসদের হরণ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা অপরাধ করেছিলেন। তাই, অপরাধ খণ্ডন করার জন্য তিনি ভগবানের কাছে কৃপাভিক্ষা করেন।

শ্লোক ৩২

তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা, আমি তোমার তনয় ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার নাভিপদ্ম থেকে আমার জন্ম হয়েছে। তাই তুমি আমার পিতা-মাতা এবং আমি তোমার সন্তান।

শ্লোক ৩৩

পিতা-মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম, মোরে করহ প্রসাদ ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পিতা-মাতা কখনও তাঁদের শিশু-সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করেন না। আমি তাই তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর।"

শ্লোক ৩৪

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "হে ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ। আমি একজন গোপশিশু মাত্র, আর তুমি বলছ যে তুমি আমার পুত্র। সেটি কি করে সম্ভব?"

শ্লোক ৩৫

ব্রহ্মা বলেন, তুমি কি না হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ—শুন তাহার কারণ ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, "তুমি কি নারায়ণ নও? তুমি যে নারায়ণ, তার কারণ আমি বলছি। কৃপা করে শোন।

শ্লোক ৩৬

প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে যত জীব রয়েছে, তাদের সকলেরই আদি উৎস হচ্ছ তুমি। কারণ তুমি সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সমন্বয়ের ফলে জড় জগতের প্রকাশ হয়। চিৎ-জগতে এই ধরনের কোন জড় গুণ নেই, যদিও তা চিন্ময় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। চিৎ-জগতে অসংখ্য জীব রয়েছেন, যাঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত নিত্যমুক্ত আত্মা। জড় জগতের বদ্ধ জীবাত্মারা জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ ক্লেশে জর্জরিত। পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় বিমুখ হওয়ার ফলে তারা বিভিন্ন যোনিতে জড় শরীর ধারণ করে জড় জগতে আবদ্ধ থাকে।

সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের আদি উৎস, কারণ তারা সকলেই তাঁর তটস্থা শক্তিসম্ভূত। সেই সমস্ত জীবাত্মাদের কেউ কেউ জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ, আর অন্যরা পরা প্রকৃতির দিব্য আশ্রয়ে নিত্যস্থিত। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে পরা প্রকৃতির বিকৃত প্রকাশ, ঠিক যেমন ধোঁয়া হচ্ছে আগুনের বিকৃত প্রকাশ। ধোঁয়া আগুনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আগুনের মধ্যে ধোঁয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। আগুনের দ্বারা বহু কাজ সাধিত হয়, কিন্তু ধোঁয়া কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। চিন্ময় জগতে মুক্ত জীবাত্মাদের পরম ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেবা পাঁচটি বিভিন্ন রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জড় জগতে সকলেই জড় সুখ ও দুঃখ কেন্দ্রিক আত্মস্বার্থ চিন্তায় মগ্ন। জড় জগতে সকলেই নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে মায়াশক্তিকে ভোগ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা কখনই সফল হয় না, কারণ স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করার ক্ষমতা জীবদের নেই। তারা হচ্ছে সঙ্কর্ষণের এক অতি নগণ্য অংশ মাত্র। সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই ভগবানকে বলা হয় নারায়ণ।

শ্লোক ৩৭

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয় ।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয় ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পৃথিবী যেমন মাটি দিয়ে তৈরি সমস্ত পাত্রের মূল কারণ ও আশ্রয়, তুমিও হচ্ছ সমস্ত জীবের পরম কারণ ও আশ্রয়।

তাৎপর্য

বিশাল পৃথিবী যেমন সমস্ত মাটির পাত্রের উপাদানসমূহের মূল উৎস, তেমনই পরম আত্মা হচ্ছেন সমস্ত জীবের উৎস। সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের কারণ। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে ভগবান বলেছেন, *বীজং মাং সর্বভূতানাম্* ("আমি হচ্ছি সমস্ত জীবের বীজ") এবং *উপনিষদে* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* ("ভগবান হচ্ছেন সমস্ত চেতনের মধ্যে পরম চেতন")।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড় ও চেতন উভয় সৃষ্টিরই মূল উৎস। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, যদিও জীবের দুই রকমের শরীর রয়েছে—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর এবং পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর এবং যদিও সে এভাবেই (স্থূল, সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক) তিন রকমের শরীরে বিরাজ করছে, তবুও সে চিন্ময় আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনই, জড় ও চেতন জগৎ প্রকাশকারী পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম আত্মা। জীবাত্মা যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থেকে প্রায় অভিন্ন, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানও জড় এবং চেতন জগৎ থেকে প্রায় অভিন্ন। জড় বিষয়ভোগের চেষ্টায় মগ্ন বদ্ধ জীবে পরিপূর্ণ মায়িক জগৎ হচ্ছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পূর্ণ চিৎ-জগৎ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। যেহেতু সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ চিৎ-স্ফুলিঙ্গ, তাই তিনি হচ্ছেন জড় ও চেতন উভয় জগতেরই পরমাত্মা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের* অনুসরণকারী বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সব কিছুর কারণ ও কার্যরূপী পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য তত্ত্ব এবং তিনি তাঁর প্রকাশিত শক্তির সঙ্গে যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন।

শ্লোক ৩৮

'নার'-শব্দে কহে সর্বজীবের নিচয় ।
'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'নার' শব্দে সমস্ত জীবকে বোঝানো হয় এবং 'অয়ন' শব্দে তাদের আশ্রয়কে বোঝায়।

শ্লোক ৩৯

অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই তুমিই হচ্ছ মূল নারায়ণ। সেটি হচ্ছে একটি কারণ, এখন কৃপা করে দ্বিতীয় কারণটি শোন।

শ্লোক ৪০

জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার ।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য অপার ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"পুরুষাবতারেরা হচ্ছেন জীবের ঈশ্বর। কিন্তু তোমার ঐশ্বর্য ও শক্তি তাঁদের থেকে অধিক।

শ্লোক ৪১

অতএব অধীশ্বর তুমি সর্বপিতা ।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই তুমি হচ্ছ সকলের অধীশ্বর, সকলের পরম পিতা। তাঁরা (পুরুষাবতারেরা) তোমার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জগৎ পালন করেন।

শ্লোক ৪২

নারের অয়ন যাতে করহ পালন ।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু তুমি সমস্ত জীবের আশ্রয় এই পুরুষাবতারদের পালন কর, তাই তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ।

তাৎপর্য

এই জগতে সমস্ত জীবের পালনকর্তা হচ্ছেন তিনজন পুরুষাবতার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এই পুরুষাবতারদের থেকেও অধিক ব্যাপক ও প্রবল। তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পিতা ও প্রভু, যিনি তাঁর বিবিধ অংশ-প্রকাশের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালন করেন। যেহেতু তিনি সমস্ত জীবের আশ্রয় এই পুরুষাবতারদেরও পালন করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৪৩

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্ ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান! দয়া করে আমার তৃতীয় কারণটি শ্রবণ কর। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদি ধাম রয়েছে।

শ্লোক ৪৪

ইথে যত জীব, তার ত্রৈকালিক কর্ম ।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের সমস্ত জীবের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপ তুমি প্রত্যক্ষ কর। যেহেতু তুমি হচ্ছ সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী, তাই তুমি সব কিছুর মর্ম জান।

শ্লোক ৪৫

তোমার দর্শনে সর্ব জগতের স্থিতি ।
তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তুমি তাদের পরিচালনা কর বলেই সমস্ত জগতের স্থিতি হয়। তোমার এই রকম পরিচালনা ব্যতীত কোন কিছুই স্থিতিশীল বা গতিশীল হতে পারে না অথবা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

শ্লোক ৪৬

নারের অয়ন যাতে কর দরশন ।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি সমস্ত জীবের কার্যকলাপ দর্শন কর। সেই কারণেও তুমি হচ্ছ মূল নারায়ণ।"

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতের সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পরমাত্মারূপে তিনি হচ্ছেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সর্বকালের সর্বজীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। জীব তার পূর্বের শত-সহস্র জীবনে কি করেছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণ জানেন এবং বর্তমানে তারা কি করছে তাও তিনি জানেন; তাই তাদের বর্তমান কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তারা কি ধরনের ফল লাভ করবে, সেই সম্বন্ধেও তিনি পূর্ণরূপে অবগত। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয়। তাঁর অধ্যক্ষতা ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যেহেতু তিনি প্রত্যেক জীবের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ মহাবিষ্ণুকেও প্রত্যক্ষ করেন, তাই তিনি হচ্ছেন মূল নারায়ণ।

শ্লোক ৪৭

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা, তোমার না বুঝি বচন ।
জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ বললেন, "ব্রহ্মা, তুমি যে কি বলছ, তা আমি বুঝতে পারছি না। শ্রীনারায়ণ হচ্ছেন তিনি, যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং কারণ-সমুদ্রের জলে শয়ন করেন।"

শ্লোক ৪৮

ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ ।
সেই সব তোমার অংশ—এ সত্য বচন ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মা উত্তর দিলেন, "আমি যা বলেছি তা সত্য। কারণ-সমুদ্রের জলে ও জীবের হৃদয়ে যে নারায়ণ বিরাজ করেন, তাঁরা হচ্ছেন তোমার অংশ-প্রকাশ।

শ্লোক ৪৯

কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী ।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু মায়ার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। সেই সূত্রে তাঁরা মায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শ্লোক ৫০

সেই তিন জলশায়ী সর্ব-অন্তর্যামী ।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ-নামী ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"জলে শয়নকারী এই তিনজন পুরুষ হচ্ছেন সব কিছুর পরমাত্মা। প্রথম পুরুষ হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডসমূহের পরমাত্মা।

শ্লোক ৫১

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী ।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"সমষ্টিগত জীবের পরমাত্মা হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু।

শ্লোক ৫২

এ সবার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত পুরুষদের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াতীত, তাঁর সঙ্গে মায়ার কোন সম্বন্ধ নেই।

তাৎপর্য

কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষাবতারের সকলেরই জড়া প্রকৃতি বা মায়ার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, কারণ মায়ার দ্বারা তাঁরা জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। এই তিন পুরুষ, যাঁরা যথাক্রমে কারণসমুদ্র, গর্ভসমুদ্র ও ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করেন, তাঁরা হচ্ছেন সব কিছুর পরমাত্মা। কারণোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমষ্টিগত জীবের পরমাত্মা এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা। সৃষ্টির কারণে তাঁরা যেহেতু মায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই বলা যায় যে তাঁরা মায়ার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াতীত। তাঁর সঙ্গে মায়ার কোন সংস্পর্শ নেই। তাঁর এই চিন্ময় স্থিতিকে বলা হয় *তুরীয়* বা মায়াতীত।

শ্লোক ৫৩

বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ ।
ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৫৩ ॥

বিরাট্—বিরাট প্রকাশ; **হিরণ্য-গর্ভঃ**—হিরণ্যগর্ভ প্রকাশ; **চ**—এবং; **কারণম্**—কারণরূপী প্রকাশ; **চ**—এবং; **ইতি**—এভাবে; **উপাধয়ঃ**—বিশেষ উপাধিযুক্ত; **ঈশস্য**—ঈশ্বরের; **যৎ**—যা; **ত্রিভিঃ**—এই তিন; **হীনম্**—বিহীন; **তুরীয়ম্**—চতুর্থ, পুরুষত্রয়ের অতীত বৈকুণ্ঠ; **তৎ**—সেই; **প্রচক্ষতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

" 'এই জড় জগতে ভগবান বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই তিন মায়া সম্বন্ধীয় উপাধিযুক্ত। কিন্তু এই তিনটি উপাধির অতীত চতুর্থ স্তরে ভগবানের যে চরম স্থিতি, তাকে বলা হয় তুরীয়।'

তাৎপর্য

বিরাটরূপে ভগবানের প্রকাশ, সব কিছুর আত্মারূপে তাঁর প্রকাশ এবং প্রকৃতির কারণরূপে তাঁর প্রকাশ—এই সমস্তই পুরুষাবতারদের উপাধি, যাঁরা জড় সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন। ভগবানের চিন্ময় স্তর সব রকম উপাধির অতীত, তাই সেই স্তরকে বলা হয় চতুর্থ বা মায়াতীত স্তর। এটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকের শ্রীধর স্বামী কৃত টীকার উদ্ধৃতি।

শ্লোক ৫৪

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার ।
তথাপি তৎস্পর্শ নাহি, সবে মায়া-পার ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও এই তিনজন পুরুষাবতার মায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তবুও মায়া তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা সকলেই মায়ার অতীত।

শ্লোক ৫৫

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৫৫ ॥

এতৎ—এই; **ঈশনম্**—ঐশ্বর্য; **ঈশস্য**—ভগবানের; **প্রকৃতিস্থঃ**—জড়া প্রকৃতিতে স্থিত; **অপি**—যদিও; **তৎ**—মায়ার; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **ন যুজ্যতে**—প্রভাবিত হন না; **সদা**—সর্বদা; **আত্মস্থৈঃ**—তাঁর স্বীয় শক্তিতে অবস্থিত; **যথা**—যেমন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তৎ**—তাঁর; **আশ্রয়া**—যা আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

' "জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির গুণের বশীভূত না হওয়াই হচ্ছে ভগবানের ঐশ্বর্য। তেমনই, যাঁরা তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁদের বুদ্ধিকে তাঁর উপর নিবদ্ধ করেন, তাঁরাও কখনও প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১১/৩৮) থেকে উদ্ধৃত। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা জড়া প্রকৃতিতে অবস্থান করলেও জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের মধ্যে অবস্থান করে গুণজাত বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের কৃষ্ণভাবনাময় অপ্রাকৃত বুদ্ধির প্রভাবে তাঁরা কখনই জড়া প্রকৃতির সেই গুণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ এই ধরনের ভক্তদের আকৃষ্ট করতে পারে না। তাই, পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অনুগত সেবাপরায়ণ ভক্তরা জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ৫৬

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয় ।
তুমি মূল নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি হচ্ছ সেই তিন পুরুষাবতারের পরম আশ্রয়। সুতরাং তুমিই যে মূল নারায়ণ, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এখানে তাঁর উক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তিন পুরুষাবতার—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর মূল উৎস। তাঁর লীলাবিলাসের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রথমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে প্রকাশ করেন এবং এই চার প্রকাশই (চতুর্ব্যূহ) হচ্ছেন ভগবানের আদি প্রকাশ। কারণ-সমুদ্রে শায়িত সমগ্র জড় শক্তি বা মহৎ-তত্ত্বের স্রষ্টা প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুর প্রকাশ হয় সঙ্কর্ষণ থেকে, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয় প্রদ্যুম্ন থেকে এবং তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয় অনিরুদ্ধ থেকে। এই তিন পুরুষাবতার নারায়ণ থেকে উদ্ভূত প্রকাশসমূহের সমপর্যায়ভুক্ত। নারায়ণ প্রকাশিত হন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে।

শ্লোক ৫৭

সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ ।
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল-নারায়ণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই তিন পুরুষাবতারের উৎস হচ্ছেন চিদাকাশে নিত্য বিরাজমান নারায়ণ, যিনি হচ্ছেন তোমার বিলাস-বিগ্রহ। তাই তুমিই হচ্ছ মূল নারায়ণ।"

শ্লোক ৫৮

অতএব ব্রহ্মবাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ ।
তেঁহো কৃষ্ণের বিলাস—এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

সুতরাং ব্রহ্মার বিচার অনুসারে, চিদাকাশে নিত্য অধিষ্ঠিত নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৯

এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার ।
পরিভাষা-রূপে ইহার সর্বত্রাধিকার ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকে (৩০) যে সত্য নিরূপিত হয়েছে, তা শ্রীমদ্ভাগবতের চূড়ান্ত বিচার। এই বিচার শাস্ত্রীয় পরিভাষারূপে সর্বত্র ব্যবহার করা হয়।

শ্লোক ৬০

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার ।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান—এই সবই যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, সেই সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত না হয়ে পণ্ডিতাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে।

শ্লোক ৬১

অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার ।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের ভ্রান্ত বিচার অনুসারে, যেহেতু নারায়ণ চতুর্ভুজ-সম্পন্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতো, তাই নারায়ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর অবতার।

তাৎপর্য

তথাকথিত কোন কোন পণ্ডিতেরা বলে যে, যেহেতু নারায়ণের চারটি হাত রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের দুটি হাত রয়েছে, তাই নারায়ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান, যাঁর থেকে কৃষ্ণ অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এই ধরনের নির্বোধ পণ্ডিতেরা পরমতত্ত্বের বিবিধ প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

শ্লোক ৬২

এইমতে নানারূপ করে পূর্বপক্ষ ।
তাহারে নির্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিরুদ্ধপক্ষ নানা রকম তর্কের উত্থাপন করে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাদের সেই সমস্ত তর্ককে খণ্ডন করে।

শ্লোক ৬৩

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৬৩ ॥

বদন্তি—বলেন; তৎ—সেই; তত্ত্ব-বিদঃ—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ; তত্ত্বম্—পরমতত্ত্ব; যৎ—যা; জ্ঞানম্—জ্ঞান; অদ্বয়ম্—অদ্বয়; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; ইতি—এই নামে; পরমাত্মা—পরমাত্মা; ইতি—এই নামে; ভগবান্—ভগবান; ইতি—এই নামে; শব্দ্যতে—কথিত হন।

অনুবাদ

"যা অদ্বয়জ্ঞান, অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত হন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/২/১১) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৪

শুন ভাই এই শ্লোক করহ বিচার ।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

হে ভাইসকল, দয়া করে তোমরা এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তার অর্থ বিচার কর—একই মুখ্যতত্ত্ব তিনটি বিভিন্ন রূপে জ্ঞাত হন।

শ্লোক ৬৫

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব। তিনি নিজেকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিনটি রূপে প্রকাশিত করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১/২/১১) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে মুখ্য শব্দ *ভগবান্* অর্থে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হচ্ছেন সেই পরম পুরুষের আনুষঙ্গিক প্রকাশ, ঠিক যেমন রাজ্যের সরকার ও মন্ত্রীমণ্ডলী হচ্ছে রাজার আনুষঙ্গিক প্রকাশ। পক্ষান্তরে বলা যায়, পরমতত্ত্ব তিনটি বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত হয়েছেন। পরমতত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা রূপেও পরিচিত। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকাশ তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৬৬

এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্বচন ।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকের স্পষ্ট অর্থ তোমাকে তর্ক থেকে বিরত করেছে। এখন শ্রীমদ্ভাগবতের আর একটি শ্লোক শ্রবণ কর।

শ্লোক ৬৭

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৬৭ ॥

এতে—এই সমস্ত; চ—এবং; অংশ-কলাঃ—অংশ অথবা কলা; পুংসঃ—পুরুষাবতারদের; কৃষ্ণঃ তু—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ; ভগবান্—আদিপুরুষ ভগবান; স্বয়ম্—স্বয়ং; ইন্দ্র-অরি—ইন্দ্রের শত্রু; ব্যাকুলম্—উপদ্রুত; লোকম্—বিশ্ব; মৃড়য়ন্তি—সুখী করেন; যুগে যুগে—প্রতি যুগে।

অনুবাদ

"ভগবানের এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষাবতারদের অংশ অথবা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। ইন্দ্রের শত্রুদের দ্বারা বিশ্ব যখন প্রপীড়িত হয়, তখন ভগবান তাঁর অংশ-কলার দ্বারা যুগে যুগে বিশ্বকে রক্ষা করেন।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণু বা নারায়ণের অবতার—এই মতবাদটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটিতে (১/৩/২৮) স্পষ্টভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। এই শ্লোকটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহ, বরাহদেব আদি সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, কিন্তু তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ অথবা কলা।

শ্লোক ৬৮

সব অবতারের করি সামান্য-লক্ষণ ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতে সাধারণভাবে সমস্ত অবতারের লক্ষণ ও কার্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেও গণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৯

তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয় ।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল সূত গোস্বামী তখন মনে বড় ভয় পেলেন। তাই তিনি প্রতিটি অবতারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ৭০

অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষাবতারদের অংশ ও কলা, কিন্তু আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অবতারের অবতারী।

শ্লোক ৭১

পূর্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান ।
পরব্যোম-নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এখন বিরুদ্ধপক্ষ হয়ত বলতে পারে, "সেটি তোমার নিজের ব্যাখ্যা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নারায়ণ, যিনি পরব্যোমে বিরাজ করেন।

শ্লোক ৭২

তেঁহ আসি' কৃষ্ণরূপে করেন অবতার ।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি (নারায়ণ) শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতরণ করেন। আমার মতে সেটিই হচ্ছে এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ। সুতরাং অন্য আর কোন বিচারের প্রয়োজন নেই।"

শ্লোক ৭৩

তারে কহে—কেনে কর কুতর্কানুমান ।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই ধরনের ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকারদের আমরা বলি, "কেন এভাবে কুতর্ক করছ? শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থ কখনও প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয় না।

শ্লোক ৭৪

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদম্—উদ্দেশ্য; অনুক্ত্বা—যা উক্ত হয়নি; তু—কিন্তু; ন—না; বিধেয়ম্—বিধেয়; উদীরয়েৎ—বলা উচিত; ন—না; হি—অবশ্যই; অলব্ধ-আস্পদম্—সঠিক আশ্রয়বিহীন; কিঞ্চিৎ—কিঞ্চিৎ; কুত্রচিৎ—কোথাও; প্রতিতিষ্ঠতি—অবস্থান বা প্রতিষ্ঠা হয়।

অনুবাদ

"উদ্দেশ্যের আগে বিধেয় উল্লেখ করা উচিত নয়, কেন না তার ফলে সেই বাক্যের আশ্রয় থাকে না এবং তাই তার প্রতিষ্ঠা হয় না।'

তাৎপর্য

অলঙ্কারের এই নিয়মটি *একাদশী*-তত্ত্বের ত্রয়োদশ স্কন্ধে শব্দের আলঙ্কারিক ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে। আলঙ্কারিক বিচার অনুসারে অজ্ঞাত বিষয়কে *বিধেয়* এবং জ্ঞাত বস্তুকে

অনুবাদ বা *উদ্দেশ্য* বলা হয়। অজ্ঞাত বিষয়কে জ্ঞাত বস্তুর পূর্বে উল্লেখ করা উচিত নয়, কেন না তা হলে সেই বিষয়ের কোন অর্থ থাকে না।

শ্লোক ৭৫

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাদ্বিধেয় ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"অনুবাদ বা উদ্দেশ্য উল্লেখ না করে বিধেয় উল্লেখ করা হয় না। তাই, আগে উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তার পরে বিধেয় সম্বন্ধে বলা হয়।

শ্লোক ৭৬

'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত ।
'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"পাঠকের কাছে বাক্যের যে অংশ অজ্ঞাত, তাকে বলা হয় বিধেয় এবং যে অংশ জ্ঞাত তাকে বলা হয় অনুবাদ।

শ্লোক ৭৭

যৈছে কহি,—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত ।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।' এই বাক্যে বিপ্র হচ্ছে অনুবাদ এবং পাণ্ডিত্য হচ্ছে তার বিধেয়।

শ্লোক ৭৮

বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু মানুষটি বিপ্র, তাই তার বিপ্রত্ব সম্বন্ধে সকলেই জ্ঞাত। কিন্তু তার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলে জ্ঞাত নয়। অতএব আগে মানুষটির পরিচয় প্রদান করে পরে তাঁর গুণের কথা (পাণ্ডিত্য) বলা হয়েছে।

শ্লোক ৭৯

তৈছে ইঁহ অবতার সব হৈল জ্ঞাত ।
কার অবতার?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তেমনই, এখানে এই সমস্ত অবতারের সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া গেল কিন্তু তাঁরা যে কার অবতার সেই বিষয়টি অজ্ঞাত থেকে গেল।

শ্লোক ৮০

'এতে'-শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রথমে 'এতে' ('এই সমস্ত') শব্দে অনুবাদ (অবতারসমূহ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তার পরে 'পুরুষ-অবতারদের অংশ' বিধেয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৮১

তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত ।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"তেমনই, শ্রীকৃষ্ণকে যখন অবতারগণের মধ্যে গণনা করা হল, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তখনও অপ্রকাশিত ছিল।

শ্লোক ৮২

অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ ।
'স্বয়ং-ভগবত্তা' পিছে বিধেয়-সংবাদ ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"সুতরাং, অনুবাদরূপে প্রথমে 'কৃষ্ণ' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অনুবাদের বিধেয়রূপে তাঁর ভগবত্তাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৮৩

কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য ।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তার ফলে প্রতিপন্ন হল যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যে অন্য আর কেউ স্বয়ং ভগবান নন, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল।

শ্লোক ৮৪

কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীকৃষ্ণ যদি অংশ হতেন এবং নারায়ণ যদি হতেন তাঁর অংশী, তা হলে শ্রীল সূত গোস্বামীর উক্তিটি বিপরীত হত।

শ্লোক ৮৫

নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্ ।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তা হলে তিনি বলতেন, 'সমস্ত অবতারের উৎস নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।'

শ্লোক ৮৬

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্যে ভ্রম (ভুল করার প্রবণতা), প্রমাদ (মোহগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা), বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করার প্রবণতা) ও করণাপাটব (ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি) জনিত কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার ও পুরুষের অংশ-প্রকাশসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং সেই তালিকায় শ্রীকৃষ্ণেরও উল্লেখ রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* আবার এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান, তাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ পরমেশ্বররূপে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করে।

শ্রীকৃষ্ণ যদি নারায়ণের অংশ-প্রকাশ হতেন, তা হলে মূল শ্লোকটি ভিন্নরূপে রচিত হত; তা হলে অবশ্যই তা বিপরীতভাবে বর্ণিত হত। কিন্তু নিত্যমুক্ত ঋষিদের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব জনিত কোন দোষ থাকতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, এই বর্ণনায় কোন ভুল নেই। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি শ্লোকই হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ। পূর্ণরূপে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছিলেন। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি উক্তিই অভ্রান্ত, কেন না শ্রীল ব্যাসদেবের মতো নিত্যমুক্ত ঋষির রচনায় কোন ভুল থাকতে পারে না। এই সত্যকে যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করা হয়, তা হলে শাস্ত্রের মাধ্যমে ভগবৎ-তত্ত্ব নিরূপণ করার প্রচেষ্টা অর্থহীন।

ভ্রম বলতে কোন কিছুর সম্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞানকে বোঝায়। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে মুক্তাভ্রম। *প্রমাদ* বলতে বাস্তব সম্বন্ধে অজ্ঞানতাকে বোঝায়। *বিপ্রলিপ্সা* হচ্ছে

অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণতা, আর *করণাপাটব* হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয়গুলির ত্রুটি বা অপূর্ণতা। এই ধরনের ত্রুটির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। চোখ অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা অনেক দূরবর্তী কোন বস্তুকে দর্শন করতে পারে না। এই ত্রুটিপূর্ণ চোখের দ্বারা মানুষ তার নিকটতম চোখের পাতাও দর্শন করতে পারে না। আর যদি সে পাণ্ডুরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তা হলে সে সব কিছুই হলুদ দেখে। তেমনই, কান দূরবর্তী কোন শব্দ শ্রবণ করতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর অংশ-প্রকাশ এবং তাঁর নিত্যমুক্ত ভক্তরা যেহেতু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁরা এই ধরনের ত্রুটি বা ভ্রান্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ৮৭

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি শ্লোকের বিপরীত অর্থ করছ, আর যখন তোমার সেই ভুলের কথা বলা হচ্ছে, তুমি রাগ করছ। তোমার বিশ্লেষণে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ রয়েছে।

শ্লোক ৮৮

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ।
'স্বয়ং-ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যাঁর ভগবত্তা থেকে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশ পায়, তাঁকেই স্বয়ং ভগবান বলা যায়। তাঁর মধ্যেই সেই সত্তা বিরাজমান।

শ্লোক ৮৯

দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"একটি দীপ থেকে যখন অন্যান্য বহু দীপ প্রজ্বলিত হয়, তখন প্রজ্বলনকারী সেই দীপটিকেই মূল দীপ বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৬) *বিষ্ণুতত্ত্ব* বা পরম ভগবৎ-তত্ত্বকে দীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কারণ ভগবানের থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রকাশ তাঁদের উৎস মূল আদিপুরুষের সঙ্গে সর্বতোভাবে সমান। একটি প্রজ্বলিত দীপ থেকে আরও অনেক দীপকে জ্বালানো যেতে পারে এবং সেই দীপগুলি মূল দীপটি থেকে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু তবুও

প্রজ্বলনকারী প্রথম দীপটিকেই মূল দীপ বলে গণনা করা হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে তাঁর অংশ-প্রকাশ বহু *বিষ্ণুতত্ত্বে* বিস্তার করেন। যদিও সেই সমস্ত অংশ-প্রকাশদের সকলেই তাঁর মতো শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তবুও আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁকেই তাঁদের সকলের উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্রহ্মা ও শিব, এই দুই গুণাবতারের প্রকাশও বিশ্লেষিত হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, *শম্ভোস্তু তমোধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যম্*—"শম্ভুতত্ত্ব বা শিব তমোগুণের অধিকারী হওয়ার ফলে কাজলের দ্বারা আচ্ছাদিত দীপশিখার মতো। এই শিখার জ্যোতি অত্যন্ত অল্প। তাই *বিষ্ণুতত্ত্বের* সঙ্গে শিবের শক্তির কোন তুলনা হয় না।"

শ্লোক ৯০

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের পরম কারণ। এই প্রসঙ্গে আর একটি শ্লোক শোন, যাতে সব রকম কুব্যাখ্যা খণ্ডন করা হয়েছে।

শ্লোক ৯১-৯২

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯১ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ৯২ ॥

অত্র—এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **সর্গঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির সৃষ্টি; **বিসর্গঃ**—ব্রহ্মার সৃষ্টি; **চ**—এবং; **স্থানম্**—সৃষ্টির স্থিতি; **পোষণম্**—ভগবদ্ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ; **ঊতয়ঃ**—কর্মবাসনা; **মন্বন্তর**—মনু প্রদত্ত কর্তব্যকর্ম; **ঈশ-অনুকথাঃ**—ভগবানের অবতারদের বর্ণনা; **নিরোধঃ**—সৃষ্টির সংবরণ; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **আশ্রয়ঃ**—পরম আশ্রয়, পরমেশ্বর ভগবান; **দশমস্য**—দশমের (আশ্রয়); **বিশুদ্ধি-অর্থম্**—তত্ত্বজ্ঞানের জন্য; **নবানাম্**—নয়টি তত্ত্বের; **ইহ**—এখানে; **লক্ষণম্**—স্বরূপ; **বর্ণয়ন্তি**—বর্ণনা করে; **মহাত্মানঃ**—মহাত্মাগণ; **শ্রুতেন**—প্রার্থনার দ্বারা; **অর্থেন**—অর্থ বিশ্লেষণের দ্বারা; **চ**—এবং; **অঞ্জসা**—প্রত্যক্ষভাবে।

অনুবাদ

" 'এখানে (শ্রীমদ্ভাগবতে) দশটি বিষয় বা তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে—১) সর্গ বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির সৃষ্টি, ২) বিসর্গ বা ব্রহ্মার সৃষ্টি, ৩) স্থান বা সৃষ্টির স্থিতি, ৪) পোষণ বা ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ, ৫) ঊতি বা কর্মবাসনা, ৬) মন্বন্তর বা সাধারণ

মানুষের জন্য মনু প্রদত্ত কর্তব্যকর্ম, ৭) ঈশানুকথা বা ভগবানের অবতারদের বর্ণনা, ৮) নিরোধ বা সৃষ্টির সংবরণ, ৯) স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় আবরণ থেকে মুক্তি এবং ১০) আশ্রয় বা পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান। দশম তত্ত্বটি হচ্ছে অপর নয়টি তত্ত্বের আশ্রয়। প্রথম নয়টি তত্ত্ব থেকে দশম তত্ত্ব বা পরম আশ্রয়ের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য মহাত্মারা কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও বা স্তুতি করে, আবার কখনও বা গল্পের ছলে এই নয়টি তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন।'

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (২/১০/১-২) এই শ্লোক দুটিতে দশটি বিষয়ের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই দশটি বিষয়ের মধ্যে দশম বিষয়টি হচ্ছে মূল বিষয় এবং অপর নয়টি বিষয় সেই মূল বিষয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই দশটি বিষয় হচ্ছে—

(১) *সর্গ*—শ্রীবিষ্ণুর প্রথম সৃষ্টি, পাঁচটি স্থূল জড় পদার্থের প্রকাশ, পঞ্চতন্মাত্রের প্রকাশ, দশটি ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকারের প্রকাশ এবং মহৎ-তত্ত্ব বা বিরাটরূপের প্রকাশ।

(২) *বিসর্গ*—গৌণ সৃষ্টি, অথবা ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা কর্তৃক স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত দেহের সৃষ্টি।

(৩) *স্থান*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের পালন। শ্রীবিষ্ণুর কার্যকলাপ ও মহিমা ব্রহ্মা এবং শিবের থেকেও অধিক, কেন না যদিও ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং শিব তা ধ্বংস করেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাকে পালন করেন।

(৪) *পোষণ*—ভগবান তাঁর ভক্তদের বিশেষভাবে পালন করেন। রাজা যেমন রাজ্যশাসন এবং প্রজাপালন করলেও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল হন। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর চরণে সর্বতোভাবে সমর্পিতাত্মা ভক্তদের অনুগ্রহ করেন এবং তাঁদের বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

(৫) *ঊতি*—কর্মবাসনা অথবা স্থান, কাল ও পাত্রের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি করার অনুপ্রেরণা।

(৬) *মন্বন্তর*—মনুষ্যজীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন বিধি-নিষেধ। *মনু-সংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, মনু কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত বিধি-নিষেধ মানুষকে পূর্ণতা প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করে।

(৭) *ঈশানুকথা*—পরমেশ্বর ভগবান, এই জগতে তাঁর বিভিন্ন অবতার এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বর্ণনা। মানবজীবনে প্রগতি সাধন করার জন্য শাস্ত্রে আলোচিত এই সমস্ত বিষয়গুলি অপরিহার্য।

(৮) *নিরোধ*—সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত সমস্ত শক্তির সংবরণ। এই সমস্ত শক্তিগুলির উৎস হচ্ছেন কারণ-সমুদ্রে শায়িত কারণোদকশায়ী বিষ্ণু। তাঁর প্রতি নিঃশ্বাসে সৃষ্টির প্রকাশ হয় এবং যথাসময়ে তা আবার লয়প্রাপ্ত হয়।

(৯) *মুক্তি*—স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণরূপ জড় দেহ ও মনের বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবের মুক্তি। আত্মা যখন সব রকমের জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন সে তার চিন্ময় স্বরূপে চিৎ-জগতে প্রবেশ করে এবং বৈকুণ্ঠলোকে বা কৃষ্ণলোকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। ভগবানের সেবকরূপে জীব যখন তার নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত। জড় শরীরে অবস্থানকালেও জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে *জীবন্মুক্ত* অবস্থা লাভ করতে পারে।

(১০) *আশ্রয়*—পরমতত্ত্ব, যাঁর থেকে সব কিছুর প্রকাশ হয়, যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে এবং প্রলয়ের পর যাঁর মধ্যে সব কিছু লীন হয়ে যায়। তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়। এই আশ্রয়কে পরমব্রহ্মও বলা হয়। সেই কথা *বেদান্তসূত্রে* বর্ণিত হয়েছে (*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্য যতঃ*)। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই পরমব্রহ্মকেই বিশেষ করে *আশ্রয়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন এই *আশ্রয়*। তাই জীবনের পরম প্রয়োজন হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত প্রকাশের আশ্রয়রূপে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস এবং তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর পরম লক্ষ্য।

এখানে দুটি তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে—একটি হচ্ছে *আশ্রয়তত্ত্ব* এবং অপরটি *আশ্রিততত্ত্ব*। *আশ্রিত আশ্রয়ের* অধীনে বিরাজ করে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম নয়টি স্কন্ধে বর্ণিত সৃষ্টি থেকে শুরু করে মুক্তি পর্যন্ত, পুরুষাবতার, ভগবানের অন্যান্য অবতার, তটস্থা শক্তি বা জীব, বহিরঙ্গা শক্তি বা জড় জগৎ—এই সমস্ত কিছুই *আশ্রিত*। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* সমস্ত স্তুতির পরম লক্ষ্য হচ্ছেন *আশ্রয়তত্ত্ব* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনায় পারদর্শী মহাত্মারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অন্য নয়টি তত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কখনও সরাসরিভাবে সেগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন, আবার কখনও বা গল্পচ্ছলে সেগুলি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া, কেন না তিনিই হচ্ছেন জড় ও চেতন উভয় জগতের আশ্রয়।

শ্লোক ৯৩

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সব কিছুর পরম আশ্রয়কে যথাযথভাবে জানার জন্য আমি এই নয়টি বিষয়ের বর্ণনা করেছি। এই নয়টি বিষয়ের উৎপত্তির কারণকে তাদের আশ্রয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

শ্লোক ৯৪

কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয় ও পরম ধাম। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর শরীরে বিশ্রাম করে।

শ্লোক ৯৫

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ৯৫ ॥

দশমে—দশম স্কন্ধে; **দশমম্**—দশম বিষয়; **লক্ষ্যম্**—লক্ষ্য; **আশ্রিত**—আশ্রিতের; **আশ্রয়**—আশ্রয়ের; **বিগ্রহম্**—বিগ্রহ; **শ্রীকৃষ্ণ-আখ্যম্**—শ্রীকৃষ্ণ নামক; **পরম্**—পরম; **ধাম**—ধাম; **জগৎ-ধাম**—সমস্ত জগতের ধাম; **নমামি**—আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি; **তৎ**—তাঁকে।

অনুবাদ

' "শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে দশম তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। এই দশম তত্ত্ব হচ্ছেন সমস্ত আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি সমস্ত জগতের পরম ধাম। আমি তাঁর উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের শ্রীধর স্বামীকৃত ভাষ্য থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯৬

কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং তাঁর তিনটি বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে অবগত, তিনি কখনই তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকতে পারেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী *ভক্তিসন্দর্ভে* (১৬) উল্লেখ করেছেন যে, মানব মনের জল্পনা-কল্পনার ঊর্ধ্বে স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল তাঁর শক্তির মাধ্যমে সেই পরমতত্ত্ব নিত্যকাল ধরে যুগপৎ চারটি অপ্রাকৃত সত্তায় বিরাজ করেন। এই চারটি সত্তা হচ্ছে—তাঁর স্বরূপ, তাঁর নির্বিশেষ

জ্যোতি, তাঁর বিভিন্নাংশ জীব এবং সর্ব কারণের পরম কারণরূপ প্রকাশ বা প্রধান। সেই পরমতত্ত্বকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সূর্যও চারটি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। এই চারটি প্রকাশ হচ্ছে—সূর্যলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্যদেব, সূর্যমণ্ডলের অন্তরস্থ তেজ, সূর্যমণ্ডল থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি এবং অন্যান্য বস্তুতে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির প্রতিবিম্ব। জীব তার অনুমানভিত্তিক সীমিত ক্ষমতার দ্বারা কখনই অধোক্ষজ পরমতত্ত্বকে জানতে পারে না, কারণ তিনি জীবের জল্পনা-কল্পনা নিরত সীমিত মনের অতীত। পরম সত্যের অনুসন্ধানে আমরা যদি যথার্থই আন্তরিক হই, তা হলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সীমিত শক্তির তুলনায় তাঁর শক্তি অসীম এবং তা আমাদের চিন্তার অতীত। পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা আজ মহাশূন্যের গবেষণায় লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু এই জড় সৃষ্টির মৌলিক জ্ঞান সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং যারা সেই জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে, তারা তাদের সীমিত বুদ্ধির মাধ্যমে সেই অচিন্ত্য শক্তিকে অনুধাবন করতে না পারার ফলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আর এই জড়-জাগতিক জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে হচ্ছে পরা প্রকৃতিসম্ভূত সেই চিন্ময় জগতের জ্ঞান। সুতরাং, সেই পরমতত্ত্বের আয়োজন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় চিন্ময় জ্ঞান নিঃসন্দেহে অচিন্ত্য।

পরমতত্ত্বের মুখ্য শক্তি হচ্ছে তিনটি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশ করেন। জড় সৃষ্টির লয় হয়ে গেলেও সেই বৈকুণ্ঠলোকসমূহ চিরকালই বিরাজমান থাকে। তাঁর তটস্থা শক্তির প্রভাবে ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেন, ঠিক যেভাবে সূর্য চতুর্দিকে তার কিরণ বিতরণ করে। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান এই জড় জগতের প্রকাশ করেন, ঠিক যেভাবে সূর্যরশ্মি কুয়াশা সৃষ্টি করে। এই জড় সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য বৈকুণ্ঠধামের বিকৃত প্রতিফলন।

বিষ্ণু পুরাণেও পরমতত্ত্বের এই তিনটি শক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, জীব গুণগতভাবে অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে এক, কিন্তু বহিরঙ্গা শক্তি পরোক্ষভাবে সর্ব কারণের পরম কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কুয়াশা যেমন সূর্যরশ্মিকে আচ্ছাদিত করে পথিককে বিভ্রান্ত করে, ঠিক সেভাবে ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তিও জীবকে বিভ্রান্ত করে। কুয়াশা যেমন সূর্যের আলোককে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত করতে না পারলেও তার একটি অংশকে আচ্ছাদিত করতে পারে, তেমনই মায়াশক্তি যদিও তটস্থা শক্তি বা ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব থেকে গুণগতভাবে নিকৃষ্ট, কিন্তু তবুও তার জীবকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত জীব একটি নগণ্য পিপীলিকা থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শরীর ধারণ করে এই ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করে। নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে যাকে সর্ব কারণের পরম কারণ বা *প্রধান* বলে অভিহিত করা হয়, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, সেই ভগবানকে অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়। তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত জড় রূপ ধারণ করেন। যদিও এই তিনটি শক্তি—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা মূলত এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু তারা বিভিন্নভাবে কার্যকরী হয়। এটি ঠিক বিদ্যুৎশক্তির মতো; একই বিদ্যুৎশক্তি অবস্থার তারতম্য ঘটিয়ে উষ্ণতা ও শীতলতা উৎপাদন করতে পারে। বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি সেই রকম বিভিন্ন অবস্থার প্রকাশ, কিন্তু মূল অন্তরঙ্গা শক্তিতে সেই রকম কোন অবস্থার বৈষম্য নেই। এমন কি বহিরঙ্গা শক্তিসম্ভূত বিভিন্ন অবস্থা তটস্থা শক্তিতে থাকতে পারে না, অথবা তটস্থা শক্তিসম্ভূত অবস্থাসমূহ বহিরঙ্গা শক্তিতে থাকতে পারে না। যিনি ভগবানের এই সমস্ত শক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সম্বন্ধে অবগত হন, তিনি আর স্বল্প জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ পোষণ করতে পারেন না।

শ্লোক ৯৭

কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ছয়ভাবে বিস্তার করে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর দুটি প্রকাশ হচ্ছে প্রাভব ও বৈভব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রণেতা এখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপের বিভিন্ন প্রকাশের বর্ণনা করেছেন। প্রথমে ভগবান নিজেকে *প্রাভব* ও *বৈভব*, এই দুটি রূপে প্রকাশ করেন। *প্রাভব* রূপ শ্রীকৃষ্ণের মতোই সর্বশক্তিমান এবং *বৈভব* রূপ ভগবানের পূর্ণ শক্তি থেকে কিঞ্চিৎ কম শক্তিসম্পন্ন। শক্তির তারতম্যে প্রভুত্বের প্রাবল্যে *প্রাভব* প্রকাশ এবং বিভুত্বের প্রাবল্যে *বৈভব* প্রকাশ হয়। *প্রাভব* প্রকাশ আবার দুই প্রকার—অস্থায়ী ও স্থায়ী। মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অবতার অস্থায়ী, বিশেষ কোন যুগে এঁদের প্রকাশ হয়। অন্যান্য *প্রাভবেরা*, যাঁরা জড়-জাগতিক বিচারে খুব বেশি যশস্বী নন, তাঁরা হচ্ছেন ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। কূর্ম, মৎস্য, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু—এই অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের বৈভব প্রকাশ।

শ্লোক ৯৮

অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম দুই ত' প্রকার ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের অবতার দুই প্রকার—অংশাবেশ অবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতার। তিনি বাল্য ও পৌগণ্ড এই দুটি বয়সের লীলাবিলাস করেন।

তাৎপর্য

বিলাস বিগ্রহ ছয় প্রকার। অবতার দুই প্রকার—*শক্ত্যাবেশ* অবতার ও *অংশাবেশ* অবতার। এই সমস্ত অবতারেরাও আবার *প্রাভব* এবং *বৈভব* প্রকাশের অন্তর্গত। বাল্য ও পৌগণ্ড হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুটি বিশেষ রূপ, কিন্তু তাঁর স্থায়ী রূপ হচ্ছে তাঁর নবকৈশোর-সম্পন্ন স্বরূপ। আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এই নিত্য নবকিশোর রূপে সর্বদা পূজিত হন।

শ্লোক ৯৯

কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি' ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নিত্য নবকিশোর রূপসম্পন্ন, তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ এবং সমস্ত অবতারের অবতারী। সমস্ত জগৎ জুড়ে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করার জন্য তিনি এই ছয় রূপে লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ১০০

এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ।
অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ছয় রূপের অনন্ত বিভেদ বা বৈচিত্র্য রয়েছে। অনন্ত বৈচিত্র্যসম্পন্ন বহু রূপ হলেও তাঁরা সকলেই এক। তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ছয়টি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত করেন—(১) *প্রাভব,* (২) *বৈভব,* (৩) *শক্ত্যাবেশ অবতার,* (৪) *অংশাবেশ অবতার,* (৫) *বাল্য* ও (৬) *পৌগণ্ড।* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর নিত্য রূপ হচ্ছে তাঁর নবকিশোর স্বরূপ, তিনি এই ছয় রূপে লীলাবিলাস করে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। ভগবানের এই ছয় রূপের অনন্ত বিভেদ রয়েছে। জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন অংশ। তারা সকলেই হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ।

শ্লোক ১০১

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম ।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের চিৎ-শক্তি, যাকে স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়, তা বিভিন্ন বৈচিত্র্য

প্রকাশ করে। সেই শক্তি ভগবানের অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম এবং তাঁর অনন্ত বৈভব প্রকাশ করে।

শ্লোক ১০২

মায়াশক্তি, বহিরঙ্গা, জগৎকারণ ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, যাকে মায়াশক্তিও বলা হয়, তা থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং বিভিন্ন জড় শক্তির প্রকাশ হয়।

শ্লোক ১০৩

জীবশক্তি তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত ।
মুখ্য তিন শক্তি, তার বিভেদ অনন্ত ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দুই শক্তির মধ্যবর্তী তটস্থা শক্তি হচ্ছে অসংখ্য জীবের সমন্বয়। এই তিনটি হচ্ছে মুখ্য শক্তি; এই তিনটি শক্তির আবার অন্তহীন বিভাগ রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবানের স্বরূপশক্তি, যাকে চিৎ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়, তা থেকে বৈকুণ্ঠ আদি ধামে অনন্ত বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়। আমাদের মতো বদ্ধ জীব ছাড়াও অসংখ্য নিত্যমুক্ত জীব রয়েছেন, যাঁরা চিৎ-জগতে পরমেশ্বর ভগবানের অসংখ্য রূপের নিত্যসঙ্গ লাভ করেন। জড় সৃষ্টি হচ্ছে বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, যেখানে বদ্ধ জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৮) বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। তিনি জড় ইন্দ্রিয়সম্পন্ন নন। কেউ তাঁর সমান নয় অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়। তাঁর বিভিন্ন নামে অন্তহীন বিভিন্ন শক্তি রয়েছে, যেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাঁর মধ্যে বিরাজমান এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি ও লীলার প্রকাশ হয়।"

শ্লোক ১০৪

এমত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি ।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এবং তাঁর তিনটি শক্তির মুখ্য প্রকাশ ও বিস্তার। তাঁদের সকলের আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর মধ্যেই এঁদের স্থিতি।

শ্লোক ১০৫

যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয় ।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও তিন পুরুষাবতার হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই পুরুষাবতারদেরও মূল আশ্রয়।

শ্লোক ১০৬

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান এবং সব কিছুর পরম আশ্রয়। সমস্ত শাস্ত্রে তাঁকে পরম ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে।

শ্লোক ১০৭

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১০৭ ॥

ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; পরমঃ—পরম; কৃষ্ণঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; সৎ—নিত্য স্থিতি; চিৎ—পরম জ্ঞান; আনন্দ—পরম আনন্দ; বিগ্রহঃ—রূপ; অনাদিঃ—অনাদি; আদিঃ—আদি; গোবিন্দঃ—শ্রীগোবিন্দ; সর্বকারণ-কারণম্—সমস্ত কারণের পরম কারণ।

অনুবাদ

' "শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামেও পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময় (নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়)। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কেন না তিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের পরম কারণ।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতার* পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক।

শ্লোক ১০৮

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে ।
তবু পূর্বপক্ষ কর আমা চালহিতে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত তুমি ভালভাবেই জান। কিন্তু আমাকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য তুমি এই সমস্ত বিরুদ্ধ তর্কের উত্থাপন করছ।"

তাৎপর্য

যে বিজ্ঞ ব্যক্তি যথাযথভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। এই ধরনের কোন মানুষ যদি এই বিষয়ে তর্ক করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি নিশ্চয়ই অপর পক্ষকে বিক্ষুব্ধ করার জন্য তা করছেন।

শ্লোক ১০৯

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত অবতারের অবতারী সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার নামে পরিচিত। তিনি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করেছেন।

শ্লোক ১১০

অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা ।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাঁকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বলে অভিহিত করা হলে, তাঁর মহিমা পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা হয় না।

শ্লোক ১১১

সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী ।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের মুখ থেকে স্ফুরিত এই ধরনের বাক্য কখনও মিথ্যা হতে পারে না। তাঁর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব, কেন না তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান।

শ্লোক ১১২

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি ।
কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত অবতারেরা অবতারী স্বয়ং ভগবানের দেহে অবস্থান করেন। তাই কেউ হয়ত তাঁকে এই সমস্ত অবতারের যে কোন একটির অবতার বলে সম্বোধন করতে পারে।

তাৎপর্য

কোন ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর অংশ-প্রকাশের অসংখ্য নামের কোন একটি নামে যদি সম্বোধন করেন, তা হলে সেটি মতবিরুদ্ধ নয়। কারণ আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবানের মধ্যে সমস্ত অংশ-প্রকাশেরাই অবস্থিত। যেহেতু আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবানের মধ্যে সমস্ত অংশ-প্রকাশের অবস্থিতি, তাই ভগবানকে এই সমস্ত নামের যে কোন একটি নামে সম্বোধন করা যায়। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*মধ্য* ৬/৯৫) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

"শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলেছেন। তিনি এখানে নিজেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ১১৩

কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নর-নারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥ ১১৩॥

শ্লোকার্থ

কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং নর-নারায়ণ। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ বামন।

শ্লোক ১১৪

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥ ১১৪॥

শ্লোকার্থ

আবার কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার। এই বিবৃতিগুলি কোনটিই অসম্ভব নয়; সকলের বক্তব্যই সত্য।

তাৎপর্য

লঘুভাগবতামৃতে (৫/৩৮৩) শ্রীকৃষ্ণের অবতারীত্বের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অতএব পুরাণাদৌ কেচিন্নরসখাত্মতাম্
মহেন্দ্রানুজতাং কেচিৎ কেচিৎ ক্ষীরাব্ধিশায়িতাম্।
সহস্রশীর্ষতাং কেচিৎ কেচিদ্বৈকুণ্ঠনাথতাম্
ব্রূয়ুঃ কৃষ্ণস্য মুনয়স্তত্তদ্বৃত্ত্যনুগামিনঃ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্তের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ অনুসারে *পুরাণে* তাঁকে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও তাঁকে বলা হয় নারায়ণ, কখনও দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র (বামন), আবার কখনও বা তাঁকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও তাঁকে সহস্রশীর্ষ শেষনাগরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কখনও তাঁকে বৈকুণ্ঠনাথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।"

শ্লোক ১১৫

কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী॥ ১১৫॥

শ্লোকার্থ

কেউ কেউ তাঁকে হরি বলে ডাকেন, আবার কেউ তাঁকে পরব্যোমে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব, কেন না তিনি হচ্ছেন সব অবতারের অবতারী।

শ্লোক ১১৬

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন॥ ১১৬॥

শ্লোকার্থ

আমি সমস্ত শ্রোতাদের চরণ বন্দনা করি। দয়া করে তোমরা একাগ্রচিত্তে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রণেতা এখানে সমস্ত পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের কাছে প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত সিদ্ধান্ত একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণে অবহেলা করতে নেই, কেন না এই জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল পূর্ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়।

শ্লোক ১১৭

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ ১১৭॥

শ্লোকার্থ

আলস্যবশত পাঠক যেন এই সমস্ত সিদ্ধান্তের আলোচনা শ্রবণ করার ব্যাপারে কখনও অবহেলা না করে। কারণ, এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে মন সুদৃঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

অনেক পাঠক রয়েছে, যারা *ভগবদ্‌গীতা* পাঠ করা সত্ত্বেও পূর্ণ জ্ঞানের অভাববশত সিদ্ধান্ত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন সাধারণ ঐতিহাসিক পুরুষ। কখনই এই ধরনের ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। আলস্যবশত কেউ যদি কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত না হয়, তা হলে তার ভক্তিমার্গ থেকে চ্যুত হয়ে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের মানুষেরা নিজেদের উন্নত স্তরের ভক্ত বলে জাহির করে এবং শুদ্ধ ভক্তদের অপ্রাকৃত লক্ষণগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা করে। যদিও অদীক্ষিত মানুষদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার জন্য ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিন্তা এবং তর্কের পন্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবুও এই ধরনের কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য নব্য ভক্তদের সর্বদাই সাধু, শাস্ত্র ও গুরুর শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং তাঁদের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এই রকম নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ না করলে ভক্তিমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। শাস্ত্রে *নবধা ভক্তির* উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে প্রথমটি বা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভক্তির অঙ্গটি হচ্ছে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ। শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জলে সিঞ্চন করা না হলে ভক্তিলতার বীজ অঙ্কুরিত হয় না। পারমার্থিক জীবনে উত্তম অধিকারী ভক্তের কাছ থেকে বিনীতভাবে এই দিব্যজ্ঞান গ্রহণ করতে হয় এবং তারপর নিজের ও অপরের মঙ্গলের জন্য সেই বাণী কীর্তন করতে হয়।

কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তদের সম্বন্ধে বর্ণনাকালে ব্রহ্মা পরামর্শ দেন যে, সব সময় ভক্তিমার্গ অবলম্বনকারী ভগবদ্ভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থা গ্রহণ করতে হয়। দিব্যজ্ঞান প্রদানে সমর্থ এই ধরনের মুক্ত আত্মাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যায় এবং তার ফলে মহাভাগবতে পরিণত হওয়া যায়। সনাতন গোস্বামীকে দেওয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা থেকে (*মধ্য* ২২/৬৫) আমরা জানতে পারি—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার ॥

"শাস্ত্রসিদ্ধান্তে পারদর্শী এবং ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ও তাঁর সেবায় সর্বতোভাবে সমর্পিত আত্মা যে ভক্ত, তাঁকে উত্তম অধিকারী ভক্ত বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে সমস্ত জীবকে উদ্ধার করতে পারেন।" শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *উপদেশামৃত* গ্রন্থে (৩) উপদেশ দিয়েছেন যে, ভক্তিমার্গে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে সব রকমের আলস্য পরিত্যাগ করে গভীর উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল ধৈর্য সহকারে গুরুদেবের আনুগত্যে শাস্ত্রনির্ধারিত কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে হয়। মুক্ত পুরুষদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন এবং শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করার মাধ্যমে এই ধরনের ভক্তিমূলক কার্যকলাপ সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অনেক সময় তথাকথিত কিছু ভক্ত নিজেদের উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব বলে জাহির করার জন্য পূর্বতন আচার্যদের অনুকরণ করে, কিন্তু তাঁদের শিক্ষাকে অনুসরণ করে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/২৪) এই ধরনের অনুকরণ-প্রিয় ভক্তদের পাষাণ-হৃদয় বলে নিন্দা করা হয়েছে। তাদের পাষাণ-হৃদয় সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন—*বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপি অশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দ্যৈষা।* "যারা কৃত্রিমভাবে অশ্রু বিসর্জন করে, কিন্তু যাদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি, তারা হচ্ছে সব চাইতে নিম্ন স্তরের পাষাণ-হৃদয় ভক্ত। কৃত্রিম অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ তাদের কপট ক্রন্দন সর্বদাই নিন্দনীয়।" পূর্বে হৃদয়ের যে ঈপ্সিত পরিবর্তনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই পরিবর্তন যথার্থই সাধিত হয়েছে কি না, তা বোঝা যায় ভক্তির প্রতিকূল সব রকমের কার্যকলাপের প্রতি ভক্তের অনীহার মাধ্যমে। হৃদয়ের এই ধরনের পরিবর্তন আনতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তমূলক আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। তথাকথিত কিছু ভক্ত মনে করে যে, হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন না করে কেবলমাত্র কপট অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমেই তারা চিন্ময় স্তর লাভ করতে পারবে। কিন্তু এই ধরনের অনুশীলন অর্থহীন যদি অপ্রাকৃত অনুভূতি না হয়। পারমার্থিক জ্ঞানের সিদ্ধান্তের অভাব হেতু কপট ভক্তরা মনে করে যে, কৃত্রিমভাবে অশ্রুপাত করে তারা মুক্তি লাভ করবে। তেমনই, অন্য আর এক ধরনের কপট ভক্তরা মনে করে যে, মনোধর্ম-প্রসূত শুষ্ক দর্শন পাঠ করার যেমন প্রয়োজনীয়তা নেই, তেমনই পূর্বতন আচার্যদের গ্রন্থাবলী পাঠ করারও প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল জীব গোস্বামী *ষট্-সন্দর্ভ* নামক ছয়টি গবেষণামূলক গ্রন্থে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। যে সমস্ত কপট ভক্তের এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুদ্ধ ভক্ত প্রদর্শিত ভগবদ্ভক্তির অনুকূল নির্দেশাবলী গ্রহণে উৎসাহের অভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। নির্বিশেষবাদীদের মতো এই ধরনের কপট ভক্তরা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তি সাধারণ সকাম কর্মের মতো জাগতিক কার্যকলাপ।

শ্লোক ১১৮

চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানতে পেরেছি। কেবলমাত্র তাঁর মহিমা জানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি অনুরাগ আরও গভীর এবং দৃঢ় হয়।

তাৎপর্য

পূর্বতন আচার্যদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে যখন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তখনই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১১৯

চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে ।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বর্ণনা করার জন্য আমি বিস্তারিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

শ্লোক ১২০

চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই তত্ত্ব নিরূপণ করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১২১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'বস্তুনির্দেশ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্য-তত্ত্ব-নিরূপণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আশীর্বাদ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য ও বিশেষ কারণ

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্য কারণগুলি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁর লীলা প্রদর্শন করার পর, এই জগতে সেই লীলার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য আদি চারটি রসে তাঁর ভক্তের সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের মহিমা প্রচার করার জন্য স্বয়ং ভক্তরূপে অবতরণ করতে মনস্থ করেন। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে *নাম-সংকীর্তন* বা সমবেতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন। সাধারণত কোন যুগের যুগাবতার সেই যুগের জন্য নির্দিষ্ট যুগধর্মের প্রচার করেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কেবল ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে পূর্বোক্ত চারটি রসের মাধ্যমে সেই দিব্য প্রেম বিনিময়ের মহিমা বিশ্লেষণ করতে পারেন। তাই, এই কলিযুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্যদবর্গ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণ করেন। এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই উদ্দেশ্যেই কেবল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতরণ করেছেন।

এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবত* ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বহু প্রমাণ উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণগুলি বিচার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা স্থাপন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মহিমা প্রচার করার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ সহ অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের তাৎপর্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নিগূঢ়। তাঁর শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল ভক্তিযোগের মাধ্যমে তাঁকে জানতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর পরিচিতি গোপন রাখার জন্য তিনি ভক্তরূপে অবতরণ করেন, কিন্তু তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে চিনতে পারেন। *বেদ* ও *পুরাণে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের *প্রচ্ছন্ন অবতার* বলা হয়।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতার সমসাময়িক। তিনি জড় জগতের ভগবৎ-বৈমুখ্যরূপ দুরবস্থা দর্শন করে অত্যন্ত ব্যথিত হন। কারণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতরণ করে ভক্তিযোগের শিক্ষা দান করা সত্ত্বেও ভগবানের সেবার প্রতি কারও তেমন উৎসাহ ছিল না। এই কৃষ্ণবিস্মৃতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ মানুষকে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নীত করতে পারবে না। তাই অদ্বৈত প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা

করেছিলেন যে, তিনি যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন। প্রতিদিন ভগবানের উদ্দেশ্যে তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল নিবেদন করে তিনি এই ধরাধামে ভগবানের অবতরণের জন্য তাঁর কাছে আর্তি প্রকাশ করতেন। তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অবতরণ করেন। এভাবেই শুদ্ধ ভক্ত অদ্বৈত আচার্যের প্রেমার্তিতে তুষ্ট হয়ে এই জগৎকে প্রেম বিতরণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেন।

শ্লোক ১

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্যতঃ ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুম্—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **যৎ**—যাঁর; **পাদ-আশ্রয়**—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের; **বীর্যতঃ**—শক্তি থেকে; **সংগৃহ্ণাতি**—সংগ্রহ করে; **আকর-ব্রাতাৎ**—শাস্ত্ররূপ অগণিত খনি থেকে; **অজ্ঞঃ**—মূর্খ; **সিদ্ধান্ত**—সিদ্ধান্তের; **সৎ-মণীন্**—শ্রেষ্ঠ মণি।

অনুবাদ

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের প্রভাবে একজন মূর্খও শাস্ত্ররূপ আকর থেকে পরমতত্ত্বের সিদ্ধান্তরূপ অত্যন্ত মূল্যবান মণি-রত্নসমূহ সংগ্রহ করতে পারে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৩

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। হে ভক্তবৃন্দ! দয়া করে তোমরা এখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শ্রবণ কর।

শ্লোক ৪

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

অনর্পিত—যা অর্পিত হয়নি; **চরীম্**—পূর্বে; **চিরাৎ**—বহুকাল পর্যন্ত; **করুণয়া**—করুণাবশত; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **কলৌ**—কলিযুগে; **সমর্পয়িতুম্**—দান করার জন্য; **উন্নত**—উন্নত; **উজ্জ্বল-রসাম্**—উজ্জ্বল রসময়ী; **স্ব-ভক্তি**—স্বীয় ভক্তি; **শ্রিয়ম্**—সম্পদ; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **পুরট**—স্বর্ণ থেকেও; **সুন্দর**—অধিক সুন্দর; **দ্যুতি**—দ্যুতি; **কদম্ব**—সমূহের দ্বারা; **সন্দীপিতঃ**—সমুদ্ভাসিত; **সদা**—সর্বদা; **হৃদয়কন্দরে**—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে; **স্ফুরতু**—প্রকাশিত হোন; **বঃ**—তোমাদের; **শচীনন্দনঃ**—শচীমাতার পুত্র।

অনুবাদ

পূর্বে যা অর্পিত হয়নি, উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তিসম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহের দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত *বিদগ্ধমাধব* (১/২) নামক ভক্তিমূলক একটি নাটিকা থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজরাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি ব্রজধাম সহ তাঁর নিত্য আলয় গোলোকে নিত্য লীলাবিলাস করেন।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। তিনি নিত্যকাল তাঁর পরম ধাম গোলোকে অবস্থান করে সেখানকার অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য সমন্বিত ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। চিন্ময় ধাম কৃষ্ণলোকে ভগবানের নিত্যলীলাকে বলা হয় অপ্রকট, কারণ তা বদ্ধ জীবের অগোচর। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু যখন তিনি আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হন না, তখন তাঁকে বলা হয় অপ্রকট বা অপ্রকাশিত।

শ্লোক ৬

ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার ।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মার এক দিনে একবার তিনি তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রকট করার জন্য এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন।

শ্লোক ৭

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি ।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

আমরা জানি যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগ রয়েছে। এই চারটি যুগকে একত্রে এক দিব্যযুগ বলা হয়।

শ্লোক ৮

একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর ।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

একাত্তরটি দিব্যযুগে এক মন্বন্তর হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চোদ্দটি মন্বন্তর রয়েছে।

তাৎপর্য

একজন মনুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কালকে বলা হয় *মন্বন্তর*। চতুর্দশ মনুর শাসনকাল অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার জীবনকালের এক দিন (বারো ঘণ্টা) অতিবাহিত হয় এবং সমপরিমিত কালে তাঁর এক রাত্রি অতিবাহিত হয়। *সূর্যসিদ্ধান্ত* নামক প্রামাণিক জ্যোতিষ-গ্রন্থে এই হিসাবের বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থটি সংকলন করেন জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ দত্ত, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হন; ইনিই হচ্ছেন আমার পরমারাধ্য গুরুদেব। *সূর্যসিদ্ধান্ত* নামক গ্রন্থটি রচনা করার জন্যই তাঁকে 'সিদ্ধান্ত সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তিনি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তার সঙ্গে 'গোস্বামী মহারাজ' উপাধিটি যুক্ত হয়।

শ্লোক ৯

'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর ।
সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

বর্তমান সপ্তম মন্বন্তরের মনু হচ্ছেন (সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র) বৈবস্বত। তাঁর আয়ুষ্কালের সাতাশ দিব্যযুগ (২৭×৪৩,২০,০০০ সৌরবর্ষ) গত হয়েছে।

তাৎপর্য

চোদ্দজন মনুর নাম হচ্ছে—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রপুত্র (রুদ্রসাবর্ণি), (১৩) রৌচ্য বা দেবসাবর্ণি এবং (১৪) ভৌত্যক বা ইন্দ্রসাবর্ণি।

শ্লোক ১০

অষ্টাবিংশে চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য ব্রজধামের সমস্ত উপকরণ সহ এই জড় জগতে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

এখন বৈবস্বত মনুর কাল চলছে। এই সময়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। প্রথমে অষ্টাবিংশতি *দিব্যযুগের* দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন এবং তারপর সেই *দিব্যযুগেরই* কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মার এক দিনে একবার, অর্থাৎ চতুর্দশ মন্বন্তরের মধ্যে একবার আবির্ভূত হন। প্রতিটি মন্বন্তরের আয়ুষ্কাল একাত্তর দিব্যযুগ।

৪৩২,০০,০০,০০০ বছর সমন্বিত ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে ছয়জন মনুর আবির্ভাব ও তিরোভাবের পর শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। অর্থাৎ, ব্রহ্মার এক দিনের ১৯৭,৫৩,২০,০০০ বছর অতিক্রান্ত হলে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। সৌরবর্ষ অনুসারে এই জ্যোতিষিক গণনাটি করা হয়েছে।

শ্লোক ১১

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস ।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারটি দিব্যরস রয়েছে। এই চারটি রসের ভাব সমন্বিত যত ভক্ত রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বশীভূত।

তাৎপর্য

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও *শৃঙ্গার বা মাধুর্য*—এই চারটি রসের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সাধিত হয়। *শান্তরসের* মাধ্যমে যদিও পরমতত্ত্বের অপূর্ব মহিমা উপলব্ধি করা যায়, তবুও এই শ্লোকে *শান্তরসের* উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, *শান্তরস* পরমতত্ত্বের মহিমা উপলব্ধির ঊর্ধ্বে প্রবেশ করতে পারে না। জড়বাদী দার্শনিকদের কাছে *শান্তরস* অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হলেও, এই রস অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের। চিন্ময় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তর। *শান্তরসকে* বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ উপলব্ধি হলে সক্রিয় দিব্যভাবের বিনিময় শুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভক্তের প্রাথমিক সম্পর্ক হচ্ছে *দাস্যরস*, তাই এই শ্লোকে *দাস্যরসকে* ভগবদ্ভক্তির প্রথম স্তর বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১২

দাস-সখা-পিতামাতা-কান্তাগণ লঞা ।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই দিব্যপ্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে তাঁর দাস, সখা, পিতা-মাতা ও প্রেয়সীদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেউ যখন তত্ত্বগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ জড় জগতের বন্ধনমুক্ত হন। এভাবেই তাঁর বর্তমান জড় দেহ ত্যাগ করে মুক্তি লাভ করার পর জন্ম-মৃত্যু সমন্বিত এই জড় জগতে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না। পক্ষান্তরে, যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানা হলে হৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জড় জগতের অস্তিত্ব অপূর্ণ। জড় জগতের সমস্ত মানুষ একে অপরের সঙ্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও দাম্পত্য আদি পাঁচটি সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পর্কিত। এই পাঁচটি সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ অনিত্য জড় আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু জড় জগতে এই পাঁচটি সম্পর্ক হচ্ছে চিন্ময় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য ও পূর্ণ আনন্দময় সম্পর্কের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে জীবের সেই নিত্য সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন। তাই তিনি ব্রজধামে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রকাশ করেন, যাতে মানুষ সেই লীলাবিলাসের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই জড় জগতের সমস্ত কৃত্রিম সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারে। তারপর সমস্ত লীলাবিলাস প্রদর্শন করার পর ভগবান অপ্রকট হন।

শ্লোক ১৩

যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান ।
অন্তর্ধান করি' মনে করে অনুমান ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ইচ্ছাক্রমে পর্যাপ্তভাবে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস উপভোগ করার পর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হন। অন্তর্ধানের পর তিনি মনে মনে অনুমান করেন—

শ্লোক ১৪

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান ।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"বহুকাল পর্যন্ত আমি জগতের মানুষকে আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি দান করিনি। ভক্তি বিনা জগতের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

ভগবান সচরাচর প্রেমভক্তি দান করেন না। কিন্তু সকাম কর্ম ও মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এই প্রেমভক্তি লাভ না করতে পারলে জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১৫

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি ।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"পৃথিবীর সর্বত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ আমার আরাধনা করে। কিন্তু এই বিধিভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজভূমির ভক্তদের প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১৬

ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে সমস্ত জগৎ আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দর্শন করে। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রভাবে শিথিল যে প্রেম, তা আমাকে আকৃষ্ট করে না।

তাৎপর্য

তাঁর আবির্ভাবের পর শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেন যে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য রসে ভক্তদের সঙ্গে তাঁর যে প্রেমময়ী সম্পর্ক, তা তিনি সমগ্র জগতের কাছে বিতরণ করেননি। বৈদিক শাস্ত্র থেকে ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হয়ে কেউ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হতে পারেন এবং শাস্ত্র-নির্ধারিত বৈধীভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। কিন্তু তার দ্বারা ব্রজবাসীদের নিগূঢ় কৃষ্ণপ্রেমের সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না। বৈদিক শাস্ত্র-নির্ধারিত বৈধীভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে বৃন্দাবনে ভগবানের লীলার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। শাস্ত্রনির্দেশ অনুশীলন করার ফলে ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করা যেতে পারে, কিন্তু তার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করা যায় না। ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার অত্যধিক প্রচেষ্টার ফলে ভগবানের সঙ্গে প্রেমময়ী সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই প্রেমময়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হতে মনস্থ করেন।

শ্লোক ১৭

ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া ।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন করে ভক্ত চার প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

শ্লোক ১৮

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য ।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই চার প্রকার মুক্তি হচ্ছে সার্ষ্টি (ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা), সারূপ্য (ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া), সামীপ্য (ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা) এবং সালোক্য (ভগবানের লোকে বাস করা)। ভক্তরা কখনও সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না, কেন না তা হলে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে হয়।

তাৎপর্য

শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি অনুসারে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে এই চার রকমের মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু যদিও ভক্তরা *সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য* ও *সালোক্য* মুক্তি লাভ করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনই এই ধরনের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। কারণ, ভক্ত ভগবানের

সেবা করেই সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকেন। পঞ্চবিধ মুক্তির পঞ্চম মুক্তি *সাযুজ্য* বৈধীভক্তি অনুশীলনকারী ভক্তরা কখনও গ্রহণ করেন না। *সাযুজ্য মুক্তি* বা পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কেবল নির্বিশেষবাদীরাই করে থাকে। ভক্ত কখনও *সাযুজ্য মুক্তি* গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ১৯

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন ।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি স্বয়ং এই যুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন বা সম্মিলিতভাবে ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন প্রবর্তন করব। ভগবদ্ভক্তির চার প্রকার রস আস্বাদন করিয়ে আমি সমগ্র জগৎকে প্রেমানন্দে উদ্বেলিত করে নৃত্য করাব।

শ্লোক ২০

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি ভক্তের ভূমিকা গ্রহণ করব এবং নিজে আচরণ করে সকলকে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা দান করব।

তাৎপর্য

কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করেন, তখন তিনি এত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হন যে, তিনি এমন কি *সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য* অথবা *সালোক্য* মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। কারণ সেই স্তরে তিনি অনুভব করেন যে, এই সমস্ত মুক্তিগুলিও এক প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর নিজের জন্য ভগবানের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছু দেওয়া হলেও শুদ্ধ ভক্ত তা গ্রহণ করতে চান না, কারণ প্রেমময়ী সেবার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র বাসনা। এই সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা কেবল ভগবানই দান করতে পারেন। তাই, ভগবান যখন কলিযুগের অবতাররূপে এই যুগে ভগবানের আরাধনার প্রকৃষ্ট পন্থা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মহিমা প্রচার করার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হন, তখন তিনি শুদ্ধ ভক্তির স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমজনিত ভগবৎ-সেবার পদ্ধতিও প্রদান করেন। তাই, পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দান করার জন্য ভগবান স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ২১

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায় ।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"নিজে ধর্ম আচরণ না করলে অন্যকে ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করা যায় না। সেই সিদ্ধান্ত গীতা ও ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২২

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

যদা যদা—যখনই; হি—অবশ্যই; ধর্মস্য—ধর্মীয় নীতিসমূহের; গ্লানিঃ—অবক্ষয়; ভবতি—হয়; ভারত—হে ভরত-কুলোদ্ভূত; অভ্যুত্থানম্—উদয়; অধর্মস্য—অধর্মের; তদা—তখন; আত্মানম্—নিজেকে; সৃজামি—প্রকাশ করি; অহম্—আমি।

অনুবাদ

" 'হে ভরত-কুলোদ্ভূত (অর্জুন)! যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকট করি।'

শ্লোক ২৩

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২৩ ॥

পরিত্রাণায়—পরিত্রাণ করার জন্য; সাধূনাম্—ভক্তদের; বিনাশায়—বিনাশ করার জন্য; চ—এবং; দুষ্কৃতাম্—দুষ্কৃতকারীদের; ধর্ম—ধর্মনীতি; সংস্থাপন-অর্থায়—প্রতিষ্ঠা করার জন্য; সম্ভবামি—আমি আবির্ভূত হই; যুগে যুগে—প্রতি যুগে।

অনুবাদ

" 'সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে যুগে প্রকাশিত হই।'

তাৎপর্য

দ্বাবিংশতি ও ত্রয়োবিংশতি শ্লোক দুটি *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭-৮) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত হয়েছিল। পরবর্তী চতুর্বিংশতি এবং পঞ্চবিংশতি শ্লোক দুটিও *ভগবদ্গীতা* (৩/২৪,২১) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ২৪

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

উৎসীদেয়ুঃ—উৎসন্নে যাবে; ইমে—এই সমস্ত; লোকাঃ—লোকসমূহ; ন কুর্যাম্—না করি; কর্ম—কর্ম; চেৎ—যদি; অহম্—আমি; সঙ্করস্য—অবাঞ্ছিত জনগণের; চ—এবং; কর্তা—কারণ; স্যাম্—হব; উপহন্যাম্—বিনাশপ্রাপ্ত হবে; ইমাঃ—এই সমস্ত; প্রজাঃ—জীবসমূহ।

অনুবাদ

" 'যদি আমি যথার্থ ধর্মতত্ত্ব প্রদর্শন না করি, তা হলে এই সমস্ত জগৎ উৎসন্নে যাবে। তখন আমি অবাঞ্ছিত জনগণের কারণ হব এবং এই সমস্ত প্রজা বিনাশ প্রাপ্ত হবে।'

শ্লোক ২৫

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২৫ ॥

যৎ যৎ—যেভাবে; আচরতি—আচরণ করেন; শ্রেষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তৎ তৎ—সেভাবেই; এব—অবশ্যই; ইতরঃ—ইতর; জনঃ—মানুষ; সঃ—তিনি; যৎ—যা; প্রমাণম্—প্রমাণ; কুরুতে—প্রদর্শন করে; লোকঃ—মানুষ; তৎ—তা; অনুবর্ততে—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

" 'শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরা সেভাবেই তাঁর অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আদর্শ কর্মের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, সকলেই তা অনুসরণ করে।'

শ্লোক ২৬

যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে ।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার অংশ-প্রকাশেরাও প্রত্যেক যুগে অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারে। কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কেউ ব্রজের প্রেম দান করতে পারে না।

শ্লোক ২৭

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ২৭ ॥

সন্ত—হোক; অবতারাঃ—অবতারগণ; বহবঃ—বহু; পঙ্কজ-নাভস্য—যাঁর নাভি থেকে পদ্মফুল বিকশিত হয়, সেই পরমেশ্বর ভগবানের; সর্বতঃ-ভদ্রাঃ—সর্বতোভাবে মঙ্গলময়;

কৃষ্ণাৎ—শ্রীকৃষ্ণ থেকে; অন্যঃ—অন্য; কঃ বা—কেই বা; লতাসু—শরণাগতদের; অপি—ও; প্রেমদঃ—প্রেম প্রদানকারী; ভবতি—হন।

অনুবাদ

" 'পরমেশ্বর ভগবানের সর্ব মঙ্গলময় অন্য অনেক অবতার থাকতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেই বা তাঁর শরণাগতদের ভগবৎ-প্রেম দান করতে পারেন?'

তাৎপর্য

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের এই উক্তিটি *লঘুভাগবতামৃত* (১/৫/৩৭) গ্রন্থে উক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৮

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি' সঙ্গে ।
পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই আমি আমার আপন ভক্তদের সঙ্গে পৃথিবীতে অবতরণ করে বহুবিধ আনন্দময় লীলাবিলাস করব।"

শ্লোক ২৯

এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় ।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চিন্তা করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রথম ভাগে (সন্ধ্যায়) নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন।

তাৎপর্য

যুগ আরম্ভের সময়টিকে বলা হয় *প্রথম-সন্ধ্যা*। জ্যোতিষিক গণনা অনুসারে প্রতিটি যুগকে বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই বারোটি ভাগের প্রথম ভাগটিকে বলা হয় *প্রথম-সন্ধ্যা* এবং শেষ ভাগটিকে বলা হয় *শেষ-সন্ধ্যা*। *সূর্যসিদ্ধান্ত* অনুসারে কলিযুগের *প্রথম-সন্ধ্যার* স্থিতি ৩৬,০০০ সৌরবর্ষ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন কলিযুগের *প্রথম-সন্ধ্যায়* ৪,৫৮৬ সৌরবর্ষ গত হওয়ার পর।

শ্লোক ৩০

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার ।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য, সিংহের হুঙ্কার ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সিংহসদৃশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর গ্রীবা সিংহের

মতো বলিষ্ঠ, তাঁর বীর্য সিংহের মতো তেজোদ্দীপ্ত এবং তাঁর হুঙ্কার সিংহের মতো প্রবল।

শ্লোক ৩১

সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে ।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সিংহ প্রতিটি জীবের হৃদয়-কন্দরে আসন গ্রহণ করুন। তাঁর হুঙ্কারের প্রভাবে হস্তিসদৃশ সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়।

শ্লোক ৩২

প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম ।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রারম্ভিক লীলায় তাঁর নাম বিশ্বম্ভর, কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বকে ভক্তিরসে প্লাবিত করে সমস্ত জীবকে উদ্ধার করেছেন।

শ্লোক ৩৩

ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

'ডুভৃঞ্' ধাতুর (যা হচ্ছে 'বিশ্বম্ভর' শব্দটির মূল) অর্থ হচ্ছে পোষণ ও ধারণ। তিনি (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু) ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করে ত্রিভুবন পোষণ ও ধারণ করেন।

শ্লোক ৩৪

শেষলীলায় ধরে নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অন্ত্যলীলায় তাঁর নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মহিমা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে তিনি সমস্ত জগৎকে ধন্য করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বছর গৃহস্থ-আশ্রমে ছিলেন। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করে আটচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি এই জড় জগতে প্রকট ছিলেন। সুতরাং, তাঁর *শেষলীলার* স্থায়িত্ব ছিল চব্বিশ বছর।

তথাকথিত কিছু বৈষ্ণব বলে যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরার ধারায় সন্ন্যাস গ্রহণ করার রীতি নেই। এই ধরনের উক্তি তাদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীপাদ কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শঙ্কর সম্প্রদায় সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দশটি বিশেষ নাম অনুমোদন করে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের রীতি ছিল। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দশটি বিভিন্ন সন্ন্যাস নাম আছে এবং সন্ন্যাসীদের অষ্টোত্তরশত নামে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাস প্রদান করা হত। বৈদিক নির্দেশাবলীর দ্বারা এটি প্রমাণিত। অতএব শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বেও বৈষ্ণব সন্ন্যাসের অস্তিত্ব ছিল। বৈষ্ণব সন্ন্যাস সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তিরা অনর্থক প্রচার করে যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণের রীতি নেই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে মানব-সমাজে শঙ্করাচার্যের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তখন মানুষ মনে করত কেবল শঙ্করাচার্যের শিষ্য-পরম্পরায় সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রচারকার্য গৃহস্থরূপেও সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখেছিলেন যে, গৃহস্থজীবন প্রচারের প্রতিবন্ধক। তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি যেহেতু মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য তিনি শঙ্কর সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস-দীক্ষাকালে নির্দিষ্ট দশটি নাম থেকে একটি নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এই দশটি নাম হচ্ছে—১) *তীর্থ,* ২) *আশ্রম,* ৩) *বন,* ৪) *অরণ্য,* ৫) *গিরি,* ৬) *পর্বত,* ৭) *সাগর,* ৮) *সরস্বতী,* ৯) *ভারতী এবং* ১০) *পুরী*। সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারীকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। একজন ব্রহ্মচারী হচ্ছেন একজন সন্ন্যাসীর সহকারী। *তীর্থ* ও *আশ্রম* নামক সন্ন্যাসীরা সাধারণত দ্বারকায় থাকেন এবং তাঁদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে *স্বরূপ*। *বন* ও *অরণ্য* নামক সন্ন্যাসীরা পুরুষোত্তম বা জগন্নাথপুরীতে থাকেন এবং তাঁদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে *প্রকাশ*। *গিরি, পর্বত* ও *সাগর* নামক সন্ন্যাসীরা সাধারণত থাকেন বদরিকাশ্রমে এবং তাঁদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে *আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী* ও *পুরী* নামক সন্ন্যাসীরা সাধারণত থাকেন দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরিতে এবং তাঁদের ব্রহ্মচারী নাম হচ্ছে *চৈতন্য।*

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে চারটি মঠ স্থাপন করে তাঁর চারজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে সেই চারটি মঠের দায়িত্বভার অর্পণ করে যান। বর্তমানে এই চারটি মূল মঠের অধীনে ক্রমশ অসংখ্য শাখামঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মঠগুলির মধ্যে কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও তাদের আচরণের মধ্যে অনেক বৈষম্য এবং বিভেদ রয়েছে। চারটি মঠের চারটি সম্প্রদায় *আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার* ও *ভূমিবার* নামে পরিচিত। কালক্রমে তাদের মতবাদের মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

শঙ্কর সম্প্রদায়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলে প্রথমে একজন প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ব্রহ্মচারী শিক্ষা লাভ করতে হয়। সন্ন্যাসী যে শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই অনুসারে ব্রহ্মচারীর নাম দান করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যখন তিনি কেশব ভারতীর কাছে প্রথম যান, তখন তিনি একজন ব্রহ্মচারী হিসাবে গৃহীত হন এবং তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারী। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটিই উপযুক্ত মনে করেন এবং তাই তিনি তাঁর সেই নামটি পরিবর্তন করেননি।

কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতী নামটি যে কেন গ্রহণ করেননি, তা তাঁর অনুগামী আচার্যরা বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নামের সঙ্গে ঈশ্বর অভিমান যুক্ত থাকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা বর্জন করেছেন এবং নিজেকে ভগবানের নিত্য সেবকরূপে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামটি ব্যবহার করেছেন। ব্রহ্মচারী হচ্ছেন তাঁর গুরুর সেবক, তাই তাঁর গুরুর দাস্য তিনি ত্যাগ করেননি। গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক ভক্তির অনুকূল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রামাণিক জীবনচরিত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসীর চিহ্নসমূহ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তাঁর যুগাবতার জানি' গর্গ মহাশয় ।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে (মহাপ্রভুকে) কলিযুগের অবতার জেনে, গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করার সময়ে তাঁর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

আসন্—ছিল; **বর্ণাঃ**—বর্ণসকল; **ত্রয়ঃ**—তিন; **হি**—অবশ্যই; **অস্য**—এর; **গৃহ্ণতঃ**—প্রকাশ করে; **অনুযুগম্**—যুগ অনুসারে; **তনূঃ**—শরীর; **শুক্লঃ**—সাদা; **রক্তঃ**—লাল; **তথা**—তেমনই; **পীতঃ**—হলুদ; **ইদানীম্**—এখন; **কৃষ্ণতাম্**—কৃষ্ণত্ব; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে।

অনুবাদ

"এই বালকটি (কৃষ্ণ) অন্য তিনটি যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে। এখন দ্বাপরে সে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮/১৩) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৩৭

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি ।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীপতি ভগবান সত্য, ত্রেতা ও কলিযুগে যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন।

শ্লোক ৩৮

ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এখন, দ্বাপর যুগে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটিই হচ্ছে পুরাণ ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসমূহের সারমর্ম।

শ্লোক ৩৯

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

দ্বাপরে—দ্বাপর যুগে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্যামঃ**—শ্যামবর্ণ; **পীত-বাসাঃ**—পীত বসন পরিহিত; **নিজ**—নিজের; **আয়ুধঃ**—অস্ত্রশস্ত্র; **শ্রীবৎস-আদিভিঃ**—শ্রীবৎস প্রভৃতির; **অঙ্কৈঃ**—দেহের চিহ্নসকল দ্বারা; **চ**—এবং; **লক্ষণৈঃ**—কৌস্তুভ মণি প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা; **উপলক্ষিতঃ**—উপলক্ষিত।

অনুবাদ

"দ্বাপর যুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্যামবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি পীত বসন পরিহিত এবং তাঁর হাতে অস্ত্রশস্ত্র শোভা পায়। তিনি কৌস্তুভ মণি ও শ্রীবৎসাদি চিহ্নসমূহের দ্বারা সজ্জিত। এভাবেই তাঁর লক্ষণগুলি বর্ণিত হয়েছে।"

তাৎপর্য

এটি করভাজন মুনি কর্তৃক উক্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/৫/২৭) একটি শ্লোক। নবযোগেন্দ্র নামক যে নয়জন মহান যোগী মহারাজ নিমিকে বিভিন্ন যুগে ভগবানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছিলেন, করভাজন মুনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শ্লোক ৪০

কলিযুগে যুগধর্ম—নামের প্রচার ।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই কলিযুগে প্রত্যেকের আচরণীয় ব্যবহারিক ধর্ম হচ্ছে ভগবানের নাম-সংকীর্তন। এটি প্রবর্তন করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগের শুরু হয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে। এই উক্তি *মুণ্ডক উপনিষদের* ভাষ্যে মধ্বাচার্য কর্তৃক প্রতিপন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে *নারায়ণ-সংহিতা* থেকে তিনি এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

"দ্বাপর যুগে মানুষের *নারদ-পঞ্চরাত্র* ও অন্য সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা উচিত। কিন্তু কলিযুগে মানুষের কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা উচিত।" বিভিন্ন *উপনিষদে* হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, *কলিসন্তরণ উপনিষদে* বলা হয়েছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

"সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেও কলিযুগের কলুষকে নাশ করার জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের থেকে অধিক উপযোগী আর কোন পন্থা পাওয়া যায়নি।"

শ্লোক ৪১

তপ্তহেম-সমকান্তি, প্রকাণ্ড শরীর ।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর প্রকাণ্ড শরীরের কান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর নবমেঘের গম্ভীর গর্জনকেও পরাভূত করে।

শ্লোক ৪২

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত ।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপুরুষের একটি লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে তাঁর নিজের হাতের চার হাত পরিমিত দীর্ঘ হবেন।

শ্লোক ৪৩

'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম ।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই ধরনের মহাপুরুষকে বলা হয় 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণের আকর, সেরূপ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলের মতো দেহ ধারণ করেছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা বদ্ধ জীবসমূহকে মোহিত করে রেখেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউই এই সমস্ত দৈহিক আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কেবল বিষ্ণুর অবতারের মধ্যেই দেখা যায়, অন্য কারও মধ্যে তা দেখা যায় না।

শ্লোক ৪৪

আজানুলম্বিতভুজ কমললোচন ।
তিলফুল-জিনি-নাসা, সুধাংশু-বদন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বাহুযুগল আজানুলম্বিত, তাঁর চক্ষুদ্বয় ঠিক পদ্মফুলের মতো, তাঁর নাসিকা তিলফুলের মতো এবং তাঁর মুখমণ্ডল চন্দ্রের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত।

শ্লোক ৪৫

শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্বভূতে সম ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শান্ত, সংযত এবং কৃষ্ণভক্তির প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাপরায়ণ। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহপ্রবণ, তিনি সুশীল এবং তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন।

শ্লোক ৪৬

চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দন-ভূষণ ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসংকীর্তন ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি চন্দন কাঠের কঙ্কণ ও অনন্তের দ্বারা ভূষিত এবং তাঁর অঙ্গ চন্দনচর্চিত। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে নৃত্য করার সময় তিনি এভাবেই সজ্জিত হন।

শ্লোক ৪৭

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন ।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম-গণন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত গুণাবলী লিপিবদ্ধ করে বৈশম্পায়ন মুনি বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৪৮

দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা দুটি ভাগে বিভক্ত—আদিলীলা ও শেষলীলা। এই দুটি লীলার প্রত্যেকটিতে তাঁর চারটি করে বিশেষ নাম রয়েছে।

শ্লোক ৪৯

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

সুবর্ণ—সুবর্ণের; বর্ণঃ—অঙ্গকান্তি; হেম-অঙ্গঃ—যাঁর অঙ্গ তপ্ত কাঞ্চনের মতো; বর-অঙ্গঃ—অপূর্ব সুন্দর দেহ; চন্দন-অঙ্গদী—যাঁর দেহ চন্দনে চর্চিত; সন্ন্যাস-কৃৎ—সন্ন্যাস ধর্ম পালনকারী; শমঃ—শমগুণ-সম্পন্ন; শান্তঃ—শান্ত; নিষ্ঠা—ভক্তি; শান্তি—শান্তি; পরায়ণঃ—পরম আশ্রয়।

অনুবাদ

"তাঁর আদিলীলায় তিনি স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল বর্ণের সুন্দর দেহ ধারণ করে গৃহস্থরূপে লীলাবিলাস করেন। তাঁর সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং তাঁর চন্দনচর্চিত শ্রীঅঙ্গ তপ্ত কাঞ্চনের মতো দ্যুতিসম্পন্ন। তাঁর পরবর্তী লীলায় তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন এবং তিনি শমগুণ-

সম্পন্ন ও শান্ত। তিনি শান্তি ও ভক্তির পরম আশ্রয়, কেন না তিনি নির্বিশেষবাদী অভক্তদের নিবৃত্ত করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *মহাভারত* (*দানধর্ম, বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্র*) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ *বিষ্ণু-সহস্রনাম*-এর *নামার্থ-সুধাভিধ* নামক ভাষ্যে এই শ্লোকটির উপর মন্তব্য করে বলেছেন যে, *উপনিষদের* প্রমাণ অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, *সুবর্ণবর্ণঃ* কথাটির অর্থ হচ্ছে সোনার মতো অঙ্গকান্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি *যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্* (*মুণ্ডক উপঃ ৩/১/৩*)—এই বৈদিক নির্দেশটিরও উল্লেখ করেছেন। *রুক্মবর্ণং কর্তারমীশম্* অর্থে তপ্ত কাঞ্চনের মতো অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। *পুরুষম্* শব্দটির অর্থ পরম পুরুষ এবং *ব্রহ্মযোনিম্* অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, তিনিই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। এই শ্লোকের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সোনার মতো অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করার আর একটি কারণ হচ্ছে যে, তিনি স্বর্ণের মতো আকর্ষণীয়। *বরাঙ্গ* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন 'অপূর্ব সুন্দর'।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করেছিলেন। *শমঃ* বা তাঁর শমগুণ দুটি অর্থে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমত, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে এবং প্রেম দান করে সকলের যথার্থ শান্তি ও আনন্দ বিধান করেছেন। তিনি শান্ত, কেন না কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তিনি উদাসীন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, *নিষ্ঠা* শব্দটির অর্থে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তনে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন, সেই কথাই বোঝানো হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিবিরোধী সব রকম মত ও পথকে খণ্ডন করেছেন, বিশেষ করে ভগবানের সবিশেষ রূপের বিরোধী অদ্বৈতবাদীদের তিনি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেছেন।

শ্লোক ৫০

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে ধর্ম—নামসংকীর্তন সার ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতে বারবার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে সমস্ত ধর্মের সার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম-সংকীর্তন।

শ্লোক ৫১

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৫১ ॥

ইতি—এভাবেই; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **উর্বীশ**—হে রাজন্; **স্তুবন্তি**—স্তব করেন; **জগৎ-ঈশ্বরম্**—জগতের পতি; **নানা**—বিবিধ; **তন্ত্র**—শাস্ত্রসমূহের; **বিধানেন**—বিধানের দ্বারা; **কলৌ**—কলিযুগে; **অপি**—ও; **যথা**—যেভাবে; **শৃণু**—অনুগ্রহ করে শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

"হে রাজন্! এভাবেই দ্বাপর যুগের মানুষ জগদীশ্বরের আরাধনা করেছিলেন। কলিযুগের মানুষেরাও পরমেশ্বর ভগবানকে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে আরাধনা করেন। দয়া করে সেই সম্বন্ধে এখন আপনি শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

করভাজন মুনি কর্তৃক উক্ত এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩১) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৫২

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ-বর্ণম্—'কৃষ্' ও 'ণ' শব্দাংশ দুটি বারবার উচ্চারণ করতে করতে; **ত্বিষা**—কান্তি; **অকৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ বা কালো নয় (তপ্ত কাঞ্চনের মতো); **স-অঙ্গ**—সপার্ষদ; **উপাঙ্গ**—সেবকবৃন্দ; **অস্ত্র**—অস্ত্র; **পার্ষদম্**—অন্তরঙ্গ পার্ষদ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **সংকীর্তন-প্রায়ৈঃ**—প্রধানত সংকীর্তনের দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা করেন; **হি**—অবশ্যই; **সু-মেধসঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা।

অনুবাদ

"যে পরমেশ্বর ভগবান 'কৃষ্' ও 'ণ' শব্দাংশ দুটি নিরন্তর উচ্চারণ করেন, কলিযুগের বুদ্ধিমান মানুষেরা তাঁর উপাসনার নিমিত্ত সমবেতভাবে নাম-সংকীর্তন করে থাকেন। যদিও তাঁর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, তবুও তিনিই কৃষ্ণ। তিনি সর্বদা তাঁর পার্ষদ, সেবক, সংকীর্তনরূপ অস্ত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবৃত থাকেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/৫/৩২) থেকে উদ্ধৃত। *ক্রমসন্দর্ভ* নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যে শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকটির বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সেই কৃষ্ণ গৌরকান্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হন। সেই গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁকে বুদ্ধিমান মানুষেরা এই যুগে আরাধনা করে থাকেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* গর্গমুনিও বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, যদিও শিশু কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তিনি অন্য তিনটি যুগে শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি সত্য ও ত্রেতাযুগে যথাক্রমে শ্বেত ও রক্তবর্ণের দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গৌরহরিরূপে বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-রূপে অবতরণ করার পূর্বে তাঁর তপ্তকাঞ্চনের মতো পীতবর্ণ আর কখনও প্রদর্শিত হয়নি।

শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, *কৃষ্ণবর্ণম্* শব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বোঝানো হয়েছে। *কৃষ্ণবর্ণ* ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক। কৃষ্ণ নামটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উভয়ের সঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেন এবং এভাবেই নিরন্তর ভগবানের নাম এবং রূপ কীর্তন ও স্মরণ করার মাধ্যমে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন এবং বর্ণনা করেন। আর যেহেতু তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাই যে-ই তাঁর সংস্পর্শে আসে, সে-ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করতে শুরু করে এবং তারপর তা অন্যদের কাছে প্রচার করে। তাঁর সান্নিধ্যে যে-ই আসে, তারই মধ্যে তিনি অপ্রাকৃত কৃষ্ণভাবনামৃতের রস সঞ্চার করেন, যার ফলে সেই কীর্তনকারী ব্যক্তি অপ্রাকৃত আনন্দে মগ্ন হয়। তাই, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে সকলের কাছে তাঁর কৃষ্ণস্বরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করা মাত্রই কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয়। সেই জন্য তাঁকে *বিষ্ণুতত্ত্ব* বলে স্বীকার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ কথাটিতে বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর শ্রীঅঙ্গ সর্বদাই চন্দনের অলঙ্কারে ভূষিত এবং চন্দনচর্চিত। তাঁর পরম সৌন্দর্যের দ্বারা তিনি এই যুগের সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য অবতারে ভগবান কখনও কখনও অসুর সংহার করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন, কিন্তু এই যুগে তিনি সকলকে বশীভূত করেন তাঁর সর্বাকর্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপের দ্বারা। শ্রীজীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, অসুর দমন করার জন্য তাঁর অস্ত্র হচ্ছে তাঁর সৌন্দর্য। যেহেতু তিনি সর্বাকর্ষক, তাই বুঝতে হবে যে, সমস্ত দেবতারা তাঁর পার্ষদরূপে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর কার্যকলাপ অসাধারণ এবং তাঁর পার্ষদেরা অপূর্ব। সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারকালে তিনি বঙ্গভূমি ও উড়িষ্যাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত ও আচার্যদের আকৃষ্ট করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভু ও শ্রীবাস প্রভুর দ্বারা পরিবৃত থাকেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী বৈদিক শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, যাগযজ্ঞ অথবা মহোৎসব অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন নেই। এই ধরনের বহির্মুখী, আড়ম্বরপূর্ণ সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারে। *কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্* বলতে বোঝানো হয়েছে যে, কৃষ্ণের নামকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আরাধনা করার জন্য সকলকে একত্রিত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করতে হবে। মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জায় ভগবানের আরাধনা করা সম্ভব নয়, কেন না মানুষ মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা সম্পর্কে তাদের উৎসাহ হারিয়ে

ফেলেছে। কিন্তু মানুষ যে-কোন স্থানে সর্বদাই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারে। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করার মাধ্যমে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং মানব-জীবনের মূল উদ্দেশ্য যে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা, এই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সেই কাজেও সাফল্য লাভ করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অগ্রগণ্য একজন অনুগামী শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন, "চিন্ময় ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হয়েছেন সেই ভগবদ্ভক্তির পন্থা পুনরায় প্রদান করার জন্য। তিনি এতই দয়ালু যে, তিনি অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করছেন। ভ্রমর যেমন পদ্মফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ঠিক সেভাবেই সকলেরই অধিক থেকে অধিকতর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।"

শ্লোক ৫৩

শুন, ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা ।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

হে ভাইসকল! দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত মহিমা শ্রবণ কর। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর মহিমার সারমর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৪

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে ।
অথবা, কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

'কৃষ্' ও 'ণ', এই শব্দাংশে দুটি নিরন্তর তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, অথবা তিনি মহানন্দে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছেন।

শ্লোক ৫৫

কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। বাস্তবিকই, কৃষ্ণ ছাড়া অন্য আর কিছু তাঁর মুখে আসে না।

শ্লোক ৫৬

কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ যদি বলে যে, তাঁর বর্ণ কৃষ্ণ, তা হলে পরবর্তী বিশেষণে (ত্বিষা অকৃষ্ণম্) তা নিবারণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৭

দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দেহের বর্ণ অবশ্যই কৃষ্ণ নয়। তাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ বলে বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তাঁর বর্ণ পীত।

শ্লোক ৫৮

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্তনময়ৈঃ ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫৮ ॥

কলৌ—কলিযুগে; যম্—যাঁকে; বিদ্বাংসঃ—বিদ্বানেরা; স্ফুটম্—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত; অভিযজন্তে—আরাধনা করেন; দ্যুতি-ভরাৎ—উজ্জ্বল অঙ্গকান্তির আধিক্যবশত; অকৃষ্ণ-অঙ্গম্—যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ (পীত); কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; মখ-বিধিভিঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; উৎকীর্তন-ময়ৈঃ—উচ্চ কীর্তন সমন্বিত; উপাস্যম্—উপাস্য; চ—এবং; প্রাহুঃ—তাঁরা বলেছেন; যম্—যাঁকে; অখিল—সমস্ত; চতুর্থ-আশ্রম-জুষাম্—চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস) অবলম্বীদের; সঃ—তিনি; দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান; চৈতন্য-আকৃতিঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে; অতিতরাম্—অতীব; নঃ—আমাদের; কৃপয়তু—কৃপা করুন।

অনুবাদ

"কলিযুগে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত পণ্ডিতেরা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবরূপ দ্যুতির আধিক্যবশত অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপ প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করেন। তিনি চতুর্থ আশ্রমের (সন্ন্যাসের) সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত পরমহংসদের আরাধ্য বিগ্রহ। সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের উপর তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *স্তবমালার দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টক* ১ থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫৯

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি ।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

অজ্ঞানের অন্ধকার বিনাশকারী তাঁর তপ্ত কাঞ্চনসদৃশ দ্যুতি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬০

জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে ।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

অজ্ঞানের প্রভাবে জীব পাপ-পঙ্কিল জীবন যাপন করে। জীবের সেই অজ্ঞান বিনাশ করার জন্য তিনি তাঁর অঙ্গ, তাঁর উপাঙ্গ বা ভক্তগণ এবং দিব্য নামরূপ নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ৬১

ভক্তির বিরোধী কর্ম-ধর্ম বা অধর্ম ।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তিবিরোধী যে কর্ম, তা ধর্মই হোক অথবা অধর্মই হোক, তা হচ্ছে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তাকে বলা হয় 'কল্মষ'।

শ্লোক ৬২

বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্ট্যে চায় ।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

দুই বাহু তুলে, হরিনাম কীর্তন করে এবং প্রেমপূর্ণ নয়নে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি সমস্ত কল্মষ নাশ করেন এবং সকলকে ভগবৎ-প্রেমে প্লাবিত করেন।

শ্লোক ৬৩

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৬৩ ॥

স্মিত—হাস্যযুক্ত; আলোকঃ—দৃষ্টিপাত; শোকম্—শোক; হরতি—হরণ করে; জগতাম্—জগতের; যস্য—যাঁর; পরিতঃ—সর্বতোভাবে; গিরাম্—বাক্যের; তু—ও; প্রারম্ভঃ—প্রারম্ভ; কুশল—কুশল; পটলীম্—সমূহের; পল্লবয়তি—বিকশিত হতে সহায়তা করে; পদ-আলম্ভঃ—শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; কম্ বা—কি বা; প্রণয়তি—প্রণয়ন করে; ন—না; হি—অবশ্যই; প্রেম-নিবহম্—প্রেমসমূহ; সঃ—তিনি; দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান; চৈতন্য-আকৃতিঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে; অতিতরাম্—অতীব; নঃ—আমাদের প্রতি; কৃপয়তু—কৃপা করুন।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে পরমেশ্বর ভগবান আমাদের উপর তাঁর অহৈতুকী করুণা বর্ষণ করুন। তাঁর সহাস্য দৃষ্টিপাত তৎক্ষণাৎ জগতের সমস্ত দুঃখ বিদূরিত করে এবং তাঁর বাণী মঙ্গলময় ভক্তিলতাকে পত্রপল্লবে বিকশিত হতে সহায়তা করে। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের অপ্রাকৃত আশ্রয় গ্রহণ করা হলে তৎক্ষণাৎ চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *স্তবমালার দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টক* ৮ থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৪

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন ।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করা মাত্র যে-কোন ব্যক্তির পাপ ক্ষয় হয় এবং সে ভগবৎ-প্রেমরূপ মহাসম্পদ লাভ করে।

শ্লোক ৬৫

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে ।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

অন্যান্য অবতারে ভগবান সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সহ অবতরণ করেন। কিন্তু এই অবতারে তাঁর সৈন্য হচ্ছেন তাঁর অঙ্গ ও উপাঙ্গ।

শ্লোক ৬৬

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬৬ ॥

সদা—সর্বদা; উপাস্যঃ—উপাস্য; শ্রীমান্—সুন্দর; ধৃত—যিনি ধারণ করেছেন; মনুজ-কায়ৈঃ—মনুষ্যদেহ; প্রণয়িতাম্—প্রেম; বহদ্ভিঃ—যিনি বহন করছিলেন; গীঃ-বাণৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; গিরিশ—মহাদেব; পরমেষ্ঠি—ব্রহ্মা; প্রভৃতিভিঃ—প্রভৃতির দ্বারা; স্বভক্তেভ্যঃ—তাঁর নিজ ভক্তদের; শুদ্ধাম্—শুদ্ধ; নিজ-ভজন—তাঁর নিজের ভজন; মুদ্রাম্—মুদ্রা; উপদিশন্—উপদেশ দান করেন; সঃ—তিনি; চৈতন্যঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; কিম্—কি; মে—আমার; পুনঃ—পুনরায়; অপি—অবশ্যই; দৃশোঃ—দুই চক্ষুর; যাস্যতি—তিনি যাবেন; পদম্—পদ।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শিব ও ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদেরও পরম আরাধ্য। তিনি স্বীয় ভক্তিভাব অবলম্বন করে একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তাঁর নিজের ভক্তদের শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। তিনি কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হবেন?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *স্তবমালার প্রথম শ্রীচৈতন্যাষ্টক* ১ থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৭

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্যসাধন ।
'অঙ্গ'-শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্রসমূহ স্বীয় কর্তব্যসমূহ সাধন করে। 'অঙ্গ' শব্দটির আর একটি অর্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৬৮

'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ'-ব্যাখ্যান ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে অঙ্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ এবং অঙ্গের অংশকে বলা হয় 'উপাঙ্গ'।

শ্লোক ৬৯

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৬৯ ॥

নারায়ণঃ—শ্রীনারায়ণ; **ত্বম্**—আপনি; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **সর্ব**—সমস্ত; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবদের; **আত্মা**—পরমাত্মা; **অসি**—আপনি হন; **অধীশ**—হে পরমেশ্বর; **অখিল-লোক**—সমস্ত জগতের; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ নামক; **অঙ্গম্**—অঙ্গ; **নর**—নরের; **ভূ**—জাত; **জল**—জলে; **অয়নাৎ**—আশ্রয়স্থল হওয়ার ফলে; **তৎ**—তা; **চ**—এবং; **অপি**—অবশ্যই; **সত্যম্**—পরম সত্য; **ন**—না; **তব এব**—আপনারই; **মায়া**—মায়াশক্তি।

অনুবাদ

"হে পরমেশ্বর! আপনি অখিল লোকসাক্ষী। আপনি হচ্ছেন সকলের প্রিয় আত্মা। তাই, আপনি কি আমার পিতা নারায়ণ নন? নর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু) জাত জল হচ্ছে নার, তাতে যাঁর অয়ন (আশ্রয়স্থল), তিনিই নারায়ণ। তিনি আপনার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। আপনার অংশরূপ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কেউই মায়ার অধীন নন। তাঁরা সকলেই মায়াধীশ, মায়াতীত পরম সত্য।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার এই উক্তিটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭০

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত জীবের অন্তর্যামী যে নারায়ণ কিংবা জলে (কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর) শায়িত যে নারায়ণ, তিনি আপনার অংশ। তাই, আপনিই হচ্ছেন মূল নারায়ণ।

শ্লোক ৭১

'অঙ্গ'-শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয় ।
মায়াকার্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

'অঙ্গ' শব্দটির মাধ্যমে তাঁর অংশদের বোঝানো হয়েছে। এই ধরনের অংশ-প্রকাশদের কখনই মায়ার সৃষ্টি বলে মনে করা উচিত নয়, কেন না তাঁরা সকলেই মায়াধীশ—সৎ, চিৎ ও আনন্দময়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে যদি মূল বস্তু থেকে একটি অংশ নিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে মূল বস্তুটি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কখনই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না। *ঈশোপনিষদের* মঙ্গলাচরণে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ, তাই দৃশ্যমান জগতের মতো তাঁর থেকে প্রকাশিত সব কিছুই পূর্ণরূপে নিখুঁতভাবে সজ্জিত। পূর্ণ থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিও পূর্ণ হয়ে ওঠে। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই যদিও তাঁর থেকে বহু পূর্ণ সত্তার প্রকাশ ঘটে, তবুও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।"

পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ-জগতে একের সঙ্গে এক যোগ করলে একই থাকে এবং এক থেকে এক বিয়োগ করলেও এক থাকে। তাই জড়-জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের অংশাতি-অংশেরও অনুমান করা উচিত নয়। চিৎ-জগতে জড় শক্তি অথবা জড় হিসাব-নিকাশের কোন প্রভাব নেই। *ভগবদ্গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, জীব হচ্ছে তাঁর বিভিন্ন অংশ। জড় জগতে ও চিৎ-জগতে অসংখ্য জীব রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বলে যে ভগবানের সত্তা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, তা মনে করা হচ্ছে মায়া। সেটি একটি জড়-জাগতিক বিচার। জড় শক্তি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলেই এই ধরনের বিচার করা সম্ভব হয়। চিৎ-জগতে জড় অস্তিত্বের অনুভূতি হয় কেবলমাত্র তার অনুপস্থিতির মাধ্যমে।

বহুরূপে প্রকাশিত হলেও *বিষ্ণুতত্ত্বের* শক্তি কখনও হ্রাস পায় না, ঠিক যেমন একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালানো সত্ত্বেও সেই প্রদীপের শক্তি অপরিবর্তিতই থাকে। মূল প্রদীপ থেকে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালানো যেতে পারে এবং প্রতিটি প্রদীপ থেকে একই পরিমাণ আলোক প্রকাশিত হয়। এভাবেই বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে বিভিন্ন যুগে রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত সমস্ত *বিষ্ণুতত্ত্বের* সকলেই সমভাবে পরম শক্তিসম্পন্ন।

ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা জড় শক্তির সংস্পর্শে আসেন এবং তাই তাঁদের শক্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরের। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত অবতারেরা সমান শক্তিসম্পন্ন, কেন না মায়ার প্রভাব তাঁদের কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ৭২

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়ই হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুটি অঙ্গ। এই দুটি অঙ্গের অংশদের বলা হয় উপাঙ্গ।

শ্লোক ৭৩

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে ।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই ভগবান তাঁর অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহে সজ্জিত। তিনি সেই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা ভগবৎ-বিদ্বেষী পাষণ্ডদের দমন করেন।

তাৎপর্য

এখানে *পাষণ্ড* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে স্বর্গের দেব-দেবীদের সঙ্গে তুলনা করে, তাকে বলা হয় *পাষণ্ড। পাষণ্ডেরা* ভগবানকে জড় স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। কখনও কখনও তারা তাদের মনগড়া ভগবান তৈরি করে অথবা একজন সাধারণ মানুষকে ভগবান বলে প্রচার করে। তারা এতই মূর্খ যে, অনেক সময় তারা একজন সাধারণ মানুষকে শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী অবতার বলে প্রচার করে, যদিও সেই মানুষটির কার্যকলাপ ভগবৎ-অবতারদের কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এভাবেই তারা সাধারণ মানুষদের প্রতারিত করে। যিনি যথার্থ বুদ্ধিমান এবং বৈদিক প্রমাণের ভিত্তিতে পরমেশ্বর ভগবানের অবতারদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত, তিনি কখনই *পাষণ্ডদের* দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

পাষণ্ড অথবা নাস্তিকেরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের তত্ত্ব অথবা ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বুঝতে পারে না। তারা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তি সকাম কর্মের থেকে কোন অংশে শ্রেয় নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্তরা সাধুদের পরিত্রাণ করেন, দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি প্রদান করেন এবং এই সমস্ত মূর্খ নাস্তিকদের দমন করেন (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। দুষ্কৃতকারীরা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করে এবং নানাভাবে ভগবদ্ভক্তির পথকে কণ্টকিত করতে চায়। তাদের সেই অন্যায় প্রচেষ্টা দমন করার জন্য ভগবান তাঁর নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন অথবা স্বয়ং আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৭৪

নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর ।
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ গোসাঞি হচ্ছেন সাক্ষাৎ হলধর (বলরাম) এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

শ্লোক ৭৫

শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা ।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্তন করিয়া ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই সেনাপতি শ্রীবাস ঠাকুর আদি পারিষদ সৈন্যসহ ভগবানের দিব্য নামকীর্তন করতে করতে সর্বত্র ভ্রমণ করেন।

শ্লোক ৭৬

পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায় ।
আচার্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রূপ হচ্ছে পাষণ্ডদলনকারী রূপ। আর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর হুঙ্কারে সমস্ত পাপ ও পাষণ্ডীরা পলায়ন করে।

শ্লোক ৭৭

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছেন সংকীর্তন (সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নামকীর্তন) যজ্ঞের প্রবর্তক। যিনি এই সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর ভজনা করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ভাগ্যবান।

শ্লোক ৭৮

সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ।
সর্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মানুষই হচ্ছেন যথার্থ বুদ্ধিমান। কিন্তু যারা নির্বোধ, তারা সংসারে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিরন্তর আবর্তিত হয়। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম-কীর্তনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সংকীর্তন আন্দোলনের পিতা ও প্রবর্তক। যে মানুষ সংকীর্তন আন্দোলনে তার জীবন, সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ও বাক্য উৎসর্গ করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করে, ভগবান তার প্রতি সদয় হন এবং তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। এছাড়া অন্য সকলেই হচ্ছে মূর্খ, কেন না তারা বহু শক্তি ক্ষয় করে যে সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করে, তার মধ্যে এই সংকীর্তন যজ্ঞ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৭৯

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম ।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক কৃষ্ণনামের সমান, এই কথা যে বলে সে পাষণ্ডী। সে অবশ্যই যমরাজ কর্তৃক দণ্ডিত হবে।

তাৎপর্য

ভগবানের দিব্যনাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ বা কীর্তন করার সময় দশটি অপরাধ বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই দশটি অপরাধের মধ্যে অষ্টম অপরাধটি হচ্ছে, *ধর্মব্রততত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ*। অর্থাৎ, ভগবানের নাম-কীর্তনকে ব্রাহ্মণ অথবা সাধুদের দান করা, দাতব্য শিক্ষানিকেতন খোলা, খাদ্য বিতরণ করা প্রভৃতি পুণ্যকর্মগুলির সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। কোন পুণ্যকর্মের ফলই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥

"এমন কি কেউ যদি সূর্যগ্রহণের সময় কোটি গাভী দান করেন, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বসবাস করেন, অথবা যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পর্বতপ্রমাণ স্বর্ণ দান করেন, তবুও তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার এক-শতাংশ ফলও অর্জন করতে পারেন না।" পক্ষান্তরে, কেউ যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে কোন রকম পুণ্যকর্ম বলে মনে করে, তা হলে সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই হরিনাম কীর্তনে অবশ্যই পুণ্য অর্জন হয়। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নাম সর্বতোভাবে চিন্ময় এবং তাই তা সব রকম জড়-জাগতিক পুণ্যকর্মের অতীত। পুণ্যকর্ম হচ্ছে জড়-জাগতিক স্তরের বস্তু, কিন্তু ভগবানের দিব্য নামকীর্তন সম্পূর্ণভাবে চিন্ময়। তাই, *পাষণ্ডীরা* তা বুঝতে না পারলেও, ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের সঙ্গে পুণ্যকর্মের কখনই তুলনা করা যায় না।

শ্লোক ৮০

'ভাগবতসন্দর্ভ'-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ।
এ-শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

ভাগবত-সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল জীব গোস্বামী সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৮১

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮১ ॥

অন্তঃ—অন্তরে; **কৃষ্ণম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **বহিঃ**—বাইরে; **গৌরম্**—গৌরবর্ণ; **দর্শিত**—প্রদর্শিত; **অঙ্গ**—অঙ্গ; **আদি**—আদি; **বৈভবম্**—বৈভব; **কলৌ**—কলিযুগে; **সংকীর্তন-আদ্যৈঃ**—সংকীর্তন প্রভৃতি দ্বারা; **স্ম**—অবশ্যই; **কৃষ্ণচৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রিত।

অনুবাদ

"আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি, যিনি বাইরে গৌরবর্ণ ধারণ করেছেন, কিন্তু অন্তরে তিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই কলিযুগে তিনি ভগবানের দিব্য নামকীর্তন করার মাধ্যমে তাঁর বৈভব (অঙ্গ ও উপাঙ্গ) প্রদর্শন করেন।"

তাৎপর্য

৫২ শ্লোকে উদ্ধৃত *শ্রীমদ্ভাগবতের* (*কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্*) শ্লোকটি শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ* গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে উল্লেখ করেছেন। তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* সেই শ্লোকটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই শ্লোকটি (৮১) রচনা করেছেন, যা হচ্ছে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোক। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকটি নবযোগেন্দ্র নামক নয়জন শ্রেষ্ঠ মুনির অন্যতম করভাজন মুনির উক্তি। শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত *ষট্‌সন্দর্ভের* ভাষ্য *সর্বসংবাদিনীতে* এই শ্লোকটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অন্তঃ কৃষ্ণ বলতে তাঁকেই বোঝায়, যিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করছেন। এটিই হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব। যদিও বহু ভক্তই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু কেউই ব্রজগোপিকাদের মতো এত গভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন না এবং তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণভাবনামৃতের উৎকর্ষতা অন্যান্য সমস্ত ভক্তদেরকে ছাপিয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করেছিলেন; তাই তিনি নিরন্তর রাধারাণীর মতো শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন। নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার দ্বারা তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে আবৃত করে রেখেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাঁর অঙ্গকান্তি ছিল তপ্তকাঞ্চনের মতো গৌর বর্ণ, তিনি তাঁর নিত্যপার্ষদ, বৈভব, প্রকাশ ও অবতার সহ প্রকাশিত হয়েছিলেন। তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন এবং যাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ধন্য।

শ্লোক ৮২

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন ।
কৃপা করি ব্যাস প্রতি করিয়াছেন কথন ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

উপপুরাণেও আমরা শুনতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করে ব্যাসদেবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৮৩

অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ৮৩ ॥

অহম্—আমি; এব—অবশ্যই; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ; সন্ন্যাস-আশ্রমম্—সন্ন্যাস-আশ্রম; আশ্রিতঃ—অবলম্বন করে; হরিভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; গ্রাহয়ামি—আমি দান করব; কলৌ—কলিযুগে; পাপহতান্—পাপী; নরান্—মানুষদের।

অনুবাদ

"হে ব্রাহ্মণ! কখনও কখনও আমি কলিযুগের অধঃপতিত পাপী মানুষদের হরিভক্তি প্রদান করার জন্য সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করি।"

শ্লোক ৮৪

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, পুরাণ ও অন্যান্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৮৫

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।
অলৌকিক কর্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্যকলাপ এবং অলৌকিক ভক্তিভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

শ্লোক ৮৬

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু অভক্তেরা তা দেখেও দেখতে পায় না, ঠিক যেমন প্যাঁচা সূর্যের কিরণ দেখতে পায় না।

শ্লোক ৮৭

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ৮৭ ॥

ত্বাম্—তোমাকে; শীল—চরিত্র; রূপ—রূপ; চরিতৈঃ—কার্যকলাপের দ্বারা; পরম—পরম; প্রকৃষ্টৈঃ—প্রকৃষ্টভাবে; সত্ত্বেন—অসাধারণ শক্তির প্রভাবে; সাত্ত্বিকতয়া—সত্ত্বগুণের দ্বারা; প্রবলৈঃ—প্রবল; চ—এবং; শাস্ত্রৈঃ—শাস্ত্রের দ্বারা; প্রখ্যাত—বিখ্যাত; দৈব—দৈব; পরম-অর্থ-বিদাম্—পরমার্থবিৎদের; মতৈঃ—মতে; চ—এবং; ন—না; এব—অবশ্যই; আসুর-প্রকৃতয়ঃ—আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন; প্রভবন্তি—সক্ষম; বোদ্ধুম্—জানতে।

অনুবাদ

"হে ভগবান! যদিও তুমি তোমার মহিমান্বিত কর্ম, মাধুর্যমণ্ডিত রূপ, মহিমাময় চরিত্র ও অসাধারণ ক্ষমতার বলে পরমেশ্বর ভগবান এবং তা সমস্ত সাত্ত্বিক শাস্ত্রসমূহ এবং সকল পরমার্থবিৎ কর্তৃক প্রতিপাদিত হয়েছে, তবুও আসুরিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা তোমাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।"

তাৎপর্য

এটি শ্রীরামানুজাচার্যের গুরুদেব শ্রীযামুনাচার্যের রচিত *স্তোত্ররত্ন* (১২) থেকে উদ্ধৃত একটি শ্লোক। প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলা আদির বর্ণনা করে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পৃথিবীর সব চাইতে প্রামাণিক শাস্ত্র *ভগবদ্গীতায়* তাঁর নিজের সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবতেও* তাঁকে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কেবল অজ্ঞ মানুষদের স্বীকৃতির মাধ্যমে নয়। আধুনিক যুগে এক ধরনের মূর্খ মানুষেরা মনে করে যে, যেভাবে তারা ভোট দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচন করে, ঠিক সেভাবেই তারা ভোট দিয়ে যে কোনও ব্যক্তিকে ভগবান বানাতে পারে। কিন্তু জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান প্রামাণিক শাস্ত্রে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, মূর্খ লোকেরাই কেবল তাঁকে সাধারণ মানুষ জ্ঞানে অবজ্ঞা করে এবং মনে করে সকলেই তাঁর মতো পরম তত্ত্বজ্ঞান দান করতে পারে।

এমন কি ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুসারেও শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ অত্যন্ত অসাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আমি হচ্ছি ভগবান" এবং তিনি সেই অনুসারে কার্য করেছেন। মায়াবাদীরা মনে করে, যে কেউ নিজেকে ভগবান বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু সেটি তাদের ভ্রান্তি, কেন না শ্রীকৃষ্ণের মতো এই ধরনের অসাধারণ কার্যকলাপ আর কেউই করতে পারে না। তিনি যখন তাঁর মাতৃক্রোড়স্থ একটি শিশু, তখন তিনি

পূতনা নাম্নী এক ভয়ংকরী রাক্ষসীকে সংহার করেছিলেন। তারপর তিনি একে একে তৃণাবর্তাসুর, বৎসাসুর ও বকাসুরকে সংহার করেছিলেন। তারপর একটু বয়স প্রাপ্ত হলে তিনি অঘাসুর ও ঋষভাসুরকে সংহার করেছিলেন। এভাবেই দেখা যায় যে, ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবান হওয়া যায়, এই ধারণাটি হাস্যকর। কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেউ তাঁর দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, কিন্তু সে কখনই ভগবান হতে পারে না। যে সমস্ত অসুরেরা মনে করে যে, যে কেউই ভগবান হতে পারে, তারা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

প্রামাণিক শাস্ত্রগুলি প্রণয়ন করেছেন ব্যাসদেব, নারদ মুনি, অসিত, পরাশর আদি মহর্ষিরা, যাঁরা সাধারণ মানুষ নন। *বেদের* সমস্ত অনুগামীরাই এই সমস্ত মহাপুরুষদের স্বীকার করেছেন। তাঁদের প্রামাণিক শাস্ত্রগুলি বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসুরিক ভাবাপন্ন জীবেরা শাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার করে না এবং তারা ইচ্ছাপূর্বক পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্তদের বিরোধিতা করে। আজকাল তথাকথিত ভগবানের অবতার বলে নিজেদের জাহির করে মনগড়া কতকগুলি কথা লিখে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে ভগবান বলে স্বীকৃতি আদায় করাটা একটি কায়দা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে প্রবলভাবে নিন্দা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুরিক ভাবাপন্ন দুষ্কৃতকারী মানুষেরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। তাদের উলুক বা প্যাঁচার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যারা সূর্যের আলোকে চক্ষু উন্মীলিত করতে পারে না। যেহেতু তারা সূর্যের আলোক সহ্য করতে পারে না, তাই তারা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে এবং কোন দিনই সূর্যকে দেখতে পায় না। তারা বিশ্বাসই করতে পারে না যে, সূর্যের আলোক রয়েছে।

শ্লোক ৮৮

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তাঁকে যথাযথভাবে চিনতে পারেন।

শ্লোক ৮৯

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্ ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৮৯ ॥

উল্লংঘিত—উল্লংঘন করে; **ত্রিবিধ**—তিন প্রকার; **সীম**—সীমা; **সম**—সম; **অতিশায়ি**—অতিক্রম করে; **সম্ভাবনম্**—সম্ভাবনা; **তব**—তোমার; **পরিব্রঢ়িম**—পরম উৎকৃষ্ট; **স্বভাবম্**—স্বভাব; **মায়াবলেন**—মায়াশক্তির দ্বারা; **ভবতা**—তোমার; **অপি**—যদিও; **নিগুহ্যমানম্**—লুকায়িত হয়ে; **পশ্যন্তি**—তাঁরা দেখে; **কেচিৎ**—কিছু; **অনিশম্**—সর্বদা; **ত্বৎ**—তোমাকে; **অনন্য-ভাবাঃ**—যাঁরা অনন্য ভাব সহকারে ভক্তিযুক্ত।

অনুবাদ

"হে ভগবান! সমস্ত জড় বস্তুই দেশ, কাল ও চিন্তা—এই তিনটি সীমার দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু তবুও তোমার অসম ও অনতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তুমি ওই সীমাত্রয়কে সর্বদাই উল্লঙ্ঘন করতে পার। যদিও তুমি তোমার ওই স্বভাবকে নিজ শক্তির দ্বারা আচ্ছাদন কর, কিন্তু তবুও তোমার অনন্য ভক্তরা সর্বদা তোমাকে দর্শন করতে সমর্থ।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিও শ্রীযামুনাচার্যের *স্তোত্ররত্ন* (১৩) থেকে উদ্ধৃত। *মায়ার* প্রভাবে আচ্ছাদিত সব কিছুই স্থান, কাল ও চিন্তার দ্বারা সীমিত। সব চাইতে বৃহৎ যে বস্তুর ধারণা করা যায়, সেই আকাশও সীমিত। প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, জড় আকাশের মধ্যে রয়েছে সাতটি আবরণ এবং পূর্ববর্তী আবরণ থেকে পরবর্তী আবরণটি দশ গুণ বৃহৎ। এই আবরণের স্তরগুলি বিশাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জড় জগৎ সীমিত। স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করার ক্ষমতাও সীমিত। কাল অনন্ত; আমরা কোটি কোটি বছর সম্বন্ধে কল্পনা করতে পারি, কিন্তু অনন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিতান্তই নগণ্য। আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলি তাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারে না, অথবা তাঁকে আমরা সময়সীমার মধ্যে অথবা আমাদের চিন্তাশক্তির মধ্যে আনতে পারি না। *উল্লংঘিত* শব্দটির মাধ্যমে তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি স্থান, কাল ও চিন্তার অতীত; যদিও তিনি তাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, তবুও তিনি সর্বদাই সেগুলির অতীত। এমন কি ভগবানের চিন্ময় অস্তিত্ব স্থান, কাল ও চিন্তার দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও শুদ্ধ ভক্ত ভগবানকে স্থান, কাল ও চিন্তার অতীত তাঁর প্রকৃত স্বরূপে দর্শন করতে পারেন। অর্থাৎ, ভগবান যদিও সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হন না, কিন্তু চিন্ময় ভক্তির প্রভাবে যাঁরা মায়ার আবরণ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা তাঁকে নিরন্তর দর্শন করতে পারেন।

সূর্যকে মেঘাচ্ছাদিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র জীবের দৃষ্টিই মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, সূর্য কখনও মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় না। সেই ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা যদি একটি বিমানে চড়ে মেঘের উপরে উঠে যায়, তা হলে তারা আবার সূর্য ও সূর্যের কিরণ দর্শন করতে পারে। তেমনই, মায়ার আবরণ যদিও অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"প্রকৃতির তিনটি গুণ সমন্বিত আমার এই দৈবী মায়াকে অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা সহজেই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" মায়াশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হতে বদ্ধপরিকর, তারা মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়। তাই, শুদ্ধ ভক্তরা ভগবানকে জানতে পারেন, কিন্তু দুষ্কৃতকারী অসুরেরা বহু শাস্ত্র প্রমাণ এবং ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপ দর্শন করা সত্ত্বেও ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ৯০

অসুরস্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

যাদের স্বভাব আসুরিক, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারেন না।

তাৎপর্য

যে সমস্ত মানুষ রাবণ ও হিরণ্যকশিপুদের মতো আসুরিক ভাবযুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের বিরোধিতা করে, তারা কখনই ভগবানকে জানতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে নিজেকে কোন মতেই গোপন রাখতে পারেন না।

শ্লোক ৯১

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বৌ—দুই; **ভূত**—জীবদের; **সর্গৌ**—প্রবণতা; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **দৈবঃ**—দৈব; **আসুরঃ**—আসুরিক; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **বিষ্ণু-ভক্তঃ**—শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত; **স্মৃতঃ**—স্মরণ করা হয়; **দৈবঃ**—দৈব; **আসুরঃ**—আসুরিক; **তৎ-বিপর্যয়ঃ**—তার বিপরীত।

অনুবাদ

"এই জগতে দৈব ও অসুর ভেদে দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে এক প্রকার মানুষ দৈব ভাবযুক্ত, আর এক প্রকার মানুষ আসুরিক স্বভাবযুক্ত। বিষ্ণুভক্তেরা সুর, আর যারা তার বিপরীত তারা অসুর।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্মপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত। *বিষ্ণুভক্ত* বা কৃষ্ণভক্তেরা *দেব* (দেবতা) নামে পরিচিত। নাস্তিকেরা, যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না অথবা নিজেদের ভগবান বলে ঘোষণা করে, তারা হচ্ছে অসুর। অসুরেরা সব সময়ই ভগবৎ-বিদ্বেষী জড় কার্যকলাপে লিপ্ত। তারা সব সময় জড় জগৎকে ভোগ করার মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের

চেষ্টা করে। বিষ্ণুভক্ত বা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তরাও সব সময় নানা রকম কাজে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু তাঁদের সেই কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করা। আপাতদৃষ্টিতে দুই শ্রেণীর মানুষকেই একই রকম কার্যকলাপে লিপ্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তাদের চেতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অসুরেরা তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্ম করে, কিন্তু ভক্তরা কর্ম করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য। উভয়েই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কর্ম করে, কিন্তু তাদের দুজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন *দেব* (দেবতা) বা ভক্তদের জন্য। অসুরেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে পারে না। তেমনই, আবার কৃষ্ণভক্তেরাও আসুরিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারেন না অথবা কেবলমাত্র তাঁদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কুকুর-বিড়ালের মতো কাজ করতে পারেন না। সেই রকম কার্যকলাপে কৃষ্ণভক্তেরা উৎসাহী হন না। ভগবদ্ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনায় সক্রিয় থাকার জন্য জীবন ধারণের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করেন। বাকি শক্তি তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের জন্য ব্যবহার করেন। এভাবেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে, তাঁরা এমন কি মৃত্যুর সময়েও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন এবং তার ফলে তাঁরা কৃষ্ণলোকে উন্নীত হন।

শ্লোক ৯২

আচার্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন ভক্তরূপে ভগবানের অবতার। তাঁর উচ্চ হুঙ্কারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন।

শ্লোক ৯৩

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার ।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন প্রথমে তিনি তাঁর গুরুবর্গকে অবতরণ করান।

শ্লোক ৯৪

পিতা, মাতা, গুরু আদি যত মান্যগণ ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তাঁর পিতা, মাতা, গুরুদেব আদি সমস্ত গুরুবর্গ প্রথমে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্লোক ৯৫

মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ ।
অদ্বৈত আচার্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীল ঈশ্বর পুরী, শ্রীমতী শচীমাতা ও শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র আদি মহাপ্রভুর সমস্ত গুরুবর্গ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর সঙ্গে প্রকট হলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন নররূপে অবতরণ করেন, তখন প্রথমে তিনি তাঁর ভক্তদের প্রেরণ করেন, যাঁরা তাঁর পিতা, মাতা, গুরুদেব ও গুরুস্থানীয় পার্ষদরূপে লীলা করেন। এই সমস্ত ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণের পূর্বেই অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের পূর্বে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী, তাঁর গুরুদেব শ্রীল ঈশ্বর পুরী, তাঁর মাতা শ্রীমতী শচীদেবী, তাঁর পিতা শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র এবং শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তরা আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৯৬

প্রকটিয়া দেখে আচার্য সকল সংসার ।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকটিত হয়ে অদ্বৈত আচার্য দেখলেন যে, মানুষ অত্যন্ত গভীরভাবে বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ার ফলে সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে।

শ্লোক ৯৭

কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

অসৎ পথে হোক অথবা সৎ পথে হোক, সকলেই বিষয়ভোগে লিপ্ত। যে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি জীবকে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত করে, তার প্রতি কারও কোন রকম উৎসাহ নেই।

তাৎপর্য

অদ্বৈত আচার্য দেখলেন জগতের প্রত্যেকেই জাগতিক পাপ ও পুণ্যকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও কৃষ্ণভক্তির চিহ্নমাত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই জড় জগতে কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন কিছুরই অভাব নেই। পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে জড় জগতের প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করেছেন। আমরা কখনও কখনও অভাব অনুভব করি, তার কারণ আমাদের বিশৃঙ্খল পরিচালন ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিটি মানুষ জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিজনিত প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান করার কোন প্রচেষ্টাই মানুষ করে না। এই চার প্রকার জড়-জাগতিক দুঃখকে বলা হয় *ভবরোগ*। কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই তার নিরাময় হয়। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে মানব-সমাজের সব চাইতে বড় আশীর্বাদ।

শ্লোক ৯৮

লোকগতি দেখি' আচার্য করুণ-হৃদয় ।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয় ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

পৃথিবীর মানুষের অবস্থা দেখে আচার্যের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হল এবং তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে, কিভাবে মানুষের মঙ্গল সাধন করা যায়।

তাৎপর্য

জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য এই রকম ঐকান্তিক প্রচেষ্টা মানুষকে প্রকৃত *আচার্যে* পরিণত করে। *আচার্য* কখনও তাঁর অনুগামীদের শোষণ করেন না। যেহেতু *আচার্য* হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক, তাই মানুষের দুঃখ দর্শন করে তাঁর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়। তিনি জানেন যে, ভগবদ্ভক্তির অভাবই হচ্ছে সমস্ত দুঃখের কারণ এবং তাই তিনি সর্বদা তাদের কৃষ্ণভক্তে পরিণত করে তাদের কার্যকলাপের পরিবর্তন সাধন করতে চেষ্টা করেন। সেটিই হচ্ছে *আচার্যের* গুণ। জড় জগতের এই অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য যদিও অদ্বৈত আচার্য প্রভুর নিজেরই যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, তবুও ভগবানের বিনীত সেবকরূপে তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে, ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত না হলে কেউ এই মানব-সমাজকে তাদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।

মায়ার সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এই জড় জগৎরূপ কারাগারে প্রথম শ্রেণীর কয়েদিরা ভ্রান্তিবশত মনে করছে যে, তারা সুখী, কারণ তারা ধনী, শক্তিশালী ও যশস্বী। এই ধরনের মূর্খ জীবেরা জানে না যে, তারা জড়া প্রকৃতির হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয় এবং যে-কোনও মুহূর্তে তাদের ভগবৎ-বিমুখ পরিকল্পনা ও কার্যকলাপগুলি জড়া প্রকৃতির নির্দয় ষড়যন্ত্রে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই ধরনের মূর্খ কয়েদিরা অনুধাবন করতে পারে না যে, কৃত্রিমভাবে তারা তাদের অবস্থার যতই উন্নতি সাধন করুক না কেন, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণ-শক্তির অতীত। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানের অভাববশত তারা তাদের জীবনের এই বৃহত্তম সমস্যাগুলি অবহেলা করে অর্থহীন কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যা তাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান করতে কোন রকম সাহায্য

করে না। তারা জানে যে, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কষ্টভোগ করতে তারা চায় না, কিন্তু জড়া প্রকৃতির মায়ার প্রভাবে তারা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকে এবং তাই তাদের সমস্যাগুলির কখনও সমাধান হয় না। একে বলা হয় *মায়া*। *মায়ার* বন্ধনে আবদ্ধ জীবেরা মৃত্যুর পর বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের কর্মফল অনুসারে পরবর্তী জীবনে পশুশরীর অথবা দেবশরীর প্রাপ্ত হয়; অবশ্য তাদের অধিকাংশই পশুশরীর প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী জীবনে দেবশরীর প্রাপ্ত হতে হলে তাদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত হতে হবে; অন্যথায়, প্রকৃতির নিয়মে তাদের কুকুর অথবা শূকর আদি পশুর শরীর ধারণ করতে হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিদের জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য প্রথম শ্রেণীর কয়েদিদের থেকে কম হওয়ার ফলে, তারা প্রথম শ্রেণীর কয়েদিদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, কেন না তাদেরও কারাবদ্ধ অবস্থা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। এভাবেই তাদেরও মোহময়ী জড়া প্রকৃতির দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে হয়। *আচার্যের* কাজ হচ্ছে প্রথম ও তৃতীয় উভয় শ্রেণীর কয়েদিরই যথার্থ মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের কার্যকলাপের পরিবর্তন করা। তাঁর এই প্রচেষ্টা তাঁকে ভগবানের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্তে পরিণত করে। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করার জন্য যে মানুষ নিরন্তর ভগবানের বাণী প্রচার করার মাধ্যমে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁর থেকে প্রিয় ভক্ত ভগবানের আর কেউ নেই। কলিযুগের তথাকথিত আচার্যরা তাদের অনুগামীদের দুঃখ-দুর্দশার কবল থেকে উদ্ধার করার পরিবর্তে তাদের আরও বেশি করে প্রতারণা করে। কিন্তু একজন আদর্শ আচার্যরূপে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু এই জগতের দুরবস্থার পরিবর্তন সাধন করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন।

শ্লোক ৯৯

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার ।
আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

[অদ্বৈত আচার্য প্রভু চিন্তা করলেন—] "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতাররূপে আবির্ভূত হন, তা হলে স্বয়ং আচরণ করার মাধ্যমে তিনি ভগবদ্ভক্তির প্রচার করতে পারেন।

শ্লোক ১০০

নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর ।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নামকীর্তন ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। কিন্তু এই কলিযুগে কৃষ্ণ কিভাবে অবতাররূপে আবির্ভূত হবেন?

শ্লোক ১০১

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন ।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি শুদ্ধ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করব এবং অত্যন্ত দৈন্য সহকারে নিরন্তর তাঁর কাছে আর্তি নিবেদন করব।

শ্লোক ১০২

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্তন সঞ্চার ।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যদি এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ঘটিয়ে তাঁর দ্বারা সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করাতে পারি, তা হলেই আমার 'অদ্বৈত' নাম সার্থক হবে।"

তাৎপর্য

অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, ভগবানের সঙ্গে তাদের কোন প্রভেদ নেই। তাই, তারা কখনও অদ্বৈত আচার্য প্রভুর মতো ভগবানকে ডাকতে পারে না। অদ্বৈত আচার্য প্রভুর সঙ্গে ভগবানের কোন প্রভেদ নেই, কিন্তু তবুও তিনি ভগবানে লীন হয়ে যান না! পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবানের স্বাংশরূপে তিনি তাঁর নিত্য সেবা করেন। মায়াবাদীদের কাছে এটি অচিন্তনীয়, কারণ তারা তাদের জড় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুমান করার চেষ্টা করে। তাঁরা মনে করে, অদ্বয়তত্ত্বে স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু এই শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু যদিও ভগবান থেকে অভিন্ন, তবুও তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা বর্তমান।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* প্রচার করে গিয়েছেন। কিন্তু চিন্তনীয় দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ হচ্ছে অপূর্ণ ইন্দ্রিয়প্রসূত ধারণা, যার দ্বারা কখনই চিন্ময় জগতে প্রবেশ করা যায় না। কারণ, চিন্ময় জগৎ সীমিত জড় অনুভূতির অতীত। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর কার্যকলাপ *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের* বাস্তব প্রমাণ প্রদান করে। তাই, অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে অনায়াসে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১০৩

কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে ।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

কোন্ আরাধনা করার মাধ্যমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বশ করতে পারবেন? এভাবেই তিনি যখন ভাবতে লাগলেন, তখন তাঁর একটি শ্লোক মনে পড়ল।

শ্লোক ১০৪

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০৪ ॥

তুলসী—তুলসীর; **দল**—একটি পত্র; **মাত্রেণ**—কেবলমাত্র; **জলস্য**—জলের দ্বারা; **চুলুকেন**—এক অঞ্জলি; **বা**—এবং; **বিক্রীণীতে**—বিক্রয় করেন; **স্বমাত্মানম্**—নিজেকে; **ভক্তেভ্যঃ**—ভক্তের কাছে; **ভক্ত-বৎসলঃ**—ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

"যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি তুলসীপত্র এবং এক অঞ্জলি জল নিবেদন করেন, ভক্তবৎসল ভগবান সম্পূর্ণরূপে সেই ভক্তের বশীভূত হয়ে পড়েন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গৌতমীয়তন্ত্র* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৫-১০৬

এই শ্লোকার্থ আচার্য করেন বিচারণ ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥ ১০৫ ॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন ।
'জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন' ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু এই শ্লোকটির অর্থ বিচার করলেন এভাবে—"কৃষ্ণকে যিনি তুলসী ও জল নিবেদন করেন, তাঁর সেই দান পরিশোধ করতে নিরুপায় হয়ে ভগবান চিন্তা করেন, 'জল-তুলসীর সমগোত্রীয় কোন ধন আমার নেই।'

শ্লোক ১০৭

তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন ।
এত ভাবি' আচার্য করেন আরাধন ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে অর্পণ করে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন।" সেই কথা বিবেচনা করে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেন।

তাৎপর্য

ভক্তি সহকারে একটি তুলসীপত্র ও একটু জল দেওয়ার মাধ্যমে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধান করা যায়। *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন যে, কেউ যদি একটি পত্র, একটি পুষ্প, একটি ফল অথবা একটু জল (*পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*) ভক্তি সহকারে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন, তা হলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর ভক্তের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত সেবাই গ্রহণ করেন। এমন কি পৃথিবীর যে-কোনও স্থানের সব চাইতে দরিদ্র ভক্তও যদি কিছু ফুল, ফল বা পত্র এবং জল সংগ্রহ করে সামান্যতম সেই অর্ঘ্য পরম ভক্তির সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন, তা হলে ভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। বিশেষ করে তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল সহযোগে যখন তাঁর আরাধনা করা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভগবান এই ধরনের সেবার দ্বারা এতই সন্তুষ্ট হন যে, তিনি সেই সেবার বিনিময়ে নিজেকে সেই ভক্তের কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেন। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু তা জানতেন এবং তাই তিনি তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল সহযোগে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করে তাঁকে এই ধরাধামে অবতরণ করার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০৮

গঙ্গাজল, তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্মরণ করে তিনি প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে তুলসীমঞ্জরী ও গঙ্গাজল অর্পণ করতেন।

শ্লোক ১০৯

কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার ।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই জগতে অবতরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি হুঙ্কার করতেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভগবান এই ধরাধামে অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ১১০

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু ।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

অতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের মুখ্য কারণ হচ্ছে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আকুল প্রার্থনা। এভাবেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে ধর্মসেতু (যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন) আবির্ভূত হন।

শ্লোক ১১১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্ ।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ১১১ ॥

ত্বম্—তুমি; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগের দ্বারা; **পরিভাবিত**—সম্পৃক্ত; **হৃৎ**—হৃদয়ের; **সরোজে**—পদ্মের উপর; **আস্সে**—অবস্থান কর; **শ্রুত**—শ্রুত; **ঈক্ষিত**—দর্শিত; **পথঃ**—পথে; **ননু**—অবশ্যই; **নাথ**—হে প্রভু; **পুংসাম্**—ভক্তদের দ্বারা; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **ধিয়া**—মনের দ্বারা; **তে**—তাঁরা; **উরুগায়**—ভগবান, উত্তম বন্দনার দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তন করা হয়; **বিভাবয়ন্তি**—বিভাবন বা চিন্তন করেন; **তৎ তৎ**—সেই সমস্ত; **বপুঃ**—রূপ; **প্রণয়সে**—তুমি প্রকট করে থাক; **সৎ**—তোমার ভক্তবৃন্দের প্রতি; **অনুগ্রহায়**—অনুগ্রহ করে।

অনুবাদ

"হে নাথ! তুমি সর্বদা তোমার ভক্তদের শ্রবণ ও দর্শনপথে বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁদের হৃদয়পদ্মে তুমি সর্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়! ভক্তবৃন্দ তাঁদের হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবন করেন, তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি তাঁদের কাছে তোমার সেই নিত্য স্বরূপ প্রকট করে থাক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/৯/১১) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার একটি নিবেদন। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা থেকে পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, *ব্রহ্মসংহিতায়* ভগবানের চিন্ময় ধাম সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই ধাম *চিন্তামণি* রত্নের দ্বারা নির্মিত এবং সেখানে গোপবালক রূপে লীলাবিলাসকারী ভগবান হাজার হাজার লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হচ্ছেন। মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তদের কল্পনাপ্রসূত শ্রীকৃষ্ণের রূপ অলীক, কিন্তু প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বহুবিধ দিব্যরূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রুতেক্ষিতপথঃ শব্দের *শ্রুত* অর্থে *বেদকে* বোঝানো হয়েছে এবং *ঈক্ষিত* অর্থে সেই *বেদ* যথাযথভাবে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার পন্থা

নির্দেশ করা হয়েছে। ভগবান বা তাঁর রূপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করার কোন অবকাশ নেই। ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য যাঁরা যথাযথভাবে আগ্রহী, তাঁরা এই ধরনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। এখানে ব্রহ্মা বলেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায়। বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, নাম, গুণ, লীলা ও পরিকরের দ্বারা আকৃষ্ট হন, তখন তিনি তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হন। এই স্তরে ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের দিব্যরূপ স্বতঃপ্রকাশিত হয় এবং ভক্ত সর্বদা সেই রূপের চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকেন। ভগবানের প্রতি দিব্য প্রেমের উদয় না হওয়া পর্যন্ত নিরন্তর ভগবৎ-চিন্তায় চিত্তকে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। ভগবানের চিন্তায় চিত্তকে এভাবে নিরন্তর যুক্ত রাখাই হচ্ছে সমস্ত যোগের পরম সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪৭) এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এভাবেই যিনি নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় চিত্তকে নিবদ্ধ রাখতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ধরনের দিব্য তন্ময়তাকে বলা হয় *সমাধি*। যে শুদ্ধ ভক্ত সব সময় পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন, চরমে তিনিই তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করতে সমর্থ হন।

পারমার্থিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করতে না পারলে *উরুগায়* বা ভগবানের মহিমা কীর্তন করা সম্ভব নয়। *ব্রহ্মসংহিতার* বর্ণনা অনুসারে ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে (*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*)। ভগবান নিজেকে অসংখ্য *স্বাংশ* রূপে বিস্তার করেন। এই সমস্ত অসংখ্য রূপ সম্বন্ধে শ্রবণ করে ভক্ত যখন তার একটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সর্বদাই সেই রূপের চিন্তা করেন, তখন ভগবান সেই রূপে তাঁর কাছে আবির্ভূত হন। ভগবানের প্রতি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের দিব্য অনুরাগের ফলে ভগবান সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করে তাঁদের আনন্দ বিধান করেন।

শ্লোক ১১২

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার ।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকের সার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাঁর অসংখ্য নিত্যরূপে অবতীর্ণ হন।

শ্লোক ১১৩

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে ।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চতুর্থ শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট হল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অনন্য ভগবৎ-প্রেম প্রকাশ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ১১৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'আশীর্বাদ-মঙ্গলাচরণে শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য ও বিশেষ কারণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যাবতারের মূলপ্রয়োজন-কথন

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যের এই পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনটি মুখ্য প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের পরম আশ্রয় শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে সেই প্রেম আস্বাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই প্রেমের বিষয় এবং শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন তার আশ্রয়। তাই সেই প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়স্বরূপা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে সেই সুখ অনুভব করতে চেয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হচ্ছে তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) নিজের অপ্রাকৃত মাধুরী আস্বাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত মাধুর্যের আধার। সেই মাধুর্যের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর যে আকর্ষণ তা অতুলনীয় এবং তা আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর অন্তরের ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তৃতীয় উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করে শ্রীমতী রাধারাণী যে সুখ অনুভব করেন তা আস্বাদন করা। শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছিলেন, নিঃসন্দেহে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর সঙ্গসুখ উপভোগ করেন এবং তিনিও শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গসুখ উপভোগ করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে রাধারাণীই অধিক সুখ আস্বাদন করেন। সুতরাং, তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) মধ্যে নিশ্চয়ই এমন এক অপূর্ব রস আছে, যা আস্বাদন করে শ্রীমতী রাধারাণী অধিক সুখ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর নিজের মাধুরী আস্বাদন করে সেই সুখ অনুভব করার বাসনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত পুরুষ এবং রাধারাণী অপ্রাকৃত প্রকৃতি। তাই, শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীমতী রাধারাণীর আস্বাদিত সুখ অনুভব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই হেতু তিনি রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করে রাধারাণীর সজাতীয়রূপে তাঁর নিজের মাধুরিজাত সুখ আস্বাদন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনোগত এই গূঢ় বাসনাগুলি পূরণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। এটিই হচ্ছে তাঁর আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। এছাড়াও কলিযুগের যুগধর্ম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তনের মহিমা প্রচার এবং তার তাৎপর্য শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেও তিনি আবির্ভূত হন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেওয়াও হচ্ছে তাঁর আবির্ভাবের আর একটি কারণ। তবে যুগধর্ম প্রচার বা অদ্বৈত প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কারণগুলি হচ্ছে গৌণ কারণ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী হলেন প্রধান। তাঁর লিখিত কড়চা থেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের এই গূঢ় কারণগুলি পাওয়া যায়। এই তত্ত্বসমূহ শ্রীল রূপ গোস্বামী কর্তৃক রচিত বিভিন্ন বন্দনা ও শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই পরিচ্ছেদে যথার্থ *প্রেম* এবং প্রাকৃত *কামের* পার্থক্যও নিরূপণ করা হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত *প্রেম* প্রাকৃত *কামের* থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই গ্রন্থকার তাদের পার্থক্য স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ১

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্ ।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য-প্রসাদেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়; **তৎ**—তাঁর; **রূপস্য**—রূপের; **বিনির্ণয়ম্**—তত্ত্বনির্দেশ; **বালঃ**—একটি শিশু; **অপি**—এমন কি; **কুরুতে**—করে; **শাস্ত্রম্**—শাস্ত্র; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ব্রজ-বিলাসিনঃ**—ব্রজলীলা আস্বাদনকারী।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় একটি অবোধ শিশুও শাস্ত্রীয় দর্শন অনুসারে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করলে তবেই এই সংস্কৃত শ্লোকটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, তাই জাগতিক দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অভক্তদের মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার কাছে তিনি নিজেকে অপ্রকাশিত রাখেন। তা সত্ত্বেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় একটি শিশুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবন ধামে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সম্পর্কে অনায়াসে অবগত হতে পারে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় হোক। জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৩

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ আমি বর্ণনা করেছি। এখন, হে ভক্তগণ! অনুগ্রহ করে পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৪

মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

মূল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করার জন্য আমি প্রথমে তার আভাস বর্ণনা করব।

শ্লোক ৫

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার ।
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

আমি চতুর্থ শ্লোকের সারার্থ বর্ণনা করেছি। ভগবানের দিব্য নামের কীর্তন এবং ভগবৎ-প্রেম প্রচার করার জন্যই তাঁর এই অবতরণ।

শ্লোক ৬

সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও সেই কথা সত্য, তবে এগুলি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের আর একটি নিগূঢ় (অন্তরঙ্গ) কারণ রয়েছে, অনুগ্রহ করে সেটি শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণপ্রেম দান এবং শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন প্রবর্তন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বাহ্যিক কারণ। তাঁর আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণটি ভিন্ন, যা এই পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭

পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পূর্বে পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

স্বয়ং-ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ ।
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎপালন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

পৃথিবীর ভার হরণ করা স্বয়ং ভগবানের কর্ম নয়। স্থিতিকর্তা বিষ্ণুই জগতের পালন করেন।

শ্লোক ৯

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল ।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-কালের সঙ্গে পৃথিবীর ভার হরণ করার কাল মিশ্রিত হল।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আবির্ভূত হন। মানব-সমাজের পারমার্থিক কৃষ্টির পুনর্জাগরণের জন্য এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রকট করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগের শেষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জগতের পালনকর্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্তা এবং তিনিই হচ্ছেন মূল দেবতা, যিনি জগতের অপশাসন অপসারণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিদেব, তিনি কিন্তু অপশাসন অপনোদন করার জন্য অবতীর্ণ হন না। তিনি অবতরণ করেন তাঁর লীলাবিলাস প্রদর্শন করানোর মাধ্যমে বদ্ধ জীবদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিন্তু দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সময় জগতের অপশাসন দূরীকরণের কালও উপস্থিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হলেন, তখন জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুও তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। কারণ, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তাঁর সমস্ত অংশ এবং কলাও তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন।

শ্লোক ১০

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে ।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন ভগবানের অন্য সমস্ত অবতারেরাও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

শ্লোক ১১-১২

নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার ।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥ ১১ ॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), মৎস্য আদি লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার এবং অন্য সমস্ত অবতারেরা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হন। এভাবেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতরণ করেন।

শ্লোক ১৩

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে ।
বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সুতরাং, তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে বিরাজমান বিষ্ণুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করেন।

শ্লোক ১৪

আনুষঙ্গ-কর্ম এই অসুর-মারণ ।
যে লাগি' অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

অসুরদের সংহার করা হচ্ছে ভগবানের একটি আনুষঙ্গিক কর্ম। তাঁর অবতরণের মূল কারণ এখন আমি বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৫-১৬

প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন ।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৫ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

দুটি কারণে ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করেন—ভগবৎ-প্রেমরসের নির্যাস আস্বাদন করা এবং এই জগতে রাগমার্গ বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের স্তরে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা। তাই তিনি রসিক-শেখর এবং পরম করুণ নামে পরিচিত।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এই ধরাধামে প্রকটকালে তাঁর ভগবত্তার মধ্যে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা কংস, জরাসন্ধ আদি ভগবদ্ভক্তিহীন অসুরদের সংহার করেছিলেন। এই ধরনের সংহার-পর্ব ছিল তাঁর অবতরণের আনুষঙ্গিক কার্যকলাপ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল কারণ হচ্ছে বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করার মাধ্যমে জীবের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময়ের দ্বারা প্রেমময়ী সম্পর্কের সর্বোত্তম রস আস্বাদন করা। এই রসের বিনিময়কে বলা হয় *রাগভক্তি* বা অপ্রাকৃত অনুরাগের মাধ্যমে ভগবৎ-সেবা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বদ্ধ জীবদের জানাতে চান যে, তিনি *বৈধীভক্তি* থেকে *রাগভক্তির* দ্বারাই অধিক আকৃষ্ট হন। *বেদে* বলা হয়েছে (*তৈত্তিরীয় উপঃ* ২/৭), *রসো বৈ সঃ*—পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সব রকম প্রেমানুভূতি বিনিময়ের পরম কারণ। তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময়, তাই তিনি আমাদের *রাগভক্তি* প্রদান করতে চান। এভাবেই তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে প্রকাশিত হন। বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তিনি আবির্ভূত হন না।

শ্লোক ১৭

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত ।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

[শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—] "সমস্ত জগৎ আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে আমার প্রতি সম্ভ্রম-পরায়ণ। কিন্তু এই ঐশ্বর্যপ্রসূত সম্ভ্রমের প্রভাবে প্রেম শিথিল হয়ে যায় বলে তা আমাকে আনন্দ দান করে না।

শ্লোক ১৮

আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন ।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন আমাকে ভগবান বলে জেনে নিজেকে হীন বলে মনে করে, তখন আমি তার প্রেমে বশীভূত হই না বা তার অধীন হই না।

শ্লোক ১৯

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে ।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার ভক্ত আমাকে যে যেভাবে ভজনা করে, আমিও সেভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি। সেটিই আমার স্বভাব।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সহজাত ভগবৎ-সেবা অনুসারে তাঁর সহজাত স্বভাব দ্বারা নিজেকে তাঁর ভক্তদের সম্মুখে প্রকাশ করেন। তাঁর বৃন্দাবন-লীলার মাধ্যমে তিনি এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন যে, যদিও মানুষ সাধারণত ভগবানকে সম্ভ্রম সহকারে আরাধনা করে, কিন্তু তাঁকে প্রিয় সখা, প্রিয় পুত্র অথবা পরম প্রেমাস্পদ জ্ঞানে স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা সেবা করা হলে তিনি অধিক আনন্দ লাভ করেন। এই প্রকার চিন্ময় প্রেমের দিব্য সম্পর্কের মাধ্যমে ভগবান ভক্তের অধীন হতেই ভালবাসেন। এই ধরনের শুদ্ধ প্রেম ভগবদ্ভক্তিহীন ভোগবাসনার দ্বারা কলুষিত নয় এবং তা জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত। তা চিন্ময় স্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়। এই ভক্তি অনুকূল পরিবেশে সম্পাদিত হয় এবং তা সব রকম জড় অভিলাষশূন্য।

শ্লোক ২০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২০ ॥

যে—যারা; **যথা**—যেভাবে; **মাম্**—আমার কাছে; **প্রপদ্যন্তে**—প্রপত্তি করে; **তান্**—তাদের; **তথা**—সেভাবেই; **এব**—অবশ্যই; **ভজামি**—অনুগ্রহ করি; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **বর্ত্ম**—পথ; **অনুবর্তন্তে**—অনুসরণ করে; **মনুষ্যাঃ**—মানুষেরা; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

" 'হে পার্থ! আমার ভক্তরা যেভাবে আমার কাছে প্রপত্তি করে, সেভাবেই আমি তাদের অনুগ্রহ করি। সকল মানুষই সর্বতোভাবে আমার প্রদর্শিত পথে অনুগমন করে।'

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন যে, পূর্বে (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় বারো কোটি বছর আগে) তিনি *গীতার* অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সূর্যদেবকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই জ্ঞান শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে কোন কারণবশত সেই পরম্পরা বিনষ্ট হয়েছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হয়ে অর্জুনকে সেই জ্ঞান দান করেছেন। সেই জ্ঞান দান করার সময় ভগবান এই শ্লোকটি (*ভগবদ্গীতা* ৪/১১) তাঁর সখা অর্জুনকে বলেছিলেন।

শ্লোক ২১-২২

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি ।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥ ২১ ॥

আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন ।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যখন আমাকে তার পুত্র, সখা অথবা প্রেমাস্পদ বলে মনে করে শুদ্ধ ভক্তিযোগে আমার সেবা করে এবং নিজেকে উর্ধ্বতন ও আমাকে তার সমকক্ষ অথবা অধস্তন বলে মনে করে, তখন আমি তার বশীভূত হই।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তিন রকমের ভক্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে *ভক্তি* (সাধারণভাবে ভগবানের সেবা), *শুদ্ধ-ভক্তি* (বিশুদ্ধভাবে ভগবানের সেবা) এবং *বিদ্ধ-ভক্তি* (মিশ্রভাবে ভগবানের সেবা)।

ভক্তি যখন সকাম কর্ম, মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা অথবা অতীন্দ্রিয় যোগ আদি কার্যসমূহের দ্বারা মিশ্রিত থেকে জড়-জাগতিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তখন তাকে বলা হয় *বিদ্ধ-ভক্তি* অথবা *মিশ্র-ভক্তি*। *ভগবদ্‌গীতায় ভক্তিযোগ* ছাড়াও *কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ* এবং *ধ্যানযোগের* বর্ণনাও করা হয়েছে। *যোগ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, যা কেবল ভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। সকাম কর্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও যোগমিশ্রা ভক্তিকে যথাক্রমে *কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ* ও *ধ্যানযোগ* বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের ভক্তি তিন প্রকার জড় কার্যকলাপের দ্বারা কলুষিত।

যে সমস্ত মানুষ তাদের স্থূল জড় দেহটিকেই তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তাদের জন্য পুণ্যকর্ম অথবা *কর্মযোগ* নির্দেশিত হয়েছে। যারা মনকেই তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তাদের জন্য দার্শনিক জ্ঞানালোচনা বা *জ্ঞানযোগের* পন্থা নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্তদের এই ধরনের জড় চেতনা সঞ্জাত *মিশ্র-ভক্তি* অনুশীলন করার কোন প্রয়োজন হয় না। *মিশ্র-ভক্তির* উদ্দেশ্য শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম নয়। তাই শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অনুশীলন করার মাধ্যমে যে ভক্তি সম্পাদিত হয়, তা *বিদ্ধ-ভক্তির* থেকে শ্রেয়, কেন না তা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তা কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

যাঁরা সব রকমের জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ, তাঁদের বলা হয় আকৃষ্ট ভক্ত। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁরা তত্ত্বদ্রষ্টা মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের প্রভাবে তাঁদের শুদ্ধ ভক্তি প্রকাশিত হয়, যা শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধের অতীত। স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ-প্রেম বিধি-নিষেধের স্তর অতিক্রম করে; এই প্রকার প্রেম সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত এবং কখনও তার অনুকরণ করা যায় না। বিধি-নিষেধ শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে সাধারণ ভক্তদের সাহায্য করে। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে *শুদ্ধ-ভক্তির* পূর্ণতা এবং শুদ্ধ-ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম থেকে অভিন্ন।

বৈধী-ভক্তি নিষ্কলুষভাবে অনুষ্ঠিত হয় বৈকুণ্ঠলোকে। শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে অনুশীলন করার ফলে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম বা রাগময়ী ভক্তি কেবল কৃষ্ণলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৩

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ২৩ ॥

ময়ি—আমার প্রতি; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **হি**—অবশ্যই; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **অমৃতত্বায়**—অমৃতত্ব; **কল্পতে**—যোগ্য হয়; **দিষ্ট্যা**—সেই ভাগ্যের ফলে; **যৎ**—যা; **আসীৎ**—ছিল; **মৎ**—আমার জন্য; **স্নেহঃ**—স্নেহ; **ভবতীনাম্**—তোমাদের সকলের; **মৎ**—আমার; **আপনঃ**—সাক্ষাৎকার।

অনুবাদ

" 'জীব আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে অমৃতত্ব লাভ করে। হে ব্রজবালাগণ, তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছ, তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক, কেন না এই অনুরাগই আমাকে লাভ করার একমাত্র উপায়।'

তাৎপর্য

ব্রজবাসীদের ক্রিয়াকলাপে শুদ্ধ ভক্তি প্রকাশ পায়। সূর্যগ্রহণের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে আসেন, তখন সমন্ত-পঞ্চকে ব্রজবাসীদের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। ব্রজবালাদের কাছে সেই মিলন ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কেন না শ্রীকৃষ্ণ আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের পরিত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন। এই শ্লোকটির (*ভাগবত* ১০/৮২/৪৫) উল্লেখ করে ভগবান তাঁর প্রতি ব্রজবালাদের শুদ্ধ প্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন ।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মাতা আমাকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে কখনও দড়ি দিয়ে বাঁধেন। আবার আমাকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা করে আমার লালন-পালন করেন।

শ্লোক ২৫

সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"শুদ্ধ সখ্যভাবে আমার সখারা আমার স্কন্ধে আরোহণ করে বলে, 'তুমি কোন্ বড় লোক? তুমি আর আমি সমান।'

শ্লোক ২৬

প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন ।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার প্রিয়া যদি অভিমান করে আমাকে ভর্ৎসনা করে, তবে তা বেদের বন্দনা থেকেও আমার মনকে অধিক আকৃষ্ট করে।

তাৎপর্য

উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে, প্রতিটি জীবই পরম জীব পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল। *কঠ উপনিষদে* (২/২/১৩) বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্*—সমস্ত নিত্য জীবদের আশ্রয় হচ্ছেন এক পরম নিত্য পুরুষ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবদের পালন করেন, তাই তারা ভগবানের অধীন। এমন কি প্রেম বিনিময়ের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হলেও জীব ভগবানের অধীনই থাকেন।

কিন্তু শুদ্ধ অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময়ের সময় কখনও কখনও ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর নিজের অধীন বলে মনে করেন। কেউ যখন পিতা অথবা মাতার মতো স্নেহের বশবর্তী হয়ে ভগবানের প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তখন তিনি ভগবানের সঙ্গে গুরুজনের মতো আচরণ করেন। তেমনই, তাঁর প্রিয়া বা প্রণয়িনী কখনও কখনও অভিমান করে ভগবানকে ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু এই ধরনের আচরণ সর্বোচ্চ স্তরের প্রেমের ক্ষেত্রেই কেবল প্রদর্শিত হয়। কেবল শুদ্ধ *ভক্তির* প্রভাবেই প্রেমিকা ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের অধীন তত্ত্ব হলেও তাঁকে তিরস্কার করতে পারেন। ভগবান এই তিরস্কার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে উপভোগ করেন। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের এই প্রকাশ এই ধরনের আচরণকে অত্যন্ত উপাদেয় করে তোলে। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত উপাসনায় এই ধরনের স্বাভাবিক প্রেমের প্রকাশ হয় না, কেন না ভক্ত তখন ভগবানকে তাঁর পূজ্য বলে মনে করেন।

ভগবানের প্রতি যাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের উন্মেষ হয়নি, তাদের জন্য *বৈধীভক্তির* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের উদয় হয়, তখন তা সমস্ত বিধি-নিষেধের স্তর অতিক্রম করে এবং ভগবানের সঙ্গে ভক্তের শুদ্ধ প্রেম প্রকাশিত হয়। এই ধরনের শুদ্ধ প্রেমের ক্ষেত্রে যদিও কখনও কখনও দেখা যায় যে, ভক্ত ভগবানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন, অথবা বৈদিক শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি লঙ্ঘন করছেন, তবুও তা সম্ভ্রম মিশ্রিত *বৈধীভক্তির* থেকে অনেক উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্তি। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি

সম্পূর্ণভাবে আসক্ত হওয়ার ফলে যে ভক্ত সর্বতোভাবে উপাধিমুক্ত হয়েছেন, তাঁরই মধ্যে ভগবানের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যা সর্বদাই *বৈধীভক্তির* তুলনায় উৎকৃষ্টতর।

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে যে রীতিবিরুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ, তা শুদ্ধ অনুরাগের ইঙ্গিতবাহী। ভক্ত যখন তাঁর প্রিয়তমকে সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্রজ্ঞানে পূজা করেন, তখন প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ততা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ প্রেমের স্তরে উন্নীত হয়নি যে নবীন ভক্ত, সে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির আচরণ করে এবং আপাতদৃষ্টিতে তার নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তিকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমে অনুরক্ত ভক্তের *প্রেমভক্তি* থেকে অধিক উন্নত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ প্রেম পারমার্থিক মার্গে *বৈধীভক্তির* তুলনায় অনেক উন্নত। এই প্রকার শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম সর্বদাই সর্বতোভাবে মহিমামণ্ডিত এবং তা ঐশ্বর্যপ্রধান *বৈধীভক্তির* থেকে সর্বতোভাবে শ্রেয়।

শ্লোক ২৭-২৮

এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার ।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭ ॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার ।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের নিয়ে আমি নানা রকম অদ্ভুত লীলাবিলাস করার জন্য অবতরণ করব। যে সমস্ত লীলাবিলাস বৈকুণ্ঠেও অজ্ঞাত, আমি সেই রকম লীলাবিলাসে মগ্ন থাকব এবং তা আমাকে পর্যন্ত চমৎকৃত করবে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের শুদ্ধ ভক্তির স্তরে বিকাশ সাধন করার শিক্ষা দান করেছেন। তাই, তিনি তাঁর মধুরতম দর্শন ও শিক্ষা প্রচার করার উদ্দেশ্যে তাঁর পরম অদ্ভুত লীলাবিলাস করার জন্য ভক্তরূপে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অবতরণ করেন।

চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান তাঁর নিত্য ভক্তদের সম্ভ্রম মিশ্রিত সেবা গ্রহণ করেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোলোক বৃন্দাবনে যে সমস্ত গূঢ় লীলা উপভোগ করেন, সেই সমস্ত লীলা তিনি প্রদর্শন করেন। তাঁর এই সমস্ত লীলা এতই আকর্ষণীয় যে, তা স্বয়ং ভগবানকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তিনি তা আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২৯

মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে ।
যোগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"যোগমায়ার প্রভাবে গোপিকারা আমাকে তাদের উপপতি বলে মনে করে।

তাৎপর্য

যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে ভগবান আত্মবিস্মৃত হন এবং বিভিন্ন রসে তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে প্রেমাস্পদরূপে পরিগণিত হন। এই *যোগমায়া* শক্তি ব্রজগোপিকাদের চিত্তে বিশেষ ভক্তিভাবের সৃষ্টি করে, যার প্রভাবে তাঁরা মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উপপতি। শুদ্ধ ভক্তির এই আবেগকে কখনই জড় জগতের অবৈধ কাম-লালসার সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তদের প্রেমভক্তিকে জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে যৌন সম্পর্ক বলে মনে হলেও, সেই বিশুদ্ধ প্রেম হচ্ছে কামগন্ধহীন। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের প্রতিচ্ছবি; চিৎ-জগতে যদি বস্তুর যথার্থ অস্তিত্ব না থাকে, তা হলে জড় জগতে তার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে না। সমস্ত জড় প্রকাশের উৎস চিৎ-জগৎ। এই জড় জগতের প্রণয়ঘটিত কাম হচ্ছে চিৎ-জগতে অনুষ্ঠিত ভগবৎ-প্রেমের জড় চেতনা-মিশ্রিত বিকৃত প্রতিফলন। কিন্তু ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত না হলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

শ্লোক ৩০

আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"গোপিকারা তা জানে না বা আমিও তা জানি না, কেন না আমরা আমাদের পরস্পরের রূপ ও গুণে সর্বদাই মুগ্ধ থাকি।

তাৎপর্য

চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোকসমূহের কর্তৃত্ব করেন নারায়ণ। তাঁর ভক্তরা তাঁরই মতো রূপবিশিষ্ট এবং সেখানে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে ভক্তরা ভগবানের সেবা করেন। কিন্তু এই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকের ঊর্ধ্বে গোলোক বা কৃষ্ণলোক রয়েছে, যেখানে আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধ-প্রেমরূপী হ্লাদিনী শক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন। যেহেতু জড় জগতের ভক্তরা সেই বিষয়ে প্রায় কিছুই জানেন না, তাই ভগবান তাঁদের এই প্রেমবিলাস প্রদর্শন করাবার বাসনা করেন।

গোলোক বৃন্দাবনে *পরকীয়া-রসে* প্রেমের বিনিময় হয়। এটি অনেকটা বিবাহিতা রমণীর পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণের মতো। জড় জগতে সেই ধরনের সম্পর্ক সব চাইতে ঘৃণ্য, কেন না তা হচ্ছে চিৎ-জগতের *পরকীয়া-রসের* বিকৃত প্রতিফলন। এই *পরকীয়া-রসে* ভগবানের সঙ্গে ভক্তের যে সম্পর্ক তা ভগবৎ-প্রেমের পরম প্রকাশ। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই বিনিময় *যোগমায়ার* প্রভাবে সম্পাদিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা

হয়েছে যে, সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তরা *দৈবীমায়া* বা *যোগমায়ার* দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। *মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৯/১৩)। যাঁরা যথার্থই মহাত্মা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তাঁরা *দৈবীপ্রকৃতি* বা *যোগমায়ার* আশ্রিত। *যোগমায়া* এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন, যেখানে ভক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে সব রকম বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভক্ত স্বাভাবিকভাবে ভগবানের সেবার জন্য শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে চান না, কিন্তু *যোগমায়ার* প্রভাবে তিনি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের বশবর্তী হয়ে সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকেন।

জড় শক্তির প্রভাবে মুগ্ধ জীব *যোগমায়ার* কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেন না বদ্ধ জীব ভগবানের সঙ্গে ভক্তের বিশুদ্ধ সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত নয়। কিন্তু বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, মানুষ অতি উন্নত স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তখন *যোগমায়ার* পরিচালনায় শুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

যোগমায়া শক্তির প্রভাবে যে দিব্য প্রেমের আবেগ অনুভূত হয়, তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবালারা উভয়েই আত্মবিস্মৃত হন। এই আত্মবিস্মৃতির ফলে ব্রজগোপিকাদের অপূর্ব সুন্দর রূপ ভগবানকে অপ্রাকৃত তৃপ্তি আস্বাদন করায়, যার সঙ্গে জড়-জাগতিক যৌন সম্পর্কের কোন সম্বন্ধ নেই। যেহেতু দিব্য ভগবৎ-প্রেম এই জড় জগতের সব কিছুর অতীত, তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ব্রজগোপিকারা জড়-জাগতিক নীতি বা শালীনতাবোধ লঙ্ঘন করেছেন। তাঁদের এই আচরণ জড় জগতের নীতিবাগীশদের নিরন্তর বিভ্রান্ত করে। তাই *যোগমায়া* ভগবানকে এবং তাঁর লীলাসমূহকে জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের চোখের আড়াল করে রাখেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন যে, সকলের কাছে প্রকাশিত না হওয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে।

যোগমায়ার প্রভাবে প্রেমানন্দে ভগবানের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের কখনও মিলন হয় আবার কখনও বিচ্ছেদ হয়। ভগবানের এই অপ্রাকৃত প্রেম নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীদের কল্পনারও অতীত। তাই, বদ্ধ জীবদের সর্বোচ্চ স্তরের পারমার্থিক উপলব্ধি প্রদান করার জন্য এবং স্বয়ং সেই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য ভগবান তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ভগবান এতই করুণাময় যে, অধঃপতিত জীবদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্বয়ং অবতরণ করেন। যে বিকৃত যৌন সম্পর্কের প্রতি ব্যাধিগ্রস্ত অধঃপতিত জীবেরা এত আসক্ত, তার প্রকৃতরূপ হচ্ছে ভগবৎ-প্রেম এবং এই ভগবৎ-প্রেম ভগবৎ-ধামে নিত্য আস্বাদন করা যায়। ভগবান যে *রাসলীলা* বিলাস করেন, তার মুখ্য কারণ হচ্ছে অধঃপতিত জীবদের বিকৃত নীতিবোধ ও ধর্মবোধ পরিত্যাগ করিয়ে তাদের ভগবৎ-ধামে প্রকৃত আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট করানো। যিনি যথাযথভাবে *রাসলীলার* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি জড়-জাগতিক যৌন জীবনে লিপ্ত হতে অবশ্যই ঘৃণা বোধ করবেন। যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি যখন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে ভগবানের *রাসলীলার* বর্ণনা শ্রবণ করেন, তখন তাঁর হৃদয় থেকে সব রকমের জড়-জাগতিক কামভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

শ্লোক ৩১

ধর্ম ছাড়ি' রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন ।
কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"পরস্পরের প্রতি শুদ্ধ অনুরাগের ফলে ধর্ম ত্যাগ করেও আমাদের মিলন হবে। দৈবের প্রভাবে কখনও আমাদের মিলন হবে, আবার কখনও বিচ্ছেদ হবে।

তাৎপর্য

গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এসেছিলেন। সেই সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোকে (দেখুন *আদি* ৫/২২৪) শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, "গোবিন্দ নামক একটি অপূর্ব সুন্দর বালক যমুনার তটে চন্দ্রালোকিত রাত্রে বংশী বাজাচ্ছে। যারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের প্রতি আসক্ত হয়ে জড়-জাগতিক জীবন উপভোগ করতে চায়, তারা যেন কখনই যমুনার তটে সেই গোবিন্দের রূপ দর্শন করতে না যায়।" শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এতই মধুর যে, তা শুনে ব্রজগোপিকারা আত্মীয়স্বজনের প্রতি আসক্তি এবং সামাজিক নীতি লঙ্ঘনের লজ্জা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন।

এভাবেই গৃহত্যাগ করে গোপিকারা বৈদিক নির্দেশ অনুসারে গার্হস্থ্য জীবনের নীতি লঙ্ঘন করেছিলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমভক্তি যখন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তখন ভক্ত সব রকম সামাজিক বিধি-নিষেধ অবহেলা করতে পারেন। এই জড় জগতে আমরা সকলেই বিভিন্ন উপাধিযুক্ত, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি শুরু হয় তখনই, যখন মানুষ এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়। কৃষ্ণপ্রেম যখন প্রকাশিত হয়, তখন জীব স্বাভাবিকভাবেই সব রকম জড় উপাধি থেকে মুক্ত হয়।

প্রিয় পরিকরবর্গের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অনুরাগ এমন এক পরম উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যে, তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপিকারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন। সেই অপ্রাকৃত আবেগ আস্বাদন করার জন্য প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে বিরহের প্রয়োজন হয়। দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ এই জড় জগতে কেউই বিরহ-বেদনা আকাঙ্ক্ষা করে না। কিন্তু চিন্ময় স্তরে, সেই বিরহ পরম স্তরের মহিমা প্রাপ্ত হয়ে প্রেমবন্ধনকে সুদৃঢ় করে এবং প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মিলন বাসনাকে সুতীব্র করে তোলে। চিন্ময় অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিরহ মিলনের থেকেও অধিক মধুর, কেন না সেই বিরহে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে বর্ধিত হয়।

শ্লোক ৩২

এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত রসের নির্যাস আমি নিজে আস্বাদন করব এবং এভাবেই আমি আমার সমস্ত ভক্তদেরও এই রসনির্যাস আস্বাদন করাব।

শ্লোক ৩৩

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম-কর্ম ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"ব্রজের নির্মল রাগের কথা শুনে ভক্তরা সব রকম ধর্ম অনুষ্ঠান এবং সব রকম সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে রাগমার্গে আমাকে ভজনা করবে।"

তাৎপর্য

রঘুনাথ দাস গোস্বামী, মহারাজ কুলশেখর আদি আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষগণ সামাজিক নীতিবোধ এবং ধর্ম আচরণের প্রথা লঙ্ঘন করেও রাগমার্গে ভগবদ্ভক্তি বিকশিত করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌-গোস্বামীদের অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর *মনঃশিক্ষা* নামক প্রার্থনায় লিখেছেন যে, সর্বান্তঃকরণে রাধা-কৃষ্ণের সেবা করা উচিত। *ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু*—বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান অথবা কেবলমাত্র বিধি-নিষেধ অনুশীলন করার প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

তেমনই মহারাজ কুলশেখর তাঁর *মুকুন্দমালা স্তোত্রে* (৫) লিখেছেন—

নাস্থা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপম্ ।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

"ধর্ম অনুষ্ঠান করা, অথবা সাম্রাজ্য লাভ করার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অপেক্ষা করি না; আমার পূর্ব কর্ম অনুসারে তারা আসুক বা না আসুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার একমাত্র বাসনা হচ্ছে, জন্ম-জন্মান্তরে আমি যেন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি নিশ্চলা ভক্তি লাভ করতে পারি।"

শ্লোক ৩৪

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

অনুগ্রহায়—অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **মানুষম্**—মানুষের মতো; **দেহম্**—দেহ; **আশ্রিতঃ**—গ্রহণ করে; **ভজতে**—তিনি উপভোগ করেন; **তাদৃশীঃ**—সেই রূপ; **ক্রীড়াঃ**—লীলাবিলাস; **যাঃ**—যা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ-পরঃ**—তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ; **ভবেৎ**—অবশ্যই হওয়া উচিত।

অনুবাদ

"ভক্তদের কৃপা করার জন্য ভগবান তাঁর শাশ্বত নররূপ প্রকট করে তাঁর অতি অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত লীলাবিলাসের বর্ণনা শ্রবণ করে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ হওয়া উচিত।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩৩/৩৬) থেকে উদ্ধৃত। পরমেশ্বর ভগবান অনন্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সেই রূপ চিন্ময় এবং তা চিৎ-জগতে নিত্য বিরাজমান। এই জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র এবং চিৎ-জগতে সব কিছুই অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করে। সেখানে সব কিছুই কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত। চিৎ-জগতের কোন কিছুকেই কাল বিকৃত করতে পারে না অথবা হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং সেখানে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ জীবের পারমার্থিক অবস্থা ভেদে তাঁদের সেবা গ্রহণ করেন। চিন্ময় জগতে সব কিছুই বিশুদ্ধ সত্ত্বে স্থিত। জড় জগতে যে সত্ত্বগুণ তা রজোগুণ ও তমোগুণের মিশ্রণে কলুষিত।

কথিত আছে যে, মনুষ্য-শরীর ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং তার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ, কেবলমাত্র মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হলেই জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। জড় জগতে সমস্ত জীবদেহের মধ্যে মনুষ্য-শরীরকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। কেউ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ জড় শরীরের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেন, তা হলে তিনি ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন।

ভগবানের অবতারেরা মনুষ্যরূপ ব্যতীত মনুষ্যেতর রূপেও আবির্ভূত হন, যদিও তা মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। বিভিন্ন জীবের উপলব্ধির ক্ষমতা ভেদে ভগবানের বিভিন্ন লীলা রয়েছে। কিন্তু ভগবান নররূপে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে সব চাইতে বেশি কৃপা করেন। তখন মানুষ ভগবানের বিভিন্ন প্রকার নিত্যসেবায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

ভগবানের বিশেষ কোন লীলার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে জীবের স্বরূপগত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। *শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য* ও *মধুর*—এই পাঁচটি মুখ্য রসে জীব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্কগুলির মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে *মধুর* রসাশ্রিত সম্পর্ক, যা বিবিধ আবেগের মিশ্রণে ভক্তের কাছে সব চাইতে বেশি আস্বাদনীয়।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে অবতরণ করে ভগবান জীবের চেতনার বিকাশ অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জীবদের সঙ্গে সম্পর্কের বিনিময় করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যে *মধুর পরকীয়া-রস* প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়।

সহজিয়া নামক এক শ্রেণীর তথাকথিত ভক্ত ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ পরকীয়া প্রেমের মহিমা বুঝতে না পেরে ভগবানের লীলাবিলাসের অনুকরণ করে। তাদের এই কৃত্রিমভাবে অনুকরণের ফলে তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে, ভক্তিমার্গ

থেকে বিচ্যুত হয়। জড়-জাগতিক কামনা-প্রসূত যৌন আবেদন এবং চিন্ময় প্রেম সমশ্রেণীর নয়। ভগবৎ-প্রেম বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত অধোক্ষজ বস্তু। সহজিয়াদের কার্যকলাপ ইন্দ্রিয় ও মনের কলুষ বৃদ্ধি করে মানুষকে জড় জগতের গভীরতম অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত করে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ অধোক্ষজ বা ভগবানের প্রতি নিত্যদাসত্ব প্রদর্শন করে। তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনার অতীত। জড়বাদী বদ্ধ জীবেরা অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, পক্ষান্তরে তারা ভগবদ্ভক্তির নামে ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। যে সমস্ত অবিবেচক মানুষ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাসকে সাধারণ মানুষের কার্যকলাপ বলে মনে করে, তারা কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। রাসনৃত্যের আয়োজন হয় শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি *যোগমায়ার* প্রভাবে এবং তা কখনই জড় বিষয়াসক্ত মানুষের বোধগম্য নয়। বিকৃত মনোবৃত্তি-সম্পন্ন সহজিয়ারা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় লীলার প্রতি প্রাকৃত আবর্জনা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে *তৎপরত্বেন নির্মলম্* এবং *তৎপরো ভবেৎ* উক্তির বিকৃত অর্থ করে। *তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ* শব্দের বিকৃত অর্থ করে তারা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করার ছলে কামক্রীড়ায় লিপ্ত হয়। মহাজন গোস্বামীদের প্রদত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এই অধোক্ষজ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী গোস্বামীদের বন্দনা করে উল্লেখ করেছেন যে, সেই অপ্রাকৃত লীলাবিলাস হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা তাঁর নেই—

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥

"যখন আমি গোস্বামীদের রচিত সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আকুল হব, তখন আমি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হব।" পক্ষান্তরে বলা যায়, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীদের শিষ্য-পরম্পরার ধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বদ্ধ জীবেরা স্বাভাবিকভাবেই ভগবৎ-বিমুখ এবং জড় বিষয়ে মগ্ন থাকাকালে তারা যদি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলার তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করে, তা হলে তারা প্রাকৃত সহজিয়াদের মতো নিজেদের অবশ্যই সর্বনাশ সাধন করবে।

শ্লোক ৩৫

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

এখানে 'ভবেৎ' এই বিধিলিঙ্ ক্রিয়াটি ব্যক্ত করে যে, সেটি করা অবশ্য কর্তব্য। তা না করা হলে কর্তব্যের অবহেলা করা হবে।

তাৎপর্য

এই বিধিলিঙ্ ক্রিয়াটি কেবল শুদ্ধ ভক্তদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নবীন ভক্তরা সদ্‌গুরুর সুদক্ষ পরিচালনায় বৈধীভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করার পরেই কেবল এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। তখন তারা রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা শ্রবণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

জড় বিষয়ে আসক্ত থাকাকালে জীবকে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সম্পর্কে কঠোরভাবে বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়। চিৎ-জগৎ প্রপঞ্চাতীত এবং সব রকম উপাধিমুক্ত, কেন না সেখানে কোন বিকার নেই। কিন্তু এই জড় জগতে জীবের যৌন ক্ষুধা ন্যায় ও অন্যায় আচরণের পার্থক্য সৃষ্টি করে। চিৎ-জগতে কোন প্রকার যৌন ক্রিয়া নেই। চিৎ-জগতে প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে যে প্রণয়ের সম্পর্ক, তা বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেম এবং তা পূর্ণ আনন্দময়।

যারা চিন্ময় *মাধুর্য রসের* প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, তারা অবশ্যই জড় ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অধঃপতিত হবে এবং পরিণামে চরমভাবে কলুষিত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন নারকীয় জীবনের গভীরতম প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে স্ত্রী-পুরুষের জড়-জাগতিক তথাকথিত প্রেমের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার অপ্রাকৃত বাৎসল্য প্রেমের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে জড় জগতের পুত্র-কন্যার প্রতি আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারলে জড় জগতের কোলাহল সৃষ্টিকারী তথাকথিত বন্ধু-বান্ধবের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সেবকরূপে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারলে আর অধঃপতিত জড় জগতের প্রভু হওয়ার আশায় জড় শরীরটির দাসত্ব করতে হয় না। তেমনই, শান্তরসে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য দর্শন করতে পারলে আর নির্বিশেষবাদ অথবা শূন্যবাদের দর্শনের মাধ্যমে দুঃখ নিবৃত্তির অর্থহীন প্রচেষ্টা করতে হয় না। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তা হলে সে অবশ্যই জড় সুখভোগের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পাপ-পুণ্যের কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে একের পর এক জড় দেহ ধারণ করে জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমেই জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৬-৩৭

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ ।
অসুরসংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩৬ ॥
এই মত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ ।
যুগধর্মপ্রবর্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বাসনাগুলি যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ, তেমনই অসুর সংহার কেবল একটি আনুষঙ্গিক প্রয়োজন, আর যুগধর্ম প্রবর্তন হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনুষঙ্গিক কারণ।

শ্লোক ৩৮

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন ।
যুগধর্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য কারণবশত ভগবান যখন অবতরণ করতে মনস্থ করলেন, তখন যুগধর্ম প্রবর্তনের সময় সমুপস্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯

দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নামসংকীর্তন ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই দুটি কারণবশত ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান অবতরণ করেছিলেন এবং নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রেমামৃত আস্বাদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে ।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তিনি এমন কি আচণ্ডালের মধ্যেও কীর্তন প্রচার করেছিলেন। তিনি নাম ও প্রেমের একটি মালা গেঁথে সমস্ত জড় জগতের গলায় পরিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪১

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার ।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

এরূপে ভক্তভাব অবলম্বন করে তিনি স্বয়ং সেই ভক্তি আচরণপূর্বক তা প্রচার করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রয়াগে শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে বলেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অবতারদের মধ্যে সব চাইতে কৃপাময়, কারণ তিনি কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন। কৃষ্ণপ্রেম বিতরণই ছিল তাঁর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য। মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া। কখনও কখনও অনেকে মনে করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নতুন কোন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তাদের সেই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন নতুন মত সৃষ্টি করেননি। তিনি জীবের নিত্যধর্ম প্রচার করে গেছেন। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জীবকে অবগত করানো। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অভাববশত মানুষ ভগবানের ভগবত্তা উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁকে বিশ্বের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির একজন সরবরাহকারী বলে মনে করে এবং তাঁর কাছে তাদের ঈপ্সিত বস্তুগুলির জন্য প্রার্থনা করাকেই ধর্ম আচরণ বলে মনে করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ভগবৎ-প্রেম দান করা। যে কেউই ভগবানকে পরম ঈশ্বর বলে জেনে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবৎ-প্রেমিক হতে পারেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মহাবদান্য অবতার। এই রকম উদারভাবে ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দান করেছেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, তিনি কিভাবে ভগবানকে ভালবাসতে হয় তা শেখার মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনে অধিক উন্নতি সাধন করতে পারেন। তাই যাঁরা জানেন যে, সব কিছুর পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তাঁরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। সমস্ত মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় কিভাবে যুক্ত হতে হয়, সমস্ত মানুষকে সেই শিক্ষা প্রদান করাই হচ্ছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-কার্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের ভূমিকা অবলম্বন করে নিজের প্রেমময়ী সেবার পন্থা শিক্ষা দিচ্ছেন। ভক্তের ভূমিকা অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবানের নিত্য প্রকাশ হচ্ছে তাঁর অপূর্ব সমস্ত প্রকাশের মধ্যে অন্যতম প্রকাশ। বদ্ধ জীব তার ত্রুটিপূর্ণ প্রয়াসের দ্বারা কখনই পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারে না। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিকটে আসার জন্য বদ্ধ জীবকে যে সরল পন্থা প্রদান করলেন, তা পরম অদ্ভুত।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে রাধারাণীর ভাবে বিভোর শ্রীকৃষ্ণরূপে বা রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনুরূপে বর্ণনা করেছেন। চিন্ময় প্রেমের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মাধুরীর স্বাদ আস্বাদন করাই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম আকাঙ্ক্ষা। তিনি নিজেকে কখনও শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে করেন না, কারণ তিনি রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করার জন্য অধিক আগ্রহী। আমাদের সব সময় সেই কথা মনে রাখতে

হবে। *নদীয়া-নাগরী* বা *গৌর-নাগরী* নামে তথাকথিত একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে, যারা গোপীদের ভাব অনুকরণ করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে তাঁর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে। কিন্তু তারা জানে না যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তাভাবকে গ্রহণ করেননি। তিনি রাধারাণীর ভোগ্যভাবকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে সেই ভাবকেই গ্রহণ করেছেন। তথাকথিত ভক্তরূপী কপট ব্যক্তিদের মনগড়া অপসিদ্ধান্ত মহাপ্রভু কখনও অনুমোদন করেননি। *গৌর-নাগরীর* মতো অপসম্প্রদায়গুলির এই ধরনের অপপ্রচার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর প্রসারের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিঃসন্দেহে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি সব সময়ই শ্রীমতী রাধারাণীর থেকে অভিন্ন। কিন্তু গূঢ় কারণবশত *বিপ্রলম্ভ-ভাব* নামক যে বিশেষ ভাব তিনি অবলম্বন করেছেন, সেবার নামে তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। চিন্ময় তত্ত্বে অনধিকার প্রবেশ করে জড়বাদী মানুষদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসন্তোষ উৎপাদন করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী এই ধরনের প্রতিকূল আচরণ সব সময় পরিত্যাগ করা উচিত। এমন কোন আচরণ কখনও করা উচিত নয় যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ অসন্তুষ্ট হন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *আনুকূল্যেন*, অর্থাৎ যা কিছু শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের অনুকূল, তাই করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রতিকূল আচরণ কৃষ্ণভক্তি নয়। কংস শ্রীকৃষ্ণের শত্রু ছিল। সে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করত, কিন্তু সে তাঁকে শত্রুরূপে চিন্তা করত। এই ধরনের প্রতিকূল আচরণ-প্রসূত তথাকথিত ভগবৎ-সেবা সব সময় পরিত্যাগ করা উচিত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মহাপ্রভুর সেই ভাবটিকে অঙ্গীকার করা, ঠিক যেভাবে গম্ভীরায় (শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে মহাপ্রভুর আবাসস্থলে) শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী করেছিলেন। তিনি সব সময় *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে বিরহকাতর শ্রীমতী রাধারাণীর *বিপ্রলম্ভ* ভাবের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সেই অনুকূল সাহচর্যে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু *গৌর-নাগরী* সম্প্রদায় যে মহাপ্রভুকে ভোক্তার আসনে অধিষ্ঠিত করিয়ে, নিজেরা ভোগ্যরূপে তাঁর আরাধনা করার চেষ্টা করে, তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা তাঁর অনুগামীদের দ্বারা স্বীকৃত নয়। তার ফলে এই সমস্ত ভণ্ড প্রতারকেরা মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করার পরিবর্তে তাঁর বিরাগভাজন হয় এবং তাঁর পাদপদ্মের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়। তাদের কল্পনাপ্রসূত অপসিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার নীতিবিরুদ্ধ। ভোক্তারূপে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় আনন্দ উপভোগ এবং *বিপ্রলম্ভ* ভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণবিরহ, অপ্রাকৃত প্রেমের এই দুটি পৃথক ভাবকে কখনও একীভূত করা যায় না।

শ্লোক ৪২

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার ।
চারি প্রেম, চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের চারটি রস। এই চারটি রসের আধার হচ্ছেন চার প্রকার ভগবদ্ভক্ত।

শ্লোক ৪৩

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে ।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত রসের ভক্তরাই তাঁদের নিজের ভাবটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং সেই ভাব অনুসারে তাঁরা কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৪৪

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি ।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যদি এই রসসমূহের বিচার করা হয়, তা হলে দেখা যায় যে, শৃঙ্গার রসের মাধুর্য সব চাইতে বেশি।

তাৎপর্য

পারমার্থিক জগতে ভগবানের সঙ্গে বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউই কারও থেকে বড় অথবা ছোট নয়, কেন না সেই জগতে সব কিছুই সমান। কিন্তু যদিও সেই সম্পর্কগুলি পরম স্তরে অধিষ্ঠিত, তবুও তাদের মধ্যে অপ্রাকৃত একটি বিভেদ রয়েছে। এভাবেই সেই সমস্ত অপ্রাকৃত সম্পর্কগুলির মধ্যে *মাধুর্য* প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্লোক ৪৫

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি ।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৪৫ ॥

যথা-উত্তরম্—উত্তরোত্তর; **অসৌ**—সেই; **স্বাদ-বিশেষ**—কোন বিশেষ স্বাদের; **উল্লাসময়ী**—আধিক্যসম্পন্না; **অপি**—যদিও; **রতিঃ**—প্রেম; **বাসনয়া**—বিভিন্ন বাসনার দ্বারা; **স্বাদ্বী**—মধুর; **ভাসতে**—অবস্থান করে; **কা অপি**—কোন; **কস্যচিৎ**—কারও (ভক্তের)।

অনুবাদ

"রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন স্তরে আস্বাদিত হয়। সেই রতি ক্রমে ক্রমে চরম স্তরে পরম আস্বাদনীয় মধুর রসরূপে প্রকাশিত হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/৫/৩৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪৬

অতএব মধুর রস কহি তার নাম ।
স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

অতএব তাকে আমি মধুর রস বলে উল্লেখ করেছি। স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে এই রসের দুটি বিভাগ রয়েছে।

শ্লোক ৪৭

পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস ।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

পরকীয়া-ভাবে এই রস প্রবলভাবে বর্ধিত হয়েছে। ব্রজ ছাড়া অন্য কোথাও এই রস দেখা যায় না।

শ্লোক ৪৮

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি ।
তার মধ্যে শ্রীরাধায় ভাবের অবধি ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজগোপিকাদের এই ভাব অন্তহীন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীতে এই ভাবের পরম পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে।

শ্লোক ৪৯

প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম ।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস-আস্বাদ-কারণ ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর নির্মল, পরিণত প্রেম সর্বোত্তম। তাঁর প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদনের কারণ।

শ্লোক ৫০

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি' ।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীগৌরাঙ্গ, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীহরি, তিনি রাধারাণীর সেই ভাব অঙ্গীকার করে নিজের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তিতে *দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য* ও *মাধুর্য*—এই চারটি রসের মধ্যে *মাধুর্য* রসকেই পূর্ণতম বলে বিবেচনা করা হয়। এই *মাধুর্য* রসকে আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—*স্বকীয়া* ও *পরকীয়া*। সামাজিক প্রথা অনুসারে বিবাহের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন পতিরূপে লাভ করা যায়, তখন পতি-পত্নীর ভাবসম্পন্ন মাধুর্যপর সম্পর্ককে বলা হয় *স্বকীয়া*। আর সামাজিক সমস্ত প্রথা লঙ্ঘন করে উপপতি ও উপপত্নীরূপে ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত যখন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন, গভীর মাধুর্যমণ্ডিত সেই সম্পর্ককে বলা হয় *পরকীয়া*। শাস্ত্রনিপুণ ভগবদ্ভক্তেরা এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, *পরকীয়া-রসের* মাধুর্য তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ, কারণ ভগবৎ-প্রীতির প্রগাঢ়তার জন্য এই রসের ভক্তরা ভগবৎ-সেবায় অধিক তৎপর। ভগবানের প্রতি গভীর প্রেমের আতিশয্যে যে সমস্ত ভক্ত নিজেদের ভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরাই *পরকীয়া* প্রেমের মাধুর্যের দ্বারা ভগবানের পরম প্রীতিসাধন করেন। উপপত্নীর ভূমিকা অবলম্বনকারী এই সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তরা যদিও জানেন যে, উপপতির সঙ্গে এই ধরনের অবৈধ প্রণয়জনিত সম্পর্ক সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ, তবুও ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগবশত তাঁরা সব রকম সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করার কলঙ্ক গ্রহণ করেন। আর যেহেতু এই ধরনের ভগবৎ-প্রেমে বিপদ ও ভয়ের কারণ রয়েছে, তাই তাকে বিপদ ও ভীতিবিহীন অন্য মাধুর্যপর প্রেমের থেকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই ধরনের কলঙ্কিত প্রেমের বৈধতা কেবল অপ্রাকৃত জগতেই দেখা যায়। জড় জগতে *স্বকীয়া* ও *পরকীয়া* প্রেমের কোনটিরই অস্তিত্ব নেই, এমন কি বৈকুণ্ঠজগতেও *পরকীয়া* প্রেমের কোন অস্তিত্ব নেই, তা কেবল ব্রজ নামক গোলোক বৃন্দাবনের একটি বিশেষ অংশেই বিরাজ করে।

কোন কোন ভক্ত মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সব সময় গোলোক বৃন্দাবনে অবস্থানপূর্বক সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেন এবং কখনও কখনও তিনি ব্রজভূমিতে এসে *পরকীয়া-রস* আস্বাদন করেন। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনের ষড়্-গোস্বামীরা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, গোলোক বৃন্দাবনের মতো ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাবিলাস নিত্য। ব্রজ হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবনের একটি বিশেষ অংশ, যেখানে ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস সম্পাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে তাঁর ব্রজধামের লীলাবিলাস করেছিলেন, সেই লীলা অপ্রাকৃত জগতের গোলোক বৃন্দাবনে অবস্থিত ব্রজধামে নিত্য বিরাজিত এবং *পরকীয়া-রস* সেখানে নিত্য বর্তমান।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বোত্তম লীলাবিলাসের নিত্য আলয় ব্রজধাম সহ এই জগতে অবতরণ করেন। ভগবান যেমন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তেমনই তাঁর লীলাবিলাসের সহায়ক বিভিন্ন উপকরণও বাহ্যিক সহায়তা ছাড়া সেই একই অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপ্রাকৃত জগৎ ব্যতীত আর কোথাও *পরকীয়া* প্রেমের প্রকাশ হয় না। এই সর্বোচ্চ স্তরের ভগবৎ-প্রেম অপ্রাকৃত জগতের এক বিশেষ অংশে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জগতে বদ্ধ জীবের অগোচর ব্রজধামের সেই সর্বোচ্চ রস কিঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশিত হয়।

ব্রজগোপিকারা যে অপ্রাকৃত মাধুর্যরস আস্বাদন করেন, শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন তার মূল আধার। শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অপ্রাকৃত ভাব স্বয়ং ভগবানও অনুধাবন করতে পারেন না, তাঁর মধ্যেই মাধুর্যপর প্রেমের অপ্রাকৃত রস সমন্বিত দিব্য ভাবের পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে। তাঁর প্রেমময়ী সেবা সমস্ত অপ্রাকৃত আনন্দের মধ্যে সর্বোত্তম। ভগবানের দিব্য মাধুরীর রসাস্বাদনে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা; এই রসাস্বাদনে কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভগবান স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি ব্রজধামে প্রকাশিত *পরকীয়া-রসের* সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করেছেন।

শ্লোক ৫১

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫১ ॥

সুর-ঈশানাম্—দেবতাদের; **দুর্গম**—দুর্গ; গতিঃ—লক্ষ্য; **অতিশয়েন**—সর্বোৎকৃষ্টভাবে; **উপনিষদাম্**—উপনিষদসমূহের; **মুনীনাম্**—মুনিগণের; **সর্বস্বম্**—সর্বস্ব; **প্রণত-পটলীনাম্**—শরণাগত ভক্তদের; **মধুরিমা**—মাধুর্য; **বিনির্যাসঃ**—নির্যাস; **প্রেম্ণঃ**—প্রেমের; **নিখিল**—সমস্ত; **পশুপালা**—গোপরমণীদের; **অম্বুজ-দৃশাম্**—কমলাক্ষী; **সঃ**—তিনি; **চৈতন্যঃ**—শ্রীচৈতন্য; **কিম্**—কি; **মে**—আমার; **পুনঃ**—পুনরায়; **অপি**—অবশ্যই; **দৃশোঃ**—চক্ষুযুগলের; **যাস্যতি**—প্রাপ্ত হবেন; **পদম্**—পরমপদ।

অনুবাদ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন দেবতাদের আশ্রয়, উপনিষদ-সমূহের লক্ষ্য, মুনিদের সর্বস্ব, শরণাগত ভক্তদের মধুরিমা, কমলনয়না ব্রজযুবতীদের প্রেমের নির্যাসস্বরূপ। সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার গোচরীভূত হবেন?"

শ্লোক ৫২

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫২ ॥

অপারম্—অন্তহীন; কস্য অপি—কারও; প্রণয়ি-জন-বৃন্দস্য—অসংখ্য প্রণয়ীদের; কুতুকী—কৌতুহলী; রস-স্তোমম্—রসের স্তবক; হৃত্বা—হরণ করে; মধুরম্—মধুর; উপভোক্তুম্—উপভোগ করার জন্য; কম্ অপি—কোন; যঃ—যিনি; রুচম্—দ্যুতি; স্বাম্—নিজের; আবব্রে—আচ্ছাদিত; দ্যুতিম্—দ্যুতি; ইহ—এখানে; তদীয়াম্—তাঁর প্রিয়জনদের; প্রকটয়ন্—প্রকাশ করে; সঃ—তিনি; দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান; চৈতন্য-আকৃতিঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে; অতিতরাম্—অত্যন্ত; নঃ—আমাদের; কৃপয়তু—কৃপা করুন।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসংখ্য প্রণয়িজনের মধ্যে কোন এক বিশেষ ব্রজযুবতীর (শ্রীমতী রাধারাণীর) অন্তহীন রসসমূহ আস্বাদন করার জন্য তাঁর নিজের শ্যামবর্ণ গোপন করে শ্রীমতী রাধারাণীর গৌরবর্ণ অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি আমাদের বিশেষভাবে কৃপা করুন।"

তাৎপর্য

শ্লোক ৫১ ও ৫২ শ্রীল রূপ গোস্বামীর *স্তবমালার প্রথম শ্রীচৈতন্যাষ্টক* ২ এবং *দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যাষ্টক* ৩ থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৫৩

ভাবগ্রহণের হেতু কৈল ধর্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি, শুন সর্বজন ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব আস্বাদন হচ্ছে তাঁর অবতরণের মুখ্য কারণ এবং সেই সঙ্গে তিনি যুগধর্ম স্থাপন করেছেন। সেই মুখ্য কারণ আমি এখন বর্ণনা করব, দয়া করে আপনারা সকলে তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৫৪

মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের অবতরণের মুখ্য কারণ বর্ণনা করে একটি শ্লোকে আমি তার আভাস পূর্বে দিয়েছি, এখন আমি সেই শ্লোকের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করব।

শ্লোক ৫৫

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫৫ ॥

রাধা—শ্রীমতী রাধারাণী; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; প্রণয়—প্রণয়ের; বিকৃতিঃ—বিকার; হ্লাদিনী শক্তিঃ—হ্লাদিনী শক্তি; অস্মাৎ—এই হেতু; এক-আত্মানৌ—স্বরূপত একাত্মা বা অভিন্ন; অপি—হওয়া সত্ত্বেও; ভুবি—পৃথিবীতে; পুরা—অনাদিকাল থেকে; দেহভেদম্—ভিন্ন দেহ; গতৌ—ধারণ করেছেন; তৌ—রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে; চৈতন্য-আখ্যম্—শ্রীচৈতন্য নামে; প্রকটম্—প্রকটিত হয়েছেন; অধুনা—এখন; তৎ-দ্বয়ম্—সেই দুই দেহ; চ—এবং; ঐক্যম্—একত্রে; আপ্তম্—যুক্ত হয়ে; রাধা—শ্রীমতী রাধারাণীর; ভাব—ভাব; দ্যুতি—কান্তি; সুবলিতম্—বিভূষিত; নৌমি—আমি প্রণতি নিবেদন করি; কৃষ্ণ-স্বরূপম্—যিনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ তাঁকে।

অনুবাদ

"রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকার। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রথম চোদ্দটি শ্লোকের পঞ্চম শ্লোক।

শ্লোক ৫৬

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি' ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাঁরা দুটি পৃথক দেহ ধারণ করেছেন। এভাবেই তাঁরা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

দুই অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ জড়বাদীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা থেকে উদ্ধৃত শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উপরোক্ত বর্ণনাটি তাঁদের তত্ত্বের সারমর্ম। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ, এই দুটি তত্ত্বের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে গভীর পারমার্থিক উপলব্ধির প্রয়োজন। এক ভগবান দুইরূপে আনন্দ উপভোগ করছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শক্তিমান তত্ত্ব, আর শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তিতত্ত্ব। বেদান্ত-দর্শন অনুসারে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নেই; তাঁরা অভিন্ন। আগুন থেকে যেমন তাপকে পৃথক করা যায় না, তেমনই শক্তিমান থেকে শক্তিকে পৃথক করা যায় না।

জড় প্রকৃতির আপেক্ষিক অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পরা প্রকৃতির সব কিছুই অচিন্ত্য। তাই আপেক্ষিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি ও শক্তিমান তত্ত্বের অভেদত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ* দর্শনের মাধ্যমেই কেবল অপ্রাকৃত জগতের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তিনি নিত্যকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করেন। মহাভাগবত ভক্তের কৃপা ব্যতীত নির্বিশেষবাদীরা কখনও এই গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পরমানন্দে মগ্ন রেখেছেন বলে তাঁর নাম রাধা। আবার, শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত জীবের সেবা নিবেদন করার মাধ্যম হচ্ছেন তিনি। তাই বৃন্দাবনে কৃষ্ণভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত সেবকরূপে স্বীকৃতি লাভ করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা প্রার্থনা করেন।

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের অপ্রাকৃত সম্পর্কের সর্বোত্তম তত্ত্ব কলিযুগের বদ্ধ জীবদের প্রদান করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কার্যকলাপ মূলত তাঁর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া।

পূর্ণতত্ত্ব, শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপ। সেই একই চিৎ-শক্তি প্রথমে সদংশে *সন্ধিনী* অর্থাৎ সত্তা-বিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণ জ্ঞানরূপ *সম্বিৎতত্ত্ব* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব এবং আনন্দাংশে *হ্লাদিনী* অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আনন্দদায়িনী শক্তি। এভাবেই ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে তিনটি অপ্রাকৃত সত্তায় বিস্তার করেন।

শ্লোক ৫৭

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি ।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

রস আস্বাদন করার জন্য এখন তাঁরা দুজন এক দেহ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৫৮

ইথি লাগি' আগে করি তার বিবরণ ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি প্রথমে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করব, যাঁর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৫৯

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার ।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার। তিনি হ্লাদিনী নামক শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি।

শ্লোক ৬০

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করায় এবং তাঁর ভক্তদের পোষণ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *প্রীতিসন্দর্ভে* বিস্তারিতভাবে *হ্লাদিনী* শক্তির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, *বেদে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হওয়া যায়। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবদ্ভক্ত সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবান আকৃষ্ট হন এবং তাই বৈদিক জ্ঞানের সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান।"

ভগবদ্ভক্তিতে আকর্ষণীয় এমন কি আছে, যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবান তা এমনভাবে গ্রহণ করেন? আর এই সেবার ধরনই বা কি রকম? তার উত্তরে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। *মায়া* বা অজ্ঞান তাঁকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না। অতএব যে শক্তি পরমেশ্বর ভগবানকে বশ করে তা অবশ্যই পরা শক্তি। সেই শক্তি কখনই জড়া প্রকৃতিসম্ভূত হতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান যে আনন্দ উপভোগ করেন, তা নির্বিশেষবাদীদের ব্রহ্মানন্দের মতো হেয় আনন্দ নয়। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে দুটি সত্তার মধ্যে প্রেমের বিনিময় এবং তাই তা একক আত্মার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। নির্বিশেষ উপলব্ধির আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ ভগবদ্ভক্তির সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে—*হ্লাদিনী* বা আনন্দদায়িনী শক্তি, *সন্ধিনী* বা সত্তা-বিস্তারিণী শক্তি এবং *সম্বিৎ* বা পূর্ণ জ্ঞানময় শক্তি। *বিষ্ণু পুরাণে* (১/১২/৬৯) ভগবানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—"হে ভগবান! আপনি হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়। *হ্লাদিনী, সন্ধিনী* ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় এক স্বরূপশক্তি রূপে আপনাতেই বিরাজ করে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণ, যা থেকে সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হয়, তা আপনাতে অবস্থান করে না, কেন না আপনার মধ্যে কোন জড় গুণ নেই।"

হ্লাদিনী হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দের মূর্ত প্রকাশ, যার মাধ্যমে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন। যেহেতু *হ্লাদিনী* শক্তি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানে বর্তমান, তাই মায়াবাদীদের মতানুসারে ভগবান যে জড়া প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণে আবির্ভূত হন, তা স্বীকার্য নয়। কারণ *বেদে* বলা হয়েছে যে, ভগবান তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তিসহ নিত্য বিরাজমান। সুতরাং *বেদের* এই বিচার অনুসারে মায়াবাদ সিদ্ধান্ত-বিরোধী। পরমেশ্বর ভগবানের *হ্লাদিনী* শক্তি যখন তাঁর কৃপায় ভক্তদের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন সেই প্রকাশকে বলা হয় ভগবৎ-প্রেম। 'ভগবৎ-প্রেম' হচ্ছে ভগবানের আনন্দদায়িনী *হ্লাদিনী* শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে যে ভগবৎ-প্রেমের বিনিময় হয়, তা হচ্ছে ভগবানের অপ্রাকৃত আনন্দদায়িনী *হ্লাদিনী* শক্তির প্রকাশ।

পরমেশ্বর ভগবানের যে শক্তি তাঁকে নিরন্তর আনন্দে নিমগ্ন রাখে, তা জড় নয়। কিন্তু শঙ্করপন্থীদের যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তাই তারা মনে করে যে, তা জড়। এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ এবং সবিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভগবৎ-প্রেমানন্দের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। *হ্লাদিনী* শক্তি ভগবানকে সব রকম দিব্য আনন্দ আস্বাদন করায় এবং ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করেন।

শ্লোক ৬১

সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ নিত্য (সৎ), জ্ঞানময় (চিৎ) ও পূর্ণ আনন্দময় (আনন্দ)। তাঁর একই চিৎ-শক্তি তিনটি ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৬২

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের আনন্দ অংশে হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ হয়, সদংশে সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হয় এবং চিদংশে সম্বিৎ শক্তির প্রকাশ হয়। সম্বিৎ শক্তিকে জ্ঞান বলেও বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভগবৎ-সন্দর্ভ* গ্রন্থে (শ্লোক ১০৩) ভগবানের শক্তিকে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—পরমেশ্বর ভগবান যে শক্তির দ্বারা স্বীয় সত্তাকে ধারণ করেন, তাকে বলা হয় *সন্ধিনী*। যে শক্তির মাধ্যমে তিনি স্বীয় সত্তাকে জানতে সমর্থ হন এবং অন্যকে তা জানাতে সমর্থ হন, তাকে বলা হয় *সম্বিৎ*। আর যে শক্তির দ্বারা তিনি স্বয়ং অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন এবং ভক্তদের আনন্দ প্রদান করেন, তাকে বলা হয় *হ্লাদিনী*।

এই শক্তিসমূহের পূর্ণ প্রকাশকে বলা হয় *বিশুদ্ধ-সত্ত্ব* এবং ভগবান যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর সঙ্গে সেই চিন্ময় বৈচিত্র্যপূর্ণ *বিশুদ্ধ-সত্ত্বই* প্রকাশিত হয়। তাই এই জড় জগতে ভগবানের লীলাবিলাস ও প্রকাশসমূহ জড়-জাগতিক কোন ক্রিয়া নয়; তা পূর্ণরূপে চিন্ময়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ভগবানের আবির্ভাব, কার্যকলাপ ও তিরোভাব দিব্য, তখন তিনি তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর পুনরায় জড় দেহে আবদ্ধ হন না। তিনি তখন জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সঙ্গ লাভ করেন এবং *হ্লাদিনী* শক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের মাধ্যমে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করেন। মায়িক সত্ত্বগুণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত থাকে। তাই সেই সত্ত্বগুণকে বলা হয় *মিশ্রসত্ত্ব*। কিন্তু *বিশুদ্ধ-সত্ত্বের* চিন্ময় বৈচিত্র্য সব রকম জড় গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাই *বিশুদ্ধ-সত্ত্বই* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর চিন্ময় লীলাবিলাস উপলব্ধি করার আদর্শ পরিবেশ। চিৎ-বৈচিত্র্য সর্বদাই সব রকম জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। পরমেশ্বর ভগবান ও চিৎ-বৈচিত্র্য উভয়ই পরমতত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর ভক্তরা উভয়েই *সম্বিৎ* শক্তির প্রভাবে সরাসরিভাবে *হ্লাদিনী* শক্তি আস্বাদন করেন।

জড়া প্রকৃতির গুণগুলি বদ্ধ জীবদের নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কখনই এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একাদশ স্কন্ধে (১১/২৫/১২) কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, *সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে*—"জড় জগতে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ বদ্ধ জীবদের প্রভাবিত করে, কিন্তু তা আমার পরম সত্তাকে কখনও প্রভাবিত করতে পারে না।" *বিষ্ণু পুরাণেও* বর্ণিত হয়েছে—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র ন প্রাকৃতা গুণাঃ ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥

"পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের অতীত। তাঁর মধ্যে কোন জড় গুণের অবস্থিতি নেই। সেই আদিপুরুষ নারায়ণ, যিনি পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে (১০/২৭/৪) শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে ইন্দ্র বলেছেন—

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্ ।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥

"হে ভগবান! আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ধাম জড়-জাগতিক গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সেখানকার সমস্ত কার্যকলাপ আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি প্রেমময়ী সেবার প্রকাশ। রজ ও তমোগুণের কলুষমুক্ত সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ভক্তরা কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যার দ্বারা এই ক্রিয়ায় সমৃদ্ধি লাভ করেন। কোন অবস্থাতেই জড় জগতের গুণগুলি আপনাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।"

জড় প্রকৃতির গুণগুলি যখন অপ্রকাশিত থাকে, তখন তা সত্ত্বগুণে অবস্থান করছে বলে বর্ণিত হয়। সেগুলি যখন বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং জড় অস্তিত্বের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে সক্রিয় হয়, তখন তাকে বলা হয় রজোগুণ। আর ক্রিয়া ও বৈচিত্র্যের অভাবকে বলা হয় তমোগুণ। পক্ষান্তরে, ঔদাসীন্য হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ, সক্রিয়তা রজোগুণের লক্ষণ এবং নিষ্ক্রিয়তা তমোগুণের লক্ষণ। এই সমস্ত জাগতিক গুণময় প্রকাশের ঊর্ধ্বে হচ্ছে *বিশুদ্ধ-সত্ত্ব*। এই *বিশুদ্ধ-সত্ত্বে সন্ধিনী* শক্তির প্রাধান্য উপলব্ধ হয় সব কিছুর অস্তিত্বে, *সম্বিৎ* শক্তির প্রাধান্য উপলব্ধ হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং *হ্লাদিনী* শক্তির প্রাধান্যের ফলে গুহ্যতম প্রেমভক্তি উপলব্ধ হয়। এই তিনের যুগপৎ প্রকাশ *বিশুদ্ধ-সত্ত্ব* হচ্ছে ভগবৎ-ধামের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাই পরতত্ত্ব হচ্ছেন বাস্তব বস্তু ও ত্রিশক্তিতে নিত্য প্রকাশমান। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যে প্রকাশিত, তাঁর তটস্থা শক্তি হচ্ছে জীব এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ হচ্ছে জড় জগৎ। সুতরাং পরতত্ত্বের চারটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ভগবান স্বয়ং, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, তাঁর তটস্থা শক্তি এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। *স্বয়ংরূপ* ও তাঁর *বৈভব-প্রকাশ* রূপে ভগবান ও তাঁর প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে ভোগ করেন। চিৎ-জগতের প্রকাশ হয় অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে, যা তাঁর সমস্ত শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুহ্যতম। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত জড়া প্রকৃতি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বদ্ধ জীবদের দেহরূপ আবরণ প্রদান করেন। এই আবরণাত্মিকা শক্তি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবসমূহকে উচ্চতর ও নিম্নতর শরীর দান করে।

অন্তরঙ্গা শক্তির তিনটি প্রকাশ—*সন্ধিনী, সম্বিৎ* ও *হ্লাদিনী*। এই শক্তিত্রয় বহিরঙ্গা

শক্তির প্রকাশগুলিকে প্রভাবিত করে, যার দ্বারা বদ্ধ জীবেরা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রভাব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে প্রকাশ করে এবং প্রমাণ করে যে, তটস্থা শক্তির অন্তর্গত জীবেরা ভগবানের চিরন্তন সেবক এবং তারা হয় অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা, নয়তো বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

শ্লোক ৬৩

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥ ৬৩ ॥

হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী শক্তি; **সন্ধিনী**—সত্তা-বিস্তারিণী শক্তি; **সম্বিৎ**—জ্ঞানশক্তি; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **একা**—এক; **সর্ব-সংস্থিতৌ**—সব কিছুর সম্যক আশ্রয়; **হ্লাদ**—আনন্দ; **তাপ**—বেদনা; **করী**—প্রদানকারী; **মিশ্রা**—দুই-এর মিশ্রণ; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **নো**—না; **গুণ-বর্জিতে**—যিনি জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

"হে ভগবান! আপনি সব কিছুর আশ্রয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় এক অন্তরঙ্গা শক্তিরূপে আপনার মধ্যে বিরাজ করে। জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ, যা সুখ, দুঃখ এবং এই দুই-এর মিশ্রণ, তা আপনার মধ্যে বিরাজ করে না, কেন না আপনি জড় গুণ বর্জিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণু পুরাণ* (১/১২/৬৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৬৪

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম ।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ধিনীর সার অংশ হচ্ছে শুদ্ধ-সত্ত্ব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সত্তা এই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থান করে।

শ্লোক ৬৫

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর ।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা, আসন আদি শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, গৃহ, আসন আদি সব কিছু *বিশুদ্ধ-সত্ত্বের* বিকার। জীব যখন শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ এবং অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেন। কৃষ্ণভক্তি শুরু হয় *বিশুদ্ধ-সত্ত্বের* স্তরে। প্রথমে যে অস্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি হয়, তা সমস্ত শক্তির পরম নিয়ন্তা বাসুদেব রূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি। জীব যখন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত *বিশুদ্ধ-সত্ত্বে* অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি তাঁর সেবাবৃত্তির মাধ্যমে ভগবানের রূপ, গুণ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উপলব্ধি করতে পারেন। *বিশুদ্ধ-সত্ত্বের* স্তর হচ্ছে যথার্থ উপলব্ধির স্তর, কেন না পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই চিন্ময় স্তরে বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই পূর্ণ চিন্ময় তত্ত্ব। পরমেশ্বর ভগবানের পিতা-মাতাই কেবল নন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব কিছুই মূলত *সন্ধিনী-শক্তির* প্রকাশ অথবা *বিশুদ্ধ-সত্ত্বের* বিকার। আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে যে, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত এই *সন্ধিনী-শক্তি* চিৎ-জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন এবং পালন করেন। ভগবৎ-ধামে ভগবানের সেবক-সেবিকা, পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধব আদি সব কিছুই চিৎ-শক্তির অন্তর্গত *সন্ধিনী-শক্তির* বিকার। তেমনই, বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে *সন্ধিনী-শক্তি* জড় জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য বিস্তার করে, যার ফলে আমরা চিৎ-জগতের আভাস দর্শন করতে পারি।

শ্লোক ৬৬

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ৬৬ ॥

সত্ত্বম্—সত্তা; **বিশুদ্ধম্**—বিশুদ্ধ; **বসুদেব-শব্দিতম্**—বসুদেব নামক; **যৎ**—যাঁর থেকে; **ঈয়তে**—প্রকাশিত হন; **তত্র**—তাতে; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপাবৃতঃ**—আবরণশূন্য; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণে; **চ**—এবং; **তস্মিন্**—সেই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **হি**—অবশ্যই; **অধোক্ষজঃ**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত; **মে**—আমার; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বিধীয়তে**—বিশেষভাবে গ্রাহ্য হয়।

অনুবাদ

"যে শুদ্ধ-সত্ত্বে পরমেশ্বর ভগবান অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হন, তাকে বলা হয় বসুদেব। সেই শুদ্ধ-সত্ত্বে অবস্থিত জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব নামে পরিচিত। আমার মনের দ্বারা আমি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৪/৩/২৩) থেকে উদ্ধৃত। সতী যখন তাঁর পিতা দক্ষের আলয়ে যজ্ঞ দর্শন করতে যেতে চান, তখন মহাদেব বিষ্ণুবিদ্বেষী দক্ষের যজ্ঞে সতীকে যেতে নিষেধ করার সময় এই শ্লোকটি বলেছিলেন। মহাদেবের এই উক্তিটি থেকেও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নাম, গুণ, যশ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তর্গত *সন্ধিনী-শক্তিতে* অবস্থান করে।

শ্লোক ৬৭

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান—সংবিতের সার ।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই জ্ঞান হচ্ছে সম্বিৎ-শক্তির সার। এছাড়া অন্য যে সমস্ত জ্ঞান, যেমন নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি হচ্ছে এই সম্বিৎ-শক্তির অংশস্বরূপ।

তাৎপর্য

সম্বিৎ-শক্তির প্রভাবেই জ্ঞানের প্রকাশ হয়। কৃষ্ণ ও জীব উভয়েই জ্ঞাতা। পরমেশ্বর ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই সব কিছু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। তাই তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়। তিনি কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, কিন্তু অন্তহীন বাধা সাধারণ জীবদের জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। জীবের জ্ঞান ত্রিবিধ—সাক্ষাৎ জ্ঞান, ব্যতিরেক জ্ঞান ও বিকৃত জ্ঞান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা আদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জড় বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তা ত্রুটিপূর্ণ, সুতরাং বিকৃত। এই মায়ামোহ জড় শক্তির প্রকাশ, যা মায়াশক্তির অন্তর্গত *সম্বিতের* বিকৃতিময় ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর নেতিবাচক জ্ঞান হচ্ছে ব্যতিরেক জ্ঞানের পন্থা। এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত না হলেও তা অসম্পূর্ণ। এই সমস্ত জ্ঞানের নাম 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'আত্মজ্ঞান', 'নির্বিশেষ জ্ঞান' প্রভৃতি। কিন্তু চিদ্গত *সম্বিৎ-শক্তি* যখন হ্লাদিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবকে কৃপা করেন, তখনই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানরূপে জানা যায়। অতএব তাই হচ্ছে *সম্বিতের* সার। 'জড় জ্ঞান' ও 'ব্রহ্মজ্ঞান' *সম্বিৎ-শক্তির* বিকৃত প্রকাশ।

শ্লোক ৬৮

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব' ।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম—'মহাভাব' ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

হ্লাদিনী শক্তির সার 'ভগবৎ-প্রেম', ভগবৎ-প্রেমের সার 'ভাব' এবং ভাবের পরম প্রকাশ হচ্ছে 'মহাভাব'।

তাৎপর্য

হ্লাদিনী-শক্তির ক্রিয়ার নাম 'প্রেম'। সেই প্রেম দুই প্রকার—শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম ও মিশ্র ভগবৎ-প্রেম। কৃষ্ণগত *হ্লাদিনী-শক্তি* যখন কৃষ্ণকে আনন্দ দান করে জীবকে কৃপা করেন, তখন জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভ হয়। কিন্তু সেই *হ্লাদিনী-শক্তি* যখন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির

দ্বারা কলুষিত হয়ে জীবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে না। তখন জীব বিষয়-বাসনায় মত্ত হয়ে কৃষ্ণপ্রেম থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সময় জীব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হওয়ার পরিবর্তে জড় সুখভোগের প্রতি উন্মত্ত হয় এবং জড়া প্রকৃতির গুণের সংসর্গের ফলে সে দুঃখময় জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শ্লোক ৬৯

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী ।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী হচ্ছেন মহাভাবের মূর্ত প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণের আধার এবং কৃষ্ণপ্রেয়সীদের শিরোমণি।

তাৎপর্য

হ্লাদিনী-শক্তির বিশুদ্ধ ক্রিয়ার প্রকাশ হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের কৃষ্ণপ্রেম, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। *হ্লাদিনী-শক্তির* সার হচ্ছে 'প্রেম', প্রেমের সার হচ্ছে 'ভাব' এবং ভাবের পরাকাষ্ঠা হচ্ছে 'মহাভাব'। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সেই মহাভাব-স্বরূপিণী। তাই শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের মূর্ত প্রকাশ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আশ্রয়স্বরূপা।

শ্লোক ৭০

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা ।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ৭০ ॥

তয়োঃ—তাঁদের মধ্যে; **অপি**—ও; **উভয়োঃ**—উভয়ের (চন্দ্রাবলী ও রাধারাণী); **মধ্যে**—মধ্যে; **রাধিকা**—শ্রীমতী রাধারাণী; **সর্বথা**—সর্বতোভাবে; **অধিকা**—শ্রেষ্ঠা; **মহাভাব-স্বরূপা**—মহাভাব-স্বরূপা; **ইয়ম্**—ইনি; **গুণৈঃ**—সমস্ত গুণ সমন্বিত; **অতিবরীয়সী**—সর্বশ্রেষ্ঠা।

অনুবাদ

"(রাধারাণী ও চন্দ্রাবলী) এই দুজন গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাব-স্বরূপা এবং সমস্ত গুণে বরীয়সী।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রণীত *উজ্জ্বলনীলমণি* (*রাধা-প্রকরণ* ৩) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭১

কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায় ।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সহায়িকা।

তাৎপর্য

শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের মতো পূর্ণ চিন্ময়ী। তাঁকে কখনও জড় জগতের মায়ার দ্বারা প্রভাবিত একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। জড় জগতের বদ্ধ জীবদের মতো তাঁর স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সমন্বিত জড় দেহ নেই। তিনি পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং তাঁর দেহ ও চিত্ত উভয়ই চিন্ময়। যেহেতু তাঁর দেহ চিন্ময়, তাই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিও চিন্ময়। এভাবেই তাঁর দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন ভগবানের আনন্দদায়িনী অন্তরঙ্গা শক্তি বা *হ্লাদিনী-শক্তির* মূর্ত প্রকাশ এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের একমাত্র উৎস।

অন্তরঙ্গভাবে যা শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন, তা শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করতে পারেন না। তাই শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির *সন্ধিনী* অংশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক চিন্ময় কলেবর প্রকাশিত হয় এবং সেই অন্তরঙ্গা শক্তির *হ্লাদিনী-শক্তি* সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণকারী শ্রীমতী রাধারাণীকে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে কেউই শ্রীমতী রাধারাণীর সমপর্যায়ভুক্ত নন।

শ্লোক ৭২

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭২ ॥

আনন্দ—আনন্দ; **চিৎ**—জ্ঞান; **ময়**—পূর্ণ; **রস**—রস; **প্রতি**—প্রতিক্ষণ; **ভাবিতাভিঃ**—ভাবিতদের; **তাভিঃ**—তাঁদের; **যঃ**—যিনি; **এব**—অবশ্যই; **নিজ-রূপতয়া**—তাঁর স্বরূপ দ্বারা; **কলাভিঃ**—যাঁরা তাঁর আনন্দদায়িনী শক্তির বিভিন্ন অংশ; **গোলোক**—গোলোক বৃন্দাবনে; **এব**—অবশ্যই; **নিবসতি**—বাস করেন; **অখিল-আত্ম**—সকলের আত্মারূপে; **ভূতঃ**—বিরাজমান; **গোবিন্দম্**—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; **আদি-পুরুষম্**—আদিপুরুষকে; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

অনুবাদ

"আনন্দদায়িনী চিন্ময় রসের দ্বারা প্রতিভাবিতা হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্তি ও তাঁর কায়ব্যূহ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় ধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৩৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৩

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন ।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে, শুন বিবরণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের সহচরীগণ কিভাবে তাঁকে রস আস্বাদন করান এবং তাঁর লীলাবিলাসে সহায়তা করেন, অনুগ্রহ করে এখন তার বিবরণ শ্রবণ কর।

শ্লোক ৭৪-৭৫

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার ।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৭৪ ॥
ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ-সার ।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সহচরীরা তিনটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজগোপিকাগণ। ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণী থেকে এই সমস্ত কান্তাদের বিস্তার হয়েছে।

শ্লোক ৭৬

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার ।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকে যেভাবে সমস্ত অবতারদের বিস্তার হয়, তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী থেকে সমস্ত লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজদেবীরা প্রকাশিত হন।

শ্লোক ৭৭

বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি ।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবীরা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ-প্রকাশ এবং মহিষীরা তাঁর মূর্তির প্রতিবিম্ব।

শ্লোক ৭৮

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ ।
মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশস্বরূপ ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন তাঁর বৈভব-বিলাসাংশ এবং মহিষীগণ হচ্ছেন তাঁর বৈভব-প্রকাশ।

শ্লোক ৭৯

আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজদেবীদের আকার ও স্বভাব বিভিন্ন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর কায়ব্যূহ এবং তাঁর রস বিস্তার করেন।

শ্লোক ৮০

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস ।
লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

বহু কান্তা ব্যতীত রস আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। তাই ভগবানের লীলাবিলাসে সহায়তা করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণী বহুরূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ৮১

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে ।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজে বিভিন্ন যূথে বিভিন্ন ভাব ও রস অনুসারে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে রাসনৃত্য ও অন্যান্য লীলাবিলাসের রস আস্বাদন করান।

তাৎপর্য

পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারাণীর দেহ ভিন্ন হলেও তাঁরা এক। শ্রীকৃষ্ণ *পুরুষাবতার* আদি বিভিন্ন অবতারে নিজেকে বিস্তার করেন। তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজগোপীরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। সেই সমস্ত কান্তাগণ তাঁর অংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিষ্ণুরূপের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই কান্তারূপের বিস্তার হয়। আদি রূপ থেকে এই বিস্তৃতিকে বিম্ব ও প্রতিবিম্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আদি রূপের সঙ্গে প্রতিবিম্বিত রূপের কোন পার্থক্য নেই। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির কান্তারূপের প্রতিবিম্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং নিজেকে বিস্তার করেন তখন তাঁকে বলা হয় *বৈভব-বিলাস* ও *বৈভব-প্রকাশ*। শ্রীমতী রাধারাণীর বিস্তারও তেমনভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর *বৈভব-বিলাস* এবং দ্বারকার মহিষীগণ হচ্ছেন তাঁর *বৈভব-প্রকাশ*। রাধারাণীর সখীরা বা ব্রজাঙ্গনারা হচ্ছেন তাঁর নিজের কায়ব্যূহ। তাঁর অপ্রাকৃত বিস্তাররূপে ব্রজাঙ্গনারা শ্রীমতী রাধারাণীর পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন। চিৎ-জগতে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পূর্ণরূপে আনন্দ আস্বাদন হয়। শ্রীমতী রাধারাণীর মতো বহু কান্তা, যাঁরা গোপী বা সখী নামে পরিচিত, তাঁদের সঙ্গ প্রভাবে অপ্রাকৃত রস বর্ধিত হয়। বহু কান্তার বৈচিত্র্যই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের উৎস এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিকে বর্ধিত করার জন্য রাধারাণীর এই সমস্ত বিস্তার প্রয়োজন। তাঁদের অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় বৃন্দাবন লীলার পরম উৎকর্ষ। শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর এই কায়ব্যূহ বিস্তারের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে *রাসনৃত্য* ও সেরূপ লীলাবিলাসের আনন্দ আস্বাদন করান। *রাসলীলা* রূপ পুষ্পের মধ্যবর্তী দল হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত নামগুলির দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ৮২

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী ।
গোবিন্দসর্বস্ব, সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীগোবিন্দের আনন্দদায়িনী এবং তিনি গোবিন্দের মোহিনীও। তিনি শ্রীগোবিন্দের সর্বস্ব এবং সমস্ত কান্তাদের শিরোমণি।

শ্লোক ৮৩

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৮৩ ॥

দেবী—জ্যোতির্ময়ী; **কৃষ্ণময়ী**—শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন; **প্রোক্তা**—বলা হয়; **রাধিকা**—শ্রীমতী রাধারাণী; **পর-দেবতা**—পরম আরাধ্যা; **সর্ব-লক্ষ্মীময়ী**—সমস্ত লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠাত্রী; **সর্বকান্তিঃ**—সমস্ত কান্তি বা শোভা যাঁর মধ্যে রয়েছে; **সম্মোহিনী**—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত মোহিত করেন; **পরা**—চিৎ-শক্তি।

অনুবাদ

"পরদেবতা শ্রীমতী রাধারাণী সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণময়ী', 'সর্ব-লক্ষ্মীময়ী', 'সর্বকান্তি', 'কৃষ্ণ-সম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলে কথিত হয়েছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বৃহদ্‌গৌতমীয়-তন্ত্র* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৮৪

'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী ।
কিম্বা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

'দ্যুতিবিশিষ্টা ও পরমা সুন্দরী' বলে, কিংবা 'কৃষ্ণপূজারূপ যে ক্রীড়া তার বসতিস্থান' বলে তিনি 'দেবী'।

শ্লোক ৮৫

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে ।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

'যাঁর অন্তরে ও বাইরে সর্বত্রই কৃষ্ণ বিরাজ করেন', তিনিই 'কৃষ্ণময়ী'। তিনি যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন, সেখানেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৮৬

কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

অথবা 'কৃষ্ণময়ী' অর্থ হচ্ছে তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ, কেন না তিনি প্রেমরসময়। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণময়ী শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত, যিনি অন্তরে ও বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং যেখানেই তিনি যান না কেন এবং যা কিছুই তিনি দেখেন না কেন, যিনি সব সময় কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই স্মরণ করেন, তিনিই *কৃষ্ণময়ী*। আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়, তাই তাঁর প্রেমের প্রকাশ ও শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর থেকে অভিন্ন হওয়ায় তাঁর একটি নাম *কৃষ্ণময়ী*।

শ্লোক ৮৭

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে ।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর আরাধনা হচ্ছে কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তি। তাই, পুরাণে তাঁকে 'রাধিকা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তাৎপর্য

রাধা নামটি প্রকাশিত হয়েছে *আরাধনা* শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে 'উপাসনা করা'। যিনি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠা, তাঁরই নাম রাধিকা।

শ্লোক ৮৮

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৮৮ ॥

অনয়া—এই এক জনের দ্বারা; **আরাধিতঃ**—আরাধিত; **নূনম্**—অবশ্যই; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **যৎ**—যাঁর থেকে; **নঃ**—আমাদের; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **গোবিন্দঃ**—গোবিন্দ; **প্রীতঃ**—প্রীত; **যাম্**—যাঁকে; **অনয়ৎ**—নিয়ে গিয়েছেন; **রহঃ**—নির্জন স্থানে।

অনুবাদ

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই তাঁর দ্বারা আরাধিত হয়েছেন। তাই গোবিন্দ তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে, আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে, তাঁকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩০/২৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৯

অতএব সর্বপূজ্যা, পরম-দেবতা।
সর্বপালিকা, সর্ব-জগতের মাতা ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন পরম দেবতা এবং তিনি সকলের পূজনীয়া। তিনি সকলের পালিকা এবং সমস্ত জগতের মাতা।

শ্লোক ৯০

'সর্বলক্ষ্মী'-শব্দ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি ইতিমধ্যেই 'সর্বলক্ষ্মী' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন সমস্ত লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠান।

শ্লোক ৯১

কিম্বা, 'সর্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্বশক্তিবর্য ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

অথবা 'সর্বলক্ষ্মী' শব্দে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্যের মূর্ত প্রকাশ। তাই, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পরমা শক্তি।

শ্লোক ৯২

সর্ব-সৌন্দর্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

'সর্বকান্তি' শব্দে ব্যক্ত হয়েছে যে, সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত কান্তি তাঁর শরীরে বিরাজ করে। সমস্ত লক্ষ্মীগণ তাঁদের সৌন্দর্য তাঁর থেকেই লাভ করেন।

শ্লোক ৯৩

কিংবা 'কান্তি'-শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

'কান্তি' শব্দে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছাকেও বোঝানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ইচ্ছা শ্রীমতী রাধারাণীতে বিরাজ করে।

শ্লোক ৯৪

রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্বকান্তি'-শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সেটিই হচ্ছে 'সর্বকান্তি' শব্দের অর্থ।

শ্লোক ৯৫

জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগৎকে মোহিত করেন, কিন্তু শ্রীরাধা সেই জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণকেও মোহিত করেন। তাই তিনি সমস্ত দেবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা।

শ্লোক ৯৬

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ শক্তিমান। তাঁদের দুজনের মধ্যে কোন ভেদ নেই, এই কথা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

শ্লোক ৯৭

মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ ।
অগ্নি, জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

কস্তুরী ও তার গন্ধ যেমন অভিন্ন, অগ্নি ও তার উত্তাপ যেমন অভিন্ন, তেমনই তাঁরা উভয়ে অভিন্ন।

শ্লোক ৯৮

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এক, তবুও লীলারস আস্বাদন করার জন্য তাঁরা দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন।

শ্লোক ৯৯-১০০

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি ।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি' ॥ ৯৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার ।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেম ও ভক্তির শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব ও কান্তি অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এভাবেই আমি পঞ্চম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি।

শ্লোক ১০১

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমে আমি সেই শ্লোকের আভাস বর্ণনা করব।

শ্লোক ১০২

অবতরি' প্রভু প্রচারিল সংকীর্তন ।
এহো বাহ্য হেতু, পূর্বে করিয়াছি সূচন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্তন প্রচার করলেন। সেই কারণটি যে বাহ্য, তা আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১০৩

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের একটি মুখ্য কারণ রয়েছে। সেটি হচ্ছে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব কার্য।

শ্লোক ১০৪

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার ।
দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার তিনটি অতি গূঢ় কারণ রয়েছে। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তা প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ১০৫

স্বরূপ-গোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাই তিনি মহাপ্রভুর এই সমস্ত প্রসঙ্গ জানেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য নামক জনৈক নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করার বাসনা করেন। তাই তিনি গৃহত্যাগ করে বারাণসীতে যান এবং জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য-আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি যখন ব্রহ্মচর্য-আশ্রম অবলম্বন করেন, তখন তাঁর নাম হয় শ্রীদামোদর স্বরূপ। তার অল্পকাল পরে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ না করেই তিনি বারাণসী পরিত্যাগ করেন এবং নীলাচলে জগন্নাথপুরীতে যান। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে অবস্থান করছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং মহাপ্রভুর সেবায় তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত সচিব ও নিত্য পার্ষদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে উপযুক্ত গান গেয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আনন্দ দান করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা খুব পছন্দ করতেন। স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের গূঢ় কারণ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং তাঁর কৃপাতেই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা মহাপ্রভুর অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছেন।

শ্রীস্বরূপ দামোদরকে রাধারাণীর দ্বিতীয় প্রকাশ ব্রজের ললিতাদেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কবিকর্ণপূরের প্রামাণিক *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* ১৬০ শ্লোকে স্বরূপ দামোদরকে গোলোক বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণা বিশাখাদেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বুঝতে হবে যে, শ্রীস্বরূপ দামোদর হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর সাক্ষাৎ প্রকাশ, যিনি মহাপ্রভুকে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব আস্বাদন করতে সাহায্য করেন।

শ্লোক ১০৬

রাধিকার ভাব-মূর্তি প্রভুর অন্তর ।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবমূর্তি। এভাবেই নিরন্তর সুখ-দুঃখের অনুভূতি উদয় হয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর ছিল শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে পূর্ণ এবং তাঁর রূপ ছিল রাধারাণীর মতন। স্বরূপ দামোদর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভাবকে *রাধাভাবমূর্তি* বলে বর্ণনা করেছেন। জড়-জাগতিক সুখভোগে লিপ্ত মানুষ কখনই *রাধাভাব* হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হলেই কেবল তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *রাধাভাব* অবগত হতে হয় সর্বতোভাবে জিতেন্দ্রিয় গোস্বামীদের কাছ থেকে। তাঁদের কাছ থেকেই যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরের ভাব হচ্ছে মাধুর্য প্রেমের পরম পূর্ণতা এবং এই মাধুর্য প্রেম হচ্ছে পাঁচটি অপ্রাকৃত রসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণপ্রেমের সর্বোত্তম প্রকাশ।

এই সমস্ত অপ্রাকৃত লীলাবিলাস দুটি স্তরে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তার একটি হচ্ছে উত্তম আর অপরটি হচ্ছে পরম উত্তম। দ্বারকায় যে প্রেম প্রদর্শিত হয়েছে তা উত্তম এবং ব্রজপ্রেম হচ্ছে পরম উত্তম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অবশ্যই পরম উত্তম বা 'অধিরূঢ় মহাভাব'।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত চরিতামৃত পর্যালোচনা করলে বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত বুঝতে পারবেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে তিনি অন্তরে সর্বক্ষণ কি গভীর বিরহ অনুভব করতেন। এই ধরনের বিরহকাতর অবস্থায় তিনি কখনও কখনও অনুভব করতেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগ করছেন। এই বিরহ ও মিলনের তাৎপর্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অনন্য বিপ্রলম্ভ রসের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে না জেনে, জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর অধিরূঢ় মহাভাবকে বুঝবার চেষ্টা করে, তারা কখনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে। তা না হলে ভ্রান্তিবশত মহাপ্রভুকে *নাগর* বা *গোপীজনবল্লভ* বলে মনে হতে পারে। এভাবেই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করার ফলে *রসাভাস* হয়।

শ্লোক ১০৭

শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ ।
ভ্রমময় চেষ্টা, আর প্রলাপময় বাদ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর লীলার শেষভাগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ হয়েছিলেন। তখন তাঁর আচরণ ছিল ভ্রমপূর্ণ এবং তাঁর বাক্যালাপ ছিল প্রলাপময়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-বিরহ জনিত সর্বোচ্চ ভাব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সেই দিব্য অবস্থা অত্যন্ত মাধুর্যমণ্ডিত, কিন্তু জড়বাদীরা তা বুঝতে পারে না। কখনও কখনও জড় পণ্ডিতেরা মনে করে যে, তিনি ছিলেন রোগগ্রস্ত বা উন্মাদ। এই সমস্ত পণ্ডিতদের সমস্যা হচ্ছে যে, তারা সর্বদাই জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং তাই তারা কখনও ভক্ত ও ভগবানের অনুভূতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে না। জড়বাদীদের মনোভাব অত্যন্ত জঘন্য। তারা মনে করে যে, স্থূল জড় জগৎ যেমন তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কেন্দ্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত কার্যকলাপও তেমন তাদের জড় বুদ্ধির বিকৃত বিচারের অধীন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ আচার্যদের মাধ্যমেই কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। *নদীয়া-নাগরী* ও অন্যান্য অপসম্প্রদায়ের মতবাদ কখনই স্বরূপ দামোদর বা ষড়্‌গোস্বামীদের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। *গৌরাঙ্গ-নাগরী* আদি অপসম্প্রদায়গুলির মতবাদ হচ্ছে কতকগুলি বিষয়াসক্ত ভোগীর মনগড়া ধারণা।

শ্লোক ১০৮

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে ।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

উদ্ধবকে দর্শন করে শ্রীমতী রাধারাণী যে ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত থাকতেন।

তাৎপর্য

যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত, তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, *বিপ্রলম্ভ* ভাবে তাঁর কৃষ্ণ-আরাধনা হচ্ছে প্রকৃত ভগবৎ-আরাধনা। বিরহের অনুভূতি যখন অত্যন্ত তীব্র হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের স্তর লাভ হয়।

তথাকথিত *সহজিয়ারা* সহজভাবে কল্পনা করে যে, তারা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই ধরনের কল্পনা তাদের কাছে লাভজনক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদর্শিত *বিপ্রলম্ভ* ভাবের মাধ্যমেই সম্ভব।

শ্লোক ১০৯

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি' ।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

রাত্রিবেলায় তিনি স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠ ধরে প্রলাপ করতেন। অপ্রাকৃত প্রেমোন্মাদনায় তাঁর হৃদয় উজাড় করে তিনি তাঁর ভাব ব্যক্ত করতেন।

শ্লোক ১১০

যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর ।
সেই গীতি-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হত, স্বরূপ দামোদর তখন সেই ভাব অনুসারে গান গেয়ে অথবা শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁকে আনন্দ দান করতেন।

শ্লোক ১১১

এবে কার্য নাহি কিছু এসব বিচারে ।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

এখন এগুলি বিচার করার প্রয়োজন নেই। পরে আমি বিস্তারিতভাবে সেগুলি বর্ণনা করব।

শ্লোক ১১২

পূর্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম ।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতিমর্ম ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ তিনটি বিভিন্ন বয়সে লীলা প্রদর্শন করেছিলেন। এই তিনটি বয়স হচ্ছে কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। তন্মধ্যে তাঁর কৈশোরলীলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শ্লোক ১১৩

বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল ।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

বাৎসল্য ভাবে পিতা-মাতার স্নেহ তাঁর কৌমারলীলাকে সফল করেছে। আর তাঁর পৌগণ্ডলীলা সফল হয়েছে সখাদের সাহচর্যে।

শ্লোক ১১৪

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস ।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্যাস ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৈশোরে তিনি রাধিকা প্রমুখ ব্রজগোপিকাদের নিয়ে রাসনৃত্য আদি লীলাবিলাস করে প্রাণভরে সমস্ত রসের নির্যাস আস্বাদন করলেন।

শ্লোক ১১৫

কৈশোর-বয়সে কাম, জগৎসকল ।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্যের মতো প্রেমময়ী লীলাবিলাসের মাধ্যমে স্বীয় কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর সহ সমস্ত জগৎ সফল করলেন।

শ্লোক ১১৬

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১১৬ ॥

সঃ—তিনি; অপি—বিশেষভাবে; কৈশোরক-বয়ঃ—কিশোর বয়স; মানয়ন্—সম্মান করেছিলেন; মধু-সূদনঃ—মধু নামক দৈত্যের সংহারক; রেমে—উপভোগ করেছিলেন; স্ত্রীরত্ন—গোপিকাদের; কূট—সমূহ; স্থঃ—অবস্থিত; ক্ষপাসু—শরৎকালের রাত্রে; ক্ষপিত-অহিতঃ—দুর্ভাগ্য বিনাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সে শারদ-রজনীতে রত্নসদৃশ গোপাঙ্গনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বিশেষ লীলাবিলাসের মাধ্যমে তাঁর কৈশোর বয়সকে সম্মান করেছিলেন। এভাবেই তিনি সমস্ত জগতের দুর্ভাগ্য নাশ করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণু পুরাণ* (৫/১৩/৬০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৭

বাচা সূচিতশর্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ১১৭ ॥

বাচা—বাক্যের দ্বারা; সূচিত—প্রকাশ করে; শর্বরী—রাত্রির; রতি—রতিবিলাস; কলা—অংশের; প্রাগল্‌ভ্যয়া—প্রণয়-চাতুর্য; রাধিকাম্—শ্রীমতী রাধারাণী; ব্রীড়া—লজ্জাবশত; কুঞ্চিত-লোচনাম্—মুদ্রিত নয়ন; বিরচয়ন্—করেছিলেন; অগ্রে—সম্মুখে; সখীনাম্—তাঁর সখীদের; অসৌ—সেই; তৎ—তাঁর; বক্ষঃ-রুহ—বক্ষে; চিত্র-কেলি—বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলাসমূহের দ্বারা; মকরী—মকর আদি চিত্র অঙ্কন করে; পাণ্ডিত্য—চাতুর্য; পারম্—সীমা; গতঃ—যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন; কৈশোরম্—কৈশোর; সফলী-করোতি—সফল করেন; কলয়ন্—করে; কুঞ্জে—কুঞ্জে; বিহারম্—বিহার; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

"এই কৃষ্ণ প্রগল্‌ভতা সহকারে সখীদের সামনে পূর্ব রজনীর প্রণয়ক্রীড়া বর্ণনা করলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর নয়নদ্বয় মুদ্রিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর বক্ষোপরে মকর আদি চিত্র অঙ্কন করে বিশেষ চাতুর্য প্রকাশ করেছিলেন। এই রকম রসক্রীড়ার দ্বারা কুঞ্জে বিহার করে হরি তাঁর কৈশোর বয়স সার্থক করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/১/২৩১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১১৮

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্য-
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥ ১১৮ ॥

হরিঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; এষঃ—এই; ন—না; চেৎ—যদি; অবাতরিষ্যৎ—অবতরণ করতেন; মথুরায়াম্—মথুরায়; মধুরাক্ষি—হে মধুরাক্ষি; রাধিকা—শ্রীমতী রাধিকা; চ—এবং; অভবিষ্যৎ—হতেন; ইয়ম্—এই; বৃথা—বৃথা; বিসৃষ্টিঃ—সমস্ত সৃষ্টি; মকর-অঙ্কঃ—কামদেব; তু—তা হলে; বিশেষতঃ—বিশেষভাবে; তদা—তখন; অত্র—এতে।

অনুবাদ

"হে মধুরাক্ষি! যদি মথুরায় শ্রীহরি ও রাধিকা প্রকট না হতেন, তা হলে এই সমস্ত সৃষ্টি, বিশেষ করে প্রেমের দেবতা কামদেব বিফল হতেন।"

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী কৃত *বিদগ্ধমাধবে* (৭/৫) এটি বৃন্দাদেবীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি।

শ্লোক ১১৯-১২০

এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন ।
যদ্যপি করিল রস-নির্যাস-চর্বণ ॥ ১১৯ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত রসের আধার শ্রীকৃষ্ণ যদিও মধুর রসের নির্যাস আস্বাদন করেছিলেন, তবুও তাঁর তিনটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২১

তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান ।
কৃষ্ণ কহে,—'আমি হই রসের নিদান ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর প্রথম অভিপ্রায়টি আমি ব্যাখ্যা করব। কৃষ্ণ বললেন, "আমিই হচ্ছি সমস্ত রসের কারণ।

শ্লোক ১২২

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব ।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি পূর্ণ আনন্দময় এবং চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। কিন্তু রাধিকার প্রেম আমাকে উন্মত্ত করে।

শ্লোক ১২৩

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"রাধারাণীর প্রেমে যে কত শক্তি আছে, তা আমি জানি না। সেই প্রেম আমাকে সর্বদা বিহুল করে।

শ্লোক ১২৪

রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট ।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"রাধিকার প্রেম আমার গুরু, আর আমি তার শিষ্য নট। তার প্রেম আমাকে সর্বদা উদ্ভট নৃত্যে প্রবৃত্ত করে।"

শ্লোক ১২৫

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ ।
তং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্তয়ন্তী স্ব-পশ্চাৎ ॥ ১২৫ ॥

কস্মাৎ—কোথা থেকে; বৃন্দে—হে বৃন্দে; প্রিয়সখি—হে প্রিয়সখি; হরেঃ—ভগবান শ্রীহরির; পাদ-মূলাৎ—পাদমূল থেকে; কুতঃ—কোথায়; অসৌ—সেই (শ্রীকৃষ্ণ); কুণ্ড-অরণ্যে—রাধাকুণ্ডের তীরবর্তী অরণ্যে; কিম্—কি; ইহ—এখানে; কুরুতে—তিনি করেন; নৃত্য-শিক্ষাম্—নৃত্যশিক্ষা; গুরুঃ—গুরু; কঃ—কে; তম্—তাঁকে; ত্বৎ-মূর্তিঃ—তোমার মূর্তি; প্রতি-তরু-লতাম্—প্রতি তরুলতায়; দিক্-বিদিক্ষু—সমস্ত দিকে; স্ফুরন্তী—স্ফুরিত হয়; শৈলূষী—দক্ষ নটী; ইব—মতন; ভ্রমতি—ভ্রমণ করেন; পরিতঃ—চতুর্দিকে; নর্তয়ন্তী—নৃত্য করছেন; স্ব-পশ্চাৎ—স্বীয় পশ্চাতে।

অনুবাদ

"হে প্রিয়সখি বৃন্দে, তুমি কোথা থেকে আসছ?"
"আমি শ্রীহরির পাদমূল থেকে আসছি।"
"তিনি কোথায়?"
"রাধাকুণ্ডের তীরবর্তী অরণ্যে।"
"তিনি সেখানে কি করছেন?"
"তিনি নৃত্যশিক্ষা করছেন।"
"তাঁর নৃত্যশিক্ষার গুরু কে?"
"তোমারই মূর্তি রাধা, যা প্রতিটি তরুলতায় মূর্ত হয়ে উৎকৃষ্ট নটীর মতো নৃত্য করছে এবং পিছনে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করতে বাধ্য করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত *গোবিন্দ-লীলামৃত* (৮/৭৭) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১২৬

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ ।
তাহা হ'তে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি আমার প্রেম থেকে আমি যে আনন্দ আস্বাদন করি, তা থেকে কোটিগুণ অধিক আনন্দ রাধারাণী আমার প্রতি তার প্রেম থেকে আস্বাদন করে থাকে।

শ্লোক ১২৭

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয় ।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্মময় ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়, রাধার প্রেমও তেমনই সর্বদাই বিরুদ্ধ-ধর্মময়।

শ্লোক ১২৮

রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি ।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"রাধার প্রেম সর্বব্যাপ্ত, এই প্রেম বর্ধিত হওয়ার কোন স্থান নেই। তবুও তা নিরন্তর বর্ধিত হয়।

শ্লোক ১২৯

যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত ।
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব-বর্জিত ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর প্রেমের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নেই, কিন্তু তবুও তাঁর প্রেমে গর্ব নেই। সেটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ।

শ্লোক ১৩০

যাহা হৈতে সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর ।
তথাপি সর্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর প্রেমের থেকে সুনির্মল আর কিছু নেই, কিন্তু তাঁর ব্যবহার সর্বদাই বাম্য ও বক্র।"

শ্লোক ১৩১

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্যয়া বিহীনঃ ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥ ১৩১ ॥

বিভুঃ—সর্বব্যাপ্ত; অপি—যদিও; কলয়ন্—ধারণ করে; সদা—সর্বদা; অভিবৃদ্ধিম্—বর্ধনশীল; গুরুঃ—গুরুত্বপূর্ণ; অপি—যদিও; গৌরব-চর্যয়া বিহীনঃ—গৌরবান্বিত আচরণবিহীন; মুহুঃ—বারংবার; উপচিত—বর্ধিত; বক্রিমা—কুটিল; অপি—যদিও; শুদ্ধঃ—শুদ্ধ; জয়তি—জয় হোক; মুরদ্বিষি—মুর নামক দৈত্যের সংহারকারী বা মুরারির জন্য; রাধিকা—শ্রীমতী রাধারাণীর; অনুরাগঃ—প্রেম।

অনুবাদ

"মুর নামক দৈত্যের সংহারক বা মুরারি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম যদিও সর্বব্যাপ্ত, তবুও তা সর্বদা বর্ধনশীল। যদিও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবুও তা গৌরবান্বিত আচরণবিহীন। আর যদিও তা নির্মল, তবুও তা নিরন্তর বক্রতাবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এই প্রকার অনুরাগ জয়যুক্ত হোক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত *দানকেলি-কৌমুদী* (২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩২

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়' ।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীরাধিকা হচ্ছেন সেই প্রেমের পরম 'আশ্রয়' এবং আমি হচ্ছি সেই প্রেমের একমাত্র 'বিষয়'।

শ্লোক ১৩৩

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বিষয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করি। কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণী আশ্রয়জাতীয় আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই আনন্দ আমার আনন্দ থেকে কোটি গুণ অধিক সুখ প্রদান করে।

শ্লোক ১৩৪

আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় ।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করার জন্য আমার মন আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি তা আস্বাদন করতে পারি না। কি উপায়ে আমি তা আস্বাদন করতে পারি?

শ্লোক ১৩৫

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যদি কখনও এই প্রেমের আশ্রয় হতে পারি, তখনই কেবল এই প্রেমানন্দ আমি অনুভব করতে পারব।"

তাৎপর্য

বিষয় ও *আশ্রয়* শব্দদুটি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তকে বলা হয় *আশ্রয়* এবং তাঁর প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ হচ্ছেন *বিষয়*। *আশ্রয়* ও *বিষয়ের* মধ্যে প্রেম বিনিময়ের ক্ষেত্রে *বিভাব*, *অনুভাব*, *সাত্ত্বিক* ও *ব্যভিচারী*—এই চার প্রকার সামগ্রী রয়েছে। *বিভাব* দুই প্রকার—*আলম্বন* ও *উদ্দীপন*। *আলম্বন* আবার দুই প্রকার—*বিষয়* ও *আশ্রয়*। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণীর অপ্রাকৃত প্রেমের *আশ্রয়* রাধিকা এবং প্রেমের একমাত্র *বিষয়* কৃষ্ণ। ভগবান তাঁর চিন্ময় চেতনায় বিচার করেন, "আমি কৃষ্ণ এবং আমি *বিষয়* রূপে আনন্দ আস্বাদন করি। কিন্তু *আশ্রয়* রূপে শ্রীমতী রাধারাণী যে আনন্দ আস্বাদন করেন, তা আমার আনন্দ অপেক্ষা কোটি গুণ বেশি।" তাই, *আশ্রয়* জাতীয় আনন্দ আস্বাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ১৩৬

এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী ।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্‌ধকি ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেম আস্বাদন করার জন্য কৌতূহলী হন। সেই অপ্রাকৃত প্রেম আস্বাদন করার প্রবল বাসনা তাঁর হৃদয়ে বর্ধিত হয়ে বিস্তার লাভ করে।

শ্লোক ১৩৭

এই এক, শুন আর লোভের প্রকার ।
স্বমাধুর্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেটি এক প্রকার লোভ। এখন দয়া করে অন্য প্রকার লোভের কথা শ্রবণ কর। তাঁর নিজের মাধুর্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করেন—

শ্লোক ১৩৮

অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা ।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মধুরিমা অদ্ভুত, অনন্ত ও পূর্ণ। ত্রিজগতের কেউই তার সীমানার সন্ধান পায় না।

শ্লোক ১৩৯

এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি ।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীরাধিকা তাঁর প্রেমের বলে একাকী আমার সমস্ত অমৃত-মাধুরী আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১৪০

যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও রাধারাণীর প্রেম দর্পণের মতো নির্মল, তবুও তার স্বচ্ছতা প্রতিক্ষণে বর্ধিত হয়।

শ্লোক ১৪১

আমার মাধুর্য নাহি বাড়িতে অবকাশে ।
এ-দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মাধুর্যেরও বর্ধিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই, তবুও তা এই দর্পণের সম্মুখে নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়।

শ্লোক ১৪২

মন্মাধুর্য রাধার প্রেম—দোঁহে হোড় করি' ।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মাধুর্য এবং শ্রীরাধার প্রেমদর্পণের মধ্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলছে। তারা উভয়েই ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিত হয়, কিন্তু দুজনের মধ্যে কেউই পরাজিত হয় না।

শ্লোক ১৪৩

আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয় ।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মাধুর্য চিরনবীন। তাদের স্বীয় প্রেম অনুসারে ভক্তরা তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আস্বাদন করে।

শ্লোক ১৪৪

দর্পণাদ্যে দেখি' যদি আপন মাধুরী ।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যখন দর্পণে স্বীয় মাধুর্য দর্শন করি, তখন তা আস্বাদন করার জন্য আমার লোভ জন্মায়, কিন্তু আমি তা আস্বাদন করতে পারি না।

শ্লোক ১৪৫

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায় ।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যখন আমি তা আস্বাদন করার উপায় উদ্ভাবন করার চেষ্টা করি, তখন আমার রাধিকাস্বরূপ হতে মন চায়।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ অদ্ভুত ও অনন্ত। কেউই তার অন্ত খুঁজে পায় না। আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীমতী রাধারাণীই কেবল তা পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীমতী রাধারাণীর অপ্রাকৃত প্রেমের দর্পণ সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণকে জানার অপ্রাকৃত পন্থায় তা স্বচ্ছতর থেকে স্বচ্ছতম হয়ে ওঠে। শ্রীমতী রাধারাণীর হৃদয়-দর্পণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নব নব রূপে নিত্য প্রকাশিত হন। পক্ষান্তরে, শ্রীমতী রাধারাণীকে জানার মাত্রা অনুসারে

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ বর্ধিত হয়। প্রত্যেকেই পরস্পরকে অতিক্রম করার বাসনা করেন। প্রেমমাধুর্য বর্ধিত হওয়ার দ্বন্দ্বে কেউই পরাজিত হতে চান না। সেই ক্রমবর্ধমান প্রেমমাধুর্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ১৪৬

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৬ ॥

অপরিকলিত—অনাস্বাদিত; **পূর্বঃ**—পূর্বে; **কঃ**—কে; **চমৎকার-কারী**—বিস্ময় উৎপাদনকারী; **স্ফুরতি**—প্রকাশ করে; **মম**—আমার থেকে; **গরীয়ান্**—মহান; **এষঃ**—এই; **মাধুর্য-পূরঃ**—অপরিমিত মাধুর্য; **অয়ম্**—এই; **অহম্**—আমি; **অপি**—এমন কি; **হন্ত**—হায়; **প্রেক্ষ্য**—দর্শন করে; **যম্**—যা; **লুব্ধ-চেতাঃ**—আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয়; **স-রভসম্**—বলপূর্বক; **উপভোক্তুম্**—উপভোগ করার জন্য; **কাময়ে**—বাসনা করি; **রাধিকা ইব**—শ্রীমতী রাধারাণীর মতো।

অনুবাদ

"এক অনাস্বাদিত মাধুর্য যা প্রতিটি মানুষকেই চমৎকৃত করে, তা আমার থেকে অধিক কে প্রকাশ করে? হায়, এই মধুরিমা অবলোকন করে আমার চেতনা প্রলুব্ধ হয় এবং শ্রীমতী রাধারাণীর মতো বলপূর্বক সেই রূপমাধুরী আস্বাদন করতে আমি বাসনা করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত *ললিত-মাধব* (৮/৩৪) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বারকায় লীলা-বিলাসকালে মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্বের রূপমাধুরী দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উক্তি করেছিলেন।

শ্লোক ১৪৭

কৃষ্ণমাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল ।
কৃষ্ণআদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীর একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, যা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে সকলকেই চঞ্চল করে।

শ্লোক ১৪৮

শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর বা বংশীধ্বনি শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুপম রূপমাধুরী দর্শন করে সকলের মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁর এই মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য সচেষ্ট হন।

শ্লোক ১৪৯

এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে ।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই অমৃতোপম মাধুর্য পান করে তৃষ্ণা কখনও নিবারিত হয় না, পক্ষান্তরে সেই তৃষ্ণা নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৫০

অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন ।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা তখন অতৃপ্ত হয়ে ব্রহ্মার নিন্দা করে বলেন যে, তিনি সৃষ্টিকার্যে অনভিজ্ঞ, তাই যথাযথভাবে সেই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি।

শ্লোক ১৫১

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই ।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপমাধুরী দর্শন করার জন্য কোটি নেত্র না দিয়ে ব্রহ্মা কেবলমাত্র দুটি নেত্র দিয়েছেন এবং তাতে আবার পলক পড়ে। তা হলে কিভাবে আমি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের অনুপম রূপ দর্শন করব?

শ্লোক ১৫২

অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ১৫২ ॥

অটতি—গমন কর; **যৎ**—যখন; **ভবান্**—তুমি; **অহ্নি**—দিনের বেলা; **কাননম্**—বনে; **ত্রুটিঃ**—অর্ধ নিমেষ; **যুগায়তে**—এক যুগের মতো মনে হয়; **ত্বাম্**—তোমার; **অপশ্যতাম্**—

দেখতে না পেয়ে; **কুটিল-কুন্তলম্**—কুঞ্চিত কেশদাম শোভিত; **শ্রীমুখম্**—সুন্দর মুখমণ্ডল; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **জড়ঃ**—মূঢ়; **উদীক্ষতাম্**—অবলোকন করি; **পক্ষ্মকৃৎ**—পলকস্রষ্টা বিধাতা; **দৃশাম্**—নয়নের।

অনুবাদ

[গোপিকারা বললেন—] "হে কৃষ্ণ! দিনের বেলা তুমি যখন বনে গমন কর, তখন কুঞ্চিত কেশদাম শোভিত তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করতে না পেরে অর্ধ নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হয়। তখন আমরা যে চোখ দিয়ে তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল অবলোকন করি, তাতে পলক সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মাকে মূঢ় বলে নিন্দা করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/১৫) থেকে উদ্ধৃত ব্রজগোপিকাদের একটি উক্তি।

শ্লোক ১৫৩

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি ।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ১৫৩ ॥

গোপ্যঃ—গোপিকাগণ; **চ**—এবং; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **উপলভ্য**—দর্শন করে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল পরে; **অভীষ্টম্**—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু; **যৎ-প্রেক্ষণে**—যাঁর দর্শনে; **দৃশিষু**—চক্ষে; **পক্ষ্ম-কৃতম্**—পলক সৃষ্টিকারী; **শপন্তি**—অভিশাপ দেন; **দৃগ্‌ভিঃ**—দৃষ্টির দ্বারা; **হৃদীকৃতম্**—যিনি হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলেন; **অলম্**—যথেষ্ট; **পরিরভ্য**—আলিঙ্গন করে; **সর্বাঃ**—সকলে; **তৎ-ভাবম্**—সেই সর্বোত্তম আনন্দের স্তর; **আপুঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **অপি**—যদিও; **নিত্য-যুজাম্**—সিদ্ধ যোগীদের দ্বারা; **দুরাপম্**—দুর্লভ।

অনুবাদ

"দীর্ঘ বিরহের পর ব্রজগোপিকারা কুরুক্ষেত্রে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টির মাধ্যমে কৃষ্ণকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং নিবিড়ভাবে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তার ফলে যে পরম ভাব তাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সিদ্ধ যোগীদেরও দুর্লভ। ব্রজগোপিকারা তখন তাঁদের কৃষ্ণদর্শনে বাধা প্রদানকারী চোখের পলক সৃষ্টি করার জন্য বিধাতাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮২/৩৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৪

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্র ফল নাহি আন ।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা ব্যতীত চোখের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তিনি সব চাইতে ভাগ্যবান।

শ্লোক ১৫৫

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ১৫৫ ॥

অক্ষণ্বতাম্—যাদের চোখ আছে তাদের; **ফলম্**—ফল; **ইদম্**—এই; **ন**—না; **পরম্**—অন্য; **বিদামঃ**—আমরা জানি; **সখ্যঃ**—হে সখীগণ; **পশূন্**—গাভীগণ; **অনুবিবেশয়তোঃ**—বন থেকে বনান্তরে প্রবেশ করে; **বয়স্যৈঃ**—সমবয়সী সখাদের সঙ্গে; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **ব্রজ-ঈশ**—নন্দ মহারাজের; **সুতয়োঃ**—পুত্রদ্বয়ের; **অনুবেণু-জুষ্টম্**—বেণুগীতযুক্ত; **যৈঃ**—যাঁর দ্বারা; **বা**—অথবা; **নিপীতম্**—পান করেন; **অনুরক্ত**—অনুরাগযুক্ত; **কটাক্ষ-মোক্ষম্**—কটাক্ষকারী।

অনুবাদ

(গোপিকারা বললেন—) "হে সখীগণ! নন্দ মহারাজের দুই পুত্র যখন গাভী ও সখা পরিবৃত হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এবং তাঁদের প্রিয় ব্রজবাসীদের প্রতি কটাক্ষপাত করতে করতে বনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সুন্দর মুখমণ্ডল যাঁরা দর্শন করেন তাঁরা ধন্য। কারণ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের পক্ষে তার থেকে দর্শনীয় বস্তু আর কিছু নেই।"

তাৎপর্য

কেউ যদি যথার্থ সৌভাগ্যবান হন, তা হলে তিনিও গোপিকাদের মতো নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত নয়নে ভক্তরা নিরন্তর শ্যামসুন্দরকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তাঁদের হৃদয়ে দর্শন করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২১/৭) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি 'শরতের আগমন' নামক অধ্যায়ে গোপিকাদের উক্তি।

শ্লোক ১৫৬

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৫৬ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; তপঃ—তপশ্চর্যা; **কিম্**—কি; **অচরন্**—আচরণ করেছিলেন; **যৎ**—যার থেকে; **অমুষ্য**—এমন এক জনের (শ্রীকৃষ্ণের); **রূপম্**—রূপ; **লাবণ্য-সারম্**—মাধুর্যের নির্যাস; **অসম-ঊর্ধ্বম্**—যাঁর সমান বা যাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই; **অনন্য-সিদ্ধম্**—যিনি অন্য অলংকারাদির দ্বারা সিদ্ধ নন (স্বতঃসিদ্ধ); **দৃগ্ভিঃ**—চক্ষুর দ্বারা; **পিবন্তি**—পান করেন; **অনুসব-অভিনবম্**—চিরনবীন; **দুরাপম্**—দুর্লভ; **একান্ত-ধাম**—একমাত্র আশ্রয়; **যশসঃ**—যশের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্যের; **ঐশ্বরস্য**—ঐশ্বর্যের।

অনুবাদ

(মথুরার পুরনারীরা বললেন—) "আহা! ব্রজগোপিকারা কি তপস্যাই করেছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, অসমোর্ধ্ব সমস্ত লাবণ্যের সারস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের অমৃত তাঁরা তাঁদের নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১০/৪৪/১৪) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি কংসের রঙ্গভূমিতে মুষ্টিক ও চাণূর নামক দুই দুর্ধর্ষ মল্লযোদ্ধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে মথুরার পুরনারীদের উক্তি।

শ্লোক ১৫৭

অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব তার বল ।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অপূর্ব এবং তাঁর বলও অপূর্ব। তাঁর এই সৌন্দর্য কথা শ্রবণ করার ফলে চিত্ত বিচলিত হয়।

শ্লোক ১৫৮

কৃষ্ণের মাধুর্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণের মাধুর্য কৃষ্ণকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে। কিন্তু যেহেতু তা তিনি পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারেন না, তাই তাঁর মনে ক্ষোভ থেকে যায়।

শ্লোক ১৫৯

এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

এটি হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ, তা আমি বর্ণনা করলাম। দয়া করে এখন আপনারা তৃতীয় হেতুর লক্ষণ শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১৬০

অত্যন্তনিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত ।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এই ভগবৎ-প্রেমরসের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত নিগূঢ়। কেবল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তা ভালভাবে জানেন।

শ্লোক ১৬১

যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে ।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম যাতে ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য যে কেউ তা জানেন বলে দাবি করেন, তিনিও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাছ থেকে নিশ্চয়ই তা শ্রবণ করেছেন, কেন না তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

শ্লোক ১৬২

গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম ।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম, কভু নহে কাম ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীদের প্রেমের নাম 'রূঢ়ভাব'। তা বিশুদ্ধ ও নির্মল। তা কখনই কাম নয়।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি *গোপিকাদের* প্রেম অপ্রাকৃত। তাঁদের এই আবেগকে বলা হয় *রূঢ়ভাব*। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা কাম বলে মনে হয়, তবুও কখনই তাকে জড়-জাগতিক যৌন আবেদন বা কাম বলে মনে করা উচিত নয়, কেন না তা শুদ্ধ ও নির্মল ভগবৎ-প্রেম।

শ্লোক ১৬৩

'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্ ।'
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ১৬৩ ॥

প্রেমা—প্রেম; **এব**—কেবল; **গোপরামাণাম্**—ব্রজগোপিকাদের; **কামঃ**—কাম; **ইতি**—মতন; **অগমৎ**—গমন করেছিলেন; **প্রথাম্**—যশ; **ইতি**—এভাবে; **উদ্ধব-আদয়ঃ**—শ্রীউদ্ধব প্রমুখ; **অপি**—এমন কি; **এতম্**—এই; **বাঞ্ছন্তি**—বাসনা করেন; **ভগবৎ-প্রিয়াঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় ভক্তগণ।

অনুবাদ

"ব্রজগোপিকাদের শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমই 'কাম' বলে খ্যাত হয়েছে। শ্রীউদ্ধব প্রমুখ ভগবানের প্রিয় ভক্তগণও সেই প্রেমের পিপাসু।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/২৮৫-২৮৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬৪

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ঠিক যেমন লোহার সঙ্গে সোনার পার্থক্য।

তাৎপর্য

কাম ও শুদ্ধ প্রেমের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করা উচিত, কেন না তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। লোহা ও সোনার মধ্যে যে রকম পার্থক্য, কাম ও প্রেমের মধ্যেও সেই রকমই পার্থক্য রয়েছে।

শ্লোক ১৬৫

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি, 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাকে বলা হয় কাম, আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বিশুদ্ধ প্রেমের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥

"ধ্বংসের কারণ উদিত হলেও দম্পতিদ্বয়ের যে সুদৃঢ় ভাববন্ধন কোন প্রকারেই ধ্বংস হয় না, তাকে বলা হয় প্রেম।"

প্রধানা গোপীরা এই রকম বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাজাত কোন রকম কামভাব তাঁদের ছিল না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বিবেচনা না করে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা। তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সর্বতোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিকাদের প্রেম কামগন্ধহীন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ থেকে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, কাম হচ্ছে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনা। জনপ্রিয়তা, সন্তান-সন্ততি লাভ, ঐশ্বর্য প্রাপ্তি প্রভৃতি বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিধি বেদে নির্দেশিত হয়েছে, সেগুলি আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির বিভিন্ন স্তর। জনসেবা, জাতীয়তাবোধ, ধর্মাচরণ, পরার্থবাদ, নীতিবোধ, শাস্ত্রনির্দেশ, স্বাস্থ্যরক্ষা, সকাম কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি, প্রগতি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহমমতা অথবা সমাজচ্যুত হওয়ার ভয় অথবা আইনের দ্বারা দণ্ডভোগ করার ভয় প্রভৃতির আবরণে ইন্দ্রিয়-তর্পণের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সবই হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিভিন্ন স্তর। এই সমস্ত তথাকথিত সৎকর্ম সাধিত হয় নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে, কেন না এই সমস্ত নীতি ও ধর্ম অনুশীলনের সময় কেউই তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করেন না। কিন্তু এই সবের ঊর্ধ্বে একটি অপ্রাকৃত স্তর রয়েছে, যে স্তরে জীব নিজেকে কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক বলেই মনে করেন। এই সেবার ভাবযুক্ত হয়ে যে সকল কার্য সম্পাদিত হয়, তাই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম, কারণ তার একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি-বিধান। কিন্তু ফলভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, তার উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন। এই ধরনের কর্ম কখনও স্থূলভাবে এবং কখনও সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ১৬৬

কামের তাৎপর্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য-মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

কামের উদ্দেশ্য কেবল নিজের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ। কিন্তু প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধন করা এবং তাই তা অত্যন্ত প্রবল।

শ্লোক ১৬৭-১৬৯

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, কর্ম।
লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম ॥ ১৬৭ ॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥ ১৬৮ ॥
সর্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

লৌকিক আচার, শাস্ত্রনির্দেশ পালন, দেহধর্ম, সকাম কর্ম, লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম, যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন—ব্রজগোপিকারা সেই সবই ত্যাগ

করেছিলেন, এমন কি তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজন এবং তাঁদের তাড়না ও ভর্ৎসনা, সবই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই কেবল তাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭০

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

একেই বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। তা সম্পূর্ণভাবে নির্মল, ঠিক যেমন স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে কোন দাগ থাকে না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকার সকলকে আত্মেন্দ্রিয় সুখের জন্য সমস্ত কার্যকলাপ ত্যাগ করে ব্রজগোপিকাদের মতো পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হতে উপদেশ দিয়েছেন। সেটিই হচ্ছে *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ। ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য সব কিছু করতে আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত, এমন কি তা করার জন্য যদি বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ এবং সামাজিক নীতি লংঘন করতে হয়, তা করতেও প্রস্তুত থাকা উচিত। সেটিই হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ। শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের এই আচরণ স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রের মতো নির্মল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, আমরা যেন ভ্রমবশত মনে না করি যে, দেহ ও মনের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপগুলিও আমাদের সেই সূত্রে বর্জন করতে হবে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যদি সেই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হয়, তা হলে সেগুলি আর আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিসাধন নয়।

শ্লোক ১৭১

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর ।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

তাই কাম ও প্রেমের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাম হচ্ছে গভীরতম অন্ধকারের মতো, আর প্রেম সূর্যের মতো উজ্জ্বল।

শ্লোক ১৭২

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই গোপীদের প্রেমে কামের নামগন্ধও নেই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করা।

শ্লোক ১৭৩

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৭৩ ॥

যৎ—যে; তে—তোমার; **সুজাত**—সুকুমার; **চরণ-অম্বু-রুহম্**—চরণকমল; **স্তনেষু**—স্তনে; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **শনৈঃ**—মৃদুভাবে; **প্রিয়**—হে প্রিয়; **দধীমহি**—আমরা স্থাপন করি; **কর্কশেষু**—কর্কশ; **তেন**—তাদের দ্বারা; **অটবীম্**—পথ; **অটসি**—তুমি ভ্রমণ কর; **তৎ**—তা; **ব্যথতে**—ব্যথিত হয়; **ন**—না; **কিং স্বিৎ**—আমরা উৎকণ্ঠিত হই; **কূর্প-আদিভিঃ**—ছোট ছোট পাথরকুচি প্রভৃতির দ্বারা; **ভ্রমতি**—চঞ্চলভাবে গমন করে; **ধীঃ**—মন; **ভবৎ-আয়ুষাম্**—তুমি যাদের জীবনস্বরূপ, তাদের; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

"হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কর্কশ স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবনস্বরূপ, তাই বনচারণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/১৯) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ যখন *রাসলীলা* থেকে অন্তর্হিত হলেন, তখন *ব্রজগোপিকাদের* মুখে এই শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৭৪

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার ।
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজগোপিকারা তাঁদের নিজেদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কখনও কোন বিবেচনা করেননি। তাঁদের সমস্ত কায়িক ও মানসিক চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সম্পাদন।

শ্লোক ১৭৫

কৃষ্ণ লাগি' আর সব করে পরিত্যাগ ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করাই হচ্ছে তাঁদের শুদ্ধ অনুরাগের হেতু।

শ্লোক ১৭৬

এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ১৭৬ ॥

এবম্—এভাবে; মৎ-অর্থ—আমার জন্য; উজ্‌ঝিত—বর্জন করেছ; লোক—লৌকিক আচার; বেদ—বৈদিক নির্দেশ; স্বানাম্—আত্মীয়স্বজন; হি—অবশ্যই; বঃ—তোমাদের; ময়ি—আমাকে; অনুবৃত্তয়ে—অনুরাগ বর্ধনের জন্য; অবলাঃ—হে নারীগণ; ময়া—আমার দ্বারা; পরোক্ষম্—পরোক্ষভাবে; ভজতা—অনুগ্রহপূর্বক; তিরোহিতম্—দৃষ্টির অগোচর; মা—আমাকে; অসূয়িতুম্—অসন্তুষ্ট হওয়া; মা অর্হথ—তোমাদের উচিত নয়; তৎ—তাই; প্রিয়ম্—প্রিয়পাত্র; প্রিয়াঃ—হে প্রিয়াগণ।

অনুবাদ

"হে গোপীগণ! আমার জন্য তোমরা লোকাচার, বৈদিক নির্দেশ ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেছ। তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগ বর্ধিত হবে বলে আমি তোমাদের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলাম। হে প্রিয়াগণ! আমি তোমাদের প্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত, আমার প্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ো না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩২/২১) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণ যখন *রাসলীলায়* আবার ফিরে এলেন, তখন তিনি এই কথাটি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৭৭

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে ।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

আগে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রতিজ্ঞা আছে, যে যেভাবে তাঁর ভজনা করবেন, তিনিও তাঁর প্রতি সেভাবেই আচরণ করবেন।

শ্লোক ১৭৮

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১৭৮ ॥

যে—যারা; যথা—যেভাবে; মাম্—আমাকে; প্রপদ্যন্তে—প্রপত্তি করে; তাম্—তাদের; তথা—সেভাবেই; এব—অবশ্যই; ভজামি—পুরস্কৃত করি; অহম্—আমি; মম—আমার;

বর্ত্ম—পথ; অনুবর্তন্তে—অনুসরণ করে; মনুষ্যাঃ—সমস্ত মানুষ; পার্থ—হে পৃথাপুত্র অর্জুন; সর্বশঃ—সর্বতোভাবে।

অনুবাদ

"যারা যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেভাবেই আমি তাদের পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সমস্ত মানুষই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কখনই গোপীদের কাছে অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, কেন না *ভগবদ্গীতার* (৪/১১) এই শ্লোকটিতে তিনি অর্জুনের কাছে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর প্রতি তাঁর ভক্তদের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার মাত্রা অনুসারে তিনি তাঁদের প্রতিদান দেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসে যে পথ, সকলে সেই পথই অনুসরণ করছে, কিন্তু সেই পথে প্রগতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং সেই প্রগতির মাত্রা অনুসারে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। পথ একটি, কিন্তু সেই পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে উন্নতির মাত্রা ভিন্ন। তাই, সেই পরমতত্ত্ব উপলব্ধির মাত্রা অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধিতেও পার্থক্য দেখা যায়। ব্রজগোপিকারা ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মহাপ্রভুও সেই কথা প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন যে, ব্রজগোপিকারা যেভাবে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, সেটিই হচ্ছে সর্বোচ্চ আরাধনা। তার থেকে শ্রেয় আরাধনা আর নেই।

শ্লোক ১৭৯

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে ।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজগোপিকাদের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১৮০

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ১৮০ ॥

ন—না; পারয়ে—করতে পারব; অহম্—আমি; নিরবদ্য-সংযুজাম্—যারা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কপট তাদের; স্ব-সাধু-কৃত্যম্—উপযুক্ত প্রতিদান; বিবুধ-আয়ুষা—দেবতাদের আয়ুষ্কালের মধ্যেও; অপি—যদিও; বঃ—তোমাদের; যাঃ—যারা; মা—আমাকে; অভজন্—ভজনা করেছ; দুর্জয়-গেহ-শৃঙ্খলাঃ—দুর্জয় গৃহরূপ শৃঙ্খল; সংবৃশ্চ্য—ছেদন করে; তৎ—যা; বঃ—তোমাদের; প্রতিযাতু—প্রতিদান হোক; সাধুনা—কেবলমাত্র সৎকর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

"হে গোপীগণ! আমার প্রতি তোমাদের নির্মল সেবার ঋণ আমি ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের মধ্যেও পরিশোধ করতে পারব না। আমার সঙ্গে তোমাদের যে সম্পর্ক তা সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ। তোমরা দুশ্ছেদ্য সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে আমার আরাধনা করেছ। তাই তোমাদের মহিমান্বিত কার্যই তোমাদের প্রতিদান হোক।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩২/২২) থেকে উদ্ধৃত। বিরহকাতর *গোপীদের* আকুল আবেদন শুনে, তাঁদের কাছে ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ১৮১

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত ।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

নিজেদের দেহের প্রতি ব্রজগোপিকাদের যে প্রীতি দেখা যায়, নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, তা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি *ব্রজগোপিকারা* যে নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদর্শন করেছেন, তার কোন তুলনা নেই। তাই *ব্রজগোপিকারা* যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজেদের সজ্জিত করেন, সেই বিষয়ে আমরা যেন কখনও ভুল না বুঝি। তাঁরা যতদূর সম্ভব সুন্দর করে নিজেদের সাজাতেন, যাতে তাঁদের সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়। এছাড়া তাঁদের আর কোন বাসনা ছিল না। তাঁরা তাঁদের দেহ, মন, প্রাণ, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁর সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের সুন্দর করে সাজাতেন, যাতে তাঁদের দেখে এবং স্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়।

শ্লোক ১৮২

'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ।
তাঁর ধন তাঁর ইহা সম্ভোগ-সাধন ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

(ব্রজগোপিকারা মনে মনে ভেবেছিলেন—) "আমি আমার এই দেহ কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছি। এটি তাঁরই সম্পদ এবং এটি তাঁকে আনন্দ দান করুক।

শ্লোক ১৮৩

এদেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ' ।
এই লাগি' করে দেহের মার্জন-ভূষণ ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দেহ দর্শন করে এবং স্পর্শ করে কৃষ্ণ আনন্দ উপভোগ করেন।" সেই হেতু তাঁরা তাঁদের দেহ মার্জন করতেন এবং সুন্দরভাবে সাজাতেন।

শ্লোক ১৮৪

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে ।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ১৮৪ ॥

নিজ-অঙ্গম্—নিজেদের শরীর; **অপি**—যদিও; **যাঃ**—যে; **গোপ্যঃ**—ব্রজগোপিকারা; **মম**—আমার; **ইতি**—এভাবেই বিবেচনা করে; **সমুপাসতে**—অলঙ্কারাদির দ্বারা সাজায়; **তাভ্যঃ**—তাদের থেকে; **পরম্**—পরতর; **ন**—নেই; **মে**—আমার কাছে; **পার্থ**—হে অর্জুন; **নিগূঢ়**—গভীর; **প্রেমভাজনম্**—প্রিয়পাত্র।

অনুবাদ

"হে অর্জুন! যে গোপীরা তাদের নিজেদের শরীর আমার ভোগ্য বলে যত্ন করে এবং সাজায়, সেই গোপিকাদের থেকে অধিক প্রিয় আমার আর কেউ নেই।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটি *আদি পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৮৫

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব ।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীভাবের আর একটি অদ্ভুত স্বভাব রয়েছে, যার প্রভাব বুদ্ধির অগোচর।

শ্লোক ১৮৬

গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন ।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তখন তাঁরা অসীম সুখ অনুভব করেন, যদিও সুখভোগের কোন বাসনা তাঁদের নেই।

শ্লোক ১৮৭

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীদের দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তার থেকে কোটিগুণ আনন্দ গোপীরা আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

গোপীদের অদ্ভুত চরিত্র সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। নিজেদের সুখভোগের কোন বাসনা তাঁদের নেই, কিন্তু তবুও তাঁদের দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ যখন আনন্দ উপভোগ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন্দ দর্শন করে তাঁরা তাঁর থেকে কোটি গুণ সুখ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১৮৮

তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের নিজেদের সুখের জন্য গোপীদের কোন রকম আকাঙ্ক্ষা নেই, কিন্তু তবুও তাঁদের সুখ বর্ধিত হয়। তার ফলে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ১৮৯

এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান ।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই বিরোধের কেবল একটি মাত্র সমাধানই দেখা যায়—গোপিকাদের সুখ তাঁদের প্রিয় কৃষ্ণের সুখে পর্যবসিত হয়।

তাৎপর্য

গোপিকাদের এই অবস্থা তাঁদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে, কেন না যদিও তাঁরা তাঁদের নিজেদের সুখ চান না, তবুও অযাচিতভাবে সুখের অনুভূতি আসে। তাঁদের এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে যে, গোপিকাদের সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুখে পর্যবসিত হয়। বৃন্দাবনের ভক্তরা তাই শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁর সহচরী গোপিকাদের সেবা করার চেষ্টা করেন। কেউ যদি গোপিকাদের কৃপা লাভ করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়, কেন না গোপিকারা সুপারিশ করলে শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের সেবা গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে গোপিকাদের প্রীতিসাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর চারপাশের অনেক মানুষই তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন এবং সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯০

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা ।
সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

গোপিকাদের দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধিত হয়, আর সেই সঙ্গে তাঁর অতুলনীয় মাধুর্যও বর্ধিত হয়।

শ্লোক ১৯১

আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

(গোপিকারা মনে মনে বিবেচনা করেছিলেন—) "আমাকে দেখে কৃষ্ণ এত সুখ পেয়েছে।" সেই চিন্তা তাঁদের দেহ এবং মুখের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা অন্তহীনভাবে বর্ধিত করেছিল।

শ্লোক ১৯২

গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত ।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীদের সৌন্দর্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। আর গোপীরা যতই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করেন, ততই তাঁদের সৌন্দর্য বর্ধিত হয়।

শ্লোক ১৯৩

এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি ।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এই প্রতিযোগিতায় কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করেন না।

শ্লোক ১৯৪

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে ।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু গোপীদের রূপ ও গুণ দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ সুখ আস্বাদন করেন। আর তাঁর সুখে গোপীদের সুখ বৃদ্ধি হয়।

শ্লোক ১৯৫

অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে ।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমরা দেখতে পাই যে, গোপীদের সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুখের পুষ্টিসাধন করে। সেই হেতু, গোপীদের প্রেমে কামরূপ দোষ নেই।

তাৎপর্য

পরমা সুন্দরী *গোপীদের* দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের এই আনন্দ *গোপীদের* আনন্দ দান করে, তার ফলে সেই উচ্ছলযৌবনা *গোপীদের* দেহ ও মুখের সৌন্দর্য বিকশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও *ব্রজগোপিকাদের* মধ্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির অন্তহীন প্রতিযোগিতা যদিও ভগবদ্ভক্তির পরম প্রকাশ, তবুও জড়-জাগতিক নীতিবাগীশেরা তাকে কখনও কখনও 'কাম' বলে ভুল করে। কিন্তু তাঁদের এই প্রেমের সম্পর্ক জড়-জাগতিক নয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধনের জন্য *গোপিকাদের* ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা কামলেশহীন শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম।

শ্লোক ১৯৬

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ ।
স্তন-স্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ১৯৬ ॥

উপেত্য—অট্টালিকায় আরোহণ করে; **পথি**—পথে; **সুন্দরী-ততিভিঃ আভিঃ**—ব্রজসুন্দরীদের দ্বারা; **অভ্যর্চিতম্**—সর্বতোভাবে পূজিত হয়েছেন; **স্মিত-অঙ্কুর-করম্বিতৈঃ**—স্মিতহাস্যরূপ অঙ্কুর মিশ্রিত; **নটৎ**—নর্তনশীল; **অপাঙ্গ**—কটাক্ষ; **ভঙ্গীশতৈঃ**—শত শত ভঙ্গিমার দ্বারা; **স্তন-স্তবক**—স্তনের স্তবক; **সঞ্চরৎ**—সঞ্চরণশীল; **নয়ন**—নয়নের; **চঞ্চরীক**—ভ্রমরের মতো; **অঞ্চলম্**—প্রান্তভাগ; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **বিজয়িনম্**—আগমনশীল; **ভজে**—আমি ভজনা করি; **বিপিন-দেশতঃ**—অপরাহ্নে গোচারণ থেকে; **কেশবম্**—শ্রীকেশবকে।

অনুবাদ

"বন থেকে ব্রজে ফিরে আসছেন যে কেশব, তাঁকে আমি ভজনা করি। তিনি স্মিতহাস্য ও নৃত্যশীল কটাক্ষরূপ শত শত ভঙ্গিমার দ্বারা প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে ব্রজগোপিকাগণ কর্তৃক পথিমধ্যে পূজিত হয়েছেন। সেই গোপিকাদের স্তনস্তবকে ভ্রমরতুল্য তাঁর নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *স্তবমালার কেশবাষ্টক* (৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৯৭

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন ।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীপ্রেমের আর একটি স্বাভাবিক চিহ্ন হচ্ছে তাতে কামের লেশমাত্রও নেই।

শ্লোক ১৯৮

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্যের পুষ্টি ।
মাধুর্যে বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীপ্রেম কৃষ্ণ-মাধুর্যের পুষ্টিসাধন করে। সেই মাধুর্য মহা আনন্দ দান করে প্রেম বর্ধিত করে।

শ্লোক ১৯৯

প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমাস্পদের আনন্দ বিধান করে প্রেমের আশ্রয় প্রেমিকা আনন্দ উপভোগ করেন। তাতে নিজের সুখ-বাসনার কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্লোক ২০০-২০১

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি ।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥ ২০০ ॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে ।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

নিঃস্বার্থ প্রেমের এই রীতি। প্রীতি বিষয়ের সুখে প্রীতির আশ্রয়ও সুখ লাভ করে। নিজের প্রেমানন্দ যখন কৃষ্ণসেবার বাধা সৃষ্টি করে, তখন ভক্তের সেই আনন্দের প্রতি মহাক্রোধ হয়।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *প্রীতির আশ্রয়* হচ্ছেন গোপীগণ এবং *প্রীতির বিষয়* হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *প্রীতিবিষয়ের* আনন্দে *আশ্রয়ের* আনন্দ। এই রকম আনন্দ সমৃদ্ধিতে গোপীদের

নিজেদের সুখভোগের কোন বাসনা নেই। তাঁদের আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের উপর নির্ভরশীল। অহৈতুকী প্রেমের এই হচ্ছে রীতি। এই ধরনের শুদ্ধ প্রেম তখনই সম্ভব হয়, যখন *প্রীতিবিষয়ের* সুখেই *প্রীতির আশ্রয়ের* সুখ। এই ধরনের নিষ্কলুষ প্রেমে নিজের *প্রেমানন্দকে কৃষ্ণ-সেবানন্দের* প্রতিবন্ধক বলে মনে হয় এবং তখন সেই *প্রেমানন্দের* প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ হয়।

শ্লোক ২০২

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমা-
নন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষাদ-
ক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ২০২ ॥

অঙ্গ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের; **স্তম্ভ-আরম্ভম্**—স্তম্ভ বা জড় ভাবের আরম্ভ; **উত্তুঙ্গয়ন্তম্**—প্রাপ্ত হওয়ার কারণ; **প্রেম-আনন্দম্**—প্রেমানন্দ; **দারুকঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথের সারথি দারুক; **ন**—না; **অভ্যনন্দৎ**—অভিনন্দিত; **কংস-অরাতেঃ**—কংসারি শ্রীকৃষ্ণকে; **বীজনে**—চামর ব্যজনকালে; **যেন**—যার দ্বারা; **সাক্ষাৎ**—স্পষ্টভাবে; **অক্ষোদীয়ান্**—মহত্তর; **অন্তরায়ঃ**—প্রতিবন্ধক; **ব্যধায়ি**—সৃষ্টি হয়েছে।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করার সময় ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে দারুকের দেহে স্তম্ভভাবের উদয় হয়ে তাঁর সেবায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল, তাই তিনি সেই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করলেন না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (৩/২/৬২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২০৩

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ২০৩ ॥

গোবিন্দ—শ্রীগোবিন্দের; **প্রেক্ষণ**—দর্শন; **আক্ষেপি**—বাধা সৃষ্টিকারী; **বাষ্প-পূর**—নেত্রজল; **অভিবর্ষিণম্**—বর্ষণকারী; **উচ্চৈঃ**—অতিশয়; **অনিন্দৎ**—নিন্দা করেছিলেন; **আনন্দম্**—আনন্দকে; **অরবিন্দ-বিলোচনা**—কমলনয়না শ্রীমতী রাধারাণী।

অনুবাদ

"কমলনয়না শ্রীমতী রাধারাণী নেত্রজল বর্ষণকারী আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করেছিলেন, কেন না তা গোবিন্দ-দর্শনে বাধা সৃষ্টি করেছিল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (২/৩/৫৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২০৪

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

আর শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত নিজের সুখের জন্য কখনও সালোক্য আদি মুক্তিও গ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতিপরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য-মুক্তি থেকে শুরু করে ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়ার সারূপ্য-মুক্তি, ভগবানের নিকটে থাকার সামীপ্য-মুক্তি এবং ভগবানের মতো ঐশ্বর্য প্রাপ্তির সার্ষ্টি-মুক্তি আদি সব রকমের মুক্তি হেলাভরে পরিত্যাগ করেন।

শ্লোক ২০৫

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ২০৫ ॥

মৎ—আমার; **গুণ**—গুণাবলীর; **শ্রুতিমাত্রেণ**—শ্রবণ করা মাত্র; **ময়ি**—আমার প্রতি; **সর্ব-গুহা**—সকলের হৃদয়ে; **আশয়ে**—অবস্থানকারী; **মনঃ-গতিঃ**—মনের গতি; **অবিচ্ছিন্না**—অপ্রতিহতা; **যথা**—ঠিক যেমন; **গঙ্গা-অম্ভসঃ**—গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি; **অম্বুধৌ**—সমুদ্রে।

অনুবাদ

"গঙ্গার স্বর্গীয় জলরাশি যেমন অপ্রতিহতভাবে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তেমনই আমার গুণাবলী শ্রবণ করা মাত্র আমার ভক্তের মন সর্বচিত্ত-নিবাসী আমার প্রতি ধাবিত হয়।"

শ্লোক ২০৬

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২০৬ ॥

লক্ষণম্—লক্ষণ; **ভক্তি-যোগস্য**—ভক্তিযোগের; **নির্গুণস্য**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অতীত; **হি**—অবশ্যই; **উদাহৃতম্**—কথিত; **অহৈতুকী**—অহৈতুকী; **অব্যবহিতা**—অপ্রতিহতা; **যা**—যা; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **পুরুষোত্তমে**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি।

অনুবাদ

"পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ হচ্ছে যে, এই অপ্রাকৃত প্রেম অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা।"

শ্লোক ২০৭

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত ।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২০৭ ॥

সালোক্য—আমার ধামে অবস্থান করা; **সার্ষ্টি**—আমার মতো ঐশ্বর্য লাভ করা; **সারূপ্য**—আমার মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া; **সামীপ্য**—আমার প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করা; **একত্বম্**—আমার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া; **অপি**—এমন কি; **উত**—অথবা; **দীয়মানম্**—দেওয়া হলেও; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করেন; **বিনা**—ব্যতীত; **মৎ-সেবনম্**—আমার সেবা; **জনাঃ**—ভক্তবৃন্দ।

অনুবাদ

"আমার ভক্তদের সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি দান করা হলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না, কেন না আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁদের আর কোন বাসনা নেই।"

তাৎপর্য

এই শ্লোক তিনটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৩/২৯/১১-১৩) থেকে উদ্ধৃত এবং এটি শ্রীকৃষ্ণের অবতার কপিলদেবের উক্তি।

শ্লোক ২০৮

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ২০৮ ॥

মৎ—আমার; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **প্রতীতম্**—প্রাপ্ত; **তে**—তাঁরা; **সালোক্য-আদি**—সালোক্য আদি মুক্তি; **চতুষ্টয়ম্**—চার রকম; **ন ইচ্ছন্তি**—বাসনা করেন না; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **পূর্ণাঃ**—পূর্ণ; **কুতঃ**—কোথায়; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **কাল-বিপ্লুতম্**—যা কালের প্রভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুবাদ

"আমার সেবার প্রভাবে সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় স্বয়ং আগত হলেও, আমার সেবায় পূর্ণরূপে মগ্ন আমার ভক্তরা সেগুলি গ্রহণ করেন না। তখন কালের দ্বারা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায় যে সুখ, তা তাঁরা গ্রহণ করবেন কেন?"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (৯/৪/৬৭) এই শ্লোকটিতে মহারাজ অম্বরীষের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। স্বর্গলোকে বসবাসের মতো ব্রহ্মসাযুজ্যও অনিত্য। উভয়ই কালের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং অনিত্য।

শ্লোক ২০৯

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম ।
নির্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজগোপিকাদের স্বাভাবিক প্রেমে কামের লেশমাত্রও নেই। তা নির্মল, উজ্জ্বল এবং তপ্তকাঞ্চনের মতো বিশুদ্ধ।

শ্লোক ২১০

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী ।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজগোপিকারা কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধবী, প্রেয়সী, প্রিয়া শিষ্যা, অন্তরঙ্গা সখী ও দাসী।

শ্লোক ২১১

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ২১১ ॥

সহায়াঃ—সহকারী; **গুরবঃ**—গুরু; **শিষ্যাঃ**—শিষ্যা; **ভুজিষ্যাঃ**—দাসী; **বান্ধবাঃ**—বান্ধবী; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী; **সত্যম্**—সত্য সত্যই; **বদামি**—আমি বলছি; **তে**—তোমাকে; **পার্থ**—হে অর্জুন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **কিম্**—কি; **মে**—আমার; **ভবন্তি**—হয়; **ন**—না।

অনুবাদ

"হে পার্থ! আমি তোমাকে সত্য সত্যই বলছি যে, গোপীরা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, দাসী, বান্ধবী ও স্ত্রী। তাঁরা যে আমার কি নয়, তা আমি জানি না।"

তাৎপর্য

গোপী-প্রেমামৃত থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ২১২

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত ।
প্রেমসেবা-পরিপাটী, ইষ্ট-সমীহিত ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনের বাসনা জানেন এবং তাঁরা জানেন তাঁকে আনন্দ দান করার জন্য কিভাবে পরিপূর্ণরূপে তাঁর প্রেমসেবা করতে হয়। তাঁদের পরম প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে তাঁরা তাঁর সেবা করেন।

শ্লোক ২১৩

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্ ।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ২১৩ ॥

মৎ-মাহাত্ম্যম্—আমার মাহাত্ম্য; **মৎ-সপর্যাম্**—আমার সেবা; **মৎ-শ্রদ্ধাম্**—আমার প্রতি শ্রদ্ধা; **মৎ-মনঃ-গতম্**—আমার মনের গতি; **জানন্তি**—জানেন; **গোপিকাঃ**—গোপিকাগণ; **পার্থ**—হে অর্জুন; **ন**—না; **অন্যে**—অন্যরা; **জানন্তি**—জানে; **তত্ত্বতঃ**—স্বরূপত।

অনুবাদ

"হে পার্থ! আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীরাই জানে। স্বরূপত অন্য আর কেউ তা জানে না।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *আদি পুরাণে* অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ২১৪

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্বাধিকা ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন সর্বোত্তমা। রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা।

তাৎপর্য

সমস্ত *গোপীদের* মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন সর্বোত্তমা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী, সব চাইতে গুণবতী এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী।

শ্লোক ২১৫

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ২১৫ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **রাধা**—শ্রীমতী রাধারাণী; **প্রিয়া**—অত্যন্ত প্রিয়া; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **তস্যাঃ**—তাঁর; **কুণ্ডম্**—কুণ্ড; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত প্রিয়; **তথা**—তেমনই; **সর্ব-গোপীষু**—সমস্ত গোপীদের মধ্যে; **সা**—তিনি; **এব**—অবশ্যই; **একা**—একমাত্র; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **অত্যন্ত-বল্লভা**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

"শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় স্থান। সমস্ত গোপীদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *পদ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১৬

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ২১৬ ॥

ত্রৈ-লোক্যে—ত্রিভুবনে; **পৃথিবী**—পৃথিবী; **ধন্যা**—ধন্য; **যত্র**—যেখানে; **বৃন্দাবনম্**—বৃন্দাবন; **পুরী**—নগরী; **তত্র**—সেখানে; **অপি**—অবশ্যই; **গোপিকাঃ**—গোপীগণ; **পার্থ**—হে অর্জুন; **যত্র**—যেখানে; **রাধা**—শ্রীমতী রাধারাণী; **অভিধা**—নামক; **মম**—আমার।

অনুবাদ

"হে পার্থ! ত্রিভুবনে এই পৃথিবী বিশেষভাবে ধন্য, কেন না এই পৃথিবীতে রয়েছে বৃন্দাবন নামক পুরী। আর সেখানে গোপিকারা বিশেষভাবে ধন্য, কেন না তাদের মধ্যে রয়েছে আমার শ্রীমতী রাধারাণী।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *আদি পুরাণে* অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ২১৭

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য সমস্ত গোপীরা শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। তাঁদের উভয়ের আনন্দ বৃদ্ধির উপকরণ রূপে গোপিকারা আচরণ করেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের *গোপীরা* পঞ্চবিধ—*সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরম-প্রেষ্ঠসখী*। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর এই সমস্ত সুন্দরী সহচরীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উদ্দীপনে অত্যন্ত দক্ষ। *পরম-প্রেষ্ঠসখী* হচ্ছেন আট জন এবং রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় তাঁরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে আবার কখনও শ্রীমতী রাধারাণীর পক্ষ অবলম্বন করে এমন এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করেন, যার ফলে মনে হয় তাঁরা এক জনের থেকে অন্য জনের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তার ফলে রসাস্বাদন আরও মধুর হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২১৮

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন কৃষ্ণবল্লভা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন। তাঁকে ছাড়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করতে পারেন না।

শ্লোক ২১৯

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্ ।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ২১৯ ॥

কংস-অরিঃ—কংসারি শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—অধিকন্তু; **সংসার**—আনন্দের সার (রাসলীলা); **বাসনা**—বাসনার দ্বারা; **বদ্ধ**—আবদ্ধ; **শৃঙ্খলাম্**—যিনি শৃঙ্খলের মতো; **রাধাম্**—শ্রীমতী রাধারাণীকে; **আধায়**—ধারণ করে; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **তত্যাজ**—ত্যাগ করেছিলেন; **ব্রজ-সুন্দরীঃ**—অন্যান্য গোপিকাদের।

অনুবাদ

"কংসারি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার আনন্দ উৎসবে শ্রীমতী রাধারাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, কেন না তিনি হচ্ছেন ভগবানের বাসনার সার অনুভবের প্রধান সহায়িকা।"

তাৎপর্য

শ্রীল জয়দেব গোস্বামীকৃত *গীতগোবিন্দ* (৩/১) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে শ্রীমতী রাধারাণীর অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণের *রাসলীলা* ত্যাগের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২২০

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার ।
যুগধর্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যুগধর্ম—ভগবানের দিব্যনাম সংকীর্তন এবং শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম প্রচার করেছেন।

শ্লোক ২২১

সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল-কারণ ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে তিনি তাঁর নিজের বাসনাও পূর্ণ করেছেন। সেটি তাঁর অবতরণের মুখ্য কারণ।

শ্লোক ২২২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার ।
রসময়-মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত রসের মূর্ত প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন শৃঙ্গার রসের মূর্ত বিগ্রহ।

শ্লোক ২২৩

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার ।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শৃঙ্গার রস আস্বাদন করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হলেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে সমস্ত রসের প্রচার করলেন।

শ্লোক ২২৪

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্ ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ২২৪ ॥

বিশ্বেষাম্—সমস্ত গোপীদের মধ্যে; **অনুরঞ্জনেন**—প্রীতি উৎপাদনের দ্বারা; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **আনন্দম্**—আনন্দ; **ইন্দীবর-শ্রেণী**—নীল কমলের সারি; **শ্যামল**—শ্যামল; **কোমলৈঃ**—কোমল; **উপনয়ন্**—আনয়ন করে; **অঙ্গৈঃ**—তাঁর অঙ্গসমূহের দ্বারা; **অনঙ্গ-উৎসবম্**—কামদেবের উৎসব; **স্বচ্ছন্দম্**—স্বচ্ছন্দে; **ব্রজ-সুন্দরীভিঃ**—ব্রজ সুন্দরীদের দ্বারা; **অভিতঃ**—উভয় দিকে; **প্রতি-অঙ্গম্**—প্রতিটি অঙ্গ; **আলিঙ্গিতঃ**—আলিঙ্গিত; **শৃঙ্গারঃ**—শৃঙ্গার রস; **সখি**—হে সখি; **মূর্তিমান্**—মূর্তিমান; **ইব**—মতো; **মধৌ**—বসন্তকালে; **মুগ্ধঃ**—মুগ্ধ; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ক্রীড়তি**—ক্রীড়া করছেন।

অনুবাদ

"হে সখী! দেখ, কৃষ্ণ কিভাবে বসন্ত ঋতুকে উপভোগ করছে! তাঁর প্রতিটি অঙ্গ গোপীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েছে এবং তাই তাঁকে ঠিক মূর্তিমান কামদেবের মতো মনে হচ্ছে। তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের দ্বারা তিনি সমস্ত গোপীদের এবং সমস্ত জগৎকে আনন্দ দান করছেন। তাঁর নীল কমলের মতো শ্যামল ও কোমল কর ও চরণ প্রভৃতি অঙ্গসকল যেন অনঙ্গের আনন্দোৎসব সৃষ্টি করেছে।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *গীতগোবিন্দ* (১/১১) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২২৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন ।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত রসের আধার। অন্তহীনভাবে তিনি রসমাধুর্য আস্বাদন করেছেন।

শ্লোক ২২৬

সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ-ধর্ম ।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তিনি কলিযুগের যুগধর্ম প্রবর্তন করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা তার মর্ম জানেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন *ব্রজগোপিকাদের* প্রেমের পরম ভোক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সেই অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করার জন্য তিনি স্বয়ং *ব্রজগোপিকাদের* ভাব অবলম্বন করেছেন। সেই ভাব নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই যুগের যুগধর্ম প্রবর্তন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তরাই কেবল এই অপ্রাকৃত রহস্যের মর্ম জানেন।

শ্লোক ২২৭-২২৮

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস ।
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ॥ ২২৭ ॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, মুরারিগুপ্ত, হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আর যত ভক্ত রয়েছেন, ভক্তিভরে আমি তাঁদের শ্রীচরণকমল আমার মস্তকে ধারণ করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকার আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, আমরা যদি যথার্থই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানতে চাই, তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হয়।

শ্লোক ২২৯

ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস ।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

আমি ষষ্ঠ শ্লোকের আভাস দিয়েছি। এখন আমি মূল শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করছি, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২৩০

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ২৩০ ॥

শ্রীরাধায়াঃ—শ্রীমতী রাধারাণীর; **প্রণয়-মহিমা**—প্রেমের মাহাত্ম্য; **কীদৃশঃ**—কি রকম; **বা**—অথবা; **অনয়া**—তাঁর (শ্রীমতী রাধারাণীর) দ্বারাই; **এব**—কেবল; **আস্বাদ্যঃ**—আস্বাদনীয়; **যেন**—সেই প্রেমের দ্বারা; **অদ্ভুত-মধুরিমা**—অত্যাশ্চর্য মাধুর্য; **কীদৃশঃ**—কি রকম; **বা**—অথবা; **মদীয়ঃ**—আমার; **সৌখ্যম্**—সুখ; **চ**—এবং; **অস্যাঃ**—শ্রীরাধার; **মৎ-অনুভবতঃ**—আমার মাধুর্যের অনুভববশত; **কীদৃশম্**—কি রকম; **বা**—অথবা; **ইতি**—এভাবেই; **লোভাৎ**—লোভবশত; **তৎ**—তাঁর (শ্রীমতী রাধারাণীর); **ভাব-আঢ্যঃ**—ভাবযুক্ত হয়ে; **সমজনি**—আবির্ভূত হয়েছেন; **শচী-গর্ভসিন্ধৌ**—শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে; **হরি**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইন্দুঃ**—চন্দ্র।

অনুবাদ

"শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কি রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কি রকম—এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্লোক ২৩১

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায় ।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গূঢ়, তাই সর্বসমক্ষে তা প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু তা যদি প্রকাশ না করা হয়, তা হলে কেউই তা বুঝতে পারবে না।

শ্লোক ২৩২

অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ় ।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তাই কেবল তার সারমর্ম প্রকাশ করে আমি তার উল্লেখ করব, যাতে প্রেমিক ভক্ত তা বুঝতে পারে, কিন্তু মূর্খরা তা বুঝতে পারবে না।

শ্লোক ২৩৩

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

যে মানুষ তাঁর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধারণ করেছেন, তিনি এই সকল অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে আনন্দে মগ্ন হবেন।

শ্লোক ২৩৪

এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব ।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্বদা বল্লভ ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি হচ্ছে নব বিকশিত আম্র-পল্লবের মতো; সেগুলি কোকিলের মতো ভক্তদের কাছে সর্বদা অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ২৩৫

অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

উষ্ট্রের মতো অভক্তেরা এই সমস্ত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারে না। তাই আমার হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ হচ্ছে।

শ্লোক ২৩৬

যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে ।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাদের ভয়ে আমি বলতে চাই না। কিন্তু তারা যদি বুঝতে না পারে, তা হলে তার থেকে অধিক সুখের বিষয় ত্রিভুবনে আর কি আছে?

শ্লোক ২৩৭

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার ।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক্ চমৎকার ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

অতএব ভক্তদের প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য আমি নিঃসঙ্কোচে তা ব্যক্ত করব।

শ্লোক ২৩৮

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে ।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরসরূপ কহে মোরে ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরে বিবেচনা করেন, "সকলেই বলে যে, আমি পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ রসের মূর্ত বিগ্রহ।

শ্লোক ২৩৯

আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন ।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্ জন ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত জগৎ আমার থেকে আনন্দ লাভ করে। এমন কেউ কি আছে যে আমাকে আনন্দ দান করতে পারে?

শ্লোক ২৪০

আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ ।
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার থেকে যার মহিমা শত শত গুণে অধিক, সেই কেবল আমার মনকে আনন্দিত করতে পারে।

শ্লোক ২৪১

আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব ।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"এই জগতে আমার থেকে অধিক গুণসম্পন্ন কাউকে পাওয়া অসম্ভব। কেবল রাধারাণীর মধ্যেই তা রয়েছে বলে আমি অনুভব করি।

শ্লোক ২৪২-২৪৩

কোটিকাম জিনি' রূপ যদ্যপি আমার ।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য—সাম্য নাহি যার ॥ ২৪২ ॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন ।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আমার সৌন্দর্য কোটি কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্যকে পরাভূত করে, যদিও আমার এই সৌন্দর্যের সমান অথবা তাঁর থেকে অধিক সৌন্দর্য সমন্বিত আর কেউ নেই এবং যদিও আমার এই সৌন্দর্য ত্রিভুবনের আনন্দ বিধান করে, তবুও রাধারাণীকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়।

শ্লোক ২৪৪

মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন ।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার বংশীগীত ত্রিভুবনকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণীর মধুর বচন শুনে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় মোহিত হয়।

শ্লোক ২৪৫

যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ ।
মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আমার অঙ্গগন্ধ সমস্ত জগৎকে সুরভিত করে, তবুও রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের গন্ধ আমার চিত্ত এবং হৃদয়কে হরণ করে।

শ্লোক ২৪৬

যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস ।
রাধার অধর-রস আমা করে বশ ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আমার রসে সমস্ত জগৎ সরস হয়েছে, তবুও শ্রীমতী রাধারাণীর অধরের সুধা আমাকে বশীভূত করেছে।

শ্লোক ২৪৭

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল ।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আমার স্পর্শ কোটি চন্দ্রের থেকেও শীতল, তবুও শ্রীমতী রাধিকার স্পর্শ আমাকে সুশীতল করে।

শ্লোক ২৪৮

এই মত জগতের সুখে আমি হেতু ।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই যদিও আমি হচ্ছি সমস্ত জগতের সুখের কারণ, তবুও শ্রীরাধিকার রূপ এবং গুণ আমার জীবনস্বরূপ।

শ্লোক ২৪৯

এই মত অনুভব আমার প্রতীত ।
বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনুভব করতে পারলেও, যখন আমি বিচার করে দেখি, তখন সব বিপরীত বলে প্রতিভাত হয়।

শ্লোক ২৫০

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণীকে দর্শন করে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু আমাকে দেখে শ্রীমতী রাধারাণী অধিক সুখ অনুভব করে।

শ্লোক ২৫১

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন ।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের ফলে যে বংশীধ্বনির মতো শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনে শ্রীমতী

রাধারাণী চেতনা হারায়। কারণ, সে মনে করে সেটি যেন আমার বংশীধ্বনি। আর আমি বলে ভুল করে সে তমাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে।

শ্লোক ২৫২

কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে ।
কৃষ্ণসুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীমতী রাধারাণী মনে করে, 'কৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করে আমার জন্ম সার্থক হল।' এভাবেই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে সে কৃষ্ণসুখে মগ্ন থাকে।

শ্লোক ২৫৩

অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"অনুকূল বায়ু যখন আমার অঙ্গগন্ধ বহন করে তার কাছে নিয়ে যায়, তখন সে প্রেমে অন্ধ হয়ে সেই বায়ুতে উড়ে যেতে চায়।

শ্লোক ২৫৪

তাম্বুলচর্বিত যবে করে আস্বাদনে ।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সে যখন আমার চর্বিত তাম্বুল আস্বাদন করে, তখন সে আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন হয়ে সব কিছু বিস্মৃত হয়।

শ্লোক ২৫৫

আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ ।
শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার মিলনে রাধা যে আনন্দ আস্বাদন করে, তা শতমুখে বর্ণনা করেও আমি শেষ করতে পারি না।

শ্লোক ২৫৬

লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী ।
তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাশরি ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাদের লীলাবিলাসের পর যখন আমি তার অঙ্গের মাধুরী দর্শন করি, তখন আমি সুখে মগ্ন হয়ে নিজেকে ভুলে যাই।

শ্লোক ২৫৭

দোঁহার যে সমরস, ভরতমুনি মানে ।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভরতমুনি বলেছেন যে, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের রস সমান। কিন্তু আমার ব্রজের রস তিনিও জানেন না।

তাৎপর্য

ভরতমুনির মতো যৌন-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞের মতে, জড়-জাগতিক কামক্রীড়ায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সমানভাবে সুখ উপভোগ করে। কিন্তু চিৎ-জগতে প্রেমের আস্বাদন ভিন্ন, সেই কথা জড় বিশেষজ্ঞরা জানেন না।

শ্লোক ২৫৮

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই ।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"অন্যের মিলনে আমি যে সুখ পাই, রাধারাণীর সঙ্গসুখ তার থেকে শত শত গুণে বেশি।

শ্লোক ২৫৯

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্যসর্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥ ২৫৯ ॥

নির্ধূত—পরাজিত; অমৃত—অমৃতের; মাধুরী—মাধুর্য; পরিমলঃ—যার সৌরভ; কল্যাণি—হে পরম মঙ্গলময়ী; বিম্ব-অধরঃ—রক্তিম অধর; বক্ত্রম্—মুখ; পঙ্কজ-সৌরভম্—পদ্মফুলের মতো সৌরভ; কুহরিত—কোকিলের মধুর কূজনের; শ্লাঘা—গর্ব; ভিদঃ—যা পরাজিত করে; তে—তোমার; গিরঃ—বচন; অঙ্গম্—অঙ্গসমূহ; চন্দন-শীতলম্—চন্দনের মতো শীতল; তনুঃ—দেহ; ইয়ম্—এই; সৌন্দর্য—সৌন্দর্যের; সর্বস্ব-ভাক্—যা সব কিছু প্রকাশ

করে; ত্বাম্—তোমাকে; আস্বাদ্য—আস্বাদন করে; মম—আমার; ইদম্—এই; ইন্দ্রিয়-কুলম্—ইন্দ্রিয়সমূহ; রাধে—হে শ্রীমতী রাধারাণী; মুহুঃ—পুনঃপুনঃ; মোদতে—আমোদিত হচ্ছে।

অনুবাদ

" 'হে কল্যাণি রাধারাণী! তোমার দেহ সমস্ত সৌন্দর্যের উৎস। তোমার রক্তিম অধর অমৃতের মাধুর্য থেকেও মধুর, তোমার শ্রীমুখে পদ্মের সৌরভ, তোমার মধুর বচন কোকিলের কূজনকেও হার মানায় এবং তোমার অঙ্গ চন্দনের থেকেও সুশীতল। এই রকম রূপ-গুণ সমন্বিত লীলাময়ী তোমাকে লাভ করে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ পুনঃপুনঃ মহানন্দে মগ্ন হচ্ছে।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ললিত-মাধব* নাটকে (৯/৯) শ্রীমতী রাধারাণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্লোক ২৬০

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্ ।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ২৬০ ॥

রূপে—রূপে; কংস-হরস্য—কংসারি শ্রীকৃষ্ণের; লুব্ধ—লুব্ধ; নয়নাম্—যাঁর নয়নযুগল; স্পর্শে—স্পর্শে; অতি-হৃষ্যৎ—অত্যন্ত হর্ষিত ; ত্বচম্—যাঁর ত্বক; বাণ্যাম্—বাণীর স্পন্দনে; উৎকলিত—অত্যন্ত উৎসুক; শ্রুতিম্—যাঁর কর্ণদ্বয়; পরিমলে—অঙ্গ সৌরভে; সংহৃষ্ট—আনন্দে মগ্ন; নাসা-পুটাম্—যাঁর নাসারন্ধ্র; আরজ্যৎ—সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়ে; রসনাম্—যাঁর রসনা; কিল—কি আর বলার আছে; অধরপুটে—অধরামৃত পানে; ন্যঞ্চৎ—নত হয়ে; মুখ—যাঁর মুখ; অম্ভঃ-রুহাম্—পদ্মফুলের মতো; দম্ভ—দম্ভের দ্বারা; উদ্গীর্ণ—প্রকাশিত; মহা-ধৃতিম্—মহান ধৈর্য; বহিঃ—বাহ্যিকভাবে; অপি—যদিও; প্রোদ্যৎ—প্রকাশিত হয়ে; বিকার—বিকারসমূহ; আকুলাম্—আকুল।

অনুবাদ

" 'তাঁর নয়নযুগল কংসারি কৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ। কৃষ্ণস্পর্শে তাঁর অঙ্গ অত্যন্ত হরষিত। কৃষ্ণের মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার জন্য তাঁর কর্ণদ্বয় সর্বদা উৎকণ্ঠিত। কৃষ্ণের অঙ্গসুবাস আঘ্রাণ করার জন্য তাঁর নাসিকা প্রফুল্লিত এবং কৃষ্ণের অধরামৃত পান করার জন্য তাঁর রসনা সর্বদাই আকুল। তাঁর মুখপদ্ম আনত করে তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের রোমাঞ্চ আদি বিকারসমূহ তাঁর অঙ্গসমূহে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

তাৎপর্য

এভাবেই শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৬১

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস ।
আমার মোহিনী রাধা, তারে করে বশ ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"তা বিবেচনা করে আমি বুঝতে পারি যে, আমার মধ্যে এমন কোন এক রস আছে, যা আমার মোহিনী শ্রীমতী রাধারাণীকেও সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে।

শ্লোক ২৬২

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার থেকে রাধারাণী যে সুখ পায়, সেই সুখ আস্বাদন করার জন্য আমি সর্বদাই উন্মুখ।

শ্লোক ২৬৩

নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে ।
সেই সুখমাধুর্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"নানাভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই রস আমি আস্বাদন করতে পারিনি। উপরন্তু সেই সুখ-মাধুর্যের ঘ্রাণে আমার চিত্তে তা আস্বাদন করার লোভ বেড়ে যায়।

শ্লোক ২৬৪

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই রস আস্বাদন করার জন্য আমি অবতীর্ণ হয়েছি। বিবিধ প্রকারে আমি শুদ্ধ প্রেমের রস আস্বাদন করব।

শ্লোক ২৬৫

রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে ।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণ-দ্বারে ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"রাগমার্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভক্ত যে ভক্তি করে, তা আমি লীলা-আচরণের দ্বারা শেখাব।

শ্লোক ২৬৬

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু এই তিনটি বাসনা আমার পূর্ণ হয়নি, কেন না বিজাতীয়ভাবে তা আস্বাদন করা যায় না।

শ্লোক ২৬৭

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে ।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অবলম্বন না করলে, এই তিনটি বাসনা পূর্ণ হতে পারে না।

শ্লোক ২৬৮

রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই, রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে এই তিনটি বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমি অবতীর্ণ হব।"

শ্লোক ২৬৯

সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ মনস্থির করলেন। সেই সময় যুগাবতারের আবির্ভাবেরও সময় হল।

শ্লোক ২৭০

সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন ।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য নিষ্ঠাভরে আরাধনা করছিলেন। তাঁর হুঙ্কার শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করল।

শ্লোক ২৭১-২৭২

পিতামাতা, গুরুগণ, আগে অবতারি' ।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥ ২৭১ ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর পিতা-মাতা ও গুরুজনদের অবতরণ করালেন। তার পরে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে তিনি নিজে শচীমাতার গর্ভরূপ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো নবদ্বীপে প্রকাশিত হলেন।

শ্লোক ২৭৩

এই ত' করিলুঁ ষষ্ঠশ্লোকের ব্যাখ্যান ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পাদপদ্ম করি' ধ্যান ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করে আমি এভাবেই ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা করলাম।

শ্লোক ২৭৪

এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুটি শ্লোকের (প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক) আমি যে ব্যাখ্যা করলাম, তার প্রমাণ রয়েছে শ্রীল রূপ গোস্বামীর শ্লোকে।

শ্লোক ২৭৫

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২৭৫ ॥

অপারম্—অসীম; কস্য অপি—কারও; প্রণয়ি-জন-বৃন্দস্য—প্রণয়িণীদের; কুতুকী—কুতূহলী; রস-স্তোমম্—রসসমূহ; হৃত্বা—হরণ করে; মধুরম্—মধুর; উপভোক্তুম্—উপভোগ করার

জন্য; কম্ অপি—কিছু; যঃ—যে; রুচম্—দীপ্তি; স্বাম্—নিজের; আবব্রে—আবৃত করে; দ্যুতিম্—দ্যুতি; ইহ—এখানে; তদীয়াম্—তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত; প্রকটয়ন্—প্রকাশিত হয়েছেন; সঃ—তিনি; দেবঃ—পরমেশ্বর ভগবান; চৈতন্য-আকৃতিঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আকৃতি লাভ করে; অতিতরাম্—মহানভাবে; নঃ—আমাদের প্রতি; কৃপয়তু—তিনি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করুন।

অনুবাদ

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অসংখ্য প্রণয়িণীদের মধ্যে কোন এক জনের (শ্রীমতী রাধারাণীর) অন্তহীন মাধুর্যরস আস্বাদন করার বাসনা করেছিলেন এবং তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাঁর শ্যামকান্তি তপ্তকাঞ্চন বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে তিনি সেই প্রেম আস্বাদন করেছেন। সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন আমাদের কৃপা করেন।"

তাৎপর্য

এটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *স্তবমালার* দ্বিতীয় *চৈতন্যাষ্টকের* তৃতীয় শ্লোক।

শ্লোক ২৭৬

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণম্ ।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতম্ ॥ ২৭৬ ॥

মঙ্গল-আচরণম্—মঙ্গলাচরণ; কৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর; তত্ত্ব-লক্ষণম্—তত্ত্বের লক্ষণ; প্রয়োজনম্—প্রয়োজন; চ—ও; অবতারে—অবতরণ বিষয়ে; শ্লোক—শ্লোক; ষট্‌কৈঃ—ছয়টি; নিরূপিতম্—নিরূপিত হয়েছে।

অনুবাদ

এভাবেই মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণ ও তাঁর অবতরণের প্রয়োজন ছয়টি শ্লোকের মাধ্যমে নিরূপিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭৭

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্যাবতারের মূলপ্রয়োজন-কথন' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ

এই পরিচ্ছেদে মূলত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর বিলাস মূর্তি অর্থাৎ দ্বিতীয় দেহ হচ্ছেন শ্রীবলরাম।

এই জড় জগতের অতীত চিদাকাশ বা *পরব্যোম*, যেখানে অসংখ্য চিন্ময় ধাম রয়েছে এবং সেই চিন্ময় ধামের সব চাইতে উপরে রয়েছে 'কৃষ্ণলোক'। শ্রীকৃষ্ণের আলয় কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল নামক তিনটি ভাগ রয়েছে। সেই ধামে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন (অপ্রাকৃত কামদেব) ও অনিরুদ্ধ—এই চার রূপে বিস্তার করেছেন। তাঁদের বলা হয় আদি চতুর্ব্যূহ।

সেই কৃষ্ণলোকে শ্বেতদ্বীপ বা বৃন্দাবন নামক চিন্ময় ধাম রয়েছে। কৃষ্ণলোকের নীচে পরব্যোমে অগণিত বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে। প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোকে আদি চতুর্ব্যূহের শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজমান। কৃষ্ণলোকে যিনি শ্রীবলরাম, তিনি হচ্ছেন মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁর বিলাস মূর্তি পরব্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। তাঁর চিৎ-শক্তির প্রভাবে মহাসঙ্কর্ষণ পরব্যোমের সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক ধারণ করেন। সেখানকার সমস্ত জীব নিত্যমুক্ত। সেখানে মায়াশক্তির অবস্থিতি নেই। সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বিরাজমান।

বৈকুণ্ঠলোকের বাইরে ব্রহ্মলোক নামক শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় প্রকাশ রয়েছে। তার বাইরে রয়েছে চিন্ময় কারণ-সমুদ্র। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে, তাকে স্পর্শ না করে জড়া প্রকৃতির (মায়ার) অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে রয়েছেন মূল-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদিপুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। এই মহাবিষ্ণু দূর থেকে মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর চিন্ময় দেহের প্রতিবিম্বের দ্বারা তিনি মায়ার উপাদান কারণে মিলিত হন।

মায়াই উপাদান কারণরূপে *প্রধান* এবং নিমিত্ত কারণরূপে *প্রকৃতি*। জড়া প্রকৃতি জড়, তাই তার স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের ফলে তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে তিনি জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। তাই, জড়া প্রকৃতি জড় জগতের প্রকাশের প্রধান কারণ নয়। পক্ষান্তরে, মায়ার প্রতি মহাবিষ্ণুর চিন্ময় দৃষ্টিপাতই জড় জগতের প্রকাশের কারণ।

সেই কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই সমস্ত জীবের উৎস গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বিস্তার লাভ করেন এবং তিনিই হচ্ছেন সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটি বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করে তাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতিরূপে বিরাজমান। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শয়ন করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে প্রকাশ করেন। তাঁরই এক অংশকে বিরাটরূপে কল্পনা করা হয়।

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি করে দ্বীপ রয়েছে, যেখানে

শ্রীবিষ্ণু অবস্থান করেন। তাই, এই পরিচ্ছেদে দুটি শ্বেতদ্বীপের বর্ণনা করা হয়েছে—একটি কৃষ্ণলোকে এবং অন্যটি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষীরসমুদ্রে। কৃষ্ণলোকের শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন ধাম থেকে অভিন্ন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী লীলাবিলাস করেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত শ্বেতদ্বীপে ভগবানের শেষমূর্তি ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

কৃষ্ণলোকে বলদেবই হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তাই নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন মূল সঙ্কর্ষণ। পরব্যোমে মহাসঙ্কর্ষণ এবং তাঁর পুরুষাবতারেরা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অংশ ও কলা।

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার তাঁর গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রার ইতিহাস এবং সেখানে তাঁর সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভের কথা বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে জানা যায় যে, তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল কাটোয়া জেলায় নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীমীনকেতন রামদাসকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভ্রাতা তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু গুণার্ণব মিশ্র নামক জনৈক পূজারীর প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য বুঝতে না পেরে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা সেই পূজারীর পক্ষ অবলম্বন করেন। তাই, মীনকেতন রামদাস দুঃখিত হয়ে তাঁর বংশী ভেঙ্গে সেখান থেকে চলে যান। তাতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার সর্বনাশ হয়। সেই রাত্রে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করে স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং পরের দিনই বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে তাঁকে নির্দেশ দেন।

শ্লোক ১

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্ ।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **অনন্ত**—অন্তহীন; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **ঐশ্বর্যম্**—যাঁর ঐশ্বর্য; **শ্রীনিত্যানন্দম্**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যস্য**—যাঁর; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছার প্রভাবে; **তৎ-স্বরূপম্**—তাঁর স্বরূপ; **অজ্ঞেন**—অজ্ঞ লোকদের দ্বারা; **অপি**—ও; **নিরূপ্যতে**—নিরূপিত হতে পারে।

অনুবাদ

আমি অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি। তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে মূর্খ লোকেরাও তাঁর স্বরূপ নিরূপণ করতে পারে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হোক! জয় হোক সমস্ত গৌরভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৩

এই ষট্‌শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা ।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

ছয়টি শ্লোকে আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা বর্ণনা করেছি। এখন, পাঁচটি শ্লোকে আমি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪

সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। শ্রীবলরাম হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় দেহ।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ এবং তাঁর প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন শ্রীবলরাম। পরমেশ্বর ভগবান অনন্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর যে সমস্ত রূপ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন তাঁদের বলা হয় *স্বাংশ* এবং যে সমস্ত রূপ সীমিত শক্তিসম্পন্ন (জীব) তাদের বলা হয় *বিভিন্নাংশ*।

শ্লোক ৫

একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায় ।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের দুজনের স্বরূপ একই। কেবল তাঁদের দেহ ভিন্ন। শ্রীবলরাম হচ্ছেন কৃষ্ণের প্রথম কায়ব্যূহ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর লীলায় সহায়তা করেন।

তাৎপর্য

শ্রীবলরাম হচ্ছেন ভগবানের *স্বাংশ* প্রকাশ, তাই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের শক্তিতে কোন পার্থক্য নেই। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে তাঁদের দৈহিক গঠন। ভগবানের প্রথম কায়ব্যূহরূপে বলরাম হচ্ছেন প্রথম চতুর্ব্যূহের প্রধান বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে তিনি হচ্ছেন তাঁর প্রধান সহায়।

শ্লোক ৬

সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে শ্রীবলরাম আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৭

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স
নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—পরব্যোমের মহাসঙ্কর্ষণ; কারণ-তোয়-শায়ী—কারণ-সমুদ্রে শায়িত কারণোদকশায়ী বিষ্ণু; গর্ভোদশায়ী—ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভসমুদ্রে শায়িত গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; চ—এবং; পয়ঃ-অব্ধিশায়ী—ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু; শেষঃ—শ্রীবিষ্ণুর শয্যা শেষনাগ; চ—এবং; যস্য—যাঁর; অংশ—অংশ; কলাঃ—অংশের অংশ; সঃ—তিনি; নিত্যানন্দ-আখ্য—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নামক; রামঃ—শ্রীবলরাম; শরণম্—আশ্রয়; মম—আমার; অস্তু—হোন।

অনুবাদ

সঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং শেষনাগ যাঁর অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ রাম আমার আশ্রয় হোন।

তাৎপর্য

শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁর কড়চায় এই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই শ্লোকটি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রথম চৌদ্দটি শ্লোকের সপ্তম শ্লোকরূপেও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ৮

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবলরাম হচ্ছেন মূল-সঙ্কর্ষণ। তিনি পাঁচটি রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

শ্লোক ৯

আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় ।
সৃষ্টিলীলা-কার্য করে ধরি' চারি কায় ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় সহায়তা করেন এবং অন্য চারটি রূপ ধারণ করে তিনি সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন।

শ্লোক ১০

সৃষ্ট্যাদিক সেবা,—তাঁর আজ্ঞার পালন ।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করে তিনি সৃষ্টিকার্য সম্পাদনরূপ সেবা করেন এবং শেষরূপে তিনি বিবিধভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

তাৎপর্য

তত্ত্বজ্ঞদের মত অনুসারে আদি চতুর্ব্যূহের প্রধান বলরাম হচ্ছেন মূল-সঙ্কর্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরাম নিজেকে পাঁচটি রূপে প্রকাশিত করেন—(১) মহা-সঙ্কর্ষণ, (২) কারণাব্ধিশায়ী বিষ্ণু, (৩) গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, (৪) ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং (৫) শেষনাগ। এই পাঁচটি অংশ-প্রকাশ চেতন ও জড় উভয় জগতেরই প্রকাশের কার্য সম্পাদন করেন। এই পাঁচটি রূপে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন। তাঁর প্রথম চারটি রূপ জড় সৃষ্টির কার্য সম্পাদন করেন এবং শেষরূপে কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সেবা করেন। শেষনাগকে বলা হয় অনন্ত, কেন না অন্তহীনভাবে ভগবানের সেবা করে তিনি ভগবানের অনন্ত প্রকাশের সহায়তা করেন। শ্রীবলরাম হচ্ছেন সেবক-ঈশ্বর, যিনি সৎ ও চিৎ বিষয়ে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, যিনি হচ্ছেন সেই সেবক-ঈশ্বর-ভগবান বলরাম, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদরূপে একইভাবে সেবা করেন।

শ্লোক ১১

সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বরূপে ইনি শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ আনন্দ আস্বাদন করেন। সেই শ্রীবলরাম হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সহচর শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্লোক ১২

সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোকে ।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্বলোকে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

চারটি শ্লোকে আমি এই সপ্তম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি, যাতে সমস্ত জগদ্বাসী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব জানতে পারে।

শ্লোক ১৩

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৩ ॥

মায়া-অতীতে—মায়া সৃষ্টির অতীত; ব্যাপি—সর্বব্যাপক; **বৈকুণ্ঠ-লোকে**—চিৎ-জগৎ বৈকুণ্ঠলোকে; **পূর্ণ-ঐশ্বর্যে**—সমগ্র ঐশ্বর্য সমন্বিত; **শ্রীচতুর্ব্যূহ-মধ্যে**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে; **রূপম্**—রূপ; **যস্য**—যাঁর; **উদ্ভাতি**—প্রকাশ পাচ্ছে; **সঙ্কর্ষণ-আখ্যম্**—সঙ্কর্ষণ নামক; **তম্**—তাঁকে; **শ্রীনিত্যানন্দরামম্**—শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামকে; **প্রপদ্যে**—আমি প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

মায়াতীত, সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বিত চতুর্ব্যূহের মধ্যে যিনি সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা থেকে উদ্ধৃত। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রথম চতুর্দশ শ্লোকের মধ্যে অষ্টম শ্লোকরূপে এই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শ্লোক ১৪

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম ।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

জড়া প্রকৃতির পারে রয়েছে পরব্যোম নামে ধাম। শ্রীকৃষ্ণের মতো এই ধামও ষড়ৈশ্বর্য আদি সব রকম চিন্ময় ঐশ্বর্যে পূর্ণ।

তাৎপর্য

সাংখ্য-দর্শন অনুসারে জড়া প্রকৃতি চব্বিশটি উপাদান দ্বারা রচিত—পাঁচটি স্থূল জড় উপাদান, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি তন্মাত্র (ইন্দ্রিয়ের বিষয়), তিনটি সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং মহৎ-তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল দার্শনিকেরা এই সমস্ত জড় উপাদানের ঊর্ধ্বে উপনীত হতে অক্ষম হয়ে কল্পনা করে যে, তার অতীত যা কিছু তা নিশ্চয় *অব্যক্ত*। কিন্তু চতুর্বিংশতি উপাদানের ঊর্ধ্বে যে জগৎ তা অব্যক্ত নয়, কেন না *ভগবদ্গীতায়* তাকে সনাতন প্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে সনাতন প্রকৃতি, যাকে বলা হয় পরব্যোম বা চিদাকাশ। যেহেতু সেই জগৎ চিন্ময়, তাই সেখানে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। সেখানে সব কিছুই চিন্ময়, সব কিছুই উৎকৃষ্ট এবং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের মতো চিন্ময় রূপসম্পন্ন। সেই চিৎ-জগৎ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ; তা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত নির্বিশেষ জ্যোতি বা সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম চিৎ-জগতের বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজমান। জড় আকাশের সঙ্গে তুলনা করার মাধ্যমে আমরা চিদাকাশ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি। জড় জগতের সূর্যকিরণের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মিছটা ব্রহ্মজ্যোতির তুলনা করা যেতে পারে। ব্রহ্মজ্যোতিতে অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, সেই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক চিন্ময় এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময়। সেই জ্যোতি সূর্যের কিরণ থেকে অনেক অনেক গুণ অধিক উজ্জ্বল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অন্তহীন অংশ ও কলা এই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক অলংকৃত করে বিরাজ করেন। চিদাকাশের সর্বোচ্চভাগে রয়েছে কৃষ্ণলোক। এই কৃষ্ণলোক তিনটি ভাগে বিভক্ত—দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক।

জড়বাদীদের কাছে এই ভগবৎ-ধাম বৈকুণ্ঠ সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। জ্ঞানের অভাবে মূর্খ মানুষদের কাছে সব কিছুই রহস্যাবৃত থাকে। ভগবৎ-ধাম কাল্পনিক নয়। এমন কি এই জড় জগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, যা আমরা আমাদের জড় চক্ষু দিয়ে মহাশূন্যে ভাসতে দেখি, মূর্খ লোকদের কাছে তাও রহস্যাবৃত। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করছে এবং এমন একদিন আসতে পারে, যখন এই পৃথিবীর মানুষ মহাশূন্যে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবে এবং স্বচক্ষে এই সমস্ত অগণিত নক্ষত্রের বৈচিত্র্য দর্শন করতে পারবে। আমাদের এই গ্রহে যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি, প্রতিটি গ্রহেই এই রকম বৈচিত্র্য রয়েছে।

জড় সৃষ্টিতে আমাদের এই পৃথিবী একটি অতি নগণ্য বিন্দুর মতো। তবুও মূর্খ মানুষেরা বৈজ্ঞানিক প্রগতির গর্বে স্ফীত হয়ে, অন্য সমস্ত গ্রহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না জেনে, এই গ্রহের তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে ভিন্ন। তাই, চন্দ্রগ্রহে গেলে মানুষ অনেক ভারী বস্তু উত্তোলন করতে পারবে এবং অনেক বেশি দূরত্ব লাফ দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে। *রামায়ণে* বর্ণনা করা হয়েছে

যে, হনুমান পাহাড়ের মতো ভারী বস্তু তুলতে সক্ষম ছিলেন এবং লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বীকার করেছে যে, তা বাস্তবিকই সম্ভব।

আধুনিক যুগের তথাকথিত সভ্য মানুষদের একটি মস্ত বড় রোগ হচ্ছে, শাস্ত্রে উল্লিখিত সব কিছুর প্রতি তাদের অবিশ্বাস। অবিশ্বাসী মানুষেরা কখনই পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে পারে না, কেন না তারা চিৎ-শক্তির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বটগাছের একটি ছোট্ট ফলে শত শত বীজ রয়েছে এবং প্রতিটি বীজে কোটি কোটি ফল উৎপন্ন করার ক্ষমতা-সম্পন্ন একটি করে বটগাছ রয়েছে। কিভাবে যে সেটি সম্ভব হয়, তা আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলেও প্রকৃতির এই নিয়ম আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বিরাজ করছে। এটি ভগবানের চিৎ-শক্তির এক অতি নগণ্য দৃষ্টান্ত। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা বিশ্লেষণ করতে বৈজ্ঞানিকেরা সম্পূর্ণভাবে অক্ষম।

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই অচিন্ত্য, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তিই কেবল সত্যকে জানতে পারেন। যদিও ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত বিভিন্ন জীব রয়েছে এবং যদিও তারা সকলেই চেতন, তবুও তাদের জ্ঞানের পরিধির তারতম্য রয়েছে। তাই জ্ঞান আহরণ করতে হয় উপযুক্ত পাত্র থেকে। প্রকৃতপক্ষে যথার্থ জ্ঞান কেবল বৈদিক শাস্ত্র থেকেই লাভ করা যায়। *চতুর্বেদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ*—এই সমস্ত শাস্ত্রকে বলা হয় স্মৃতি। এগুলিই যথার্থ প্রামাণিক জ্ঞানের আধার। যদি আমরা যথার্থই জ্ঞান লাভ করতে চাই, তা হলে এই সমস্ত আধার থেকে নিঃসঙ্কোচে আমাদের সেই জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক দ্বারা সব কিছু যাচাই করে দেখার বাসনার ফলে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞানকে শুরুতে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই জ্ঞানের অনুশীলন করলে অচিরেই তার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পক্ষান্তরে, মন ও ইন্দ্রিয়-প্রসূত জ্ঞান পরিণামে সর্বদাই ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। মহান আচার্যরা শাস্ত্রোক্ত বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করে গেছেন। তাঁরা সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর ভাষ্য রচনা করে গেছেন এবং তাঁদের কেউই শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করেননি। শাস্ত্রকে যে অবিশ্বাস করে তাকে বলা হয় নাস্তিক এবং আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত নাস্তিকদের মত যত মহৎ বলেই মনে হোক না কেন, তাদের সিদ্ধান্ত কখনই গ্রহণ করা উচিত নয়। শাস্ত্রে যিনি যথাযথভাবে বিশ্বাসী, তিনি যেই হোন না কেন, তাঁর কাছ থেকেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। শুরুতে এই জ্ঞান অচিন্ত্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যখন উপযুক্তভাবে তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছ থেকে সেই জ্ঞান লাভ করা হয়, তখন তার তাৎপর্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হয় এবং তখন অন্তরের সমস্ত সংশয় দূর হয়।

শ্লোক ১৫

সর্বগ, অনন্ত, বিভু—বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৈকুণ্ঠধাম সর্বব্যাপ্ত, অনন্ত ও বিভু। সেই ধামসমূহ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর অবতারের বাসস্থান।

শ্লোক ১৬

তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক'-খ্যাতি ।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিৎ-জগতের সর্বোপরিভাগে রয়েছে 'কৃষ্ণলোক'। তার তিনটি বিভাগ—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল।

শ্লোক ১৭

সর্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোক-ধাম ।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বোপরিভাগে রয়েছে শ্রীগোকুল, যা ব্রজ, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন নামে পরিচিত।

শ্লোক ১৮

সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম ।
উপর্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তনুর মতো গোকুল সর্বব্যাপ্ত, অনন্ত ও বিভু। তা কোন রকম নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে উপরে ও নীচে উভয় দিকেই বিস্তৃত।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় মহান তত্ত্বজ্ঞানী ও দার্শনিক শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণসন্দর্ভে* কৃষ্ণলোক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান "আমার ধাম" কথাটির উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণলোক সম্বন্ধে জীব গোস্বামী *স্কন্দ পুরাণের* বর্ণনার উল্লেখ করেছেন—

যা যথা ভুবি বর্তন্তে পুর্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।
তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥

"জড় জগতে দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক আদি ভগবানের ধামসমূহ চিৎ-জগতে ভগবৎ-ধামের অবিকল প্রতিরূপ।" অনন্ত, চিন্ময় বৈকুণ্ঠধাম জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। *সায়ম্ভুবতন্ত্রে* চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রের প্রভাব সম্বন্ধে শিব ও পার্বতীর আলোচনায় তা

প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

নানাকল্পলতাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং ব্যাপকং স্মরেৎ ।
অধঃ সাম্যং গুণানাং চ প্রকৃতিঃ সর্বকারণম্ ॥

"মন্ত্র জপ করার সময় সর্বদা চিৎ-জগতের কথা স্মরণ করা উচিত, যা অন্তহীনভাবে ব্যাপ্ত এবং সমস্ত মনোরথ পূর্ণকারী কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। সেই বৈকুণ্ঠলোকের অধোভাগে জড় সৃষ্টির কারণ-স্বরূপ প্রকৃতি অবস্থিত।" শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন স্বতন্ত্রভাবে নিত্যকাল কৃষ্ণলোকে বিরাজমান। ঐ ধামসমূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত আলয় এবং সেগুলি যে জড়া প্রকৃতির উর্ধ্বে অবস্থিত, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন বা গোকুলই সর্বোপরি বিরাজমান গোলোক। *ব্রহ্মসংহিতায়* সর্বোচ্চ ভগবৎ-ধাম গোকুলের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা একটি সহস্র পত্রবিশিষ্ট পদ্মফুলের মতো। পদ্মসদৃশ সেই গ্রহের বহির্ভাগে চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট স্থানকে বলা হয় শ্বেতদ্বীপ। গোকুলের অভ্যন্তর ভাগে নন্দ, যশোদা আদি নিত্য পার্ষদসহ শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানের বিস্তৃত আয়োজন রয়েছে। সেই চিন্ময় ধাম শ্রীবলদেবের শক্তি থেকে উদ্ভূত, যিনি হচ্ছেন শেষ বা অনন্ত। তন্ত্রে আরও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বলদেবের অংশ শ্রীঅনন্তদেবের নিবাসস্থলকে বলা হয় ভগবৎ-ধাম। বৃন্দাবন ধাম হচ্ছে শ্বেতদ্বীপের চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের অভ্যন্তর মণ্ডল।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে বৈকুণ্ঠলোককে ব্রহ্মলোকও বলা হয়। *নারদপঞ্চরাত্রে* বিজয়ের রহস্য উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে—

তৎ সর্বোপরি গোলোকে তত্র লোকোপরি স্বয়ম্ ।
বিহরেৎ পরমানন্দী গোবিন্দোঽতুলনায়কঃ ॥

"চিৎ-জগতের সর্বোচ্চলোক গোলোকে সর্বদা স্বয়ং গোপীনাথ গোকুলপতি গোবিন্দদেব পরমানন্দে বিহার করেন।"

শ্রীল জীব গোস্বামীর প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কৃষ্ণলোক জড় জগতের থেকে বহুদূরে চিৎ-জগতের শ্রেষ্ঠ লোক। চিন্ময় বৈচিত্র্য আস্বাদন করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের জন্য সেখানে তিনটি ভাগ রয়েছে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। এই তিনটি ধামে বিভিন্ন লীলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তিনি তখন সেই সমস্ত নাম সমন্বিত স্থানগুলিতে লীলাবিলাস উপভোগ করেন। পৃথিবীতে ভগবানের বিভিন্ন ধামসমূহ তাঁর সেই আদি আলয় থেকে অভিন্ন, কেন না সেগুলি চিৎ-জগতের সেই সেই স্থানগুলির হুবহু প্রতিরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ধামও শ্রীকৃষ্ণের মতো এবং সেই ধামসমূহ শ্রীকৃষ্ণেরই মতো আরাধ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আরাধ্য এবং তাঁর ধাম বৃন্দাবনও তেমনই আরাধ্য।

শ্লোক ১৯

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।
একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই চিন্ময় ব্রজধাম এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়েও একই স্বরূপে বিরাজমান।

তাৎপর্য

এই সমস্ত ধাম সর্ব শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার প্রভাবে সচল। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর ধামকেও সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে অবতরণ করাতে পারেন। চিৎ-জগতের ভগবৎ-ধাম এবং এই পৃথিবীর ভগবৎ-ধামের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করা উচিত নয়। আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে, এই পৃথিবীতে যে ভগবৎ-ধাম তা জড় এবং চিৎ-জগতের ভগবৎ-ধাম চিন্ময়। সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের ধাম চিন্ময়। আমাদের বর্তমান বদ্ধ অবস্থার প্রভাবে যেহেতু আমরা জড়ের অতীত কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারি না, তাই তাঁর ধাম এবং তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবান স্বয়ং জড়বৎ প্রতিভাত হয়ে আমাদের জড় চক্ষুর গোচরীভূত হন, যাতে আমরা তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পারি। প্রথম দিকে নব্য ভক্তের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হতে পারে, কিন্তু যথাসময়ে ভক্তিমার্গে যথেষ্ট অগ্রসর হলে, দর্শন, স্পর্শন দ্বারা অনুভবনীয় বস্তুতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

শ্লোক ২০

চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ।
চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই জড় জগতে প্রকাশিত ব্রজের ভূমিও চিন্তামণি এবং বন কল্পবৃক্ষময়। কিন্তু চর্মচক্ষে তা জড় জগতের যে-কোন স্থানের মতো একটি স্থান বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁর ধাম ও তিনি স্বয়ং তাঁদের মৌলিক গুরুত্ব না হারিয়ে যুগপৎ বর্তমান থাকতে পারেন। ভগবানের প্রতি প্রেম যখন পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তখন তাঁর ধামের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করা যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় এক মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদের মঙ্গলের জন্য বলেছেন যে, জড় জগতের উপর কর্তৃত্ব করার বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা হয়, তখনই কেবল ধামের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করা যায়। জড় জগৎকে ভোগ করার বিকৃত মনোবৃত্তি ত্যাগের মাত্রা অনুসারে চিন্ময় দৃষ্টির বিকাশ হয়। কোন বদভ্যাসের প্রভাবে কারও যখন কোন রোগ হয়, তখন সেই রোগ নিরাময়ের জন্য তাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় এবং সেই সঙ্গে যে বদভ্যাসের ফলে তার রোগ হয়েছিল, সেই বদভ্যাস ত্যাগ করতে হয়। বদভ্যাসগুলি বজায় রেখে কেবল চিকিৎসকের সহায়তায়

কখনই রোগমুক্ত হওয়া যায় না। আধুনিক জড় সভ্যতা ভবরোগ নিরাময়ের জন্য এই জড় জগতের অসুস্থ পরিবেশের সংস্কার করার চেষ্টা করছে না। জীব হচ্ছে ভগবানের মতো চিন্ময়। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবান হচ্ছেন পূর্ণ এবং জীব হচ্ছে অণুসদৃশ। গুণগতভাবে তারা এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন। তাই, জীব যেহেতু তার স্বরূপে চিন্ময়, তাই চিন্ময় পরিবেশেই কেবল সে যথাযথভাবে সুখী হতে পারে এবং সেই চিন্ময় পরিবেশ হচ্ছে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক সমন্বিত চিৎ-জগৎ বা ভগবৎ-ধাম। জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ চিন্ময় জীবকে তার রোগগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য, যে কারণে রোগটি হয়েছে, সেই কারণটি নির্মূল করে রোগমুক্ত হবার চেষ্টা করতে হবে।

জড় বিষয়ে মগ্ন মূর্খ মানুষেরা জনসাধারণের নেতা সেজে অনর্থক গর্বিত হয়। এই ধরনের নেতারা কখনই মানুষকে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের পথ প্রদর্শন করতে পারে না। এই ধরনের মোহগ্রস্ত নেতারা একের পর এক 'পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা' করতে পারে, কিন্তু তারা কখনও ত্রিতাপ দুঃখ-জর্জরিত মানুষের দুঃখ দূর করতে পারে না। রাজনৈতিক সংগ্রাম করে কখনও প্রকৃতির আইনকে আয়ত্ত করা যায় না। প্রকৃতির চরম আইন মৃত্যুর কাছে সকলকেই বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হচ্ছে ভবরোগের লক্ষণ। তাই, এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়াই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য।

শ্লোক ২১

প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

তার স্বরূপ-প্রকাশ প্রেমনেত্রে দৃষ্ট হয়, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপসখা ও গোপসখীদের সঙ্গে নিত্য লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ২২

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২২ ॥

চিন্তামণি—চিন্তামণি; **প্রকর**—রচিত; **সদ্মসু**—গৃহসমূহে; **কল্পবৃক্ষ**—কল্পবৃক্ষ দ্বারা; **লক্ষ**—লক্ষ লক্ষ; **আবৃতেষু**—আবৃত; **সুরভীঃ**—সুরভি গাভী; **অভিপালয়ন্তম্**—পালন করছেন;

লক্ষ্মী—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; **সহস্র**—হাজার হাজার; **শত**—শত শত; **সম্ভ্রম**—সম্ভ্রম সহকারে; **সেব্যমানম্**—সেবিত হচ্ছেন; **গোবিন্দম্**—গোবিন্দ; **আদিপুরুষম্**—আদিপুরুষ; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

অনুবাদ

"যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চিন্তামণির দ্বারা রচিত স্থানে সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী সুরভি গাভীদের পালন করছেন এবং যিনি নিরন্তর শত শত লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হচ্ছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/২৯) থেকে উদ্ধৃত। কৃষ্ণলোকের এই বর্ণনাটি আমাদের সেই চিন্ময় জগতের তথ্য প্রদান করছে, যেখানে সব কিছুই কেবল সৎ, চিৎ ও আনন্দময়ই নয়, বরং সেখানে অপর্যাপ্ত ফল-মূল, দুধ, মণি-রত্ন ও উদ্যান, যা গোপাঙ্গনাদের দ্বারা পরিসেবিত এবং যাঁরা সকলেই হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী। কৃষ্ণলোক হচ্ছে চিৎ-জগতের সর্বোচ্চ লোক এবং তার নীচে রয়েছে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতে* পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম-চেতনার বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ব্রহ্মা নারায়ণের কৃপায় বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেছিলেন। তারপর, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি কৃষ্ণলোক দর্শন করেছিলেন। এই অপ্রাকৃত দর্শন অনেকটা টেলিভিশনে চন্দ্রগ্রহ দর্শনের মতো। টেলিভিশনে দর্শন সাধিত হয় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলোক তরঙ্গের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে, কিন্তু চিন্ময় দর্শন সম্ভব হয় অন্তর্মুখী তপশ্চর্যা এবং ধ্যানের প্রভাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠলোকে জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণগুলির কোন প্রভাব নেই। জড় জগতে সর্বোচ্চ গুণ হচ্ছে সত্ত্বগুণ, যা সত্য, শৌচ, মানসিক সমতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, সরলতা, ভগবৎ-বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান আদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ভূষিত। কিন্তু তা হলেও এই সমস্ত গুণগুলি রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা মিশ্রিত। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকের গুণগুলি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ এবং তাই সেগুলি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত এবং শুদ্ধ চিন্ময়। চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকের সঙ্গে জড় জগতের কোন গ্রহেরই, এমন কি সত্যলোকেরও গুণগতভাবে কোন তুলনা হয় না। জড় জগতের পাঁচটি স্বাভাবিক গুণ—অজ্ঞান, ক্লেশ, অহঙ্কার, ক্রোধ ও মাৎসর্য—চিৎ-জগতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

জড় জগতে সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় যা কিছুই আমরা উপলব্ধি করি, এমন কি আমাদের দেহ এবং মন, তা-ও সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টির শুরু হয় ব্রহ্মার জীবন থেকে এবং এই জড় জগতের সর্বত্র প্রকাশিত এই সৃষ্টিতত্ত্ব রজোগুণের প্রভাবজাত। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যেহেতু রজোগুণ অনুপস্থিত, তাই সেখানে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না; সেখানে সব কিছুরই অস্তিত্ব নিত্য এবং যেহেতু সেখানে তমোগুণ অনুপস্থিত, তাই সেখানে কোন কিছুরই ধ্বংস বা বিনাশ হয় না। জড় জগতে সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা সব কিছু চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু জড় জগতের সত্ত্বগুণ

রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত, তাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের শত শত পরিকল্পনা সত্ত্বেও কোন কিছুই চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই জড় জগতে নিত্যত্ব, পূর্ণজ্ঞান ও আনন্দ নেই। কিন্তু চিৎ-জগতে জড়া প্রকৃতির গুণগুলি নেই বলে, সব কিছুই সেখানে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। সেখানে নিত্য আনন্দময় অস্তিত্বের ফলে সব কিছুই কথা বলতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, শুনতে পারে এবং দেখতে পারে। সেখানকার পরিবেশ এমনই যে, কাল ও স্থান স্বাভাবিকভাবেই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রভাব থেকে মুক্ত। চিদাকাশে কোন পরিবর্তন হয় না, কেন না সেখানে কালের কোন প্রভাব নেই। তেমনই, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব, যা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিস্মৃতির ফলে জড় জগতের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে, তা সেখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত।

ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতির চিন্ময় কণারূপে আমরা সকলেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং গুণগতভাবে তাঁর সঙ্গে এক। কিন্তু জড় শক্তি সেই চিৎ-স্ফুলিঙ্গকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে, কিন্তু সেই আচ্ছাদন থেকে মুক্ত বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবেরা কখনও তাঁদের স্বরূপ বিস্মৃত হন না। তাঁরা তাঁদের স্বরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থেকে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকেন। যেহেতু তাঁরা নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাই স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহ চিন্ময়, কেন না জড় ইন্দ্রিয় দিয়ে কেউ কখনও ভগবানের সেবা করতে পারে না। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা জড় জগৎ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জড় ইন্দ্রিয় সমন্বিত নন।

অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে, যে স্থান জড় গুণ রহিত তা নিশ্চয়ই আকারবিহীন এবং শূন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগৎ গুণরহিত নয়, সেখানেও গুণ রয়েছে, তবে সেই গুণ জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে ভিন্ন, কেন না সেখানে সব কিছুই নিত্য, অসীম ও বিশুদ্ধ। সেই জগৎ স্বতঃপ্রকাশিত এবং তাই সেখানে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি অথবা বিদ্যুতের আলোকের কোন প্রয়োজন নেই। সেখানে একবার গেলে আর জড় দেহ নিয়ে জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবৎ-বিদ্বেষী আর ভগবৎ-বিশ্বাসীর পার্থক্য নেই, কেন না সেখানে সকলেই জড় গুণ থেকে মুক্ত এবং তাই সুর ও অসুর উভয়েই সমান আনুগত্য সহকারে ভগবানের সেবা করেন।

বৈকুণ্ঠবাসীদের উজ্জ্বল শ্যাম অঙ্গকান্তি জড় জগতের নিষ্প্রভ সাদা অথবা কালো রং থেকে অনেক বেশি মনোহর ও আকর্ষণীয়। তাঁদের দেহ চিন্ময় হওয়ার ফলে জড় জগতের কোন কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা করা যায় না। বর্ষার জলভরা মেঘে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, সেই সৌন্দর্য বৈকুণ্ঠবাসীদের অঙ্গকান্তির সৌন্দর্যের আভাসমাত্র প্রদান করে। সাধারণত বৈকুণ্ঠবাসীরা পীত বসন পরিধান করেন। তাঁদের দেহ অত্যন্ত কোমল ও সুন্দর এবং তাঁদের চক্ষু পদ্মফুলের পাপড়ির মতো। শ্রীবিষ্ণুর মতো বৈকুণ্ঠবাসীরা চতুর্ভুজ এবং তাঁদের চারটি হাতে তাঁরা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন। তাঁদের প্রশস্ত বক্ষ অত্যন্ত সুন্দর এবং জড় জগতে কখনও দেখা যায় না এমন সমস্ত মণি-রত্ন খচিত

এবং হীরকের মতো উজ্জ্বল ধাতু নির্মিত কণ্ঠহার দ্বারা শোভিত। বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও জ্যোতির্ময়। তাঁদের কারও কারও অঙ্গকান্তি প্রবালের মতো, কারও বৈদুর্যমণির মতো এবং কারও পদ্মফুলের মতো, আর তাঁদের সকলেরই কানে রয়েছে অপূর্ব মণি-রত্ন খচিত কর্ণভূষণ, মাথায় তাঁদের ফুলের মুকুট।

বৈকুণ্ঠলোকে বিমান রয়েছে, কিন্তু তাতে কোন আওয়াজ নেই। জড় জগতের বিমান মোটেই নিরাপদ নয়; যে কোন সময় তাতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কেন না জড় পদার্থ সর্বতোভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ। কিন্তু চিৎ-জগতের বিমান চিন্ময় এবং সেগুলি চিন্ময়ভাবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। সেই সমস্ত বিমান ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ অথবা পরিকল্পনাকারীদের যাত্রীরূপে বহন করে না, অথবা মালপত্র বা ডাক বহন করে না, কেন না সেখানে সেগুলির কোনও প্রয়োজন নেই। সেই সমস্ত বিমান কেবল প্রমোদ-ভ্রমণের জন্য এবং বৈকুণ্ঠবাসীরা স্বর্গীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত সহচরীদের সঙ্গে সেই সমস্ত বিমানে চড়ে ভ্রমণ করেন। বৈকুণ্ঠের স্ত্রী ও পুরুষে পরিপূর্ণ সমস্ত বিমান চিদাকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তা যে কত সুন্দর তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, তবে আকাশে বিদ্যুৎ সমন্বিত মেঘের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁদের সৌন্দর্যের তুলনা করা যেতে পারে। বৈকুণ্ঠলোকের চিদাকাশ সর্বদাই এভাবেই অলংকৃত।

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণ ঐশ্বর্য নিরন্তর বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত। সেখানে সহস্র শত লক্ষ্মীদেবী অন্তহীন অনুরাগ সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন। সখীপরিবৃতা এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবীরা নিরন্তর অপ্রাকৃত আনন্দোৎসব-মুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেন। তাঁরা সর্বক্ষণ ভগবানের মহিমা কীর্তনে মুখর।

চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং জড় আকাশের অনুপাতে চিদাকাশের পরিমাণ তিনগুণ বেশি। এভাবেই সহজেই অনুমান করা যায় যে, জড়বাদীরা যেভাবে এই ছোট্ট পৃথিবীতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, ভগবানের সৃষ্টিতে তা কত নগণ্য। এই পৃথিবীর কি কথা, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৃষ্টিতে একটি সর্ষের মতো ক্ষুদ্র। কিন্তু মূর্খ জড়বাদী এখানে সুখে থাকবার পরিকল্পনা করতে করতে তার দুর্লভ মানব-জন্মের অপচয় করে। কারণ, তার সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জড় বিষয়ে মগ্ন থেকে সময়ের অপচয় না করে, তার উচিত সরল ও সাদাসিধেভাবে জীবন যাপন করে পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকা। এভাবেই সে চিরস্থায়ী জাগতিক অশান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

কোন জড়বাদী যদি উন্নত জড় সুখ উপভোগ করতে চায়, তা হলে সে উচ্চতরলোকে গিয়ে জড় সুখ উপভোগ করতে পারে, যা এই পৃথিবীর মানুষের কল্পনারও অতীত। সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা হচ্ছে এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কিন্তু কেউ যদি জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকে, তা হলে সে যৌগিক শক্তির মাধ্যমে স্বর্গ আদি জড় জগতের উচ্চতর লোকে যেতে পারে। মহাকাশচারীদের মহাকাশ-যান সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি শিশুর খেলনার মতো। অষ্টাঙ্গ-

যোগের জড় কৌশল হচ্ছে প্রাণবায়ুকে মূলাধার থেকে নাভিতে, নাভি থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে কণ্ঠে, কণ্ঠ থেকে ভ্রূ-যুগলের মধ্যে এবং ভ্রূ-যুগলের মধ্য থেকে মস্তিষ্কে এবং সেখান থেকে ঈপ্সিত যে কোন গ্রহে চালিত করা। জড় বৈজ্ঞানিকেরা বায়ু ও আলোকের গতি বিবেচনা করে, কিন্তু মন ও বুদ্ধির গতি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। মনের গতি সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা রয়েছে, কারণ এক নিমেষের মধ্যে মন হাজার হাজার মাইল দূরে যেতে পারে। বুদ্ধি তার থেকেও সূক্ষ্ম। বুদ্ধির থেকে সূক্ষ্ম আত্মা, যা মন ও বুদ্ধির মতো জড় পদার্থ নয়, তা চিন্ময় বা অ-জড়। আত্মা বুদ্ধির থেকে শত সহস্র গুণ সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী। এভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কি প্রবল গতিতে আত্মা এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণ করতে পারে। এখানে এটি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, আত্মা কোন জড় যানের সাহায্য ব্যতীত নিজস্ব শক্তিতে ভ্রমণ করতে পারে।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন সর্বস্ব পাশবিক সভ্যতার ফলে মানুষ আত্মার শক্তির কথা ভুলে গিয়েছে। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আত্মা হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ। মানুষ যখন আত্মারূপে তার যথার্থ পরিচয় জানতে না পারে, তখন তার মানবজন্ম ব্যর্থ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই বিপথগামী সভ্যতা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে যোগীরা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলিতে ভ্রমণ করতে পারেন। জীবনীশক্তি যখন মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত করা হয়, তখন চোখ, নাক, কান প্রভৃতি দিয়ে সেই শক্তি ফেটে বেরোবার সম্ভাবনা থাকে। সেই স্থানগুলিকে বলা হয় জীবনীশক্তির সপ্তম কক্ষপথ। কিন্তু সিদ্ধ যোগীরা বায়ু রুদ্ধ করে এই সমস্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ করতে পারেন। তারপর যোগী ভ্রূযুগলের মধ্যে জীবনীশক্তিকে একাগ্রীভূত করেন। সেই অবস্থায়, যোগী স্থির করতে পারেন দেহত্যাগ করার পর তিনি কোন গ্রহে যাবেন। তখন তিনি মনস্থ করতে পারেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধাম চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে যাবেন, না এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন উচ্চতর লোকে যাবেন। সিদ্ধযোগীর সেই স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।

শুদ্ধ চেতনায় দেহত্যাগ করার সিদ্ধিলাভ করেছেন যে সিদ্ধ যোগী, তাঁর কাছে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে যাওয়া, একজন সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে যাওয়ার মতোই সহজ। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জড় দেহ হচ্ছে চিন্ময় আত্মার আবরণ। মন ও বুদ্ধি হচ্ছে প্রথম সূক্ষ্ম আবরণ এবং মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত স্থূল দেহটি হচ্ছে আত্মার বাইরের আবরণ। যে উন্নত আত্মা যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে জানতে পেরেছেন, যিনি জড় বস্তু ও চিন্ময় আত্মার সম্পর্কের কথাও অবগত হয়েছেন, তিনি আত্মার স্থূল আবরণটি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যথাযথভাবে ত্যাগ করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি আমাদের যে কোনও জায়গায় থাকবার সুযোগ দিয়েছেন। চিৎ-জগতে অথবা

এই জড় জগতে, যে কোন গ্রহে আমরা আমাদের বাসনা অনুসারে থাকতে পারি। কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে আমরা জড় জগতে অধঃপতিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করি। মিলটনের Paradise Lost কবিতায় জড় জগতে আত্মার স্বীয় ইচ্ছার প্রভাবে দুঃখময় জীবন যাপন করার সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনই, আত্মার বাসনার প্রভাবে সে আবার স্বর্গ পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং তার প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

মৃত্যুর অন্তিম সময়ে দুই ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করে ইচ্ছা অনুসারে আত্মাকে পরিচালিত করা যায়। সেই সময় জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাইলে, এক পলকেরও কম সময়ে চিন্ময় শরীরে বৈকুণ্ঠলোকে চলে যাওয়া যায়। সেই চিন্ময় ধামে চিন্ময় শরীর নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তাকে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় জড় শরীরই ত্যাগ করার সংকল্প করে জীবনীশক্তিকে মস্তিষ্কের সর্বোচ্চভাগে উন্নীত করে ব্রহ্মরন্ধ্র নামক মস্তিষ্কের ছিদ্রপথ দিয়ে দেহত্যাগ করতে হয়। যোগ অনুশীলনে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে এটি অত্যন্ত সহজসাধ্য।

অবশ্যই মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, তাই সে যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না চায়, তা হলে সে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হয়ে জড় জীবন উপভোগ করতে পারে এবং সিদ্ধলোকে যেতে পারে, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, স্থান ও কালকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ ক্ষমতা-সম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষরা বাস করেন। জড় জগতের এই উচ্চস্তরের লোকগুলিতে যেতে হলে, মন ও বুদ্ধির (সূক্ষ্ম জড় পদার্থের) আবরণ ত্যাগ করতে হয় না। তবে স্থূল আবরণের (জড় দেহের) বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হয়।

প্রতিটি গ্রহেরই বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ রয়েছে এবং কেউ যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিশেষ লোকে যেতে চায়, তা হলে তাকে সেই গ্রহের অবস্থা অনুযায়ী উপযোগী জড় দেহ গ্রহণ করতে হয়। যেমন, কেউ যদি ভারতবর্ষ থেকে ভিন্ন পরিবেশ সমন্বিত ইউরোপে যেতে চায়, তা হলে তাকে সেখানকার পরিবেশের উপযোগী পোশাক পরতে হয়। তেমনই, কেউ যদি চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে যেতে চায়, তা হলে তাকে সম্পূর্ণরূপে দেহ পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি এই জড় জগতের উচ্চতর গ্রহে যেতে চায়, তা হলে তাকে মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ দ্বারা গঠিত স্থূল জড় দেহটি ত্যাগ করতে হয়, তবে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম জড় দেহটি বজায় রাখতে পারে।

কেউ যখন চিন্ময় ধামে যান, তখন তাঁকে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহেরই পরিবর্তন করতে হয়, কেন না চিন্ময় জগতে চিন্ময় শরীর নিয়ে যেতে হয়। কেউ যদি সেই রকম বাসনা করেন, তা হলে মৃত্যুর সময় এই পোশাকের পরিবর্তন আপনা থেকেই হবে।

ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, দেহত্যাগের সময়ে বাসনা অনুসারে জীব তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়। মনের বাসনা আত্মাকে উপযুক্ত পরিবেশে বহন করে নিয়ে

যায়, ঠিক যেমন বায়ু সৌরভকে একস্থান থেকে আর একস্থানে নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত যারা ঘোর বিষয়ী, যারা আজীবন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকে, তারা মৃত্যুর সময় দৈহিক ও মানসিক বিশৃঙ্খল অবস্থার প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই ধরনের স্থূল ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিরা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, তাদের অধঃপতিত বাসনা ও সঙ্গের প্রভাবে এমন কিছু বাসনা করে, যা তাদের প্রকৃত স্বার্থের বিরোধী এবং তার ফলে তারা আর একটি নতুন দেহ ধারণ করে, যা তাদের জড় দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়েই তোলে।

তাই মন ও বুদ্ধিকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, যাতে মৃত্যুর সময় সচেতনভাবে এই জগতের উচ্চতর কোন লোকে অথবা চিৎ-জগতে উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হওয়ার বাসনা করা যায়। যে সভ্যতা অবিনশ্বর আত্মার উন্নতির কথা বিবেচনা করে না, তা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন পাশবিক সভ্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

কেউ যদি মনে করে যে, মৃত্যুর পর সমস্ত আত্মা একই স্থানে গমন করে, তা হলে তা নিতান্ত মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মা হয় তার অন্তিম সময়ের বাসনা অনুসারে কোন স্থানে গমন করে, অথবা তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহত্যাগ করার পর কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বিষয়ী ও যোগীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, বিষয়ী তার পরবর্তী দেহ নির্ধারণ করতে পারে না, কিন্তু যোগী উচ্চতরলোকে সুখভোগ করার জন্য সচেতনভাবে উপযুক্ত শরীর ধারণ করতে পারেন। ঘোর বিষয়ীরা সারা জীবন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় পরিবার প্রতিপালন করার জন্য এবং জীবন ধারণের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে এবং রাত্রিতে যৌনসুখ ভোগের চেষ্টায় শক্তি অপচয় করে, অথবা সারাদিন সে কি করেছে সেই কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। জড়বাদীর জীবন এই রকমই একঘেয়ে। ব্যবসায়ী, উকিল, রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, বিচারক, কুলি, পকেটমার, শ্রমিক—সে যাই হোক না কেন, জড়বাদীরা আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন আদি অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত থেকে ভোগবিলাসের অন্বেষণ করতে করতে তাদের দুর্লভ মনুষ্যজন্মের অপচয় করে এবং পারমার্থিক উপলব্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার আসল উদ্দেশ্য সাধন করার পরম দায়িত্ব তারা অবহেলা করে।

পক্ষান্তরে, যোগীরা চেষ্টা করে জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে এবং তাই *ভগবদ্গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকলকে যোগী হওয়ার জন্য। যোগ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আত্মাকে যুক্ত করার পন্থা। তার সামাজিক অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন সাধন না করে, কেবল তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পরিচালনায় যথাযথভাবে এই যোগের অনুশীলন করা যায়। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন রকম যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতীত যোগী তাঁর ইচ্ছামতো যে কোন জায়গায় যেতে পারেন, কেন না যোগী তাঁর দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুতে মন ও বুদ্ধিকে স্থাপন করতে পারেন এবং প্রাণায়ামের দ্বারা তিনি সেই বায়ুকে দেহের বহিঃস্থ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত বায়ুর সঙ্গে মিলিত করতে পারেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের বায়ুর মাধ্যমে তিনি যে কোনও গ্রহে যেতে পারেন এবং সেখানকার আবহাওয়া

অনুসারে উপযুক্ত দেহ ধারণ করতে পারেন। তড়িৎ-অণুর তরঙ্গের বা Electronic Transmission-এর মাধ্যমে বেতার বার্তা প্রেরণের কৌশল তুলনা করলে এই পন্থাটি বোঝা যেতে পারে। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত বার্তা শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে পলকের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে। শব্দের সৃষ্টি হয় আকাশ থেকে এবং পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আকাশের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে মন এবং মনের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে বুদ্ধি। আত্মা বুদ্ধির থেকেও সূক্ষ্ম এবং প্রকৃতিগত ভাবে জড়ের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি কত দ্রুত গতিতে আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে।

মন, বুদ্ধি ও আত্মার মতো সূক্ষ্ম বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করার স্তরে উন্নীত হতে হলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন এবং উপযুক্ত পরিবেশে কঠোর নিয়মানুবর্তিতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে হয়। এই শিক্ষা নির্ভর করে ঐকান্তিক প্রার্থনা, ভগবদ্ভক্তি, যৌগিক সিদ্ধিলাভ এবং আত্মা ও পরমাত্মার প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে যথাযথভাবে মগ্ন হওয়ার উপর। স্থূল জড়বাদী, তা তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক হোন, বৈজ্ঞানিক হোন, মনস্তত্ত্ববিদ হোন, অথবা যাই হোন না কেন, তাঁরা তাঁদের অর্থহীন প্রচেষ্টা এবং বাক্চাতুর্যের মাধ্যমে কখনও এই সাফল্য অর্জন করতে পারেন না।

যে সমস্ত স্থূল জড়বাদী গবেষণাগার ও টেস্ট টিউবের অতীত আর কিছুই জানে না, তাদের থেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী জড়বাদীরা অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। উন্নত স্তরের জড়বাদীরা এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী বৈশ্বানর লোকে গমন করতে পারেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোকের মার্গে অবস্থিত এই বৈশ্বানর লোকে উন্নত স্তরের জড়বাদীরা সব রকমের পাপ এবং তার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারেন। এভাবেই সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়ে জড়াসক্ত জীবাত্মা শিশুমার চক্র নামক ধ্রুবলোকের পরিভ্রমণ পথে আদিত্যলোকে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের বৈকুণ্ঠলোকে গমন করতে পারেন।

যে পবিত্র জড়বাদী বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছেন, কঠোর তপস্যা করেছেন এবং তাঁর সম্পদের অধিকাংশ দান করেছেন, তিনি ধ্রুবলোকে উন্নীত হতে পারেন। সেখানে তিনি যদি আরও যোগ্যতা অর্জন করেন, তা হলে তিনি আরও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের নাভির মধ্য দিয়ে মহর্লোকে প্রবেশ করতে পারেন, যেখানে ভৃগু আদি মুনিরা বাস করেন। এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক প্রলয়ের সময়েও মহর্লোকে বেঁচে থাকা যায়। যখন ব্রহ্মাণ্ডের নীচ থেকে অনন্তদেব প্রলয়াগ্নি উদ্গিরণ করেন, তখন সেই প্রলয় শুরু হয়। এই আগুনের উত্তাপ এমন কি মহর্লোকে পর্যন্ত পৌঁছয় এবং তখন মহর্লোকের অধিবাসীরা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, যার অস্তিত্ব দ্বিপরার্ধকাল।

ব্রহ্মলোকে অসংখ্য বিমান রয়েছে, যেগুলি যন্ত্রের দ্বারা নয়, মন্ত্রের দ্বারা চালিত। ব্রহ্মলোকে মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব বজায় থাকে বলে সেখানকার অধিবাসীদের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি রয়েছে, তবে সেখানে বার্ধক্য, রোগ বা মৃত্যুর ভয় নেই। প্রলয়ের

সময় প্রলয়াগ্নিতে জীবের বিনাশপ্রাপ্তি দেখে তাঁরা সহানুভূতি অনুভব করেন। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের মৃত্যুর মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জড় দেহ নেই, তবে তাঁরা সূক্ষ্ম জড় দেহের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে, চিন্ময় দেহ ধারণ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে পারেন। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা তিন রকম সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। যে সমস্ত পুণ্যবান পুরুষ পুণ্যকর্মের প্রভাবে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরা ব্রহ্মার নিশাবসানে বিভিন্ন গ্রহে আধিপত্য লাভ করতে পারেন। যাঁরা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর আরাধনা করেছেন, তাঁরা ব্রহ্মার সঙ্গে মুক্তিলাভ করতে পারেন। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে পারেন।

বুদ্‌বুদের মতো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফেনার আকারে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তাই কিছু ব্রহ্মাণ্ড কেবল কারণ-সমুদ্রের দ্বারা আবৃত। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতি ক্ষোভিত হয়ে জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি করে। এই জড় উপাদান আটটি এবং সেগুলি ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উপাদানে প্রকাশিত হয়। অহঙ্কারের একটি অংশ হচ্ছে আকাশ, আকাশের একটি অংশ বায়ু, বায়ুর একটি অংশ অগ্নি, অগ্নির একটি অংশ জল এবং জলের একটি অংশ মাটি। এভাবেই চার শত কোটি মাইল স্থান জুড়ে একটি ব্রহ্মাণ্ড। যে যোগী ক্রমে ক্রমে উন্নীত-হয়ে মুক্তি লাভ করতে চান, তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণগুলি একের পর এক ভেদ করতে হয়, অবশেষে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করতে হয়। যিনি তা করতে পারেন, তাঁকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতে জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের এই বর্ণনা কাল্পনিক নয় অথবা অবাস্তব নয়। বৈদিক শাস্ত্রে এই সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্রহ্মার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বাসুদেব ব্রহ্মার কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। কেউ যখন বৈকুণ্ঠ ও পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হয়, তখনই কেবল জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। তাই নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তা করা উচিত এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করা উচিত। সমস্ত শাস্ত্রের শিরোমণি *ভগবদ্‌গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* এই গ্রন্থ দুটিতে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এই যুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই তথ্য অত্যন্ত সরলভাবে প্রদান করে গিয়েছেন, যাতে প্রতিটি মানুষই তা অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে তা ব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

মথুরা ও দ্বারকায় তাঁর চতুর্ব্যূহ রূপ বিস্তার করে তিনি বিবিধ লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ২৪

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ।
সর্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হচ্ছেন আদি চতুর্ব্যূহ, যাঁদের থেকে অন্য সমস্ত চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই বিশুদ্ধ ও চিন্ময়।

শ্লোক ২৫

এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময় ।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

[দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল] এই তিনটি লোকেই কেবল লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের নিয়ে অনন্ত লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ২৬

পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

চিদাকাশে বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে প্রকাশিত হয়ে বিবিধ লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ২৭-২৮

স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৭ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মহৈশ্বর্যময় ।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-বিগ্রহ দ্বিভুজ, কিন্তু নারায়ণরূপে তিনি চতুর্ভুজ। শ্রীনারায়ণ তাঁর চারটি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন এবং তিনি মহা ঐশ্বর্যমণ্ডিত। শ্রী, ভূ ও নীলা শক্তি নিরন্তর তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন।

তাৎপর্য

রামানুজ সম্প্রদায় এবং মধ্ব সম্প্রদায়ে *শ্রী, ভূ* ও *নীলা* শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বঙ্গদেশে *নীলাশক্তিকে* কখনও কখনও *লীলাশক্তি* বলে বর্ণনা করা হয়। এই তিনটি

শক্তি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণের সেবায় নিয়োজিত। ভূতযোগী, সরযোগী ও ভ্রান্তযোগী নামক তিনজন আলোয়ার যখন গেহলী গ্রামে রাত্রে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তখন নারায়ণ তাঁদের দর্শন দান করেছিলেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের *প্রপন্নামৃত* গ্রন্থে নারায়ণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

তার্ক্ষ্যাধিরূঢ়ং তড়িদম্বুদাভং
লক্ষ্মীধরং বক্ষসি পঙ্কজাক্ষম্ ।
হস্তদ্বয়ে শোভিতশঙ্খচক্রং
বিষ্ণুং দদৃশুর্ভগবন্তমাদ্যম্ ॥
আজানুবাহুং কমনীয়গাত্রং
পার্শ্বদ্বয়ে শোভিতভূমিনীলম্ ।
পীতাম্বরং ভূষণভূষিতাঙ্গং
চতুর্ভুজং চন্দনরূষিতাঙ্গম্ ॥

"গরুড়ের পৃষ্ঠে আসীন পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তাঁরা দর্শন করলেন এবং তাঁর বক্ষে তিনি লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করে আছেন। তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘে বিদ্যুতের ঝলকের মতো। তাঁর চারটি হাতের মধ্যে দুটি হাতে তিনি শঙ্খ চক্র ধারণ করে আছেন। তাঁর বাহু আজানুলম্বিত এবং তাঁর সুন্দর অঙ্গ চন্দন-চর্চিত ও উজ্জ্বল অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত। পরণে তাঁর পীতবসন এবং তাঁর দুই পার্শ্বে রয়েছেন ভূমিদেবী ও নীলাদেবী।"

শ্রী, ভূ ও *নীলা* শক্তি সম্বন্ধে *সীতোপনিষদে* বলা হয়েছে—*মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা চেতনাচেতনাত্মিকা। সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি—শক্ত্যাত্মনা ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সাক্ষাচ্ছক্তিরিতি। ইচ্ছাশক্তিস্ত্রিবিধা ভবতি—শ্রী-ভূমি-নীলাত্মিকা।* "ভগবানের পরমা শক্তি মহালক্ষ্মী বিভিন্নরূপা। চেতন ও অচেতন উভয়রূপে তিনি ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও সাক্ষাৎশক্তি রূপে ক্রিয়া করেন। ইচ্ছাশক্তি পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে—*শ্রী*, ভূ ও *নীলা*।"

ভগবদ্‌গীতার (৪/৬) টীকায় শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীমধ্বাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, মাতৃরূপা জড়া প্রকৃতি, যা মায়াশক্তি দুর্গারূপে প্রকাশিত, তিনি *শ্রী*, ভূ ও নীলারূপে কল্পিত হন। যাদের চিৎ-বলের অভাব, তাদের কাছে তিনি মহামায়া রূপে প্রকাশিত হয়ে তাদের বিমোহিত করেন, কেন না তা বিষ্ণুরই শক্তি। যদিও এই শক্তির কোনটির সঙ্গেই অনন্তের সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবুও তাঁরা ভগবানের অধীনতত্ত্ব, কেন না ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শক্তির অধীশ্বর।

ভগবৎসন্দর্ভে (শ্লোক ২৩) শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করেছেন, "*পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে যে, নিত্য মঙ্গলময় ভগবৎ-ধাম *শ্রী*, ভূ ও *নীলা* শক্তিসহ সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। *মহাসংহিতায়* ভগবানের দিব্য নাম ও রূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেখানে জীবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পরমাত্মার শক্তিরূপে দুর্গার উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি

তাঁর লীলাবিলাস বিষয়ে ক্রিয়া করেন এবং বহিরঙ্গা শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা রূপে প্রকাশিতা হন।" শাস্ত্রবচনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের *শ্রীশক্তি* জগৎ পালন করেন, ভূশক্তি জগৎ সৃষ্টি করেন এবং *নীলা* বা দুর্গাশক্তি সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন। এই তিনটি শক্তিই জীবের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ক্রিয়া করেন এবং একত্রে তাঁদের বলা হয় *জীবমায়া*।

শ্লোক ২৯

যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম ।
তথাপি জীবেরে কৃপায় করে এক কর্ম ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও লীলাবিলাস করাই তাঁর একমাত্র ধর্ম, তবুও অধঃপতিত জীবদের প্রতি তাঁর কৃপার প্রভাবে তিনি আর একটি কর্ম করেন।

শ্লোক ৩০

সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যপ্রকার ।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য—এই চার প্রকার মুক্তি দান করে তিনি অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করেন।

তাৎপর্য

দুই রকমের মুক্ত জীব রয়েছেন—ভগবানের কৃপার প্রভাবে মুক্ত এবং স্বীয় চেষ্টার প্রভাবে মুক্ত। যাঁরা নিজেদের চেষ্টায় মুক্তি লাভ করেন, তাঁদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী এবং তিনি ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যান। কিন্তু যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবার প্রভাবে মুক্তি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন, তাঁদের ভগবান চার প্রকার মুক্তি দান করেন, যথা—*সালোক্য* (ভগবানের লোকে বাস), *সামীপ্য* (ভগবানের সান্নিধ্য লাভ), *সার্ষ্টি* (ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ) এবং *সারূপ্য* (ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্তি)।

শ্লোক ৩১

ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাহা নাহি গতি ।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা' সবার স্থিতি ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁরা ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন না; তাঁদের স্থিতি বৈকুণ্ঠের বাইরে।

শ্লোক ৩২

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল ।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

বৈকুণ্ঠলোকের বাইরে রয়েছে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল, তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পরম উজ্জ্বল অঙ্গপ্রভা।

শ্লোক ৩৩

'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার ।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্থানকে বলা হয় সিদ্ধলোক এবং তা জড়া প্রকৃতির অতীত। তা চিৎস্বরূপ, তবে তাতে চিৎ-শক্তির বৈচিত্র্য নেই।

শ্লোক ৩৪

সূর্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্বিশেষ ।
ভিতরে সূর্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডলের বাইরে রয়েছে নির্বিশেষ জ্যোতি, কিন্তু ভিতরে সূর্যের রথ, অশ্ব আদি সূর্যদেবের বিভিন্ন সবিশেষ বৈভব রয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৈকুণ্ঠের বাইরে রয়েছে পরব্যোম, যা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। এই রশ্মিচ্ছটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি। এই জ্যোতির্ময় প্রদেশের নাম সিদ্ধলোক বা ব্রহ্মলোক। নির্বিশেষবাদীরা যখন মুক্তি লাভ করেন, তখন তাঁরা ওই ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যান। সেই চিন্ময় প্রদেশ অবশ্যই জড়াতীত, কিন্তু সেখানে কোন রকম চিন্ময় ক্রিয়া বা চিৎ-বৈচিত্র্য নেই। তাকে সূর্যের কিরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সূর্যকিরণের অভ্যন্তরে রয়েছে সূর্যমণ্ডল, যেখানে সব রকম সবিশেষ বৈচিত্র্য দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৩৫

কামাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥ ৩৫ ॥

কামাৎ—কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে; দ্বেষাৎ—দ্বেষ থেকে; ভয়াৎ—ভয় থেকে; স্নেহাৎ—স্নেহ থেকে; যথা—যেমন; ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; ঈশ্বরে—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; মনঃ—মন; আবেশ্য—সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট করে; তৎ—তা; অঘম্—পাপকর্ম; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; বহবঃ—বহু; তৎ—সেই; গতিম্—গতি; গতাঃ—প্রাপ্ত হয়েছেন।

অনুবাদ

"ভগবানের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে যেমন তাঁর ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনই অনেকেই কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহের দ্বারা তাঁর প্রতি মনকে আবিষ্ট করে এবং তাঁদের পাপকর্ম পরিত্যাগপূর্বক সেই গতি প্রাপ্ত হয়েছেন।"

তাৎপর্য

সূর্য যেমন তার উজ্জ্বল কিরণের দ্বারা সব কিছু পবিত্র করতে পারে, তেমনই পূর্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান যাঁকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। এমন কি যদি কেউ জড়-জাগতিক কামের দ্বারা ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে সেই আকর্ষণও ভগবানের কৃপায় নির্মল ভগবৎ-প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তেমনই, কেউ যদি ভয়বশত অথবা শত্রুতাবশত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে তিনিও ভগবানের প্রতি আকর্ষণের প্রভাবে পবিত্র হন। ভগবান যদিও মহৎ এবং জীব অত্যন্ত নগণ্য, তবুও উভয়ই চিন্ময়। তাই, জীব যখন তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে ভগবানের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান শুরু করেন, তৎক্ষণাৎ সেই পরম মহৎ চিন্ময় পুরুষ (ভগবান) অণুসদৃশ চিন্ময় ব্যক্তিকে (জীবকে) আকর্ষণ করেন এবং তার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৭/১/৩০) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৩৬

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্ ।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৩৬ ॥

যৎ—শাস্ত্রে যে যে স্থানে; অরীণাম্—পরমেশ্বর ভগবানের শত্রুদের; প্রিয়াণাম্—পরমেশ্বর ভগবানের অতি প্রিয় ভক্তদের; চ—এবং; প্রাপ্যম্—প্রাপ্তির; একম্—একত্ব; ইব—এভাবেই; উদিতম্—কথিত; তৎ—তা; ব্রহ্ম—নির্বিশেষ ব্রহ্মের; কৃষ্ণয়োঃ—এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; ঐক্যাৎ—ঐক্যবশত; কিরণ—সূর্যকিরণ; অর্ক—সূর্য; উপমা—উপমা; জুষোঃ—তা বোধগম্য হয়।

অনুবাদ

"শাস্ত্রে যে যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শত্রুদের এবং তাঁর অতি প্রিয় ভক্তদের একত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ রয়েছে, তা ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের একত্ব বিচার করে বলা হয়েছে মাত্র। সূর্য ও সূর্যকিরণের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা বোঝা যেতে পারে; অর্থাৎ, ব্রহ্ম সূর্যকিরণের মতো আর শ্রীকৃষ্ণ সূর্যের মতো।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/২৭৮) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে (পূর্ব ৫/৪১) এই বিষয়ে আলোচনা

করেছেন। সেখানে তিনি *বিষ্ণু পুরাণের* (৪/১৫/১) শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন। এই শ্লোকে মৈত্রেয় ঋষি পরাশর মুনিকে জয় ও বিজয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করার সময় জিজ্ঞাসা করেন, এটি কি করে সম্ভব যে, হিরণ্যকশিপু পরজন্মে রাবণরূপে স্বর্গের দেবতাদের থেকেও অধিক জড় সুখ ভোগ করেছিল, কিন্তু মুক্তি লাভ করেনি, অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন শিশুপালরূপে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়ে তাঁর দেহে লীন হয়ে গিয়ে সে মুক্তি লাভ করেছিল। তার উত্তরে পরাশর মুনি বলেন, হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে শ্রীবিষ্ণুরূপে চিনতে পারেনি। সে নৃসিংহদেবকে পুণ্যকর্মের প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত কোন জীব বলে মনে করেছিল। রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে সে নৃসিংহ-দেবকে চিনতে না পেরে, তাঁকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করেছিল। কিন্তু তবুও নৃসিংহদেবের হাতে নিহত হওয়ার ফলে, সে পরবর্তী জন্মে রাবণরূপে অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিল। রাবণরূপে অসীম জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার ফলে সে রামচন্দ্রকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে পারেনি। তাই যদিও সে শ্রীরামচন্দ্রের হাতেই নিহত হয়েছিল, তবুও সে *সাযুজ্য* মুক্তি বা ভগবানের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি লাভ করতে পারেনি। রাবণরূপে সে শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিল এবং সেই আসক্তির ফলে সে রামচন্দ্রকে দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সেই রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করার পরিবর্তে সে তাঁকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করেছিল। শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত হওয়ার ফলে, সে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। এই শিশুপাল এত ঐশ্বর্যশালী ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার স্পর্ধা তার হয়েছিল। যদিও শিশুপাল সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল, তবুও সে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করত এবং সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর রূপ চিন্তা করত। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে ও শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে, বৈরী ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সে তার পাপকর্মের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরূপে তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা নিহত হয়, তখন নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির প্রভাবে সে তার পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভ করে।

এর থেকে বোঝা যায় যে, এমন কি বৈরী ভাবাপন্ন হয়েও শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করলে এবং তাঁর দ্বারা হত হলে, শ্রীকৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে যাওয়ার মুক্তি লাভ করা যেতে পারে। তা হলে যে সমস্ত ভক্ত প্রীতি ভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রভু বা সখারূপে নিরন্তর চিন্তা করেন, তাদের কি গতি হবে? এই সমস্ত ভক্তরা নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত নির্বিশেষ রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মলোক থেকেও উচ্চতর গতি প্রাপ্ত হবেন। যে ব্রহ্মজ্যোতিতে নির্বিশেষবাদীরা লীন হয়ে যাওয়ার বাসনা করেন, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে ভক্তরা থাকতে পারেন না। ভক্তরা বৈকুণ্ঠলোক অথবা কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন।

চার কুমারদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে জয় ও বিজয় যে জড় জগতে অধঃপতিত হয়েছিলেন, প্রতিকল্পে ভক্তরা সেভাবেই এই জড় জগতে আসেন কি না, সেই বিষয়টিকে

কেন্দ্র করে মৈত্রেয় ঋষি ও পরাশর মুনির মধ্যে এই আলোচনাটি হয়েছিল। মৈত্রেয় ঋষির কাছে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপাল সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময় পরাশর মুনি বলেননি যে, এই দৈত্যরাই পূর্বে জয় ও বিজয় ছিলেন। তিনি কেবল তিনটি জীবনে জন্মান্তরের বর্ণনা করেছেন মাত্র। ভগবৎ-পার্ষদ বৈকুণ্ঠবাসীদের এভাবেই প্রতিকল্পে ভগবানের অবতরণের সময় ভগবানের শত্রুতা করার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কোন বিশেষ কল্পে জয় ও বিজয়ের অধঃপতন হয়েছিল। এমন নয় যে, প্রতি কল্পেই জয় ও বিজয় দৈত্যরূপে এই জগতে আসেন। ভগবানের কিছু পার্ষদেরা প্রতিকল্পে দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য অধঃপতিত হন বলে যে ধারণা রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

জীবের মধ্যে যে সমস্ত প্রবণতাগুলি দেখা যায়, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যেও রয়েছে, কেন না তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ। তাই এটি স্বাভাবিক যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে কখনও কখনও লড়াই করার প্রবণতা দেখা যায়। তাঁর মধ্যে যেমন সৃষ্টি করার, ভোগ করার, বন্ধুত্ব করার, পিতা-মাতা গ্রহণ করার প্রবণতা রয়েছে, তেমনই তাঁর মধ্যে লড়াই করার প্রবণতাও রয়েছে। কখনও কখনও রাজা মহারাজাদের মল্লযোদ্ধা রাখতে দেখা যায়, যাদের সঙ্গে তাঁরা মল্লক্রীড়া করেন, তেমনই ভগবান শ্রীবিষ্ণুও সেই রকম আয়োজন করেন। যে সমস্ত দৈত্য জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, অনেক সময় তাঁরা ভগবানেরই পার্ষদ। যখন ভগবানের লড়াই করার বাসনা হয়, কিন্তু উপযুক্ত কোন অসুর না থাকে, তখন তিনি বৈকুণ্ঠে তাঁর কোন পার্ষদকে অসুররূপে অভিনয় করার জন্য প্রেরণ করেন। যখন বলা হয় যে, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন বুঝতে হবে যে, সেই ক্ষেত্রে তিনি জয় অথবা বিজয় নন—তিনি প্রকৃতই একটি অসুর।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৃহদ্ভাগবতামৃত* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে যে *সাযুজ্য* মুক্তি লাভ হয়, তাকে কখনও জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে গ্রহণ করা যায় না, কারণ গো-ব্রাহ্মণ হত্যাকারী কংসের মতো অসুরও সেই মুক্তি লাভ করেছিল। ভক্তের কাছে সেই মুক্তি অত্যন্ত ঘৃণ্য। ভক্তরা প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু অভক্তেরা হচ্ছে নারকীয় জীবনের পথযাত্রী। ভক্তজীবন ও অসুর-জীবনের মধ্যে সর্বদাই একটি পার্থক্য রয়েছে এবং তাঁদের উপলব্ধির মধ্যেও আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

অসুরেরা সর্বদাই ভক্তদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। তাঁরা ব্রাহ্মণ ও গাভী হত্যা করে। অসুরের পক্ষে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া জীবনের চরম প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু ভক্তের কাছে তা নারকীয়। ভক্তের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসার মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া। যারা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, তাঁরা অসুরদের মতোই ঘৃণ্য। যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত প্রীতি-পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁরা অনেক উচ্চস্তরে রয়েছেন।

শ্লোক ৩৭

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস ।
নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তেমনই, পরব্যোমে নানা রকম চিৎ-শক্তির বিলাস হচ্ছে। নির্বিশেষ জ্যোতির প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকের বাইরে।

শ্লোক ৩৮

নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময় ।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতির্ময় রশ্মি। যারা সাযুজ্য মুক্তি লাভের উপযুক্ত, তারা সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৯

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধ-লোকঃ—সিদ্ধলোক অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্ম; **তু**—কিন্তু; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পারে**—পারে; **যত্র**—যেখানে; **বসন্তি**—বাস করেন; **হি**—অবশ্যই; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধগণ; **ব্রহ্ম-সুখে**—ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার আনন্দে; **মগ্নাঃ**—মগ্ন; **দৈত্যাঃ চ**—দৈত্যরাও; **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **হতাঃ**—নিহত।

অনুবাদ

"অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক রয়েছে। সেখানে সিদ্ধগণ ব্রহ্মসুখে মগ্ন হয়ে বিরাজ করেন। ভগবানের দ্বারা নিহত দৈত্যরাও সেই পদ প্রাপ্ত হন।"

তাৎপর্য

তমঃ শব্দটির অর্থ অন্ধকার। জড় জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে আলোক। পক্ষান্তরে, এই জড় জগৎ অতিক্রম করলে জ্যোতির্ময় চিৎ-জগতে যাওয়া যায়, যার নির্বিশেষ জ্যোতি হচ্ছে সিদ্ধলোক। মায়াবাদী দার্শনিকেরা, যারা পরমেশ্বর ভগবানের দেহে লীন হতে চায় এবং কংস, শিশুপাল আদি অসুরেরা, যারা ভগবানের হস্তে নিহত হয়, তারা ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবিষ্ট হয়। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতির মাধ্যমে যারা কৈবল্য লাভ করে, তারাও সিদ্ধলোক প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকটি *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৪০

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে ।
দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিদাকাশে নারায়ণের চতুর্দিকে দ্বারকার চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ অবস্থান করেন।

তাৎপর্য

চিদাকাশে শ্রীকৃষ্ণের ধাম দ্বারকার চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ রয়েছে। মায়াতীত সেই চিন্ময় চতুর্ব্যূহের মহাসঙ্কর্ষণরূপে শ্রীবলদেব প্রকাশিত।

চিৎ-জগতের সমস্ত ক্রিয়া শুদ্ধ সত্ত্বে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত হয়। ছয়টি চিন্ময় ঐশ্বর্যরূপে তাদের বিস্তার হয়, যা হচ্ছে সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় এবং পরম গতি মহাসঙ্কর্ষণের প্রকাশ। জীবশক্তি নামক তটস্থা শক্তিসম্ভূত হলেও জীব নামক চিৎ-স্ফুলিঙ্গ জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেহেতু এই চিৎ-স্ফুলিঙ্গ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয় শক্তির সঙ্গেই যুক্ত, তাই তারা তটস্থা শক্তি নামে পরিচিত।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—পরমেশ্বর ভগবানের এই চতুর্ব্যূহ সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে মায়াবাদীরা নির্বিশেষ ভাবধারা সমন্বিত *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্য রচনা করেছেন। সেই সূত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে, বৃন্দাবনের ষড়্-গোস্বামীদের শিরোমণি শ্রীল রূপ গোস্বামী *বেদান্তসূত্রের* স্বাভাবিক ভাষ্য *লঘুভাগবতামৃতে* যথাযথভাবে নির্বিশেষবাদীদের উত্তর দিয়েছেন।

লঘুভাগবতামৃতে শ্রীল রূপ গোস্বামী *পদ্ম পুরাণ* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, পরব্যোমের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চারটি দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন অবস্থিত। জড় জগতেও চারটি স্থানে এই বাসুদেব আদি চার মূর্তি রয়েছেন। *পদ্ম পুরাণে* আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৈকুণ্ঠে বেদবতীপুরে বাসুদেব বিরাজ করেন। সত্যলোকের উপরিভাগে বিষ্ণুলোকে সঙ্কর্ষণ বিরাজ করেন। মহাসঙ্কর্ষণ হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের আর একটি নাম। দ্বারকাপুরীতে প্রদ্যুম্ন বিরাজ করেন এবং ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যবর্তী শ্বেতদ্বীপে অনন্তশয্যায় অনিরুদ্ধ বিরাজ করেন।

শ্লোক ৪১

বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হচ্ছেন দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ। তাঁরা পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও চিন্ময়।

তাৎপর্য

বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিচত্বারিংশতিতম সূত্রের (*উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ*) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য চতুর্ব্যূহ সম্বন্ধে যে ভ্রমপূর্ণ বিচার উপস্থাপন করেছেন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* ৪১-৪৭ শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের সেই মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান কোন জড় বস্তু নন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁকে জানা যাবে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* নারায়ণ স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবকে সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু মহাদেবের অবতার শঙ্করাচার্য তাঁর প্রভু শ্রীনারায়ণের আদেশে চরম বিলোপ-আকাঙ্ক্ষী অদ্বৈতবাদীদের বিভ্রান্ত করেছিলেন। প্রতিটি বদ্ধ জীবেরই চারটি ত্রুটি রয়েছে, তার একটি হচ্ছে বিপ্রলিপ্সা বা প্রতারণা করার প্রবণতা। শঙ্করাচার্য সেই প্রতারণা করার প্রবণতাকে চরম সীমায় নিয়ে গিয়ে মায়াবাদীদের বিভ্রান্ত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত চতুর্ব্যূহের রূপ বদ্ধ জীবের কল্পনার দ্বারা বোধগম্য নয়। *বেদে* যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ঠিক সেভাবেই চতুর্ব্যূহকে গ্রহণ করা উচিত। *বেদের* প্রামাণিকতা এমনই যে, সীমিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়ে বোঝা না গেলেও বৈদিক নির্দেশ সত্য বলে মেনে নিতে হয়। নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী কখনও *বেদের* বাণী বিশ্লেষণ করা উচিত নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁর *শারীরক-ভাষ্যে* অদ্বৈতবাদীদের আরও বেশি করে বিভ্রান্ত করেছেন।

চতুর্ব্যূহের অস্তিত্ব চিন্ময়। *বাসুদেব-সত্ত্বে* (*শুদ্ধ-সত্ত্বে*) বা নির্গুণ সত্ত্বে কেবল তা উপলব্ধি করা যায়। সেটি সম্পূর্ণরূপে বাসুদেব উপলব্ধিতে মগ্ন থাকার স্তর। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ চতুর্ব্যূহ রূপ হচ্ছেন অন্তরঙ্গা শক্তির ভোক্তা। পরমেশ্বর ভগবানকে দরিদ্র এবং নিঃশক্তিক বলে মনে করা মূঢ়দের ধর্ম। এই মূঢ়তা বদ্ধ জীবের বৃত্তি এবং তা তার বিভ্রান্তি বর্ধন করে। যে মানুষ চিৎ-জগৎ ও জড় জগতের পার্থক্য বুঝতে পারে না, চতুর্ব্যূহের চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে বিচার করা অথবা জানার কোন যোগ্যতাই তার নেই। *বেদান্তসূত্রের* দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্বিচত্বারিংশতি থেকে পঞ্চচত্বারিংশতি শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য চিৎ-জগতে চতুর্ব্যূহের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন।

শঙ্করাচার্য বলেছেন (*সূত্র* ৪২), ভক্তরা মনে করেন যে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ এক, তিনি জড় গুণ থেকে মুক্ত এবং তাঁর চিন্ময় বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি হচ্ছেন ভক্তদের পরম লক্ষ্য। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারটি নিত্য চিন্ময় রূপে ভগবান নিজেকে বিস্তার করেন। প্রথম প্রকাশ বাসুদেব থেকে যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রকাশিত হন। বাসুদেবের আর এক নাম পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণের আর এক নাম জীব, প্রদ্যুম্নের আর এক নাম মন এবং অনিরুদ্ধের আর এক নাম অহঙ্কার। এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেবকে জড়া প্রকৃতির মূল কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। যেহেতু সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বাসুদেব-ব্যূহ থেকে সমুৎপন্ন

হয়েছেন, তাই শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলেছেন যে, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ সেই মূল কারণ থেকে সৃষ্ট হয়েছেন।

মহাত্মারা বলে গিয়েছেন যে, নারায়ণ, যাঁর আর এক নাম পরমাত্মা, তিনি জড় জগতের অতীত এবং তা বৈদিক শাস্ত্রের কথা। মায়াবাদীরাও স্বীকার করে যে, নারায়ণ বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। শঙ্করাচার্য বলেছেন যে, ভক্তদের সেই ধারণা নিয়ে তিনি তর্ক করতে চান না, তবে যে বাসুদেব থেকে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি হয়েছে, সঙ্কর্ষণ থেকে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রদ্যুম্নের থেকে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছে, সেই সম্বন্ধে তাঁকে প্রতিবাদ করতেই হবে। কারণ, সঙ্কর্ষণ যদি বাসুদেবের দেহ থেকে সৃষ্ট জীবসমূহের প্রকাশ হন, তা হলে জীবসমূহের অনিত্যত্ব আদি দোষ অপরিহার্য হবে। নিয়মিত আরাধনা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, যোগ অনুশীলন ও পুণ্যকর্ম সাধন আদির মাধ্যমে ভক্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু জীব যদি কোন বিশেষ অবস্থায় জড়া প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে তারা অনিত্য এবং তাদের পক্ষে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সঙ্গ করার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণের বিনাশে কার্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। *বেদান্তসূত্রের* দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (*নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ*) সূত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীবের কখনও মৃত্যু হয় না। যেহেতু জীবের সৃষ্টি নেই, তাই সে অবশ্যই নিত্য।

শঙ্করাচার্য বলেছেন (*সূত্র* ৪৩), ভগবদ্ভক্তেরা মনে করেন যে, সঙ্কর্ষণ নামক কর্তা জীব থেকে প্রদ্যুম্ন নামক ইন্দ্রিয়ের কারণ জন্মেছে। কিন্তু আমরা কখনও কোনও ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করতে দেখি না। ভক্তরা আরও বলেন যে, প্রদ্যুম্ন থেকে অহঙ্কারের কারণ অনিরুদ্ধের জন্ম হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না ভক্তরা দেখাতে পারছেন জীব কিভাবে অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করে, ততক্ষণ *বেদান্তসূত্রের* এই প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, অন্য কোন দার্শনিক সেভাবে সূত্র স্বীকার করেন না।

শঙ্করাচার্য আরও বলেছেন (*সূত্র* ৪৪), ভক্তদের এই ধারণাও স্বীকার করা যায় না যে, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পরমপুরুষ ভগবানের মতো জ্ঞান, সম্পদ, বীর্য, সৌন্দর্য, যশ ও বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত। এমন কি তাঁরা পূর্ণ প্রকাশ হলেও তাঁদের উৎপাদনে দোষ থেকে যায়। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এরা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নন; অথচ সকলেই সমধর্মী এবং ঈশ্বর। এই অর্থ যদি অভিপ্রেত হয়, তা হলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করতে হয়। বহু সংখ্যক ঈশ্বর স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, কেন না সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বর স্বীকার করলেই যথেষ্ট। উপরন্তু বহু সংখ্যক ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের একমেবাদ্বিতীয়ত্ব হানি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এই চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই সমপর্যায়ভুক্ত এবং তাঁরা সকলেই সমধর্মী, তা হলেও উৎপত্তি-অসম্ভব-দোষ পরিহার করা যায় না। কারণ, প্রত্যেকের অস্তিত্বে কোনরূপ আতিশয্য না থাকলে বাসুদেব থেকে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণের থেকে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্নের থেকে অনিরুদ্ধের জন্ম হতে পারে না। কার্য ও কারণের

মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে, যেমন মৃত্তিকা থেকে ঘট প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে মৃত্তিকা হচ্ছে ঘটের কারণ এবং ঘট মৃত্তিকার কার্য। পৃথকত্ব না থাকলে কোন্‌টি কার্য কোন্‌টি কারণ, তা নির্দেশ করতে পারা যায় না। আর তা ছাড়া *পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তের* অনুগামীরা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যে জ্ঞান ও গুণের কোন তারতম্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। ভক্তরা পক্ষান্তরে, ব্যূহ চতুষ্টয়কে সবিশেষ বাসুদেব বলে মনে করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যায় পর্যাপ্ত? অবশ্যই তা নয়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সমগ্র জগৎ ভগবানের ব্যূহ। এই তত্ত্ব *শ্রুতি, স্মৃতি* উভয় শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

শঙ্করাচার্য আরও বলেছেন (*সূত্র* ৪৫), *পঞ্চরাত্র* আদি শাস্ত্র অনুসরণকারী ভক্তরা বলেন যে, ভগবানের গুণ এবং গুণীরূপে স্বয়ং ভগবান অভিন্ন। কিন্তু ভাগবতবাদীরা কিভাবে বলেন যে, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বল, যশ, সৌন্দর্য ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণ ভগবান বাসুদেব থেকে অভিন্ন? সেটি কখনও সম্ভব নয়।

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ প্রসঙ্গে ভগবদ্ভক্তদের মতবাদের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য যে অভিযোগ করেছেন, শ্রীল রূপ গোস্বামী *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে (পূর্ব ৫/১৬৫-১৯৩) তা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নারায়ণের এই চারটি প্রকাশ পরব্যোমে 'মহাবস্থ' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁদের মধ্যে বাসুদেব ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে উপাসিত হন, কেন না তিনি হচ্ছেন হৃদয়ের উপাস্যদেব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩/২৩) সেই কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের স্বাংশ বা বিলাস প্রকাশ এবং সমস্ত জীবের উৎস বলে কখনও কখনও তাঁকে *জীব* বলা হয়। সঙ্কর্ষণের অঙ্গকান্তি অসংখ্য পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র কিরণের থেকেও মধুর। তিনি অহঙ্কারতত্ত্ব রূপে পূজিত হন। তিনি অনন্তদেবে তাঁর ধারণশক্তি আরোপ করেছেন এবং তিনি রুদ্র, অধর্ম, অহি (সর্প), অন্তক (মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা যমরাজ) এবং অসুরদের অন্তর্যামীরূপে জগতের সংহার কার্য সম্পাদন করেন।

তৃতীয় প্রকাশ প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ থেকে প্রকাশিত হন। বুদ্ধিমানেরা বুদ্ধিতত্ত্বরূপে প্রদ্যুম্নের উপাসনা করেন। লক্ষ্মীদেবী *ইলাবৃতবর্ষে* তাঁর মহিমা কীর্তন করতে করতে পরম ভক্তি সহকারে তাঁর পরিচর্যা করেন। তাঁর অঙ্গকান্তি কখনও সুবর্ণের মতো এবং কখনও নবীন নীল জলধরের মতো। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিদান এবং কন্দর্পের মধ্যে তিনি সৃষ্টিশক্তি নিহিত করেছেন। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে প্রজাপতি, দেবতা, মানুষ আদি সমস্ত প্রাণী সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেন।

চতুর্ব্যূহের চতুর্থ প্রকাশ অনিরুদ্ধ মনীষীদের দ্বারা মনস্তত্ত্বে উপাসিত হন। তাঁর অঙ্গকান্তি মেঘের মতো। তিনি সৃষ্টি রক্ষা করেন। তিনি ধর্ম, মনু ও দেবতাদের অন্তর্যামীরূপে জগতের পালন করেন। বৈদিক শাস্ত্র মোক্ষধর্মে প্রদ্যুম্নকে মনের অধিদেবতা এবং অনিরুদ্ধকে অহঙ্কারের অধিদেবতা বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চতুর্ব্যূহ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বর্ণনা, অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন যে বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ যে মনের অধিদেবতা, তা *পঞ্চরাত্র-তন্ত্রে* সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

ভগবানের বিলাস ও অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে *লঘুভাগবতামৃতে* (*পূর্ব* ৫/৮৬-১০০) খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শঙ্করাচার্যের উক্তি খণ্ডন করে *মহাবরাহ পুরাণে* বলা হয়েছে—

সর্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের সর্ববিধ দেহ চিন্ময় ও নিত্য এবং সর্ববিধ দেহ জড় জগতের বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হন। তাঁদের রূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। সেই সমস্ত দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, সর্ববিধ চিন্ময় গুণযুক্ত এবং যেহেতু তাঁরা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি নন, তাই তাঁরা শাশ্বত। তাঁদের রূপ চিন্ময় এবং তাঁরা জড় কলুষমুক্ত।"

এই উক্তির সমর্থনে *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে—

মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ ॥

"বৈদূর্যমণি যেমন স্থান ভেদে নীল, হলুদ প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে, তেমনই ভগবান অচ্যুত উপাসনা ভেদে তাঁর স্বরূপ বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে পারেন।" প্রতিটি অবতারই অন্য অবতারদের থেকে স্বতন্ত্র। তা সম্ভব কেবল ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, যার দ্বারা তিনি যুগপৎ বিভিন্ন অংশ-অবতার এবং সেই সমস্ত অবতারের উৎস মূল—অবতারীর একত্ব বজায় রাখতে পারেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু বিভিন্নরূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে নারদ মুনি বলেছেন—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥

"এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময় পৃথক পৃথকভাবে ষোল সহস্র প্রাসাদে ষোল সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করার জন্য নিজেকে ষোল সহস্ররূপে প্রকাশ করেছেন।" (*ভাগবত* ১০/৬৯/২) *পদ্ম পুরাণেও* বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

স দেবো বহুধা ভূত্বা নির্গুণঃ পুরুষোত্তমঃ ।
একীভূয় পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃৎ ॥

"সেই নির্গুণ, নির্দোষ, আদিকর্তা, পুরুষোত্তম শ্রীহরি বহুরূপ হয়েও পুনরায় একরূপে শয়ন করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধেও বলা হয়েছে, *যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্*— "হে ভগবান! তুমি বহুমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও অদ্বিতীয়। তাই, শুদ্ধ ভক্তরা একাগ্রচিত্তে কেবল তোমারই আরাধনা করেন।" (*ভাগবত* ১০/৪০/৭) *কূর্ম পুরাণে* বলা হয়েছে—

অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্বতঃ ।
অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান সবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বিশেষ, তিনি বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও অণুসদৃশ এবং তিনি বর্ণহীন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ণ ও আরক্তলোচন।" জড় বিচারে এগুলি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, তা হলে তাঁর পক্ষে সেগুলি সব সময় সম্ভব। আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা চিৎ-জগতের কার্যকলাপ বুঝতে পারি না, কিন্তু জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি অসম্ভব হলেও এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী গুণের ধারণাগুলি অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে সমস্ত পরস্পর-বিরোধী গুণের সামঞ্জস্য সম্ভব। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধে (৬/৯/৩৪-৩৭) এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে—

"হে ভগবান! তোমার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বা ক্রীড়া দুর্বোধ্যরূপে প্রকাশ পায়, কেন না সাধারণ কার্য-কারণ-ভাব তোমার মধ্যে দেখা যায় না। কোন রকম দৈহিক ক্রিয়া না করেই তুমি সব কিছু করতে পার। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরম সত্যের অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে এবং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছুই করতে হয় না। হে ভগবান! তুমি সর্বতোভাবে জড় গুণরহিত। কারও সাহায্য ব্যতীতই তুমি সমস্ত জড় জগৎ সৃষ্টি করতে পার, পালন করতে পার এবং বিনাশ করতে পার, অথচ এই সমস্ত কার্যকলাপে তোমার কোন পরিবর্তন হয় না। জড় জগতের দেবতা ও অসুরেরা যেমন তাদের কার্যকলাপের ফল ভোগ করে, তোমাকে তেমন তোমার কার্যকলাপের ফল ভোগ করতে হয় না। কর্মের ফলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তুমি নিত্যকাল তোমার পূর্ণ চিৎ-শক্তি সহ বিরাজ কর। তা আমরা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না।

"যেহেতু তুমি অন্তহীন ষড়ৈশ্বর্যে পূর্ণ, তাই তোমার চিন্ময় গুণরাশি গণনা করে শেষ করা যায় না। দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দৃশ্যজগতের বিরুদ্ধ-প্রকাশ ও যুক্তি-তর্কের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন। বাক্‌চাতুর্য ও বিবিধ শাস্ত্রমতের দ্বারা তাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত, তাই তাদের মতবাদ সকলের শাসক ও নিয়ন্তা তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

"তোমার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে জড় গুণ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত তোমার বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তার প্রভাবে তুমি মনোধর্ম-প্রসূত সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অতীত। তোমার অচিন্ত্য শক্তির পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

"মানুষ কখনও মনে করতে পারে যে, তুমি সবিশেষ বা নির্বিশেষ, অথবা গুণময় বা নির্গুণ, এই দুটি যে তোমার ভিন্ন স্বরূপ, তা নয়। ভাবনাভেদে তোমার একই স্বরূপের দুই প্রকার প্রকাশ মাত্র। যাদের বুদ্ধি বিপর্যস্ত বা বিভ্রান্ত হয়েছে, তাদের যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনই যাদের বুদ্ধি তোমার সম্বন্ধে অনিশ্চিত, তাদের মধ্যে তুমি ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ কর।"

চিন্ময় কার্যকলাপ এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পার্থক্য আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। পূর্ণ চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবান কোন রকম সাহায্য ব্যতীতই যে কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। জড় জগতে আমরা যদি একটি মৃৎপাত্র তৈরি করতে চাই, তা হলে আমাদের উপাদান, যন্ত্র ও শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের সেই ধারণা পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপে আরোপ করা উচিত নয়, কেন না ভগবান কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত পলকের মধ্যে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন বলে, এটি মনে করা উচিত নয় যে, অবতরণ না করলে তিনি সেই কার্য সম্পাদন করতে পারতেন না। তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি যে-কোন কার্য সম্পাদন করতে পারেন। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁকে ভক্তদের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়। তিনি যশোদা মায়ের সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মা যশোদার ভরণ-পোষণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। পক্ষান্তরে, তিনি সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে। তিনি যখন তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণের জন্য আবির্ভূত হন, তখন তিনি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের জন্য নানা রকম দুঃখকষ্ট স্বীকার করেন।

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান প্রতিটি জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়ার ফলে কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা বন্ধু নয়। কিন্তু যে সমস্ত ভক্ত প্রেমভক্তি সহকারে নিরন্তর তাঁর কথা চিন্তা করেন, তাঁদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে স্নেহপরায়ণ। তাই নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতিত্ব, উভয়ই ভগবানের চিন্ময় গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং তা অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়। ভগবান হচ্ছেন পরব্রহ্ম অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উৎস, যা হচ্ছে তাঁর নিরপেক্ষতার সর্বব্যাপ্ত রূপ। কিন্তু তাঁর সবিশেষ রূপে, অর্থাৎ সমস্ত চিৎ-ঐশ্বর্যের অধীশ্বররূপে ভগবান তাঁর ভক্তের পক্ষ অবলম্বন করে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। পক্ষপাতিত্ব, নিরপেক্ষতা আদি সমস্ত গুণই ভগবানের মধ্যে রয়েছে, তা না হলে জড় সৃষ্টিতে সেগুলি দেখা যেত না। যেহেতু তিনি হচ্ছেন পূর্ণ সত্তা, তাই সব কিছুই যথাযথভাবে তাঁর মধ্যে রয়েছে। আপেক্ষিক জগতে সমস্ত গুণগুলি বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাই অদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিকৃত। চিৎ-জগতের কার্যকলাপ যেহেতু কোন নিয়ম বা ভিত্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাই ভগবানকে অধোক্ষজ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আমরা যদি ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার করি, তা হলে আমরা তাঁর মধ্যে সব কিছুরই সামঞ্জস্য দেখতে পাব। অভক্তেরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, ফলে তিনি তাদের অভিজ্ঞতার অতীত। *ব্রহ্মসূত্রের* প্রণেতা সেই তত্ত্ব স্বীকার করে বলেছেন, *শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ*—পরমেশ্বর ভগবান সাধারণ মানুষের গোচরীভূত নন, বৈদিক নির্দেশের মাধ্যমেই কেবল তাঁকে জানা যায়। *স্কন্দ পুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ*—"যে বিষয় সাধারণ মানুষের চিন্তার অতীত, সেই বিষয় নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়।" এই জড় জগতেও অনেক রত্ন এবং ঔষধ আদিতে নানা রকম অদ্ভুত গুণ দর্শন করা

যায় এবং তাদের সেই সমস্ত গুণ প্রায়ই অচিন্ত্য বলে মনে হয়। সুতরাং, আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে স্বীকার না করি, তা হলে আমরা তাঁর পরমেশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না। এই অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভগবানের মাহাত্ম্য দুর্বোধ্য।

অজ্ঞানতা ও বাক্‌চাতুর্য মানব-সমাজে অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি এই দুই সুলভ বস্তুর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমরা যদি এই অজ্ঞানতা ও বাক্‌চাতুর্য স্বীকার করে নিই, তা হলে আমরা ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণতার মহিমা উপলব্ধি করতে পারব না। যেমন, ভগবানের একটি ঐশ্বর্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান। তাই তাঁর অজ্ঞানতা কিভাবে সম্ভব? বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ ও যুক্তির মাধ্যমে জানা যায় যে, ভগবান সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা, আবার সেই সঙ্গে তিনি সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই গুণ দুটি বিরুদ্ধ নয়, কেন না তা অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই সম্ভব। যে মানুষ সর্বদাই সর্পের চিন্তায় মগ্ন, তার রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনই যে মানুষ জড় গুণের দ্বারা বিভ্রান্ত এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, তাদের কাছে ভগবান বিভ্রান্তিজনক সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকাশিত হন।

কেউ তর্ক করতে পারে যে, পরমতত্ত্ব যদি পরম জ্ঞানসম্পন্ন (ব্রহ্ম) ও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ (ভগবান) হন, তা হলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সৃষ্ট হয়। এই তর্ক খণ্ডন করার জন্য, *স্বরূপদ্বয়ম্ ঈক্ষতে* সূত্রটি ঘোষণা করছে যে, প্রকাশের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পরমতত্ত্বে দ্বৈতত্ব নেই, কেন না তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত একমেবাদ্বিতীয়। অতএব তাঁর শক্তিবিলাসে যে বিরোধ প্রতীতি হয়, তাকেই অচিন্ত্য ঐশ্বর্য বলে; তা তাঁর ভূষণ ব্যতীত দূষণ নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৪/১৬) ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্ ।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্‌রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥

"যদিও পরমেশ্বর ভগবানের কিছুই করণীয় নেই, তবুও তিনি কর্ম করেন; যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি জন্মগ্রহণ করেন; যদিও তিনি সকলের ভয় উৎপাদনকারী কালস্বরূপ, তবুও তিনি শত্রুভয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং যদিও তিনি আত্মারাম, তবুও তিনি ষোল হাজার রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর এই সমস্ত বিরোধপূর্ণ লীলাবিলাসের ফলে তত্ত্বজ্ঞানীদের বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়।" ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ যদি বাস্তব না হত, তা হলে কখনই তত্ত্বজ্ঞানী মুনি-ঋষিদের বুদ্ধি এগুলির দ্বারা বিভ্রান্ত হত না। তাই এই সমস্ত কার্যকলাপকে কখনও কল্পনা বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান যখনই ইচ্ছা করেন, তখনই তাঁর অচিন্ত্য শক্তি (*যোগমায়া*) তাঁর ইচ্ছা অনুসারে লীলা সৃষ্টি করে তাঁর সেবা করেন।

পঞ্চরাত্র শাস্ত্র হচ্ছে সমস্ত আচার্যদের দ্বারা স্বীকৃত বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ। এই সমস্ত

শাস্ত্রগুলি রজ ও তমোগুণ-জাত নয়। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা তাই সেই গ্রন্থগুলিকে *সাত্বত-সংহিতা* বলেন। এই সমস্ত শাস্ত্রের আদি বক্তা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ। সেই কথা *মহাভারতের শান্তিপর্বে* একটি অংশ *মোক্ষধর্মে* (৩৪৯/৬৮) বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। বদ্ধ জীবের চারটি ত্রুটি থেকে মুক্ত নারদ ও ব্যাসদেবের মতো মুক্ত পুরুষেরা এই ধরনের শাস্ত্রের প্রচারক। শ্রীনারদ মুনি হচ্ছেন *পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের* আদি বক্তা। *শ্রীমদ্ভাগবতও* একটি *সাত্বত-সংহিতা*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলম্*—"*শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ *পুরাণ*।" যে সমস্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ ভাষ্যকার ও পণ্ডিত *পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের* নির্দেশের কদর্থ করে, তারা সব চাইতে ঘৃণ্য। আধুনিক যুগে যে সমস্ত বিদ্বেষ-পরায়ণ তথাকথিত পণ্ডিতেরা *ভগবদ্গীতার* বক্তা শ্রীকৃষ্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না বলে প্রমাণ করার চেষ্টায় *ভগবদ্গীতার* কদর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করছে, তাদের নিন্দা করা হয়েছে। *মায়াবাদীরা* যে কিভাবে *পাঞ্চরাত্রিক-বিধির* কদর্থ করেছে, তা নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) *বেদান্তসূত্রের* (২/২/৪২) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সঙ্কর্ষণকে একজন সাধারণ জীব বলেছেন, কিন্তু সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যেখানে ভগবদ্ভক্তেরা বলেছেন যে, সঙ্কর্ষণ জীব। তিনি হচ্ছেন অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তিনি জড়া প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ তত্ত্ব। তিনি সমস্ত জীবের আদি উৎস। *উপনিষদে* বর্ণনা করা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—"সমস্ত নিত্য ও চেতন জীবদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য ও পরম চেতন।" তাই তিনি হচ্ছেন *বিভুচৈতন্য* বা সর্বশ্রেষ্ঠ। অসংখ্য অণুসদৃশ জীব এবং জড় জগতের সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছেন তিনি। তিনি বিভুচৈতন্য এবং জীব অণুচৈতন্য। তাই তাঁকে একটি জীব বলে মনে করা উচিত নয়, কেন না তা হবে প্রামাণিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধী। জীবাত্মারও জন্ম এবং মৃত্যু নেই। সেটিই *বেদের* উক্তি এবং তা সমস্ত শ্রৌতপন্থী তত্ত্ববেত্তারা স্বীকার করেছেন।

(২) শঙ্করাচার্যের *বেদান্তসূত্রের* (২/২/৪৩) ভাষ্যের উত্তরে উল্লেখ করতে হয় যে, মূল-সঙ্কর্ষণ থেকে অন্যান্য যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে। সঙ্কর্ষণও বিষ্ণু, কিন্তু তাঁর থেকে অন্য সমস্ত বিষ্ণুর প্রকাশ হয়েছে। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, দীপরশ্মি যেভাবে ভিন্ন ভিন্ন আধারে পৃথক দীপের মতো কার্য করে, অর্থাৎ পূর্বদীপের মতো সমানধর্মা, তেমনই যে আদিপুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন, তাঁকে আমি ভজনা করি।

(৩) চতুশ্চত্বারিংশতি সূত্রে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের উত্তরে বলা হয়েছে, *পঞ্চরাত্র* বিধির অনুশীলনকারী কোন শুদ্ধ ভক্ত স্বীকার করবেন না যে, বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কেন না সেই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এমন কি শঙ্করাচার্য তাঁর দ্বিচত্বারিংশতি সূত্রের ভাষ্যে স্বীকার করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন রূপে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। সুতরাং শঙ্করাচার্যের দ্বিচত্বারিংশতি সূত্রের ভাষ্য এবং চতুশ্চত্বারিংশতি সূত্রের ভাষ্যের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী। মায়াবাদীদের একটি মস্ত বড় ত্রুটি

হচ্ছে যে, তারা ভাগবত পরম্পরার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার জন্য সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে স্থান বিশেষে বিভিন্ন রকম মত প্রদান করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাগবত পরম্পরার অনুগামীরা নারায়ণের চতুর্ব্যূহ স্বীকার করেন, কিন্তু তাই বলে তাঁরা বহু-ঈশ্বরবাদী নন। ভক্তরা পূর্ণরূপে অবগত যে, পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁরা কখনই বহু ঈশ্বরবাদী নন, কেন না তা বেদের বিরোধী। ভক্তরা সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন যে, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির উপর চিন্ময় আধিপত্য বজায় রাখেন। তাই আমরা শিক্ষিত মানুষদের কাছে আবেদন করি, তাঁরা যেন শ্রীল রূপ গোস্বামীর *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থটি পড়ে দেখেন, যেখানে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ কার্য-কারণ-বশত প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি তাঁদের মৃত্তিকা ও মৃৎভাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। সেটি সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত, কেন না তাঁদের প্রকাশে কার্য ও কারণ বলে কিছু নেই (*নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্*)। *কূর্ম পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *দেহদেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ*—"পরমেশ্বর ভগবানের দেহ ও দেহীর ভেদ নেই।" কার্য ও কারণ জড়। যেমন, পিতার দেহ পুত্রের দেহের উৎপত্তির কারণ, কিন্তু আত্মা কারণও নয়, কার্যও নয়। কার্য এবং কারণের যে পার্থক্য জড় জগতে দেখা যায়, চিন্ময় স্তরে সেই রকম কোন পার্থক্য নেই। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের সব কয়টি রূপই চিন্ময়ভাবে পরম, তেমনই তাঁর প্রতিটি রূপই সমভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। চিন্ময় স্তরে তাঁর সব কয়টি রূপই ঈশ্বরতত্ত্ব। তাঁদের প্রকাশে কোন রকম জড় কলুষ নেই, কেন না জড়া প্রকৃতির কোন নিয়ম তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। জড় জগতের বাইরে কার্য ও কারণের প্রভাব নেই। তাই পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে কার্য-কারণের প্রভাব স্পর্শ করতে পারে না। বৈদিক শাস্ত্রে তা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণ এবং তিনি পূর্ণ বলে তাঁর সমস্ত প্রকাশও, যেমন এই জগৎ পূর্ণ। পূর্ণের থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তাও পূর্ণ। যেহেতু তিনি পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য পূর্ণ বস্তু প্রকাশিত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।" (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৫/১)। এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অভক্তরা ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি লঙ্ঘন করে বিষ্ণুর বহিরঙ্গা প্রকাশ জড় সৃষ্টিকে মায়াধীশ পরমেশ্বর ভগবান বা তাঁর চতুর্ব্যূহের সঙ্গে এক করে দিতে চায়। মায়ার সঙ্গে চেতনের অথবা মায়ার সঙ্গে ভগবানের একত্ব বা সমজ্ঞান নাস্তিক্যবাদের লক্ষণ। জড় সৃষ্টি, যা ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকায় পর্যন্ত জীবনের প্রকাশ করে, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। তা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির এক-চতুর্থাংশ, যা *ভগবদ্গীতায়* (*একাংশেন স্থিতো জগৎ*) প্রতিপন্ন হয়েছে। মায়াশক্তির জগৎরূপে যে প্রকাশ, তা হচ্ছে

জড়া প্রকৃতি এবং এই জড়া প্রকৃতিতে সব কিছুই জড় পদার্থ থেকে তৈরি। অতএব এই জড় জগতের বিস্তারের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের চতুর্ব্যূহের তুলনা করা উচিত নয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদীরা অবিবেচকের মতো তাই করার চেষ্টা করে।

(৪) *বেদান্তসূত্রের* (২/২/৪৫) শাঙ্কর-ভাষ্যের উত্তরে *লঘুভাগবতামৃতে* (পূর্ব ৫/২০৮-২১৪) ভগবানের চিন্ময় গুণ ও চিন্ময় প্রকৃতির কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, "কেউ কেউ বলে যে, ব্রহ্ম নিশ্চয় সমস্ত গুণরহিত, কেন না গুণসমূহ কেবল জড় পদার্থে প্রকাশিত হয়। তাঁদের মতে, সমস্ত গুণই অনিত্য ও মরীচিকা-সদৃশ। কিন্তু এই মতবাদ মেনে নেওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর গুণাবলীও তাঁর থেকে অভিন্ন। তাই তাঁর রূপ, গুণ, নাম এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু তাঁরই মতো চিন্ময় তত্ত্ব। পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যেকটি গুণগত প্রকাশ তাঁর থেকে অভিন্ন। যেহেতু পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত আনন্দের উৎস, তাই তাঁর থেকে উদ্ভূত চিন্ময় গুণাবলীও আনন্দময়। সেই কথা *ব্রহ্মতর্ক* নামক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাঁর স্বরূপগত গুণে গুণবান, অতএব বিষ্ণু এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী কখনই তাঁদের স্বরূপ থেকে পৃথক নয়। *বিষ্ণু পুরাণেও* নিম্নলিখিত বাক্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হয়েছে—'যে পরমেশ্বর ভগবানে সত্ত্বগুণ আদি প্রাকৃত গুণের সংসর্গ নেই, সেই পরম শুদ্ধ আদিপুরুষ হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।' *বিষ্ণুপুরাণে* আরও বলা হয়েছে যে, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বীর্য ও তেজ প্রভৃতি পরমেশ্বর ভগবানের গুণসমূহ তাঁর থেকে অভিন্ন। *পদ্ম পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে যখন নির্গুণ বলে বর্ণনা করা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি প্রাকৃত গুণরহিত। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম অধ্যায়ে (১/১৬/২৯) বর্ণনা করা হয়েছে, 'হে ধর্ম! সমস্ত মহৎ গুণাবলী শ্রীকৃষ্ণে নিত্য বিরাজমান এবং যে সমস্ত ভক্ত মহত্ত্বের অভিলাষী, তাঁরাও সেই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হতে চান।'" অতএব বুঝতে হবে যে, আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত আনন্দপ্রদ সমস্ত গুণের এবং অচিন্ত্য শক্তির উৎস। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ের একবিংশতি, পঞ্চবিংশতি, সপ্ত-বিংশতি ও অষ্টবিংশতি শ্লোকের আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তাঁর *শ্রীভাষ্য* নামক *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মতবাদ খণ্ডন করেছেন—"শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্রকে নিরীশ্বর কপিলের দর্শনের সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং এভাবেই তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, *পঞ্চরাত্র* সমূহ বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের বিরুদ্ধ মত পোষণ করছে। *পঞ্চরাত্রে* শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম কারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব থেকে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ থেকে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি এবং প্রদ্যুম্ন থেকে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে জীবের উৎপত্তি বলা যেতে পারে না, কেন না তা *বেদের* বিরুদ্ধ। *কঠ উপনিষদে* (২/১৮) বলা হয়েছে, চিন্ময় জীবাত্মা কখনও জন্মায় না বা মরে না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জীব নিত্য। অতএব সঙ্কর্ষণকে জীব বলতে

বোঝানো হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন জীবের অধিষ্ঠাতৃদেব। তেমনই প্রদ্যুম্ন হচ্ছেন মনের এবং অনিরুদ্ধ হচ্ছেন অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃদেব।

"বলা হয়েছে যে, সঙ্কর্ষণ থেকে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু সঙ্কর্ষণ যদি জীব হন, তা হলে তা স্বীকার করা যায় না, কেন না জীব কখনও মনের কারণ হতে পারে না। বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন কি প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কোন জীব থেকে মনের উদ্ভব সম্ভব নয়, কেন না সমস্ত *বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সব কিছুর উৎপত্তি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে।

"পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত শক্তি পূর্ণরূপে রয়েছে। বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান অভ্রান্ত, সুতরাং তা নিয়ে কোন তর্ক করা চলে না। তাই এই চতুর্ব্যূহকে কখনই জীবতত্ত্ব বলে মনে করা উচিত নয়। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন ঈশ্বর এবং তাঁরা সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বীর্য, তেজ প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য-সম্পন্ন। অতএব *পঞ্চরাত্রের* সিদ্ধান্ত কোন মতেই ভ্রান্ত নয়। যাঁরা যথাযথভাবে *পঞ্চরাত্র* শাস্ত্র অধ্যয়ন করেনি তারাই কেবল মনে করে যে, জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে *পঞ্চরাত্রের* মত শ্রুতি-বিরুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আমাদের *শ্রীমদ্ভাগবতের* বিচার মেনে নিতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে, 'পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বাসুদেব নামে পরিচিত এবং আশ্রিত ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, তিনি চতুর্ব্যূহ রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। এই চতুর্ব্যূহ তাঁর আশ্রিত তত্ত্ব, অথচ সর্বতোভাবে তাঁর থেকে অভিন্ন।' *পুষ্কর-সংহিতায়* বলা হয়েছে, 'যে সমস্ত শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ব্রাহ্মণদের আরাধ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের চতুর্ব্যূহ রূপ, তাদের বলা হয় *আগম* (প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র)।' সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই চতুর্ব্যূহের আরাধনা পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের আরাধনারই মতো, যিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর ভক্তদের স্বধর্মের আচরণের ফল উৎসর্গরূপ আরাধনা গ্রহণ করেন। নৃসিংহ, রাম, শেষ ও কূর্ম আদি অবতারদের অর্চনার ফলে সঙ্কর্ষণ আদি চতুর্ব্যূহ অর্চনের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। সেই স্তর থেকে বাসুদেব নামক পরমব্রহ্মের অর্চনের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। *পুষ্কর-সংহিতায়* বলা হয়েছে, 'শাস্ত্র-নির্দেশিত পন্থায় পূর্ণরূপে আরাধনা করলে বাসুদেব নামক অব্যয় পরমব্রহ্মকে পাওয়া যায়।' সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পরমব্রহ্ম বাসুদেবেরই মতো, কেন না তাঁরা সকলেই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন এবং ইচ্ছা করলে বাসুদেবের মতো চিন্ময় রূপ ধারণ করতে পারেন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের কখনও জন্ম হয় না, কিন্তু তাঁরা বিভিন্ন অবতার রূপে তাঁদের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে নিজেদেরকে প্রকাশিত করতে পারেন। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবান যে তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর ভক্তদের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন, সেই সিদ্ধান্ত *পঞ্চরাত্র* বিরুদ্ধ নয়। যেহেতু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হচ্ছেন সমস্ত জীবের, সমস্ত মনের এবং সমস্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃদেব, তাই সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে যথাক্রমে জীব, মন ও অহঙ্কার

রূপে বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। এই নামগুলি অধিষ্ঠাতৃদেবের দ্যোতক, ঠিক যেমন ব্রহ্মকে কখনও কখনও 'আকাশ' ও 'জ্যোতি' বলে বর্ণনা করা হয়।

"শাস্ত্রসমূহ জীবের জন্ম অথবা উৎপত্তি পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছে। *পরম-সংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, অচেতন, পরার্থ-সাধক সর্বদা বিকারযোগ্য ত্রিগুণই কর্মীদের ক্ষেত্র—এটিই প্রকৃতির রূপ। প্রকৃতি বহিরঙ্গাভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তাও নিত্য। প্রতিটি *সংহিতায়* জীবকে নিত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং *পঞ্চরাত্রে* জীবের জন্ম সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। যারই সৃষ্টি হয় তার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। জীবের উৎপত্তি স্বীকার করলে বিনাশও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু জীব যখন নিত্য, তখন তার উৎপত্তি বা জন্ম আপনা থেকেই প্রতিসিদ্ধ হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে যেহেতু বলা হয়েছে জীব নিত্য, তাই মনে করা উচিত নয় যে, কোন বিশেষ সময় জীবের সৃষ্টি হয়েছে। *পরম-সংহিতায়* শুরুতে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জড় জগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল। তাই উৎপত্তি, বিনাশ আদি সংজ্ঞাগুলি কেবল জড় জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

"এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, জীবরূপে সঙ্কর্ষণের জন্ম হয় বলে শঙ্করাচার্য যে বর্ণনা করেছেন, তা সর্বতোভাবে বৈদিক সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। তাঁর মতবাদ উপরোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা সর্বতোভাবে খণ্ডিত হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রীধর স্বামীর *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৩/১/৩৪) ভাষ্য খুবই আলোকপ্রদ।"

শঙ্করাচার্য যে সঙ্কর্ষণকে জীবরূপে বর্ণনা করেছেন, সেই মতবাদ খণ্ডনের বিস্তৃত বিবরণ জানতে হলে, শ্রীমৎ সুদর্শনাচার্য কৃত *শ্রীভাষ্যের শ্রুত-প্রকাশিকা* টীকা আলোচনা করা যেতে পারে।

আদি চতুর্ব্যূহ কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ আর একটি চতুর্ব্যূহে প্রকাশিত হয়ে চিদাকাশে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন। সুতরাং পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন দ্বারকার আদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ। পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অপরিবর্তনীয় অংশ-প্রকাশ, যাঁদের সঙ্গে প্রকৃতির গুণের কোন সংসর্গ নেই। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ কেবল বলরামেরই প্রকাশ নন, তিনি হচ্ছেন কারণ-সমুদ্রের আদি কারণ, যেখানে মহাবিষ্ণু শয়ন করে আছেন এবং তাঁর নিঃশ্বাসে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নির্গত হচ্ছে।

পরব্যোমে *শুদ্ধ-সত্ত্ব* নামে চিৎ-শক্তির 'সন্ধিনী' বিলাস রয়েছে, যার দ্বারা বৈকুণ্ঠ আদি শুদ্ধ সত্ত্বময় ধাম ও ষড়বিধ ঐশ্বর্যের প্রকাশ হয়। এই সবই মহাসঙ্কর্ষণের বিভূতি। মহাসঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থা শক্তিরূপ জীবশক্তির আশ্রয়। যখন সৃষ্টির লয় হয়, তখন প্রকৃতিগত ভাবে অবিনাশী সমস্ত বদ্ধ জীব মহাসঙ্কর্ষণের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই সঙ্কর্ষণকে কখনও কখনও সমগ্র *জীব* বলা হয়। চিৎ-স্ফুলিঙ্গরূপ জীবের জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, ঠিক যেমন একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ আগুন থেকে বেরিয়ে এলে নিভে যায়। কিন্তু পরম পুরুষের

সঙ্গ প্রভাবে জীবের চিন্ময় প্রকৃতি প্রকাশিত হতে পারে। জীব যেহেতু জড়রূপে অথবা চেতনরূপে প্রকাশিত হতে পারে, তাই তাকে বলা হয় তটস্থা শক্তি।

সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর উৎস এবং সেই সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ রামের অংশ-প্রকাশ।

শ্লোক ৪২

তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিহোঁ, কারণের কারণ ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে যে মহাসঙ্কর্ষণ নামক বলরামের প্রকাশ, তিনি হচ্ছেন চিৎ-শক্তির আশ্রয়। তিনি সমস্ত কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৪৩

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

চিৎ-শক্তির এক বিলাসের নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব। বৈকুণ্ঠাদি ধামসমূহ শুদ্ধ সত্ত্বময়।

শ্লোক ৪৪

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য সর্বতোভাবেই চিন্ময়। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, সেই সব হচ্ছে সঙ্কর্ষণের বিভূতি।

শ্লোক ৪৫

'জীব'-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

জীব নামক একটি তটস্থা শক্তি রয়েছে। মহাসঙ্কর্ষণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের আশ্রয়।

শ্লোক ৪৬

যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁর থেকে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে প্রলয়ে সব লীন হয়ে যাবে, সেই পুরুষের আশ্রয় হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ।

শ্লোক ৪৭

সর্বাশ্রয়, সর্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য অপার।
'অনন্ত' কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি (সঙ্কর্ষণ) সব কিছুর আশ্রয়। তিনি সর্বতোভাবে অদ্ভুত এবং অসীম ঐশ্বর্য সমন্বিত। এমন কি অনন্ত পর্যন্ত তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৮

তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ' নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সঙ্কর্ষণ, যিনি হচ্ছেন জড়াতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব, তিনি সেই নিত্যানন্দ বলরামের অংশ-প্রকাশ।

শ্লোক ৪৯

অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সংক্ষেপে অষ্টম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করলাম। এখন মনোযোগ সহকারে আপনারা নবম শ্লোকের অর্থ শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৫০

মায়াভর্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধি-মধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥

মায়া-ভর্তা—মায়াশক্তির অধীশ্বর; অজাণ্ড-সঙ্ঘ—ব্রহ্মাণ্ডসমূহের; আশ্রয়—আশ্রয়; অঙ্গঃ—যাঁর শ্রীঅঙ্গ; শেতে—তিনি শয়ন করেন; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎভাবে; কারণ-অম্ভোধি-মধ্যে—কারণ-সমুদ্রের মাঝখানে; যস্য—যাঁর; এক-অংশঃ—এক অংশ; শ্রীপুমান্—পরম পুরুষ;

আদি-দেবঃ—আদি পুরুষাবতার; তম্—তাঁকে; শ্রীনিত্যানন্দ-রামম্—শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামকে; প্রপদ্যে—আমি প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ মায়াশক্তির অধীশ্বর, কারণ-সমুদ্রে শায়িত আদিপুরুষ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর এক অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

শ্লোক ৫১

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম ।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

বৈকুণ্ঠের বাইরে রয়েছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি এবং তার বাইরে রয়েছে কারণ-সমুদ্র।

তাৎপর্য

চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠলোকের বহির্ভাগে রয়েছে ব্রহ্মজ্যোতি নামক নির্বিশেষ উজ্জ্বল জ্যোতি। সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের বাইরে রয়েছে কারণ-সমুদ্র, যা জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের মাঝখানে অবস্থিত। জড় জগৎ এই কারণ-সমুদ্র থেকে উদ্ভূত।

কারণ-সমুদ্রে শায়িত কারণোদকশায়ী বিষ্ণু কেবলমাত্র জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে অসংখ্য জড় জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং, জড় জগতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষভাবে কোন সংশ্রব নেই। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। গোলোকের শ্রীকৃষ্ণ অথবা বৈকুণ্ঠের নারায়ণ সরাসরিভাবে জড় সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। তাঁরা প্রকৃতি থেকে বহু দূরে রয়েছেন।

কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে মহাসঙ্কর্ষণ কারণ-সমুদ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। জড়া প্রকৃতির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের যোগাযোগ কেবল তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিশক্তির দ্বারা প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চার করেন। প্রকৃতি বা মায়া এমন কি কখনও কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না, কেন না ভগবান বহু দূর থেকে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

ভগবানের দৃষ্টিশক্তি সমস্ত জাগতিক শক্তিকে বিক্ষুব্ধ করে এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ তার ক্রিয়া শুরু হয়। তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রকৃতি যতই শক্তিশালী হোন না কেন, তাঁর নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাঁর কার্যকলাপের শুরু হয় ভগবানের কৃপার প্রভাবে এবং তারপর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পূর্ণ জড় জগৎ প্রকাশিত হয়। এটি অনেকটা স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার প্রক্রিয়ার মতো। মাতা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু পিতা মাতৃগর্ভে তাঁর শক্তি সঞ্চার করেন এবং তার ফলে মাতা গর্ভবতী হন। তারপর গর্ভে সন্তানের

জন্মগ্রহণ করার জন্য মাতা সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করেন। তেমনই, ভগবান প্রকৃতিকে সক্রিয় করেন, তারপর জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি প্রকৃতি সরবরাহ করে।

জড়া প্রকৃতির দুটি দিক রয়েছে। *প্রধান* নামক প্রকৃতির প্রকাশ জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করে এবং *মায়া* নামক প্রকৃতির অপর প্রকাশ তাঁর উপাদানগুলি প্রকাশিত করে, যা সমুদ্রের ফেনার মতো অনিত্য। প্রকৃতপক্ষে, জড় জগতের অনিত্য প্রকাশ সাধিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় দৃষ্টিপাতের ফলে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সৃষ্টির প্রত্যক্ষ কারণ এবং প্রকৃতি তার পরোক্ষ বা আপেক্ষিক কারণ। জড় বিজ্ঞানীরা তাঁদের তথাকথিত আবিষ্কারের মাধ্যমে যে জড় পদার্থের পরিবর্তন সাধন করছেন, তার গর্বে অন্ধ হয়ে তাঁরা জড়ের উপর ভগবানের শক্তির প্রভাব দর্শন করতে পারেন না। তাই বৈজ্ঞানিকদের প্রতারণা ধীরে ধীরে মানুষকে ভগবৎ-বিমুখ করে তুলছে এবং তার ফলে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ফলে, জড়বাদীরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, ভগবানের কৃপায় এই জড় জগৎ আপনা থেকেই আত্ম-নির্ভরশীল। এভাবেই সভ্যতার নামে সমস্ত মানব-সমাজকে প্রচণ্ডভাবে প্রতারিত করে তাঁরা জড়া প্রকৃতির স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ভারসাম্য নষ্ট করছে।

মূল কারণ সম্বন্ধে অবগত না হয়ে প্রকৃতিকে সর্বেসর্বা বলে মনে করা মূর্খতা। পারমার্থিক জীবনের চিন্ময় জ্ঞানবর্তিকা জ্বালিয়ে অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবেই তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি সমগ্র জগৎকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।

কৃষ্ণশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মায়া কিভাবে ক্রিয়া করে, সেই কথা বিশ্লেষণ করার জন্য *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার অগ্নি ও লৌহদণ্ডের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। লৌহদণ্ড যদিও অগ্নি নয়, তবুও অগ্নির সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে তা অগ্নিময় হয়ে ওঠে। তেমনই, জড়া প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ক্রিয়া নয়, তা হচ্ছে জড় পদার্থের মাধ্যমে প্রকাশিত পরম ঈশ্বরের শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। বিদ্যুৎশক্তি তামার তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তামা বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন হয় তড়িৎ-উৎপাদন কেন্দ্রে কোন সুদক্ষ জীবের তত্ত্বাবধানে। তেমনই, প্রকৃতির সমস্ত আয়োজনের আড়ালে রয়েছেন একজন মহান পুরুষ, যিনি তড়িৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মতন একজন ব্যক্তি। তাঁরই বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে সমগ্র জড় জগৎ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

জড় জগৎকে সক্রিয় করে প্রকৃতির যে গুণসমূহ, তাও মূলত নারায়ণের দ্বারাই সক্রিয় হয়। তা কিভাবে সাধিত হয়, সেই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কুমার যখন মাটির দ্বারা একটি মাটির পাত্র তৈরি করে, তখন মাটি, চাকা এবং তার যন্ত্র সেই মৃৎপাত্রটির সৃষ্টির পরোক্ষ কারণ, কিন্তু কুম্ভকার হচ্ছে মুখ্য কারণ। তেমনই, নারায়ণ হচ্ছেন সমস্ত জড় সৃষ্টির মুখ্য কারণ, আর প্রকৃতি জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করেন।

তাই নারায়ণ ব্যতীত অন্য সমস্ত কারণগুলি অর্থহীন, ঠিক যেমন কুম্ভকার ব্যতীত চাকা ও যন্ত্রপাতি অর্থহীন। যেহেতু জড় বৈজ্ঞানিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে, তাই তাঁরা চাকা, চাকার ঘূর্ণন, কুম্ভকারের যন্ত্রপাতি এবং পাত্র তৈরির উপাদানগুলি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হলেও স্বয়ং কুম্ভকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই, আধুনিক বিজ্ঞান পরম কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত এক ভ্রান্ত, ভগবৎ-বিহীন সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির উদ্দেশ্য হচ্ছে এক মহৎ লক্ষ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই মহৎ লক্ষ্যটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে গবেষণা করার পর জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন। কেউ যখন যথার্থভাবে তাঁকে জানতে পেরে তাঁর শরণাগত হন, তখন তিনি মহাত্মায় পরিণত হন।

শ্লোক ৫২

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করে রয়েছে এক অনন্ত, অপার জলধি।

শ্লোক ৫৩

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

বৈকুণ্ঠের মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সবই চিন্ময়। কোন জড় উপাদান সেখানে নেই।

শ্লোক ৫৪

চিন্ময়-জল সেই পরম কারণ ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কারণ-সমুদ্রের চিন্ময় জল জগতের পরম কারণ, যাঁর একটি বিন্দু হচ্ছে পতিতপাবনী গঙ্গা।

শ্লোক ৫৫

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কারণ-সমুদ্রে সঙ্কর্ষণের এক অংশ শয়ন করেন।

শ্লোক ৫৬

মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ ।
আদ্য-অবতার করে মায়ায় ঈক্ষণ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি প্রথম পুরুষ, মহৎ-তত্ত্বের স্রষ্টা এবং জগতের কারণরূপে পরিচিত। তিনি আদ্য অবতার এবং মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

শ্লোক ৫৭

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াশক্তি কারণ-সমুদ্রের বাহিরে অবস্থিত। মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ৫৮

সেই ত' মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি ।
জগতের উপাদান 'প্রধান', প্রকৃতি ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

মায়ার দুই রকম অবস্থিতি রয়েছে। একটিকে বলা হয় প্রধান বা প্রকৃতি। তা জড় জগতের সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। মায়া হচ্ছে জড় সৃষ্টির কারণ এবং উপাদান। জড় সৃষ্টির কারণরূপে তিনি *মায়া* এবং জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদান সরবরাহকারী রূপে তিনি হচ্ছেন *প্রধান*। এই সংজ্ঞাদ্বয়ের পরস্পর ভেদ *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে (১১/২৪/১-৪) বর্ণিত হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যত্র (১০/৬৩/২৬) জড় সৃষ্টির কারণ এবং উপাদানের বৃত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

কালো দৈবং কর্ম জীবঃ স্বভাবো
দ্রব্যং ক্ষেত্রং প্রাণ আত্মা বিকারঃ ।
তৎসংঘাতো বীজরোহপ্রবাহ-
স্ত্বন্মায়ৈষা তন্নিষেধং প্রপদ্যে ॥

"হে ভগবান! কাল, কর্ম, দৈব ও স্বভাব—এই চারটি *মায়ার* নিমিত্ত অংশ। প্রাণশক্তি, *দ্রব্য* নামক সূক্ষ্ম জড় উপাদান, প্রকৃতি (যা হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, যেখানে অহঙ্কার আত্মারূপে ক্রিয়াশীল), একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ), যেগুলি হচ্ছে দেহের ষোলটি উপাদান—এই সমস্ত *মায়ার* উপাদান। দেহ থেকে বীজরূপ কর্ম, আবার কর্ম থেকে অঙ্কুররূপ দেহ—এরূপ পুনঃপুনঃ প্রবাহ—এই কার্য-কারণক্রম হচ্ছে *মায়া*। হে প্রভু! আপনি আমাকে এই কার্য-কারণের আবর্তন থেকে উদ্ধার করুন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করি।"

জীব যদিও *মায়ার* নিমিত্ত অংশের প্রতি আসক্ত, কিন্তু তা হলেও সে *মায়ার* উপাদান-সমূহের দ্বারা পরিচালিত। *মায়ার* নিমিত্ত অংশে তিনটি শক্তি রয়েছে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। জড় উপাদানসমূহ *প্রধানরূপে মায়ার* প্রকাশ। পক্ষান্তরে, *মায়ার* তিনটি গুণ যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তখন তারা *প্রকৃতি, অব্যক্ত* ও *প্রধানরূপে* অবস্থান করে। *অব্যক্ত* প্রধানের আর একটি নাম। *অব্যক্ত* স্তরে প্রকৃতি বৈচিত্র্যহীন। বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয় *মায়ার প্রধান* অংশের দ্বারা। তাই, *প্রধান* নামক প্রকাশ *অব্যক্ত* বা *প্রকৃতি* থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৫৯

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় ও অচেতন, তাই তা জড় জগতের কারণ হতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই জড়, নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিতে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে কৃপা করেন।

শ্লোক ৬০

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি গৌণ কারণ হয়, ঠিক যেমন অগ্নির শক্তির প্রভাবে লোহা আগুনের মতো হয়ে যায়।

শ্লোক ৬১

অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ ।
প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতি অনেকটা ছাগলের গলস্তনের মতো। কেন না তা থেকে কখনও দুধ পাওয়া যায় না।

তাৎপর্য

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের উপাদানরূপে *প্রধান* বা *প্রকৃতি* নামে পরিচিত এবং জগতের নিমিত্ত অংশে *মায়া* নামে পরিচিত। জড়রূপা প্রকৃতি জড় জগতের প্রকৃত কারণ নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু সমস্ত উপাদানগুলিকে সক্রিয় করেন। এভাবেই জড়া প্রকৃতি সমস্ত উপাদানগুলি সরবরাহ করার শক্তি লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, লোহার যেমন দহন করার বা তাপ প্রদান করার শক্তি নেই, কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত লোহা অন্য বস্তুকে দহন করতে ও তাপ দিতে সমর্থ হয়। জড়া প্রকৃতি লোহার মতো, কেন না শ্রীবিষ্ণুর সংস্পর্শ ছাড়া তার কার্য করার কোন স্বতন্ত্রতা নেই। কিন্তু কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারিত হলেই প্রকৃতি জড় সৃষ্টির উপাদানগুলি সরবরাহ করার যোগ্যতা অর্জন করে। জড়া প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকপিলদেব *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৮/৪০) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্ যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥

"যদিও ধূম, জ্বলন্ত কাষ্ঠ ও স্ফুলিঙ্গ একত্রে অগ্নির উপাদান, কিন্তু তা হলেও জ্বলন্ত কাষ্ঠ আগুন থেকে ভিন্ন এবং ধূম জ্বলন্ত কাষ্ঠ থেকে ভিন্ন।" পঞ্চ-মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ) ধূমের মতো, জীব স্ফুলিঙ্গের মতো এবং *প্রধানরূপে* প্রকৃতি জ্বলন্ত কাষ্ঠের মতো। তারা সকলে ভগবানের থেকে শক্তি লাভ করেই স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত সৃষ্টির মূল। জড়া প্রকৃতির কোন কিছু সরবরাহ করার ক্ষমতা তখনই থাকে, যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের দ্বারা সক্রিয় হয়।

পুরুষের বীর্য গর্ভে সঞ্চার হওয়ার ফলেই স্ত্রী যেমন সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তেমনই মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের ফলেই জড়া প্রকৃতির জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। তাই *প্রধান* কখনই পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে— *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*। *প্রকৃতি* বা সমগ্র জড় শক্তি ভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য করে। সমস্ত জড় উপাদানগুলির উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জড়া প্রকৃতিকেই এই সমস্ত উপাদানগুলির উৎস বলে মনে করে, তা সর্বতোভাবে ভ্রান্ত। তা অনেকটা ছাগলের গলায় স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড থেকে দুধ দোহন করার প্রচেষ্টার মতো।

শ্লোক ৬২

মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ ।
সেহ নহে, যাতে কর্তা-হেতু—নারায়ণ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতির মায়া-অংশ হচ্ছে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, তা প্রকৃত কারণ হতে পারে না, কেন না মূল কারণ হচ্ছেন শ্রীনারায়ণ।

শ্লোক ৬৩

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার ।
তৈছে জগতের কর্তা—পুরুষাবতার ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

মাটির তৈরি ঘটের কারণ যেমন কুম্ভকার, তেমনই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন প্রথম পুরুষাবতার (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু)।

শ্লোক ৬৪

কৃষ্ণ—কর্তা, মায়া তাঁর করেন সহায় ।
ঘটের কারণ—চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা এবং মায়া কেবল সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করেন, ঠিক যেমন কুম্ভকারের চক্র এবং অন্য সমস্ত যন্ত্র ঘট তৈরির ব্যাপারে কুম্ভকারকে সাহায্য করে।

শ্লোক ৬৫

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ।
জীবরূপ বীর্য তাতে করেন আধান ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে পুরুষাবতার মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং এভাবেই তিনি জীবরূপ বীর্য তাঁর গর্ভে সঞ্চার করেন।

শ্লোক ৬৬

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দেহের প্রতিবিম্বিত জ্যোতির সঙ্গে মায়ার মিলন হয় এবং তার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

বৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বদ্ধ জীবের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত জড় জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আর নাস্তিকদের বিচার হচ্ছে, এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতি থেকে। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি তিনভাবে প্রকাশিত—চিৎ-শক্তি, জড় শক্তি ও তটস্থা শক্তি। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিৎ-শক্তি থেকে অভিন্ন। চিৎ-শক্তির সংস্পর্শেই কেবল জড় শক্তি সক্রিয় হতে পারে এবং তখন অনিত্য জড় সৃষ্টি সক্রিয় বলে মনে হয়। বদ্ধ অবস্থায় তটস্থা শক্তিজাত জীবসমূহ চিৎ-শক্তি ও জড় শক্তির মিশ্রণ। তটস্থা শক্তি মূলত চিৎ-শক্তির অনুগত, কিন্তু জড় শক্তির প্রভাবে জীবসমূহ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অনাদিকাল ধরে জড় জগতে ভ্রমণ করছে।

চিন্ময় স্তরে তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কেন না তখন জীব চিৎ-শক্তির সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু জীব যখন পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন সে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত হয় এবং তার ফলে সে নিত্যজ্ঞান ও আনন্দের পরম মঙ্গলময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। তটস্থা জীব তার স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করার ফলে যখন ভগবৎ-সেবার প্রতি বিমুখ হয়, তখন সে নিজেকে ভগবানের শক্তিরূপে বিবেচনা না করে, শক্তিমান বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলে জীব জড় জগৎকে ভোগ করতে সচেষ্ট হয়।

জড় জগৎ ঠিক চিৎ-জগতের বিপরীত-ধর্মী। চিৎ-শক্তির প্রভাবেই জড় শক্তি সক্রিয় হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি চিন্ময়, কিন্তু তা বিবিধভাবে ক্রিয়া করে; ঠিক যেমন বিদ্যুৎশক্তির ভিন্নভাবে প্রয়োগের ফলে তাপের উদ্ভব হয়, আবার শীতলতারও উদ্ভব হয়। জড় শক্তি হচ্ছে *মায়ার* দ্বারা আচ্ছাদিত চিৎ-শক্তি। তাই জড় শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চিৎ-শক্তিকে অচিৎ-শক্তিতে আরোপ করেন এবং তারপর তা সক্রিয় হয়, যেমন আগুনের মতো উত্তপ্ত হলে লোহা আগুনের মতো ক্রিয়া করে। চিৎ-শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হলেই জড় শক্তি সক্রিয় হতে পারে।

অচেতন জড় শক্তির আবরণে যখন ভগবানের পরা শক্তিসম্ভূত জীব আচ্ছাদিত থাকে, তখন সে চিৎ-শক্তির কার্যকলাপ বিস্মৃত হয় এবং জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা মোহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার ফলে জীব যখন চিন্ময় শক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, অচেতন জড় শক্তির স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। জড় স্তরে যা কিছু হচ্ছে, তা সবই হচ্ছে চিৎ-শক্তির সহায়তায়। চিৎ-শক্তির বিকৃত রূপ জড় শক্তি সব কিছু বিকৃতভাবে প্রকাশ করে এবং তার ফলে ভ্রান্ত ধারণা ও দ্বৈতভাবের উদয় হয়। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন জড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনুমান করে যে, অচিৎ-শক্তি আপনা আপনি সক্রিয় হয়। এই ধারণার ফলে তারা পদে পদে নিরাশ হয়, ঠিক যেমন একজন মোহাচ্ছন্ন মানুষ ছাগলের গলদেশে অবস্থিত স্তনাকৃতি গলস্তন থেকে দুগ্ধ লাভের চেষ্টায় অকৃতকার্য

হয়। ছাগলের গলস্তন থেকে যেমন দুগ্ধ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তেমনই জড়-জাগতিক মতবাদের মাধ্যমে সৃষ্টির আদি কারণ সম্বন্ধে জানার সম্ভাবনা নেই। এই ধরনের প্রচেষ্টা কেবল অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

পরমেশ্বর ভগবানের অচিৎ-শক্তিকে বলা হয় *মায়া,* কেন না দুভাবে (জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করে এবং জড় সৃষ্টি প্রকাশ করে) তা বদ্ধ জীবকে প্রকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে দেয় না। কিন্তু জীব যখন জড় জগতের বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

সৃষ্টির আদি কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় জড় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে। ভগবান জড় জগতে তিনটি গুণ আরোপ করেছেন। এই গুণগুলির দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রকৃতির উপাদানগুলি বিভিন্ন বস্তুর প্রকাশ করে, ঠিক যেমন একজন শিল্পী লাল, হলুদ ও নীল—এই তিনটি রঙের মিশ্রণে নানা রকম ছবি আঁকেন। হলুদ হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রতীক, লাল রজোগুণের প্রতীক এবং নীল তমোগুণের প্রতীক। তাই বৈচিত্র্যময় জড় জগৎ এই তিনটি গুণের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়, যা একাশিটি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (৩×৩=৯, ৯×৯=৮১)। জড় শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব একাশিটি বিভিন্ন বৈচিত্র্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, ঠিক যেমন পতঙ্গ আগুনকে উপভোগ করতে চায়। এই মোহ হচ্ছে বদ্ধ জীবের পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিস্মৃতির ফল। বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা জড়া প্রকৃতির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু চিৎ-শক্তির প্রভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করার ফলে, সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে তাঁর সেবায় যুক্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চিৎ-জগতের আদি কারণ এবং তিনি জড় সৃষ্টির আচ্ছাদিত কারণ। তিনি তটস্থা শক্তি জীবেরও আদি কারণ। তিনি তটস্থা শক্তি নামক জীবের পরিচালক ও প্রতিপালক। জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ-শক্তির আশ্রয়ে সক্রিয় হতে পারে অথবা জড় শক্তির আবরণে আচ্ছাদিত থাকতে পারে। চিৎ-শক্তির প্রভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, স্বাতন্ত্র্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই রয়েছে, যিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করতে পারেন।

পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম পূর্ণ এবং জীবসমূহ সেই পরম পূর্ণের অংশ-বিশেষ। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবের মধ্যে এই সম্পর্ক নিত্য। ভ্রান্তিবশত কারও মনে করা উচিত নয় যে, চিন্ময় পূর্ণকে জড় শক্তির দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত করা যায়। এই মায়াবাদী মতবাদকে *ভগবদ্গীতায়* স্বীকার করা হয়নি। পক্ষান্তরে, *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অণুসদৃশ জীব পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপে চিরকালই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। অংশ যেমন কখনও পূর্ণের সমান হতে পারে না, তেমনই চিন্ময় পূর্ণের অতি ক্ষুদ্র অংশ হওয়ার ফলে জীব কখনই পরম পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের

সমান হতে পারে না। ভগবান পূর্ণ ও জীব তাঁর অংশ হওয়ার ফলে, জীব ও ভগবান যদিও গুণগতভাবে এক, কিন্তু আয়তনগত ভাবে পূর্ণ ও অংশ সমান হতে পারে না। জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হলেও আপেক্ষিকভাবে অবস্থিত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর নিয়ন্তা, কিন্তু জীব সর্বদাই ভগবানের পরা প্রকৃতির দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জীব কখনই জড় জগৎ অথবা চিৎ-জগতের নিয়ন্তা হতে পারে না। জীব তার স্বরূপে সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন। কেউ যখন সেই অবস্থা স্বীকার করে নেয়, তখন তার জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন সে সেই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন সে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ৬৭

অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রকাশ ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটিতে পুরুষ প্রবেশ করেন। যতগুলি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ততরূপে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন।

শ্লোক ৬৮

পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

পুরুষ যখন শ্বাস ত্যাগ করেন, তখন তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৬৯

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন তাঁর প্রশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় তাঁর শরীরে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চার করেন। সেই দৃষ্টিপাতের চিন্ময় অণুগুলি হচ্ছে আত্মা বা চিৎকণা, যারা পূর্বকল্পে তাদের স্ব-স্ব কর্ম অনুসারে বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। ভগবান স্বয়ং তাঁর অংশ-প্রকাশের দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড

সৃষ্টি করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হন। *ভগবদ্গীতায়* আকাশের সঙ্গে বায়ুর তুলনা করার মাধ্যমে মায়ার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আকাশ সমস্ত জড় বস্তুতে প্রবিষ্ট হলেও তা আমাদের থেকে অনেক দূরে।

শ্লোক ৭০

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

গবাক্ষের রন্ধ্র দিয়ে যেমন অণুসদৃশ ধূলিকণা যাতায়াত করে, তেমনই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের জাল পুরুষের লোমকূপ দিয়ে গমনাগমন করে।

শ্লোক ৭১

যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭১ ॥

যস্য—যাঁর; **এক**—এক; **নিশ্বসিত**—নিশ্বাসের; **কালম্**—কাল; **অথ**—এভাবেই; **অবলম্ব্য**—অবলম্বন করে; **জীবন্তি**—জীবন ধারণ করে; **লোম-বিলজাঃ**—লোমকূপ থেকে জাত; **জগৎ-অণ্ড-নাথাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের পতিগণ (ব্রহ্মাগণ); **বিষ্ণুঃ মহান্**—মহাবিষ্ণু; **সঃ**—সেই; **ইহ**—এখানে; **যস্য**—যাঁর; **কলা-বিশেষঃ**—অংশের অংশ; **গোবিন্দম্**—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; **আদি-পুরুষম্**—আদিপুরুষকে; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **ভজামি**—ভজনা করি।

অনুবাদ

"ব্রহ্মা ও জগতের অন্যান্য পতিগণ যাঁর লোমকূপ থেকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর এক নিশ্বাসকাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

তাৎপর্য

ভগবানের সৃষ্টিশক্তির এই বর্ণনাটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৪৮) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যা ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানকে উপলব্ধি করার পর রচনা করেছিলেন। মহাবিষ্ণু যখন শ্বাস ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের চিন্ময় বীজ তাঁর লোমকূপ থেকে নির্গত হয়। আধুনিক পারমাণবিক গবেষণার যুগে, পারমাণবিক বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত এই তথ্যটি থেকে অন্তত একটু আভাস পাবেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত চিন্ময় পরমাণু থেকে কিভাবে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় এবং তা নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন।

শ্লোক ৭২

ক্বাহং তমো-মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাঽবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৭২ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি; **তমঃ**—জড়া প্রকৃতি; **মহৎ**—মহৎ-তত্ত্ব; **অহম্**—অহঙ্কার; **খ**—আকাশ; **চর**—বায়ু; **অগ্নি**—আগুন; **বাঃ**—জল; **ভূ**—পৃথিবী; **সংবেষ্টিত**—পরিবেষ্টিত; **অণ্ড-ঘট**—একটি ঘটের মতো ব্রহ্মাণ্ড; **সপ্ত-বিতস্তি**—সাত বিঘত; **কায়ঃ**—দেহ; **ক্ব**—কোথায়; **ঈদৃক্**—এই রকম; **বিধা**—মতন; **অবিগণিত**—অসংখ্য; **অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড; **পরাণু-চর্যা**—পরমাণুর মতো ভ্রমণশীল; **বাত-অধ্ব**—বায়ুর ছিদ্র; **রোম**—দেহের লোম; **বিবরস্য**—রন্ধ্রের; **চ**—ও; **তে**—আপনার; **মহিত্বম্**—মহিমা।

অনুবাদ

"প্রকৃতি, মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চভূত-নির্মিত আমার হাতের মাপের সাত বিঘত দীর্ঘ এই দেহের অন্তর্গত আমি বা কোথায়, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে যাঁর লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে, সেই রকম যে আপনি, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ, আমার ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ আপনার মহিমার তুলনায় কিছু নয়।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপসখাদের হরণ করার পর ব্রহ্মা ফিরে এসে যখন দেখলেন, গোবৎস এবং গোপবালকেরা তখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তিনি তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পেরে, এভাবেই ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন (*ভাগবত* ১০/১৪/১১)। বদ্ধ জীব, এমন কি সে যদি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মার মতো মহৎও হয় তবুও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই হয় না, কেন না ভগবান তাঁর দেহের লোমকূপ থেকে নির্গত চিন্ময় রশ্মি দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন। জড় বৈজ্ঞানিকদের উচিত ভগবানের তুলনায় আমাদের নগণ্যতা সম্বন্ধে ব্রহ্মা যা বলেছেন, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা। ক্ষমতার গর্বে গর্বিত মানুষদের ব্রহ্মার এই প্রার্থনা থেকে অনেক কিছু জানবার আছে।

শ্লোক ৭৩

অংশের অংশ যেই, 'কলা' তার নাম ।
গোবিন্দের প্রতিমূর্তি শ্রীবলরাম ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

অংশের অংশকে বলা হয় কলা। শ্রীবলরাম হচ্ছেন গোবিন্দের প্রতিমূর্তি।

শ্লোক ৭৪

তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

বলরামের একটি স্বরূপ হচ্ছেন শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ এবং তাঁর এক অংশ পুরুষাবতারকে কলা বা অংশের অংশ বলে গণনা করা হয়।

শ্লোক ৭৫

যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু ।
মহাপুরুষাবতারী তেঁহো সর্বজিষ্ণু ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁকে আমরা কলা বলি, তিনি হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। তিনি হচ্ছেন মহাপুরুষ, যিনি অন্য সমস্ত পুরুষের উৎস এবং সর্বব্যাপ্ত।

শ্লোক ৭৬

গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম ।
সেই দুই, যাঁর অংশ,—বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী উভয়কেই বলা হয় পুরুষ। তাঁরা হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ।

তাৎপর্য

পুরুষের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের অবতারদের বর্ণনা করার সময় গ্রন্থকার *বিষ্ণু পুরাণ* (৬/৮/৫৯) থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "আমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সর্বদাই জড় জগতের দ্বৈতভাব সমন্বিত ছয়টি সমস্ত কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত; যাঁর অংশ-প্রকাশ মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড় জগৎকে প্রকাশিত করেন; যিনি নিজেকে বিভিন্ন চিন্ময় রূপে প্রকাশিত করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিটি রূপই এক এবং অভিন্ন; যিনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর; যিনি সর্ব অবস্থাতেই জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত; তিনি যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে আমাদেরই মতো একজন বলে মনে হলেও তাঁর চিন্ময় রূপ নিত্য আনন্দময়।" এই বর্ণনার সার সংকলন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের যে অংশ-প্রকাশ জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন, তিনি হচ্ছেন *পুরুষ*।

শ্লোক ৭৭

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ৭৭ ॥

বিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; **তু**—অবশ্যই; **ত্রীণি**—তিন; **রূপাণি**—রূপ; **পুরুষ-আখ্যানি**—পুরুষ নামে খ্যাত; **অথো**—কিভাবে; **বিদুঃ**—তাঁরা জানতে পারেন; **একম্**—তাঁদের মধ্যে একজন; **তু**—কিন্তু; **মহতঃ স্রষ্টৃ**—মহৎ-তত্ত্বের স্রষ্টা; **দ্বিতীয়ম্**—দ্বিতীয়; **তু**—কিন্তু; **অণ্ড-সংস্থিতম্**—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে স্থিত; **তৃতীয়ম্**—তৃতীয়; **সর্ব-ভূতস্থম্**—সমস্ত জীবের অন্তরে; **তানি**—সেই তিন জনকে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

অনুবাদ

"নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটি রূপকে বলা হয় পুরুষ। প্রথম মহৎ-তত্ত্বের স্রষ্টা কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় গর্ভোদকশায়ী, যিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করেন এবং তৃতীয় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। এই তিনটি তত্ত্ব জানতে পারলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থ (*পূর্বখণ্ড* ২/৯) থেকে উদ্ধৃত *সাত্বত-তন্ত্রের* একটি শ্লোক।

শ্লোক ৭৮

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি ।
মৎস্য-কূর্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও কারণোদকশায়ী বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের কলা বলা হয়, তবুও তিনি হচ্ছেন মৎস্য, কূর্ম ও অন্যান্য অবতারদের অবতারী।

শ্লোক ৭৯

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৭৯ ॥

এতে—এই সমস্ত; **চ**—এবং; **অংশ-কলাঃ**—অংশ অথবা কলা; **পুংসঃ**—পুরুষাবতারদের; **কৃষ্ণঃ তু**—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—আদিপুরুষ ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ইন্দ্র-অরি**—ইন্দ্রের শত্রু; **ব্যাকুলম্**—উপদ্রুত; **লোকম্**—বিশ্ব; **মৃড়য়ন্তি**—সুখী করেন; **যুগে যুগে**—প্রতি যুগে।

অনুবাদ

"ভগবানের এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষাবতারের অংশ অথবা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। ইন্দ্রের শত্রুদের দ্বারা বিশ্ব যখন প্রপীড়িত হয়, তখন ভগবান তাঁর অংশ-কলার দ্বারা যুগে যুগে বিশ্বকে রক্ষা করেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/২৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮০

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্তা ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পুরুষ (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু) হচ্ছেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। তিনি নানা অবতারে নিজেকে প্রকাশ করেন, কেন না তিনিই হচ্ছেন জগতের পালনকর্তা।

শ্লোক ৮১

সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান ।
সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার' নাম ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপুরুষ নামক ভগবানের যে অংশ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য সাধন করার জন্য আবির্ভূত হন, তাঁকে বলা হয় অবতার।

শ্লোক ৮২

আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্ ।
সর্ব-অবতার-বীজ, সর্বাশ্রয়-ধাম ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মহাপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তিনি হচ্ছেন আদ্যাবতার, অন্য সমস্ত অবতারদের বীজ এবং সব কিছুর আশ্রয়।

শ্লোক ৮৩

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৮৩ ॥

আদ্যঃ অবতারঃ—আদি অবতার; **পুরুষঃ**—মহাবিষ্ণু; **পরস্য**—পরমেশ্বরের; **কালঃ**—কাল; **স্বভাবঃ**—স্বভাব; **সৎ-অসৎ**—কার্য ও কারণ; **মনঃ চ**—এবং মন; **দ্রব্যম্**—পঞ্চ-মহাভূত; **বিকারঃ**—বিকার অথবা অহঙ্কার; **গুণঃ**—প্রকৃতির গুণ; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **বিরাট্**—বিরাটরূপ; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **স্থাস্নু**—স্থাবর; **চরিষ্ণু**—জঙ্গম; **ভূম্নঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

"কারণাব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য-কারণরূপ প্রকৃতি, মন আদি মহৎ-তত্ত্ব, মহাভূত আদি অহঙ্কার, সত্ত্ব আদি গুণ, ইন্দ্রিয়সমূহ, বিরাট, স্বরাট, স্থাবর ও জঙ্গম সবই তাঁর বিভূতি-স্বরূপ।"

তাৎপর্য

অবতারসমূহ ও তাঁদের লক্ষণ বর্ণনা করে *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন জড় জগতের সৃষ্টিকার্যের জন্য অবতরণ করেন, তখন তাঁকে বলা হয় *অবতার*। *অবতার* দুই প্রকার—শক্ত্যাবিষ্ট ভক্ত ও তদেকাত্মরূপ (ভগবান স্বয়ং)। তদেকাত্মরূপের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শেষ এবং শক্ত্যাবিষ্ট ভক্তের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, জড় জগৎ হচ্ছে আংশিকভাবে ভগবানের রাজ্য, যেখানে ভগবান কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করার জন্য মাঝে মাঝে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যে অংশাবতারের দ্বারা এই কার্য সম্পাদন করেন, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের আদি উৎস মহাবিষ্ণু। অনভিজ্ঞ দর্শকেরা অনুমান করে যে, জড়া প্রকৃতি জড় সৃষ্টির কারণ ও উপাদান উভয়ই সরবরাহ করে এবং জীব এই প্রকৃতির ভোক্তা। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা, যাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কিছু বিচার করেছেন, তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, জড়া প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে জড় উপাদানগুলি সরবরাহও করতে পারে না এবং জড় সৃষ্টির কারণও হতে পারে না। পরমপুরুষ মহাবিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের প্রভাবে জড়া প্রকৃতি জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করার শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়ে প্রকৃতি জড় জগৎ প্রকাশের কারণ হয়। জড় সৃষ্টির কারণরূপে এবং জড় উপাদানগুলির উৎসরূপে জড়া প্রকৃতির যে ক্ষমতা, তা সম্ভব হয় পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। পরমেশ্বর ভগবানের যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকাশ জড় শক্তিকে আবিষ্ট করে, তাঁদের বলা হয় অংশ-প্রকাশ বা অবতার। একটি আলোকবর্তিকা থেকে বহু আলোকবর্তিকা জ্বালাবার দৃষ্টান্তটি এখানে দেওয়া যায়। ভগবানের সব কয়টি অংশ-প্রকাশ বা অবতার তাঁরই মতো শক্তিমান তত্ত্ব; কিন্তু মায়ার নিয়ন্ত্রণ কার্যে যুক্ত থাকায়, তাঁদের কখনও কখনও মায়িক বা মায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (২/৬/৪২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৪

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ৮৪ ॥

জগৃহে—ধারণ করেছিলেন; পৌরুষম্—পুরুষাবতার; রূপম্—রূপ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; মহৎ-আদিভিঃ—মহৎ-তত্ত্ব আদির দ্বারা; সম্ভূতম্—সৃষ্টি করেছিলেন; ষোড়শ—ষোল; কলম্—শক্তি; আদৌ—আদিতে; লোক—জড় জগৎ; সিসৃক্ষয়া—সৃষ্টি করার জন্য।

অনুবাদ

"সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবান জড় সৃষ্টির সমস্ত উপাদান সহ পুরুষাবতার রূপ ধারণ করেছিলেন। জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য তিনি প্রথমে ষোলটি প্রধান শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/৩/১) থেকে উদ্ধৃত। শ্রীমধ্বাচার্য *শ্রীমদ্ভাগবতের* তাৎপর্যে বলেছেন যে, নিম্নলিখিত ষোলটি চিন্ময় শক্তি চিৎ-জগতে বিরাজমান—(১) শ্রী, (২) ভূ, (৩) লীলা, (৪) কান্তি, (৫) কীর্তি, (৬) তুষ্টি, (৭) গীঃ, (৮) পুষ্টি, (৯) সত্যা, (১০) জ্ঞানাজ্ঞানা, (১১) জয়া উৎকর্ষিণী, (১২) বিমলা, (১৩) যোগমায়া, (১৪) প্রহ্বী, (১৫) ঈশানা ও (১৬) অনুগ্রহা। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শক্তিগুলি নয়টি নামেও পরিচিত—(১) বিমলা, (২) উৎকর্ষিণী, (৩) জ্ঞানা, (৪) ক্রিয়া, (৫) যোগা, (৬) প্রহ্বী, (৭) সত্যা, (৮) ঈশানা ও (৯) অনুগ্রহা। শ্রীল জীব গোস্বামী বিরচিত *ভাগবত-সন্দর্ভে* (শ্লোক ১০৩) তাঁদের শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, জয়া, বিদ্যাবিদ্যা, মায়া, সম্বিৎ, সন্ধিনী, হ্লাদিনী, ভক্তি, মূর্তি, বিমলা, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহা আদি নামে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে এই সমস্ত শক্তি বিভিন্নভাবে কার্যকরী হয়।

শ্লোক ৮৫

যদ্যপি সর্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার ।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয় এবং যদিও সব কয়টি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মধ্যে বিরাজ করছে, তিনিই আবার পরমাত্মারূপে সব কিছুর আধার।

শ্লোক ৮৬

প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর দুই প্রকার সম্পর্ক রয়েছে, তবুও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর কোন রকম যোগাযোগ নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে জড় গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে ভগবানের চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে বলেছেন যে, জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা ও অধ্যক্ষরূপে জড় গুণগুলির সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর যে সম্বন্ধ, তাকে বলা হয় *যোগ*। কারাধ্যক্ষ যেমন কয়েদি নন, তেমনই ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতির পরিচালক ও পরিদর্শকরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে জড়া প্রকৃতির গুণগুলির কোন সম্বন্ধ নেই। শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশগণ সর্ব অবস্থাতেই তাঁদের ঈশ্বরত্ব বজায় রাখেন; তাঁরা কখনই জড় গুণের দ্বারা যুক্ত হয়ে পড়েন না। এখন তর্ক উঠতে পারে যে, জড় গুণের সঙ্গে মহাবিষ্ণুর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, কারণ তাঁর যদি সেই সম্পর্ক থাকত, তা হলে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হত না যে, মায়া (জড়া প্রকৃতি) জীবকে ভগবৎ-বিমুখ করার প্রশংসাহীন কাজে লজ্জিতা হয়ে ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, *গুণ* শব্দের অর্থ 'নিয়ম'। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই জড় জগতে তিনটি গুণের নিয়ন্তারূপে অবস্থিত এবং গুণের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধকে বলা হয় *যোগ*। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধ। বিশেষ করে শ্রীবিষ্ণু সর্ব অবস্থাতেই এই গুণের নিয়ন্তা। তাঁর গুণবদ্ধ হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

যদিও পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে প্রকৃতিতে উপাদান ও নিমিত্ত কারণের প্রকাশ হয় এবং সেই সূত্রে ভগবানের দৃষ্টিপাতের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ থাকলেও ভগবান কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে জড় জগতে বিভিন্ন গুণগত বিকার সাধিত হয়, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর কোন প্রকার জড় বিকারের সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ৮৭

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৮৭ ॥

এতৎ—এই; ঈশনম্—ঐশ্বর্য; ঈশস্য—ভগবানের; প্রকৃতিস্থঃ—জড়া প্রকৃতিতে স্থিত; অপি—যদিও; তৎ-গুণৈঃ—জড় গুণের দ্বারা; ন যুজ্যতে—কখনও প্রভাবিত হন না; সদা—সর্বদা; আত্মস্থৈঃ—তাঁর স্বীয় শক্তিতে অবস্থিত; যথা—যেমন; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; তৎ—তাঁর; আশ্রয়া—ভক্তগণ।

অনুবাদ

"জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির গুণের বশীভূত না হওয়াই হচ্ছে ভগবানের ঐশ্বর্য। তেমনই, যাঁরা তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁদের বুদ্ধিকে তাঁর উপর নিবদ্ধ করেন, তাঁরা কখনও প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না"।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১/১১/৩৮) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৮৮

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয় ।
সর্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই গীতাতেও বারবার বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈশ্বরতত্ত্ব সর্বদাই অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন।

শ্লোক ৮৯

আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে ।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—) "আমি জড় জগতে অবস্থিত এবং জড় জগৎ আমাকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি এই জড় জগতে অবস্থিত নই এবং জড় জগৎও আমাতে অবস্থিত নয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় না হলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই সমগ্র জগৎ ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে। কিন্তু, তাই বলে কারও মনে করা উচিত নয় যে, জড় জগৎ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। মেঘ আকাশের আশ্রয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা বলে মেঘ ও আকাশ এক বস্তু নয়। তেমনই, গুণময়ী জড়া প্রকৃতি এবং জড় জগতের সমস্ত দ্রব্য কখনই ভগবানের সঙ্গে এক নয়। মায়া বা জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার প্রবণতা ভগবানের নেই। তিনি যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় প্রকৃতি নিয়ে এখানে আসেন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। চিৎ-জগৎ ও জড় জগৎ, উভয় জগতেই তিনি সর্বদা সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা। নির্মল পরা প্রকৃতি সর্বদাই তাঁর মধ্যে বিরাজ করে। ভগবান তাঁর লীলাবিলাসের জন্য এই জড় জগতে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন এবং অন্তর্হিত হন। কিন্তু তবুও তিনি সর্ব অবস্থাতেই সমগ্র জড় সৃষ্টির আদি উৎস।

পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু মায়ার সংস্পর্শে এলেও কখনও মায়ার অধীন হন না। তাঁর সচ্চিদানন্দময় আদি স্বরূপ কখনই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীন হন না। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৯০

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই জানিহ আমার ।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"হে অর্জুন জেনে রেখো যে, আমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য এই রকম।" ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই অর্থই প্রচার করেছেন।

শ্লোক ৯১

সেই ত' পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম ।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মহাপুরুষ (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু) যাঁর অংশরূপে পরিচিত, সেই নিত্যানন্দ বলরাম হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

শ্লোক ৯২

এই ত' নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি নবম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমি দশম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করব। দয়া করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৯৩

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্ ।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯৩ ॥

যস্য—যাঁর; অংশ-অংশঃ—অংশের অংশ; শ্রীল-গর্ভ-উদ-শায়ী—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; যৎ—যাঁর; নাভি-অব্জম্—নাভিপদ্ম; লোক-সংঘাত—লোকসমূহের; নালম্—নাল, যা বিশ্রামস্থান; লোক-স্রষ্টুঃ—লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার; সূতিকাধাম—জন্মস্থান; ধাতুঃ—সৃষ্টিকর্তার; তম্—সেই; শ্রী-নিত্যানন্দ-রামম্—শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামকে; প্রপদ্যে—আমি প্রণাম করি।

অনুবাদ

যাঁর নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার সূতিকাধাম এবং লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ রামকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি প্রদ্যুম্ন, তিনিই অনিরুদ্ধ। তিনি ব্রহ্মারও পিতা। এভাবেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধ্যদেব প্রদ্যুম্নের অভিন্ন অংশ-প্রকাশ। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে বিশ্বের সৃষ্টিকার্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার জন্মের পূর্ণ বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৮/১৫-১৬) দেওয়া হয়েছে।

তিন পুরুষাবতারের রূপ বর্ণনা করে *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর রূপ চতুর্ভুজ এবং তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডের গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়ে ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করেন, তখন তিনি ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে পরিচিত হন, যিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এমন কি দেবতাদেরও। *সাত্বত-তন্ত্রে* বলা হয়েছে যে, তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই লীলাবিলাসের জন্য ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ৯৪

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্তি হঞা ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করে প্রথম পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন।

শ্লোক ৯৫

ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার ।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন সব কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সেখানে থাকবার মতো কোন স্থান নেই। তখন তিনি বিবেচনা করলেন।

শ্লোক ৯৬

নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন ।
সেই জলে কৈল অর্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তিনি তাঁর দেহের স্বেদজল সৃষ্টি করলেন এবং সেই জলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ পূর্ণ করলেন।

শ্লোক ৯৭

ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন ।
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি যোজন। তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এক ও সমান।

শ্লোক ৯৮

জলে ভরি' অর্ধ তাঁহা কৈল নিজ-বাস ।
আর অর্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ জলে পূর্ণ করে তিনি সেখানে তাঁর নিজের আবাসস্থল তৈরি করলেন এবং বাকি অর্ধাংশে চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করলেন।

তাৎপর্য

চতুর্দশ ভুবনের বর্ণনা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সাতটি ঊর্ধ্বলোক হচ্ছে ১) ভূ, ২) ভুবঃ, ৩) স্বঃ, ৪) মহঃ, ৫) জন, ৬) তপ ও ৭) সত্য। নিম্নলোকগুলি হচ্ছে ১) তল, ২) অতল, ৩) বিতল, ৪) নিতল, ৫) তলাতল ৬) মহাতল ও ৭) সুতল। নিম্ন লোকগুলিকে একত্রে বলা হয় পাতাল। উপরের দিকে ভুবর্লোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত লোকগুলিকে বলা হয় স্বর্গলোক এবং ভূলোককে বলা হয় মর্ত্যলোক। এভাবেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় ত্রিলোক।

শ্লোক ৯৯

তাঁহহি প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম ।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে তিনি তাঁর নিজধাম বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করলেন এবং শেষশয্যায় জলে শয়ন করলেন।

শ্লোক ১০০-১০১

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন ।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ১০০ ॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন ।
সর্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে তিনি অনন্তশয্যায় শয়ন করলেন। ভগবান অনন্ত সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র হস্ত, সহস্র পাদ এবং সহস্র নয়ন-বিশিষ্ট। তিনি সমস্ত অবতারদের বীজ এবং জড় জগতের কারণ।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু তাঁর স্বেদজলে শেষশয্যায় শয়ন করেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* ও চারটি *বেদে* তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

"অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণুর সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত-পদ এবং তিনিই হচ্ছেন এই জড় জগতের সমস্ত অবতারদের উৎস।"

শ্লোক ১০২

তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর নাভিপদ্ম থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হল। সেই পদ্ম হচ্ছে ব্রহ্মার জন্মস্থান।

শ্লোক ১০৩

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন ।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পদ্মের নালে তিনি চোদ্দভুবন সৃষ্টি করলেন। এভাবেই ব্রহ্মা হয়ে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন।

শ্লোক ১০৪

বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে ।
গুণাতীত-বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

বিষ্ণুরূপে তিনি জগৎ পালন করেন। শ্রীবিষ্ণু মায়াতীত হওয়ার ফলে, জড় গুণ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন, যদিও বিষ্ণু হচ্ছেন জড় জগতের সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতৃদেব, তবুও তিনি কখনও সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ, তিনি তাঁর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা

সেই গুণকে পরিচালিত করেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সমস্ত জীবের সর্বমঙ্গল সাধিত হয়। *বামন পুরাণে* বলা হয়েছে, সেই বিষ্ণু নিজেকে ব্রহ্মা ও শিবরূপে প্রকাশ করে বিভিন্ন গুণগুলি পরিচালনা করেন।

যেহেতু শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণ বিস্তার করেন, তাই তাঁর একটি নাম সত্ত্বতনু। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বিবিধ অবতারগণও সত্ত্বতনু নামে পরিচিত। তাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণু সব রকম গুণ থেকে মুক্ত। *শ্রীমদ্ভাগবতে* দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স সর্বদৃগ্ উপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই জড় গুণের কলুষ থেকে মুক্ত, কেন না তিনি জড় জগতের অতীত। তিনি ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতাদের জ্ঞানের উৎস এবং তিনি সব কিছুর সাক্ষী। তাই যিনি পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিও জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হন।" (ভাগবত ১০/৮৮/৫) শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাই তাঁকে সত্ত্বতনু বলা হয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১০৫

রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

রুদ্ররূপ ধারণ করে তিনি জগৎ সংহার করেন। এভাবেই তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়।

তাৎপর্য

মহেশ্বর বা শিব সাধারণ জীব নন, আবার তিনি শ্রীবিষ্ণুর সমকক্ষও নন। বিষ্ণু ও শিবের তুলনা করে *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু হচ্ছেন দুধের মতো এবং শিব হচ্ছেন দধির মতো। দধি দুধেরই বিকার, কিন্তু তা হলেও তা দুধ নয়।

শ্লোক ১০৬

হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ ।
যাঁর অংশ করি' করে বিরাট-কল্পন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, সমস্ত জগতের কারণ। তাঁর অংশকেই বিরাটরূপে কল্পনা করা হয়।

শ্লোক ১০৭

হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব-অবতংস ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত অবতারদের উৎস সেই নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ বলরামের অংশের অংশ।

শ্লোক ১০৮

দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি দশম শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করেছি। এখন দয়া করে মনোযোগ সহকারে একাদশ শ্লোকের অর্থ শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১০৯

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০৯ ॥

যস্য—যাঁর; অংশ-অংশ-অংশঃ—অংশাতি অংশের অংশ; পর-আত্মা—পরমাত্মা; অখিলানাম্—সমস্ত জীবের; পোষ্টা—পালনকর্তা; বিষ্ণুঃ—শ্রীবিষ্ণু; ভাতি—প্রতিভাত হন; দুগ্ধ-অব্ধি-শায়ী—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু; ক্ষৌণীভর্তা—পৃথিবী ধারণকারী; যৎ—যাঁর; কলা—অংশের অংশ; সঃ—তিনি; অপি—অবশ্যই; অনন্তঃ—শেষনাগ; তম্—সেই; শ্রীনিত্যানন্দ-রামম্—শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামকে; প্রপদ্যে—আমি প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

যাঁর অংশাতি অংশের অংশ হচ্ছেন ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা। পৃথিবী ধারণকারী শেষনাগ হচ্ছেন যাঁর কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

শ্লোক ১১০

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী ।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে উত্থিত পদ্মের নালে ধরণী অবস্থিত। ধরণীর মধ্যে সাতটি সমুদ্র রয়েছে।

শ্লোক ১১১

তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম ।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে, ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে রয়েছে জগতের পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণুর ধাম শ্বেতদ্বীপ।

তাৎপর্য

সিদ্ধান্ত-শিরোমণি নামক জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিম্নলিখিতভাবে সাতটি সমুদ্রের বর্ণনা করা হয়েছে—১) লবণসমুদ্র, ২) ক্ষীরসমুদ্র, ৩) দধিসমুদ্র, ৪) ঘৃতসমুদ্র ৫) ইক্ষুরস-সমুদ্র, ৬) মদ্যসমুদ্র ও ৭) স্বাদুজল-সমুদ্র। লবণ-সমুদ্রের দক্ষিণে রয়েছে ক্ষীরসমুদ্র, যেখানে ব্রহ্মা আদি দেবতাদের দ্বারা পূজিত সর্বাশ্রয় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বাস করেন।

শ্লোক ১১২

সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্যামী ।
জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা। তিনি এই জড় জগৎ পালন করেন এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের পতি।

তাৎপর্য

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে *(পূর্ব* ২/৩৬-৪২) *বিষ্ণুধর্মোত্তর* শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বিষ্ণুলোকের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"শিবের আলয় রুদ্রলোকের উপরিভাগে চার লক্ষ মাইল পরিমিত বিষ্ণুলোক নামক সর্বলোকের অগম্য একটি লোক আছে। তার উপরিভাগে সুমেরুর পূর্বদিকে লবণ-সমুদ্রের মধ্যভাগে জলের মধ্যে অবস্থিত বৃহদাকার স্বর্ণময় মহাবিষ্ণুলোক রয়েছে। শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করার জন্য ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা মধ্যে মধ্যে সেখানে যান। এই লোকে জনার্দন বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে শেষশয্যায় বর্ষার চার মাস নিদ্রিত থাকেন। সুমেরুর পূর্বদিকে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে শুভ্রবর্ণা অন্য পুরী আছে, তাতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে শেষাসনে উপবেশন করে বিরাজ করেন। সেখানেও প্রভু বর্ষার চার মাস নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন। তারই দক্ষিণ দিকে ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে দুই লক্ষ মাইল পরিমিত শ্বেতদ্বীপ নামক বিখ্যাত পরম সুন্দর একটি দ্বীপ আছে।" *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, মহাভারত* ও *পদ্ম পুরাণ* আদি শাস্ত্রে শ্বেতদ্বীপের বর্ণনা রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৫/১৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্মময়ে ময়ি ।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্মিরহিতো নরঃ ॥

"হে উদ্ধব! তোমার জানা উচিত যে, শ্বেতদ্বীপে আমার বিষ্ণুরূপ আমার থেকে অভিন্ন। কেউ যদি শ্বেতদ্বীপ-পতিকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেন, তা হলে তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, মৃত্যু, শোক ও মোহ—এই ছয়টি দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হন। এভাবেই তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারেন।"

শ্লোক ১১৩

যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার ।
ধর্ম সংস্থাপন করে, অধর্ম সংহার ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

যুগে যুগে এবং মন্বন্তরে মন্বন্তরে অধর্ম সংহার করে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য তিনি নানারূপে অবতরণ করেন।

তাৎপর্য

অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বিভিন্ন রূপে অবতরণ করেন। প্রত্যেক মন্বন্তরে (এক-একজন মনুর আয়ুষ্কাল হচ্ছে ৭১×৪৩, ২০, ০০০ বছর) ভগবান অবতরণ করেন। ব্রহ্মার এক দিনে একে একে চোদ্দজন মনুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়।

শ্লোক ১১৪

দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন ।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

দেবতারাও তাঁর দর্শন লাভ করতে পারেন না, তাই তাঁকে দর্শন করার জন্য তাঁরা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে তাঁর স্তব করেন।

তাৎপর্য

স্বর্গের দেবতারাও শ্বেতদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করতে পারেন না। সেই দ্বীপে গমন করতে অক্ষম হয়ে, তাঁরা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে অবতরণ করার জন্য আবেদন করে তাঁর স্তব করেন।

শ্লোক ১১৫

তবে অবতরি' করে জগৎ পালন ।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন তিনি জগৎ পালন করার জন্য অবতরণ করেন। তাঁর অনন্ত বৈভব কখনও নিরূপণ করা যায় না।

শ্লোক ১১৬

সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব-অবতংস ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অংশের অংশের অংশ।

তাৎপর্য

শ্বেতদ্বীপাধিপতি বিষ্ণুর সৃষ্টি করার এবং ধ্বংস করার অসীম ক্ষমতা রয়েছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, যিনি হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের আদিরূপ স্বয়ং শ্রীবলদেব, তিনিই হচ্ছেন শ্বেতদ্বীপাধিপতির আদিরূপ।

শ্লোক ১১৭

সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী ।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বিষ্ণু শেষরূপে তাঁর মস্তকে ধরণী ধারণ করেন। তিনি জানেন না সেগুলি কোথায় রয়েছে, কেন না তিনি তাঁর মস্তকে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেন না।

শ্লোক ১১৮

সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল ।
সূর্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর হাজার হাজার বিস্তীর্ণ ফণায় সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল মণিসমূহ ঝলমল করে।

শ্লোক ১১৯

পঞ্চাশৎকোটি-যোজন পৃথিবী-বিস্তার ।
যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর একটি ফণার উপর একটি সর্ষের দানার মতো বিরাজ করে।

তাৎপর্য

শ্বেতদ্বীপাধিপতি নিজেকে শেষনাগরূপে প্রকাশ করেন, যিনি তাঁর অনন্ত ফণায় সমস্ত ভুবনগুলি ধারণ করেন। এই সমস্ত এক-একটি বিশাল ভুবন তাঁর মাথায় এক-একটি

সর্ষের দানার মতো বিরাজ করে। বৈজ্ঞানিকদের অনুমিত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সঙ্কর্ষণের শক্তির আংশিক বিশ্লেষণ। 'সঙ্কর্ষণ' নামটির সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের নামগত সম্পর্ক রয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/১৭/২১) শেষনাগের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

যমাহরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু ॥

"হে ভগবান! *বেদের* মন্ত্র ঘোষণা করে যে, আপনি হচ্ছেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি এই সমস্ত সীমার অতীত এবং তাই আপনার নাম অনন্ত। আপনার হাজার হাজার ফণায় অসংখ্য ভুবন সর্ষের দানার মতো বিরাজ করছে এবং তারা এতই নগণ্য যে, তাদের ভার পর্যন্ত আপনি অনুভব করতে পারেন না।" *ভাগবতে* (৫/২৫/২) আরও বলা হয়েছে—

যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ।

"শ্রীঅনন্তদেব সহস্র সহস্র ফণাবিশিষ্ট। তাঁর প্রতিটি ফণাতে রয়েছে এক-একটি ক্ষিতিমণ্ডল, যেগুলি সর্ষের দানার মতো প্রতিভাত হয়।"

শ্লোক ১২০

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার ।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অনন্তশেষ হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত-অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *কৃষ্ণসন্দর্ভে* শেষনাগের বর্ণনা করে বলেছেন—"শ্রীঅনন্তদেব সহস্র সহস্র বদন বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উন্মুখ হয়ে সর্বদা তাঁর সম্মুখে থাকেন। সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন বাসুদেবের প্রথম অংশ এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন, সেহেতু তাঁকে বলা হয় *স্বরাট্* বা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। তাই তিনি অনন্ত অর্থাৎ কাল, দেশ, সীমা রহিত। তিনি সহস্র বদন শেষরূপেও বর্তমান।" *স্কন্দ পুরাণে, অযোধ্যা-মাহাত্ম্য* অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, সকলের সমক্ষে দেবরাজ ইন্দ্র শেষরূপধারী সত্যপ্রতিজ্ঞ লক্ষ্মণকে বলতে লাগলেন, "আপনি আপনার সনাতন বিষ্ণুধামে গমন করুন, যেখানে আপনার ফণাশোভিত শেষমূর্তিও উপস্থিত আছেন।" এই বলে দেবরাজ ভূভার ধারণে সমর্থ শেষরূপী লক্ষ্মণকে পাতালে প্রেরণ করে সুরলোকে গমন

করলেন। এই উদ্ধৃতিটি থেকে বোঝা যায় যে, চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণরূপে অবতরণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন অপ্রকট হন, শেষ তখন লক্ষ্মণ থেকে পৃথক হয়ে স্বীয় ধাম পাতালে গমন করেন এবং লক্ষ্মণ বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে—"দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ ভূধারী শেষ-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শেষের দুটি রূপ রয়েছে। একটি হচ্ছে ভূধারী এবং অপরটি হচ্ছে ভগবানের শয্যারূপ সেবক। যে শেষ ভূধারণ করেন, তিনি হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের আবেশ অবতার। সেই জন্য তাঁকেও কখনও কখনও সঙ্কর্ষণ বলা হয়। শয্যারূপ শেষ সর্বদাই ভগবানের নিত্য সেবক বলে অভিমান করেন।"

শ্লোক ১২১

সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান ।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

সহস্র বদনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, কিন্তু এভাবেই নিরন্তর কীর্তন করেও তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত পান না।

শ্লোক ১২২

সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে ।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

সনক আদি চার কুমার তাঁর মুখ থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন এবং তাঁরা ভগবৎ-প্রেমের দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে তার পুনরাবৃত্তি করেন।

শ্লোক ১২৩

ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন ।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, বিশ্রামের আসন, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন আদি রূপে নিজেকে প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

শ্লোক ১২৪

এত মূর্তিভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে ।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার চরম সীমা প্রাপ্ত হয়ে তিনি শেষ নাম ধরেছেন।

শ্লোক ১২৫

সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা ।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত যাঁর অংশের অংশ বা কলা, তিনি হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ১২৬

এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা ।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁর মহিমা ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত সিদ্ধান্ত থেকে আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্বের সীমা অবগত হতে পারি, কিন্তু তাঁকে অনন্ত বলার কি মহিমা?

শ্লোক ১২৭

অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি' ।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

আমি কিন্তু এই তত্ত্ব সত্য বলেই স্বীকার করি, কেন না এই সব ভক্তের বাক্য। যেহেতু তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী, তাই তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।

শ্লোক ১২৮

অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে ।
পূর্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা জানেন যে, অবতার ও অবতারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পূর্বে যেমন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১২৯

কেহো কহে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ, আবার কেউ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বামনাবতার।

শ্লোক ১৩০

কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার ।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার। সেই সব উক্তিই সত্য, তা অসম্ভব নয়।

শ্লোক ১৩১

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয় ।
সর্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত অংশের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর সমস্ত অংশ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন।

শ্লোক ১৩২

যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে ।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

যিনি যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, তিনি সেভাবেই তাঁর কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সবই সম্ভব, তাই তা মিথ্যা নয়।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে হায়দ্রাবাদে যখন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করছিলাম, তখন আমাদের দুজন সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। তাদের একজন বলেছিল, 'হরে রাম' বলতে শ্রীবলরামকে সম্বোধন করা হচ্ছে, আর অন্য একজন প্রতিবাদ করে বলেছিল যে, 'হরে রাম' মানে হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র। অবশেষে তারা তাদের সেই তর্কের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমার কাছে আসে এবং আমি বলেছিলাম যে, কেউ যদি বলে 'হরে রাম'-এর 'রাম' হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র আর কেউ যদি বলে 'হরে রাম'-এর 'রাম' হচ্ছেন শ্রীবলরাম, তা হলে তাদের দুজনেই ঠিক, কেন না শ্রীবলরাম ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এখানেও দেখা যাচ্ছে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও সেই সিদ্ধান্তই করেছেন—

যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥

কেউ যদি 'হরে রাম' মন্ত্রে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করেন অথবা রামচন্দ্রকে বোঝেন, তা হলে তা ভুল নয়, তেমনই কেউ যদি বলেন যে, 'হরে রাম' মানে শ্রীবলরাম, তা হলে তিনিও ঠিক। যাঁরা বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক করেন না।

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে প্রকাশকারী নারায়ণ এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, উভয়ই বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার বলে যে ধারণা, তা তিনি খণ্ডন করেছেন। কোন কোন ভক্ত মনে করেন, নারায়ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অবতার। এমন কি শঙ্করাচার্যও তাঁর *ভগবদ্গীতার* ভাষ্যে নারায়ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন, যিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা বেশ কঠিন হতে পারে। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় *ভগবদ্গীতায়* এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমিই সব কিছুর উৎস।" 'সব কিছু' বলতে নারায়ণকেও বোঝানো হয়েছে। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষ ভগবান—নারায়ণ নন।

এই প্রসঙ্গে তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৩/২/১৫) একটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-
রভ্যর্দ্যমানেম্বনুকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো
হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ ॥

"যখন বসুদেবের মতো ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কংস আদি ভয়ংকর অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আদি সমস্ত লীলা অবতারদের সঙ্গে যুক্ত হন এবং তিনি অজ হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ করেন, ঠিক যেমন অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে আগুনের প্রকাশ হয়।" দেশলাই অথবা অন্য কোন আগুন ছাড়াই কেবল অরণি কাষ্ঠের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি জ্বালানো হত। অরণি কাষ্ঠ থেকে যেমন আগুনের প্রকাশ হয়, তেমনই ভক্তদের সঙ্গে অভক্তদের সংঘর্ষের ফলে পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্নের মতো তাঁর সমস্ত অবতারদের নিয়ে পূর্ণরূপে অবতরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই নৃসিংহ, বরাহ, বামন, নর-নারায়ণ, হয়গ্রীব, অজিত আদি অবতারদের সঙ্গে যুক্ত। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও এই সমস্ত অবতারদের লীলা প্রদর্শন করেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে, "সেই একই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে পরিচিত, সমস্ত জীবের পরম বন্ধু এবং ক্ষীরসমুদ্রে শ্বেতদ্বীপপতি এবং যিনি

হচ্ছেন পুরুষোত্তম, তিনিই নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আগুনে বিভিন্ন আকারের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে; তাদের কোনটি খুব বড়, আবার কোনটি ছোট। ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গগুলিকে জীবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর বৃহৎ স্ফুলিঙ্গগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের অবতারদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সমস্ত অবতারই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ এবং তাঁদের লীলান্তে তাঁরা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঐক্য প্রাপ্ত হন।"

সুতরাং বিভিন্ন *পুরাণে* শ্রীকৃষ্ণকে কখনও নারায়ণ, কখনও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, কখনও গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং কখনও বৈকুণ্ঠনাথ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবস্থাতেই পূর্ণ, তাই মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণে রয়েছেন এবং যেহেতু সমস্ত অবতার মূল-সঙ্কর্ষণ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন, তাই বুঝতে হবে যে, তাঁর পরম ইচ্ছার প্রভাবে তিনি বিভিন্ন অবতারদের প্রকাশ করতে পারেন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতেও। তাই মহান ঋষিরা বিভিন্ন নামে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেছেন। এভাবেই সমস্ত অবতারের অবতারী আদিপুরুষকে যখন কখনও অবতার বলে বর্ণনা করা হয়, তখন তাতে কোন ভুল হয় না।

শ্লোক ১৩৩

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত অবতারের সমস্ত লীলা সবাইকে দেখিয়েছেন।

শ্লোক ১৩৪

এইরূপে নিত্যানন্দ 'অনন্ত'-প্রকাশ।
সেইভাবে—কহে মুঞি চৈতন্যের দাস ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত প্রকাশ রয়েছে। সেই অপ্রাকৃত ভাবের আবেগে তিনি বলেন যে, তিনি হচ্ছেন শ্রীচৈতন্যের দাস।

শ্লোক ১৩৫

কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও গুরুরূপে, কখনও সখারূপে এবং কখনও ভৃত্যরূপে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেন, ঠিক যেভাবে বলরাম পূর্বে ব্রজে এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেছিলেন।

শ্লোক ১৩৬

বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

বৃষ হয়ে কখনও শ্রীবলরাম মাথা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পাদ-সম্বাহন করেন।

শ্লোক ১৩৭

আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জানে ।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি নিজেকে ভৃত্য বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলে জানেন। এভাবেই তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা বলে মনে করেন।

শ্লোক ১৩৮

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৩৮ ॥

বৃষায়মাণৌ—বৃষের মতো হয়ে; **নর্দন্তৌ**—গর্জন করতে করতে; **যুযুধাতে**—তাঁরা দুজনে লড়াই করতেন; **পরস্পরম্**—পরস্পরের সঙ্গে; **অনুকৃত্য**—অনুকরণ করে; **রুতৈঃ**—শব্দ করতেন; **জন্তূন্**—পশুসমূহ; **চেরতুঃ**—খেলা করতেন; **প্রাকৃতৌ**—সাধারণ বালকদের মতো; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

"সাধারণ বালকদের মতো তাঁরা দুই ভাই বৃষের মতো গর্জন করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন এবং কখনও তাঁরা বিভিন্ন পশুদের ডাকের অনুকরণ করতেন।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ও পরবর্তী শ্লোকটি ভাগবত (১০/১১/৪০ ও ১০/১৫/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৩৯

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **ক্রীড়া**—খেলা করে; **পরিশ্রান্তম্**—অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে; **গোপ-উৎসঙ্গ**—গোপবালকের কোলে; **উপবর্হণম্**—বালিশের মতো মাথা রেখে; **স্বয়ম্**—স্বয়ং

শ্রীকৃষ্ণ; **বিশ্রাময়তি**—বিশ্রাম করিয়ে; **আর্যম্**—তাঁর বড় ভাই; **পাদ-সম্বাহন-আদিভিঃ**—পাদ-সম্বাহন আদির দ্বারা।

অনুবাদ

"কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন কোন গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শয়ন করতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর পাদ-সম্বাহন করে সেবা করতেন।"

শ্লোক ১৪০

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১৪০ ॥

কা—কে; **ইয়ম্**—এই; **বা**—অথবা; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **আয়াতা**—এসেছে; **দৈবী**—দেবতা কি না; **বা**—অথবা; **নারী**—স্ত্রীলোক; **উত**—অথবা; **আসুরী**—আসুরিক; **প্রায়ঃ**—প্রায়ই; **মায়া**—মায়াশক্তি; **অস্তু**—তিনি নিশ্চয়ই হবেন; **মে**—আমার; **ভর্তুঃ**—প্রভু শ্রীকৃষ্ণের; **ন**—না; **অন্যা**—অন্য কেউ; **মে**—আমার; **অপি**—অবশ্যই; **বিমোহিনী**—বিমোহিনী।

অনুবাদ

"এই মায়া কে এবং তিনি কোথা থেকে এসেছেন? ইনি কি দৈবী, মানুষী, না আসুরী? তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি, কেন না তিনি ছাড়া আর কে আমাকে বিমোহিত করতে পারেন?"

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াবিলাস ব্রহ্মার চিত্তে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং তাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের গোপসখা ও গোবৎসদের হরণ করেন। আর তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোবৎস ও গোপসখাদের পুনরায় সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণসৃষ্ট গোবৎসদের প্রতি গাভীদের অস্বাভাবিক স্নেহ দর্শন করে, শ্রীবলদেব তা বুঝতে পেরে বিস্মিত হয়েছিলেন (ভাগবত ১০/১৩/৩৭)।

শ্লোক ১৪১

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোক-পালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব? ॥ ১৪১ ॥

যস্য—যাঁর; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **রজঃ**—ধূলিকণা; **অখিল-লোক**—সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের; **পালৈঃ**—পালনকর্তাদের দ্বারা; **মৌলি-উত্তমৈঃ**—অত্যন্ত মূল্যবান মুকুট শোভিত

তাঁদের মস্তকে; ধৃতম্—ধারণ করেন; উপাসিত—উপাসিত; তীর্থ-তীর্থম্—তীর্থসমূহের তীর্থস্বরূপ; ব্রহ্মা—ব্রহ্মা; ভবঃ—শিব; অহম্ অপি—আমিও; যস্য—যাঁর; কলাঃ—অংশ; কলায়াঃ—কলার; শ্রীঃ—লক্ষ্মীদেবী; চ—এবং; উদ্বহেম—আমরা বহন করি; চিরম্—চিরকাল; অস্য—তাঁর; নৃপ-আসনম্—রাজসিংহাসন; ক্ব—কোথায়।

অনুবাদ

"সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তারা সমস্ত তীর্থের তীর্থস্বরূপ যাঁর পদরজ তাঁদের মুকুট শোভিত মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী—আমরা কেউ অংশ, কেউ অংশের অংশরূপে যাঁর পদরজ চিরকাল মস্তকে ধারণ করি, তাঁর কাছে সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য?"

তাৎপর্য

কৌরবেরা শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে বলদেবকে তাঁদের পক্ষভূত করার চেষ্টা করলে, বলদেব তখন রুষ্ট হয়ে তাঁদের এই কথা বলেছিলেন (ভাগবত ১০/৬৮/৩৭)।

শ্লোক ১৪২

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই তাঁর সেবক। তিনি যেভাবে নির্দেশ দেন, তাঁরা সেভাবেই নৃত্য করেন।

শ্লোক ১৪৩

এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একমাত্র নিয়ন্তা। অন্য সকলে তাঁর পার্ষদ অথবা ভৃত্য।

শ্লোক ১৪৪-১৪৫

গুরুবর্গ,—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য।
শ্রীবাসাদি, আর যত—লঘু, সম, আর্য ॥ ১৪৪ ॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ-কার্য সাধে গৌর-রায় ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর এবং অন্যান্য সমস্ত ভক্তবৃন্দ, তাঁর কনিষ্ঠ, সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে বড় যাঁরা তাঁর লীলায় সহায়তা করছেন,তাঁরা সকলেই তাঁর পার্ষদ। তাঁদের নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধন করেন।

শ্লোক ১৪৬

অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ,—দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন ভগবানের দুটি অঙ্গ এবং তাঁর প্রধান পার্ষদ। তাঁদের দুজনকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্নভাবে তাঁর লীলাবিলাস করেন।

শ্লোক ১৪৭

অদ্বৈত-আচার্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু গুরু করি' মানে, তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে গুরুরূপে সম্মান করতেন, তবুও অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন তাঁর ভৃত্য।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে পিতার মতো সম্মান করতেন, কারণ অদ্বৈত আচার্য প্রভু ছিলেন তাঁর পিতার থেকেও বয়সে বড়; তবুও অদ্বৈত আচার্য প্রভু সব সময় নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে অভিমান করতেন। অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী, দুজনেই ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুরও গুরু। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর খুল্লতাতরূপে অদ্বৈত প্রভু সর্বদাই পূজনীয় ছিলেন, কারণ গুরুদেবের গুরুভ্রাতাদের গুরুদেবের মতোই সম্মান করা উচিত। এই সমস্ত কারণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে গুরুর মতো সম্মান করতেন, কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু সর্বদাই নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নগণ্য দাসরূপে মনে করতেন।

শ্লোক ১৪৮

আচার্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর তত্ত্ব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করিয়ে সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেছেন।

শ্লোক ১৪৯

নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্বে হইয়া লক্ষ্মণ ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ পূর্বে লক্ষ্মণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীদের মতো ব্রহ্মচারীদেরও বিভিন্ন নাম রয়েছে। প্রত্যেক সন্ন্যাসীরই ব্রহ্মচারী সহকারী থাকে। সেই ব্রহ্মচারীদের চার রকমের নাম রয়েছে—স্বরূপ, আনন্দ, প্রকাশ ও চৈতন্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ না করে ব্রহ্মচারী-রূপে ছিলেন। ব্রহ্মচারীরূপে তাঁর নাম ছিল নিত্যানন্দ স্বরূপ। সেই সূত্রে বোঝা যায় যে, তিনি নিশ্চয়ই *তীর্থ* অথবা *আশ্রম* উপাধিযুক্ত সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, কেন না স্বরূপ হচ্ছে এই ধরনের সন্ন্যাসীদের সেবক ব্রহ্মচারীর উপাধি।

শ্লোক ১৫০

রামের চরিত্র সব,—দুঃখের কারণ ।
স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপ ছিল দুঃখময়, কিন্তু লক্ষ্মণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই দুঃখ সহ্য করেছিলেন।

শ্লোক ১৫১

নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই ।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই' ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

ছোট ভাই বলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর সংকল্প থেকে নিষেধ করতে পারেননি, তাই মনে দুঃখ পেলেও তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি।

শ্লোক ১৫২

কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করলেন, তখন তিনি (বলরাম) তাঁর বড় ভাইরূপে তাঁকে নানা রকম সুখ আস্বাদন করাবার জন্য প্রাণভরে তাঁর সেবা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৩

রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণ হচ্ছেন যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের অংশ-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের অবতারে তাঁরা দুজন তাঁদের দেহে প্রবিষ্ট হন।

তাৎপর্য

লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে *বিষ্ণুধর্মোত্তরের* উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীরামচন্দ্র বাসুদেবের অবতার, লক্ষ্মণ সঙ্কর্ষণের অবতার, ভরত প্রদ্যুম্নের অবতার এবং শত্রুঘ্ন অনিরুদ্ধের অবতার। *পদ্ম পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, রামচন্দ্র হচ্ছেন নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শঙ্খ। *স্কন্দ পুরাণের রামগীতায়* লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে শ্রীরামচন্দ্রের তিনজন পরিচারক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫৪

সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান ।
অংশাংশি-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণ ও বলরাম কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর প্রকাশ।

শ্লোক ১৫৫

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৫৫ ॥

রাম-আদি—শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অবতার; **মূর্তিষু**—বিভিন্ন রূপে; **কলা-নিয়মেন**—অংশের অংশের ভাব আদির দ্বারা; **তিষ্ঠন্**—বিরাজিত হয়ে; **নানা**—বিভিন্ন; **অবতারম্**—অবতার; **অকরোৎ**—প্রকাশ করেছিলেন; **ভুবনেষু**—এই জগতের বিভিন্ন লোকে; **কিন্তু**—কিন্তু; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **সমভবৎ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পরমঃ**—পরম;

পুমান্—পুরুষ; যঃ—যিনি; গোবিন্দম্—ভগবান গোবিন্দকে; আদি-পুরুষম্—আদিপুরুষকে; তম্—তাঁকে; অহম্—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

অনুবাদ

"কলাবিভাগে রামাদি মূর্তিতে ভগবান জগতে নানা অবতার প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মসংহিতা* (৫/৩৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৫৬

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম ।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন শ্রীবলরাম। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

শ্লোক ১৫৭

নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার ।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমারূপ সমুদ্র অনন্ত ও অপার। তাঁর কৃপাতেই কেবল আমি তাঁর একবিন্দু স্পর্শ করতে পারি।

শ্লোক ১৫৮

আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা ।
অধম জীবেরে চড়াইল ঊর্ধ্বসীমা ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কৃপার আর একটি মহিমা দয়া করে শ্রবণ করুন। তিনি অধম জীবকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করলেন।

শ্লোক ১৫৯

বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে ।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত কথা প্রকাশ করা উচিত নয়, কেন না এগুলি হচ্ছে বেদের গুহ্যতম তত্ত্ব। তবুও তিনি যে জীবকে কিভাবে কৃপা করে গিয়েছেন, সেই কথা প্রকাশ করার জন্য আমাকে এই সমস্ত কথা বলতে হচ্ছে।

শ্লোক ১৬০

উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

হে নিত্যানন্দ প্রভু, গভীর আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি তোমার কৃপার কথা লিখছি। দয়া করে আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

শ্লোক ১৬১

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম ।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমীনকেতন রামদাস নামক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একজন সেবক ছিলেন, যিনি ছিলেন ভগবৎ-প্রেমের আধারস্বরূপ।

শ্লোক ১৬২

আমার আলয়ে অহোরাত্র-সংকীর্তন ।
তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

আমার গৃহে দিবা-রাত্রি সংকীর্তন হচ্ছিল এবং তাই নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেখানে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৬৩

মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে ।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রেমে মগ্ন হয়ে তিনি আমার অঙ্গনে এসে বসলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণব তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন।

শ্লোক ১৬৪

নমস্কার করিতে, কা'র উপরেতে চড়ে ।
প্রেমে কা'রে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে প্রণাম করতে গেলে ভগবৎ-প্রেমের আনন্দে তিনি কখনও কাঁধে চড়লেন, কাউকে আবার তাঁর বংশী দিয়ে আঘাত করলেন অথবা কাউকে চাপড় মারলেন।

শ্লোক ১৬৫

যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার ।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

মীনকেতন রামদাসের নয়ন দর্শনে দর্শকের চক্ষু দিয়ে আপনা থেকেই প্রেমাশ্রু নির্গত হতে থাকে, কেন না মীনকেতন রামদাসের নয়ন-যুগল দিয়ে প্রবল ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬৬

কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব ।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও তাঁর দেহের কোন অঙ্গে কদম্ব ফুলের মতো পুলক প্রকাশিত হচ্ছিল, কখনও তাঁর দেহের কোন অঙ্গ স্তম্ভিত হচ্ছিল এবং অন্য কোন অঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬৭

নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার ।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম নিয়ে হুঙ্কার করছিলেন, তখন তাঁর চারপাশের মানুষের হৃদয় বিস্ময়ে চমৎকৃত হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬৮

গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য ।
শ্রীমূর্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবা-কার্য ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

গুণার্ণব মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সেবা করছিলেন।

শ্লোক ১৬৯

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

মীনকেতন রামদাস যখন অঙ্গনে বসেছিলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ সেখানে এসে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। তা দেখে মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

শ্লোক ১৭০

'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম' ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"এখানে আমি দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূতকে দেখছি, যে বলরামকে দর্শন করে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি।"

শ্লোক ১৭১

এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ ।
কৃষ্ণকার্য করে বিপ্র—না করিল রোষ ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে তিনি প্রাণভরে নৃত্য ও কীর্তন করতে লাগলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হলেন না, কেন না তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

মীনকেতন রামদাস ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত। তিনি যখন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে আসেন, তখন গুণার্ণব মিশ্র নামক পূজারী গৃহে স্থাপিত শ্রীবিগ্রহের পূজা করছিলেন এবং তিনি শ্রদ্ধা সহকারে মীনকেতন রামদাসকে সম্ভাষণ করেননি। এই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল, যখন নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের সভায় রোমহর্ষণ সূত *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করছিলেন। সেই সময় বলদেব সেই সভায় উপস্থিত হন, কিন্তু ব্যাসাসনে উপবিষ্ট রোমহর্ষণ সূত তাঁর আসন থেকে উঠে বলদেবকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। গুণার্ণব মিশ্রের ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন না এবং তা মীনকেতন রামদাস মোটেই পছন্দ করেননি। সেই জন্য মীনকেতন রামদাসের এই ব্যবহার কখনই ভক্তদের কাছে দোষযুক্ত নয়।

শ্লোক ১৭২

উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হইল বাদ ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

উৎসব শেষে মীনকেতন রামদাস যখন সকলকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন, তখন আমার ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কিছু কথা কাটাকাটি হয়।

শ্লোক ১৭৩

চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আমার ভাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল না।

শ্লোক ১৭৪

ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হইল মনে ।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তা জেনে রামদাস অন্তরে ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই জন্য আমি আমার ভাইকে ভর্ৎসনা করেছিলাম।

শ্লোক ১৭৫

দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্বনাশ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

আমি তাকে বলেছিলাম, "সেই দুই ভাইয়ের তনু এক; তাঁদের প্রকাশ অভিন্ন। তুমি যদি নিত্যানন্দ প্রভুকে না মান, তা হলে তোমার সর্বনাশ হবে।

শ্লোক ১৭৬

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান ।
"অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি যদি তাঁদের এক জনকে বিশ্বাস কর কিন্তু অন্য জনকে সম্মান না কর, তা হলে তোমার সেই প্রমাণ অর্ধকুক্কুটি-ন্যায় এর মতো।

শ্লোক ১৭৭

কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড ।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এক জনকে মেনে অপর জনকে না মেনে ভণ্ড হওয়ার থেকে দুজনকেই না মেনে পাষণ্ড হওয়া শ্রেয়।"

শ্লোক ১৭৮

ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস ।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥ ১৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রুদ্ধ হয়ে রামদাস তাঁর বাঁশি ভেঙ্গে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং তখন আমার ভাইয়ের সর্বনাশ হল।

শ্লোক ১৭৯

এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব ।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবকের প্রভাব বর্ণনা করলাম। এখন আমি তাঁর দয়ার স্বভাব বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৮০

ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

আমার ভাইকে আমি ভর্ৎসনা করলাম, সেই গুণের প্রভাবে সেই রাত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নে আমাকে দর্শন দিলেন।

শ্লোক ১৮১

নৈহাটি নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম ।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

নৈহাটির কাছে ঝামটপুর নামক গ্রামে স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আমাকে দর্শন দিলেন।

তাৎপর্য

এখন ঝামটপুর গ্রামের কাছে রেল লাইন আছে। কেউ যদি সেখানে যেতে চান, তা হলে তিনি কাটোয়া লাইনে ট্রেনে করে সালার নামক স্টেশনে যেতে পারেন। সেই স্টেশন থেকে ঝামটপুর খুব একটা দূরে নয়।

শ্লোক ১৮২

দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে ।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে আমি তাঁর পায়ে পড়লাম এবং তখন তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আমার মাথার উপর রাখলেন।

শ্লোক ১৮৩

'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার ।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি আমাকে বারবার বলতে লাগলেন, "ওঠ! ওঠ!" উঠে তাঁর রূপ দর্শন করে আমি চমৎকৃত হলাম।

শ্লোক ১৮৪

শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর ।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অঙ্গকান্তি মসৃণ শ্যামবর্ণ এবং তাঁর শরীর মল্লবীরের মতো প্রকাণ্ড। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ কামদেব।

শ্লোক ১৮৫

সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-নয়ান ।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর হস্ত, পদ ও কমলসদৃশ নয়ন অত্যন্ত সুন্দর। তাঁর পরনে ছিল পট্টবস্ত্র, আর মাথায় ছিল পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ।

শ্লোক ১৮৬

সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা ।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কানে সোনার কুণ্ডল, হাতে সোনার অঙ্গদ ও বালা। তাঁর পায়ে রিনিঝিনি নূপুর বাজছিল, আর তাঁর গলায় ছিল ফুলের মালা।

শ্লোক ১৮৭

চন্দনলেপিত-অঙ্গ, তিলক সুঠাম ।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শ্রীঅঙ্গ চন্দনলিপ্ত ছিল, তাঁর কপালে সুন্দরভাবে আঁকা তিলক এবং তাঁর গতি মদমত্ত হস্তীর মন্থর গতির চেয়েও সুন্দর।

শ্লোক ১৮৮

কোটিচন্দ্র জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্ত তাম্বূল-চর্বণ ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

কোটি চন্দ্রের মাধুর্যকে ম্লান করছিল তাঁর শ্রীমুখের সৌন্দর্য এবং তাঁর দন্তপংক্তি তাম্বুল চর্বণ করার ফলে ডালিম ফলের বীজের মতো দেখাচ্ছিল।

শ্লোক ১৮৯

প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে-বামে দোলে ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমে মত্ত হওয়ার ফলে তাঁর অঙ্গ ডানে-বামে দুলছিল, আর গম্ভীর স্বরে তিনি 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' উচ্চারণ করছিলেন।

শ্লোক ১৯০

রাঙ্গা-যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ ।
চারিপাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর হাতে রাঙ্গা যষ্টি দুলছিল, তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক মত্ত সিংহ। তাঁর চরণ-কমলের চারপাশে উড়ছিল অসংখ্য ভ্রমর।

শ্লোক ১৯১

পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর সমস্ত পার্ষদদের পরনে ছিল গোপবেশ এবং তাঁরা সকলেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করছিলেন।

শ্লোক ১৯২

শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায় ।
সেবক যোগায় তাম্বুল, চামর ঢুলায় ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের কেউ শিঙ্গা ও বাঁশি বাজাচ্ছিলেন, কেউ নাচছিলেন এবং গান গাইছিলেন। কেউ তাঁকে তাম্বুল নিবেদন করছিলেন এবং কেউ চামর ব্যজন করছিলেন।

শ্লোক ১৯৩

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব ।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের ঐশ্বর্য দর্শন করেছিলাম। তাঁর অপূর্ব রূপ, গুণ ও লীলা সবই ছিল অলৌকিক।

শ্লোক ১৯৪

আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি ।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

আনন্দে বিহ্বল হয়ে আমি অন্য সব কিছু সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়েছিলাম, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মৃদু হেসে আমাকে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৯৫

আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয় ।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাঁহা সর্ব লভ্য হয় ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হে কৃষ্ণদাস! কোন ভয় করো না। বৃন্দাবনে যাও, সেখানে তোমার সব কিছু লাভ হবে।"

শ্লোক ১৯৬

এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া ।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা বলে তিনি হাত নাড়িয়ে আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তার পরে তাঁর পার্ষদসহ তিনি অন্তর্ধান হলেন।

শ্লোক ১৯৭

মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে ।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি, হঞাছে প্রভাতে ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন আমি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হলাম, আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হল এবং আমি চোখ মেলে দেখলাম, সকাল হয়েছে।

শ্লোক ১৯৮

কি দেখিনু কি শুনিনু, করিয়ে বিচার ।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন আমি মনে মনে বিচার করতে লাগলাম যে, আমি কি দেখলাম আর কি শুনলাম এবং তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রভু আমাকে বৃন্দাবন যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ১৯৯

সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ক্ষণে আমি বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম এবং প্রভুর কৃপায় আমি মহানন্দে বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলাম।

শ্লোক ২০০

জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম ।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ বলরামের জয় হোক! যাঁর কৃপায় আমি বৃন্দাবন ধামে আশ্রয় লাভ করলাম।

শ্লোক ২০১

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ২০১ ॥

শ্লোকার্থ

কৃপাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! যাঁর কৃপায় আমি শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেছি।

শ্লোক ২০২

যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কৃপায় আমি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর আশ্রয় লাভ করেছি।

তাৎপর্য

কেউ যদি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় দক্ষতা লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে নিরন্তর শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কৃপা আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবেই কেবল গোস্বামীদের চরণাশ্রয় লাভ করা যায়। এই দুটি শ্লোকে গ্রন্থকার সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২০৩

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃপায় আমি ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছি এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর কৃপায় আমি ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব অমৃত আস্বাদন করতে পেরেছি।

তাৎপর্য

ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামী বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে *বৃহদ্ভাগবতামৃত* অতি প্রসিদ্ধ। কেউ যদি ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

জানতে চান, তা হলে এই গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। সনাতন গোস্বামী *দশম-টিপ্পনী* নামক *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের বিশেষ ভাষ্য রচনা করেছেন। গ্রন্থটি এত অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত যে, তা পাঠ করে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলার মাহাত্ম্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *হরিভক্তি-বিলাস*। এই গ্রন্থটিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের অনুসরণীয় বিধি-নিষেধগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি বিশেষ করে বৈষ্ণব গৃহস্থদের জন্য রচিত হয়েছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী *বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি* নামক প্রার্থনায় ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেছেন—

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্ মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

"বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির অমৃত আমি পান করতে চাইছিলাম না, কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আমাকে তা পান করিয়েছেন, যদিও আমার পক্ষে তা পান করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি হচ্ছেন কৃপার পারাবার। আমার মতো অধঃপতিত জীবের প্রতি তিনি অত্যন্ত কৃপাময়, তাই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করি।" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* শেষ অংশে শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি সেই পরম পূজনীয় গুরুত্রয় এবং সেই সঙ্গে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি-বিজ্ঞানের আচার্যরূপে স্বীকার করেছিলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে বলা হয় ভক্তিরসাচার্য অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিরূপ রসের আচার্য। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান এবং এই গ্রন্থটি পাঠ করে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে *উজ্জ্বল-নীলমণি*। এই গ্রন্থটিতে তিনি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাসের তত্ত্ব সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ২০৪

জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণারবিন্দের জয় হোক, যাঁর কৃপায় আমি শ্রীরাধা-গোবিন্দকে পেয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁর *প্রার্থনা* কবিতায় আকুলভাবে প্রার্থনা করেছেন—

আর ক'বে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জড় বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ধাম বৃন্দাবন যথাযথভাবে দর্শন করা যায় না। তিনি আরও বলেছেন, ষড়্-গোস্বামীর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ না করলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আর একটি কবিতায় শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ করা যায় না।

শ্লোক ২০৫

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

আমি জগাই এবং মাধাই-এর থেকেও বড় পাপী এবং পুরীষের কীট থেকেও ঘৃণ্য।

শ্লোক ২০৬

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

যে আমার নাম শোনে তার পুণ্য ক্ষয় হয়। যে আমার নাম উচ্চারণ করে তাঁর পাপ হয়।

শ্লোক ২০৭

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে ।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই জগতে আমার মতো এমন একজন ঘৃণ্য ব্যক্তিকে নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া আর কে কৃপা করতে পারে?

শ্লোক ২০৮

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত এবং কৃপার অবতার, তাই তিনি ভাল ও মন্দের বিচার করেন না।

শ্লোক ২০৯

যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার ।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

যে-ই তাঁর সম্মুখে নিপতিত হয়, তাকেই তিনি উদ্ধার করেন। তাই, আমার মতো পাপী এবং দুরাচারীকেও তিনি উদ্ধার করেছেন।

শ্লোক ২১০

মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপ-চরণ ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও আমি অত্যন্ত পাপী এবং সব চাইতে পতিত, তবুও তিনি আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে এসেছেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করেছেন।

শ্লোক ২১১

শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন ।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেব দর্শনের গোপন কথাগুলি বলার যোগ্য আমি নই।

শ্লোক ২১২

বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল ।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল হচ্ছেন রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার।

শ্লোক ২১৩

শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস ।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীললিতা প্রমুখ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তিনি রাসনৃত্য বিলাস করেন। তিনি মন্মথের মন্মথরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ২১৪

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২১৪ ॥

তাসাম্—তাঁদের মধ্যে; আবিরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; শৌরিঃ—শ্রীকৃষ্ণ; স্ময়মান—হাসতে হাসতে; মুখ-অম্বুজঃ—মুখপদ্ম; পীত-অম্বর-ধরঃ—পীতবসনধারী; স্রগ্বী—ফুলের মালায় ভূষিত; সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ; মন্মথ—কামদেবের; মন্মথঃ—কামদেব।

অনুবাদ

"পীতবসন পরিহিত এবং ফুলের মালায় সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে গোপিকাদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। তখন তাঁকে ঠিক কামদেবেরও কামদেব বলে মনে হচ্ছিল।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩২/২) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২১৫

স্বমাধুর্যে লোকের মন করে আকর্ষণ ।
দুই পাশে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দুই পার্শ্বে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীললিতা দেবী তাঁর সেবা করেন এবং তিনি স্বীয় মাধুর্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করেন।

শ্লোক ২১৬

নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল ।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আমি শ্রীমদনমোহনকে দর্শন করলাম এবং শ্রীমদনমোহনকে আমার প্রভুরূপে পেলাম।

শ্লোক ২১৭

মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন ।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

আমার মতো অধমকে তিনি শ্রীগোবিন্দের দর্শন দান করলেন। সেই কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, আর তা ছাড়া তা ব্যক্ত করার মতো বিষয়ও নয়।

শ্লোক ২১৮-২১৯

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে ।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
মাধুর্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনের যোগপীঠে কল্পবৃক্ষের বনে রত্নমণ্ডপে এক রত্নসিংহাসনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ বসে আছেন এবং মাধুর্য প্রকাশ করে তিনি জগৎকে মোহিত করছেন।

শ্লোক ২২০

বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে ।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বাম পার্শ্বে রয়েছেন সখী পরিবৃতা শ্রীমতী রাধারাণী। তাঁদের সঙ্গে শ্রীগোবিন্দদেব নানা রঙ্গে রাস আদি লীলা উপভোগ করেন।

শ্লোক ২২১

যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন ।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মা তাঁর স্বীয় লোকে পদ্মাসনে উপবেশন করে নিরন্তর তাঁর ধ্যান করেন এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে তাঁর উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

পদ্মাসন ব্রহ্মা তাঁর নিজ লোকের অধিবাসীগণ সহ *অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র—ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা* দ্বারা শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করেন। যাঁরা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, তাঁরা এই *অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র* সম্বন্ধে অবগত আছেন। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা এবং ব্রহ্মলোকের নিম্নস্থ লোকের অধিবাসীরা এই মন্ত্র ধ্যান করার মাধ্যমে গোবিন্দের উপাসনা করেন। ধ্যান ও কীর্তনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু এই যুগে এই গ্রহের মানুষদের পক্ষে ধ্যান

করা সম্ভব নয়। তাই উচ্চস্বরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং *অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্র* জপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক নামক ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোকে বাস করেন। প্রত্যেক গ্রহলোকেরই একজন অধিষ্ঠাতৃদেবতা রয়েছেন। ব্রহ্মা যেমন সত্যলোকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তেমনই স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র এবং সূর্যলোকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হচ্ছেন বিবস্বান। প্রতিটি অধিষ্ঠাতৃদেব এবং সেখানকার অধিবাসীদের সকলকেই ধ্যানের মাধ্যমে অথবা কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীগোবিন্দের আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২২২

চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি-পুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

চৌদ্দভুবনে সকলেই তাঁর ধ্যান করেন এবং বৈকুণ্ঠের সমস্ত অধিবাসীরা তাঁর লীলা ও গুণগান করেন।

শ্লোক ২২৩

যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁর মাধুরীতে লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, সেই রূপের বর্ণনা শ্রীল রূপ গোস্বামী করেছেন—

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে *পদ্ম পুরাণের* বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব সুন্দর রূপ দর্শন করে লক্ষ্মীদেবী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কেন তপস্যা করছ?" তখন লক্ষ্মীদেবী উত্তর দেন, "আমি গোপীরূপে বৃন্দাবনে তোমার সঙ্গে বিহার করতে চাই।" সেই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন যে, তা অসম্ভব। লক্ষ্মীদেবী পুনরায় তাঁকে বলেন, "প্রভু! আমি স্বর্ণরেখার মতো তোমার বক্ষস্থলে বিরাজ করতে চাই।" ভগবান তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন এবং সেই থেকে লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর ভগবানের বক্ষস্থলে স্বর্ণরেখার মতো বিরাজ করছেন। লক্ষ্মীদেবীর তপশ্চর্যা ও ধ্যানের কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১০/১৬/৩৬) বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে কালীয়নাগের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করার সময় বলেছেন যে, লক্ষ্মীদেবী পরমাসুন্দরী হয়েও তোমার পদধূলির অভিলাষ করে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে ব্রতধারণ-পূর্বক বহুকাল তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ২২৪

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২২৪ ॥

স্মেরাম্—স্মিত হাস্যযুক্ত; **ভঙ্গী-ত্রয়-পরিচিতাম্**—ত্রিভঙ্গ অর্থাৎ গ্রীবা, কটি ও জানু—এই তিনটি স্থানে বঙ্কিম; **সাচি-বিস্তীর্ণ-দৃষ্টিম্**—প্রশস্ত তির্যক দৃষ্টি; **বংশী**—বাঁশিতে; **ন্যস্ত**—বিন্যস্ত; **অধর**—অধর; **কিশলয়াম্**—নবপল্লব; **উজ্জ্বলাম্**—অতি উজ্জ্বল; **চন্দ্রকেণ**—চন্দ্রের জ্যোৎস্নার দ্বারা; **গোবিন্দ-আখ্যাম্**—গোবিন্দ নামক; **হরি-তনুম্**—ভগবান শ্রীহরির চিন্ময় তনু; **ইতঃ**—এখানে; **কেশী-তীর্থ-উপকণ্ঠে**—কেশীঘাটের সন্নিকটে; **মা**—না; **প্রেক্ষিষ্ঠাঃ**—অবলোকন করো; **তব**—তোমার; **যদি**—যদি; **সখে**—হে সখা; **বন্ধু-সঙ্গে**—জড় জগতের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে; **অস্তি**—থাকে; **রঙ্গঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

"হে সখে! যদি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ করার প্রতি তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের কাছে স্মিত হাস্যযুক্ত, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম, বাম অঞ্চলে নেত্রকটাক্ষ-বিশিষ্ট, নব-বিকশিত পল্লবসদৃশ অধরে বিরাজিত বংশী এবং ময়ূর-পুচ্ছের দ্বারা অপূর্ব শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্তি দর্শন করো না।"

তাৎপর্য

ব্যবহারিক ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় এই শ্লোকটি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (১/২/২৩৯) থেকে উদ্ধৃত। সাধারণত জড় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ সমাজ, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সুখে মগ্ন থাকে। এই তথাকথিত ভালবাসা হচ্ছে কাম, প্রেম নয়। কিন্তু মানুষ প্রেম সম্বন্ধীয় এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট। মিথিলার মহান তত্ত্বদ্রষ্টা কবি বিদ্যাপতি বলেছেন, "*তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত-মিত-রমণী সমাজে।*" অর্থাৎ, জড় জগতে সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব ও রমণীর প্রেম উত্তপ্ত মরুভূমির বুকে একবিন্দু জলের মতো। মরুভূমির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সমুদ্রের প্রয়োজন, এক বিন্দু জলে কোন কাজ হয় না। তেমনই, আমাদের হৃদয় যেখানে আনন্দ-সমুদ্রের অন্বেষণ করছে, সেখানে একবিন্দু সুখের কি প্রয়োজন। মরুভূমির বুকে একবিন্দু জল দেখে কেউ বলতে পারে এটিও তো জল, কিন্তু সেই জলের পরিমাণ এত নগণ্য যে, তার কোন মূল্যই নেই। তেমনই, এই জড় জগতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও রমণীর প্রেমে কেউ সন্তুষ্ট হয় না। তাই কেউ যদি তাঁর হৃদয়ে যথার্থ আনন্দ উপলব্ধি করতে চান, তা হলে তাঁকে শ্রীগোবিন্দের চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এই শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও রমণীর প্রেমে সন্তুষ্ট থাকতে চান, তা হলে তাঁর শ্রীগোবিন্দের চরণাশ্রয় গ্রহণ করার কোন

প্রয়োজন নেই, কেন না কেউ যদি শ্রীগোবিন্দের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন, তা হলে অতি নগণ্য সেই তথাকথিত সুখ তিনি সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হবেন। যিনি সেই তথাকথিত সুখের দ্বারা তৃপ্ত নন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার তীরে কেশীঘাটে বিরাজমান, মাধুর্যপ্রেমে গোপিকাদের চিত্ত আকর্ষণকারী শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ২২৫

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। মূর্খেরাই কেবল তাঁকে প্রতিমা বলে মনে করে।

শ্লোক ২২৬

সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অপরাধে তার নিস্তার নেই। সে ঘোর নরকে পতিত হবে। সেই সম্বন্ধে আমি আর কি বলব?

তাৎপর্য

ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী বলেছেন যে, যাঁরা ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ তাঁরা ভগবানের স্বরূপের সঙ্গে মাটি, ধাতু, পাথর অথবা কাঠ থেকে তৈরি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ভেদবুদ্ধি করেন না। জড় জগতের একজন মানুষের সঙ্গে তাঁর ফটো, ছবি অথবা মূর্তির পার্থক্য থাকে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, কারণ ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। আমাদের কাছে কাঠ, পাথর ও ধাতুরূপে যা প্রতিভাত হচ্ছে, তা সবই ভগবানের শক্তি এবং শক্তিমান থেকে শক্তি ভিন্ন নয়। পূর্বে কয়েকবার আমরা বিশ্লেষণ করেছি, সূর্যকিরণ শক্তিকে শক্তিমান সূর্য থেকে আলাদা করা যায় না। অতএব জড়া প্রকৃতিকে ভগবানের থেকে ভিন্ন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু চিন্ময়ভাবে তা ভগবান থেকে অভিন্ন।

ভগবান সর্বত্রই প্রকাশিত হতে পারেন, কেন না সূর্যকিরণের মতো তাঁর বিভিন্ন শক্তি সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, যা কিছু আমরা দেখছি তা সবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি এবং তাই ভগবানের সঙ্গে মাটি, ধাতু, কাঠ অথবা পাথরের তৈরি তাঁর অর্চাবিগ্রহের কোন পার্থক্য নিরূপণ করা উচিত নয়। এমন কি কারও চেতনা যদি ততটা বিকশিত না হয়ে থাকে, তা হলেও সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে

এই সত্যকে মেনে নেওয়া উচিত এবং মন্দিরে ভগবানের অর্চাবিগ্রহকে ভগবান থেকে অভিন্ন জ্ঞানে অর্চনা করা উচিত।

পদ্ম পুরাণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে মাটি, কাঠ, পাথর অথবা ধাতু বলে মনে করে, তা হলে সে অবশ্যই একটি নারকী। মায়াবাদীরা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার বিরোধী। ভারতবর্ষে একটি গোষ্ঠী আছে যারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের আরাধনার নিন্দা করে। আপাতদৃষ্টিতে তারা যে *বেদ* মানছে, সেটি প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন, কেন না ভারতের সমস্ত আচার্য, এমন কি নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্য পর্যন্ত ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্যের মতো নির্বিশেষবাদীরা *পঞ্চোপাসনা* নামক পাঁচটি বিভিন্ন রূপের আরাধনা অনুমোদন করেছেন। তার মধ্যে বিষ্ণুরূপও রয়েছে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন রূপেরই কেবল আরাধনা করেন, যেমন রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রাম, রুক্মিণী-কৃষ্ণ প্রভৃতি। মায়াবাদীরা স্বীকার করে যে, প্রথমে ভগবানের রূপের আরাধনা করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তারা মনে করে, চরমে সব কিছুই নিরাকার নির্বিশেষ। সুতরাং, যেহেতু তারা চরমে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার বিরোধী, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের অপরাধী বলে বর্ণনা করেছেন।

যে সমস্ত মানুষ *ভৌম ইজ্যধীঃ* ভাবযুক্ত হয়ে দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাদের নিন্দা করা হয়েছে। *ভৌম* মানে মাটি, আর *ইজ্যধীঃ* মানে উপাসক। দুই রকমের *ভৌম ইজ্যধীঃ* রয়েছে—যারা তাদের জন্মভূমিকে আরাধ্য বলে মনে করে, যেমন জাতীয়তাবাদীরা, তারা তাদের মাতৃভূমির জন্য অনেক কিছু উৎসর্গ করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর *ভৌম ইজ্যধীঃ* হচ্ছে তারা, যারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনার নিন্দা করে। এই পৃথিবী অথবা জন্মস্থানের পূজা করা উচিত নয় এবং আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য ভগবান যে নিজেকে মাটি, কাঠ, ধাতু আদিতে প্রকাশ করছেন, সেই রূপের নিন্দা করা উচিত নয়। জড় পদার্থও পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি।

শ্লোক ২২৭

হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

যাঁর কৃপায় আমি এই শ্রীগোবিন্দদেবের আশ্রয় লাভ করেছি, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণ-কমলের কৃপা কে বর্ণনা করতে পারে?

শ্লোক ২২৮

বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে যত বৈষ্ণবমণ্ডলী বাস করেন, তাঁরা সর্বদাই পরম মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণে মগ্ন।

শ্লোক ২২৯

যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য ।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের প্রাণধন হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভক্তি ব্যতীত তাঁরা অন্য কিছু জানেন না।

শ্লোক ২৩০

সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া ।
অধমেরে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ-দয়া ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় এই অধম সেই সকল বৈষ্ণবদের পদরেণু ও পদছায়া লাভ করেছে।

শ্লোক ২৩১

'তাঁহা সর্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন ।
সেই সূত্র—এই তার কৈল বিবরণ ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলেছেন, "বৃন্দাবনে সব কিছু লাভ হয়।" এখানে আমি সূত্রের আকারে তাঁর সেই উক্তির বিশদ বিশ্লেষণ করলাম।

শ্লোক ২৩২

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয় ।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে এসে আমি সেই সবই পেয়েছি এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনের সমস্ত অধিবাসীরা হচ্ছেন বৈষ্ণব। তাঁরা সর্ব মঙ্গলময়, কেন না কোন না কোনভাবে তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন। যদিও তাঁদের কেউ কেউ

কঠোর নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি পালন করেন না, তবুও তাঁরা কৃষ্ণভক্ত এবং প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করেন। তাঁরা যখন রাস্তা দিয়ে যান, তখন তাঁরা জয় রাধে অথবা হরে কৃষ্ণ বলে পরস্পরকে সম্ভাষণ করেন। এটি এক মহান সৌভাগ্যের পরিচায়ক। এভাবেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁরা সুকৃতি অর্জন করছেন।

বর্তমান বৃন্দাবন নগরী রচিত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা। ষড়্-গোস্বামীরা সেখানে গিয়ে বিভিন্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তার সূচনা করেছিলেন। বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের। তার মধ্যে সাতটি মন্দির অতি বিখ্যাত। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা ছাড়া আর কিছু জানেন না। ইদানীং জাতি-গোস্বামী নামক এক শ্রেণীর কপট পূজারী সেখানে দেব-দেবীদের পূজার সূচনা করেছে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবেরা তাতে অংশ গ্রহণ করেন না। যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে বৈষ্ণব ধারায় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে যুক্ত, তাঁরা এই ধরনের দেব-দেবীর পূজায় অংশ গ্রহণ করেন না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা কখনও শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না। তাঁরা বলেন যে, যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনু, তাই তিনি রাধা-কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। কিন্তু কিছু বিভ্রান্ত মানুষ নিজেদের খুব উন্নত মার্গের বৈষ্ণব বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে বলে, তারা রাধা-কৃষ্ণ নামের পরিবর্তে গৌরাঙ্গের নামকীর্তনে আসক্ত। এভাবেই তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে। তাদের উর্বর মস্তিষ্ক নদীয়া-নাগরী নামক এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে এবং তারা রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা না করে গৌর বা শ্রীচৈতন্যের আরাধনা করে। তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, রাধা-কৃষ্ণ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন আর রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তথাকথিত এই সমস্ত ভক্তদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধ্যে এই ভেদ দর্শন শুদ্ধ ভক্তির মার্গে এক উৎপাত-স্বরূপ। যারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তারা মায়ার হাতের ক্রীড়নক।

অন্য অনেক সম্প্রদায় আছে, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর পূজার বিরোধিতা করে। কিন্তু যে সমস্ত সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যের পূজা করে কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের পূজা করে না, অথবা রাধা-কৃষ্ণের পূজা করে কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করে না, তারা উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে এবং তাই তারা প্রাকৃত-সহজিয়া।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের দ্বিশত পঞ্চবিংশতি ও দ্বিশত ষড়বিংশতি শ্লোকে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে যারা নিজেদের মনগড়া মত সৃষ্টি করবে, তারা ধীরে ধীরে রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা ত্যাগ করবে

এবং যদিও তারা নিজেদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভৃত্য বলে পরিচয় দেবে, তবুও তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা ত্যাগ করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে অধঃপতিত হবে। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত উপাসক, তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনা।

শ্লোক ২৩৩

আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি নির্লজ্জের মতো নিজের কথা লিখছি। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুণাবলী আমাকে উন্মত্ত করিয়ে জোর করে এই সব লেখাচ্ছে।

শ্লোক ২৩৪

নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার ।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুণের মহিমা অপার। এমন কি সহস্র বদনে কীর্তন করেও শেষ তাঁর অন্ত পান না।

শ্লোক ২৩৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর স্বরূপ ও মহিমা দুটি ভিন্ন শ্লোকে নিরূপিত হয়েছে। মায়ার দুটি বৃত্তি—নিমিত্ত ও উপাদান। প্রকৃতিতে নিমিত্ত কারণরূপ পুরুষ-অবতারের নাম মহাবিষ্ণু। উপাদানরূপ প্রধানতত্ত্বে মহাবিষ্ণুর দ্বিতীয় স্বরূপই অদ্বৈত। সমস্ত জড় সৃষ্টির অধ্যক্ষ সেই অদ্বৈত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করার জন্য অদ্বৈত আচার্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যখন নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে পরিচয় দেন, তাতে তাঁর মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পায়, কেন না এই দাস্যভাব ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসের মাধুর্য আস্বাদন করা যায় না।

শ্লোক ১

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্ ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; তম্—তাঁকে; শ্রীমৎ—সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ; অদ্বৈত-আচার্যম্—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে; অদ্ভুত-চেষ্টিতম্—যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত; যস্য—যাঁর; প্রসাদাৎ—কৃপার প্রভাবে; অজ্ঞঃ অপি—একজন মূর্খ লোকও; তৎ-স্বরূপম্—তাঁর স্বরূপ; নিরূপয়েৎ—নিরূপণ করতে পারে।

অনুবাদ

আমি সেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে বন্দনা করি, যাঁর কার্যকলাপ অদ্ভুত। তাঁর কৃপার প্রভাবে একজন মূর্খ লোকও তাঁর স্বরূপ নিরূপণ করতে পারে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়।

শ্লোক ৩

পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্যের মহত্ত্ব ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

পাঁচটি শ্লোকে আমি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বর্ণনা করেছি। এখন দুটি শ্লোকে আমি শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের মহত্ত্ব বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

মহা-বিষ্ণুঃ—নিমিত্ত কারণের আশ্রয় মহাবিষ্ণু; জগৎ-কর্তা—জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা; মায়য়া—মায়ার দ্বারা; যঃ—যিনি; সৃজতি—সৃষ্টি করেন; অদঃ—এই ব্রহ্মাণ্ডকে; তস্য—তাঁর; অবতারঃ—অবতার; এব—অবশ্যই; অয়ম্—এই; অদ্বৈত-আচার্যঃ—অদ্বৈত আচার্য; ঈশ্বরঃ—উপাদান কারণের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

মহাবিষ্ণু হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মায়ার দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন তাঁরই অবতার।

শ্লোক ৫

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

অদ্বৈতম্—অদ্বৈত নামক; হরিণা—ভগবান শ্রীহরিসহ; অদ্বৈতাৎ—অভিন্নত্ব হেতু; আচার্যম্—আচার্য নামক; ভক্তি-শংসনাৎ—কৃষ্ণভক্তি প্রচার হেতু; ভক্ত-অবতারম্—ভক্তরূপে অবতার; ঈশম্—পরমেশ্বর ভগবানকে; তম্—তাঁকে; অদ্বৈত-আচার্যম্—অদ্বৈত আচার্যকে; আশ্রয়ে—আমি প্রপত্তি করি।

অনুবাদ

যেহেতু তিনি শ্রীহরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব, তাই তাঁর নাম অদ্বৈত এবং ভক্তিশিক্ষক বলে তাঁকে আচার্য বলা হয়, সেই ভক্তাবতার অদ্বৈত আচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

শ্লোক ৬

অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অদ্বৈত আচার্য বাস্তবিকই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁর মহিমা সাধারণ জীবের ধারণার অতীত।

শ্লোক ৭

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য ।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

বিশ্ব সৃষ্টির সমগ্র কার্য মহাবিষ্ণু সম্পাদন করেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য তাঁর সাক্ষাৎ অবতার।

শ্লোক ৮

যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায় ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

যে পুরুষ তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা সৃষ্টিকার্য ও পালনকার্য সম্পাদন করেন, তিনি তাঁর লীলাবিলাস ছলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ৯

ইচ্ছায় অনন্ত মূর্তি করেন প্রকাশ ।
এক এক মূর্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর ইচ্ছায় তিনি অনন্ত মূর্তি প্রকাশ করেন এবং সেই এক একটি মূর্তিতে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন।

শ্লোক ১০

সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ ।
শরীর-বিশেষ তাঁর,—নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন সেই পুরুষের অংশ এবং তাই তিনি তাঁর থেকে অভিন্ন। বাস্তবিকই, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ভিন্ন নন, তিনি সেই পুরুষের অন্য একটি রূপ।

শ্লোক ১১

সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান' ।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্মাণ ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

পুরুষ, যিনি প্রধান ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, আর শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর সেই কার্যে সহায়তা করেন।

শ্লোক ১২

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম ।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকারী, কেন না তিনি হচ্ছেন সমস্ত মঙ্গলের গুণধাম। তাঁর চরিত্র, কার্যকলাপ ও নাম সবই মঙ্গলময়।

তাৎপর্য

মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন আচার্য বা শিক্ষক। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ এবং শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত কার্যকলাপ মঙ্গলময়। কেউ যখন শ্রীবিষ্ণুর কার্যকলাপে সমস্ত মঙ্গল দর্শন করেন, তখন তিনিও মঙ্গলময় হয়ে ওঠেন। যেহেতু শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত মঙ্গলের গুণধাম, তাই কেউ যখন বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হন, তখন তিনি সমগ্র মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা সাধন করেন। যে সমস্ত মানুষ জগতের জঞ্জালস্বরূপ, তারাই এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝতে না পেরে ভক্তিমার্গ থেকে বিচ্যুত হয়।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিক্ষায় সকাম কর্ম, নির্বিশেষ মুক্তি লাভ আদি কোন অমঙ্গলের কথা স্থান পায়নি। জড়া প্রকৃতির মোহে আচ্ছন্ন অসুর-স্বভাব জীবেরা তাঁকে অদ্বয় বিষ্ণুতত্ত্ব বলে বুঝতে না পেরে, কেবলাদ্বৈতবাদী জ্ঞানে যে তাঁর অনুগমনের ছলনা করেছিল এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু যে সেই অভক্তদের দণ্ড বিধান করেছিলেন, তাও মঙ্গলময়। শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর কার্যকলাপ প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে জীবের মঙ্গলই সাধন করে। পক্ষান্তরে, শ্রীবিষ্ণুর কৃপা লাভ করা বা তাঁর কাছে দণ্ডভোগ করা অভিন্ন, কেন না শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত কার্যকলাপই পরম পূর্ণ। কারও কারও মতে অদ্বৈত প্রভুর আর একটি নাম মঙ্গল। তিনি নৈমিত্তিক অবতার রূপে প্রকৃতিতে উপাদান শক্তির সঞ্চার করেন। তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নন, বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত গুণের আশ্রয় নন। তাঁর চরিত্রের অনুসরণে জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁর নাম শ্রবণ ও কীর্তন করলে জীবের সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু বিগ্রহে কখনও জড় কলুষ বা নির্বিশেষবাদ আরোপ করা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য শ্রীবিষ্ণুর প্রকৃত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করা, কেন না সেই উপলব্ধির ফলে জীবের পরম শ্রেয় লাভ হয়।

শ্লোক ১৩

কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার ।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

কোটি কোটি অংশ, কোটি কোটি শক্তি, কোটি কোটি অবতার নিয়ে মহাবিষ্ণু সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১৪-১৫

মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', 'উপাদান' ।
মায়া—'নিমিত্ত'-হেতু, উপাদান—'প্রধান' ॥ ১৪ ॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্তি হইয়া ।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত' 'উপাদান' লঞা ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতিতে যেমন নিমিত্ত ও উপাদান—দুটি ভাগ রয়েছে এবং মায়া নিমিত্ত কারণ এবং প্রধান উপাদান কারণ, তেমনই মহাবিষ্ণু রূপে নিমিত্ত এবং অদ্বৈতরূপে উপাদান—এই দুই মূর্তি ধারণ করে পুরুষ বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে দুই রকমের মতবাদ রয়েছে। একটি মত হচ্ছে যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবান থেকে এই জড় জগৎ গৌণভাবে সৃষ্ট এবং মুখ্যভাবে চিৎ-জগতের প্রকাশ, যা হচ্ছে অনন্ত বৈকুণ্ঠলোক এবং তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবন। পক্ষান্তরে, ভগবানের সৃষ্টির দুটি প্রকাশ—জড় জগৎ ও চিৎ-জগৎ। জড় জগতে যেমন অসংখ্য গ্রহ- নক্ষত্র ও ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, চিৎ-জগতেও তেমন গোলোক, বৈকুণ্ঠ আদি অসংখ্য চিন্ময় লোক রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান জড় জগৎ ও চিৎ-জগৎ উভয়েরই কারণ। অপর মতবাদটি হচ্ছে যে, এক অব্যক্ত অপ্রকাশ শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদটি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

প্রথম মতটি বেদান্ত দার্শনিকেরা স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় মতটি বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী *সাংখ্য স্মৃতি* নামক নাস্তিক মতবাদ। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কোন রকম চিন্ময় বস্তুকে সৃষ্টির কারণরূপে দর্শন করতে পারেন না। এই ধরনের নাস্তিক সাংখ্য দার্শনিকেরা মনে করেন যে, অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে জীবনীশক্তি ও চেতনার লক্ষণ দেখা যায়, তা প্রকৃতির তিনটি গুণ থেকে উৎপন্ন। এভাবেই সাংখ্য মতাবলম্বীরা সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী।

বাস্তবিকপক্ষে, পরম পূর্ণ আত্মাই সমস্ত সৃষ্টির কারণ এবং তিনি শক্তি ও শক্তিমান উভয়রূপে সর্বদাই পূর্ণ। সমস্ত শক্তি যাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেই পরম পুরুষের শক্তি থেকেই জড় জগতের সৃষ্টি। যে সমস্ত দার্শনিক বিশ্ব সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার দ্বারা এক-একটি মতবাদ সৃষ্টি করেন, তাঁরা কেবল জড় শক্তির চমৎকারিত্বই উপলব্ধি করেন। এই ধরনের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, ভগবানও জড় শক্তিসম্ভূত। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিমানও শক্তিজাত। এই ধরনের দার্শনিকেরা ভ্রান্তিবশত মনে করেন যে, এই জগতের সমস্ত জীব জড় শক্তি থেকে উদ্ভূত। অতএব পরম চৈতন্যময় পুরুষও নিশ্চয়ই জড় শক্তিসম্ভূত।

জড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা যেহেতু তাঁদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত, তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেন যে, জীবনীশক্তিও নিশ্চয়ই জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বটি তার ঠিক বিপরীত। জড় পদার্থ চেতন-শক্তি থেকে উদ্ভূত। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, পরম আত্মা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত শক্তির উৎস। কেউ যখন দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে গবেষণা করেন, তখন তিনি প্রকৃতির বৈচিত্র্য দর্শন করে বিস্ময়ান্বিত হন এবং স্বাভাবিক ভাবেই স্বপ্নাবিষ্টের মতো আরোহ পন্থায় গবেষণা করতে তৎপর হন। সেই পন্থার ঠিক বিপরীত হচ্ছে অবরোহ পন্থা। এই অবরোহ পন্থায় পরম পুরুষ ভগবানকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জানা যায়; তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বর্তমান এবং তিনি নিরাকার নন, শূন্যও নন। তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশ তাঁরই একটি শক্তির প্রকাশ। অতএব জড় পদার্থ থেকে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলে যে মতবাদ, তা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের দৃষ্টিপাত হচ্ছে জড় সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতি সর্ব শক্তিমান থেকে প্রাপ্ত শক্তি লাভ করে জীবের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ-কালের অন্তর্গত জগৎ নির্মাণ করেন। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জড় শক্তির প্রকাশের দ্বারাই জড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আদি বদ্ধ জীবদের কাছে উপলব্ধ হন। শক্তির সঙ্গে শক্তিমানের সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার ফলে, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ক্ষমতা এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে অবগত নন, তাঁর বিচারে সর্বদাই ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে এবং তাকে বলা হয় *বিবর্ত*। যতক্ষণ পর্যন্ত জড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত না হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁরা অবশ্যই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত জড় জগতে ইতস্তত বিচরণ করতে থাকবেন।

মহান বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর *গোবিন্দ-ভাষ্য* নামক *বেদান্ত-সূত্রের* ভাষ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে জড়বাদীদের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

"সাংখ্য দার্শনিক কপিল তাঁর নিজের মত অনুসারে বিভিন্ন তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর মতে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের সাম্য প্রকৃতি। প্রকৃতি মহৎ নামক জড় শক্তি সৃষ্টি করেছে এবং মহৎ থেকে অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে। অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র থেকে দশটি ইন্দ্রিয় (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়), মন ও পঞ্চ-মহাভূতের উদ্ভব হয়েছে। এই চব্বিশটি উপাদানের সঙ্গে *পুরুষ* বা ভোক্তা যোগ করে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। জড় জগতের গুণগুলি তিনটি স্তরে সক্রিয় হয়, যথা—সুখের কারণ, দুঃখের কারণ এবং মোহের কারণ। সত্ত্বগুণ জড় সুখের কারণ, রজোগুণ জড় দুঃখের কারণ এবং তমোগুণ মোহের কারণ। আমাদের জড় অভিজ্ঞতাগুলি এই সুখ, দুঃখ ও মোহের দ্বারা সীমিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যিনি কোন সুন্দরী রমণীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সেই সুন্দরী রমণীটি সুখের কারণ—এই স্থলে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। সেই রমণীটিই আবার কারও পক্ষে রজোগুণের প্রভাবে দুঃখের কারণ এবং তমোগুণের প্রভাবে মোহের কারণ।

"দুই প্রকার ইন্দ্রিয় হচ্ছে, দশটি বহিরিন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন। এভাবেই এগারোটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। নিরীশ্বর কপিলের মতে জড়া প্রকৃতি নিত্য এবং সর্ব শক্তিশালী। চেতন বলতে কিছু নেই এবং জড়ের কোন কারণ নেই। জড় পদার্থই সব কিছুর মূল কারণ। তা সর্বব্যাপ্ত এবং সর্ব কারণের কারণ। এই নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য-দর্শনের মতে মহৎ-তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতির বিকার এবং অহঙ্কারাদি প্রকৃতিও প্রধানের বিকার; এগারটি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ)—এই ষোলটি বিকার। *পুরুষ* পরিণামহীন বলে কারও প্রকৃতি বা বিকার নন। কিন্তু জড়া প্রকৃতি যদিও অচেতন, তবুও তা বহু চেতন জীবের ভোগের এবং মুক্তির কারণ। তার কার্যকলাপ ইন্দ্রিয়াতীত, কিন্তু তা সত্ত্বেও উন্নত বুদ্ধির দ্বারা তা অনুমান করা যায়। জড়া প্রকৃতি এক, কিন্তু তিনটি গুণের প্রভাবে পরিণাম-শক্তির দ্বারা মহৎ-তত্ত্ব আদি বিভিন্ন অত্যাশ্চর্য জগৎ প্রসব করেন। এই ধরনের বিকারের ফলে জড়া প্রকৃতি নিমিত্ত-রূপিণী ও উপাদান-রূপিণী। *পুরুষ* বা ভোক্তা নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, আবার সেই সঙ্গে প্রভু। তিনি ভিন্নরূপে প্রতি দেহে চিৎস্বরূপে বিরাজমান। জড় কারণটি উপলব্ধি করার মাধ্যমে *পুরুষকে* নিষ্ক্রিয় কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বশূন্য বলে অনুমান করা যায়। প্রকৃতি ও *পুরুষের* তত্ত্ব এভাবেই বর্ণনা করার পর সাংখ্য-দর্শন নির্ধারণ করেছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সমন্বয়ের ফলে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। এই সমন্বয়ের ফলে প্রকৃতিতে চেতনার প্রকাশ হয়। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে, *পুরুষের* মধ্যে কর্তৃত্ব করার এবং ভোগ করার শক্তি রয়েছে। জ্ঞানের অভাবে পুরুষ যখন মোহাচ্ছন্ন থাকে, তখন সে নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে। কিন্তু যখন সে জ্ঞান লাভ করে, তখন সে মুক্ত হয়। সাংখ্য-দর্শনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, *পুরুষ* সর্বদাই প্রকৃতির কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন।

"সাংখ্য দার্শনিক প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটি প্রমাণ মেনেছেন। এই প্রমাণ সিদ্ধ হলে সব কিছু সিদ্ধ হয়। উপমান আদি এদেরই অন্তর্গত। সেগুলি অতিরিক্ত প্রমাণ নয়। প্রত্যক্ষসিদ্ধ অথবা আগমসিদ্ধ অর্থসমূহে অধিক বিরোধিতা নেই। সাংখ্য-দর্শনে *পরিণামাৎ* (পরিণাম), *সমন্বয়াৎ* (সমন্বয়) ও *শক্তিতঃ* (শক্তির ক্রিয়া) আদি সূত্রসমূহের দ্বারা প্রধানের জগৎ কারণত্ব প্রমাণ করা হয়েছে।"

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্যে এই সমস্ত সাংখ্য সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করেছেন, কেন না জগৎ সৃষ্টির সমস্ত তথাকথিত কারণগুলি খণ্ডন করা হলে, সমগ্র সাংখ্য-দর্শন খণ্ডন করা যাবে। জড়বাদী দার্শনিকেরা প্রধানকে সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলে মনে করেন। তাঁদের কাছে প্রধানই হচ্ছে সব রকম সৃষ্টির কারণ। সাধারণত তাঁরা মাটি ও মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত দেন। মাটি হচ্ছে মৃৎপাত্রের কারণ, কিন্তু মাটিকে কার্য ও কারণ উভয়রূপেই দেখা যায়। মৃৎপাত্র হচ্ছে কার্য এবং মাটি হচ্ছে কারণ, কিন্তু মাটি সর্বত্রই দেখা যায়। গাছ জড়, কিন্তু গাছ ফল উৎপাদন করে। জল জড়, কিন্তু জল গতিশীল। এভাবেই সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন যে, জড় পদার্থ গতি ও সৃষ্টির কারণ।

অতএব প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই মতবাদ খণ্ডন করার জন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রধানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

"জড়া প্রকৃতি অচেতন এবং তাই তা জগতের উপাদান বা নিমিত্ত কারণ হতে পারে না। জড় জগতের বিচিত্র রচনা ও আয়োজন স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণ করে যে, সেই আয়োজনের পেছনে একজন চেতন পরিচালক রয়েছেন, কেন না চেতন পরিচালক ব্যতীত এই রকম সুসংবদ্ধ আয়োজন সম্ভবপর নয়। চেতনের পরিচালনা ব্যতীত এই রচনা হতে পারে বলে অনুমান করা সঙ্গত নয়। আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে, অচেতন ইটগুলি নিজে নিজেই একটি প্রাসাদ তৈরি করতে পারে না।

"মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্তকে স্বীকার করা যায় না, কেন না একটি মৃৎপাত্রের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি নেই। এই ধরনের অনুভূতিগুলি জড়াতীত চেতনাপ্রসূত। সুতরাং স্থূল দেহ, অথবা মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত এই সূত্রে যথাযথ নয়।

"জড় বৈজ্ঞানিকেরা কখনও কখনও বলে যে, মালীর সহায়তা ছাড়াই মাটি থেকে গাছ গজায়, কেন না সেটি হচ্ছে জড়ের স্বাভাবিক প্রবণতা। তারা এও বলে যে, জন্ম থেকে জীবের যে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান, তাও জড়। কিন্তু দেহচেতনা আদি স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানকে স্বতন্ত্র বলে স্বীকার করা যায় না, কেন না তা হলে দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, গাছ অথবা জীবদেহের কোন প্রবণতা বা স্বতঃপ্রজ্ঞা নেই; এই প্রবণতা ও স্বতঃপ্রজ্ঞার প্রকাশ হয় দেহে আত্মার উপস্থিতির ফলে। এই সম্পর্কে একটি গাড়ি ও গাড়ির চালকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। গাড়ি চলতে পারে এবং বামদিকে ডানদিকে মোড় ফিরতে পারে, কিন্তু তা বলে কেউ বলতে পারে না যে, জড় পদার্থ গাড়িটি চালকের পরিচালনা ব্যতীতই চলতে পারে অথবা ডানদিকে বামদিকে মোড় ফিরতে পারে। চালকের পরিচালনা ব্যতীত গাড়িটির স্বতন্ত্রভাবে চলার প্রবণতা বা স্বতঃপ্রজ্ঞা নেই। তেমনই, অরণ্যমধ্যে গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এই একই তত্ত্ব প্রযোজ্য। গাছের বৃদ্ধি হয় গাছটির মধ্যে আত্মার উপস্থিতির প্রভাবে।

"কিছু মূর্খলোক চালের স্তূপে বৃশ্চিকের জন্ম হতে দেখে মনে করে, চাল হচ্ছে বৃশ্চিকের উৎপত্তির কারণ। প্রকৃতপক্ষে, স্ত্রী বৃশ্চিক চালে ডিম পাড়ার ফলে, উপযুক্ত অবস্থায় যথাসময়ে ডিম থেকে নতুন বৃশ্চিকের জন্ম হয় এবং তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তার অর্থ এই নয় যে, চাল থেকে বৃশ্চিকের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনই, কখনও কখনও নোংরা বিছানা থেকে ছারপোকা বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বিছানাটি ছারপোকা জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন রকমের প্রাণী রয়েছে। তাদের কেউ জরায়ুজ, কেউ অণ্ডজ এবং কেউ স্বেদজ। বিভিন্ন জীবের আবির্ভাবের বিভিন্ন উৎস রয়েছে, কিন্তু তাই বলে জড় পদার্থকে জীবের উৎপত্তির কারণ বলে কখনই স্থির করা উচিত নয়।

"জড়বাদীরা যে মাটি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাছের জন্ম হওয়ার দৃষ্টান্ত দেয়, সেই যুক্তিও এই দৃষ্টান্তের দ্বারা খণ্ডন করা যায়। কোন বিশেষ অবস্থায় মাটি থেকে জীব

বেরিয়ে আসে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদের* বর্ণনা অনুসারে, দৈবের অধ্যক্ষতায় প্রতিটি জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিশেষ শরীর লাভ করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন রকমের শরীর রয়েছে এবং দৈবের অধ্যক্ষতায় জীব বিভিন্ন ধরনের শরীর গ্রহণ করে।

"কেউ যখন মনে করে, 'আমি এই কাজটি করছি', তখন 'আমি' বলতে দেহকে বুঝায় না। তা দেহের অতীত কোন কিছু বা দেহাভ্যন্তরীণ কোন কিছুকে বুঝায়। সেই হেতু, দেহের কোন প্রবণতা বা স্বতঃপ্রজ্ঞা নেই; প্রবণতা ও স্বতঃপ্রজ্ঞা হচ্ছে দেহাভ্যন্তরীণ আত্মা। জড় বৈজ্ঞানিকেরা কখনও কখনও বলেন, স্ত্রীশরীর ও পুরুষ-শরীরের স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে তাদের মিলন হয় এবং তার ফলে সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু *সাংখ্য-দর্শন* অনুসারে *পুরুষ* যেহেতু সর্বদাই অবিচলিত, তা হলে তার সন্তান প্রজননের প্রবণতা আসে কোথা থেকে?

"জড় বৈজ্ঞানিকেরা কখনও দুধের আপনা থেকেই দধিতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেন এবং মেঘ থেকে পতিত পরিস্রুত বৃষ্টির জলের মাটিতে পতিত হয়ে বিভিন্ন গাছপালা এবং বিবিধ ফুলে-ফলে বিভিন্ন গন্ধ ও রসের সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, জড় পদার্থ আপনা থেকেই বৈচিত্র্যময় জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টান্তটি খণ্ডন করে *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* উক্তিটির পুনরুল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, উৎকৃষ্ট শক্তির পরিচালনায় বিভিন্ন রকম জীবদের বিভিন্ন রকম শরীরে স্থাপন করা হয়েছে—পুনঃপুনঃ এভাবেই চলছে। দৈব নিয়ন্ত্রণাধীনে জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন অবস্থায় বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য আদি বিভিন্ন রকমের শরীর প্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা প্রকাশ করে। *ভগবদ্গীতাতেও* (১৩/২২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

'জড় জগতে জীব প্রকৃতির তিনটি গুণ ভোগ করতে করতে জীবনের পথে পরিচালিত হয়। জড়া প্রকৃতির সঙ্গ প্রভাবেই তা হয়। এভাবেই সে সঙ্গ প্রভাবে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।' আত্মা বিভিন্ন ধরনের শরীর প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আত্মা যদি বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষশরীর প্রাপ্ত না হত, তা হলে বিভিন্ন রকমের ফল ও ফুলের উৎপত্তি হত না। বিশেষ বিশেষ ধরনের গাছ বিশেষ বিশেষ ধরনের ফুল ও ফল উৎপাদন করে। এক শ্রেণীর গাছ অন্য শ্রেণীর ফুল ও ফল উৎপাদন করে না। মানুষ, পশু-পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীতে যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, গাছেদের মধ্যেও তেমন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। অসংখ্য জীব রয়েছে এবং জড় জগতে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে তাদের কার্যকলাপও বিভিন্ন এবং এভাবেই তারা বিভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করার সুযোগ পায়।

এর থেকে বোঝা উচিত যে, *প্রধান* জীবনীশক্তির দ্বারা পরিচালিত না হলে সক্রিয় হতে পারে না। তাই জড়বাদীদের মতবাদ, *প্রধান* স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করতে পারে, তা

স্বীকার করা যায় না। *প্রধানকে* বলা হয় প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীশক্তি। স্ত্রীলোক হচ্ছে প্রকৃতি। *পুরুষের* সঙ্গ ব্যতীত কোন স্ত্রীলোক সন্তান উৎপাদন করতে পারে না। *পুরুষের* প্রভাবেই সন্তানের জন্ম হয়, কেন না *পুরুষ* তার বীর্যে আশ্রিত আত্মাকে স্ত্রীর গর্ভে সঞ্চারিত করে। উপাদান কারণরূপে স্ত্রী আত্মাকে দেহ সরবরাহ করে এবং নিমিত্ত কারণরূপে সন্তানের জন্ম দেয়। স্ত্রীকে যদিও সন্তানের জন্মের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলে মনে হয়, তবুও *পুরুষ* হচ্ছে সন্তানের জন্মের কারণ। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে জড় জগতে বিভিন্ন রকমের প্রকাশ দেখা যায়। তিনি কেবল ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান নন, প্রতিটি প্রাণীতে, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান। *ব্রহ্মসংহিতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুতে এবং প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান। তাই জড় ও চেতন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সমন্বিত কোন মানুষ স্বীকার করবেন না যে, প্রধান হচ্ছে জড় জগৎ সৃষ্টির কারণ।

"জড়বাদীরা অনেক সময় যুক্তির অবতারণা করে যে, খড় যেমন গরু কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে আপনা থেকেই দুধে পরিণত হয়, প্রধানও তেমন মহদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হয়। তার উত্তরে বলা যায় যে, গরুর মতো একই শ্রেণীর পশু ষাঁড় যখন সেই খড় ভক্ষণ করে, তখন সেই খড় দুধে পরিণত হয় না। সুতরাং, বিশেষ কোন প্রজাতির সংস্পর্শে খড় আপনা থেকেই দুধে পরিণত হয়, তা বলা যায় না। অতএব *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান যে বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—'এই জড়া প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হয়ে স্থাবর ও জঙ্গম সব কিছু সৃষ্টি করছে'—এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হল। পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ* ('আমার অধ্যক্ষতায়')। তিনি যখন ইচ্ছা করেন যে, গাভী খড় ভক্ষণ করে দুধ উৎপাদন করবে, তখন দুধের উৎপাদন হয় এবং যখন তিনি সেই ইচ্ছা করেন না, তখন সেই খড় থেকে দুধ উৎপন্ন হয় না। যদি প্রকৃতির প্রভাবেই খড় থেকে দুধ উৎপন্ন হত, তা হলে একটি খড়ের গাদা থেকেও দুধ পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এমন কি সেই খড় যদি কোন মহিলাকেও খাওয়ানো হয়, তা হলেও দুধ উৎপাদন হয় না। সেই কথাই *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতাতেই কেবল সব কিছু সম্পাদিত হয়। প্রধানের স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু করবার ক্ষমতা নেই। তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, যেহেতু প্রধানের স্বতঃপ্রজ্ঞা নেই, তাই জড় জগৎ সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। পরম স্রষ্টা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

"প্রধান যদি সৃষ্টির মূল কারণ হত, তা হলে পৃথিবীর সব কয়টি প্রামাণিক শাস্ত্রই অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন হত, কেন না প্রতিটি শাস্ত্রে, বিশেষ করে *মনুস্মৃতির* মতো বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম-স্রষ্টা। মনুষ্যজাতির প্রতি সর্বোত্তম বৈদিক নির্দেশ হিসেবে *মনুস্মৃতিকেই* স্বীকার করা হয়। মনু হচ্ছেন মানব-সমাজের নীতির প্রবর্তক এবং *মনুস্মৃতিতে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বৈচিত্র্যহীন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং সেই অবস্থাটি ছিল স্বপ্নের মতো

অবলম্বনহীন। সব কিছুই ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরমেশ্বর ভগবান তখন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হন এবং যদিও তিনি অদৃশ্য, তবুও তিনি দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করেন। জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে প্রকাশিত হন না, কিন্তু জড় জগতের বৈচিত্র্য প্রমাণ করে যে, সব কিছুই তাঁর পরিচালনায় সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত সৃষ্টিশক্তি সহ তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হন এবং এভাবেই তিনি এই জগতের অন্ধকার দূর করেন।

"পরমেশ্বর ভগবানের রূপের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তা চিন্ময়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শাশ্বত, সর্বব্যাপ্ত, অচিন্ত্য এবং তাই বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত। তিনি নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার প্রভাবে তিনি প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে এক বিশাল জলধি সৃষ্টি করেন এবং সেই জলে জীবের সঞ্চার করেন। সেই গর্ভ সঞ্চারের প্রক্রিয়ায় সহস্র সূর্যের মতো বিশাল এক শরীরের উদ্ভব হয় এবং সেই শরীরে আসীন ছিলেন প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা। পরাশর ঋষিও *বিষ্ণু পুরাণে* এই তথ্য প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দৃশ্য জগৎ শ্রীবিষ্ণু থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাঁরই অধ্যক্ষতায় নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি হচ্ছেন বিশ্বরূপের পালনকর্তা ও সংহারকর্তা।

"জড় সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির একটি। মাকড়সা যেমন তার লালা দিয়ে জাল বোনে এবং অবশেষে সেই জাল তার দেহের মধ্যে আবার সংবরণ করে নেয়, তেমনই বিষ্ণু তাঁর চিন্ময় শরীর থেকে এই জড় জগৎ প্রকাশ করেছেন এবং অবশেষে তা নিজের মধ্যেই সংবরণ করে থাকেন। বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানকে আদি স্রষ্টা বলে স্বীকার করেছেন।

"কখনও কখনও দাবি করা হয় যে, বড় বড় দার্শনিকদের নির্বিশেষ জল্পনা-কল্পনাগুলি হচ্ছে, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত উন্নত জ্ঞান লাভের পন্থা। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলি উন্নত পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্যই। ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করার ফলে, সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে জানার চরম স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মনীতির বাধ্যবাধকতা রহিত জ্ঞানীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের চর্চা করতে করতে অবশেষে বাসুদেবকে সর্ব কারণের পরম কারণরূপে জানতে পারেন। জীবনের এই পরম উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার ফলে উন্নত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন জ্ঞানী বা দার্শনিক পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। ধর্মীয় বিধি-বিধানগুলি অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের কলুষিত প্রভাব থেকে মনকে নির্মল করা এবং এই কলিযুগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভগবানের নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন করার ফলে, অনায়াসে মনকে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করা যায়।

"একটি বৈদিক নির্দেশে বলা হয়েছে, *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি* (*কঠ উপ*—

১/২/১৫)—সমস্ত বৈদিক জ্ঞান সেই পরমেশ্বর ভগবানের অনুসন্ধান করছে। তেমনই, আর একটি বৈদিক নির্দেশে বলা হয়েছে, *নারায়ণপরা বেদাঃ*—সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে জানা। তেমনই, *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে জানা। সুতরাং, *বেদের* তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা, বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা এবং *বেদান্তসূত্রের* তাৎপর্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। নির্বিশেষবাদ, শূন্যবাদ অথবা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার যে সমস্ত মতবাদ, তা *বেদ* অধ্যয়নের সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি নিরাশ করে। নির্বিশেষবাদীদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত বৈদিক সিদ্ধান্তগুলিকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা। তাই বুঝতে হবে যে, নির্বিশেষবাদীদের সমস্ত মতবাদ *বেদ* বা প্রামাণিক শাস্ত্রের বিরোধী। নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু বৈদিক তত্ত্ব অনুশীলন করেন না, তাই তাঁদের সমস্ত সিদ্ধান্ত *বেদের* বিরোধী। যে সিদ্ধান্ত বৈদিক তত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কাল্পনিক ও অপ্রামাণিক। তাই বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে নির্বিশেষবাদীদের কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা যায় না।

"কেউ যদি অপ্রামাণিক শাস্ত্র অথবা তথাকথিত শাস্ত্রের দ্বারা বৈদিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করতে চেষ্টা করে, তা হলে তার পক্ষে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন হবে। দুটি বিরুদ্ধ শাস্ত্রের মীমাংসা করার প্রক্রিয়া হচ্ছে, *বেদের* সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেখা, কেন না *বেদের* নির্দেশকে চরম সিদ্ধান্ত বলে স্বীকার করা হয়। আমরা যখন কোন বিশেষ শাস্ত্রের অবতারণা করি, তখন সেই শাস্ত্র অবশ্যই প্রামাণিক হতে হবে এবং তার প্রামাণিকতা নির্ভর করবে বৈদিক নির্দেশের অনুগমন করার উপর। কেউ যদি তার মনগড়া কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য উপস্থাপন করেন, সেই মতবাদ অবশ্যই অর্থহীন বলে প্রমাণিত হবে, কেন না যে মতবাদ বৈদিক প্রমাণকে অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে, সেই মতবাদ অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। *বেদের* অনুগামীরা মনু ও পরাশরের পরম্পরা সর্বতোভাবে স্বীকার করেন। তাঁদের উক্তি নিরীশ্বর কপিলের মতবাদ সমর্থন করে না। *বেদে* যে কপিলদেবের উল্লেখ রয়েছে, তিনি এই নিরীশ্বর কপিল থেকে ভিন্ন। বেদোক্ত কপিল হচ্ছেন কর্দম মুনি ও দেবহূতির পুত্র। নিরীশ্বর কপিল হচ্ছেন অগ্নিবংশ-জাত একজন বদ্ধ জীব। কিন্তু কর্দম মুনির পুত্র কপিলদেব হচ্ছেন বাসুদেবের অবতার। *পদ্ম পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব কপিলদেব রূপে অবতরণ করেছেন এবং সেই অবতারে তিনি আস্তিক সাংখ্য-দর্শন প্রবর্তন করে সমস্ত দেবতা এবং আসুরী নামক ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দান করেছেন। নিরীশ্বর কপিলের মতবাদে বহু *বেদ* বিরোধী উক্তি রয়েছে। নিরীশ্বর কপিল পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন যে, জীবই হচ্ছে ভগবান এবং তার থেকে বড় আর কেউ নেই। বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা জড়বাদ-প্রসূত এবং তিনি নিত্যকালের গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। এই সমস্ত উক্তি *বেদান্তসূত্রের* বিরোধী।"

শ্লোক ১৬

আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং অদ্বৈতরূপে নারায়ণ হচ্ছেন উপাদান কারণ।

শ্লোক ১৭

'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবিষ্ণু নিমিত্ত অংশে মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং শ্রীঅদ্বৈত উপাদান কারণরূপে জড় জগৎ সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১৮

যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও সাংখ্য-দর্শনে মনে করা হয় যে, প্রধান হচ্ছে জগৎ সৃষ্টির কারণ, কিন্তু অচেতন জড় পদার্থ থেকে কোন জগতের উৎপত্তি হতে পারে না।

শ্লোক ১৯

নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে ।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্মাণে ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবান তাঁর সৃষ্টিশক্তি প্রধানের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। তখন ভগবানের শক্তির দ্বারা সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হয়।

শ্লোক ২০

অদ্বৈতরূপে করে শক্তি-সঞ্চারণ ।
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈতরূপে তিনি জড় উপাদানের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন। তাই, অদ্বৈত হচ্ছেন সৃষ্টির মুখ্য কারণ।

শ্লোক ২১

অদ্বৈত-আচার্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্তা ।
আর এক এক মূর্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্তা ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর আর এক মূর্তিতে (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে) তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন।

শ্লোক ২২

সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত ।
'অঙ্গ'-শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত হচ্ছেন সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই 'অঙ্গকে' ভগবানের 'অংশ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২৩

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল-লোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ২৩ ॥

নারায়ণঃ—ভগবান নারায়ণ; ত্বম্—তুমি; ন—নও; হি—অবশ্যই; সর্ব—সমস্ত; দেহিনাম্—দেহধারী জীবসমূহের; আত্মা—পরমাত্মা; অসি—তুমি হও; অধীশ—হে পরমেশ্বর; অখিল-লোক—সমস্ত জগতের; সাক্ষী—সাক্ষী; নারায়ণঃ—নারায়ণ; অঙ্গম্—অংশ; নর—নরের; ভূ—জন্ম; জল—জলে; অয়নাৎ—আশ্রয়স্থল হওয়ার ফলে; তৎ—তা; চ—এবং; অপি—অবশ্যই; সত্যম্—পরম সত্য; ন—নন; তব—তোমার; এব—কোনমতে; মায়া—মায়াশক্তি।

অনুবাদ

"হে পরমেশ্বর! তুমি অখিল লোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহীমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নও? নরজাত জল শব্দের অর্থ নার, তাতে যাঁর অয়ন, তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেউই মায়ার অধীন নন। তাঁরা মায়াধীশ, মায়াতীত পরম সত্য।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৪/১৪) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৪

ঈশ্বরের 'অঙ্গ' অংশ—চিদানন্দময় ।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি' এই শ্লোকে কয় ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের অঙ্গ ও অংশসমূহ চিদানন্দময়; এর সঙ্গে মায়ার কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্লোক ২৫

'অংশ' না কহিয়া, কেনে কহ তাঁরে 'অঙ্গ' ।
'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে কেন অংশ না বলে অঙ্গ বলা হল? তার কারণ হচ্ছে 'অঙ্গ' শব্দে অধিক অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছে।

শ্লোক ২৬

মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম ।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত গুণের আধার শ্রীঅদ্বৈত হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর প্রধান অঙ্গ। তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে অদ্বৈত, কেন না তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ২৭

পূর্বে যৈছে কৈল সর্ব-বিশ্বের সৃজন ।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে তিনি যেমন সমগ্র বিশ্বের সৃজন করেছিলেন, এখন অবতরণ করে তিনি ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন করলেন।

শ্লোক ২৮

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান ।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রদান করে সমস্ত জীবদের উদ্ধার করলেন। ভগবদ্ভক্তির আলোকে তিনি ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যদিও শ্রীবিষ্ণুর অবতার, তবুও বদ্ধ জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্যদাসরূপে প্রকাশ করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও এভাবেই লীলাবিলাস করেছেন, যদিও তাঁরা হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যদি তাঁদের সর্ব শক্তিমান বিষ্ণুস্বরূপ এই জড় জগতে প্রদর্শন করতেন, তা হলে মানুষ আরও অধিক মাত্রায় নির্বিশেষবাদী, অদ্বৈতবাদী ও অহংগ্রহ উপাসক হয়ে যেতো, যা এই যুগের প্রভাবে ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। তাই পরমেশ্বর ভগবান, তাঁর বিভিন্ন অবতার ও তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ ভক্তরূপে লীলাবিলাস করে বদ্ধ জীবদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, কেমন করে ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হতে হয়। অদ্বৈত আচার্য প্রভু বিশেষভাবে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছেন। *আচার্য* কথাটির অর্থ হচ্ছে 'শিক্ষক'। এই ধরনের শিক্ষকের উদ্দেশ্য জীবকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করা। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণকারী আদর্শ শিক্ষকের সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। প্রকৃত আচার্যের যথার্থ যোগ্যতা হচ্ছে, তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের দাসরূপে উপস্থাপিত করেন। এই ধরনের আদর্শ আচার্য কখনই নিজেদের ভগবান বলে প্রচারকারী নাস্তিকদের আসুরিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করেন না। আচার্যের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের ভগবান বলে প্রচারকারী এবং সরল জনসাধারণকে প্রতারণাকারী ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দেওয়া।

শ্লোক ২৯

ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য' ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই, তাই তাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য।

শ্লোক ৩০

বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য।
দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত-আচার্য' ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি হচ্ছেন সমস্ত বৈষ্ণবের গুরু এবং তিনি হচ্ছেন জগতের সর্বাধিক পূজ্য ব্যক্তি। এই দুটি নামের মিলনের ফলে তাঁর নাম হয় অদ্বৈত আচার্য।

তাৎপর্য

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন বৈষ্ণবদের প্রধান গুরু এবং তিনি সমস্ত বৈষ্ণবদের পরমপূজ্য। অদ্বৈত আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবদের অবশ্য কর্তব্য, কেন না তার ফলে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩১

কমল-নয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' করি ধরে নাম অবতংস ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু তিনি হচ্ছেন কমলনয়ন পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গ বা অংশ, তাই তাঁর আর একটি নাম কমলাক্ষ।

শ্লোক ৩২

ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ, পীতবাস, যৈছে নারায়ণ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পার্ষদেরা ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত। নারায়ণের মতো তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ এবং পীতবসন পরিহিত।

শ্লোক ৩৩

অদ্বৈত-আচার্য—ঈশ্বরের অংশবর্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য অংশ। তাঁর তত্ত্ব, নাম ও গুণাবলী অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

শ্লোক ৩৪

যাঁহার তুলসীজলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন এবং হুঙ্কার করে তাঁর অবতরণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে অবতরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্তন প্রচার ।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য) দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করেছিলেন এবং তাঁর দ্বারাই তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

আচার্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার ।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গুণমহিমা অন্তহীন। নগণ্য জীব কিভাবে তার পার পাবে?

শ্লোক ৩৭

আচার্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ্য অঙ্গ। তাঁর আর একটি অঙ্গ হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

শ্লোক ৩৮

প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ।
হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হচ্ছেন তাঁর উপাঙ্গ। তাঁরা হচ্ছেন তাঁর হস্ত, মুখ, চোখ ও চক্র আদি অস্ত্রের মতো।

শ্লোক ৩৯

এসব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার ।
এসব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এদের সকলকে নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলাবিলাস করেছেন এবং এদের সকলকে নিয়ে তাঁর বাসনা অনুসারে প্রচার করেছেন।

শ্লোক ৪০

মাধবেন্দ্রপুরীর ইঁহো শিষ্য, এই জ্ঞানে ।
আচার্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য", এই মনে করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর গুরুর মতো মান্য করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী হচ্ছেন শ্রীমধ্বাচার্যের ধারায় এক মহান বৈষ্ণব আচার্য। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর দুজন প্রধান শিষ্য হচ্ছেন—শ্রীঈশ্বর পুরী ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এই সূত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্ব *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা* ও *প্রমেয়-রত্নাবলী* আদি প্রামাণিক গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। গোপাল গুরু গোস্বামীও তা স্বীকার করেছেন। *গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়* (২২) স্পষ্টভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরম্পরার ধারা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"ব্রহ্মা হচ্ছেন পরব্যোমনাথ বিষ্ণুর শিষ্য। তাঁর শিষ্য হচ্ছেন নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব এবং ব্যাসদেবের শিষ্য শুকদেব গোস্বামী ও মধ্বাচার্য। পদ্মনাভ আচার্য হচ্ছেন মধ্বাচার্যের শিষ্য এবং নরহরি পদ্মনাভ আচার্যের শিষ্য। মাধব হচ্ছেন নরহরির শিষ্য, অক্ষোভ্য মাধবের শিষ্য এবং জয়তীর্থ অক্ষোভ্যের শিষ্য। জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং তাঁর শিষ্য মহানিধি। মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি এবং রাজেন্দ্র বিদ্যানিধির শিষ্য। জয়ধর্ম রাজেন্দ্রের শিষ্য। পুরুষোত্তম জয়ধর্মের শিষ্য। শ্রীমন্ লক্ষ্মীপতি হচ্ছেন ব্যাসতীর্থের শিষ্য, যিনি পুরুষোত্তমের শিষ্য। আর মাধবেন্দ্র পুরী হচ্ছেন লক্ষ্মীপতির শিষ্য।"

শ্লোক ৪১

লৌকিক-লীলাতে ধর্মমর্যাদা-রক্ষণ ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করেন তাঁর চরণ বন্দন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য লোকাচারে লীলাবিলাস করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রদ্ধাপূর্ণ স্তুতি ও ভক্তি সহকারে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণ বন্দনা করেছেন।

শ্লোক ৪২

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান ।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর প্রভু বলে মনে করেন এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

"ব্রহ্ম-উপলব্ধির আনন্দকে যদি কোটি কোটি গুণ বর্ধিত করা যায়, তা হলেও তা ভক্তি-সমুদ্রের এক পরমাণুর সমান হতে পারে না।" (*ভঃ রঃ সিঃ* ১/১/৩৮) তেমনই, *ভাবার্থ-দীপিকায়* বর্ণিত হয়েছে—

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্ ॥

"যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কথামৃত আস্বাদন করেন, তাঁদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ তৃণবৎ প্রতিভাত হয়।" যাঁরা জড় সুখভোগের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। *পদ্ম-পুরাণে* কার্তিক-মাহাত্ম্যে ভগবদ্ভক্তের মনোভাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদং তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ ।
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥

"হে ভগবান! নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করার থেকে নিরন্তর বৃন্দাবনে তোমার শৈশবলীলা স্মরণ করা অনেক অনেক গুণ শ্রেয় বলে আমরা মনে করি। তোমার বাল্যলীলা বিলাসকালে তুমি কুবেরের দুই পুত্রকে উদ্ধার করেছিলে এবং তোমার মহান ভক্তে পরিণত করেছিলে। তেমনই, আমি বাসনা করি যে, আমাকে মুক্তিদান করার পরিবর্তে তুমি যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিদান কর।" *নারায়ণ-স্তোত্র* অধ্যায়ের *হয়শীর্ষীয়-শ্রীনারায়ণ-বৃহস্তবে* বর্ণনা করা হয়েছে—

ন ধর্মং কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেশ্বর ।
প্রার্থয়ে তব পাদাব্জে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥

"হে প্রভু! আমি ধর্মপরায়ণ মানুষ হতে চাই না, আমি অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করে

ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ চাই না, এমন কি আমি মুক্তিও চাই না। হে বরদেশ্বর, তোমার কাছ থেকে যদিও এই সবই পাওয়া যেতে পারে, তবুও আমি এগুলি প্রার্থনা করি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে, আমি যেন নিরন্তর তোমার শ্রীপাদপদ্মের সেবাতেই যুক্ত থাকতে পারি।" শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে সব রকম বর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ সেগুলি গ্রহণ করেননি, কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবাতেই যুক্ত থাকতে চেয়েছিলেন। তেমনই, শুদ্ধ ভক্তরা প্রহ্লাদ মহারাজের মতো কেবল ভগবদ্ভক্তিই আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবদ্ভক্তেরা শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিত্যযুক্ত হনুমানের প্রতিও তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মহান ভক্ত হনুমান প্রার্থনা করেছিলেন—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে ।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥

'আমি মুক্তি চাই না অথবা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চাই না, যার ফলে আমি যে প্রভুর দাস, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।" তেমনই, *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বর্ণিত হয়েছে—

ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন ।
ত্বৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম ॥

"আমি কখনও ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুবর্গ কামনা করি না। আমি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকতে চাই।" মহারাজ কুলশেখর তাঁর বিখ্যাত *মুকুন্দমালা-স্তোত্র* গ্রন্থে বন্দনা করেছেন—

নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্ ।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥

"হে ভগবান! আমি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তোমার বন্দনা করি না, এই জড় জগতের নারকীয় পরিবেশ থেকে রক্ষা পেতেও চাই না, এমন কি আমি সুন্দর উদ্যানে সুন্দরী স্ত্রী উপভোগ করতে চাই না। আমি কেবল চাই, আমি যেন নিরন্তর তোমার সেবানন্দে মগ্ন থাকতে পারি।" (*মুকুন্দমালা-স্তোত্র* ৪) *শ্রীমদ্ভাগবতে* তৃতীয় এবং চতুর্থ স্কন্ধেও এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাতেই যুক্ত হওয়ার প্রার্থনা করেছেন এবং এছাড়া আর কিছু প্রার্থনা করেননি (*ভাগবত* ৩/৪/১৫, ৩/২৫/৩৪, ৩/২৫/৩৬, ৪/৮/২২, ৪/৯/১০ এবং ৪/২০/২৪)।

শ্লোক ৪৩

সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে ।
'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অভিমানের আনন্দে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হন এবং সমস্ত জীবকে উপদেশ দেন, "তোমরা হচ্ছ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস।"

তাৎপর্য

চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি এতই আনন্দদায়ক যে, ভগবান স্বয়ং ভক্তরূপে লীলাবিলাস করেন। তিনিই যে পরমেশ্বর সেই কথা ভুলে গিয়ে, তিনি সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দেন, কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয়।

শ্লোক ৪৪

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু ।
কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

নিজেকে কৃষ্ণদাস বলে জানার মধ্যে হৃদয়ে যে আনন্দসিন্ধুর সঞ্চার হয়, ব্রহ্মানন্দ কোটি কোটি গুণ বর্ধিত হলেও তার এক বিন্দুর সমান হতে পারে না।

শ্লোক ৪৫

মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বলেন, "নিত্যানন্দ ও আমি হচ্ছি শ্রীচৈতন্যের দাস।" দাস্যভাব আস্বাদন করায় যে আনন্দ তা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্লোক ৪৬

পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি ।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের পরম প্রেয়সী লক্ষ্মীদেবী ভগবানের হৃদয়ে বাস করেন। সেই দাস্যসুখ লাভ করার জন্য তিনিও মিনতিপূর্বক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।

শ্লোক ৪৭

দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ ।
বিধি, ভব, নারদ আর শুক, সনাতন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুক ও সনাতন আদি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত পার্ষদেরা দাস্যভাবে আনন্দিত।

শ্লোক ৪৮

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল ।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি শ্রীচৈতন্যের দাস্যপ্রেমে পাগল হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৯-৫০

শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর ।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৯ ॥
এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব ।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর এরা সকলেই মহাপণ্ডিত ও অত্যন্ত মহৎ, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস্য এদের সকলকে আনন্দে উন্মত্ত করে।

শ্লোক ৫১

এই মত গায়, নাচে, করে অট্টহাস ।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস' ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তাঁরা নৃত্য-গীত করেন, পাগলের মতো অট্টহাস্য করেন এবং সকলকে উপদেশ দেন, "চৈতন্যের দাস হও।"

শ্লোক ৫২

চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান ।
তথাপিহ মোর হয় দাস-অভিমান ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু মনে মনে ভাবেন, "শ্রীচৈতন্য আমাকে গুরু বলে মনে করে, কিন্তু তবুও আমি অনুভব করি যে আমি তাঁর দাস।

শ্লোক ৫৩

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব ।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব যে, তা গুরু, সম ও লঘু সকলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাবে আবিষ্ট করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি দুই প্রকার—*পাঞ্চরাত্রিক* ও *ভাগবত*। পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য-প্রধান, কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের আরাধনা বিশুদ্ধ প্রেমের স্তরে অবস্থিত। এমন কি যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তাঁরাও প্রীতি সহকারে তাঁর সেবা করার সুযোগের অপেক্ষা করেন। ভগবানের গুরুবর্গের দাস্যভাব সহকারে ভগবানের সেবা করার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের বিশেষ সেবার মাহাত্ম্যের মাধ্যমে তা অত্যন্ত সরলভাবে বোঝা যায়। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মা যশোদার সেবাভাব। নারায়ণরূপে ভগবান কেবল তাঁর সম অথবা লঘু যে সমস্ত পার্ষদ, তাঁদেরই সেবা গ্রহণ করেন; কিন্তু কৃষ্ণরূপে তিনি তাঁর পিতা-মাতা, গুরুবর্গ এবং অন্যান্য গুরুজনদের, অথবা তাঁর সম ও লঘু পার্ষদদের সকলেরই সেবা গ্রহণ করেন। তাঁর এই লীলা অত্যন্ত অদ্ভুত।

শ্লোক ৫৪

ইহার প্রমাণ শুন—শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার প্রমাণ শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা শ্রবণ করুন, যা মহাপুরুষদের উপলব্ধির দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৫-৫৬

অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয় ।
তার সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥ ৫৫ ॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তার ।
তাহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজে নন্দ মহারাজের থেকে সম্মানিত গুরুজন শ্রীকৃষ্ণের আর কেউ নেই। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের প্রভাবে তিনি ভুলে গিয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর

ভগবান। চিন্ময় ভগবৎ-প্রেমে তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন। সুতরাং অন্যের আর কি কথা।

শ্লোক ৫৭

তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে ।
তাহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনিও শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি ও ভক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁর শ্রীমুখের বাণীই হচ্ছে তার প্রমাণ।

শ্লোক ৫৮-৫৯

শুন উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ—আমার তনয় ।
তেঁহো ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৮ ॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি ।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে উদ্ধব! আমার কথা শোন। এই কথা সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, কিন্তু তুমি যদি মনে কর সে হচ্ছে ভগবান, তবুও তাঁকে আমি পুত্র বলেই মনে করব। তোমার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার চিত্ত যেন আকৃষ্ট হয়।

শ্লোক ৬০

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৬০ ॥

মনসঃ—মনের; বৃত্তয়ঃ—বৃত্তি (চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা); নঃ—আমাদের; স্যুঃ—হোক; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; পাদ-অম্বুজ—শ্রীপাদপদ্ম; আশ্রয়াঃ—যাঁরা আশ্রয় লাভ করেছেন; বাচঃ—বাক্যসকল; অভিধায়িনীঃ—কীর্তন করে; নাম্নাম্—তাঁর দিব্য নামের; কায়ঃ—দেহ; তৎ—তাঁর কাছে; প্রহ্বণ-আদিষু—প্রণতি আদি নিবেদন করে।

অনুবাদ

"আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মকে আশ্রয় করুক, আমাদের বাক্যসকল তাঁর নামকীর্তন করুক এবং আমাদের দেহ তাঁর অভিবাদনে প্রযুক্ত হোক।

শ্লোক ৬১

কর্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬১ ॥

কর্মভিঃ—কর্মের দ্বারা; **ভ্রাম্যমাণানাম্**—জড় জগতে যারা ভ্রমণ করছে তাদের; **যত্র**—যেখানেই; **ক্ব অপি**—যে কোন স্থানে; **ঈশ্বর-ইচ্ছয়া**—পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা; **মঙ্গল-আচরিতৈঃ**—শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা; **রতিঃ**—আসক্তি; **নঃ**—আমাদের; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

"কর্মফল অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় জড় জগতের যেখানেই আমরা ভ্রমণ করি না কেন, দান আদি শুভ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ কৃষ্ণের প্রতি আমাদের রতি বর্ধিত হোক।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (১০/৪৭/৬৬-৬৭) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোক দুটি মথুরা থেকে আগত উদ্ধবের প্রতি নন্দ মহারাজ প্রমুখ বৃন্দাবনবাসীদের উক্তি।

শ্লোক ৬২

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয় ।
ঐশ্বর্য-জ্ঞান-হীন, কেবল-সখ্যময় ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীদামাদি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যত সখা রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁদের সখ্যভাব সম্পূর্ণ নির্মল এবং তাঁর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁদের কোন জ্ঞান নেই।

শ্লোক ৬৩

কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাঁর কাঁধে চড়েন, তবুও সেই সঙ্গে তাঁরা আবার দাস্যভাবে তাঁর চরণ-কমলের সেবাও করেন।

শ্লোক ৬৪

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৬৪ ॥

পাদ-সংবাহনম্—পাদসংবাহন; **চক্রুঃ**—করতে লাগলেন; **কেচিৎ**—তাঁদের কেউ; **তস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **মহা-আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **অপরে**—অন্যরা; **হত-পাপ্মানঃ**—সেবাবিঘ্নরূপ পাপ থেকে নিত্যমুক্ত; **ব্যজনৈঃ**—হাতপাখা দিয়ে; **সমবীজয়ন্**—অত্যন্ত আরামদায়কভাবে হাওয়া করেছিলেন।

অনুবাদ

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোন কোন সখা তাঁর পাদসংবাহন করতে লাগলেন এবং অন্যরা যাঁরা সেবাবিঘ্নরূপ পাপ থেকে নিত্যমুক্ত, তাঁরা পল্লব রচিত হাতপাখার দ্বারা তাঁকে হাওয়া করতে লাগলেন।"

তাৎপর্য

তালবনে ধেনুকাসুরকে বধ করার পর কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে তাঁর সখাদের সঙ্গে বনে খেলা করছিলেন, তা *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৫/১৭) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬৫-৬৬

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৬৫ ॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন ।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

এমন কি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজগোপিকারা, যাঁদের পদধূলি উদ্ধব প্রার্থনা করেছিলেন এবং কৃষ্ণের কাছে যাঁদের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই, তাঁরাও নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলে মনে করেন।

শ্লোক ৬৭

ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬৭ ॥

ব্রজজন-আর্তিহন্—হে ব্রজবাসীদের সন্তাপহারী; **বীর**—হে বীর; **যোষিতাম্**—রমণীগণের; **নিজ**—নিজস্ব; **জন**—পার্ষদদের; **স্ময়**—গর্ব; **ধ্বংসন**—ধ্বংস করে; **স্মিত**—যার স্মিত হাস্য; **ভজ**—ভজনা কর; **সখে**—হে সখে; **ভবৎ-কিঙ্করীঃ**—তোমার দাসী; **স্ম**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের; **জল-রুহ-আননম্**—মুখপদ্ম; **চারু**—মনোহর; **দর্শয়**—দয়া করে দেখাও।

অনুবাদ

"হে ব্রজবাসীদের সন্তাপহারী! হে রমণীগণের পরম নায়ক! হে নিজ ভক্তগণের গর্ব দূরকারী স্মিত হাস্যময়! হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী। দয়া করে তোমার মুখপদ্ম আমাদের দর্শন করিয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩১/৬) থেকে উদ্ধৃত। রাসনৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্হিত হয়ে যান, তখন কৃষ্ণবিরহে গোপীরা এভাবেই ক্রন্দন করেছিলেন।

শ্লোক ৬৮

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৬৮ ॥

অপি—অবশ্যই; বত—অনুশোচনার বিষয়; মধু-পুর্যাম্—মথুরা নগরীতে; আর্য-পুত্রঃ—নন্দ মহারাজের পুত্র; অধুনা—এখন; আস্তে—বাস করছেন; স্মরতি—স্মরণ করেন; সঃ—তিনি; পিতৃ-গেহান্—পিতৃগৃহের; সৌম্য—হে মহাত্মা (উদ্ধব); বন্ধূন্—তাঁর বন্ধুদের; চ—এবং; গোপান্—গোপবালকদের; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; অপি—অথবা; সঃ—তিনি; কথাম্—কথা; নঃ—আমাদের; কিঙ্করীণাম্—দাসীদের; গৃণীতে—বর্ণনা করেন; ভুজম্—বাহু; অগুরু-সু-গন্ধম্—অগুরুর সুগন্ধযুক্ত; মূর্ধ্নি—মস্তকে; অধাস্যৎ—রাখবেন; কদা—কখনও; নু—হয়ত।

অনুবাদ

"হে উদ্ধব! এটি অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয় যে, কৃষ্ণ এখন মথুরায় বাস করছেন। তিনি কি তাঁর পিতৃগৃহের কথা, তাঁর বন্ধুদের কথা এবং গোপবালকদের কথা স্মরণ করেন? হে মহাত্মন্! তিনি কি কখনও আমাদের কথা, এই কিঙ্করীদের কথা বলেন? কবে তিনি অগুরু সুগন্ধযুক্ত তাঁর হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করবেন?"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/৪৭/২১) *ভ্রমর-গীতা* নামক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখন কৃষ্ণবিরহে আকুল শ্রীমতী রাধারাণী এভাবেই বিলাপ করেন।

শ্লোক ৬৯-৭০

তাঁ-সবার কথা রহু,—শ্রীমতী রাধিকা ।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥ ৬৯ ॥
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

অন্য গোপিকাদের কি আর কথা, এমন কি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা যে শ্রীমতী রাধারাণী, যিনি তাঁর প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ বেঁধে রেখেছেন, তিনিও দাসী হয়ে তাঁর চরণসেবা করেন।

শ্লোক ৭১

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৭১ ॥

হা—হে; নাথ—প্রভু; রমণ—হে আমার পতি; প্রেষ্ঠ—হে প্রিয়তম; ক্ব অসি ক্ব অসি—তুমি কোথায়, তুমি কোথায়; মহা-ভুজ—হে মহাবাহু; দাস্যাঃ—দাসীর; তে—তোমার; কৃপণায়াঃ—তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতরা; মে—আমাকে; সখে—হে সখে; দর্শয়—দর্শন দান কর; সন্নিধিম্—তোমার সান্নিধ্য।

অনুবাদ

"হে নাথ, হে রমণ, হে প্রিয়তম! হে মহাবাহো! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? হে সখে! তোমার বিরহে অত্যন্ত কাতরা এই দাসীকে তোমার সান্নিধ্য দান কর।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৩০/৩৯) থেকে উদ্ধৃত। রাসনৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্য সমস্ত গোপিকাদের ফেলে রেখে কেবল শ্রীমতী রাধারাণীকে নিয়ে চলে যান, তখন সমস্ত গোপিকারা কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে বিলাপ করছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণী তখন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন, তাঁকে কাঁধে করে যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে নিয়ে যেতে। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান এবং তখন শ্রীমতী রাধারাণী এভাবেই বিলাপ করেছিলেন।

শ্লোক ৭২

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী ।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বারকায় রুক্মিণী প্রমুখ মহিষীরাও নিজেদেরকে কৃষ্ণদাসী বলে মনে করেন।

শ্লোক ৭৩

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যত-কার্মুকেষু
রাজস্বজেয়-ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথা-
ত্তচ্ছ্রীনিকেত-চরণোঽস্তু মমার্চনায় ॥ ৭৩ ॥

চৈদ্যায়—শিশুপালকে; মা—আমাকে; অর্পয়িতুম্—অর্পণ করতে; উদ্যত—উদ্যত; কার্মুকেষু—যাঁর ধনুর্বাণ; রাজসু—জরাসন্ধ প্রমুখ রাজাদের মধ্য থেকে; অজেয়—অজেয়;

ভট—সৈন্যসমূহের; **শেখরিত-অঙ্ঘ্রি-রেণুঃ**—যাঁর পদরজ হচ্ছে তাঁদের মুকুটমণি; **নিন্যে**—বলপূর্বক গ্রহণ করেন; **মৃগ-ইন্দ্রঃ**—সিংহ; **ইব**—মতন; **ভাগম্**—ভাগ; **অজা**—ছাগল; **অবি**—এবং ভেড়ার; **যূথাৎ**—মধ্য থেকে; **তৎ**—সেই; **শ্রী-নিকেত**—লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়ের; **চরণঃ**—চরণকমল; **অস্তু**—হোক; **মম**—আমার; **অর্চনায়**—আরাধ্য।

অনুবাদ

"জরাসন্ধ প্রমুখ রাজারা যখন উদ্যত ধনুর্বাণ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল এবং আমাকে শিশুপালের কাছে অর্পণ করতে যাচ্ছিল, তখন তিনি বলপূর্বক আমাকে তাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নেন, ঠিক যেমন একটি সিংহ ছাগল ও ভেড়ার পাল থেকে শিকার তুলে নেয়। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের রজ তখন অজেয় সৈন্যদের শিরোভূষণ হয়েছিল। সেই শ্রীপাদপদ্ম যা হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়, তা চিরকাল আমার আরাধ্য হোক।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০/৮৩/৮) এই শ্লোকটি মহিষী রুক্মিণী কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭৪

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া ।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জনী ॥ ৭৪ ॥

তপঃ—তপশ্চর্যা; **চরন্তীম্**—অনুষ্ঠান করে; **আজ্ঞায়**—জেনে; **স্ব-পাদ-স্পর্শন**—তাঁর পাদস্পর্শের; **আশয়া**—বাসনাসহ; **সখ্যা**—তাঁর সখা অর্জুনসহ; **উপেত্য**—এসে; **অগ্রহীৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **পাণিম্**—আমার হস্ত; **সা**—সেই রমণী; **অহম্**—আমি; **তৎ**—তাঁর; **গৃহ-মার্জনী**—গৃহ মার্জনকারিণী।

অনুবাদ

"আমি যে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ-লালসায় তপস্যা করছিলাম, তা জেনে তিনি তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে এসে আমার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। তবুও আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জনকারিণী একজন দাসী।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৩/১১) থেকে উদ্ধৃত। স্যমন্তপঞ্চকে যাদব ও কৌরব মহিলারা একত্রে যখন কৃষ্ণকথা আলোচনা করছিলেন, তখন কৃষ্ণমহিষী কালিন্দী এসে দ্রৌপদীকে এই কথা বলেন।

শ্লোক ৭৫

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৭৫ ॥

আত্মারামস্য—সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত পরমেশ্বর ভগবানের; **তস্য**—তাঁর; **ইমাঃ**—সমস্ত; **বয়ম্**—আমরা; **বৈ**—অবশ্যই; **গৃহ-দাসিকাঃ**—গৃহদাসী; **সর্ব**—সমস্ত; **সঙ্গ**—সঙ্গ; **নিবৃত্ত্যা**—

পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **তপসা**—তপশ্চর্যার প্রভাবে; **চ**—ও; **বভূবিম**—আমরা হয়েছি।

অনুবাদ

"বহু তপস্যার প্রভাবে সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করে আমরা এই আত্মারাম পরমেশ্বর ভগবানের দাসীত্ব লাভ করেছি।"

তাৎপর্য

ওই সময়ে ওই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণমহিষী লক্ষ্মণার এই উক্তিটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮৩/৩৯) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৬-৭৭

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয় ।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৭৬ ॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা ।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

অন্যের কি কথা, শুদ্ধ সখ্য ও বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভগবান বলদেব পর্যন্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বলে মনে করেন। কৃষ্ণদাসত্বের ভাবনাবিহীন কে আছে?

তাৎপর্য

যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেই সূত্রে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রদ্ধেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তবুও তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকের মতো আচরণ করতেন। চিৎ-জগতে প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোকে চতুর্ব্যূহ নামক শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিরাজমান। তাঁরা হচ্ছেন বলদেবের স্বাংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, তাই চিৎ-জগতে সকলেই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন। সামাজিক দিক দিয়ে কেউ শ্রীকৃষ্ণের থেকে জ্যেষ্ঠ হতে পারেন বা শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই তাঁর সেবায় যুক্ত। অতএব চিন্ময় জগৎ ও জড় জগতের সমস্ত গ্রহমণ্ডলীতে কেউই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করতে বা ভৃত্য করতে সমর্থ নন। পক্ষান্তরে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। তাই, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যিনি যত গভীরভাবে যুক্ত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তত বেশি। অপরপক্ষে, জীব যতই কৃষ্ণসেবা বিমুখ হয়, ততই সে জড় কলুষের অমঙ্গল আহ্বান করে। জড় জগতে মায়াবদ্ধ জীবেরা যদিও ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অথবা ভগবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছে, তবুও সকলেই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। জীব যতই কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হয়, ততই সে মৃতকল্প হয়ে পড়ে। তাই, কেউ যখন শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনার বিকাশ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব লাভ করেন।

শ্লোক ৭৮

সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সহস্র বদন শেষ-সঙ্কর্ষণ দশ রূপ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

শ্লোক ৭৯

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্বদেব-অবতংস ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

সদাশিবের অংশ রুদ্র, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান, সমস্ত দেবতাদের অলঙ্কার-স্বরূপ তিনিও শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার।

তাৎপর্য

রুদ্র বা শিবের এগারটি প্রকাশ রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন—অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। এ ছাড়াও তাঁর আটটি মূর্তি রয়েছে—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও সোমযাজী। সাধারণত সকল রুদ্রই পঞ্চমুখ, ত্রিনয়ন এবং দশ বাহু। কোন কোন স্থানে রুদ্রকে ব্রহ্মার মতো জীব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রুদ্রকে যখন পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপে বর্ণনা করা হয়, তখন তাঁকে শেষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সুতরাং শিব যুগপৎভাবে শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশ এবং সৃষ্টি ধ্বংসকারী বিভিন্নাংশ জীব। শ্রীবিষ্ণুর অংশরূপে তিনি হচ্ছেন হর এবং তিনি সব রকম জড় গুণের অতীত, কিন্তু যখন তিনি তমোগুণের সংস্পর্শে আসেন, তখন অতাত্ত্বিক মানুষদের কাছে জড় গুণের দ্বারা আপাতত প্রভাবিত বলে প্রতীয়মান হন। *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ব্রহ্মসংহিতায়* তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি যখন সাম্য অবস্থায় থাকেন, তখন রুদ্র তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন, কিন্তু প্রকৃতি যখন গুণের প্রভাবে ক্ষুব্ধা, তখন তিনি দূর থেকে তার সঙ্গ করেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বিষ্ণু ও শিবের সম্পর্ককে দুধ ও দইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুধ বিকার বিশেষের যোগে দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু দুধ এবং দইয়ের উপাদান এক হলেও তাদের ক্রিয়া ভিন্ন। তেমনই, শিব যদিও বিষ্ণুর অংশ, কিন্তু তবুও সংহারকার্যে যুক্ত থাকায় তিনি পরিবর্তিত হন বলে মনে করা হয়, ঠিক যেমন দুধ দধিতে পরিণত হয়। *পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কল্পে শিব ব্রহ্মার ললাট থেকে এবং কখনও বিষ্ণুর ললাট থেকে প্রকাশিত হন। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ থেকেও কালাগ্নি রুদ্রের জন্ম হয়। *বায়ু পুরাণে* বৈকুণ্ঠের অন্তর্ভুক্ত শিবলোকে সর্বকারণ-স্বরূপ ও তমোগুণ সম্বন্ধ রহিত যে সদাশিব, তাঁকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলা হয়েছে। কথিত আছে

যে, সদাশিব (শম্ভু) হচ্ছেন বৈকুণ্ঠের সদাশিবের (বিষ্ণুর) অংশ এবং তাঁর প্রেয়সী মহামায়া হচ্ছেন রমাদেবী বা লক্ষ্মীর অংশ। মহামায়া হচ্ছেন জড় জগতের উৎস বা জন্মদাত্রী।

শ্লোক ৮০

তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস' ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

তিনিও কেবল শ্রীকৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশা করেন। শ্রীসদাশিব নিরন্তর বলেন, "আমি কৃষ্ণদাস।"

শ্লোক ৮১

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর ।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে তিনি বিহ্বল হন, দিগম্বর হয়ে নৃত্য করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলা গান করেন।

শ্লোক ৮২

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয় ।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

পিতা, মাতা, গুরু অথবা সখা সকলেরই ভাব দাস্যভাব-যুক্ত। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব।

শ্লোক ৮৩

এক কৃষ্ণ—সর্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর ।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জগতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সকলের সেব্য। বাস্তবিকপক্ষে, অন্য সকলেই তাঁর দাসানুদাস।

শ্লোক ৮৪

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর ।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব আর সকলেই তাঁর কিঙ্কর।

শ্লোক ৮৫

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস ।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

কেউ তাঁকে মানে আবার কেউ তাঁকে মানে না, তবুও সকলেই তাঁর দাস। যে তাঁকে মানে না, সেই পাপে তার সর্বনাশ হয়।

তাৎপর্য

জীব যখন তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখন সে জড় জগতের ভোক্তা হওয়ার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বিভ্রান্ত হয়ে সে মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া সর্বোত্তম কর্ম নয়। পক্ষান্তরে, সে মনে করে ভগবানের সেবা ছাড়া আরও অনেক কিছু করণীয় আছে। এই ধরনের মূর্খ মানুষ জানে না যে, যে অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তখন সব রকম অমঙ্গল তাকে গ্রাস করে, কেন না পরমেশ্বর ভগবান বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করাটাই হচ্ছে অণুসদৃশ জীবের নিত্যবৃত্তি। জীব যেহেতু অণুসদৃশ, তাই জড় জগৎকে ভোগ করার প্রলোভন তাকে আকর্ষণ করে এবং সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে জড় জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তার শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত জাগরিত হয়, তখন আর সে জড়ের সেবায় যুক্ত না থেকে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। পক্ষান্তরে জীব যখন তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখন সে জড় জগতের প্রভু হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও সে পরমেশ্বর ভগবানের দাসই থাকে, কিন্তু সেই অবস্থাটি হচ্ছে অযোগ্য ও কলুষিত অবস্থা।

শ্লোক ৮৬

চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস ।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস। আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস এবং তাঁর দাসের অনুদাস।

শ্লোক ৮৭

এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর ।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য হৈঞা সুস্থির ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নৃত্য করলেন, গান করলেন এবং গম্ভীরভাবে হুঙ্কার করলেন। তার পরেই তিনি স্থির হয়ে বসলেন।

শ্লোক ৮৮

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে ।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্ত অভিমানের উৎস হচ্ছেন শ্রীবলরাম। তাঁর অনুগত অংশেরাও সেই ভাবের দ্বারা প্রভাবিত।

শ্লোক ৮৯

তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্বক্ষণ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীসঙ্কর্ষণ, যিনি হচ্ছেন তাঁর অবতার, তিনি সর্বক্ষণ নিজেকে ভগবানের ভক্ত বলে অভিমান করেন।

শ্লোক ৯০

তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর আর এক অবতার অপূর্ব সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সমন্বিত লক্ষ্মণ সর্বক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেন।

শ্লোক ৯১

সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী ।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

কারণ-সমুদ্রশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের অবতার এবং তাঁর হৃদয়ে ভক্তভাব নিরন্তর বিরাজমান।

শ্লোক ৯২

তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য ।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন তাঁর আর এক প্রকাশ। কায়মনোবাক্যে তিনি সর্বদাই ভক্তিযুক্ত সেবায় রত।

শ্লোক ৯৩

বাক্যে কহে, 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর' ।
মুঞি তাঁর ভক্ত—মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

মুখে তিনি বলেন, "আমি শ্রীচৈতন্যের অনুচর" এবং মনে মনে তিনি নিরন্তর ভাবেন, "আমি তাঁর ভক্ত।"

শ্লোক ৯৪

জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন ।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র অর্পণ করে তিনি তাঁর দেহ দ্বারা ভগবানের সেবা করেছেন এবং ভগবদ্ভক্তি প্রচার করে সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেছেন।

শ্লোক ৯৫

পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

শেষ-সঙ্কর্ষণ, যিনি তাঁর মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করেন, তিনি কায়ব্যূহ প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।

শ্লোক ৯৬

এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার ।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

এরা সকলেই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবুও আমরা সব সময় দেখতে পাই যে, তাঁরা তাঁর ভক্তের মতো আচরণ করছেন।

শ্লোক ৯৭

এ-সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত-অবতার' ।
'ভক্ত-অবতার'-পদ উপরি সবার ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

এদের সকলকে শাস্ত্রে বলা হয় ভক্ত-অবতার। এই ভক্ত-অবতার পদ হচ্ছে সর্বোত্তম।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্নভাবে অবতরণ করেন, কিন্তু ভক্তরূপে তাঁর অবতরণ জীবের কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত তাঁর অন্যান্য সমস্ত অবতারদের থেকেও অধিক মঙ্গলময়। সর্ব ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবানের অবতারের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে বদ্ধ জীবেরা কখনও কখনও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে বহু অলৌকিক লীলাবিলাস করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও জড়বাদীরা তাঁকে চিনতে পারে না, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাঁর অবতরণে তিনি অধিক ঐশ্বর্য প্রকাশ করেননি এবং তাই কম সংখ্যক বদ্ধ জীব বিভ্রান্ত হয়েছে। ভগবৎ-তত্ত্ব না জেনে, বহু মূর্খ নিজেদের ভগবানের অবতার বলে মনে করে। তার ফলে তারা বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর শৃগালের শরীর প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত মানুষ ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাদের দণ্ডস্বরূপ অবশ্যই এই প্রকার নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। অহঙ্কারে মত্ত যে সমস্ত বদ্ধ জীব ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার অপচেষ্টা করে, তারা মায়াবাদীতে পরিণত হয়।

শ্লোক ৯৮

একমাত্র 'অংশী'—কৃষ্ণ, 'অংশ'—অবতার ।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী এবং সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন তাঁর অংশ অথবা কলা। আমরা দেখতে পাই যে, অংশী এবং অংশ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠরূপে আচরণ করেন।

শ্লোক ৯৯

জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান ।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত অবতারদের অংশী জ্যেষ্ঠভাব সমন্বিত হয়ে নিজেকে প্রভু বলে মনে করেন এবং কনিষ্ঠ বলে তিনি আবার নিজেকে ভক্ত বলে অভিমান করেন।

তাৎপর্য

খণ্ডিত বস্তুকে অংশ বলা হয় এবং যে বস্তুর খণ্ড সেই বস্তুকে বলা হয় অংশী। তাই অংশ অথবা খণ্ড অংশীর অন্তর্গত। অংশী—প্রভুর অংশ হচ্ছে ভক্ত। সেটিই হচ্ছে প্রভু ও ভক্তের পরস্পর সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বা বড়-ছোট বিচার সংশ্লিষ্ট। বড়র নাম প্রভু, ছোটর নাম ভক্ত। অংশী ২ ২৬। কৃষ্ণ এবং বলদেব ও সমস্ত বিষ্ণু-অবতার হচ্ছেন তাঁর অংশ। তাই কৃষ্ণের নিজেকে প্রভু বলে অভিমান, আর বলদেব আদি নিজেদের ভক্ত অভিমান।

শ্লোক ১০০

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণের সমতা থেকে ভক্তপদ বড়, কেন না তাঁর নিজের থেকেও ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়।

তাৎপর্য

ভগবানের সমান হওয়ার থেকে ভগবানের ভক্তপদ শ্রেষ্ঠ, কেন না শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের স্বার্থের প্রতি যে প্রকার প্রেম-বিশিষ্ট, তার থেকে তাঁর সেবকের প্রতি অধিকতর প্রেমবান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৯/৪/৬৮) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

"ভক্তরা আমার হৃদয় এবং আমি আমার ভক্তদের হৃদয়। আমার ভক্তরা আমাকে ছাড়া কিছুই জানে না; তেমনই, আমিও আমার ভক্তদের ছাড়া আর কিছুই জানি না।" এটিই হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতি নিবিড় সম্পর্ক।

শ্লোক ১০১

আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে ।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের তাঁর থেকে বড় বলে মনে করেন। এই সম্পর্কে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রয়েছে।

শ্লোক ১০২

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১০২ ॥

ন তথা—ততটা নয়; **মে**—আমার; **প্রিয়তমঃ**—প্রিয়তম; **আত্ম-যোনিঃ**—ব্রহ্মা; **ন শঙ্করঃ**—শঙ্কর (শিব) নয়; **ন**—নয়; **চ**—ও; **সঙ্কর্ষণঃ**—ভগবান সঙ্কর্ষণ; **ন**—নয়; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ন**—নয়; **এব**—অবশ্যই; **আত্মা**—আমি নিজে; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **ভবান্**—তুমি।

অনুবাদ

"হে উদ্ধব! তুমি যেমন আমার প্রিয়, ব্রহ্মা, শিব, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী এবং স্বয়ং আমি পর্যন্ত আমার তত প্রিয় নই।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১১/১৪/১৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১০৩

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্যাস্বাদন ।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য চর্বণ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

যারা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সমান বলে মনে করে, তারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে না। ভক্তভাব অবলম্বন করার মাধ্যমেই কেবল তা আস্বাদন করা যায়।

শ্লোক ১০৪

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—বিজ্ঞের অনুভব ।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তেরা উপলব্ধি করেন। মূর্খ ও অসৎ লোকেরা ভগবদ্ভক্তির বৈভব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

তাৎপর্য

জীব যখন সারূপ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে ঠিক বিষ্ণুর মতো রূপ প্রাপ্ত হয়, তখন তার পক্ষে কৃষ্ণপার্ষদদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত রসের বিনিময় হয়, সেই রস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণভক্তেরা কখনও কখনও কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে তাঁদের স্বরূপ বিস্মৃত হন; আবার কখনও কখনও তাঁরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক বলে মনে করেন, কিন্তু তবুও তাঁরা অধিকতর রসমাধুর্য আস্বাদন করেন। সাধারণ মানুষ মূর্খতাবশত ভগবানের দাসত্ব করার অপ্রাকৃত রসের কথা বিস্মৃত হয়ে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। কিন্তু জীব যখন মনের সমস্ত দ্বিধা মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়, তখনই পারমার্থিক মার্গে তার যথার্থ উন্নতি সাধিত হয়।

শ্লোক ১০৫-১০৬

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্যরসামৃত করে পান ।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

বলদেব, লক্ষ্মণ, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, শেষ ও সঙ্কর্ষণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও দাসরূপে জেনে কৃষ্ণের মাধুর্য রসামৃত পান করেন। সেই সুখে মত্ত হয়ে তাঁদের আর অন্য কোন কথা স্মরণ থাকে না।

শ্লোক ১০৭

অন্যের আছুক্ কার্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ ।
আপন-মাধুর্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

অন্যের কি কথা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজের মাধুর্য পান করার জন্য সতৃষ্ণ হন।

শ্লোক ১০৮

স্বমাধুর্য আস্বাদিতে করেন যতন ।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তাঁর নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তভাব বিনা সেই রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের অপ্রাকৃত ভাব আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ১০৯

ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্বভাবে পূর্ণ ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করে সর্বভাবে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ১১০

নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য পান ।
পূর্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তভাব অঙ্গীকার করে তিনি নানাভাবে স্বমাধুর্য পান করেন। সেই সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি।

তাৎপর্য

গৌরহরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি বিভিন্ন রস আস্বাদন করে সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন ভাবাশ্রিত ভক্তের ভাব গ্রহণ করে সর্বভাবপূর্ণ গৌরচন্দ্র স্বমাধুর্য পান করেন।

শ্লোক ১১১

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার ।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত অবতারদের ভক্তভাবের অধিকার রয়েছে। ভক্তভাব থেকে অধিক আনন্দ আর কিছুতে নেই।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত অবতারদের ভক্তরূপে অবতরণ করে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপে লীলাবিলাস করার অধিকার রয়েছে। কোন অবতার যখন ঈশ্বরভাব উপেক্ষা করে পরম সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবকরূপে লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি অধিক আনন্দ আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১১২

মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

মূল ভক্ত-অবতার হচ্ছেন সঙ্কর্ষণ। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে সেরূপ অবতারদের মধ্যে গণনা করা হয়।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে তিনি তাঁর সেবা করেন। শ্রীবিষ্ণু যখন সেবকরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁকে বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত-অবতার। মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীসঙ্কর্ষণ চতুর্ব্যূহে ঈশ্বররূপে অবস্থিত হয়েও মূল ভক্ত-

অবতার। কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের আর এক প্রকাশ। প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের প্রভাবে নিমিত্ত ও উপাদানরূপ কারণের মাধ্যমে এই জড় জগতের প্রকাশ হয়। অদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার বিষ্ণুতত্ত্ব। সঙ্কর্ষণের সমস্ত প্রকাশ পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। সেই সূত্রে অদ্বৈত আচার্য প্রভু গৌর-কৃষ্ণের নিত্য সেবক। তাই তিনি ভক্ত অবতার।

শ্লোক ১১৩

অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞির মহিমা অপার ।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা অপার, তাঁর ঐকান্তিক হুঙ্কারের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ১১৪

সংকীর্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল ।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সংকীর্তন প্রচার করে তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করলেন। এভাবেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর কৃপার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবৎ প্রেমরূপ সম্পদ লাভ করল।

শ্লোক ১১৫

অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে ।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অনন্ত মহিমা কে বর্ণনা করতে পারে? মহাজনদের কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, তাই এখানে লিখছি।

শ্লোক ১১৬

আচার্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণে আমি কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি। অতএব দয়া করে আমার কোন অপরাধ নেবেন না।

শ্লোক ১১৭

তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র অগাধ ।
তাহার ইয়ত্তা কহি,—এ বড় অপরাধ ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তোমার মহিমা কোটি কোটি সমুদ্রের মতো অগাধ। তাকে সীমিত করে বর্ণনা করা এক মহা অপরাধ।

শ্লোক ১১৮

জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

(জয়) শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! (জয়) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! (জয়) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়!

শ্লোক ১১৯

দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই দুই শ্লোকে আমি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর তত্ত্ব নিরূপণ করলাম। এখন, হে ভক্তগণ! দয়া করে পঞ্চতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ শ্রবণ করুন।

শ্লোক ১২০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণ

শ্লোক ১

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্‌ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥

অগতি—সব চাইতে পতিতের; **এক**—কেবল এক; **গতিম্**—গতি; **নত্বা**—প্রণতি নিবেদন করে; **হীন**—হীন; **অর্থ**—পরমার্থ; **অধিক**—তার থেকে বেশি; **সাধকম্**—প্রদাতা; **শ্রীচৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **লিখ্যতে**—বর্ণনা করছি; **অস্য**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **প্রেম**—প্রেম; **ভক্তি**—ভক্তি; **বদান্যতা**—বদান্যতা।

অনুবাদ

অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরমার্থহীন ব্যক্তির মহৎ-অর্থসাধক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে, তাঁর প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব অত্যন্ত অসহায়, কিন্তু মায়ার প্রভাবে বদ্ধ জীব মনে করে, সে তার দেশ, সমাজ, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। সে জানে না যে, মৃত্যুর সময় কেউই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। জড়া প্রকৃতির নিয়ম এতই কঠোর যে, মৃত্যুর করাল হস্ত থেকে জড় জগতের কোন নিরাপত্তাই আমাদের রক্ষা করতে পারে না। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৩/৯) বলা হয়েছে, *জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্*—কেউ যদি পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করতে চায়, তা হলে তাঁকে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি—প্রকৃতির এই চারটি নিয়মের কথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে। ভগবানের চরণাশ্রয় না করলে এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সমস্ত বদ্ধ জীবের একমাত্র আশ্রয়। তাই, বুদ্ধিমান মানুষ কোন জড় আশ্রয় অবলম্বন করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন। এই ধরনের মানুষকে বলা হয় অকিঞ্চন, অথবা এই জড় জগতে যার কিছুই নেই। পরমেশ্বর ভগবানকেও বলা হয় অকিঞ্চনগোচর, কেন না এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতি যাঁর আসক্তি নেই, তিনিই কেবল তাঁকে লাভ করতে পারেন। তাই, যে সমস্ত মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছেন এবং এই জড় জগতের কোন কিছুর প্রতিই যাঁর আসক্তি নেই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তাঁদের একমাত্র আশ্রয়।

সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রত্যাশী, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অপার করুণার প্রভাবে মোক্ষের থেকেও বড় বস্তু দান করতে পারেন। তাই এই শ্লোকে *হীনার্থাধিকসাধকম্* বলতে বোঝানো হয়েছে যে, জাগতিক বিচারে মুক্তি ধর্ম, অর্থনৈতিক

উন্নতি এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের থেকে শ্রেয়, কিন্তু মুক্তির থেকেও শ্রেয় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সেই প্রেমভক্তির প্রদাতা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *প্রেমা পুমর্থো মহান্*—"ভগবৎ-প্রেম হচ্ছে জীবের পরম পুরুষার্থ।" *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি প্রদানে তাঁর মহাবদান্যতা বর্ণনা করার পূর্বে তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ২

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত, সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! যিনি তাঁর চরণাশ্রয় করেছেন, তিনিই সব চাইতে ধন্য।

তাৎপর্য

প্রভু মানে হচ্ছে ঈশ্বর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সকল প্রভুদের পরম প্রভু; তাই তাঁকে মহাপ্রভু বলা হয়। কেউ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করেন, তখন তিনি সব চাইতে ধন্য হন, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে তিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হন, যে স্তর মুক্তিরও অতীত।

শ্লোক ৩

পূর্বে গুর্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার ।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে আমি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমি পঞ্চতত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্* শ্লোকে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। সেই শ্লোকে ছয়টি তত্ত্ব রয়েছে, যার মধ্যে গুরুতত্ত্ব ইতিমধ্যেই বর্ণিত হয়েছে। এখন গ্রন্থকার অন্য পাঁচটি তত্ত্ব, যথাক্রমে ঈশতত্ত্ব (ভগবান), প্রকাশতত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ৪

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে ।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তন রঙ্গে ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই পঞ্চতত্ত্ব নিয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহানন্দে সংকীর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম, যাঁর অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে কলিযুগের সুবুদ্ধিমান মানুষেরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করবেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, তাঁর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীগদাধর প্রভু এবং তাঁর তটস্থা শক্তি শ্রীবাস প্রভুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরমেশ্বর ভগবানরূপে তিনি তাঁদের মধ্যে বিরাজমান। সকলেরই জানা উচিত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই এই সমস্ত তত্ত্ব সঙ্গে বিরাজ করেন। তাই যখন আমরা *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ*— এই মহামন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করি, তখন সেই প্রণতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভাবনার অমৃতের প্রচারকরূপে আমরা প্রথমে এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্রের দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করি; তারপর আমরা বলি, **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥** হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে দশটি নাম-অপরাধ রয়েছে, কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ*—এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তনে কোন অপরাধের বালাই নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় মহাবদান্য অবতার, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সব চাইতে উদার অবতার, কেন না তিনি পতিত বদ্ধ জীবের অপরাধ গ্রহণ করেন না। তাই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র **(হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে)** উচ্চারণের পরিপূর্ণ ফল লাভ করতে হলে আমাদের প্রথমে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করার পর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। তা হলে তা অত্যন্ত কার্যকরী হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম করে অনেক ভক্তবেশী প্রবঞ্চক তাদের নিজেদের মনগড়া মহামন্ত্র তৈরি করে। তাদের কেউ গায়, *ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম* অথবা *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।* প্রকৃতপক্ষে, পূর্ণ পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র (*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ*) উচ্চারণ করা উচিত এবং তারপর ষোল নাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম**

হরে হরে কীর্তন করা উচিত। কিন্তু এই সমস্ত নীতিজ্ঞানশূন্য, অবিবেচক লোকেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদত্ত পন্থাকে বিকৃত করে। অবশ্যই, যেহেতু তারাও ভক্ত, তাই তারা তাদের অনুভূতি সেভাবে ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা প্রদর্শিত পন্থা হচ্ছে প্রথমে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করা এবং তারপর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করা।

শ্লোক ৫

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, কেন না চিন্ময় স্তরে সব কিছুই পরম। কিন্তু তা হলেও চিন্ময় স্তরে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এই চিৎ-বৈচিত্র্য আস্বাদন করার জন্য তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নিরূপণ করতে হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে পঞ্চতত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন—পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্ন প্রকার লীলা প্রকাশের জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেন না তাঁরা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ত্ব। কিন্তু নীরস ভাবের ব্যতিক্রমে বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করার জন্য তাঁরা বিবিধ চিৎ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। *বেদে* বলা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—"পরমেশ্বর ভগবানের পরা শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।" *বেদের* এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, চিৎ-জগতে অন্তহীন রস বা বৈচিত্র্য রয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত কোন ভেদ নেই। কিন্তু রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তস্বরূপে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্ত-অবতার রূপে, গদাধর প্রভু ভক্তশক্তিরূপে এবং শ্রীবাস প্রভু শুদ্ধ ভক্তরূপে—এই পঞ্চ প্রকারে বিবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ ও ভক্ত-অবতারই স্বয়ং, প্রকাশ ও অংশরূপে বিষ্ণুতত্ত্ব। ভক্তশক্তি ও শুদ্ধ ভক্ত—বিষ্ণুতত্ত্বের অন্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন শক্তিতত্ত্ব। যদিও ভগবানের চিৎ-শক্তি ও তটস্থা শক্তি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু থেকে অভিন্ন, কিন্তু তা হচ্ছে আশ্রিততত্ত্ব এবং শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন আশ্রয়তত্ত্ব। তাই, যদিও তাঁরা একই স্তরে স্থিত, তবুও অপ্রাকৃত রস আস্বাদনের জন্য বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বৈষম্য কখনই সম্ভব নয়, কেন না উপাস্য ও উপাসককে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চিন্ময় স্তরে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে জানা যায় না।

শ্লোক ৬

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চ-তত্ত্ব-আত্মকম্—পঞ্চতত্ত্বের আত্মস্বরূপ যিনি তাঁকে; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ভক্তরূপ**—ভক্তরূপ; **স্বরূপকম্**—ভক্তস্বরূপ; **ভক্ত-অবতারম্**—ভক্তাবতার; **ভক্ত-আখ্যম্**—ভক্তরূপে পরিচিত; **নমামি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **ভক্ত-শক্তিকম্**—ভগবানের শক্তি।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রাতারূপে তাঁর স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর দেহ অপ্রাকৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে পরমানন্দময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাই বলা হয় ভক্তরূপ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলা হয় ভক্তস্বরূপ। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বিভিন্ন ধরনের ভক্ত রয়েছেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগদাধর ও শ্রীরামানন্দ প্রমুখ ভক্তরা বিভিন্ন শক্তি। এর দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের বাক্য, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়। এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৭

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত রসের উৎস শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ কেউই তাঁর থেকে মহৎ নয় অথবা সমকক্ষও নয়, কিন্তু তবুও তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, যদিও তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয় এবং সমস্ত চিন্ময় রসের উৎস, তবুও তিনি নন্দ মহারাজ ও যশোদা মায়ের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৮

রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রাসনৃত্যের পরম ভোক্তা। তিনি হচ্ছেন ব্রজ-ললনাদের নাগর এবং আর সকলেই হচ্ছেন তাঁর পরিকর।

তাৎপর্য

রাসাদি-বিলাসী শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাসনৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণই উপভোগ করতে পারেন, কেন না তিনি হচ্ছেন বৃন্দাবনের সমস্ত ললনাদের পরম নায়ক। অন্য সমস্ত হচ্ছেন তাঁর ভক্ত ও পার্ষদ। যদিও কেউই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হতে পারে না, তবুও বহু প্রতারক পাষণ্ড রয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের অনুকরণ করে। তারা মায়াবাদী এবং সকলেরই উচিত তাদের থেকে সাবধান থাকা। রাসনৃত্য কেবল শ্রীকৃষ্ণই বিলাস করতে পারেন, অন্য কেউই তা পারে না।

শ্লোক ৯

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পার্ষদগণও তাঁরই মতো মহিমান্বিত।

শ্লোক ১০

একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর ।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

পরম নিয়ন্তা ও পরম পুরুষ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তবুও তাঁর দেহ সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ।

তাৎপর্য

ঈশতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব আদি বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। ঈশতত্ত্ব বলতে পরম চেতন সত্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বোঝায়। *কঠ উপনিষদে* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—"পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমস্ত নিত্য বস্তুর মধ্যে পরম নিত্য এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন।" জীবও নিত্য এবং চেতন শক্তি, কিন্তু আয়তনগত ভাবে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আর পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম চেতন এবং পরম নিত্য। পরম নিত্য কখনই জড়া প্রকৃতিজাত অনিত্য দেহ ধারণ করেন না, কিন্তু সেই পরম নিত্যের অংশ জীবের সেই প্রবণতা রয়েছে। এভাবেই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অসংখ্য জীবের একমাত্র পরম প্রভু।

মায়াবাদী দার্শনিকেরা অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের সমপর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করে না, তাই তাদের দর্শনকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ। বাস্তবিকই, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই শ্লোকটিতে মায়াবাদীদের বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হয়েও তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনীয় বস্তু বিচারে তাঁরই সেবাভাবময় বিগ্রহ ধারণ করেন।

ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মনুষ্যরূপ ধারণ করে এই জগতে অবতীর্ণ হন, তখন মূর্খ লোকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। যারা এই রকম ভ্রান্ত বিচার করে তাদের বলা হয় মূঢ়। তাই, মূর্খের মতো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, কিন্তু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বহু নকল অবতার বেরিয়েছে, যারা বুঝতে পারে না যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কোন সাধারণ মনুষ্য নন। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা কোন সাধারণ মানুষকে ভগবান বলে প্রচার করে তাদের নিজেদের ভগবান তৈরি করে। সেটি তাদের মস্ত বড় ভুল। তাই এখানে *তাঁর শুদ্ধ কলেবর* এই কথাটির দ্বারা সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহ জড় নয়, তা বিশুদ্ধ চিন্ময়। তাই, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও তাঁকে একজন সাধারণ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। সেই সঙ্গে আমাদের এটিও বুঝতে হবে যে, যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু যেহেতু তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই তাঁর এই লীলাভেদের জন্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সমপর্যায় ভুক্ত করাও উচিত নয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরমেশ্বর হলেও, সেবকোচিত লীলা প্রদর্শনকারী, অর্থাৎ ভক্তের লীলা প্রদর্শনকারী। তাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে যদি কেউ কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বলে সম্বোধন করতেন, তখন এই ভগবান সম্বোধন না শোনার জন্য তিনি কানে আঙুল দিতেন। গৌরাঙ্গ-নাগরী নামক এক শ্রেণীর তথাকথিত ভক্ত রয়েছে, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করে। এটি একটি মস্ত বড় ভুল এবং একে বলা হয় রসাভাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভক্তভাব অবলম্বন করেছেন, তখন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করে বিরক্ত করা উচিত নয়।

শ্লোক ১১

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রসের এমনই এক স্বভাব রয়েছে যে, সেই রস পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্বন করেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, তবুও নিজেকে আস্বাদন করার জন্য তিনি ভক্তভাব অবলম্বন করেন। এর থেকে বুঝতে হবে, ভক্তরূপে আবির্ভূত হলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাই বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন, *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধা-কৃষ্ণ নহে অন্য*—"রাধা-কৃষ্ণের মিলিত তনুই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।" আর শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেছেন, *চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্*—রাধা ও কৃষ্ণ এক হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

শ্লোক ১২

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি ।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই কারণে পরম শিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব অবলম্বন করেন এবং ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন।

শ্লোক ১৩

'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য-গোসাঞি ।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত-অবতার। তাই এই তিন তত্ত্ব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু) হচ্ছেন ঈশ্বরতত্ত্ব বা প্রভু।

তাৎপর্য

গোসাঞি মানে হচ্ছে 'গোস্বামী'। যিনি তাঁর মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্পূর্ণরূপে দমন করেছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী বা *গোসাঞি*। যিনি তা পারেন না তাকে বলা হয় *গোদাস* বা ইন্দ্রিয়ের দাস এবং সে কখনও গুরু হতে পারে না। যিনি মন ও ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করতে পেরেছেন, তিনি গোস্বামী এবং তিনিই হচ্ছেন গুরু। যদিও একশ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞান রহিত মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে এই গোস্বামী উপাধি ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই *গোসাঞি* বা গোস্বামী উপাধির শুরু হয় শ্রীল রূপ গোস্বামী থেকে, যিনি গৃহস্থ-আশ্রমে বাংলার নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অবলম্বন করার ফলে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখনই তিনি গোস্বামীতে পরিণত হলেন। সুতরাং গোস্বামী কোন বংশানুক্রমিক উপাধি নয়, তা হচ্ছে বিশেষ যোগ্যতাসূচক উপাধি। কেউ যখন পারমার্থিক স্তরে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন, তখন

তিনি যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি গোস্বামী উপাধিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞি প্রভু হচ্ছেন স্বাভাবিক ভাবেই গোস্বামী, কেন না তাঁরা হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। সেই হেতু, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন প্রভু এবং কখনও কখনও তাঁদের চৈতন্য গোসাঞি, নিত্যানন্দ গোসাঞি ও অদ্বৈত গোসাঞি বলা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, যাদের গোস্বামীসুলভ কোন যোগ্যতাই নেই, তাদের তথাকথিত বংশধরেরা বংশানুক্রমিকভাবে অথবা পেশাগতভাবে এই উপাধি অবলম্বন করেছেন। এই আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয়।

শ্লোক ১৪

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন ।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের একজন হচ্ছেন মহাপ্রভু এবং অন্য দুজন হচ্ছেন প্রভু। এই দুই প্রভু মহাপ্রভুর চরণ-কমলের সেবা করেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সকলেই হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং অন্য দুই প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত হওয়ার জন্য তাঁর সেবা করার মাধ্যমে সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* আর এক জায়গায় (*আদি* ৫/১৪২) বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—"একমাত্র ঈশ্বর হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সকলেই অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের সেবক।" বিষ্ণুতত্ত্ব (নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভু) এবং জীবতত্ত্ব (শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ) উভয়েই মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত, তবে বিষ্ণুতত্ত্ব সেবকের এবং জীবতত্ত্ব সেবকের পার্থক্যের কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। জীবতত্ত্ব সেবক গুরুদেব হচ্ছেন সেবক ঈশ্বর। পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে কোন বিভেদ নেই, কিন্তু তবুও ঈশ্বরতত্ত্ব এবং সেবক-তত্ত্বের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য এই ভেদ রয়েছে।

শ্লোক ১৫

এই তিন তত্ত্ব,—'সর্বারাধ্য' করি মানি ।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' জানি ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই তিন তত্ত্ব (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু) হচ্ছেন সমস্ত জীবের উপাস্য, আর চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব (শ্রীগদাধর প্রভু) তিনি হচ্ছেন তাঁদের উপাসক।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করার সময় ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা পরম আরাধ্য বলে বুঝতে পারি এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যদিও তাঁর অধীন তত্ত্ব, তবুও তাঁরাও হচ্ছেন আরাধ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন ভগবানের প্রকাশ। তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং তাই তাঁরা জীবের উপাস্য। যদিও পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত দুটি তত্ত্ব—শক্তিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব, অর্থাৎ গদাধর ও শ্রীবাস হচ্ছেন ভগবানের উপাসক, তবুও তাঁরা একই স্তরে অধিষ্ঠিত, কেন না তাঁরা নিত্যকাল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

শ্লোক ১৬

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাসাদি ভগবানের আর যে অনন্ত কোটি ভক্ত রয়েছেন, তাঁরা সকলেই হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ততত্ত্ব।

শ্লোক ১৭

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার ।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিতাদি ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের শক্তি-অবতার। তাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত।

তাৎপর্য

ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোক সম্বন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে বিশ্লেষণ করেছেন—"কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ভগবানের অন্তরঙ্গ ও শুদ্ধ ভক্ত চেনা যায়। ভগবানের সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা হচ্ছেন শক্তিতত্ত্ব। তাঁদের কেউ মধুর-রসে, কেউ বাৎসল্য রসে, কেউ সখ্যরসে এবং কেউ দাস্যরসে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা সকলেই ভক্ত, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, মাধুর্যরসে ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্ত অন্য সকলের থেকে শ্রেয়। এভাবেই মধুর রসে নিত্য আশ্রিত ভক্তরাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবকেরা সাধারণত বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্তরসে অবস্থিত। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরাও যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি-পরায়ণ হন, তখনই তাঁরা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর রসাশ্রিত হন।" ভগবদ্ভক্তির এই ক্রমোন্নতি বর্ণনা করে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর ।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর ক'বে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব শ্রীযুগল-পিরীতি ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গ্রহণ করার ফলে কবে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হবে এবং ভগবানের পবিত্র নাম গ্রহণের ফলে কবে আমার চোখ দিয়ে অনর্গল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হবে? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কবে আমাকে করুণা করবেন এবং কবে তিনি সংসার-বাসনা থেকে আমাকে মুক্ত করবেন? যখন আমার মন সর্বপ্রকার জড় কলুষ থেকে মুক্ত হবে, তখনই কেবল আমার পক্ষে শ্রীবৃন্দাবন ধাম যথাযথভাবে দর্শন করা সম্ভব হবে। আমি যদি কেবল রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রমুখ ষড় গোস্বামীর নির্দেশের প্রতি আসক্ত হই, তা হলেই কেবল আমার পক্ষে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি আসক্তির ফলে ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভাবের স্তরে উন্নীত হন। কেউ যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হন, তখন তিনি সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং ভগবানের বৃন্দাবনলীলা হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্য হন। আর সেই স্তরে তিনি যখন ষড় গোস্বামীর আনুগত্য বরণ করেন, তখন তিনি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল প্রেম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এগুলি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত হয়ে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমভক্তির স্তরে শুদ্ধ ভক্তের উন্নীত হওয়ার বিভিন্ন স্তর।

শ্লোক ১৮-১৯

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার ।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্তন-প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন ।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত বা শক্তিসমূহ ভগবানের লীলার নিত্যপার্ষদ। তাঁদের নিয়েই কেবল ভগবান তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন, তাঁদের নিয়েই কেবল ভগবান প্রেমরস আস্বাদন করেন এবং তাঁদের নিয়েই কেবল তিনি জনসাধারণকে প্রেমধন দান করেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে শ্রীল রূপ গোস্বামী *উপদেশামৃত* গ্রন্থে নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতির কথা বর্ণনা করেছেন। হাজার হাজার কর্মীর থেকে একজন বেদজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেয়। এই রকম হাজার হাজার তত্ত্বজ্ঞানীর থেকে একজন জড় বিষয় মুক্ত ব্যক্তি শ্রেয় এবং কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের থেকে একজন কৃষ্ণভক্ত শ্রেয়। এই রকম বহু ভগবৎ-প্রেমীদের মধ্যে ব্রজগোপিকারা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা এবং সমস্ত ব্রজগোপিকাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠা। শ্রীমতী রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া, তেমনই তাঁর কুণ্ড রাধাকুণ্ডও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন যে, পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে দুজন হচ্ছেন শক্তিতত্ত্ব, অপর তিনজন হচ্ছেন শক্তিমান-তত্ত্ব। শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ উভয় ভক্তরা জ্ঞান ও স্বকাম কর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত। তাঁদের সকলকেই শুদ্ধ ভক্ত বলে বুঝতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা মাধুর্য রসে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত তাঁদের বলা হয় মাধুর্য রসের ভক্ত বা অন্তরঙ্গ ভক্ত। বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরস মাধুর্য প্রেমের অন্তর্ভুক্ত। তাই, এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রতিটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসহ তাঁর লীলা আস্বাদন করেন। তাঁর শুদ্ধ ভক্ত এবং কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষাবতার সংকীর্তন প্রচার করার জন্য সর্বদাই ভগবানের সঙ্গে থাকেন।

শ্লোক ২০-২১

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া ।
পূর্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন ।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপ্রাকৃত প্রেমের ভাণ্ডার। যদিও পূর্বে যখন কৃষ্ণ এসেছেন তখন সেই প্রেমভাণ্ডারও তাঁর সঙ্গে এসেছে এবং তা ছিল শীলমোহর দিয়ে রুদ্ধ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পঞ্চতত্ত্ব সহ অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁরা শীলমোহর ভেঙ্গে সেই কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে সেই প্রেম আস্বাদন করলেন। আর যতই তাঁরা সেই প্রেমরস আস্বাদন করলেন, ততই তাঁদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় মহাবদান্য অবতার, কেন না যদিও তিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবুও তিনি দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বেশি করুণা প্রদর্শন

করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে এসেছিলেন, তখন তিনি কেবল শরণাগত ভক্তদেরই রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সপার্ষদ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি কোন যোগ্যতার অপেক্ষা না করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নন, কেন না পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া অন্য কেউ অত্যন্ত দুর্লভ এই ভগবৎ-প্রেম এভাবে দান করতে পারেন না।

শ্লোক ২২

পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত ।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই পঞ্চতত্ত্ব স্বয়ংই পুনঃপুনঃ সেই ভগবৎ প্রেমামৃত অত্যন্ত সহজ সরলভাবে সকলকে পান করিয়ে প্রেমোন্মত্ত হলেন। তাঁরা সেই আনন্দে এমনভাবে নাচতেন, কাঁদতেন, হাসতেন, গান করতেন, তা দেখে মনে হত যেন তাঁরা উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন।

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত কীর্তন ও নৃত্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। গোস্বামীদের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীনিবাস আচার্য বলেছেন, *কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ*—কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর পার্ষদেরাই নৃত্য, কীর্তন করেননি, পরবর্তীকালে ষড় গোস্বামীরাও সেই পন্থার অনুসরণ করেছেন। বর্তমানে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনও এই পন্থার অনুগামী। তাই, কেবল কীর্তন করে এবং নৃত্য করে আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবলভাবে সাড়া পেয়েছি। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই নৃত্য-কীর্তন জড় জগতের বস্তু নয়। তা হচ্ছে চিন্ময় ক্রিয়া, কেন না মানুষ যতই এই নৃত্য-কীর্তনে যোগদান করেন, ততই তিনি ভগবৎ প্রেমামৃত আস্বাদন করেন।

শ্লোক ২৩

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদেরা কে যোগ্য কে অযোগ্য সেই কথা বিচার না করে, স্থান-অস্থানের বিচার না করে, যেখানে যাকে পেয়েছেন, তাঁকেই ভগবৎ-প্রেম দান করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ ইউরোপীয়ান ও

আমেরিকানদের ব্রাহ্মণত্ব দান করছে এবং সন্ন্যাস-আশ্রমে অধিষ্ঠিত করছে বলে কিছু মূর্খ মানুষ এই আন্দোলনের সমালোচনা করে। কিন্তু এখানে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে, মহাপ্রভু প্রদত্ত এই ভগবৎ-প্রেম বিতরণে ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বিচার নেই। যেখানে সম্ভব সেখানেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করতে হবে। এভাবেই যাঁরা বৈষ্ণব হন, তাঁদের তথাকথিত ব্রাহ্মণ, হিন্দু অথবা ভারতীয়দের থেকে অনেক উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ভগবানের নামের প্রচার হোক। অতএব সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পন্থার যখন প্রচার হল, তখন যাঁরা তা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন, তাঁদের কি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করা হবে না? মূর্খের মতো যারা তার প্রতিবাদ করে, তারা ঈর্ষাপরায়ণ একদল পাষণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃষ্ণভক্তেরা তাদের সেই কথায় কর্ণপাত করেন না। আমরা যে পন্থার অনুসরণ করছি, তা পঞ্চতত্ত্ব প্রবর্তিত পন্থা।

শ্লোক ২৪

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে ।
আশ্চর্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই পঞ্চতত্ত্ব যদিও সেই প্রেমভাণ্ডার লুটপাট করে খেয়ে এবং বিতরণ করে তা উজাড় করলেন, কিন্তু তাতে তা ফুরিয়ে গেল না। পক্ষান্তরে, সেই আশ্চর্য ভাণ্ডার যতই বিতরণ করা হল, ততই তা শত শত গুণে বর্ধিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে পরিচয় দানকারী এক ভণ্ড একবার তার শিষ্যকে বলেছিল যে, সমস্ত জ্ঞান তাকে দান করার ফলে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের ভণ্ডরা মানুষকে প্রতারণা করার জন্য এভাবেই কথা বলে। কিন্তু প্রকৃত পরমার্থ-চেতনা এমনই পূর্ণ যে, তা যতই বিতরণ করা যায়, ততই বাড়তে থাকে। জড় জগতে যখন কোন বস্তু বিতরণ করা হয়, তখন তার পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু চিন্ময় জগতের ভগবৎ-প্রেম বিতরণের ফলে কখনই তা পরিমাণে কমে না। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত কোটি জীবের সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করছেন, আর সেই অনন্ত কোটি জীব যদি কৃষ্ণভাবনাময় হতে চায়, তা হলে ভগবৎ-প্রেমের কোন অভাব হবে না এবং তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিরও অভাব হবে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আমি এককভাবে শুরু করেছিলাম এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য কেউ কোন রকম সাহায্য করেনি, কিন্তু আজ আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছি এবং এই আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সুতরাং অভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদিও ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা আমাদের হিংসা করতে পারে, কিন্তু আমরা যদি আমাদের আদর্শে অবিচলিত

থেকে পঞ্চতত্ত্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তা হলে ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সমস্ত বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এই আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকবে, কেন না এই আন্দোলন সব রকম জড় প্রভাবের অতীত। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকদের কখনই এই ধরনের মূর্খ ও পাষণ্ডদের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায় ।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায় ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমের বন্যা উথলে উঠে চারিদিকে বিস্তৃত হতে লাগল এবং তার ফলে স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবক সকলেই এই প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত হল।

তাৎপর্য

এভাবেই যখন প্রেমভাণ্ডারের ভগবৎ-প্রেম বিতরণ হয়, তখন তা বন্যার মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীধাম মায়াপুরে কখনও কখনও বর্ষার প্লাবন হয়। এটি একটি ইঙ্গিত যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান থেকে ভগবৎ-প্রেমের বন্যা সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করবে, কেন না তা স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবক, সকলকেই সাহায্য করবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই শক্তিশালী যে, তা সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করতে পারে এবং সর্বস্তরের মানুষকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

শ্লোক ২৬

সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করল এবং সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধ আদি সকলেই তাতে ডুবে গেল।

তাৎপর্য

এখানে আবার উল্লেখ করা যায়, যদিও ঈর্ষাপরায়ণ পাষণ্ডরা প্রতিবাদ করে যে, ইউরোপীয় ও আমেরিকানরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করার অথবা সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করার যোগ্য নন, কিন্তু তাদের একবার বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, সজ্জন-দুর্জন নির্বিশেষে সকলেই এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারেন, কেন না এই আন্দোলন রক্ত-মাংসের তৈরি জড় দেহের অপেক্ষা করে না। যেহেতু এই আন্দোলন পঞ্চতত্ত্বের অধ্যক্ষতায় কঠোরভাবে শুদ্ধ ভক্তির সহায়ক বিধি-নিষেধগুলি পালন করে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তাই কোন বাহ্যিক প্রতিবন্ধক এই আন্দোলনকে বাধা দিতে পারে না।

শ্লোক ২৭

জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজ নাশ ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্বের এই পাঁচ জন যখন দেখলেন যে, ভগবৎ-প্রেমে সমস্ত জগৎ নিমজ্জিত হয়েছে এবং জীবের জড় ভোগবাসনার বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে, তখন তাঁদের পরম উল্লাস হল।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন যে, যেহেতু জীব ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত, তাই প্রতিটি জীবেরই কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, যদিও সেই সঙ্গে জড় জগৎকে ভোগ করার বীজও তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অবস্থিত। এই ভোগবাসনার বীজগুলিতে যখন জড়া প্রকৃতির প্রলোভনগুলির দ্বারা জলসিঞ্চিত হয়, তখন তা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে জড় বন্ধনরূপ মহীরুহে পরিণত হয় এবং তার ফলে জীব সব রকম জড় ভোগের প্রতি আসক্ত হয়। এই জড় ভোগের আসক্তি ত্রিতাপ দুঃখ সমন্বিত। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে যখন বন্যা হয়, তখন বীজ যেমন আর অঙ্কুরিত হতে পারে না, তেমনই সারা পৃথিবী যখন ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হয়, তখন জড় ভোগবাসনার বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের যতই প্রসার হবে, ততই জড় ভোগাসক্তি কমে যাবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে, এই ভোগবাসনার বীজ আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, সেই জন্য ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত। সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, *পরম উল্লাস*। কিন্তু যেহেতু তারা হচ্ছে কনিষ্ঠ অধিকারী বা প্রাকৃত ভক্ত (পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান রহিত জড় বিষয়াসক্ত ভক্ত), তাই তারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এবং তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভুলত্রুটি দেখার চেষ্টা করছে। তবুও শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর *চৈতন্যচন্দ্রামৃত* গ্রন্থে লিখেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিষয়ীরা তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সম্বন্ধে কথা বলতে বিরক্তি অনুভব করেন, তথাকথিত জ্ঞানীরা বেদপাঠ বর্জন করেন, যোগীরা ক্লেশকর যোগসাধনা ত্যাগ করেন, তপস্বীরা কঠোর তপশ্চর্যা ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসীরা সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন বর্জন করেন। এভাবেই তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিযোগ অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নত রসমাধুর্য আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ২৮

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে ।
তত তত বাঢ়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্বের পাঁচ জন যতই এই ভগবৎ প্রেমবৃষ্টি বর্ষণ করেন, ততই সেই প্রেম-বন্যার জল বাড়তে থাকে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সীমিত ও গতিহীন নয়। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ম্লেচ্ছদের সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ হওয়ার পক্ষে মূর্খ ও পাষণ্ডীদের বাধা প্রদান সত্ত্বেও এই আন্দোলন সারা পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সারা পৃথিবী কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত হবে।

শ্লোক ২৯-৩০

মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল ।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী, সকাম কর্মী, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডী ও অধম পড়ুয়া, এরা সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মহাদক্ষ এবং তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের বন্যা তাদের স্পর্শ করতে পারল না।

তাৎপর্য

কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অতীতের মায়াবাদী দার্শনিকদের মতো আধুনিক যুগের মায়াবাদীরাও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে উৎসাহী নয়। এই জড় জগতের মূল্য তারা বোঝে না; তারা মনে করে এটি মিথ্যা এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন যে কিভাবে তার সদ্ব্যবহার করতে পারে, তা তারা বুঝতে পারে না। তারা তাদের নির্বিশেষবাদী চিন্তায় এতই মগ্ন যে, তারা মনে করে সব রকম চিন্ময় বৈচিত্র্য হচ্ছে জড়। যেহেতু তারা ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণার অতীত আর কিছুই জানে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চিন্ময় এবং তাই তিনি মায়ার অতীত। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতরণ করেন অথবা ভক্তরূপে অবতরণ করেন, তখন মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) তার নিন্দা করা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার অপ্রাকৃত পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা জানে না যে, আমিই হচ্ছি সব কিছুর অধীশ্বর।"

অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চক রয়েছে, যারা ভগবানের অবতরণের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে সরল চিত্ত মানুষদের প্রতারণা করে। ভগবানের অবতার শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হন এবং তিনি এমন সব অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন, যা কোন মানুষের পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কোন মূর্খ পাষণ্ডীকে কখনই ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তার পরম ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করে দেখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা দান করেছিলেন এবং অর্জুন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু আমাদের বোঝাবার জন্য অর্জুন ভগবানকে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন। এভাবেই পরীক্ষা হয়েছিল তিনি যথার্থই ভগবান কি না। তেমনই আদর্শ মানদণ্ড অনুসারে তথাকথিত অবতারদেরও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। কতকগুলি ভেলকিবাজি দেখে, অথবা একটু-আধটু যোগসিদ্ধি দেখে কাউকে ভগবান বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে, শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে তথাকথিত সমস্ত ভগবানের অবতারদের পরীক্ষা করে দেখা সবচেয়ে ভাল। শাস্ত্রসমূহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণ করার চেষ্টা করে দম্ভ করে যে, সে হচ্ছে ভগবানের অবতার, তা হলে তাকে সেই দাবি প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর আবির্ভাব সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ দেখাতে হবে।

শ্লোক ৩১-৩২

তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন ।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী ও অন্যান্য ভগবৎ-বিদ্বেষীদের পালাতে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, "আমি সমস্ত জগৎকে ভগবৎ-প্রেমের বন্যায় নিমজ্জিত করতে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু তাদের কেউ কেউ এড়িয়ে গেল। তাই তাদের সকলকে ডুবাবার জন্য আমি কিছু কৌশল উদ্ভাবন করব।"

তাৎপর্য

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মায়াবাদী এবং অন্য যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চাইছিল না, তাদের পাকড়াও করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে আচার্যের লক্ষণ। ভগবানের সেবা করতে আসেন যে আচার্য, তিনি গতানুগতিকভাবে তাঁর কাজ করেন না, কেন না কৃষ্ণভাবনার অমৃত যাতে প্রচার হয়, সেই জন্য তাঁকে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়।

ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করছেন বলে ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমালোচনা করে। তারা জানে না যে, ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে খুব খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করে। তাই এই সমস্ত মূর্খ সমালোচকদের বিবেচনা করা উচিত যে, কোন সমাজের সামাজিক রীতি-নীতি হঠাৎ পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু, যেহেতু এই সমস্ত ছেলে-মেয়েরা ভগবানের বাণী প্রচার করার শিক্ষা লাভ করছে, তাই এই সমস্ত মেয়েরা কোন সাধারণ মেয়ে নয়, তারা হচ্ছে তাদেরই ভাইদের মতো কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারক। এভাবেই ছেলেদের ও মেয়েদের সম্পূর্ণ চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের একটি পদ্ধতি। যে সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ মূর্খরা ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার সমালোচনা করে, তাদের নিজেদের মূর্খতায় আচ্ছন্ন থেকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কেন না বিভিন্ন উপায় অবলম্বন-পূর্বক কিভাবে যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করা যায়, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে তারা কখনই কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সক্ষম হবে না। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা যা করছি, সেটিই হচ্ছে যথার্থ পন্থা, কারণ কৃষ্ণবিমুখ মানুষদের কৃষ্ণপ্রেম দান করার জন্য তিনি নিজেও উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৩

এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার ।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বিবেচনা করে মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রম অঙ্গীকার করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এবং তাই জড় দেহাত্মবুদ্ধির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে চতুর্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেননি। তিনি বিভুচৈতন্য রূপে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা যে কোন শুদ্ধ ভক্ত কখনই সামাজিক ও পারমার্থিক উপাধির দ্বারা পরিচিত হন না, কেন না ভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন, কেন না তা হলে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তার ফলে তাদের মঙ্গল হবে। যদিও তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তবুও যারা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করছিল, তাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করা। তা এই অধ্যায়ের শেষ দিকে প্রতীয়মান হবে।

'মায়াবাদী' কথাটির ব্যাখ্যা করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন— "পরমেশ্বর ভগবান জড়ের অতীত। অতএব মায়াবাদী হচ্ছে সে, যে মনে করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ মায়ার দ্বারা রচিত এবং যে মনে করে ভগবৎ-ধাম, ভগবানের অনুগত হওয়ার পন্থা এবং ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে মায়া। মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তির সমস্ত উপকরণ হচ্ছে মায়া।" *মায়া* মানে হচ্ছে জড় অস্তিত্ব, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকাম কর্ম এবং তার ফল। মায়াবাদীরা মনে করে যে, ভগবদ্ভক্তিও হচ্ছে এই রকম সকাম কর্ম। তাদের মতে ভাগবত বা ভক্ত যখন জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র হয়, তখন তারা মুক্তির স্তরে আসবে। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যারা এভাবেই অনুমান করে তাদের বলা হয় *কুতার্কিক* এবং যারা ভগবদ্ভক্তিকে সকাম কর্ম বলে মনে করে, তাদের বলা হয় *কর্মনিষ্ঠ*। যারা ভগবদ্ভক্তির সমালোচনা করে তাদের বলা হয় *নিন্দক*। তেমনই, যে সমস্ত অভক্ত ভগবানকে অন্যান্য দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তাদের বলা হয় *পাষণ্ডী*। যে সমস্ত পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলে নির্ণয় করে এবং বিদ্যা যে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়, তা জানে না, তাদের বলা হয় *অধম পড়ুয়া*।

কুতার্কিক, নিন্দক, পাষণ্ডী, অধম পড়ুয়া এরা সকলেই প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল যাতে তাদের কোনমতে স্পর্শ করতে না পারে, সেই রকম উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে পালিয়ে গেল। তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রতি করুণা অনুভব করেন এবং সেই জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, কেন না সন্ন্যাসীরূপে তাঁকে দেখে তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হবে। ভারতবর্ষে আজও সন্ন্যাসীরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। সন্ন্যাসীর পোশাক পরিহিত যে কোন মানুষের প্রতিই ভারতবাসীরা শ্রদ্ধাশীল। তাই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন না থাকলেও, ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে ।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্মে ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ-আশ্রমে ছিলেন এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষের শুরুতে তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করলেন।

তাৎপর্য

জীবনের চারটি আশ্রম হচ্ছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই আশ্রমের প্রতিটির আবার চারটি করে ভাগ রয়েছে। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ভাগগুলি হচ্ছে—*সাবিত্র, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম* ও *বৃহৎ*। গৃহস্থ-আশ্রমের ভাগগুলি হচ্ছে—*বার্তা* (অনিষিদ্ধ কৃষি আদি বৃত্তি), সঞ্চয় (যাজন আদি বৃত্তি), শালীন (অযাচিত বৃত্তি) এবং শিলোঞ্ছন (ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্যকণিকা কুড়িয়ে জীবন ধারণরূপ বৃত্তি)। তেমনই বানপ্রস্থ-আশ্রমের চারটি ভাগ হচ্ছে—বৈখানস, বালখিল্য, ঔডুম্বর ও ফেণপ। আর সন্ন্যাস-আশ্রমের চারটি ভাগ হচ্ছে—কুটীচক, বহূদক, হংস ও নিষ্ক্রিয়। সন্ন্যাস দুই প্রকার—ধীর ও নরোত্তম। এই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৩/২৬-২৭) বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪৩২ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীকেশব ভারতীর কাছ থেকে কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৩৫

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার্কিক আদি যারা সকলে তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের আকর্ষণ করলেন।

শ্লোক ৩৬

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী, নিন্দকাদি যত ।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

যত পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী ও নিন্দুক ছিল, তারা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ-কমলে শরণাগত হল।

শ্লোক ৩৭

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে ।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং তারা সকলে ভগবৎ প্রেমামৃতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অভিনব প্রেমরূপী জাল কে এড়াতে পারে?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন আদর্শ আচার্য। আচার্য হচ্ছেন সেই আদর্শ শিক্ষক, যিনি শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত, যিনি শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন এবং যিনি তাঁর শিষ্যদের সেই তত্ত্ব অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করেন। একজন আদর্শ আচার্যরূপে সব রকমের নাস্তিক ও জড়বাদীদের আকর্ষণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন উপায়

উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রত্যেক আচার্য মানুষকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর পারমার্থিক আন্দোলন প্রচার করার বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেন। তাই, একজন আচার্যের পন্থা অন্য আচার্যের পন্থা থেকে ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য কিন্তু চরমে একই থাকে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

যেন তেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ।
সর্বে বিধি-নিষেধাস্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে এমন সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করা, যার দ্বারা কোন না কোনভাবে মানুষকে কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করা যায়। প্রথমে তাদের কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করাতে হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই পন্থা অনুসরণ করছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছেলে-মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে, তাই কৃষ্ণভক্তির পথে তাদের নিয়ে আসার জন্য তাদের অভ্যাস এবং সামাজিক রীতিনীতিগুলির যথাযথভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে, মানুষকে ভগবদ্ভক্তির পথে নিয়ে আসার উপায় উদ্ভাবন করা। সুতরাং, যদিও আমি সন্ন্যাসী তবুও আমি কখনও কখনও ছেলে-মেয়েদের বিবাহে অংশ গ্রহণ করি। অথচ সন্ন্যাসীর ইতিহাসে কখনও কোন সন্ন্যাসী তাঁর শিষ্যের বিবাহ-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেননি।

শ্লোক ৩৮

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার ।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য। তাই মায়ার কবল থেকে তাদের সকলকে উদ্ধার করার জন্য তিনি নানা রকমের চাতুরী অবলম্বন করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্যের কর্তব্য হচ্ছে অধঃপতিত জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা। এই সম্পর্কে দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করতে হয়। যেহেতু আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ইউরোপীয় ও আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা মিলিতভাবে প্রচার করে, তাই অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা সমালোচনা করে যে, তারা অবাধে মেলামেশা করছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ছেলে-মেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে এবং তাদের সমান অধিকার রয়েছে; তাই ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু, আমরা ছেলেদের ও মেয়েদের উভয়কেই শিক্ষা দিয়েছি, কিভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করতে হয় এবং তারা অপূর্ব

সুন্দরভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করছে। অবৈধ সঙ্গ অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বিবাহিত না হলে ছেলে-মেয়েরা একত্রে বসবাস করতে পারে না এবং প্রতিটি মন্দিরে ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। গৃহস্থরা মন্দিরের বাইরে থাকে, কেন না মন্দিরে বিবাহিত পতি-পত্নীর একসঙ্গে থাকাও আমরা অনুমোদন করি না। তার ফলও হয়েছে অপূর্ব। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পূর্ণ উদ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচার করছে। এই শ্লোকে *সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার*—উক্তিটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকেই উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তাই ভগবৎ-বাণীর প্রচারককে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে শাস্ত্রের নির্দেশগুলি মেনে চলতে হবে, আবার সেই সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি ।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তে পরিণত হলেন, এমন কি ম্লেচ্ছ এবং যবনেরাও। কেবল শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীরা তাঁকে এড়িয়ে গেল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও মুসলমান এবং অন্যান্য ম্লেচ্ছদের কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছিলেন, তবুও শঙ্করাচার্যের অনুগামী মায়াবাদীদের মতি ফেরানো গেল না। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকাম কর্মে আসক্ত কর্মনিষ্ঠদের, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু তার্কিকদের, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ নিন্দুকদের, জগাই-মাধাই প্রমুখ পাষণ্ডীদের এবং মুকুন্দ আদি অধম পড়ুয়াদের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তাঁরা সকলেই ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছিলেন, এমন কি পাঠান অথবা মুসলমানেরাও। কিন্তু সব চাইতে বড় অপরাধী মায়াবাদীদের পরিবর্তন করা সব চাইতে দুষ্কর হল, কেন না তারা খুব সতর্কতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পন্থা এড়িয়ে গেল।

কাশীর মায়াবাদীদের বর্ণনা করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, যারা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিমূঢ় এবং যারা সীমিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জগৎ দর্শন করে, তা জড় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা মাপা যায়, এইরূপ অনুমান করে বলে যে, এই জগৎটি মায়ারচিত, তারাই হচ্ছে কাশীর মায়াবাদী। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, যা কিছুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাই হচ্ছে মায়া। তাদের মতে, পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়-অনুভূতির অতীত হলেও তার কোন চিৎ-বৈচিত্র্য নেই, অথবা আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতা নেই। কাশীর মায়াবাদীদের মতে চিৎ-জগৎ নির্বিশেষ, নিরাকার এবং সব রকম বৈচিত্র্যহীন। তারা

পরমতত্ত্বের সবিশেষত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা চিৎ-জগতে তার চিৎ-বৈচিত্র্য সমন্বিত কার্যকলাপে বিশ্বাস করে না। যদিও তাদের নিজেদের যুক্তি রয়েছে, তবে সেগুলি খুব একটা দৃঢ় নয় এবং পরমতত্ত্বের বৈচিত্র্যময় লীলা-বিলাসের কোন ধারণাই তাদের নেই। শঙ্করাচার্যের অনুগামী এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের বলা হয় কাশীর মায়াবাদী।

আর এক রকমের মায়াবাদী হচ্ছে, কাশীর নিকটবর্তী সারনাথের মায়াবাদীরা। কাশী নগরীর ঠিক বাইরেই সারনাথ বলে একটি স্থান রয়েছে, যেখানে এক বিশাল বৌদ্ধস্তূপ রয়েছে। বুদ্ধদেবের অনুগামী বহু দার্শনিক এখানে থাকে এবং তারা সারনাথের মায়াবাদী নামে পরিচিত। সারনাথের মায়াবাদীদের সঙ্গে কাশীর মায়াবাদীদের পার্থক্য হচ্ছে, কাশীর মায়াবাদীরা প্রচার করে যে, ব্রহ্মই হচ্ছে সত্য আর জড় বৈচিত্র্য হচ্ছে মিথ্যা। কিন্তু সারনাথের মায়াবাদীরা মায়ার বিপরীত পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মকে স্বীকার করে না। তাদের মতে জড়বাদই হচ্ছে পরম সত্যের একমাত্র প্রকাশ।

প্রকৃতপক্ষে কাশীর মায়াবাদী ও সারনাথের মায়াবাদী এবং আত্মজ্ঞান রহিত অন্য সমস্ত দার্শনিকেরা সকলেই জড়বাদের প্রচারক। তাদের কারওই পরমতত্ত্ব অথবা চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। সারনাথের মায়াবাদীরা যারা পরমতত্ত্বের চিন্ময় অস্তিত্ব স্বীকার করে না, পক্ষান্তরে তারা মনে করে যে, জড় বৈচিত্র্যই হচ্ছে সব কিছু। তারা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত অপরা (জড়া) ও পরা (চিন্ময়), এই দুই রকমের প্রকৃতি রয়েছে বলেও বিশ্বাস করে না। প্রকৃতপক্ষে, কাশীর মায়াবাদী ও সারনাথের মায়াবাদী, উভয়ই যথার্থ জ্ঞানের অভাবে *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব স্বীকার করে না।

যেহেতু এই সমস্ত মায়াবাদীদের যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান নেই, তাই তারা ভক্তিযোগের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অতএব তারা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের বিরোধী এবং অভক্ত। মাঝে মাঝে এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীদের বিরোধিতায় আমাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তাদের তথাকথিত দর্শনে আমাদের কোন রকম উৎসাহ নেই, কেন না আমাদের নিজেদের দর্শন, যা *ভগবদ্গীতায়* প্রকাশিত হয়েছে তাই আমরা প্রচার করছি এবং আমাদের এই প্রচার প্রবলভাবে সফল হয়েছে। ভগবদ্ভক্তিকে তাদের জল্পনা-কল্পনার বিষয় করে উভয় শ্রেণীর মায়াবাদীরাই সিদ্ধান্ত করছে যে, ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্যটি মায়ারই সৃষ্টি এবং শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও ভক্ত, সবই মায়া। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী* (*চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য* ১৭/১২৯)। তাদের পক্ষে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই তাদের দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল্য আমরা দিই না। তর্কপরায়ণ নির্বিশেষবাদী সমস্ত ভগবৎ-বিমুখ মানুষেরা যত দক্ষতার সঙ্গে তাদের তথাকথিত যুক্তির অবতারণা করুক না কেন, আমরা সর্বতোভাবে তাদের পরাস্ত করে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করে চলি। তাদের মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা কখনই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রগতি ব্যাহত করতে পারবে না, যা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় এবং কখনই এই ধরনের মায়াবাদীদের আয়ত্তাধীন নয়।

শ্লোক ৪০

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে ।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নানাভাবে তাঁর নিন্দা করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পূর্ণ উদ্যমে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করছিলেন, তখন তাঁকে বহু মায়াবাদী দার্শনিকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তেমনই, আমাদেরও বিরোধী স্বামী, যোগী, নির্বিশেষবাদী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য সমস্ত মনোধর্মীদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আমরা অনায়াসে সকলকে পরাস্ত করি।

শ্লোক ৪১

সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন, নাচন ।
না করে বেদান্ত-পাঠ, করে সংকীর্তন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বেদান্ত-পাঠে কোন উৎসাহ নেই, পক্ষান্তরে সে সংকীর্তনে নিরন্তর নাচে এবং গান করে।

তাৎপর্য

সৌভাগ্যবশত অথবা দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের মায়াবাদীদের সাথে আমাদেরও সাক্ষাৎ হয় এবং শাস্ত্রপাঠ না করে নৃত্য-কীর্তন করার জন্য তারা আমাদের সমালোচনা করে। তারা জানে না যে, আমরা বহু গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছি এবং আমাদের মন্দিরের ভক্তরা নিয়মিতভাবে সকালে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় সেগুলি পাঠ করে। আমরা গ্রন্থ লিখছি এবং সেগুলি ছাপাচ্ছি, আর আমাদের শিষ্যরা সেগুলি পড়ছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সেগুলি বিতরণ করছে। কোন মায়াবাদী সংস্থারই আমাদের মতো এতগুলি বই নেই; কিন্তু তা হলেও, অধ্যয়নের প্রতি অনুরক্ত নয় বলে তারা আমাদের সমালোচনা করে। এই ধরনের সমালোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু আমরা যথাযথই অধ্যয়ন করি, তাই আমরা মায়াবাদীদের অর্থহীন প্রলাপ অধ্যয়ন করি না।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কীর্তন করে না অথবা নৃত্য করে না। তাদের মতে এই নৃত্য-কীর্তন হচ্ছে *তৌর্যত্রিক* এবং সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে এই ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে বেদান্ত পাঠে তার সময় অতিবাহিত করা। প্রকৃতপক্ষে, তারা জানে না বেদান্ত বলতে কি বোঝায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্*—"সমস্ত *বেদে* একমাত্র আমিই হচ্ছি জ্ঞাতব্য; আমিই

হচ্ছি বেদান্তের প্রণেতা এবং বেদবেত্তা।" শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন বেদান্তের প্রকৃত প্রণেতা এবং তিনি যা বলেছেন তাই বেদান্ত-দর্শন। যদিও পরমেশ্বর ভগবান *শ্রীমদ্ভাগবত* রূপে যে অপ্রাকৃত বেদান্ত দান করে গিয়েছেন, সেই সম্বন্ধে মায়াবাদীদের কোন জ্ঞান নেই, তবুও তারা তাদের অধ্যয়নের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। বেদান্ত-দর্শনকে যে এই সমস্ত মায়াবাদীরা কিভাবে বিকৃত করবে, তা বুঝতে পেরে শ্রীল ব্যাসদেব *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্যরূপে *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্*; পক্ষান্তরে, *ব্রহ্মসূত্র* রূপে বেদান্ত-দর্শন *শ্রীমদ্ভাগবতের* পাতায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত পাঠক হচ্ছেন সেই কৃষ্ণভক্ত, যিনি সর্বদা *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে তার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য সমস্ত জগৎ জুড়ে শিক্ষা দেন। বেদান্ত-দর্শনের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছে বলে মায়াবাদীরা খুব গর্ব করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের জন্য বেদান্তভাষ্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং অন্যান্য আচার্যদের প্রণীত ভাষ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভাষ্য হচ্ছে *গোবিন্দভাষ্য*।

মায়াবাদীরা যে অভিযোগ করে ভক্তরা বেদান্ত অধ্যয়ন করেন না, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তারা জানে না যে, নৃত্য, কীর্তন ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রচার হচ্ছে ভাগবৎ-ধর্ম এবং তা বেদান্ত অধ্যয়ন থেকে অভিন্ন। যেহেতু তারা মনে করে যে, বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়নই হচ্ছে সন্ন্যাসীদের একমাত্র কাজ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তা করছেন না, তাই তারা তাঁর সমালোচনা করে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, *বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ*—"ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করেছেন যে সন্ন্যাসী, যিনি কেবল কৌপীন ছাড়া আর কিছুই পরিধান করেন না, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে নিরন্তর *বেদান্তসূত্রের* দার্শনিক বিবরণ আস্বাদন করা। সন্ন্যাস ধর্মাবলম্বী এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থা অবলম্বন না করার জন্য বারাণসীর মায়াবাদীরা তাঁর নিন্দা করেছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেছিলেন এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে বেদান্ত-দর্শন আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ৪২

মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম নাহি জানে ।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছে একটি মূর্খ সন্ন্যাসী এবং তাই সে জানে না তার প্রকৃত ধর্ম কি? ভাবের আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে ভাবুকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।"

তাৎপর্য

মূর্খ মায়াবাদীরা জানে না যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তারা আপাতদৃষ্টিতে মনে করে যে, যাঁরা নাচেন এবং কীর্তন করেন

তাঁদের কোন দার্শনিক জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তদের বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, কেন না তাঁরা বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করেন এবং *ভগবদ্গীতায়* প্রদত্ত ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অনুসরণ করেন। ভগবৎ-দর্শন বা ভগবৎ-ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করার ফলে তাঁরা পূর্ণরূপে ভগবৎ-চেতনা বা কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন এবং তার ফলে তাঁদের নৃত্য-কীর্তন জড় স্তরে সম্পাদিত হয় না, তা অনুষ্ঠিত হয় চিন্ময় স্তরে। যদিও সকলেই ভক্তদের আনন্দোচ্ছল নৃত্য-কীর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করে এবং তার ফলে কৃষ্ণভক্তেরা সর্বত্রই 'হরেকৃষ্ণ-ভক্ত' নামে পরিচিত হয়েছেন, কিন্তু মায়াবাদীরা যথার্থ জ্ঞানের অভাবে ভক্তদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সহ্য করতে পারে না।

শ্লোক ৪৩

এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত নিন্দাবাদ শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে হাসলেন, আর এই সমস্ত অপবাদ তিনি অগ্রাহ্য করলেন এবং মায়াবাদীদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তরূপে আমরা মায়াবাদীদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করি না, তবে সুযোগ পেলেই আমরা বেশ প্রবলভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গেই আমাদের দর্শনের আলোকে তাদের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিই।

শ্লোক ৪৪

উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন ।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কাশীর নিন্দুক মায়াবাদীদের উপেক্ষা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মথুরায় গমন করলেন এবং মথুরা দর্শন করে পুনরায় তিনি কাশীতে ফিরে এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলেন তখন তিনি মায়াবাদীদের সঙ্গে কথা বলেননি, কিন্তু মথুরা থেকে পুনরায় তিনি বেদান্তের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাদের বোঝাবার জন্য সেখানে ফিরে এলেন।

শ্লোক ৪৫

কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর ।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। চন্দ্রশেখর যদিও ছিলেন শূদ্র বা কায়স্থ, কিন্তু সেই বিচার না করেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর গৃহে রইলেন, কেন না তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ঈশ্বর।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসীর যদিও শূদ্রের গৃহে বাস করা উচিত নয়, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর নামক একজন কেরানির বাড়িতে ছিলেন। পাঁচশো বছর আগে, বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচলিত প্রথা ছিল যে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এবং অন্যান্য কুলে জন্ম হলে—এমন কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদি উচ্চতর কুলে জন্ম হলেও তাদের শূদ্র বলে মনে করা হত। শ্রীচন্দ্রশেখর যদিও ছিলেন উত্তর ভারতের কায়স্থ বংশোদ্ভূত কেরানি, তবুও তাঁকে শূদ্র বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। তেমনই, বৈশ্যরা, বিশেষ করে সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে বঙ্গদেশে শূদ্র বলে গণনা করা হয়, এমন কি বৈদ্যদেরও, যারা হচ্ছে সাধারণত চিকিৎসক, তাদেরও শূদ্র বলে গণনা করা হয়। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী তথাকথিত ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত এই কৃত্রিম জাতিভেদ প্রথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেননি। পরবর্তীকালে সেই তথাকথিত ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কায়স্থ, বৈশ্য ও বণিকেরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে শুরু করে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে, বঙ্গদেশের রাজা বল্লাল সেন তাঁর ব্যক্তিগত রোষের বশে সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে জাতিচ্যুত করেন। বঙ্গদেশে সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায় অত্যন্ত ধনী, কেন না সাধারণত তারা সুদে টাকা খাটায় এবং সোনা-রূপার ব্যবসা করে। তাই, বল্লাল সেন সুবর্ণ-বণিকদের কাছ থেকে টাকা ধার করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বল্লাল সেন দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায়, সুবর্ণ-বণিক মহাজনেরা তাঁকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাল সেন সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়কে শূদ্র বলে ঘোষণা করেন। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে তাঁরা সুবর্ণ-বণিকদের বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের অনুগামী বলে স্বীকার না করেন। যদিও কিছু ব্রাহ্মণ বল্লাল সেনের এই আচরণ মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক ব্রাহ্মণ তা বরদাস্ত করেননি। তার ফলে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল এবং যাঁরা সুবর্ণ-বণিকদের সমর্থন করেছিলেন তাঁদের ব্রাহ্মণ-সমাজ থেকে জাতিচ্যুত করা হয়। এখনও সেই প্রথার অনুসরণ করা হচ্ছে।

বঙ্গদেশে বহু বৈষ্ণব পরিবার রয়েছেন, যাঁরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করলেও, বৈষ্ণবতন্ত্র অনুসারে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্বক দীক্ষা দান করে আচার্যের কার্য করেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যের বংশসমূহের বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুসারে ঠাকুর রঘুনন্দন, আচার্য ঠাকুর কৃষ্ণদাস, নবনী হোড় এবং শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেবের বংশে ব্রহ্মণ্যের আদর্শ উপনয়ন সংস্কার তিন-চারশো বছর ধরে আজও চলে আসছে। তাঁরা আজও ব্রাহ্মণ আদি সকল বর্ণের দীক্ষাগুরুর কার্য করে আসছেন এবং শালগ্রাম আদির

অর্চনা করে আসছেন। এখনও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মন্দিরগুলিতে আমরা শালগ্রাম শিলার অর্চন প্রবর্তন করিনি, কিন্তু অচিরেই অর্চনমার্গ অনুসারে আমাদের সমগ্র মন্দিরে শালগ্রাম শিলার অর্চন শুরু হবে।

শ্লোক ৪৬

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহণ ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তপন মিশ্রের ঘরে প্রসাদ পেতেন। তিনি অন্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না এবং তাদের নিমন্ত্রণও গ্রহণ করতেন না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আদর্শ আচরণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে পারেন না এবং তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশাও করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৭

সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা ।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সনাতন গোস্বামী যখন বঙ্গদেশ থেকে এলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে দুই মাস অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীগুরু-শিষ্যের পরম্পরার ধারায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করেছিলেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় বিদগ্ধ পণ্ডিত, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত বৈষ্ণব আচার সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে তিনি বৈষ্ণব মার্গের পথপ্রদর্শক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *হরিভক্তিবিলাস* রচনা করেছিলেন। এই *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"যথাযথ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদের মিশ্রণে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনই

যথার্থ সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে মানুষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।" জাতি ব্রাহ্মণেরা কখনও কখনও এর প্রতিবাদ করে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে তাদের কোন উপযুক্ত যুক্তি নেই। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের কৃপায় মানুষের জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে জহাতি বন্ধম্* ও *শুধ্যন্তি* এই দুটি শব্দের দ্বারা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। *জহাতি বন্ধম্* এর অর্থ হচ্ছে জীব কোন বিশেষ শরীরে আবদ্ধ। এই দেহ অবশ্যই একটি প্রতিবন্ধক, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা যায়। শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, কিভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। *প্রভবিষ্ণবে নমঃ*—শ্রীবিষ্ণু এতই শক্তিশালী যে, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাই বিষ্ণুর পক্ষে সদ্‌গুরুর সুদক্ষ পরিচালনায় পরিচালিত ভক্তের দেহকে অনায়াসেই পরিবর্তন করা সম্ভব।

শ্লোক ৪৮

তাঁরে শিখাইলা সব বৈষ্ণবের ধর্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম প্রকাশ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বৈষ্ণবের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করলেন।

তাৎপর্য

পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর শিক্ষা অবশ্যই বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গুরু-পরম্পরার ধারায় নিজের মনগড়া আচার অনুষ্ঠান তৈরি করা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বহু তথাকথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় রয়েছে, যেগুলি যথাযথভাবে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসরণ করে না, তাই তাদের বলা হয় অপসম্প্রদায়, যার অর্থ হচ্ছে 'সম্প্রদায় বহির্ভূত'। তাদের কয়েকটি গোষ্ঠী হচ্ছে আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত, জাত-গোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ-নাগরী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরায় নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করতে হলে, এই সমস্ত অপসম্প্রদায়ের সঙ্গ করা উচিত নয়।

সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ না করলে, বৈদিক শাস্ত্রতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেই কথা বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষাদান করার সময় এই বিষয়ে খুব জোর দিয়েছেন এবং তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অর্জুন যেহেতু তাঁর ভক্ত ও সখা ছিলেন, তাই তিনি *ভগবদ্গীতার* রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেউ যদি শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাঁকে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হবে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করতে হবে

এবং সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তা হলেই কেবল শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপঃ* ৬/২৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান ও গুরুদেবের প্রতি যাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা রয়েছে, তাঁর কাছে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।" শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন, *সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য।* এই নির্দেশের অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হলে সাধু, শাস্ত্র ও গুরু—এই তিনের বাক্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে! সাধু (মহাত্মা বা বৈষ্ণব) অথবা গুরু কখনই শাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কিছু বলেন না। এভাবেই সাধু ও গুরু যা বলেন, তা কখনও শাস্ত্রের বাণী থেকে ভিন্ন নয়। তাই, এই তিনের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪৯

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করছিলেন, তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে একটি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৫০

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু, তোমার বিরুদ্ধে আর কত নিন্দাবাদ ও সমালোচনা সহ্য করব? এই সমস্ত নিন্দাবাদ যাতে আর আমাদের শুনতে না হয়, সেই জন্য আমরা জীবন ত্যাগ করব বলে ঠিক করেছি।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব আচরণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশ হচ্ছে তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া এবং তৃণের থেকেও সুনীচ হওয়া।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"পথে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও সুনীচ হয়ে বা তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম মানসম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে সমস্ত মান দান

করে, নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা উচিত।" কিন্তু তবুও এই উপদেশ প্রদানকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুষ্কৃতকারী জগাই ও মাধাইয়ের অপকর্ম বরদাস্ত করেননি। তারা যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সংহার করতে উদ্যত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার ফলেই কেবল তারা রক্ষা পায়। ব্যক্তিগত আচার-আচরণে প্রত্যেকের অত্যন্ত বিনম্র হওয়া উচিত। বৈষ্ণব অত্যন্ত সহনশীল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হন না। কিন্তু কেউ যদি গুরুদেবের নিন্দা করে বা অন্য কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তা হলে তাঁর ক্রোধ আগুনের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং তা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। বৈষ্ণবনিন্দা কখনও সহ্য করা উচিত নয়। কেউ যদি বৈষ্ণব-নিন্দা করে, তা হলে যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাকে স্তব্ধ করা উচিত। তা করতে না পারলে সেখানেই প্রাণত্যাগ করা উচিত এবং তাও করতে না পারলে সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নানাভাবে তাঁর নিন্দা করছিল, কেন না তিনি সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও নৃত্য-কীর্তন করছিলেন। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর সেই সমালোচনা শুনেছিলেন। তাঁরা ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত, তাই তাঁদের পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাঁরা মায়াবাদীদের স্তব্ধ করতে পারছিলেন না, তাই তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন যে, যেহেতু তাঁরা সেই অসহ্য নিন্দা আর সহ্য করতে পারছিলেন না, সেহেতু তাঁরা জীবন ত্যাগ করবেন বলে মনস্থ করেছেন।

শ্লোক ৫১

তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তোমার নিন্দা করছে। সেই নিন্দা আমরা সহ্য করতে পারছি না। তার ফলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।"

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রকৃত প্রেমের প্রকাশ। তিন শ্রেণীর বৈষ্ণব রয়েছেন—কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারী। কনিষ্ঠ অধিকারী বা সর্বনিম্ন স্তরের বৈষ্ণব হচ্ছেন তিনি, যাঁর ভগবানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি ততটা পারদর্শী নন। মধ্যম অধিকারী শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত এবং গুরু ও কৃষ্ণে তাঁর ভক্তি অবিচলিত। তাই, তিনি অভক্তদের পরিহার করেন এবং বালিশ বা অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে প্রচার করেন। আর সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী কাউকে অবৈষ্ণবরূপে দর্শন করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে কেবল তিনি নিজে ছাড়া আর সকলেই বৈষ্ণব। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা* শ্লোকের সারমর্ম। তবে উত্তম অধিকারী ভক্তকে প্রচার করার জন্য মধ্যম অধিকারী স্তরে নেমে আসতে হয়, কেন না প্রচারক কখনও বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করতে পারেন না। কনিষ্ঠ অধিকারীও বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করতে পারেন না, তবে শাস্ত্র-প্রমাণের মাধ্যমে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই, এখানে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আচার্যকে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত বলে মনে করা হয়েছে, কেন না তাঁরা কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা পরাস্ত করতে পারেননি। তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করেছিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য, কেন না তাঁরা সেই সমালোচনা সহ্য করতে পারছিলেন না অথচ তা বন্ধ করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না।

শ্লোক ৫২

ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই কথা বললেন, তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হেসে চুপ করে রইলেন। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু নিন্দুকেরা মহাপ্রভুর নিন্দা করছিল, তাই মহাপ্রভু তাতে দুঃখ অনুভব করেননি, বরং তিনি ঈষৎ হাস্য করেছিলেন। এটিই হচ্ছে আদর্শ বৈষ্ণব-আচরণ। নিজের সমালোচনা বা নিন্দা শুনে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, তবে যদি অন্য কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করা হয়, তা হলে তা পূর্বোক্ত উপায়ে বন্ধ করার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় ছিলেন; তাই তাঁরই ইচ্ছার প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণ তখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বশক্তিমান ভগবান সেই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৫৩

আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া ।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে এসে ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন, "আমি একটি বস্তু চাইতে এসেছি, আপনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে তা দান করুন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া*—"অত্যন্ত বিনীতভাবে মহাত্মার শরণাগত হতে হয়" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৩৪)। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের

সঙ্গে উদ্ধতভাবে তর্ক করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাঁদের শরণাগত হতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন আদর্শ শিক্ষক এবং তিনি আচরণ করে সকল কিছু শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অনুগামীরাও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সেভাবেই আচরণ করে শিক্ষাদান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে পবিত্র হয়ে, এই ব্রাহ্মণও অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর চরণে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে তিনি বলেছিলেন—

শ্লোক ৫৪

সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু! আমি বারাণসীর সমস্ত সন্ন্যাসীদের আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে আস, তা হলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

এই ব্রাহ্মণটি জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন তখন কাশীতে একমাত্র বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী, আর অন্য সকলেই ছিলেন মায়াবাদী। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে কখনও কখনও সন্ন্যাসীদের গৃহে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করানো। এই গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ সকল সন্ন্যাসীদের তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে স্বীকার করানো অত্যন্ত কঠিন হবে, কেন না মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন। তাই তিনি তাঁর শ্রীচরণে পতিত হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে আবেদন করেছিলেন যে, তিনি যেন করুণা করে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। এভাবেই অত্যন্ত বিনয় সহকারে তিনি তাঁর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি ।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু! আমি জানি যে, তুমি অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গ কর না, কিন্তু আমাকে অনুগ্রহ করে আমার এই নিমন্ত্রণ স্বীকার কর।"

তাৎপর্য

আচার্য অথবা বৈষ্ণব মহাজন অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তাঁর নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু যদিও তিনি বজ্রের মতো কঠোর, তবুও কখনও কখনও তিনি কুসুমের মতো কোমল।

প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বতন্ত্র। তিনি সমস্ত বিধি-নিষেধ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, কিন্তু কখনও কখনও তিনি তাঁর নীতি শিথিল করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। কিন্তু তবুও তিনি সেই ব্রাহ্মণের অনুরোধ স্বীকার করেছিলেন, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৬

প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হেসে সেই ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের কৃপা করবার জন্য তিনি এভাবেই আচরণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নিন্দা করেছিল বলে তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁদের মনঃকষ্ট ব্যক্ত করে আবেদন করেছিলেন। তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল হেসেছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তখন সেই সুযোগ এল যখন সেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তাঁকে অনুরোধ করতে এলেন। এভাবেই অসমোর্ধ্ব ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলেই এই সকল ঘটনা যুগপৎ সংঘটিত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৭

সে বিপ্র জানেন প্রভু না যা'ন কা'র ঘরে ।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও অন্য কারও গৃহে যান না, তবুও মহাপ্রভুরই প্রেরণায় তিনি তাঁকে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ করতে থাকেন।

শ্লোক ৫৮

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে ।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তার পরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, কাশীর সমস্ত সন্ন্যাসীরা সেখানে বসে রয়েছেন।

শ্লোক ৫৯

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাসীদের প্রণতি নিবেদন করে তিনি পাদ প্রক্ষালন করতে গেলেন এবং পাদ প্রক্ষালন করার পর তিনি সেই স্থানেই উপবেশন করলেন।

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের প্রণতি নিবেদন করার মাধ্যমে সকলের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিনয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব কখনও কারও প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। সুতরাং সন্ন্যাসীদের প্রতি যে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, *অমানিনা মানদেন*—অন্য সকলকে সম্মান দান করা উচিত কিন্তু নিজে কখনও সম্মানের প্রত্যাশা করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা খালি পায়ে চলাফেরা করা এবং তাই তিনি যখন মন্দিরে অথবা ভক্তগোষ্ঠীতে প্রবেশ করেন, তখন সবার আগে তাঁকে পাদ প্রক্ষালন করে উপযুক্ত আসন গ্রহণ করতে হয়। ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, জুতো খুলে একটি কোন নির্দিষ্ট স্থানে তা রেখে, তারপর পা ধুয়ে খালি পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন আদর্শ আচার্য। যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তিনি আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, তা অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুশীলন করা।

শ্লোক ৬০

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ ।
মহাতেজোময় বপু কোটিসূর্যাভাস ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

মাটিতে বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন, তখন মনে হল তাঁর মহা তেজোময় শরীর থেকে যেন কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাই তিনি সর্বশক্তিমান। তাই, তাঁর পক্ষে কোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশ করা মোটেই অসম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম হচ্ছে যোগেশ্বর, অর্থাৎ যিনি সমস্ত যোগৈশ্বর্যের অধীশ্বর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং; তাই তিনি যে কোন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ৬১

প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিল সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাসীরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহের অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করলেন, তখন তাঁদের চিত্ত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল এবং তাঁরা তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কখনও কখনও মহাপুরুষেরা ও আচার্যরা তাঁদের অলৌকিক বৈভব প্রকাশ করেন। মূর্খদেরই কেবল এভাবেই আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু যথার্থ সাধু কখনই ভগবান বলে প্রচারকারী ভণ্ড প্রতারকদের মতো নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন না। এমন কি একজন যাদুকর পর্যন্ত অদ্ভুত সমস্ত খেলা দেখাতে পারে, যা সাধারণ মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যাদুকর হচ্ছে ভগবান। কিন্তু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে ভগবান বলে প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। প্রকৃতই যিনি মহাত্মা, তিনি কখনই নিজেকে ভগবান বলে জাহির করতে চান না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই নিজেকে ভগবানের সেবক বলে মনে করেন। ভগবানের যিনি দাস তাঁর পক্ষে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজন নেই এবং তিনি তা করতে চানও না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাসরূপে তিনি ভগবানের হয়ে এমন সমস্ত অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেন, যা কোনও সাধারণ মানুষ চেষ্টা পর্যন্ত করতে সাহস করে না। তবুও মহাত্মারা সেই সমস্ত কার্যকলাপের গর্বে স্ফীত হন না, কেন না তাঁরা খুব ভালভাবেই জানেন যে, ভগবানের কৃপায় যখন কোন অদ্ভুত কার্য সম্পাদিত হয়, তখন তার সমস্ত কৃতিত্ব ভগবানের, ভৃত্যের নয়।

শ্লোক ৬২

প্রকাশানন্দ-নামে এক সন্ন্যাসী-প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গভীর সম্মান সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, মায়াবাদীদের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতীও তেমনভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৬৩

ইহাঁ আইস, ইহাঁ আইস, শুনহ শ্রীপাদ ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"দয়া করে এখানে আসুন, দয়া করে এখান আসুন, হে শ্রীপাদ! আপনি কেন এই অপবিত্র স্থানে বসেছেন? আপনার এই বিষাদের কারণ কি?"

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মধ্যে পার্থক্য। জড় জগতে সকলেই নিজেকে অত্যন্ত মহৎ ও সম্মানীয় বলে জাহির করতে চায়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দীন ও বিনীতভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। মায়াবাদীরা উচ্চ আসনে বসেছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমন একটি জায়গায় বসলেন যা ছিল অপবিত্র। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করেছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবেন এবং তাই প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁর অনুশোচনার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৪

প্রভু কহে,—আমি হই হীন-সম্প্রদায় ।
তোমা-সবার সভায় বসিতে না যুয়ায় ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তখন উত্তর দিলেন, "আমি হীন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। তাই আপনাদের সঙ্গে একত্রে বসার যোগ্যতা আমার নেই।"

তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত গর্বিত। তাঁদের ধারণা, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে এবং সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষ করে ব্যাকরণ সম্বন্ধে অত্যন্ত পারদর্শী না হলে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করা যায় না এবং প্রচার করা যায় না। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সব সময় বাক্‌চাতুরির দ্বারা এবং ব্যাকরণের বিন্যাসের দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের কদর্থ করেন। তবুও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বয়ং এই বাক্‌চাতুরি ও ব্যাকরণের বিন্যাসের নিন্দা করে বলেছেন, *প্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।* *ডুকৃঞ্* হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভক্তি ও উপসর্গ। শঙ্করাচার্য তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, গোবিন্দের ভজনা না করে তারা যদি কেবল ব্যাকরণ নিয়েই মেতে থাকে, তা হলে সেই সমস্ত মূর্খগুলি কোনদিনও উদ্ধার পাবে না। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই নির্দেশ সত্ত্বেও মূর্খ মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিত্তিতে বাক্যবিন্যাস করতেই ব্যস্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী—এই তিনটি সম্প্রদায় সদাচার ও সম্মানে অপর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা তাঁদের পদমর্যাদায় অত্যন্ত গর্বিত। যাঁরা বন, অরণ্য, ভারতী আদি উপাধি-বিশিষ্ট, মায়াবাদীরা তাঁদের নিম্নতর স্তরের সন্ন্যাসী বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ভারতী সম্প্রদায় থেকে এবং তার ফলে তিনি নিজেকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী থেকে নিম্নস্তরের সন্ন্যাসী বলে মনে করেছিলেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের থেকে স্বতন্ত্র থাকার জন্য মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সর্বদাই মনে করেন যে, তাঁরা অতি উচ্চ পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁদের বিনীত ও নম্র হওয়ার শিক্ষা দান করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীচ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই তিনি স্পষ্টভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সন্ন্যাসী হচ্ছেন তিনি যিনি পারমার্থিক জ্ঞানে উন্নত। পারমার্থিক জ্ঞানে যিনি উন্নত তাঁকে উচ্চ আসন দান করে তাঁর আনুগত্য বরণ করা উচিত।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সাধারণত বলা হয় বেদান্তী, যেন বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন, তিনিই হচ্ছেন বেদান্তী। *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত *বেদে* শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জ্ঞাতব্য বিষয়। তথাকথিত মায়াবাদী বেদান্তীরা জানেন না কৃষ্ণ কি; তাই তাঁদের উপাধি সম্পূর্ণ অর্থহীন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সব সময় মনে করেন যে, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাই তাঁরা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ব্রহ্মচারী বলে মনে করেন। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হচ্ছে সন্ন্যাসীর সেবায় যুক্ত থাকা এবং তাঁকে গুরুরূপে বরণ করা। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কেবল নিজেদের গুরু বলে ঘোষণা করেই সন্তুষ্ট নন, তাঁরা নিজেদের জগদ্‌গুরু বলে প্রচার করতে চান, যদিও সারা পৃথিবী তাঁরা চোখেও দেখেননি। কখনও কখনও তাঁরা খুব আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে শোভাযাত্রা সহকারে হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেন। এভাবেই গর্বে স্ফীত হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা জগদ্‌গুরু হয়ে গিয়েছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, যিনি তাঁর জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, বাক্যের বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ এবং ক্রোধের বেগ সম্পূর্ণরূপে দমন করেছেন, তিনিই হচ্ছেন জগদ্‌গুরু। *পৃথিবীং স শিষ্যাৎ*—এই ধরনের জগদ্‌গুরু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করতে পারেন। এই সমস্ত গুণাবলী রহিত অহঙ্কারে মত্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বিনীতভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কখনও কখনও নির্যাতন ও নিন্দা করেন।

শ্লোক ৬৫

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া ।
বসাইলা সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নিজে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর হাত ধরে অত্যন্ত সম্মান সহকারে সভার মধ্যে এনে বসালেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই সম্মানজনক ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। এই ধরনের ব্যবহারকে বলা হয় অজ্ঞাত-সুকৃতি। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে অজ্ঞাত-সুকৃতির দ্বারা পারমার্থিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে পরিণত হতে পারেন।

শ্লোক ৬৬

পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
কেশব ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন বললেন, "আমি শুনেছি যে, তোমার নাম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তুমি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য এবং তাই তুমি ধন্য।

শ্লোক ৬৭

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে ।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি আমাদের শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং তুমি এই গ্রামেই থাক। তা হলে তুমি কেন আমাদের সঙ্গে মেলামেশা কর না? তুমি কেন আমাদের দর্শন পর্যন্ত কর না?

তাৎপর্য

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অথবা বৈষ্ণব পারমার্থিক প্রগতির মধ্যম অধিকারের স্তরে চারটি তত্ত্ব উপলব্ধি করেন—পরমেশ্বর ভগবান, ভগবদ্ভক্ত, অজ্ঞ ব্যক্তি ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি বা ভগবৎ-বিদ্বেষী এবং এই চার জনের প্রতি তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করেন। তিনি ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম বর্ধিত করার চেষ্টা করেন, তিনি ভক্তদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হন, অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, সেই সমস্ত ভগবৎ-বিদ্বেষীদের উপেক্ষা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রকার আচরণের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গিয়েছেন এবং সেই জন্যই প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন তিনি তাঁদের সঙ্গ করেন না অথবা তাঁদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়ে গিয়েছেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক যেন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর সময়ের অপচয় না করেন। কিন্তু যখন শাস্ত্র-প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন ওঠে, তখন বৈষ্ণব সিংহবিক্রমে এগিয়ে এসে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকারীকে পরাস্ত করেন।

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই কেবল বৈদিক সন্ন্যাসী। কখনও কখনও তারা প্রতিবাদ করেন যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক সন্ন্যাসীরা যেহেতু ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত নন, তাই তাঁরা যথার্থ সন্ন্যাসী নন, কেন না ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে মায়াবাদীরা তাঁকে সন্ন্যাস দেন না। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁরা জানেন না যে, এই যুগে সকলেই শূদ্র (*কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ*)। আমাদের জানতে হবে যে, এই যুগে কোন ব্রাহ্মণ নেই, কেন না যারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করছেন, তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলি নেই। কিন্তু অব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী দেখা যায়, তা হলে তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা উচিত। নারদ মুনি ও শ্রীধর স্বামী তা প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতেও* বর্ণিত হয়েছে। নারদ মুনি ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই সর্বতোভাবে স্বীকার করেছেন যে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হলে, যে কোন কুলোদ্ভূত মানুষই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকলে কাউকে সন্ন্যাস দিই না। যদিও এই কথা সত্যি যে, ব্রাহ্মণ না হলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তা বলে তার অর্থ এই নয় যে, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত অযোগ্য মানুষকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিতে হবে এবং অব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত মানুষের ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী থাকলেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যাবে না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভ্রান্ত পথে গমনের পন্থারূপ প্রচলিত বিকৃত ধর্মমত ও মনগড়া সিদ্ধান্ত বর্জন করে *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসরণ করছে।

শ্লোক ৬৮

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন-গায়ন ।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্তন ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি একজন সন্ন্যাসী। অতএব তুমি ভাবুকদের সঙ্গে নৃত্য করে, গান করে সংকীর্তন কর কেন?

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কর্তৃক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদান্ত-দর্শনের আরাধ্যবস্তু, তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে বেদান্ত-দর্শন পাঠ করার যোগ্যতা কার রয়েছে, সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই যোগ্যতা ব্যক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

এই উক্তিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে বেদান্ত-দর্শন শ্রবণ অথবা কীর্তন করার যোগ্যতা লাভ করা যায়। অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে, তরুর থেকে সহিষ্ণু হয়ে, তৃণের থেকেও দীনতর হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে সমস্ত সম্মান দান করে, বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

শ্লোক ৬৯

বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্তপাঠ ও ধ্যান করাই হচ্ছে সন্ন্যাসীর ধর্ম। সেই ধর্ম ত্যাগ করে কেন ভাবুকের মতো নৃত্য-কীর্তন করছ?

তাৎপর্য

একচত্বারিংশতি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নৃত্য ও কীর্তন করা অনুমোদন করেন না। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো প্রকাশানন্দ সরস্বতীও ভুল বুঝেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন পথভ্রষ্ট নবীন সন্ন্যাসী, তাই তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীর কর্তব্য না করে কেন তিনি ভাবুকদের সঙ্গ করছেন।

শ্লোক ৭০

প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার প্রভাব দেখে মনে হয় তুমি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। কিন্তু তুমি নিম্নশ্রেণীর মানুষদের মতো আচরণ করছ কেন? তার কারণ কি?"

তাৎপর্য

বৈরাগ্য, বেদান্ত অধ্যয়ন, ধ্যান ও কঠোর নিয়মনিষ্ঠা পালন করার ফলে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অবশ্যই পুণ্যকর্মের স্তরে অধিষ্ঠিত। এই পুণ্যের প্রভাবে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন সাধারণ মানুষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *সাক্ষাৎ নারায়ণ*—তিনি তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে মনে করেছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন, কেন না তারা মনে করেন যে, পরবর্তী জীবনে তাঁরা নারায়ণ হয়ে যাবেন বা নারায়ণের সঙ্গে লীন হয়ে যাবেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী মনে করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইতিমধ্যেই নারায়ণ হয়ে গিয়েছেন এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাঁর আর প্রতীক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। বৈষ্ণব ও মায়াবাদী দর্শনের মধ্যে একটি পার্থক্য হচ্ছে যে, মায়াবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, দেহত্যাগের পরে তারা নারায়ণের দেহে লীন হয়ে নারায়ণ হয়ে যাবেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জানেন যে, জড় দেহের মৃত্যুর পর তাঁরা এক জড়াতীত, চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে নারায়ণের সঙ্গ লাভ করবেন।

শ্লোক ৭১

প্রভু কহে—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "হে শ্রীপাদ! তার কারণ আমি বলছি, দয়া করে আপনি তা শুনুন। আমার গুরুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি একটি মূর্খ এবং তাই তিনি আমাকে শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কেন তিনি বেদান্ত পাঠ করেন না এবং ধ্যান করেন না, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে একজন মূর্খ বলে উপস্থাপন করেছিলেন, কেন না বর্তমান কলিযুগটি হচ্ছে সমস্ত মূর্খদের যুগ, তাই বেদান্ত-দর্শন পাঠ করে ও ধ্যান করে পরমার্থ সাধন হয় না। শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই কলিযুগে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। তা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই।" সাধারণত এই কলিযুগের মানুষেরা এত অধঃপতিত যে, তাদের পক্ষে *বেদান্তসূত্র* অধ্যয়ন করে পরমার্থ সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে হবে, কেন না এই জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার সেটিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

শ্লোক ৭২

মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার ।
'কৃষ্ণমন্ত্র' 'জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি বলেছিলেন, 'তুমি একটি মূর্খ, বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করার অধিকার তোমার নেই, তুমি কেবল নিরন্তর কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, "শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত বাণী যথাযথভাবে সম্পাদন করলে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হয়।" এভাবেই গুরুদেবের বাণী গ্রহণ করাকে বলা হয় *শ্রৌতবাক্য* এবং তা নির্দেশ করে যে, শিষ্যকে অবিচলিতভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করতে হয়। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের নির্দেশ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এখানে বলেছেন, যেহেতু তাঁর গুরুদেব তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম জপ করার জন্য, তাই তিনি নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছিলেন *('কৃষ্ণমন্ত্র' 'জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার)*।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, তাই কোন মানুষ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন বুঝতে হবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনার অভাব হলে জীব আংশিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে। তাই সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে না। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সমগ্র জগতের গুরু, তবুও তিনি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার শিক্ষা দান করার জন্য স্বয়ং শিষ্যত্ব বরণ করে এই আচরণ করে গিয়েছেন। যিনি বেদান্ত পাঠের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই যুগে কারওই বেদান্ত অধ্যয়ন করার যোগ্যতা নেই। তাই, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করাই শ্রেয়। সেই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন—

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ।

"সমস্ত বেদে আমিই কেবল জ্ঞাতব্য। আমিই হচ্ছি বেদান্তের প্রণেতা এবং আমিই হচ্ছি বেদবেত্তা।"

মূর্খেরাই কেবল গুরুসেবা ত্যাগ করে নিজেদের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। এই ধরনের মূর্খদের নিরস্ত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যথার্থ শিষ্য হবার আদর্শ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। গুরুদেব খুব ভালভাবে জানেন, কিভাবে তাঁর শিষ্যকে কোন বিশেষ সেবায় নিযুক্ত করতে হয়। কিন্তু শিষ্য যদি নিজেকে গুরুর থেকেও বড় পণ্ডিত বলে মনে করে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে স্বাধীন মতানুযায়ী আচরণ করতে শুরু করে, তা হলে তার পারমার্থিক প্রগতি রুদ্ধ হয়। প্রতিটি শিষ্যেরই কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ বলে মনে করে, কৃষ্ণভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্বদা

গুরুদেবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকা। শিষ্যের কর্তব্য গুরুদেবের সামনে নিজেকে মহামূর্খ বলে মনে করা। তাই কখনও কখনও লোকদেখানো পরমার্থবাদীদের এমন কারও কাছ থেকে দীক্ষা নিতে দেখা যায় যে, এমন কি সে শিষ্য হওয়ারও যোগ্য নয়, কেন না সেই সমস্ত তথাকথিত শিষ্যরা সেই সমস্ত তথাকথিত গুরুদেবকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে চায়। পারমার্থিক উপলব্ধির পথে এই ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে যে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, সে কখনও বেদান্ত-দর্শন উপলব্ধি করতে পারে না। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া লোকদেখানো বেদান্ত অধ্যয়ন জীবকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা কবলিভূত করার একটি আয়োজন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল মায়াশক্তির প্রমত্ততার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পড়ে, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা থেকে বিমুখ থাকে। বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত অনুগামী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব, যিনি জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মহৎ থেকে মহত্তম এবং সমগ্র জগতের পালনকর্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সীমিতের সেবাপ্রবৃত্তি অতিক্রম করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসীমের কাছে পৌঁছতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই অসীমের জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞান। যে সমস্ত মানুষ সকাম কর্মের প্রতি ও মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে, তারা পূর্ণশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ও আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে আর বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করতে হয় না, কেন না তিনি ইতিমধ্যেই এই সমস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন।

যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করতে অক্ষম হয়ে মনে করে, শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন এবং বেদান্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁকে জানবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে একটি মহামূর্খ। সেই সত্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং যে সমস্ত মনোধর্মী জ্ঞানী বেদান্ত অধ্যয়নকে তাদের পেশাগত বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছে, তাদেরও জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। কিন্তু যিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তিনি ইতিমধ্যেই অজ্ঞানের পারাবার অতিক্রম করেছেন। এভাবেই, এমন কি নীচ কুলোদ্ভূত কোন মানুষও যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে মগ্ন হন, তিনিও বেদান্ত অধ্যয়নের স্তর অতিক্রম করেছেন বলে বুঝতে হবে। সেই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/৩৩/৭) বলা হয়েছে—

অহ বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

"শ্বপচ (কুকুরভোজী চণ্ডাল) কুলোদ্ভূত মানুষও যদি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করেন,

তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর পূর্বজন্মে তিনি সব রকম তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন এবং সব রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছেন।" আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

"যে মানুষ *হ* এবং *রি* এই দুটি অক্ষর কীর্তন করেন, তিনি ইতিমধ্যেই *সাম, ঋক, যজুঃ* ও *অথর্ব*—এই চারটি *বেদ* অধ্যয়ন করেছেন।"

এই শ্লোকগুলির অজুহাতে একদল সহজিয়া সব কিছু অত্যন্ত সস্তাভাবে নেয়। তারা নিজেদের অতি উন্নত বৈষ্ণব বলে মনে করে, অথচ *বেদান্তসূত্র* অথবা বেদান্ত-দর্শন স্পর্শ পর্যন্ত করে না। প্রকৃত বৈষ্ণব কিন্তু বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বেদান্ত-দর্শন অধ্যয়ন করার পর কেউ যদি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার পন্থা গ্রহণ না করেন, তা হলে তিনি মায়াবাদীদের থেকে কোন অংশেই শ্রেয় নন। সুতরাং মায়াবাদী হওয়া উচিত নয়, আবার সেই সঙ্গে বেদান্ত-দর্শনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অজ্ঞ থাকা উচিত নয়। বাস্তবিকপক্ষে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে আলোচনাকালে বেদান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদর্শন করেছিলেন। এভাবেই এর থেকে বোঝা যায় যে, বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে সর্বতোভাবে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে অবগত থাকা, তবে তার অর্থ এই নয় যে, বেদান্ত অধ্যয়নকে পারমার্থিক অনুশীলনের মূল বিষয় বলে মনে করে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে বিরত হওয়া। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে বেদান্ত-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেই সঙ্গে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত থাকা। বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে কেউ যদি নির্বিশেষবাদী হয়ে যান, তা হলে তিনি বেদান্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *বেদান্ত* মানে হচ্ছে, 'সমস্ত জ্ঞানের অন্ত'। সমস্ত জ্ঞানের অন্ত হচ্ছে কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান, যিনি তাঁর দিব্যনাম থেকে অভিন্ন। সহজিয়ারা চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যদের ভাষ্য সমন্বিত বেদান্ত দর্শন অধ্যয়নে আগ্রহ প্রকাশ করে না। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে *গোবিন্দ-ভাষ্য* নামক বেদান্ত ভাষ্য রয়েছে, কিন্তু সহজিয়ারা মনে করে যে, এই ধরনের ভাষ্যগুলি হচ্ছে অস্পৃশ্য দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা এবং তারা মহান বৈষ্ণব আচার্যদের মিশ্রভক্ত বলে মনে করে। এভাবেই তারা নরকে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে।

শ্লোক ৭৩

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করা যায়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে বলেছেন যে, জীব যখন দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিজাত সকাম কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যখন নিরপরাধে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করেন, তখন তিনি জড়-জাগতিক জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত চিন্ময় স্তর উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবানের সেবা করার ফলে ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য—এই পাঁচটি রসের যে-কোন একটির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন এবং এভাবেই সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। এই সম্পর্ক অবশ্যই দেহ ও মনের অতীত। কেউ যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, ভগবানের দিব্যনাম পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, তখন তিনি ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। এভাবেই আনন্দে মগ্ন হয়ে যিনি কীর্তন ও নৃত্য করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে পারমার্থিক প্রগতির তিনটি স্তর রয়েছে—*সম্বন্ধ-জ্ঞান, অভিধেয়* ও *প্রয়োজন*। *সম্বন্ধ-জ্ঞানের* অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। *অভিধেয়* হচ্ছে সেই সম্পর্ক অনুসারে আচরণ করা এবং *প্রয়োজন* হচ্ছে জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ করা (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*)। কেউ যদি সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন। যে মানুষ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে অত্যন্ত আসক্ত, তিনি অনায়াসে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর পক্ষে ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাস হৃদয়ঙ্গম করার আর কোন প্রয়োজন নেই, যা মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাধারণত করে থাকেন। এই বিষয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য পর্যন্ত খুব জোর দিয়ে বলেছেন, *ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে*—"কেবল ব্যাকরণের বিভক্তি ও উপসর্গ নিয়ে বাক্যবিন্যাস করলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।" যে ভক্ত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে মগ্ন হয়েছেন, তিনি ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাসীদের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হন না। ভগবানের শক্তি *হরে* এবং স্বয়ং ভগবান *শ্রীকৃষ্ণকে* সম্বোধন করার মাধ্যমে ভক্ত হৃদয়াভ্যন্তরে হৃদয়রাজ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এভাবেই শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। কেউ যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের দ্বারা ভগবান ও তাঁর শক্তিকে সম্বোধন করে, তখন সমস্ত শাস্ত্র ও সমস্ত জ্ঞানের নির্যাস তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়, কেন না এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ বদ্ধ জীবকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে একজন মূর্খরূপে উপস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁর গুরুপাদপদ্মের যে নির্দেশ তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করছিলেন, তা হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/৭/৬) ব্যাসদেবের নির্দেশ।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥

"জীবের যে জড় জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং ভক্তিযোগে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে তা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সেই কথা জানে না এবং তাই মহামুনি বেদব্যাস ভগবৎ-তত্ত্ব সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্র (*শ্রীমদ্ভাগবত*) প্রণয়ন করেছিলেন।" ভক্তিযোগ অনুশীলনের ফলে জীব জড় জগতের সমস্ত বন্ধন ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন, তাই ব্যাসদেব শ্রীনারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে বদ্ধ জীবদের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রদান করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব তাই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রতি ক্রমশ অনুরক্ত হওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে *শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করতে হবে।

ভগবানের দিব্যনাম ভগবান থেকে অভিন্ন। যিনি সম্পূর্ণভাবে মায়ার কবল থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই জ্ঞান, যা সদ্‌গুরুর কৃপার প্রভাবে লাভ হয়, তা জীবকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে মূর্খ বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন, কেন না গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে তিনি বুঝতে পারেননি যে, কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তাঁর গুরুদেবের দাসত্ব বরণ করে তাঁর নির্দেশ পালন করতে শুরু করেছিলেন, তখনই তিনি অনায়াসে মুক্তির পথ দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন যে সব রকম অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল তা বুঝতে হবে। দশটি নাম অপরাধ হচ্ছে—(১) ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করা, (২) বিভিন্ন দেব-দেবীর নামকে ভগবানের নামের সমপর্যায়ভুক্ত করা অথবা অনেক ভগবান আছেন বলে মনে করা, (৩) গুরুদেবের নির্দেশ অবজ্ঞা করা, (৪) বৈদিক শাস্ত্র এবং বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা, (৫) ভগবানের নামের অর্থবাদ করা, (৬) ভগবানের নামের মহিমাকে অতিস্তুতি বলে মনে করা, (৭) নামের বলে পাপাচরণ করা, (৮) হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে *বেদের* কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞ ও তপস্যার মতো পুণ্যকর্ম বলে মনে করা, (৯) ভগবৎ-বিদ্বেষীদের কাছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার করা এবং (১০) ভগবানের নামের মহিমা শ্রবণ করা সত্ত্বেও জড় বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

শ্লোক ৭৪

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।
সর্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। এই নাম হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম।'

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পরম্পরার ধারা কঠোর নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করা হত, কিন্তু বর্তমানে এই কলিযুগে মানুষ *শ্রৌত-পরম্পরা* বা পরম্পরার ধারায় জ্ঞান আহরণ করার পন্থার গুরুত্ব অবহেলা করে। এই যুগে মানুষ তর্ক করে যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা তাদের সীমিত জ্ঞান ও অনুভূতির অতীত যে বস্তু তাঁকে জানতে পারবে। তারা জানে না যে, প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় অবরোহ পন্থায়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনদের কাছ থেকে সেই জ্ঞান মানুষের কাছে নেমে আসে। এই তর্ক করার প্রবণতা বৈদিক নীতির বিরোধী এবং এই রকম মনোভাবাপন্ন মানুষের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন তা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর দিব্যনাম অভিন্ন, তাই কৃষ্ণনাম নিত্য শুদ্ধ ও জড় কলুষের অতীত। এই নাম শব্দতরঙ্গ রূপে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবানের নাম জড় শব্দতরঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যে কথা শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলে গিয়েছেন—*গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্তন*। হরিনাম সংকীর্তনের দিব্য শব্দতরঙ্গ চিন্ময় জগৎ থেকে এই জড় জগতে নেমে এসেছে। এভাবেই জড়বাদীরা যদিও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রতি এবং তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির' প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তবুও তাঁরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রতি শ্রদ্ধালু হতে পারেন না। কিন্তু কেবলমাত্র নিরপরাধে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সব রকম স্থূল ও সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে যে মুক্ত হওয়া যায়, তা ধ্রুব সত্য। চিৎ-জগৎকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ, যার অর্থ 'কুণ্ঠা রহিত'। জড় জগতে সকলেই কুণ্ঠাযুক্ত এবং বৈকুণ্ঠে সকলেই কুণ্ঠামুক্ত। তাই যারা নানা রকম কুণ্ঠায় জর্জরিত তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, যা হচ্ছে সব রকম কুণ্ঠা থেকে মুক্ত। এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে জড় কলুষের অতীত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র পন্থা। যেহেতু ভগবানের দিব্যনাম বদ্ধ জীবদের মুক্ত করতে পারে, তাই এখানে বলা হয়েছে, *সর্বমন্ত্রসার*—সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার।

এই জড় জগতে কোন বস্তুর পরিচায়ক যে নাম, তা যুক্তি-তর্ক ও অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হতে পারে, কিন্তু চিৎ-জগতে নাম ও নামী, যশ ও যশস্বী অভিন্ন, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আদি সব কিছুই তাঁর থেকে অভিন্ন। মায়াবাদীরা যদিও অদ্বৈতবাদ প্রচার করে, তবুও তারা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। এই নাম অপরাধের জন্য তারা ব্রহ্মজ্ঞানের স্তর থেকে অধঃপতিত হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।

যদিও তারা কঠোর তপশ্চর্যার প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞাজনিত অপরাধের ফলে তারা অধঃপতিত

হয়। যদিও তারা প্রচার করে যে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* (*ছান্দোগ্য উপঃ* ৩/১৪/১), / .
'সবই হচ্ছে ব্রহ্ম', . . † /, ভগবানের দিব্যনামও ব্রহ্ম। কিন্তু তারা সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ ভগবানের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপরাধমুক্ত হয়ে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে পারবে না।

শ্লোক ৭৫

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এই মহিমা বর্ণনা করার পর, আমার গুরুদেব আমাকে একটি শ্লোক শিখিয়েছিলেন এবং কণ্ঠে ধারণ করে সেটি আমাকে বিচার করতে উপদেশ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৬

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬ ॥

হরেঃ নাম—ভগবানের দিব্যনাম; **হরেঃ নাম**—ভগবানের দিব্যনাম; **হরেঃ নাম**—ভগবানের দিব্যনাম; **এব**—অবশ্যই; **কেবলম্**—একমাত্র; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **ন অস্তি**—নেই; **এব**—অবশ্যই; **ন অস্তি**—নেই; **এব**—অবশ্যই; **ন অস্তি**—নেই; **এব**—অবশ্যই; **গতিঃ**—গতি; **অন্যথা**—অন্য কোন।

অনুবাদ

" 'এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই, আর অন্য কোন গতি নেই।'

তাৎপর্য

সত্যযুগে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা হচ্ছে ধ্যান, ত্রেতাযুগে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পন্থা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ করা এবং দ্বাপর যুগের পন্থা হচ্ছে মহা আড়ম্বরে মন্দিরে ভগবানের পূজা করা, কিন্তু কলিযুগে কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা যায়। সেই কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই বিষয়ে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বহু উল্লেখ রয়েছে। দ্বাদশ স্কন্ধে (৩/৫১) বলা হয়েছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥

এই কলিযুগ দোষের সমুদ্র, সেই জন্য মানুষ নানাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, কিন্তু তবুও এই যুগের এক মহান গুণ হচ্ছে—কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মানুষ সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিৎ-জগতে উন্নীত হতে পারে। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে—

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ ।
সর্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্ ।
সর্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ ॥

"তিন প্রকার বৈদিক ক্রিয়া (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ড), ছন্দ বা বৈদিক মন্ত্র এবং দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার পন্থা—এ সবই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই আটটি অক্ষরে নিহিত রয়েছে। এটিই হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের চরম তত্ত্ব। ভবসাগর পার হওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা।" তেমনই, *কলিসন্তরণ উপনিষদে* বর্ণনা করা হয়েছে, **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই ষোলটি নাম কলিযুগের সমস্ত কলুষ বিনষ্ট করার একমাত্র উপায়। সমস্ত *বেদে* বর্ণিত হয়েছে যে, অজ্ঞান সমুদ্র পার হওয়ার জন্য ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা ব্যতীত আর কোন বিকল্প উপায় নেই।" তেমনই, *মুণ্ডক উপনিষদের* ভাষ্য প্রদানকালে শ্রীমধ্বাচার্য *নারায়ণ-সংহিতা* থেকে একটি শ্লোক উল্লেখ করে বলেছেন—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্ ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥

"দ্বাপর যুগে *পাঞ্চরাত্রিকী-বিধি* অনুসারে মহাড়ম্বরে পূজা করার মাধ্যমে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা যায়, কিন্তু কলিযুগে কেবলমাত্র দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পূজা করা যায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা যায়।" *ভক্তিসন্দর্ভে* (২৮৪) শ্রীল জীব গোস্বামী অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের মহিমা বর্ণনা করে বলেছেন—

ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ, তত্র বিশেষেণ নমঃ-শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভিশ্চাহিতশক্তিবিশেষাঃ, শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা। উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্যাদা স্থাপিতাস্তি।

শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। সমস্ত মন্ত্র শুরু হয় *নম ওঁ* দিয়ে এবং অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানের নামকে সম্বোধন করা হয়। নারদ মুনি ও অন্যান্য ঋষিরা যে মন্ত্র কীর্তন করেন, তার

প্রতিটি মন্ত্রে ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের ফলে তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সংযোগ সাধনের সমস্ত বাঞ্ছিত ফল তৎক্ষণাৎ লাভ করতে পারা যায়। তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, যদিও নামকারীর স্বরূপত দীক্ষার অপেক্ষা নেই, তা হলেও প্রায়ই স্বাভাবিকভাবে বদ্ধ জীব মাত্রই পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারবশত দেহ-গেহ আদি সম্বন্ধ থাকায় কদর্য স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য আদি হয়ে থাকে। অতএব সেই কদর্য স্বভাব ও চিত্তচাঞ্চল্য আদি সংকট মোচন করে দ্রুত শুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য মন্দিরে ভগবৎ-অর্চন আদি দরকার আছে। বদ্ধ জীবনের কলুষজাত চিত্তচাঞ্চল্য দূর করার জন্য মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা প্রয়োজন। সুতরাং, নারদ মুনি তাঁর *পাঞ্চরাত্রিকী-বিধিতে* এবং অন্যান্য মুনি-ঋষিরা উল্লেখ করেছেন, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে বদ্ধ জীব যেহেতু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত, তাই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা দমন করার জন্য বিধিমার্গে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, মুক্ত পুরুষেরাই ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে পারেন, কিন্তু যাদের আমাদের দীক্ষা দিতে হবে তারা প্রায় সকলেই বদ্ধ জীব। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করে নিরপরাধে ভগবানের নাম কীর্তন করতে হবে, কিন্তু তবুও পূর্বজন্মের বদভ্যাসের ফলে এই সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি কখনও কখনও তারা লঙ্ঘন করে। তাই, ভগবানের নাম করার সঙ্গে সঙ্গে বিধিমার্গে ভগবানের আরাধনা করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৭৭

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গুরুদেবের কাছ থেকে এই আদেশ পেয়ে, আমি নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে লাগলাম এবং এভাবেই নাম নিতে নিতে আমার মন বিভ্রান্ত হল।

শ্লোক ৭৮

ধৈর্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই ভগবানের নাম নিতে নিতে আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না এবং তার ফলে আমি উন্মাদের মতো হাসতে লাগলাম, কাঁদতে লাগলাম, নাচতে লাগলাম এবং গান গাইতে লাগলাম।

শ্লোক ৭৯

তবে ধৈর্য ধরি' মনে করিলুঁ বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন নিজেকে একটু সংযত করে আমি বিচার করতে লাগলাম যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে করতে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিত করেছেন যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করার সময় আর ভগবৎ-তত্ত্ব নিয়ে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না, কেন না কীর্তনকারী আপনা থেকেই আনন্দে নিমগ্ন হন এবং সব রকম বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে উন্মাদের মতো তৎক্ষণাৎ কীর্তন করেন, নৃত্য করেন, হাসেন এবং কাঁদেন।

শ্লোক ৮০

পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি' নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি ভাবলাম যে, এভাবেই দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি, তখন আমি আমার গুরুদেবের চরণে সেই কথা নিবেদন করলাম।

তাৎপর্য

একজন আদর্শ আচার্যরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের দেখিয়ে গিয়েছেন যে, গুরুর প্রতি শিষ্যের কি রকম আচরণ করা উচিত। কোন বিষয়ে তাঁর মনে যখন সন্দেহ জাগে, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও নৃত্য করার সময় তিনি এক দিব্য উন্মাদনা অনুভব করেছিলেন, যা কেবল মুক্ত পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। তবুও এমন কি তাঁর মুক্ত অবস্থায়ও, কোন বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহের উদয় হলে তিনি সেই সম্বন্ধে তাঁর গুরুদেবকে নিবেদন করেছেন। এভাবেই যে-কোন অবস্থায়, এমন কি মুক্ত অবস্থায়ও আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমরা আমাদের গুরুদেব থেকে স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে, পারমার্থিক জীবনের প্রগতি সম্বন্ধে যখনই সন্দেহের উদয় হয়, তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে সেই কথা নিবেদন করা।

শ্লোক ৮১

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিয়েছেন? অদ্ভুত তার প্রভাব! সেই মন্ত্র জপ করতে করতে আমি পাগল হয়ে গেলাম।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* প্রার্থনা করেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

"হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে এক নিমেষকে আমার এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। অবিরত ধারায় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে এবং সমস্ত জগৎকে শূন্য বলে মনে হচ্ছে।" ভক্তের অভিলাষ হচ্ছে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় তাঁর দুই চোখ দিয়ে যেন আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে, ভাবের আবেগে গদ্‌গদ স্বরে তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে এবং হৃদয় স্পন্দিত হয়। এগুলিই হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের লক্ষণ। গভীর আনন্দে তখন গোবিন্দের বিরহে সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হয়। এটিই হচ্ছে গোবিন্দের বিরহের অনুভূতির লক্ষণ। জড় জগতে আমরা সকলেই গোবিন্দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিষয়ভোগে মগ্ন হয়ে পড়েছি। তাই, কেউ যখন চিন্ময় স্তরে প্রকৃতিস্থ হন, তখন তিনি গোবিন্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এতই আকুল হয়ে ওঠেন যে, গোবিন্দের বিরহে সমস্ত জগৎকে তাঁর শূন্য বলে মনে হয়।

শ্লোক ৮২

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন ।
এত শুনি' গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"দিব্যনাম কীর্তনের আনন্দ আমাকে হাসায়, নাচায় ও ক্রন্দন করায়। আমার এই কথা শুনে গুরুদেব হেসে বললেন—

তাৎপর্য

শিষ্য যখন পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করে, তখন গুরুদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হাসেন এবং মনে করেন, "আমার শিষ্য কত সফল হয়েছে!" তিনি এতই আনন্দ অনুভব করেন যে, তিনি হাসেন যেন তিনি শিষ্যের সাফল্য উপভোগ করছেন, ঠিক যেমন শিশু-সন্তানকে তার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখে অথবা হামাগুড়ি দিতে দেখে, হাস্যময় পিতা-মাতা আনন্দ অনুভব করেন।

শ্লোক ৮৩

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই হচ্ছে স্বভাব, যে তা জপ করে, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন, তখন তাঁর *ভাব* বা দিব্য আনন্দের অনুভূতি হয়। এই স্তর থেকে চিন্ময় উপলব্ধির শুরু হয়। ভগবৎ-প্রেমের বিকাশের এটিই হচ্ছে প্রাথমিক স্তর। এই ভাবের স্তর উল্লেখ করে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

"আমি হচ্ছি সমস্ত চেতন ও জড় জগতের উৎস। আমার থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়। সেই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষেরা ভক্তিযুক্ত হয়ে সর্বান্তঃকরণে আমার ভজনা করে।" নবীন ভক্ত শ্রবণ, কীর্তন, ভক্তসঙ্গ ও বিধি-নিষেধ অনুশীলন আদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সাধন করতে শুরু করেন এবং তার ফলে তাঁর সমস্ত অবাঞ্ছিত বদভ্যাসগুলি দূর হয়। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর রতি জন্মায় এবং এক নিমেষের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে থাকতে পারেন না। *ভাব* হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে প্রায় সাফল্য অর্জনের স্তর।

ঐকান্তিক শিষ্য শ্রবণ করার মাধ্যমে গুরুদেবের কাছ থেকে ভগবানের দিব্যনাম প্রাপ্ত হন এবং দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি গুরুদেব প্রদত্ত বিধি-নিষেধগুলি অনুসরণ করেন। এভাবেই যখন যথাযথভাবে দিব্য নামের সেবা করা হয়, তখন আপনা থেকেই নামের স্বাভাবিক ক্রিয়া শুরু হয়; পক্ষান্তরে, ভক্ত তখন নিরপরাধে নাম করার যোগ্যতা অর্জন করেন। এভাবেই কেউ যখন পূর্ণরূপে দিব্যনাম কীর্তন করার উপযুক্ত হন, তখন তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে শিষ্য গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং প্রকৃত জগদ্‌গুরুতে পরিণত হন। তখন তাঁর প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করে। এভাবেই এই ধরনের গুরুদেবের সমস্ত শিষ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর থেকে গভীরতর ভাবে অনুরক্ত হন এবং তাই তিনি কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন, কখনও নৃত্য করেন এবং কখনও কীর্তন করেন। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীঅঙ্গে এই লক্ষণগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কৃষ্ণভক্তেরা যখন কীর্তন করে এবং নৃত্য করে, তখন বিদেশীদের এভাবেই আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য-কীর্তন করতে দেখে ভারতবাসীরা পর্যন্ত আশ্চর্য হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন যে, শুধু অভ্যাসের ফলেই যে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায় তা নয়, বরং যিনি আন্তরিকতার সঙ্গে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় স্বভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ কিছু মূর্খ লোক আমাদের উচ্চস্বরে কীর্তনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রভাবে যিনি যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হয়েছেন, তাঁর সান্নিধ্যে অন্যরাও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, *কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন*—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ শক্তি ছাড়া হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা প্রচার করা যায় না। ভক্তদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের ফলেই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবানের দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাচ্ছে। ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ করার সময়, কীর্তন করার সময় এবং নৃত্য করার সময় আপনা থেকেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা মনে পড়ে যায় এবং যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, তাই কীর্তনকারী তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হন। এভাবেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সেবা করার স্বাভাবিক বৃত্তিতে যুক্ত হন। এভাবেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার বৃত্তিকে বলা হয় *ভাব* এবং এই স্তরে তিনি নিরন্তর বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন। যিনি এই *ভাবের* স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি আর মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন না। অন্য সমস্ত চিন্ময় লক্ষণগুলি, যথা—রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি যখন এই ভাবের স্তরে যুক্ত হয়, তখন ভগবদ্ভক্ত ধীরে ধীরে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামকে বলা হয় *মহামন্ত্র*। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বর্ণিত অন্য সমস্ত মন্ত্রগুলিকে কেবল *মন্ত্র* বলা হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত এই মন্ত্রকে বলা হয় *মহামন্ত্র*।

শ্লোক ৮৪

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, কামভোগ ও মুক্তি—এই চারটি হচ্ছে চতুর্বর্গ, কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় এই চতুর্বর্গ পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণের মতোই অর্থহীন।

তাৎপর্য

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, কামভোগ এবং চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি—এই জড় বাসনাগুলি করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন যে, জীবনের চরম প্রাপ্তি হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম (*প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদম্*)। আমরা যখন ভগবৎ-প্রেমের সঙ্গে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তুলনা করি, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এগুলি বুভুক্ষু বা জড় জগৎ ভোগ করার আকাঙ্ক্ষী এবং মুমুক্ষু বা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, এদের কাম্য হতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের প্রাথমিক স্তরের ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন যে ভক্ত, তাঁর কাছে এগুলি অত্যন্ত নগণ্য।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হচ্ছে জড়-জাগতিক স্তরে ধর্মের চারটি পর্যায়। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে, *ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র*—এই চারটি জড় আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত ছল ধর্ম *শ্রীমদ্ভাগবতে* সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়েছে, কেন না *শ্রীমদ্ভাগবতে* কেবল জীবের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের পুনর্জাগরণের শিক্ষা দান করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রাথমিক পাঠ এবং তাই তার শেষ কথা হচ্ছে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) এই পন্থা অবলম্বন করতে হলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমস্ত ধারণা ত্যাগ করে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। এই ভগবানের সেবা চতুর্বর্গের অতীত। ভগবৎ-প্রেম হচ্ছে জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাই তা জীবাত্মা ও ভগবানের মতোই নিত্য। এই নিত্যত্বকে বলা হয় সনাতন। ভক্ত যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় প্রতিষ্ঠিত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছেন। তখন ভগবানের দিব্য নামের প্রভাবে সব কিছুই আপনা থেকেই সম্পাদিত হয় এবং ভক্ত স্বাভাবিক ভাবেই পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

শ্লোক ৮৫

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু ।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো, তার তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আনন্দ একবিন্দুর মতোও নয়।

শ্লোক ৮৬

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্বশাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম পুনর্জাগরিত করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। তোমার চিত্তে সেই প্রেমের উদয় হয়েছে, তাই তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।

শ্লোক ৮৭

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব হচ্ছে দেহ ও মনে চিন্ময় ক্ষোভের উদ্রেক করে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় লাভের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর লোভের সৃষ্টি হয়।

শ্লোক ৮৮

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায় ।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কারও চিত্তে যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও হাসেন, কখনও গান করেন এবং কখনও উন্মাদের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বলেছেন যে, ভগবদ্ভক্তিবিহীন মানুষেরা কখনও কখনও প্রেমের এই সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে কৃত্রিমভাবে তারা হাসে, কাঁদে এবং উন্মাদের মতো নৃত্য করে, কিন্তু তাতে তারা কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করে না। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিকভাবেই যখন দেহে ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তখন এই সমস্ত কৃত্রিম লোকদেখানো বিকারগুলি পরিত্যাগ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় অনুভূতি থেকে হাস্য, ক্রন্দন ও নৃত্য আদির মাধ্যমে যে প্রকৃত আনন্দময় জীবন, তা হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির মার্গে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরাই এই স্তর প্রাপ্ত হন। অন্তরে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ না করে যারা বাইরে কৃত্রিমভাবে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ করে, তারা মানব-সমাজে কেবল উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৮৯-৯০

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য ।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্গদ স্বর, বৈবর্ণ্য, উন্মাদনা, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ ও দৈন্য—এগুলি হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের কয়েকটি স্বাভাবিক লক্ষণ, যা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় ভক্তকে নাচায় এবং আনন্দামৃতের সমুদ্রে ভাসায়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *প্রীতিসন্দর্ভে* (৬৬) ভগবৎ-প্রেমের এই স্তর বিশ্লেষণ করে লিখেছেন—*ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি। কিং তর্হি, স্বরূপ-শক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপীতি।* তেমনই, নবষষ্টীতম শ্লোকে তিনি আরও বলেছেন—

তদেবং প্রীতের্লক্ষণং চিত্তদ্রবস্তস্য চ রোমহর্ষাদিকম্। কথঞ্চিজ্জাতেঽপি চিত্তদ্রবে রোমহর্ষাদিকে বা ন চেদাশয়শুদ্ধিস্তদাপি ন ভক্তেঃ সম্যগাবির্ভাব ইতি জ্ঞাপিতম্। আশয়শুদ্ধির্নাম চান্যতাৎপর্যপরিত্যাগঃ প্রীতিতাৎপর্যং চ। অত এবানিমিত্তা স্বাভাবিকী চেতি তদ্বিশেষণম্। অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেম এই জড় জগতের বস্তু নয়, কেন না তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দরূপা স্বরূপশক্তি। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানও তাঁর আনন্দ প্রদায়িনী শক্তির পরাধীন, তাই কেউ যখন এই প্রকার ভগবৎ-প্রেমানন্দের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁর চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং রোমাঞ্চ আদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও কোন মানুষকে এভাবেই দ্রবীভূত হতে এবং এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে দেখা যায় অথচ তাদের ব্যবহারের ত্রুটি থাকে। তখন বুঝতে হবে যে, তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। পক্ষান্তরে, যদি কোন ভক্তকে ভগবৎ-প্রেমানন্দে নৃত্য এবং ক্রন্দন করা সত্ত্বেও জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকতে দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা অর্জন করতে পারেননি। এই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতার স্তরকে বলা হয় *আশয়শুদ্ধি*। যিনি *আশয়শুদ্ধির* স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি সব রকম জড় ভোগের প্রতি বিরক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমানন্দে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সব রকম জড় উদ্দেশ্য রহিত হয়ে শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হয়, তখন *আশয়শুদ্ধির* লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এগুলি হচ্ছে চিন্ময় ভগবৎ-প্রেমের বৈশিষ্ট্য। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

"পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা প্রেমভক্তিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, কেন না তার ফলে আত্মা সর্বতোভাবে প্রসন্ন হয়।"

শ্লোক ৯১

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হে বৎস! তুমি যে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছ তাতে খুব ভাল হয়েছে। তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি এবং আমি কৃতার্থ হয়েছি।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, গুরুদেব যদি অন্তত একজনকেও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে পারেন, তা হলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সব সময় বলতেন, "এই সমস্ত মঠ-মন্দির ও সম্পত্তির পরিবর্তে যদি আমি অন্তত একজন মানুষকেও

শুদ্ধ ভক্তে পরিণত করতে পারি, তা হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে।" কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং, কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যে কত দুষ্কর, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং গুরুদেবের কৃপায় যদি একজন শিষ্যও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন, তা হলে গুরুদেব অত্যন্ত প্রীত হন। শিষ্য টাকা-পয়সা নিয়ে এলে গুরুদেব প্রকৃতপক্ষে খুশি হন না। কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, শিষ্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করে পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করছে, তখন তিনি অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁর কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ বলে মনে করেন।

শ্লোক ৯২

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'বৎস! নাচ, গাও এবং ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন কর। তা ছাড়া, তুমি কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করার মহিমা সম্পর্কে সকলকে উপদেশ দাও, কেন না এভাবেই তুমি সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে পারবে।'

তাৎপর্য

গুরুদেব চান যে, তাঁর শিষ্যরা বিধি-নিষেধগুলি পালন করে কেবলমাত্র নৃত্য-কীর্তন করুক তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা যেন জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারও করুক, কেন না কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে নিজে ভগবদ্ভক্তি আচরণ করে অপরের মঙ্গলের জন্য তা প্রচার করা। দুই প্রকার ঐকান্তিক ভক্ত রয়েছেন—*গোষ্ঠ্যানন্দী* ও *ভজনানন্দী*। যাঁরা কেবল নিজের জন্য ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে সন্তুষ্ট থাকেন তাঁদের বলা হয় *ভজনানন্দী*, আর যাঁরা কেবল ভক্তিমার্গে নিজেদের সিদ্ধিলাভ করেই সন্তুষ্ট নন, পক্ষান্তরে অপরকেও ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার মাধ্যমে পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে দেখতে চান, তাঁদের বলা হয় *গোষ্ঠ্যানন্দী*। *গোষ্ঠ্যানন্দীর* একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব যখন বর প্রার্থনা করতে বললেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন—

নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥

"হে ভগবান! আমার নিজের কোন সমস্যা নেই এবং আপনার কাছ থেকে কোন বর চাই না, কারণ আপনার দিব্যনাম কীর্তন করেই আমি সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট, কারণ যখনই আমি আপনার নাম কীর্তন করি, তখনই আমি আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হই। আমার কেবল সেই জন্যই অনুশোচনা হয়, যখন দেখি অন্যরা আপনার

প্রতি প্রেমভক্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্ষণস্থায়ী জড় সুখভোগের জন্য তারা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নানাভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং ভগবৎ-প্রেমের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আশায় দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করে তাদের জীবনের অপচয় করছে। আমি কেবল তাদেরই জন্য অনুশোচনা করি এবং মায়ার বন্ধন থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করি।" (*ভাগবত* ৭/৯/৪৩)।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বিশ্লেষণ করেছেন, "যে মানুষ তাঁর ঐকান্তিক সেবার দ্বারা গুরুদেবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, তিনি সমগোত্রীয় কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করতে ভালবাসেন। গুরুদেব এই ধরনের শিষ্যকে সমস্ত পৃথিবীর পতিত জীবদের উদ্ধার করার দায়িত্ব দান করেন। যাঁরা ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করেননি তাঁরাই কেবল নির্জন স্থানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে চান।" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায় তা হচ্ছে এক প্রকারের প্রবঞ্চনা, কেন না তাঁরা হরিদাস ঠাকুরের মতো অতি উন্নত ভক্তের কার্যকলাপের অনুকরণ করতে চান। এভাবেই অতি উন্নত ধরনের ভক্তের আচরণ অনুকরণের চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা; তা হলেই পারমার্থিক পথে সাফল্য অর্জন করা যায়। যাঁরা প্রচারকার্যে দক্ষ নন, তাঁরা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করে নির্জন স্থানে ভজন করতে পারেন। কিন্তু যিনি ভক্তিমার্গে যথার্থই উন্নত, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিবিহীন মানুষদের কাছে ভগবানের মহিমা প্রচার করে তাদেরকেও ভগবদ্ভক্তির অমৃত ও রস আস্বাদন করানো। ভক্ত অভক্তদের সঙ্গদান করেন, কিন্তু তাদের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হন না। এভাবেই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে এমন কি ভগবদ্ভক্তিহীন জীবেরা ভগবানের ভক্তে পরিণত হওয়ার সুযোগ পান। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীমদ্ভাগবতের নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ* (১০/৩৩/৩০) এবং *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* (পূর্ব ২/২৫৫) নিম্নলিখিত শ্লোকটি আলোচনা করতে উপদেশ দিয়েছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

মহাপুরুষদের কার্যকলাপের অনুকরণ করা উচিত নয়। জড় সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সব কিছু গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৯৩

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কথা বলে, আমার গুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আমায় শিখিয়েছিলেন এবং বারংবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, এটি হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের সার।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের (১১/২/৪০) এই শ্লোকটি বসুদেবকে ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করার সময় নারদ মুনির উক্তি। বসুদেব ইতিমধ্যেই ভাগবত-ধর্মের মানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গৃহে তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে নারদ মুনির কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে মহান ভক্তের বিনীত মনোভাব।

শ্লোক ৯৪

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

এবংব্রতঃ—এভাবেই যখন কেউ নৃত্য-কীর্তনে ব্রতপরায়ণ হন; **স্ব**—নিজে; **প্রিয়**—অত্যন্ত প্রিয়; **নাম**—ভগবানের দিব্যনাম; **কীর্ত্যা**—কীর্তন করে; **জাত**—এভাবেই বিকশিত হয়; **অনুরাগঃ**—অনুরাগ; **দ্রুত-চিত্তঃ**—অত্যন্ত আগ্রহভরে; **উচ্চৈঃ**—জোরে জোরে; **হসতি**—হাসেন; **অথো**—ও; **রোদিতি**—ক্রন্দন করেন; **রৌতি**—উত্তেজিত হন; **গায়তি**—গান করেন; **উন্মাদবৎ**—উন্মাদের মতো; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে; **লোক-বাহ্যঃ**—কে কি বলে তার অপেক্ষা না করে।

অনুবাদ

" 'কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থ উন্নতি সাধন করেন এবং তার অতি প্রিয় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে আনন্দমগ্ন হন, তখন তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করেন। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন এবং কখনও উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাইরের লোকেরা কে কি বলে সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান থাকে না।'

শ্লোক ৯৫-৯৬

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি' ।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করি ॥ ৯৫ ॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায় ।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গুরুদেবের এই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস করে আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করি।

সেই কৃষ্ণনাম কখনও আমাকে গাওয়ায় এবং নাচায়, তাই আমি নাচি ও গান করি। আমি নিজের থেকেই তা করি না, নামের প্রভাবে আপনা থেকেই তা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

যে মানুষ গুরুদেবের বাক্যে আস্থা না রেখে স্বাধীনভাবে কার্য করে, সে কখনও ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে পারে না। *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপঃ* ৬/২৩) বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান ও গুরুদেবের বাণীতে যাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, সেই মহাত্মার কাছেই বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।" এই বৈদিক নির্দেশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা এই নির্দেশের সমর্থন করে গিয়েছেন। তাঁর গুরুদেবের বাক্যে বিশ্বাস করে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা করেছেন, ঠিক যেমন আজকের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের গুরু-মহারাজের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের প্রভাবে। তিনি চেয়েছিলেন, আমরা যেন ভগবানের বাণী প্রচার করি এবং তাঁর সেই নির্দেশের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে আমি চেষ্টা করেছিলাম কোন না কোনভাবে তাঁর সেই নির্দেশ পালন করতে এবং আজ এই আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে সাফল্য লাভ করেছে। তাই, শ্রীগুরুদেব ও পরমেশ্বর ভগবানের বাণীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করাই হচ্ছে সফল হওয়ার গোপন রহস্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ কখনও অমান্য করেননি এবং সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার বন্ধ করেননি। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর সমস্ত শিষ্যদের সংঘবদ্ধভাবে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু স্বার্থান্বেষী মূর্খ শিষ্য তাঁর সেই নির্দেশ অমান্য করেন। তাঁরা সকলেই চেয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে এবং তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের আদেশ অমান্য করে আদালতে মামলা মোকদ্দমা শুরু করেছিলেন, তার ফলে প্রচার বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে পড়ে। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং তা নিয়ে আলোচনা করতে অন্তরে আমি প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করি, কিন্তু তবুও এই সত্য প্রকাশ করতে আমি বাধ্য হই যাতে ভবিষ্যতে আমরা সেই ভুল না করি। আমরা আমাদের গুরু-মহারাজের বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করে অত্যন্ত বিনীতভাবে এই আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তখন আমরা ছিলাম অত্যন্ত অসহায়—কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই আন্দোলন আজ সফল হয়েছে।

আমাদের বুঝতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তন ও নৃত্য সম্পাদিত হয়েছিল চিৎ-জগতের হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের দিব্য নামকে জড় শব্দতরঙ্গ বলে কখনই মনে করেননি। এমন কি কোন শুদ্ধ ভক্তও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে জড় সঙ্গীত বলে মনে করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও দিব্য নামের

প্রভু হওয়ার চেষ্টা করেননি; পক্ষান্তরে তিনি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন কিভাবে ভগবানের দিব্য নামের সেবক হতে হয়। সাফল্যের রহস্য না জেনে কেউ যদি লোকদেখাবার জন্য ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করে, তা হলে তার পিত্ত বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু সে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঐকান্তিক বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমি অত্যন্ত মূর্খ এবং ভাল-মন্দ বিচার করার জ্ঞান আমার নেই। *বেদান্তসূত্রের* প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমি কখনও শঙ্কর-সম্প্রদায় বা মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিনি। মায়াবাদী দার্শনিকদের যুক্তিহীন তর্কের প্রতি আমি অত্যন্ত ভীত। তাই, তাদের *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যায় কোন প্রামাণিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করি যে, কেবল ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে জড় জগতের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়। আমি বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করা যায়। এই কলহ ও মতভেদের যুগে, ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনই হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও বলেছিলেন, "ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে আমি উন্মাদের মতো হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার গুরুদেবের কাছে অনুসন্ধানের পর আমি জানতে পেরেছি যে, জড়-জাগতিক সুখভোগের আশায় ধর্ম অনুশীলন (ধর্ম), অর্থনৈতিক উন্নতি (অর্থ), ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ (কাম) এবং জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি (মোক্ষ), এই চতুর্বর্গ লাভের প্রচেষ্টা না করে, যেভাবেই হোক ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ করাই হচ্ছে জীবনের পরম মঙ্গল। চতুর্বর্গের ঊর্ধ্বে এই পঞ্চম পুরুষার্থ লাভই হচ্ছে জীবনের পরম সাফল্য। যিনি এই ভগবৎ-প্রেম লাভ করেছেন, তিনি লোকে কি বলে না বলে তার অপেক্ষা না করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৃত্য-কীর্তন করেন।" জীবনের এই অবস্থাকে বলা হয় ভাগবত-জীবন বা ভক্তজীবন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও বলেছিলেন, "লোকদেখানোর জন্য আমি নৃত্য-কীর্তন করি না। গুরুদেবের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস করে আমি নৃত্য-কীর্তন করি। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যদিও এই নৃত্য-কীর্তন পছন্দ করেন না, কিন্তু তবুও গুরুদেবের বাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমি তা করে যাই। অতএব এই নৃত্য-কীর্তনে আমার কোন কৃতিত্ব নেই, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার প্রভাবে তা আপনা থেকেই সম্পাদিত হচ্ছে।"

শ্লোক ৯৭

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে যে আনন্দামৃত-সিন্ধু আস্বাদন করা যায়, তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হচ্ছে অগভীর খাদের জলের মতো।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (*পূর্ব* ১/৩৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি ॥

"নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার ফলে যে ব্রহ্মানন্দ বা চিন্ময় আনন্দ অনুভব করা যায়, তাকে যদি পরার্ধগুণ বর্ধিত করা যায়, তা হলেও তা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির এক আণবিক কণার সমতুল্য হতে পারে না।"

শ্লোক ৯৮

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে ।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯৮ ॥

ত্বৎ—তোমার; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ লাভ; **করণ**—এই ধরনের ক্রিয়া; **আহ্লাদ**—আনন্দ; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **অব্ধি**—সমুদ্র; **স্থিতস্য**—অবস্থিত হয়ে; **মে**—আমার দ্বারা; **সুখানি**—সুখ; **গোষ্পদায়ন্তে**—বাছুরের খুরের চাপে তৈরি ছোট গর্ত; **ব্রাহ্মাণি**—নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি জাত আনন্দ; **অপি**—ও; **জগৎ-গুরো**—হে জগদ্গুরু।

অনুবাদ

" 'হে জগদ্গুরু ভগবান! প্রত্যক্ষভাবে তোমার দর্শন লাভ করে আমি আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছি। তার ফলে এখন আমি বুঝতে পারছি যে, ব্রহ্মানন্দের তথাকথিত সুখ গো-বাছুরের পায়ের খুরের চাপে তৈরি ছোট গর্তের জলের মতো।' "

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভগবৎ-সেবায় যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন করা যায়, তা সমুদ্রের মতো, আর জড়-জাগতিক সুখ এবং এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি প্রসূত সুখ ঠিক গোষ্পদের জলের মতো। এই শ্লোকটি *হরিভক্তি-সুধোদয়* (১৪/৩৬) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৯৯

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা শুনে সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অভিভূত হলেন। তাঁদের চিত্তের পরিবর্তন হল এবং তাঁরা তখন মধুর স্বরে বললেন—

তাৎপর্য

বারাণসীতে মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমালোচনা করেছিলেন, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করছিলেন, যা তাঁরা পছন্দ করেননি। সংকীর্তন

আন্দোলনে বিরোধিতা করার জন্য আসুরিক বৃত্তি চিরকালই রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে যেমন ছিল, তেমনই তারও বহু আগে প্রহ্লাদ মহারাজের সময়েও তা ছিল। প্রহ্লাদ মহারাজ সংকীর্তন করতেন যদিও তাঁর পিতা তা পছন্দ করতেন না। তার ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিরোধ হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/১৫) ভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"যারা অত্যন্ত মূর্খ, যারা নরাধম, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা হচ্ছে *আসুরং ভাবমাশ্রিতা,* অর্থাৎ তারা আসুরিক পন্থা অবলম্বন করেছে এবং তারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। মায়াবাদীরা বলে যে, সব কিছুর পরম উৎস হচ্ছে নির্বিশেষ এবং এভাবেই তারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ভগবান নেই এই কথা যারা বলে, তারা সরাসরিভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। আর যারা বলে ভগবান আছেন, কিন্তু তাঁর মাথা নেই, পা নেই, হাত নেই, তিনি কথা বলতে পারেন না, শুনতে পারেন না এবং খেতে পারেন না, তা হচ্ছে পরোক্ষভাবে ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। যে মানুষ দেখতে পায় না তাকে বলা হয় অন্ধ, আর যে মানুষ চলতে পারে না তাকে বলা হয় খঞ্জ, যার হাত নেই তাকে বলা হয় অসহায়, যে কথা বলতে পারে না তাকে বলা হয় মূক এবং যে শুনতে পায় না তাকে বলা হয় বধির। মায়াবাদীদের মতে ভগবানের পা নেই, চোখ নেই, কান নেই এবং হাত নেই—তা পরোক্ষভাবে ভগবানকে অন্ধ, মূক, খঞ্জ, অসহায় আদি বলে অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই যদিও তারা নিজেদের মহা বৈদান্তিক বলে প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা;* অর্থাৎ, যদিও তাদের বড় বড় পণ্ডিত বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

মায়াবাদীরা সব সময় বৈষ্ণবদের বিরোধিতা করে, কেন না বৈষ্ণবেরা পরম পুরুষকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সেবা করতে চায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় এবং তাঁকে দেখতে চায়, ঠিক যেমন ভগবানও তাঁর ভক্তদের দেখতে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে, তাঁদের সাথে একসঙ্গে বসে খেতে এবং তাঁদের সঙ্গে নাচতে আগ্রহী। এই সবিশেষ প্রীতির বিনিময় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের চিত্তে অনুভূতি জাগায় না। তাই, কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল, ভগবান সম্বন্ধে তাঁর সবিশেষ ধারণাকে পরাস্ত করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু একজন আদর্শ প্রচারকরূপে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মনোভাবের পরিবর্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধুর বাণী শুনে তাঁদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে মিষ্ট বাক্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তেমনই, সমস্ত প্রচারকদের নানা বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু তাঁরা যেন কখনও তাদের শত্রুতে পরিণত না

করেন। এমনিতেই তারা শত্রু, আর তার উপর যদি তাদের সঙ্গে কর্কশভাবে ও অবিনীতভাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে তাদের শত্রুতা কেবল বৃদ্ধি পাবে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, যতদূর সম্ভব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং শাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও আচার্যদের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে তাদের চিত্তে প্রত্যয় উৎপন্ন করানো। এভাবেই আমাদের ভগবৎ-বিদ্বেষীদের পরাস্ত করতে চেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ১০০

যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয় ।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"হে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তুমি যা বললে তা সবই সত্য। যে মহা সৌভাগ্যবান, সেই কেবল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

যিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, তিনিই কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত শুরু করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকে বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

জড় প্রকৃতির নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ অসংখ্য জীব রয়েছে এবং তারা এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে চলেছে। তাদের মধ্যে যিনি ভাগ্যবান, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে আসেন এবং ভগবদ্ভক্তির মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সদ্‌গুরু বা আচার্যের পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে তিনি ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন। যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে এবং তার ফলে যিনি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হয়েছেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এই কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে স্বীকার করেন। কৃষ্ণভক্ত হওয়া সহজ নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবেই যে তা সম্ভব, সেই কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে অচিরেই প্রমাণিত হবে।

শ্লোক ১০১

কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি কৃষ্ণে ভক্তি কর তাতে কোন আপত্তি নেই, পক্ষান্তরে তার ফলে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট। কিন্তু তুমি বেদান্তসূত্র আলোচনা করতে চাও না কেন? তার কি দোষ?"

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, "মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মনে করে যে, শারীরক-ভাষ্য নামক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকৃত *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যা, যা অদ্বৈতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে *বেদান্তসূত্রের* যথার্থ ভাষ্য। এভাবেই তারা *বেদান্তসূত্র, উপনিষদ* ও অন্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র তাদের নির্বিশেষ মতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। একজন প্রখ্যাত মায়াবাদী সন্ন্যাসী সদানন্দ যোগীন্দ্র *বেদান্তসার* নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি লিখেছেন, *বেদান্তো নাম উপনিষৎ-প্রমাণম্, তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।* সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে শঙ্করাচার্যকৃত *উপনিষদ* ও *বেদান্তের শারীরক-ভাষ্য* হচ্ছে বৈদিক প্রমাণের একমাত্র উৎস। কিন্তু আসলে *বেদান্ত* বলতে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্মকে বোঝায় এবং শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্য* ছাড়া *বেদান্তের* মধ্যে আর কিছু নেই তা ঠিক নয়। বৈষ্ণব আচার্যদের রচিত আরও অনেক *বেদান্ত* ভাষ্য রয়েছে এবং তাঁরা কেউই শঙ্করাচার্যকে অনুসরণ করেননি, অথবা তাঁর কল্পনাপ্রসূত ভাষ্যকে স্বীকার করেননি। তাঁদের ভাষ্যসমূহ দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী অদ্বৈতবাদীরা প্রতিপন্ন করতে চায় যে, ভগবান ও জীব এক এবং পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার পরিবর্তে তারা নিজেরাই ভগবান হতে চায়। তারা অন্যদের কাছে ভগবানের মতো পূজিত হতে চায়। এই ধরনের মানুষেরা শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধ-দ্বৈত, *বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত* ও *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ*—বৈষ্ণব আচার্যদের এই সমস্ত দর্শন স্বীকার করে না। মায়াবাদীরা এই সমস্ত দর্শন আলোচনা করে না, কেন না তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, তাদের *কেবলাদ্বৈতবাদ* হচ্ছে একমাত্র দর্শন। এই দর্শনকে তারা *বেদান্তসূত্রের* বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে মনে করে তারা বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে কেবল ভাবপ্রবণতা মাত্র। তাদের বলা হয় মায়াবাদী, কারণ তাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ মায়ার দ্বারা রচিত এবং তাঁর প্রতি ভক্তের যে ভক্তিমূলক সেবা তাও মায়া। তারা মনে করে যে, এই প্রকার ভগবদ্ভক্তিও সকাম কর্মেরই (*কর্মকাণ্ডের*) একটি অঙ্গ। তাদের দৃষ্টিতে *ভক্তিই* হচ্ছে মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা অথবা ধ্যান। এটিই হচ্ছে মায়াবাদী দর্শন ও বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ১০২

এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন ।
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের এই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে আমি কিছু বলব।"

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি সমর্থন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন

তিনি বেদান্ত-দর্শন আলোচনা করেন না। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত বৈষ্ণব আচরণই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবেরা কখনও বেদান্তের অবমাননা করেন না, তবে তাঁরা *শারীরক-ভাষ্যের* ভিত্তিতে বেদান্ত হৃদয়ঙ্গম করতে চান না। তাই, সেই সংশয় দূর করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে তাদের বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

বৈষ্ণবেরা হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীল জীব গোস্বামী, যাঁর দর্শন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা চারশো বছর পর আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সকলেরই খুব ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, বৈষ্ণব দার্শনিকেরা ভাবুক নন অথবা সহজিয়াদের মতো সস্তা ভক্ত নন। সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যরা ছিলেন মহান পণ্ডিত ও পূর্ণরূপে বেদান্তকর্তা, কেন না বেদান্ত-দর্শন না জানলে আচার্য হওয়া যায় না। *বেদের* অনুগামী ভারতীয় পরমার্থবাদীদের মধ্যে আচার্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করতে হলে তাঁকে অবশ্যই পাঠ করার মাধ্যমে অথবা শ্রবণ করার মাধ্যমে বেদান্ত-দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়।

বেদান্ত-দর্শনের অনুসরণের ফলে ভক্তির বিকাশ হয়। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১২) বলা হয়েছে—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥

এই শ্লোকে *ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া* কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না তাতে বোঝানো হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি উপনিষদ ও বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"*বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র* আদি বিধি-বিধান ছাড়াই সম্পাদিত যে ভক্তি, তা ভাবুকতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তা কেবল সমাজে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।" বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণব রয়েছেন (কনিষ্ঠ অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারী)। কিন্তু মধ্যম অধিকারী প্রচারক হতে হলে, *বেদান্তসূত্র* ও অন্যান্য শাস্ত্রে যথেষ্ট পারদর্শী হতে হয়। কারণ, বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তিতে যখন ভক্তিযোগের বিকাশ হয়, তখন তা অকৃত্রিম ও দৃঢ় হয়। এই সম্পর্কে উপরোক্ত (*ভাগবত* ১/২/১২) শ্লোকটির অনুবাদ ও তাৎপর্য উল্লেখ করা যায়—

অনুবাদ

অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় এবং নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনিগণ জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে শাস্ত্র শ্রবণজনিত উপলব্ধি অনুসারে, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার দ্বারা তাঁদের শুদ্ধ হৃদয়ে পরমাত্মারূপে সেই তত্ত্ববস্তুকে দর্শন করেন।

তাৎপর্য

বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমতত্ত্বকে জানা যায় এবং তিনিই হচ্ছেন পূর্ণ পরমতত্ত্ব। ব্রহ্ম হচ্ছে তাঁর দেহ-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা এবং পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশ। তাই ব্রহ্ম-উপলব্ধি অথবা পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের আংশিক উপলব্ধি। চার শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। কর্মীরা হচ্ছে জড়বাদী, কিন্তু অন্য তিন শ্রেণীর মানুষেরা অধ্যাত্মবাদী। সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্তবৃন্দ, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় স্তরের অধ্যাত্মবাদী হচ্ছে তাঁরা, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ-প্রকাশ পরমাত্মাকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা সেই পরম পুরুষের চিন্ময় রশ্মিচ্ছটা দর্শন করেছেন। *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির মাধ্যমেই কেবল জানা যায়। আমরা ইতিপূর্বেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে কিভাবে ভক্তিযোগ অবলম্বন করা যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করেছি। যেহেতু ব্রহ্ম-উপলব্ধি ও পরমাত্মা-উপলব্ধি হচ্ছে পরমতত্ত্বের অপূর্ণ উপলব্ধি, তাই ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা উপলব্ধির পন্থা দুটিও অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ পরমতত্ত্ব উপলব্ধির অপূর্ণ পন্থা। ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ জ্ঞান, জড় বিষয়াসক্তি রহিত বৈরাগ্য ও *বেদান্ত-শ্রুতির* ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পূর্ণাঙ্গ পন্থাটির মাধ্যমেই কেবল ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। তাই, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন অধ্যাত্মবাদীদের জন্য নয়।

তিন রকমের ভক্ত রয়েছেন, যথা—উত্তম অধিকারী ভক্ত, মধ্যম অধিকারী ভক্ত ও কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত হচ্ছে তারা, যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই এবং যাঁরা জড় বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত নয়, কিন্তু তারা মন্দিরে ভগবানের পূজার প্রতি আকৃষ্ট। তাদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত। প্রাকৃত ভক্তরা পারমার্থিক উন্নতির থেকে জড় বিষয় লাভের প্রতি বেশি আসক্ত। তাই, এই প্রাকৃত ভক্তের স্তর থেকে মধ্যম অধিকারী ভক্তের স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য একজন ভক্তকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। মধ্যম অধিকারীর স্তরে ভক্ত ভক্তিমার্গের চারটি তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, যথা—পরমেশ্বর ভগবান, ভগবানের ভক্ত, ভগবান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষ ও ভগবৎ-বিদ্বেষী। পরমতত্ত্বকে জানবার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য ভক্তকে অন্তত মধ্যম অধিকারীর স্তরে উন্নীত হতে হবে।

সেই জন্য কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে *ভাগবতের* প্রামাণিক সূত্র থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এবং অন্য ভাগবত হচ্ছেন ভগবানের বাণী। কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তকে তাই ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে জানবার জন্য ব্যক্তি-ভাগবতের শরণাগত হতে হয়। এই ধরনের ব্যক্তি-ভাগবত *ভাগবতের* পেশাদারি পাঠক নয়, যারা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভাগবত পাঠ করে অর্থ উপার্জন করে। এই প্রকার ব্যক্তি-ভাগবতকে অবশ্যই শ্রীল সূত গোস্বামীর মতো শুকদেব

গোস্বামীর প্রতিনিধি হতে হবে এবং অবশ্যই জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে। কনিষ্ঠ ভক্তের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক সূত্র থেকে ভগবানের কথা শ্রবণে কোন রুচি নেই বললেই চলে। কনিষ্ঠ ভক্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য পেশাদারি ভাগবত পাঠকের কাছে পাঠ শোনার অভিনয় করে। কিন্তু তাদের এই ধরনের কলুষযুক্ত শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে সর্বনাশ হয়, তাই এই ভ্রান্ত পন্থা সম্বন্ধে সকলকে খুব সতর্ক হতে হবে। *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বারংবার বর্ণিত ভগবানের পবিত্র বাণী নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু, কিন্তু তা হলেও তা পেশাদারি মানুষদের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত নয়, কেন না সর্পের জিহ্বার স্পর্শে দুধ যেমন বিষে পরিণত হয়, ঠিক তেমনই এই পেশাদারি পাঠকদের মুখ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনলে তার ফলও বিষবৎ হয়।

তাই, ঐকান্তিক ভক্তকে তাঁর পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের জন্য *উপনিষদ, বেদান্ত* এবং পূর্বতন আচার্য অথবা গোস্বামীদের প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই সমস্ত গ্রন্থাবলী শ্রবণ না করলে কেউই যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারে না। আর শ্রবণ ও অনুশীলন না করলে কেবল লোকদেখানো ভক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তা ভক্তির পথে উৎপাত-বিশেষ। তাই ভগবদ্ভক্তি যদি *শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ* অথবা *পঞ্চরাত্র* আদি প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা হলে লোকদেখানো ভক্তি তৎক্ষণাৎ বর্জন করতে হবে। অনধিকারী মানুষকে কখনও শুদ্ধ ভক্ত বলে মনে করা উচিত নয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মারূপে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ে দর্শন করা যায়। তাকে বলা হয় *সমাধি*।

শ্লোক ১০৩

ইহা শুনি' বলে সর্ব সন্ন্যাসীর গণ ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কিছুটা বিনয়াবনত হন এবং বলেন, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ।"

তাৎপর্য

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন। যখনই তাঁরা অন্য কোন সন্ন্যাসীকে দেখেন, তখন *ওঁ নমো নারায়ণ* ("আমি নারায়ণরূপী তোমাকে প্রণতি জানাই") বলে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যদিও তাঁরা খুব ভাল মতেই জানেন যে, তিনি কি ধরনের নারায়ণ। নারায়ণ চতুর্ভুজ, কিন্তু তাঁরা যদিও নারায়ণ হবার গর্বে স্ফীত, তবুও তাঁরা দুটি হাতের বেশি আর কিছু প্রদর্শন করতে পারেন না। যেহেতু তাঁদের দর্শন অনুসারে নারায়ণ ও একজন সাধারণ মানুষ উভয়ই সমপর্যায়-ভুক্ত, তাই তাঁরা কখনও

কখনও *দরিদ্র-নারায়ণ* কথাটি ব্যবহার করেন। এই কথাটি সৃষ্টি করেছিলেন একজন তথাকথিত স্বামী, যাঁর বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। তাই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যদিও পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন, কিন্তু নারায়ণ যে কে সেই সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু তাঁদের তপশ্চর্যার প্রভাবে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে জানতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, যিনি নারায়ণের ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এভাবেই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ নারায়ণ আর তাঁরা সকলে হচ্ছেন গর্বস্ফীত কৃত্রিম নারায়ণ। তা বুঝতে পেরে তাঁরা তখন তাঁকে বলেছিলেন—

শ্লোক ১০৪

তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা বললেন, "হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তোমার কথা শুনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তোমার অঙ্গের মাধুরী দর্শন করে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের সেবা করেন, তখন ভগবান নিজেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করেন।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)। নারায়ণের প্রতি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সেবার ফল এখানে প্রত্যক্ষভাবে দেখা গেল। যেহেতু মায়াবাদীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং যেহেতু তাঁরা ছিলেন পুণ্যবান এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়ম তাঁরা পালন করেছিলেন, তাই বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে তাঁদের কিছু জ্ঞান ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের একটি হচ্ছে শ্রী বা সৌন্দর্য। তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্য দর্শন করে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ। তিনি তথাকথিত সন্ন্যাসীদের সৃষ্ট *দরিদ্র-নারায়ণের* মতো প্রাহসনিক নারায়ণ নন।

শ্লোক ১০৫

তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন ।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার প্রভাবে আমাদের সকলের মন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমার বচন অসঙ্গত নয়। তাই তুমি বেদান্তসূত্র সম্বন্ধে বলতে পার।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তোমার প্রভাবে* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেউ যদি পারমার্থিক মার্গে উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত না হন, তা হলে তিনি শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে পারেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু, ভজন-অনুকূল।* "যতক্ষণ না কেউ শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করেছেন, ততক্ষণ তিনি ভগবদ্ভক্তের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।" এই সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভক্তরূপী ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং অবশ্যই তাঁরা ভগবানের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে, যেহেতু যথার্থ উন্নত পরমার্থবাদী কখনও অসত্য কথা বলেন না, তাই তিনি যা বলেন তা সবই সঙ্গত এবং বেদবিহিত। গভীর তত্ত্ববেত্তা পুরুষ কখনও এমন কিছু বলেন না, যা অর্থহীন। মায়াবাদীরা যে নিজেদের পরমেশ্বর ভগবান বলে দাবি করেন, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও এই ধরনের অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেননি। তাঁর সম্বন্ধে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সমস্ত সংশয় দূর হয়েছিল, তাই তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বেদান্ত-দর্শনের তাৎপর্য শ্রবণ করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১০৬

প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন ।
ব্যাসরূপে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "বেদান্তসূত্র হচ্ছে ব্যাসদেব রূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের বাণী।

তাৎপর্য

বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার পন্থা প্রদর্শনকারী *বেদান্তসূত্র* হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত-সার। *বেদান্তসূত্রের* শুরু হয়েছে যে কথাটি দিয়ে তা হচ্ছে, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*— "এখনই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সময়।" এটিই হচ্ছে মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। তাই, *বেদান্তসূত্রে* অত্যন্ত সংক্ষেপে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই তত্ত্ব *বায়ু পুরাণে* ও *স্কন্দ পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *সূত্র* সম্বন্ধে বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছে—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্ ।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

"অল্প কথায় যা সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশ করে, তাকে বলা হয় *সূত্র*। তার প্রয়োগ

অবশ্যই সার্বজনীন হতে হবে এবং তার ভাষা নিখুঁত হতে হবে।" এই ধরনের *সূত্র* সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি অবশ্যই *বেদান্তসূত্র* সম্বন্ধে অবগত। পণ্ডিত-মণ্ডলীর কাছে *বেদান্তসূত্র* নিম্নলিখিত নামগুলির দ্বারা পরিচিত—(১) *ব্রহ্ম-সূত্র,* (২) *শারীরক,* (৩) *ব্যাস-সূত্র,* (৪) *বাদরায়ণ-সূত্র,* (৫) *উত্তর-মীমাংসা* ও (৬) *বেদান্ত-দর্শন।*

বেদান্তসূত্রের চারটি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতি অধ্যায়ে চারটি পাদ রয়েছে। তাই *বেদান্তসূত্রকে* ষোড়শ-পাদ বলা যায়। প্রতিটি পাদের বিষয় পাঁচটি অধিকরণের মাধ্যমে পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অধিকরণগুলিকে পরিভাষায় বলা হয় প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। প্রতিটি বিষয় অবশ্যই প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। *বেদান্তসূত্রের* প্রথমেই যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে, তা হচ্ছে *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। এই প্রতিজ্ঞা নির্দেশ করে যে, পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তেমনই, হেতুর মাধ্যমে কারণের বর্ণনা করা হয়, তারপর সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদাহরণ এবং তারপর বিষয়বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ধীরে ধীরে নিকটবর্তী করা হয় উপনয়ের মাধ্যমে এবং অবশেষে বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করতে হয় নিগমন পন্থায়।

মহান অভিধান রচয়িতা হেমচন্দ্র যিনি কোষকার নামেও পরিচিত, তিনি বলেন যে, *বেদের* ব্রাহ্মণ অংশের সঙ্গে *উপনিষদ* অংশই বেদান্ত। প্রফেসর আপ্তে তাঁর অভিধানে *বেদের* ব্রাহ্মণ অংশের বর্ণনা করে বলেছেন, যে অংশে বিভিন্ন যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণের বিধি বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ অংশে বিভিন্ন অংশের উৎস বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কখনও কখনও কাহিনীর আকারে তার বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্রাহ্মণ *বেদের* মন্ত্র-অংশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেমচন্দ্র বলেছেন যে, *বেদের* শেষভাগ হচ্ছে *বেদান্তসূত্র।* *বেদ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান এবং *অন্ত* মানে হচ্ছে শেষ। পক্ষান্তরে, *বেদের* চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি হচ্ছে *বেদান্ত*। *বেদের* চরম উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, তাও *বেদান্ত*। *উপনিষদ* প্রমাণ-স্বরূপে যে শাস্ত্রে ব্যবহৃত এবং তার উপকারক যে সমস্ত সূত্রাদি, তাও *বেদান্ত*।

তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদের মতে জ্ঞানের তিনটি উৎস রয়েছে, তাদের বলা হয় প্রস্থানত্রয়। এই সমস্ত তত্ত্ববেত্তাদের মতানুসারে বেদান্তও হচ্ছে এই রকম একটি উৎস, কেন না তা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বৈদিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করে। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৫) ভগবান বলেছেন, *ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ*—"কার্য ও কারণ সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পন্থা *ব্রহ্মসূত্রে* নিরূপিত হয়েছে।" তাই *বেদান্তসূত্রকে প্রস্থানত্রয়ের* অন্যতম *ন্যায়-প্রস্থান* বলা হয়, *উপনিষদগুলিকে শ্রুতি-প্রস্থান* বলা হয় এবং *গীতা, মহাভারত, পুরাণ* আদিকে *স্মৃতি-প্রস্থান* বলা হয়। সমস্ত বিজ্ঞান-সম্মত অলৌকিক জ্ঞান *শ্রুতি, স্মৃতি* এবং শব্দ প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে *বেদসমূহ* জগতে প্রকাশিত হয়েছে। সেই নারায়ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শাস্ত্র হচ্ছে *সাত্বত-পঞ্চরাত্র।* শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব,

আবার কারও মতে অপান্তরতমা নামক মহান ঋষি *বেদান্ত-সূত্র* প্রণয়ন করেছেন। *পঞ্চরাত্র* ও *বেদান্তসূত্রে* একই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে, যেহেতু *বেদান্তসূত্র* প্রণয়ন করেছেন শ্রীল ব্যাসদেব, তাই বুঝতে হবে যে, তা নারায়ণের নিঃশ্বাস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীল ব্যাসদেব যখন *বেদান্তসূত্র* রচনা করছিলেন, তখন সমকালীন সাতজন ঋষিও বেদান্ত-মতের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি ও বাদরী। এ ছাড়া পারাশরী ও কর্মন্দীভিক্ষুও ব্যাসদেবের পূর্বে *বেদান্তসূত্র* সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *বেদান্তসূত্রের* চারটি অধ্যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে। একে বলা হয় সম্বন্ধ-জ্ঞান। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কিভাবে আচরণ করতে হয়। একে বলা হয় অভিধেয় জ্ঞান। ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)। তাই, সেই সম্পর্কযুক্ত হতে হলে সাধনভক্তি বা বিধিবদ্ধভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করতে হয়। একে বলা হয় অভিধেয়-জ্ঞান। চতুর্থ অধ্যায়ে এই ধরনের ভগবৎ-সেবার মুখ্য ফল (প্রয়োজন-জ্ঞান) সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের এই চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া। *বেদান্তসূত্রে অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ* বলতে সেই চরম উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করা হয়েছে।

নারায়ণের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীল ব্যাসদেব *বেদান্তসূত্র* রচনা করেছেন এবং অপ্রামাণিক ও অযোগ্য ভাষ্যকারদের কাছ থেকে তা রক্ষা করার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁর গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে *বেদান্তসূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* রচনা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* ছাড়াও সমস্ত মহান বৈষ্ণব আচার্যদের কথিত *বেদান্তসূত্রের* বিভিন্ন ভাষ্য রয়েছে এবং প্রত্যেক ভাষ্যেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল *শাঙ্কর-ভাষ্যের* অনুগামীরা মাত্র বিষ্ণুভক্তির উল্লেখ না করে নির্বিশেষভাবে *বেদান্তসূত্রের* বর্ণনা করেছেন। সাধারণত মানুষ *শারীরক-ভাষ্য* বা *বেদান্তসূত্রের* নির্বিশেষ বর্ণনার প্রতি আসক্ত, কিন্তু বিষ্ণুভক্তি-বিহীন সমস্ত ভাষ্যই মূল *বেদান্তসূত্র* থেকে ভিন্ন বলে বুঝতে হবে। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যথাযথভাবে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, বিষ্ণুভক্তির ভিত্তিতে রচিত বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যদের ভাষ্যই হচ্ছে *বেদান্তসূত্রের* প্রকৃত ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্যের *শারীরক-ভাষ্য* নয়।

শ্লোক ১০৭

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, এই জড় ত্রুটিগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বাক্যে থাকে না।

তাৎপর্য

কোন বস্তুকে তার প্রকৃত রূপ থেকে ভিন্ন বলে মনে করা অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানকে বলা হয় *ভ্রম*। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অন্ধকারে একটি রজ্জুকে সর্প বলে *ভ্রম* হয়, অথবা একটি শুক্তিকে রৌপ্য বলে *ভ্রম* হয়। এগুলি হচ্ছে ভ্রম। তেমনই, শ্রবণের অনবধানতা জনিত ভ্রান্তি হচ্ছে *প্রমাদ* এবং এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞান অন্যাদের দান করা হচ্ছে *বিপ্রলিপ্সা* বা প্রতারণা। জড় বৈজ্ঞানিকেরা ও দার্শনিকেরা সাধারণত 'হয়ত' এবং 'খুব সম্ভবত,' এই ধরনের শব্দগুলি ব্যবহার করে, কারণ প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে তাদের যথার্থ জ্ঞান নেই। তাই তারা যখন অন্যাদের জ্ঞান দান করে, তা প্রতারণা বা *বিপ্রলিপ্সার* একটি দৃষ্টান্ত। বদ্ধ জীবের সব চাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে তার অপূর্ণ ইন্দ্রিয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের চক্ষুর যদিও দর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে, তবুও যা অনেক দূরে রয়েছে তা আমরা দেখতে পাই না। আবার আমাদের চোখের সব চাইতে কাছে রয়েছে যে চোখের পাতা তাও আমরা দেখতে পাই না। আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সূর্যকে একটি গোলকের মতো মনে হয়, আর পাণ্ডুরোগে ভুগছে যে মানুষ, তার কাছে সব কিছুই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। তাই আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টির দ্বারা লব্ধ যে জ্ঞান, তার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি না। আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ও তেমনই ভ্রান্ত। টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অনেক দূরের শব্দ আমরা শুনতে পাই না। তেমনই, এভাবেই যদি আমরা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাব যে, সব কয়টি ইন্দ্রিয়ই ভ্রান্ত। তাই, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বৈদিক প্রথা হচ্ছে, মহাজনদের কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা। *ভগবদ্গীতায়* (৪/২) ভগবান বলেছেন, *এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*—"এভাবেই পরম্পরার ধারার মাধ্যমে রাজর্ষিরা এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন।" আমাদের শ্রবণ করতে হবে টেলিফোন থেকে নয়, তত্ত্বজ্ঞানী মহাজনের কাছ থেকে, কেন না যথার্থ জ্ঞান তাঁর কাছেই রয়েছে।

শ্লোক ১০৮

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"উপনিষদসমূহে ও ব্রহ্মসূত্রে পরমতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তবে সেই শ্লোকগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সেটিই হচ্ছে উপলব্ধির পরম মহত্ত্ব।

তাৎপর্য

শঙ্করাচার্যের সময় থেকে শাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করার প্রচলন হয়েছে। তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা নিজেদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করে গর্ব অনুভব করে এবং তারা ঘোষণা

করে যে, যে-কেউ তাদের ইচ্ছামতো বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ, 'যেভাবে তুমি চাও সেভাবেই'—এই কথাগুলি হচ্ছে মূর্খতা, বোকামি এবং এগুলিই বৈদিক সংস্কৃতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান কখনও খেয়ালখুশি মতো গ্রহণ করা যায় না। যেমন, গণিতশাস্ত্রে দুয়ে দুয়ে চার হয়, কখনও তিন বা পাঁচ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানকে যদিও পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু আজকালকার মানুষেরা বৈদিক জ্ঞানকে তাদের ইচ্ছামতো গ্রহণ করার রীতি প্রচলন করেছে। সেই জন্যই আমরা *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রকাশ করেছি। আমরা আমাদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করিনি। *ভগবদ্গীতার* কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, *ভগবদ্গীতার* প্রথম শ্লোকের *কুরুক্ষেত্র* শব্দটির অর্থ দেহ, কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না। আমাদের মতে কুরুক্ষেত্র স্থানটি এখনও রয়েছে এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তা হচ্ছে *ধর্মক্ষেত্র*। পুণ্যস্থান উপলক্ষ্যে মানুষ আজও সেখানে যায়। কিন্তু মূর্খ ভাষ্যকারেরা বলে যে, *কুরুক্ষেত্র* মানে দেহ এবং *পঞ্চপাণ্ডব* মানে পাঁচটি ইন্দ্রিয়। এভাবেই তারা কদর্থ করে এবং তার ফলে মানুষ বিপথগামী হয়। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, *উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র* আদি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র, তা সে *শ্রুতি, স্মৃতি* অথবা *ন্যায়* যাই হোক না কেন, তা সবই তাদের মুখ্য অর্থ অনুসারে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রের মুখ্য অর্থ বর্ণনা করাটাই হচ্ছে মহত্ত্ব, কিন্তু ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ ভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা নিজেদের মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করলে সর্বনাশ হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেভাবেই *বেদের* অর্থ বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন।

উপনিষদগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত এগারোটি *উপনিষদ* প্রধান—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর। *মুক্তিকোপনিষদে* ৩০-৩৯ শ্লোকে ১০৮টি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে—(১) *ঈশোপনিষদ,* (২) *কেনোপনিষদ,* (৩) *কঠোপনিষদ,* (৪) *প্রশ্নোপনিষদ,* (৫) *মুণ্ডকোপনিষদ,* (৬) *মাণ্ডুক্যোপনিষদ,* (৭) *তৈত্তিরীয়োপনিষদ,* (৮) *ঐতরেয়োপনিষদ,* (৯) *ছান্দোগ্যোপনিষদ,* (১০) *বৃহদারণ্যকোপনিষদ,* (১১) *ব্রহ্মোপনিষদ,* (১২) *কৈবল্যোপনিষদ,* (১৩) *জাবালোপনিষদ,* (১৪) *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ,* (১৫) *হংসোপনিষদ,* (১৬) *আরুণেয়োপনিষদ,* (১৭) *গর্ভোপনিষদ,* (১৮) *নারায়ণোপনিষদ,* (১৯) *পরমহংসোপনিষদ,* (২০) *অমৃতবিন্দুপনিষদ,* (২১) *নাদবিন্দুপনিষদ,* (২২) *শিরোপনিষদ,* (২৩) *অথর্বশিখোপনিষদ,* (২৪) *মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ,* (২৫) *কৌষীতক্যুপনিষদ,* (২৬) *বৃহজ্জাবালোপনিষদ,* (২৭) *নৃসিংহ-তাপনীয়োপনিষদ,* (২৮) *কালাগ্নি-রুদ্রোপনিষদ,* (২৯) *মৈত্রেয়্যুপনিষদ,* (৩০) *সুবালোপনিষদ,* (৩১) *ক্ষুরিকোপনিষদ,* (৩২) *মন্ত্রিকোপনিষদ,* (৩৩) *সর্বসারোপনিষদ,* (৩৪) *নিরালম্বোপনিষদ,* (৩৫) *সুখরহস্যোপনিষদ,* (৩৬) *বজ্র-সূচিকোপনিষদ,* (৩৭) *তেজোবিন্দুপনিষদ,* (৩৮) *নাদবিন্দুপনিষদ,* (৩৯) *ধ্যানবিন্দুপনিষদ,* (৪০) *ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদ,* (৪১) *যোগতত্ত্বোপনিষদ,* (৪২) *আত্মবোধোপনিষদ,* (৪৩)

নারদপরিব্রাজকোপনিষদ, (৪৪) *ত্রিশিখ্যুপনিষদ,* (৪৫) *সীতোপনিষদ,* (৪৬) *যোগচূড়ামণ্যুপনিষদ,* (৪৭) *নির্বাণোপনিষদ,* (৪৮) *মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদ,* (৪৯) *দক্ষিণামূর্ত্যুপনিষদ,* (৫০) *শরভোপনিষদ,* (৫১) *স্কন্দোপনিষদ,* (৫২) *মহানারায়ণোপনিষদ,* (৫৩) *অদ্বয়তারকোপনিষদ,* (৫৪) *রামরহস্যোপনিষদ,* (৫৫) *রামতাপণ্যুপনিষদ,* (৫৬) *বাসুদেবোপনিষদ,* (৫৭) *মুদ্‌গলোপনিষদ,* (৫৮) *শাণ্ডিল্যোপনিষদ,* (৫৯) *পৈঙ্গলোপনিষদ,* (৬০) *ভিক্ষুপনিষদ,* (৬১) *মহদুপনিষদ,* (৬২) *শারীরকোপনিষদ,* (৬৩) *যোগশিখোপনিষদ,* (৬৪) *তুরীয়াতীতোপনিষদ,* (৬৫) *সন্ন্যাসোপনিষদ,* (৬৬) *পরমহংস-পরিব্রাজকোপনিষদ,* (৬৭) *মালিকোপনিষদ,* (৬৮) *অব্যক্তোপনিষদ,* (৬৯) *একাক্ষরোপনিষদ,* (৭০) *পূর্ণোপনিষদ,* (৭১) *সূর্যোপনিষদ,* (৭২) *অক্ষ্যুপনিষদ,* (৭৩) *অধ্যাত্মোপনিষদ,* (৭৪) *কুণ্ডিকোপনিষদ,* (৭৫) *সাবিত্র্যুপনিষদ,* (৭৬) *আত্মোপনিষদ,* (৭৭) *পাশুপতোপনিষদ,* (৭৮) *পরংব্রহ্মোপনিষদ,* (৭৯) *অবধূতোপনিষদ,* (৮০) *ত্রিপুরাতপনোপনিষদ,* (৮১) *দেব্যুপনিষদ,* (৮২) *ত্রিপুরোপনিষদ,* (৮৩) *কঠরুদ্রোপনিষদ,* (৮৪) *ভাবনোপনিষদ,* (৮৫) *হৃদয়োপনিষদ,* (৮৬) *যোগ-কুণ্ডলিন্যুপনিষদ,* (৮৭) *ভস্মোপনিষদ,* (৮৮) *রুদ্রাক্ষোপনিষদ,* (৮৯) *গণোপনিষদ,* (৯০) *দর্শনোপনিষদ,* (৯১) *তারসারোপনিষদ,* (৯২) *মহাবাক্যোপনিষদ,* (৯৩) *পঞ্চব্রহ্মোপনিষদ,* (৯৪) *প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষদ,* (৯৫) *গোপাল-তাপন্যুপনিষদ,* (৯৬) *কৃষ্ণোপনিষদ,* (৯৭) *যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ,* (৯৮) *বরাহোপনিষদ,* (৯৯) *শাঠ্যায়ন্যুপনিষদ,* (১০০) *হয়গ্রীবোপনিষদ,* (১০১) *দত্তাত্রেয়োপনিষদ,* (১০২) *গারুড়োপনিষদ,* (১০৩) *কল্যুপনিষদ,* (১০৪) *জাবাল্যুপনিষদ,* (১০৫) *সৌভাগ্যোপনিষদ,* (১০৬) *সরস্বতী-রহস্যোপনিষদ,* (১০৭) *বহবৃচোপনিষদ,* (১০৮) *মুক্তিকোপনিষদ।* এভাবেই ১০৮টি সাধারণভাবে স্বীকৃত উপনিষদ রয়েছে, যার মধ্যে ১১টি হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ, যে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০৯

গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব কার্য ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র গৌণ অর্থ অনুসারে বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যাখ্যা যে শ্রবণ করে তার সর্বনাশ হয়।

শ্লোক ১১০

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা ।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

"শঙ্করাচার্যের তাতে কোন দোষ নেই, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞা অনুসারে তিনি মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করে গৌণ অর্থ প্রকাশ করেছেন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের আধার, কিন্তু তা যদি যথাযথভাবে গ্রহণ না করা হয়, তা হলে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। যেমন, *ভগবদ্‌গীতা* হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক শাস্ত্র, যা হাজার হাজার বছর ধরে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান রহিত মূর্খ পাষণ্ডেরা এই *ভগবদ্‌গীতার* ভাষ্য রচনা করেছে, তাই তা পাঠ করে কারও কোন লাভ হচ্ছে না এবং কেউই কৃষ্ণভাবনার অমৃতস্বরূপ ভগবদ্ভক্তির মার্গ অবলম্বন করতে পারছে না। কিন্তু *ভগবদ্‌গীতা* যখন যথাযথভাবে দান করা হল, তখন দেখা গেল যে, চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে বিশ্লেষণের সেটিই হচ্ছে পার্থক্য। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব*—"ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা না করে যদি মুখ্য অর্থ অনুসারে বৈদিক শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করা হয়, তা হলে তা অপূর্ব মহিমা-মণ্ডিত হয়ে ওঠে। "দুর্ভাগ্যবশত, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য অসুরদের আস্তিকে পরিণত করার জন্য নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন এবং তা করার জন্য তিনি বৈদিক জ্ঞানের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে গৌণ অর্থ করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি *বেদান্তসূত্রের শারীরক-ভাষ্য* রচনা করেছিলেন।

তাই *শারীরক-ভাষ্যের* তেমন কোন গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। বেদান্ত-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য, যার শুরুতেই বলা হয়েছে, *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্*—"বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান। সেই অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুর আমি ধ্যান করি, যিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, যাঁর থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, যাঁকে আশ্রয় করে তারা বিরাজ করে এবং যাঁর মধ্যে তারা লয় প্রাপ্ত হয়। আমি সেই নিত্য জ্যোতির্ময় ভগবানের ধ্যান করি, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত এবং যিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।" (*ভাগবত* ১/১/১)। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *বেদান্তসূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য। দুর্ভাগ্যবশত, কেউ যদি শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তা হলে তার পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়।

কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, শঙ্করাচার্য যেহেতু দেবাদিদেব মহাদেবের অবতার, তা হলে কেন তিনি মানুষকে এইভাবে প্রতারণা করলেন? তার উত্তর হচ্ছে, তা তিনি করেছেন, তাঁর প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। সেই সত্য *পদ্ম পুরাণে* দেবাদিদেব মহাদেবের নিজের কথাতেই প্রতিপন্ন হয়েছে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥
ব্রহ্মণশ্চাপরং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া ।
সর্বস্বং জগতোহপ্যস্য মোহনার্থং কলৌ যুগে ॥
বেদান্তে তু মহাশাস্ত্রে মায়াবাদমবৈদিকম্ ।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ ॥

শিব পার্বতীকে বললেন, "মায়াবাদ দর্শন হচ্ছে অসৎ-শাস্ত্র। তা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। হে পার্বতী! কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণরূপে এই কল্পিত মায়াবাদ দর্শন প্রচার করি। ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরদের প্রতারণা করার জন্য আমি পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার ও নির্গুণ বলে বর্ণনা করি। তেমনই, সমস্ত ভগবৎ-বিদ্বেষী জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করার জন্য ভগবানের রূপকে অস্বীকার করে, বেদান্তের বিশ্লেষণ করে, আমি এই মায়াবাদ দর্শন রচনা করি।" *শিব পুরাণে* পরমেশ্বর ভগবান শিবকে বলেছেন—

দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তং চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ॥

"কলিযুগে *বেদের* কল্পিত অর্থ প্রচার করে জনসাধারণকে আমার প্রতি বিমুখ কর।" এগুলি হচ্ছে *পুরাণের* বর্ণনা।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, *মুখ্যবৃত্তি* হচ্ছে *অবিধাবৃত্তি*, অথবা যে অর্থ অভিধান থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু *গৌণবৃত্তি* হচ্ছে অভিধানের অর্থ আলোচনা না করে কল্পিত অর্থ তৈরি করা। যেমন, একজন রাজনীতিবিদ্ বলেছেন যে, *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত কুরুক্ষেত্র হচ্ছে দেহ, কিন্তু অভিধানে কোথাও এই রকম বর্ণনা নেই। তাই এই কল্পিত অর্থটি হচ্ছে *গৌণবৃত্তি*। কিন্তু অভিধানে যে প্রত্যক্ষ অর্থটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে *মুখ্যবৃত্তি* বা *অবিধাবৃত্তি*। এটিই হচ্ছে এই দুটির মধ্যে পার্থক্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *অবিধাবৃত্তি* অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি *গৌণবৃত্তি* বর্জন করেছেন। কখনও কখনও অবশ্য প্রয়োজনবোধে *গৌণবৃত্তি* বা *লক্ষণাবৃত্তি* অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবে সেই ব্যাখ্যাগুলি সনাতন সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়।

উপনিষদ ও *বেদান্তসূত্রের* আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দর্শনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বিশেষবাদীরা কিন্তু তাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য *লক্ষণাবৃত্তি* বা *গৌণবৃত্তি* অনুসারে তা গ্রহণ করে। ফলে, তত্ত্ববাদী বা পরমতত্ত্বের অনুসন্ধানী না হয়ে, তারা মায়াবাদী বা মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারজন মহান আচার্যের অন্যতম শ্রীবিষ্ণুস্বামী যখন *শুদ্ধাদ্বৈতবাদ* অনুসারে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন, তৎক্ষণাৎ মায়াবাদীরা এই দর্শনের সুযোগ নিয়ে তাঁদের *অদ্বৈতবাদ* বা *কেবলাদ্বৈতবাদ* প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এই *কেবলাদ্বৈতবাদ* খণ্ডন করার জন্য শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তাঁর *বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ* প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রীমধ্বাচার্য *তত্ত্ববাদ* প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন মায়াবাদীদের কাছে এক দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকের মতো, কেন না তাঁরা বৈদিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁদের দর্শন খণ্ডন করেন। শ্রীরামানুজাচার্যের *বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ* এবং শ্রীমধ্বাচার্যের *তত্ত্ববাদ* যে কিভাবে মায়াবাদ দর্শনকে প্রবল বিক্রমে পরাজিত করেছে তা বৈদিক দর্শনের পাঠকেরা খুব ভালভাবেই জানেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মায়াবাদ-দর্শন খণ্ডন করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন যে, *শারীরক-ভাষ্য* অনুসরণ করলে সর্বনাশ হয়। সেই সত্য *পদ্ম পুরাণে* প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যেখানে শিব পার্বতীকে বলছেন—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্ ।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্ ।
কর্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে ॥
সর্বকর্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্যং তত্র চোচ্যতে ।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে ॥

"হে দেবি! মায়াবাদ দর্শনের মাধ্যমে আমি যে কিভাবে অজ্ঞানের অন্ধকার প্রচার করেছি, সেই কথা শ্রবণ কর। কেবল তা শ্রবণ করা মাত্র জ্ঞানীদের পর্যন্ত অধঃপতন হবে। এই দর্শনের মাধ্যমে যা সমস্ত মানুষদের কাছে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক, তা বর্ণনা করে আমি *বেদের* কদর্থ করেছি এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য সব রকম কর্ম পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছি। এই মায়াবাদ দর্শনে আমি জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক বলে বর্ণনা করেছি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগামীরা যে কিভাবে মায়াবাদ দর্শন বর্জন করেছেন, সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৯৪ থেকে ৯৯ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলেছেন, যে মানুষ মায়াবাদ দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে উন্মাদ, বিশেষ করে কোন বৈষ্ণব যদি *শারীরক-ভাষ্য* অধ্যয়ন করে নিজেকে ভগবান বলে মনে করেন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাঁদের যুক্তিগুলি বাক্যালংকার সহ এত আকর্ষণীয় ভাষায় উপস্থাপন করেছেন যে, তা শুনে মহাভাগবতের মতো অতি উচ্চস্তরের ভক্তেরও চিত্ত বিচলিত হতে পারে। যে দর্শনে ভগবান ও জীবকে এক ও অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়, প্রকৃত বৈষ্ণব কখনই তা সহ্য করতে পারেন না।

শ্লোক ১১১

'ব্রহ্ম'শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্' ।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব-সমান ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

" ব্রহ্ম শব্দটির মুখ্য অর্থ হচ্ছে চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। কেউই তাঁর সমান নয় বা তাঁর থেকে মহৎ নয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উক্তিটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"যা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীরা তাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।" পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবান, তাঁর আংশিক উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা এবং অস্পষ্ট দর্শন হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। পরমেশ্বর বা ভগবান হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ; তিনি হচ্ছেন অসমোর্ধ্ব অর্থাৎ তাঁর সমান কেউ নেই এবং তাঁর ঊর্ধ্বেও কেউ নেই। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/৭) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয়! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোন তত্ত্ব নেই।" এই রকম বহু শ্লোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১১২

তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার ।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি' তাঁরে কহে 'নিরাকার' ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবানের দেহ, ঐশ্বর্য, পরিকর আদি সব কিছুই চিন্ময়। মায়াবাদী দার্শনিকেরা কিন্তু তাঁর চিৎ-বিভূতি আচ্ছাদিত করে তাঁকে নিরাকার বলে বর্ণনা করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—"পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময়।" এই জড় জগতে সকলের দেহই তাঁর ঠিক বিপরীত—অসৎ বা অনিত্য, অজ্ঞান ও দুঃখময়। তাই পরমেশ্বর ভগবানের দেহকে যে কখনও কখনও *নিরাকার* বলে বর্ণনা করা হয়, তা ইঙ্গিত করে যে, তাঁর দেহ আমাদের মতো জড় নয়।

মায়াবাদী দার্শনিকেরা জানে না, পরমেশ্বর ভগবান *নিরাকার* কিভাবে। পরমেশ্বর ভগবানের আমাদের মতো রূপ নেই, কিন্তু তাঁর চিন্ময় রূপ আছে। সেই কথা না বুঝে, মায়াবাদী দার্শনিকেরা কেবল এক পক্ষ সমর্থন করে বলে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা ব্রহ্ম হচ্ছেন *নিরাকার*। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈদিক শাস্ত্র থেকে বহু উক্তির উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি এই সমস্ত বৈদিক উক্তির মুখ্য অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ* অর্থাৎ তিনি চিন্ময় দেহসম্পন্ন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৫/১/১) বলা হয়েছে, *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে*। তা থেকে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহ চিন্ময়, কেন না যদিও তিনি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন, তবুও তিনি একই থাকেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) ভগবান বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমিই সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রকাশিত হয়।" মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাদের জড় ধারণা অনুসারে অনুমান করে যে, পরমতত্ত্ব যদি নিজেকে সব কিছুর মধ্যে বিস্তার করেন, তা হলে তাঁর আদিরূপ অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়। এভাবেই তারা মনে করে যে, ভগবানের বিরাটরূপ ছাড়া আর কোন রূপ থাকতে পারে না। কিন্তু *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে*—"যদিও তিনি নিজেকে বিভিন্নরূপে বিস্তার করেন, তবুও তাঁর স্বরূপের কোন বিকার হয় না। তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপ যেমন তেমনই থাকে।" তেমনই অন্যত্র বলা হয়েছে, *বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ*—"আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের বিচিত্র শক্তি রয়েছে।" আর *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* বলা হয়েছে, *স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ং ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্*—"তিনি হচ্ছেন জড় সৃষ্টির উৎস এবং তাঁরই প্রভাবে সব কিছুর পরিবর্তন হয়। তিনিই হচ্ছেন ধর্মের রক্ষাকর্তা এবং সব রকম পাপকর্মের সংহারক। তিনি হচ্ছেন সর্ব ঐশ্বর্যের ঈশ্বর।" (*শ্বেতাশ্বঃ উপঃ* ৬/৬) *বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ*—"এখন আমি পরমেশ্বর ভগবানকে মহত্তম থেকেও মহত্তররূপে জানতে পেরেছি। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এই জড় জগতের অতীত।" (*শ্বেতাশ্বঃ উপঃ* ৩/৮) *পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ*—"তিনি হচ্ছেন সমস্ত ঈশ্বরদের ঈশ্বর, পরমেরও পরম।" (*শ্বেতাশ্বঃ উপঃ* ৬/৭) *মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ*—"তিনি হচ্ছেন মহান প্রভু এবং পরম পুরুষ।" (*শ্বেতাশ্বঃ উপঃ* ৩/১২) *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—"তাঁর পরা শক্তি আমরা বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারি।" (*শ্বেতাশ্বঃ উপঃ* ৬/৮) তেমনই, *ঋগ্বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে, *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—"শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং যাঁরা যথার্থই তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁরা সর্বদাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন।" *প্রশ্ন উপনিষদে* (৬/৩) বলা হয়েছে, *স ঈক্ষাং চক্রে*—"তিনি জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।" *ঐতরেয় উপনিষদে* (১/১/১-২) বর্ণনা করা হয়েছে, *স ঐক্ষত*—"তিনি জড় সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন"—এবং *স ইমাল্লোঁকান্ অসৃজত*—"তিনি এই সমগ্র জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।"

এভাবেই ভগবান যে *নিরাকার* নন, তা প্রমাণ করার জন্য *বেদ* ও *উপনিষদ* থেকে বহু শ্লোকের উল্লেখ করা যায়। *কঠ উপনিষদেও* (২/২/১৩) বলা হয়েছে, *নিত্যো*

নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্—"তিনি হচ্ছেন পরম নিত্য এবং পরম চৈতন্যময় পুরুষ, যিনি অন্য সমস্ত জীবদের পালন করেন।" এই সমস্ত বৈদিক প্রমাণ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন একজন পুরুষ, যাঁর সমান অথবা যাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই। অথচ মূর্খ মায়াবাদীরা মনে করে যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বড়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অসমোর্ধ্ব—তাঁর সমানও কেউ নেই এবং তাঁর থেকে বড়ও কেউ নেই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) বর্ণনা করা হয়েছে, *অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা*। এই শ্লোকে পরম-তত্ত্বকে হস্ত ও পদহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এটি একটি নির্বিশেষ বর্ণনা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন রূপ নেই। জড় রূপের অতীত তাঁর এক চিন্ময় রূপ রয়েছে। এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

শ্লোক ১১৩

চিদানন্দ—তেঁহো, তাঁর স্থান, পরিবার ।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান চিন্ময় শক্তিতে পূর্ণ। তাই তাঁর রূপ, নাম, যশ ও পরিকর সবই চিন্ময়। অজ্ঞতাবশত মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলেন যে, সেগুলি প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শক্তিসমূহকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—*প্রাকৃত* ও *অপ্রাকৃত*, অথবা পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। *বিষ্ণু পুরাণেও* সেই একই পার্থক্য করা হয়েছে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা পরা ও অপরা এই দুটি প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু যিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি সেই প্রকৃতি দুটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই জড় জগতে কত বৈচিত্র্য এবং কত রকমের কার্যকলাপ রয়েছে, সুতরাং মায়াবাদী দার্শনিকেরা চিৎ-জগতের চিৎ-বৈচিত্র্য অস্বীকার করে কি করে? *ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণাই নেই, সেই অবিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে। এই শ্লোকে *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ* কথাটির দ্বারা অবিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের অবিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবে অথবা জ্ঞানের অভাবে মায়াবাদী দার্শনিকেরা জড় ও চিৎ-বৈচিত্র্যের পার্থক্য বুঝতে পারে না; তাই তারা এমন কি চিৎ-

বৈচিত্র্য সম্বন্ধে চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না, কেন না তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে, সমস্ত বৈচিত্র্যই হচ্ছে জড়।

তাই, এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্লেষণ করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাঁর দেহ চিন্ময় এবং তা জড় দেহ থেকে ভিন্ন এবং এভাবেই তাঁর নাম, ধাম, পরিকর ও গুণ সমস্তই চিন্ময়। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব গুণের সঙ্গে চিৎ-বৈচিত্র্যের কোন সম্পর্ক নেই। মায়াবাদী দার্শনিকেরা যেহেতু স্পষ্টভাবে চিৎ-বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাই তারা কল্পনা করে যে, জড় জগতে যা কিছু রয়েছে, সেই সব অস্বীকার করলেই তারা চিৎ-জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ চিৎ-জগতে সক্রিয় হতে পারে না। তাই চিৎ-জগৎকে বলা হয় নির্গুণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন)। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে জড় জগতের প্রকাশ, কিন্তু এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে হলে, এই গুণগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদ দর্শন থেকে শিবকে বিযুক্ত করেছেন।

শ্লোক ১১৪

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস ।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"শিবের অবতার শঙ্করাচার্য নির্দোষ, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের আজ্ঞাকারী দাস। কিন্তু যে তাঁর সেই মায়াবাদী দর্শন অনুসরণ করে, তার সর্বনাশ হয়। তাদের পারমার্থিক প্রগতি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

তাৎপর্য

মায়াবাদী দার্শনিকেরা ব্যাকরণের বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে তাদের বেদান্ত-জ্ঞান প্রদর্শন করার ব্যাপারে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তারা হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*—'মায়ার প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত'। মায়ার দুটি শক্তির প্রভাবে তাঁর দুই প্রকার ক্রিয়া সম্পাদিত হয়—*বিক্ষেপাত্মিকা-শক্তি*, অর্থাৎ জীবকে ভবসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত করার শক্তি এবং *আবরণাত্মিকা-শক্তি*, অর্থাৎ জীবের জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করার শক্তি। *ভগবদ্গীতায় আবরণাত্মিকা-শক্তির* ক্রিয়া *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* শব্দটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দৈবীমায়া বা শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি কেন মায়াবাদীদের জ্ঞান অপহরণ করে নেয়, সেই কথাও *ভগবদ্গীতায় আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ* শব্দটির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই কথাটিতে তাদেরই কথা বলা হয়েছে, যারা ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী মায়াবাদীদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—

শঙ্করাচার্যের অনুগামী কাশীর নির্বিশেষবাদী এবং সারনাথের বৌদ্ধগণ। এরা উভয়েই মায়াবাদী এবং নাস্তিক দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের জ্ঞান অপহরণ করে নেন। এরা উভয়েই ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা আত্মা ও ভগবান উভয়ের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং শঙ্কর-সম্প্রদায় যদিও সরাসরিভাবে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু তারা বলে যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার। তাই তারা উভয়েই *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*, অর্থাৎ তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অপূর্ণ এবং অবিশুদ্ধ।

বিখ্যাত মায়াবাদী সদানন্দ যোগীন্দ্র *বেদান্তসার* নামক একটি গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন এবং শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা তাঁর এই গ্রন্থটির প্রভূত গুরুত্ব দান করে। এই *বেদান্তসার* গ্রন্থে সদানন্দ যোগীন্দ্র বর্ণনা করেছেন যে, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় বস্তুই ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান আদি জড়সমূহই অবস্তু। এই অজ্ঞান (জড়)-এর বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে *সৎ* ও *অসৎ* থেকে পৃথক জ্ঞান। তা অনির্বচনীয় কিন্তু তা ত্রিগুণাত্মক। এভাবেই তিনি বিবেচনা করেছেন যে, শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত যা কিছু তা সবই জড়। এই অজ্ঞান কখনও সর্বব্যাপ্ত এবং কখনও ব্যষ্টিগতভাবে এক এবং অনেকরূপে ব্যবহৃত হয়। এই সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি-বিশিষ্ট হলে *বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান* নাম লাভ করে। চৈতন্যে *বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান* (সমষ্টি অজ্ঞান) প্রতিফলিত হলে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সদসদব্যক্ত, জীবসমূহের অন্তর্যামী, জগতের কারণ ঈশ্বর-সংজ্ঞা লাভ করে। ঈশ্বর—সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলে সর্বজ্ঞ। তাদের মতে, ঈশ্বরত্ব প্রাকৃত সত্ত্বের অজ্ঞানজ বিকার মাত্র। জীব—মলিনসত্ত্বপ্রধান ও ব্যষ্টি-উপাধি বিশিষ্ট। এভাবেই তাঁর মতে সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু ও জীব উভয়েই অজ্ঞানজাত।

সরল ভাষায় বলা যায় যে, সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে যেহেতু সব কিছুই নিরাকার, তাই বিষ্ণু ও জীব উভয়েই অজ্ঞানজাত। তিনি আরও বিশ্লেষণ করেছেন যে, বৈষ্ণবদের বিশুদ্ধ সত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা, তা হচ্ছে *প্রধান* বা জড় সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। তাঁর মতে সর্বব্যাপ্ত জ্ঞান যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা কলুষিত হয়, যা হচ্ছে সত্ত্বগুণের বিকার, তখন সর্ব শক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্ব কারণের পরম কারণ, অন্তর্যামী পরম ঈশ্বর-সংজ্ঞা লাভ করে। সদানন্দ যোগীন্দ্রের মতে, যেহেতু ঈশ্বর সমস্ত অজ্ঞানের আধার, তাই তাঁকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু যিনি সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের থেকেও অধিক বা প্রভু। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন অজ্ঞানের বিকার এবং জীব অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত। এভাবেই তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টির অস্তিত্ব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। মায়াবাদীদের মতে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্য সেবকরূপে জীব সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের যে ধারণা, তা অজ্ঞান-প্রসূত। কিন্তু আমরা যদি *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা হলে আমরা দেখতে পাই যে, মায়াবাদীরা হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা তারা মনে করে যে, ভগবান হচ্ছেন মায়ার বিকার। এগুলি আসুরিক ভাবের বৈশিষ্ট্য।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ৬/১৬৯)

এই জড় জগতের বন্ধন থেকে বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার জন্য ব্যাসদেব *বেদান্ত-সূত্র* প্রণয়ন করেছিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য সেই *বেদান্তসূত্রের* মনগড়া ভাষ্য রচনা করে মানব-সমাজে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন, কেন না তাঁর মায়াবাদ ভাষ্য শুনলে সর্বনাশ হয়। *বেদান্তসূত্রে* স্পষ্টভাবে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং তারা স্বীকার করতে চায় না যে, পরমেশ্বর ভগবান থেকে জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। এভাবেই তারা নাস্তিকবাদ সৃষ্টি করে সমস্ত জগতের সর্বনাশ করছে, কেন না এই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে মায়াবাদীরা যে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার দুর্বাসনা করে, তার ফলে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বীভৎসভাবে বিকৃত হয় এবং যে সেই দর্শন অনুসরণ করে, সে চিরতরে এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাই মায়াবাদীদের বলা হয় *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*। যেহেতু তাদের বুদ্ধি কলুষিত, তাই তাদের তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনা নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। তাই যদিও প্রথমে তারা বড় পণ্ডিত বলে সম্মানিত হতে পারে, কিন্তু চরমে তারা রাজনীতি, সমাজসেবা আদি জাগতিক কার্যকলাপের স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়। পরমেশ্বরের সঙ্গে এক হওয়ার পরিবর্তে, তারা আবার এই সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তার বিশ্লেষণ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।

প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদীরা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনে কঠোরভাবে তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনা করে এবং তার ফলে তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মস্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি অবহেলা করার জন্য তারা আবার এই জড় জগতের স্তরে অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১৫

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর ।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যে সমস্ত মানুষ শ্রীবিষ্ণুর সচ্চিদানন্দঘন রূপকে জড় রূপ বলে মনে করে, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে বড় অপরাধী। ভগবানের প্রতি এর থেকে গর্হিত অপরাধ আর নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং যে জড়া প্রকৃতি এই বিশ্বকে প্রকাশ করে, তা হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর শক্তি। জড়া প্রকৃতি বা মায়া হচ্ছে ভগবানের শক্তি মাত্র, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা সিদ্ধান্ত করে যে, ভগবান যেহেতু নিজেকে নির্বিশেষরূপে বিস্তার করেছেন, তাই তাঁর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিন্তু শক্তিমান হতে পারে না, আর তা ছাড়া বৈদিক শাস্ত্রে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি যে, মায়া আর একটি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। শাস্ত্রে বিষ্ণুমায়া (*পরাস্য শক্তিঃ*) বা শ্রীবিষ্ণুর শক্তি সম্বন্ধে শত সহস্র বর্ণনা রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *মম মায়া* ('আমার শক্তি')। মায়া পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এই নয় যে, ভগবান মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই শ্রীবিষ্ণু জড়া প্রকৃতিজাত নন। *বেদান্তসূত্রের* প্রথমেই *জন্মাদ্যস্য যতঃ* শ্লোকে নিরূপিত হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতিও পরব্রহ্মের প্রকাশ। তা হলে তিনি মায়াশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হন কি করে? তা যদি সম্ভব হত, তা হলে জড়া প্রকৃতি পরব্রহ্মের থেকে অধিক শক্তিসম্পন্না হতেন। কিন্তু, এই সমস্ত সরল যুক্তিগুলি পর্যন্ত মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না এবং তাই *ভগবদ্গীতায়* উক্ত *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* সংজ্ঞাটি তাদের বেলায় যথাযথভাবে প্রযোজ্য। যে মনে করে শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন জড়া প্রকৃতিজাত, যেমন সদানন্দ যোগীন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন, তৎক্ষণাৎ বুঝতে হবে যে, সেই মানুষটি একটি পাগল। কারণ, তার জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

শ্রীবিষ্ণুকে দেবতার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। যে সমস্ত মানুষ মায়াবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তারাই শ্রীবিষ্ণুকে একজন দেবতা বলে মনে করে। অথচ *ঋগ্বেদে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্*—"তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্বদাই পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন।" এই মন্ত্র *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু থেকে পরতর আর কোন তত্ত্ব নেই। তাই যাদের জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারাই কেবল শ্রীবিষ্ণুকে একজন দেবতা বলে মনে করে এবং তাই প্রস্তাব করে যে, শ্রীবিষ্ণু, কালী, দুর্গা অথবা যে কোন একজনের পূজা করা যেতে পারে এবং তাতে একই ফল লাভ হয়। এই মূঢ় সিদ্ধান্ত *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) স্বীকৃত হয়নি। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্ .... যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্*—"দেবতাদের উপাসকেরা তাদের উপাস্য দেবতার অনিত্যলোক প্রাপ্ত হবে, কিন্তু ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপাসকেরা ভগবৎ-ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবে।" *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, তাঁর জড় শক্তি বা মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর—*দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*। মায়ার প্রভাব এতই প্রবল যে, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও পরমার্থবাদীরা পর্যন্ত মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের পরমেশ্বর ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে, অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি*

তে। তাই বুঝতে হবে যে, শ্রীবিষ্ণু জড়া প্রকৃতিজাত নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন চিৎ-জগতের মধ্যমণি। শ্রীবিষ্ণুর কলেবর প্রাকৃত বলে মনে করা অথবা তাঁকে দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা সব চাইতে অপরাধজনক। বিষ্ণুনিন্দা এবং শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অপরাধীজনেরা কখনই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না। তাদের বলা হয় *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*, অর্থাৎ যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে।

যে মনে করে যে, শ্রীবিষ্ণুর কলেবর এবং তাঁর আত্মার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। শ্রীবিষ্ণুর দেহ ও শ্রীবিষ্ণুর আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কেন না তাঁরা হচ্ছেন অদ্বয়জ্ঞান। এই জড় জগতে জড় দেহ ও চেতন আত্মার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু চিৎ-জগতে সব কিছুই চিন্ময় এবং সেখানে এই রকম কোন পার্থক্য নেই। মায়াবাদীদের সব থেকে গর্হিত অপরাধ হচ্ছে শ্রীবিষ্ণু ও জীবকে এক বলে মনে করা। এই সম্পর্কে *পদ্ম পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে, *অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ.....যস্য বা নারকী সঃ*—"যে অর্চামূর্তি বা শ্রীবিষ্ণুর আরাধ্য বিগ্রহকে পাথর বলে মনে করে, শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, সে নারকী।" এই ধরনের মায়াবাদী সিদ্ধান্ত যে অনুসরণ করে, তার সর্বনাশ হয়।

শ্লোক ১১৬

ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবান হচ্ছেন যেন এক বিশাল জ্বলন্ত অগ্নির মতো এবং জীবের স্বরূপ হচ্ছে সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গের কণার মতো।

তাৎপর্য

যদিও স্ফুলিঙ্গ ও একটি বিরাট আগুন উভয়ই আগুন এবং উভয়েরই দহন করার শক্তি রয়েছে, কিন্তু অগ্নির দহনকারী শক্তি এবং স্ফুলিঙ্গের দহনকারী শক্তি এক নয়। কেউ যদি তার স্বরূপগতভাবে একটি ছোট্ট স্ফুলিঙ্গের মতো হয়, তবে কেন সে কৃত্রিমভাবে একটি বিরাট আগুন হওয়ার চেষ্টা করবে? সেটি হচ্ছে অজ্ঞান। পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবান ও অণুসদৃশ জীব, উভয়েরই জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু চিৎ-স্ফুলিঙ্গসদৃশ জীব যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন তার অগ্নিসদৃশ গুণগুলি নিভে যায়। সেটিই হচ্ছে বদ্ধ জীবের অবস্থা। যেহেতু তারা জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেছে, তাই তাদের চিন্ময় গুণগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত চিৎ-স্ফুলিঙ্গগুলি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, যে কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন (*মমৈবাংশঃ*), তাই তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে

তাদের চিন্ময় স্বরূপে আবার অধিষ্ঠিত হতে পারে। এটিই বিশুদ্ধ দার্শনিক উপলব্ধি। *ভগবদ্‌গীতায়* চিৎ-স্ফুলিঙ্গকে সনাতন (নিত্য) বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তাই জড়া প্রকৃতি বা মায়া তাদের স্বরূপকে নষ্ট করতে পারে না।

কেউ তর্ক করতে পারে, "এই চিৎকণা সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল?" তার উত্তরে বলা যায়, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান, তাই তাঁর অসীমক্রিয়া-প্রবৃত্তি ও অণুক্রিয়া-প্রবৃত্তি রয়েছে। এটিই হচ্ছে সর্ব শক্তিমান কথাটির অর্থ। সর্ব শক্তিমান হতে হলে তাঁর যে কেবল অসীম শক্তিই থাকবে তা নয়, তাঁর সসীম শক্তিও থাকবে। এভাবেই তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান উভয় শক্তিই প্রদর্শন করেন। জীব যদিও ভগবানের অংশ, তবুও সে অণুশক্তি-সম্পন্ন। অসীম ক্রিয়া-প্রবৃত্তি থেকে ভগবান ঈশ্বরস্বরূপ ও চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকাশ করেন, আর তাঁর অণুক্রিয়া-প্রবৃত্তি থেকে অণুচৈতন্য-রূপ অনন্ত জীব প্রকাশ করেন। এই প্রবৃত্তিকে জীবশক্তি বলা হয়। *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/৫) ভগবান বলেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"হে মহাবাহো অর্জুন! এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার আর একটি পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।" জীবভূত বা জীবেরা তাদের অণুসদৃশ শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সাধারণত, মানুষ বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিৎদের কার্যকলাপ দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়। মায়ার প্রভাবে তারা মনে করে যে, ভগবানের কোন প্রয়োজন নেই এবং তারাই সব কিছু করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তা পারে না। যেহেতু এই জগৎ সীমিত, তাই তার অস্তিত্বও সীমিত। এই জড় জগতে সব কিছুই সসীম, তাই এখানে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ রয়েছে। কিন্তু অসীম শক্তির জগৎ—চিৎ-জগতে সৃষ্টিও নেই, ধ্বংসও নেই।

পরমেশ্বর ভগবানের যদি অসীম শক্তি ও সসীম শক্তি, এই উভয় শক্তি না থাকত, তা হলে তাঁকে সর্ব শক্তিমান বলা যেত না। *অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্*—"ভগবান মহত্তম থেকেও মহত্তর এবং ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর।" তিনি জীবরূপে ক্ষুদ্রতম থেকেও ক্ষুদ্রতর এবং কৃষ্ণরূপে মহত্তম থেকেও মহত্তর। যদি নিয়ন্ত্রণ করার কেউ না থাকে, তা হলে ভগবানের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হয় না, ঠিক যেমন প্রজা না থাকলে রাজা হওয়ার কোন অর্থই হয় না। সমস্ত প্রজারাই যদি রাজা হয়ে যায়, তা হলে রাজা আর সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এভাবেই ভগবান যেহেতু পরম ঈশ্বর, তাই তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার জগৎ থাকতেই হবে। জীবের অস্তিত্বের মৌলিক তত্ত্বকে বলা হয় চিৎ-বিলাস। সর্বশক্তিমান ভগবান জীবরূপে আনন্দদায়িনী শক্তিকে প্রকাশ করেন। *বেদান্তসূত্রে* (১/১/১২) ভগবানকে *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি

হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস এবং যেহেতু তিনি আনন্দ উপভোগ করতে চান, তাই তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য অথবা তাঁর আনন্দ উপভোগ করার প্রবণতা উদ্রেক করার জন্য শক্তি অপরিহার্য। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে এটিই হচ্ছে পূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ১১৭

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"জীবতত্ত্ব হচ্ছে শক্তি, শক্তিমান নয়। শক্তিমান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্‌গীতা, বিষ্ণু পুরাণ আদি বৈদিক শাস্ত্রে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পারমার্থিক পথে উন্নতি সাধন করার জন্য যে তিনটি প্রস্থান রয়েছে তা হচ্ছে—*ন্যায়-প্রস্থান* (বেদান্ত-দর্শন), *শ্রুতি-প্রস্থান* (*উপনিষদ* ও বৈদিক মন্ত্রসমূহ) এবং *স্মৃতি-প্রস্থান* (*ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত, পুরাণ* আদি)। দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদীরা *স্মৃতি-প্রস্থান* স্বীকার করে না। *স্মৃতি* বলতে বৈদিক প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বোঝায়। কখনও কখনও মায়াবাদীরা *ভগবদ্‌গীতা* ও *পুরাণের* প্রামাণিকতা স্বীকার করে না এবং একে বলা হয় *অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়* (*আদিলীলা* ৫/১৭৬ দ্রষ্টব্য)। কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্র বিশ্বাস করে, তা হলে তাকে মহান আচার্যদের স্বীকৃত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই সমস্ত মায়াবাদী দার্শনিকেরা কেবল *ন্যায়-প্রস্থান* ও *শ্রুতি-প্রস্থান* স্বীকার করে, কিন্তু *স্মৃতি-প্রস্থান* বর্জন করে। এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু *ভগবদ্‌গীতা, বিষ্ণু পুরাণ* আদি *স্মৃতি-প্রস্থানের* প্রমাণ প্রদর্শন করেছেন। *ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত* ও *পুরাণ* আদি বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা স্বীকার করলে, পরমেশ্বর ভগবানকে না মেনে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই *ভগবদ্‌গীতার* একটি শ্লোকের (৭/৫) উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

শ্লোক ১১৮

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ১১৮ ॥

অপরা—নিকৃষ্টা শক্তি; **ইয়ম্**—এই জড় জগৎ; **ইতঃ**—এর অতীত; **তু**—কিন্তু; **অন্যাম্**—আর একটি; **প্রকৃতিম্**—শক্তি; **বিদ্ধি**—জেনে রাখ; **মে**—আমার; **পরাম্**—উৎকৃষ্টা শক্তি; **জীব-ভূতাম্**—তারা হচ্ছে জীব; **মহা-বাহো**—হে পরাক্রমশালী; **যয়া**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **ধার্যতে**—ধারণ করে আছে; **জগৎ**—জড় জগৎ।

অনুবাদ

" 'হে মহাবাহো অর্জুন। এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার আর একটি পরা প্রকৃতি

রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।'

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগৎ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম জগৎ—এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—অপরা বা জড়া; এর নাম মায়া প্রকৃতি। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *মম মায়া দুরত্যয়া*—মায়া নামক আমার এই নিকৃষ্টা শক্তি এতই প্রবল যে, জীব যদিও এই শক্তিসম্ভূত নয়, তবুও এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির মহতী শক্তির প্রভাবে জীব (*জীবভূত*) তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে এই মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই জড়া প্রকৃতির অতীত *জীবভূত* নামে আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সমস্ত জীব সেই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিজাত। কিন্তু সেই উৎকৃষ্টা প্রকৃতিজাত জীব যখন জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন তার সমস্ত কার্যকলাপ সেই জড়া প্রকৃতিতেই সম্পাদিত হয়।

পরম কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*), যিনি বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তির উৎস। ভগবানের উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা, উভয় শক্তিই রয়েছে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, উৎকৃষ্টা প্রকৃতি বাস্তব, কিন্তু নিকৃষ্টা প্রকৃতি সেই উৎকৃষ্টা প্রকৃতির প্রতিফলন। দর্পণে অথবা জলে সূর্যের প্রতিবিম্বকে সূর্য বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সূর্য নয়। তেমনই, জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ-জগতের প্রতিফলন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও তা বাস্তব বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়; তা কেবল অনিত্য প্রতিবিম্ব মাত্র, কিন্তু চিৎ-জগৎ হচ্ছে বাস্তব। স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জড় জগৎ কেবল চিৎ-জগতের প্রতিবিম্ব মাত্র।

জীব জড় শক্তিসম্ভূত নয়; সে হচ্ছে চিন্ময় শক্তি, কিন্তু জড় জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে সে তার পরিচয় বিস্মৃত হয়েছে। তার ফলে জীব নিজেকে জড় বলে মনে করে যন্ত্রবিৎ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি রূপে প্রবল উদ্যমে জড় কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। সে জানে না যে, সে আসলে জড় পদার্থজাত নয়, সে হচ্ছে চিন্ময়। এভাবেই তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ার ফলে, সে এই জড় জগতে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তার সেই স্বরূপগত চেতনার পুনর্জাগরণের চেষ্টা করছে। বিশাল গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি, মহাশূন্যে উপগ্রহ ক্ষেপণ আদি কার্যকলাপের মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই ধরনের বুদ্ধিমত্তা উন্নতির পরিচায়ক নয়। তার জানা উচিত যে, তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যেহেতু জড় কার্যকলাপে তার মন নিমগ্ন থাকার ফলে, তাকে বারংবার এই জড় জগতে জড় দেহ ধারণ করতে হয় এবং যদিও সে ভ্রান্তভাবে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে দাবি করছে, কিন্তু জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে সে মোটেই বুদ্ধিমান নয়। আমরা যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কথা বলি, যা মানুষের যথার্থ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ করার পথ প্রদর্শন করছে, তখন বদ্ধ জীব এই আন্দোলনকে

ভুল বোঝে। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সে এতই মগ্ন যে, সে বুঝতে পারে না বড় বড় বাড়ি তৈরি করা, চওড়া রাস্তা তৈরি করা, আর গাড়ি তৈরি করার ঊর্ধ্বে তার আর কোন উন্নততর কার্য থাকতে পারে, যা প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটিই হচ্ছে *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* বা মায়ার প্রভাবে বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার প্রমাণ। জীব যখন এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় মুক্ত জীব। এভাবেই কেউ যখন যথার্থ মুক্তি লাভ করে, তখন সে আর এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের পরিচয় প্রদান করে না। মুক্তির লক্ষণ হচ্ছে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ভ্রান্তভাবে লিপ্ত থাকার পরিবর্তে চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন হওয়া।

অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি হচ্ছে চিন্ময় জীবাত্মার চিন্ময় কার্যকলাপ। মায়াবাদীরা চিন্ময় কার্যকলাপের সঙ্গে জড় কার্যকলাপের পার্থক্য বুঝতে পারে না। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ *ব্রহ্মভূত* স্তরে উন্নীত হন। তখন আর তিনি এই জড় জগতে স্থিত থাকেন না, তখন তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন। ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে চেতনার পূর্ণ বিকাশ বা পুনর্জাগরণ। জীব যখন সদ্গুরুর নির্দেশনায় চিন্ময় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করে, তখন সে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে ভগবান নয়, পক্ষান্তরে সে হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকতে হয়। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/১৯) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে ভগবান বলেছেন, *বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে.....স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*—"বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত থেকে এবং জ্ঞানের অন্বেষণ করে কেউ যখন পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সে আমার শরণাগত হয়। এই ধরনের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" অতএব মায়াবাদীদের যদিও অত্যন্ত জ্ঞানী বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও তারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারেনি। সেই পূর্ণজ্ঞানে উপনীত হতে হলে তাদের অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে।

শ্লোক ১১৯

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; **পরা**—চিন্ময়; **প্রোক্তা**—উক্ত হয়; **ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা**—ক্ষেত্রজ্ঞ নামক শক্তি; **তথা**—তেমনই; **পরা**—চিন্ময়; **অবিদ্যা**—অজ্ঞান; **কর্ম**—সকাম কর্ম;

সংজ্ঞা—পরিচিত; অন্যা—অন্য; তৃতীয়া—তৃতীয়; শক্তিঃ—শক্তি; ইষ্যতে—এভাবেই পরিচিত।

অনুবাদ

" 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা। পরাশক্তি হচ্ছে চিৎ-শক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি হচ্ছে জীবশক্তি, যা পরা শক্তিসম্ভূত হলেও অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারে; এবং তৃতীয় শক্তিটি হচ্ছে কর্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তি, অর্থাৎ মায়াশক্তি।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *বিষ্ণু পুরাণ* (৬/৭/৬১) থেকে উদ্ধৃত।

ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃত পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জীব ভগবানের শক্তির অন্তর্গত। ভগবান শক্তিমান এবং তাঁর বহুবিধ শক্তি রয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। এখন, *বিষ্ণু পুরাণ* থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতেও তা পুনরায় প্রতিপন্ন হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের শক্তি রয়েছে এবং তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—যথা, চিৎ-শক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি।

চিৎ-শক্তি চিৎ-জগতে প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর আদি সব কিছুই চিন্ময়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৬) বলা হয়েছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

"যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে স্বীয় মায়ার দ্বারা আমি আমার আদি চিন্ময় স্বরূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" *আত্মমায়া* বলতে চিৎ-শক্তিকে বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে বা অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করেন, তখন তিনি তা করেন তাঁর চিৎ-শক্তির প্রভাবে। আমরা জন্মগ্রহণ করি জড় প্রকৃতির নিয়মে কর্মফলের বন্ধন অনুসারে, কিন্তু *বিষ্ণু পুরাণের* বর্ণনা অনুসারে, ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব পরা প্রকৃতি-সম্ভূত; তাই আমরা যখন জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হই, তখন আমরাও চিৎ-জগতে প্রবেশ করতে পারি।

জড় প্রকৃতি হচ্ছে অবিদ্যাশক্তি বা চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণ অজ্ঞান। জড় জগতে জীব জড় প্রকৃতির বিস্তারের মাধ্যমে জড় সুখভোগের আশায় নানা রকম সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। এই কলিযুগে তা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রকাশিত, কেন না মানব-সমাজ চিন্ময় প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থেকে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের মহতী আয়োজনে ব্যস্ত। এই যুগের মানুষ তাদের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তারা মনে করে যে, জড় উপাদানগুলি থেকে তাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জড় দেহটির বিনাশে সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত করে যে, জড় ইন্দ্রিয় সমন্বিত এই জড় দেহটি যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ পূর্ণমাত্রায় ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করে যেতে হবে। যেহেতু

তারা নাস্তিক, তাই তারা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে না। এই শ্লোকে এই সমস্ত কার্যকলাপকে *অবিদ্যাকর্ম-সংজ্ঞান্যা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অবিদ্যা বা জড় শক্তি ভগবানের চিৎ-শক্তি থেকে ভিন্ন। তাই যদিও তা ভগবানেরই শক্তি, তবুও তিনি তাতে উপস্থিত থাকেন না। *ভগবদ্গীতায়ও* (৯/৪) ভগবান বলেছেন, *মৎস্থানি সর্বভূতানি*—"সব কিছুই আমাকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে।" এই উক্তি থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সব কিছুই ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে রয়েছে। যেমন, গ্রহ-নক্ষত্রগুলি মহাশূন্যের আশ্রয়ে রয়েছে, যা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাশক্তি। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"ভূমি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি উপাদান দিয়ে আমার ভিন্না প্রকৃতি গঠিত হয়েছে।" আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন ভগবানের ভিন্না প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, যদিও সেই শক্তিগুলি অবশ্যই বাস্তব, কিন্তু সেগুলি ভিন্না মাত্র—স্বতন্ত্র নয়।

একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই ভিন্না প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায়। আমি dictaphone (কথা রেকর্ড করার এক প্রকার যন্ত্র বিশেষ)-এ কথা বলে গ্রন্থ রচনা করি, আর dictaphone-এর টেপটি যখন বাজানো হয়, তখন মনে হয় যেন আমিই কথা বলছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কথা বলছি না। আমি কথা বলেছি এবং dictaphone যন্ত্রে আমার সেই কথাগুলি টেপ করা হয়েছে, যা আমার থেকে ভিন্ন, কিন্তু তা আমারই মতো ক্রিয়া করে। তেমনই, জড়া প্রকৃতি মূলত পরমেশ্বর ভগবান থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু তা ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে, যদিও ভগবানই সেই শক্তি সরবরাহ করেছেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/১০) তার বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—"হে কুন্তীপুত্র! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা এই জড়া প্রকৃতি চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে।" পরমেশ্বর ভগবানের অধ্যক্ষতায় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন জড়া প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা স্বতন্ত্র নয়।

বিষ্ণু পুরাণ থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—যথা, ভগবানের চিৎ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা বা ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) শক্তি এবং পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্না বহিরঙ্গা শক্তি বা জড় শক্তি, যা স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল বলে প্রতীয়মান হয়। শ্রীল ব্যাসদেব যখন ধ্যান ও আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন, তখন তিনি ভগবানের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা মায়াশক্তিকেও দর্শন করেছিলেন (*অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়ম্*)। ব্যাসদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি হচ্ছে ভগবানের ভিন্না বা মায়াশক্তি, যা জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন করে (*যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্*)। ভিন্না বা জড়া প্রকৃতি জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে এবং তার প্রভাবে জীব জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে।

দুর্ভাগ্যবশত, তাদের প্রায় সকলেই মনে করে যে, তাদের দেহটি হচ্ছে তাদের স্বরূপ এবং জড় ইন্দ্রিয়গুলি উপভোগ করাই হচ্ছে তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, কেন না মৃত্যুর পর সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। এই নাস্তিক দর্শন বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে চার্বাক মুনি কর্তৃক প্রবর্তিত হয়ে প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর মতে—

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য কুতঃ পুনরাগমনো ভবেৎ ॥

তাঁর মতবাদ হচ্ছে যে, যতদিন পর্যন্ত জীবন আছে, ততদিন যতটুকু পারা যায় ঘি খেতে হবে। ভারতবর্ষে ঘি থেকে নানা রকম উপাদেয় খাবার তৈরি করা হয়। যেহেতু সকলেই ভাল খাবার খেতে চায়, তাই যত সম্ভব ঘি খাওয়ার জন্য চার্বাক মুনি উপদেশ দিয়েছেন। কেউ বলতে পারে, "আমার টাকা নেই। তা হলে আমি ঘি কিনব কি করে?" তাই চার্বাক মুনি বলেছেন, "তোমার যদি টাকা না থাকে, তা হলে ভিক্ষা করে হোক, ধার করে হোক অথবা চুরি করে হোক, যেভাবেই হোক না কেন ঘি সংগ্রহ করে জীবনটাকে উপভোগ কর।" যদি কেউ আপত্তি করে বলে যে, ঋণ করা অথবা চুরি করার মতো অবৈধ কর্ম করলে, পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হবে। তার উত্তরে চার্বাক মুনি বলেছেন, "ফলভোগ করার দায়িত্ব নেই, কেন না মৃত্যুর পর দেহ যখন ভস্মীভূত হয়ে যাবে, তখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।"

একে বলা হয় অজ্ঞান। *ভগবদ্‌গীতা* থেকে জানা যায় যে, দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না (*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*)। দেহের বিনাশ মানে হচ্ছে অপর আর একটি দেহ লাভ করা (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। তাই এই জড় জগতে অবৈধ কর্ম করা বা পাপকর্ম করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আত্মা ও তার দেহান্তর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকার ফলে, মানুষ মায়ার প্ররোচনায় নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা মনে করে যে, চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছাড়াই, কেবল জড় জ্ঞানের প্রভাবে তারা সুখী হতে পারবে। তাই জড় জগৎ এবং তার কার্যকলাপকে এখানে *অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্না জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন মানুষের অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করে তাদের স্বরূপের পুনরুজ্জীবনের জন্য ভগবান এই জড় জগতে অবতরণ করেন (*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*)। জীব যখন তার স্বরূপ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তখন ভগবান এসে তাদের শিক্ষা দেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"হে জীবগণ! তোমাদের সব রকম জড় কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাদের রক্ষা করব।" (*ভঃ গীঃ* ১৮/৬৬)

চার্বাক মুনির নির্দেশ হচ্ছে ঘি ক্রয় করার জন্য ভিক্ষা করা, ধার করা অথবা টাকা চুরি করা উচিত এবং জীবনকে উপভোগ করা উচিত (*ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*)। এভাবেই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের সব থেকে বড় নাস্তিকও নির্দেশ দিচ্ছেন ঘি খাওয়ার

জন্য, মাংস খাওয়ার জন্য নয়। মানুষ যে বাঘ অথবা কুকুরের মতো মাংস খাবে, তা কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারত না, কিন্তু আজকের মানুষ এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তারা পশুর মতো হয়ে গেছে। সুতরাং, আধুনিক সভ্যতাকে মানব-সভ্যতা বলা যায় না।

শ্লোক ১২০

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব ।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

"মায়াবাদ দর্শন এতই নীচ যে, জীবকে ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে; তার ফলে পরতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে জীবতত্ত্বকে ভগবানের শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি জীবকে ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বলে গ্রহণ না করে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সমান বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার সেই দর্শন সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য জেনে শুনেই জীবতত্ত্বকে ভগবানের সমকক্ষ বলে দাবি করেছেন। তাই, তাঁর সমস্ত দর্শন ভুলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তা বিপথে পরিচালিত করে মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করে এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। *ভগবদ্‌গীতার* বর্ণনা অনুসারে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদ দর্শন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে জীবকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করে এবং তার ফলে জীব মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে পরম ঈশ্বর। এভাবেই তা শত সহস্র নিরীহ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে।

বেদান্তসূত্রে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্ব শক্তিমান এবং চিৎ ও অচিৎ সব কিছুই তাঁর শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুরই উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) এবং সব কিছুই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। সেই কথা *বিষ্ণু পুরাণেও* বর্ণিত হয়েছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥

"অগ্নি যেমন এক স্থানে অবস্থিত থেকেও সর্বত্র তার কিরণ বিস্তার করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রভাবে সমস্ত জগতের প্রকাশ হয়েছে।" এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তেমনই, আবার বর্ণনা করা হয়েছে, এই জড় জগতের সব কিছুই যেমন সূর্যের শক্তি সূর্যকিরণের উপর নির্ভর করে বিরাজ করে, তেমনই সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের

চিৎ-শক্তি ও জড় শক্তির উপর নির্ভর করে বিরাজ করে। একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁর স্বীয় ধামে থাকেন (*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*), যেখানে তিনি নিরন্তর তাঁর গোপসখা ও ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে অপ্রাকৃত লীলাবিলাস উপভোগ করেন, কিন্তু তবুও তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণুতেও (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*)। এটি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের তথ্য।

দুর্ভাগ্যবশত, মায়াবাদ দর্শন জীবকে ভগবান বলে দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং সমস্ত জগৎ জুড়ে ব্যাপকভাবে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে জগতের সর্বনাশ করছে। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদিত করে মায়াবাদী দার্শনিকেরা মানব-সমাজের সব চাইতে বড় ক্ষতি সাধন করেছে। এই জঘন্য মায়াবাদ দর্শন প্রতিহত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রচার করেছেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ ও প্রবঞ্চনাময় এই কলিযুগে ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা। এছাড়া আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই, আর কোন উপায় নেই।" মানুষকে কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে এবং তার ফলে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে, তারা পরমেশ্বর ভগবান নয়, তারা হচ্ছে ভগবানের নিত্য সেবক। এভাবেই মায়াবাদ দর্শনের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হবে। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন সে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"কেউ যখন ঐকান্তিকভাবে পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন আর কোন অবস্থাতেই তার অধঃপতন হয় না, তখন তিনি ত্রিগুণাত্মিকা জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন।" (ভঃ গীঃ ১৪/২৬) তাই যে সমস্ত মূর্খ জীব মনে করে যে, ভগবান নেই, অথবা যদি তিনি থেকেও থাকেন তবে তিনি নিরাকার ও নির্বিশেষ, আসলে তারাই হচ্ছে এক একটি ভগবান, তাদের সেই ভয়ংকর অধঃপতিত অবস্থা থেকে রক্ষা করার একমাত্র আশার আলোক হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন।

শ্লোক ১২১

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ ।
'ব্যাস ভ্রান্ত'—বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদান্তসূত্রে শ্রীল ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে, সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের শক্তির

রূপান্তর। কিন্তু শঙ্করাচার্য সমস্ত জগৎকে বিভ্রান্ত করে মন্তব্য করলেন যে, ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এভাবেই তিনি সমগ্র জগতে আস্তিক্যবাদের মহাবিরোধের সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন, "শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর *বেদান্তসূত্রে* স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের শক্তির পরিণাম। কিন্তু শঙ্করাচার্য ভগবানের শক্তিকে স্বীকার না করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, ভগবানই বিকারগ্রস্ত হন। তিনি *বেদের* বহু উক্তির বিকৃত অর্থ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পরমতত্ত্ব বা ভগবান যদি রূপান্তরিত হন, তা হলে তাঁর অদ্বয়ত্ব ব্যাহত হবে। এভাবেই তিনি প্রচার করলেন যে, ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত ভুল। তাই অদ্বৈতবাদের মাধ্যমে তিনি বিবর্তবাদ বা মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রটি হচ্ছে—*তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ*। শঙ্করাচার্য তাঁর *শারীরক-ভাষ্যে* এই সূত্রের ব্যাখ্যায় *ছান্দোগ্য উপনিষদ* (৬/১/৪) থেকে *বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্* আদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়ে পরিণাম বাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ বলে বিতর্ক করেছেন। ভগবানের শক্তির এই পরিবর্তন বা পরিণামকে তিনি ভ্রান্তভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, যা পরে বিশ্লেষণ করা হবে। যেহেতু তাঁর মতে ভগবান নির্বিশেষ, তাই তিনি বিশ্বাস করেন না যে, সমস্ত জড় সৃষ্টিই হচ্ছে ভগবানের শক্তির পরিণাম, কেন না পরম-তত্ত্বের শক্তি যদি স্বীকার করা হয়, তখন অবশ্যই পরম-তত্ত্বকে সবিশেষরূপে বা একজন ব্যক্তিরূপে স্বীকার করতে হবে। কোন ব্যক্তি তাঁর শক্তির রূপান্তর দ্বারা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারেন। যেমন, একজন ব্যবসায়ী অনেক বড় বড় কলকারখানা ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর শক্তির রূপান্তর করতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি সেই মানুষটিই থাকেন। মায়াবাদীরা এই সরল তত্ত্বটি বুঝতে পারে না। তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও অল্প জ্ঞানের প্রভাবে তারা বুঝতে পারে না যে, একজন মানুষের শক্তি রূপান্তরিত হলেও সেই মানুষটির কোন রূপান্তর হয় না—সেই মানুষটি অপরিবর্তিতই থাকেন।

পরম-তত্ত্বের শক্তি যে রূপান্তর হতে পারে, সেই কথা বিশ্বাস না করে শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদ সৃষ্টি করেছেন। সেই মায়াবাদ দর্শন অনুসারে যদিও পরম-তত্ত্বের কখনও রূপান্তর হয় না, তবুও আমাদের মনে হয় যে, তা রূপান্তর হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে মায়া। শঙ্করাচার্য পরম-তত্ত্বের শক্তির রূপান্তরে বিশ্বাস করেন না, তাই তিনি দাবি করেছেন যে, সব কিছুই এক এবং সেই সূত্রে জীবও ঈশ্বর। এই মতবাদকে বলা হয় মায়াবাদ।

শ্রীল ব্যাসদেব বিশ্লেষণ করেছেন যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন একজন পুরুষ, যাঁর বিভিন্ন শক্তি রয়েছে। কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা (*স ঐক্ষত*) তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন (*স অসৃজত*)। সৃষ্টির পরেও তিনি সেই একই পুরুষ থাকেন—তিনি সব কিছুতে তাঁর অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন না। ভগবানের শক্তি যে অচিন্ত্য এবং তাঁর আদেশে ও তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে যে এই

বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *স-তত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিকার ইত্যুদাহৃতঃ*। এই মন্ত্র নির্দেশ করছে যে, একটি সত্যতত্ত্ব থেকে অন্য একটি সত্যতত্ত্বের উদয় হলে তাকে অন্য বস্তু বলে যে ধারণা, সেটি হচ্ছে বিকার অর্থাৎ পরিণাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন পিতা হচ্ছে একটি সত্যতত্ত্ব এবং পিতা থেকে উৎপন্ন একটি পুত্র হচ্ছে একটি দ্বিতীয় সত্যতত্ত্ব। এভাবেই তারা উভয়েই সত্যতত্ত্ব, যদিও একটি আর একটি থেকে উৎপন্ন। প্রথম সত্যতত্ত্ব থেকে উৎপন্ন দ্বিতীয় স্বতন্ত্র সত্যতত্ত্বটিকে বলা হয় বিকার বা পরিণাম। পরমব্রহ্ম হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং অন্য যে সমস্ত শক্তি তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করছে, যেমন জীব ও প্রকৃতি, এরাও সত্য। এটি হচ্ছে বিকারের বা পরিণামের একটি দৃষ্টান্ত। বিকারের আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি সত্যবস্তু দুগ্ধের আর একটি সত্যবস্তু দধিতে পরিণত হওয়া। দধি হচ্ছে দুগ্ধের পরিণাম, যদিও দধি ও দুগ্ধের উপাদান এক।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে—*ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্*। এই বেদবাক্য থেকে ব্রহ্মই যে জগৎ, সেই সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। পরতত্ত্বে অচিন্ত্য শক্তিসমূহ রয়েছে। সেই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*) এবং সমস্ত জাগতিক সৃষ্টি ভগবানের সেই বিভিন্ন শক্তির প্রমাণ। পরমেশ্বর ভগবান সত্যবস্তু, তাই তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেন তাও সত্য। সব কিছুই সত্য ও পূর্ণ (*পূর্ণম্*), কিন্তু পরম *পূর্ণম্* বা পরম সত্য সর্ব অবস্থাতেই একই থাকেন। *পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়*। পরতত্ত্ব এমনই পূর্ণ যে, যদিও তাঁর থেকে অসংখ্য পূর্ণ বস্তুর প্রকাশ হয় এবং সেগুলি তার থেকে পৃথক বলে মনে হয়, তবুও তাঁর পূর্ণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। কোন অবস্থাতেই তাঁর ক্ষয় হয় না।

অতএব যথার্থ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সমস্ত জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির বিকার। এমন নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরব্রহ্ম স্বয়ং বিকৃত হন। তিনি সর্ব অবস্থাতে একই থাকেন। জড় জগৎ ও জীব হচ্ছে আদি উৎস ভগবান, পরতত্ত্ব বা ব্রহ্মের শক্তির বিকার। পক্ষান্তরে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম হচ্ছেন মূল উপাদান এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে সেই উপাদানের বিকার। সেই কথা *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (৩/১) প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*। "সমস্ত জড় জগৎ উদ্ভূত হয়েছে পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে।" এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন আদি কারণ এবং জীব ও জড় জগৎ হচ্ছে সেই কারণের কার্য। কারণটি যেহেতু সত্য, তাই তার কার্যটিও সত্য। তা মায়া নয়। শঙ্করাচার্য সামঞ্জস্যহীনভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্রহ্মের বিকার জীব ও জগৎ হচ্ছে মায়া, কেন না তাঁর মতে জীব ও জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ও পৃথক। এভাবেই কদর্থ করে মায়াবাদীরা প্রচার করেছেন, *ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা*—"পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্য, কিন্তু জগৎ ও জীব মিথ্যা", অথবা তা সবই প্রকৃতপক্ষে পরতত্ত্ব এবং জড় জগৎ ও জীবের ভিন্ন অস্তিত্ব নেই।

তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান, জীব ও জড় জগৎকে অবিচ্ছেদ্য ও অজ্ঞান বলে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে, শঙ্করাচার্য পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আচ্ছাদন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে জড় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু সেটি একটি মস্ত বড় ভুল। পরমেশ্বর ভগবান যদি সত্য হন, তা হলে তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা হয় কিভাবে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, এই জগৎকে আমরা মিথ্যা বলে মনে করতে পারি না। তাই বৈষ্ণব-দর্শনে বলা হয় যে, জড় সৃষ্টি মিথ্যা নয়, তবে অনিত্য। তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন, কিন্তু যেহেতু তা ভগবানের শক্তির দ্বারা অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তাই তাকে মিথ্যা বলা অন্যায়।

অভক্তেরাও বিস্ময়কর জড় সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু এই জড় সৃষ্টির আড়ালে যিনি রয়েছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য *ঐতরেয় উপনিষদ* (১/১/১) থেকে *আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ* এই সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম আত্মা বা পরতত্ত্ব সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিল। কেউ বলতে পারে, "পরমেশ্বর ভগবান যদি পূর্ণরূপে চিন্ময় হন, তা হলে তাঁর মধ্যে জড় ও চেতন উভয় শক্তি বিরাজ করে কি করে এবং তিনি জড় সৃষ্টির উৎস হন কি করে?" তার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য *তৈত্তিরীয় উপনিষদের* একটি মন্ত্র (৩/১) উল্লেখ করেছেন—

> *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে*
> *যেন জাতানি জীবন্তি*
> *যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ।*

এই মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সমস্ত জগৎ পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর তাঁরই শরীরে লীন হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে জীব চিন্ময় এবং সে যখন চিৎ-জগতে প্রবেশ করে বা পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে প্রবেশ করে, তখনও স্বতন্ত্র আত্মারূপে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই সম্পর্কে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, একটি সবুজ পাখি যখন একটি সবুজ গাছে গিয়ে বসে, তখন সে গাছ হয়ে যায় না; যদিও মনে হয় যে সে গাছের সবুজে লীন হয়ে গেছে, তবুও একটি পক্ষীরূপে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই রকমই আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি পশু যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যদিও মনে হয় যে সেই পশুটি বনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, তবুও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তেমনই, জড় জগতে মায়াশক্তি ও তটস্থা শক্তি জীব তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এভাবেই যদিও জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে, তবুও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাই, জড় অথবা চেতন শক্তিতে লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়ে যায়। রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে, ভগবানের বিভিন্ন সমস্ত শক্তি যদিও এক, কিন্তু তবুও প্রতিটি শক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ শব্দটির কদর্থ করে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য *বেদান্তসূত্রের* পাঠকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, এমন কি তিনি *বেদান্তসূত্রের* প্রণেতা ব্যাসদেবের ভুল ধরারও চেষ্টা করেছেন। *বেদান্তসূত্রের* সব কয়টি সূত্রের এখানে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন নেই, তবে একটি আলাদা গ্রন্থে *বেদান্তসূত্র* উপস্থাপন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

শ্লোক ১২২

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।
এত কহি' 'বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

"শঙ্করাচার্যের মতে পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন, এই বলে তিনি বিবর্তবাদ স্থাপন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, কেউ যদি স্পষ্টভাবে *পরিণামবাদের* অর্থ না বুঝে, তা হলে সে অবশ্যই জড় জগৎ ও জীবের তত্ত্ব বুঝতে পারবে না। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৬/৮/৪) বলা হয়েছে, *সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।* জড় জগৎ ও জীব ভিন্ন বস্তু এবং তারা নিত্যসত্য, মিথ্যা নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য অর্থহীনভাবে আশঙ্কা করেছেন যে, *পরিণামবাদে* ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হন, তাই তিনি কল্পনা করেছেন যে, জড় জগৎ ও জীব উভয়ই মিথ্যা এবং তাদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কথার মারপ্যাঁচে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জীব ও জড় জগতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অলীক এবং সেই সম্পর্কে রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, অথবা শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, সেই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এভাবেই তিনি জঘন্যভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করেছেন।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্তটি *মাণ্ডূক্য উপনিষদে* রয়েছে, কিন্তু তার মাধ্যমে দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আত্মা হচ্ছে চিৎকণা, যা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে (*মমৈবাংশো জীবলোকে*), তাই মোহবশত (*বিবর্তবাদ*) পশুবৎ মানুষ তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে *বিবর্ত* বা মায়ার যথার্থ দৃষ্টান্ত। *অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ* শ্লোকটি এই বিবর্তের বর্ণনা করছে। প্রকৃত সত্য না জেনে এবং একটি বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল করা (যেমন, দেহকে আত্মা বলে মনে করা) মানেই হচ্ছে *বিবর্তবাদ*। দেহকে আত্মা বলে মনে করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীব, তারা সকলেই এই *বিবর্তবাদের* দ্বারা বিভ্রান্ত। কেউ যখন সর্বশক্তিমান ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির কথা ভুলে যায়, তখনই সে *বিবর্তবাদের* দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

পরমেশ্বর ভগবান যে কখনও পরিবর্তিত না হয়ে একই সত্তায় চিরকাল বিরাজ করেন, সেই তত্ত্ব *ঈশোপনিষদে* বর্ণিত হয়েছে—*পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।* ভগবান পূর্ণ। এমন কি তাঁর থেকে পূর্ণ সত্তা নিয়ে নেওয়া হলেও তিনি পূর্ণই থাকেন। জড় জগৎ ভগবানের শক্তির প্রভাবে প্রকাশিত, কিন্তু তবুও তিনি হচ্ছেন সেই একই আদিপুরুষ। তাঁর রূপ, গুণ, পরিকর আদি কখনই ক্ষয় হয় না। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিবর্তবাদ* সম্বন্ধে বলেছেন—"*বিবর্তবাদের* প্রভাবে কল্পনা করা হয় যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে এই ধরনের ধারণার উদয় হয়। পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম সব সময়ই এক এবং অভিন্ন। তিনি পূর্ণচিন্ময়, তাই তিনি অন্য সমস্ত ধর্মরহিত, সর্ব বিলক্ষণ এবং অহঙ্কারশূন্য। তাঁর পক্ষে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া এবং অজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা বা ভ্রমযুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। ব্রহ্মবস্তু—পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাতে ক্ষুদ্র মানুষদের অচিন্তনীয় শক্তির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দৃষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মের অলৌকিক শক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার্য। বাত, কফ ও পিত্ত, ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীকে আশ্রয় করলেও যেরূপ পরস্পর-বিরোধী ধাতুর শোধনের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা হয়, সেই প্রকার পরস্পর-বিরোধী গুণত্রয়ের ধারিণী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্ব অনুমিত হলেও অবয়ব আদি স্বীকৃত হয়। সেই বিষয়ে বস্তুতে যদি এই রকম অচিন্ত্য শক্তি থাকে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে যে তার থেকে অনন্ত গুণবিশিষ্ট একটি অচিন্ত্য শক্তি রয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে?"

শ্লোক ১২৩

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"শক্তির বিকার একটি প্রামাণিক সত্য। দেহে আত্মবুদ্ধি করাই হচ্ছে বিবর্ত।

তাৎপর্য

জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ চিৎ-স্ফুলিঙ্গ। দুর্ভাগ্যবশত, সে তার দেহকে আত্মবুদ্ধি করে এবং সেই ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় *বিবর্ত* বা অসত্যকে সত্য বলে মনে করা। দেহ আত্মা নয়, কিন্তু পশু ও মূর্খ মানুষেরা দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। *বিবর্ত* মানে আত্মার স্বরূপের পরিবর্তন নয়; দেহকে আত্মা বলে মনে করার ভ্রান্তিই হচ্ছে *বিবর্ত*। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত আটটি জড় উপাদান (*ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ* আদি) সমন্বিত ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যখন বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে, তখন পরমেশ্বর ভগবানের কোন পরিবর্তন বা বিকার হয় না।

শ্লোক ১২৪

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত। তাই তাঁর ইচ্ছায় তাঁর অচিন্ত্য শক্তি জগৎরূপে পরিণত হয়।

শ্লোক ১২৫

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণির স্পর্শে লোহা সোনায় পরিণত হয়, কিন্তু তবুও চিন্তামণির কোন পরিবর্তন হয় না। এই দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান থেকে যদিও অসংখ্য শক্তির প্রকাশ হয়, তবুও তিনি অবিকৃতই থাকেন।

শ্লোক ১২৬

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণি থেকে যদিও নানা রকম রত্নরাশি উৎপন্ন হয়, তবুও চিন্তামণি তাঁর স্বরূপে অবিকৃত থাকে।

শ্লোক ১২৭

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"চিন্তামণির মতো একটি প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি থাকতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস না করার কি আছে?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শ্লোকে যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা যে কোন মানুষই সূর্যের শক্তি বিবেচনা করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। অনাদিকাল ধরে সূর্য তাপ ও আলোক প্রদান করে আসছে, কিন্তু তবুও তার শক্তি হ্রাস পায়নি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে, সূর্যকিরণের প্রভাবে জড় জগতের পালন হয়। প্রকৃতপক্ষে সকলেই দেখতে পায়, কিভাবে সূর্যকিরণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকার্য সম্পাদিত হয়। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং এমন কি কক্ষপথে গ্রহগুলির বিচরণও

সম্পাদিত হয় সূর্যের শক্তির প্রভাবে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা কখনও কখনও বিবেচনা করে যে, সূর্য হচ্ছে সৃষ্টির আদি কারণ। কিন্তু তারা জানে না যে, সূর্য হচ্ছে একটি মাধ্যম মাত্র, কেন না তারও সৃষ্টি হয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা। সূর্য এবং চিন্তামণি ছাড়াও বহু জড় পদার্থ রয়েছে, বিভিন্নভাবে যাদের শক্তির পরিবর্তন হলেও সেগুলি অপরিবর্তনীয় থাকে। সুতরাং, আদি কারণ পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির পরিবর্তন হলেও, তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না।

বিবর্তবাদ ও *পরিণামবাদ* সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের বিশ্লেষণের ভ্রান্তি জীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যরা প্রদর্শন করে গেছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর মতে, শঙ্করাচার্য *বেদান্তসূত্রের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* সূত্রের ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচার্য কথার মারপ্যাঁচে *ময়ট্* প্রত্যয়টির এমন অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন যে, সেই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, *বেদান্তসূত্র* সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই কম, কিন্তু তিনি তাঁর নির্বিশেষবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কেবল *বেদান্তসূত্রের* ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা করতেও তিনি সক্ষম হননি, কেন না তিনি উপযুক্ত দৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি। এই সম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী *ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা* (*তৈত্তিরীয় উপঃ* ২/৫) বৈদিক শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মই সব কিছুর উৎস। কিন্তু এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের এমন অর্থ করেছেন যে, সেভাবেই অর্থ করা হলে, জীব গোস্বামীর মতে ব্যাসদেবের শব্দজ্ঞান ছিল না বলে মনে হয়, কেন না তাঁর ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা *বেদান্তের* সেই সেই অর্থ হয় না। *বেদান্তসূত্রের* প্রকৃত অর্থ এই রকম প্রবঞ্চনাপূর্ণভাবে বিকৃত করার ফলে এক শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, যারা বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রের, বিশেষ করে *ভগবদ্গীতার* বিভিন্ন মনগড়া অর্থ তৈরি করে। সেই সমস্ত মূর্খ পণ্ডিতদের একজন *কুরুক্ষেত্র* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'এই দেহটি হচ্ছে কুরুক্ষেত্র'। এই ধরনের অর্থ-বিশ্লেষণ নির্ণয় করে যে, শ্রীকৃষ্ণ অথবা ব্যাসদেবের শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ছিল না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তার অর্থ সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ ধারণা ছিল না, আর ব্যাসদেব যা লিখেছিলেন, তার অর্থ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল না, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি রেখে গেছেন, যাতে পরবর্তীকালে মায়াবাদীরা সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারে।

বেদান্তসূত্র ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের কদর্থ করে সময় নষ্ট না করার পরিবর্তে যথাযথভাবে সেই সমস্ত গ্রন্থের অর্থ গ্রহণ করা উচিত। তাই, প্রকৃত অর্থের কোন রকম পরিবর্তন না করে আমরা *ভগবদ্গীতা যথাযথ* প্রকাশ করেছি। তেমনই, কেউ যদি *বেদান্তসূত্রের* অর্থ বিকৃতি না করে যথাযথভাবে তা পাঠ করেন, তা হলে তিনি অতি সহজেই *বেদান্তসূত্র* হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। তাই শ্রীল ব্যাসদেব তাঁর *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১/১) *বেদান্তসূত্রের* প্রথম সূত্র *জন্মাদ্যস্য যতঃ* থেকে *বেদান্তসূত্রের* বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্

"আমি বাস্তব বস্তুর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) ধ্যান করি, যিনি সর্ব কারণের পরম কারণ, যাঁর থেকে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, যাঁকে আশ্রয় করে সব কিছু বিরাজ করে এবং যাঁর দ্বারা সব কিছু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নিত্য জ্যোতির্ময় সেই পরমেশ্বর ভগবানের আমি ধ্যান করি, যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত এবং যিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন।" পরমেশ্বর ভগবান সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সব কিছু সম্পাদিত করতে জানেন। তিনি *অভিজ্ঞ*, তিনি সর্বদাই পূর্ণ জ্ঞানময়। তাই *ভগবদ্‌গীতায়* (৭/২৬) তিনি বলেছেন যে, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জানেন, কিন্তু ভক্ত ছাড়া অন্য কেউ তাঁকে যথাযথভাবে জানেন না। তাই, ভগবদ্ভক্তেরা অন্তত আংশিকভাবে পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, কিন্তু মায়াবাদীরা যারা পরমতত্ত্ব নিয়ে কেবল জল্পনা-কল্পনা করে, তারা কেবল অনর্থক তাদের সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ১২৮

'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান ।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"শব্দব্রহ্ম ওঁকার হচ্ছে বেদের মহাবাক্য—তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের আধার। তাই শব্দব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ এবং সমস্ত সৃষ্টির আধার ওঁকারকে স্বীকার করা উচিত।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৮/১৩) ওঁকার-এর মহিমা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

এই শ্লোকটি ইঙ্গিত করছে যে, *ওঁকার* বা *প্রণব* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শব্দব্রহ্মরূপ প্রকাশ। তাই, মৃত্যুর সময় কেউ যদি 'ওঁ' এই একটি অক্ষর স্মরণ করেন, তা হলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন এবং তার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরম গতি লাভ করে চিৎ-জগতে প্রবিষ্ট হন। *ওঁকার* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের ভিত্তি, কেন না তা হচ্ছে শব্দব্রহ্মরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ এবং তাঁকে জানাই হচ্ছে *বেদের* চরম লক্ষ্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণিত এই সমস্ত সরল তথ্যগুলি মায়াবাদীরা বুঝতে পারে না, অথচ নিজেদের বড় বড় বৈদান্তিক বলে মনে করে তারা গর্ববোধ করে। তাই, কখনও কখনও আমরা বেদান্তী দার্শনিকদের বিদন্তী, অর্থাৎ দন্তহীন বলে বর্ণনা করি। শঙ্কর দর্শনের সমস্ত যুক্তি, যা হচ্ছে মায়াবাদীদের দাঁত, তা রামানুজাচার্য আদি মহান বৈষ্ণব আচার্যদের সুদৃঢ় যুক্তির

প্রভাবে ভগ্ন হয়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য ও মধ্বাচার্য মায়াবাদীদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাই তাদের বিদন্তী বা দন্তহীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

ভগবদ্‌গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে *ওঁকার*-এর অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

"সমাধিতে অবস্থানপূর্বক 'ওঁ' এই অক্ষর উচ্চারণ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমগতি লাভ করেন অর্থাৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যান।" কেউ যদি যথার্থই বুঝতে পারেন যে, *ওঁকার* হচ্ছেন শব্দব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, তা হলে তিনি *ওঁকার* উচ্চারণ করুন অথবা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুন, তাঁর ফল একই হয়।

ওঁকার-এর অর্থ বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্‌গীতায়* নবম অধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে আরও বলা হয়েছে—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঁকার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥

"আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমিই বেদ্য, পবিত্রকারী এবং ওঁকার। আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।"

তেমনই, *ওঁকার* সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে আরও বলা হয়েছে—

ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥

"সৃষ্টির আদিতে ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি ব্রহ্ম নির্দেশক নাম বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সময় এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণেরা তা উচ্চারণ করতেন।"

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে *ওঁকার*-এর মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভগবৎ-সন্দর্ভে* বলেছেন যে, বৈদিক শাস্ত্রে *ওঁকার* হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম। এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচ্চারণের ফলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কখনও কখনও *ওঁকারকে* তারক বা পরিত্রাণকারীও বলা হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* শুরু হয়েছে *ওঁকার* দিয়ে—*ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। তাই, শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী *ওঁকারকে* তারাঙ্কুর বা জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করার বীজ বলে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর পবিত্র নাম এবং শব্দব্রহ্ম *ওঁকার* তাঁর থেকে অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, দিব্যনাম বা শব্দব্রহ্মরূপে ভগবানের প্রকাশ *ওঁকার* পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশক্তি সমন্বিত।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

ভগবানের দিব্যনামে তাঁর সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। ভগবানের নাম অথবা *ওঁকার* যে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, যিনি ওঁকার এবং ভগবানের দিব্যনাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ শব্দব্রহ্মরূপে পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। *নারদপঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যিনি অষ্টাক্ষর সমন্বিত *ওঁ নমো নারায়ণায়* মন্ত্র উচ্চারণ করেন, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ স্বয়ং তাঁর সামনে উপস্থিত হন। *মাণ্ডুক্য উপনিষদেও* বর্ণনা করা হয়েছে যে, চিৎ-জগতে যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়, তা সবই হচ্ছে *ওঁকার*-এর চিৎ-শক্তির প্রকাশ।

সমস্ত *উপনিষদের* ভিত্তিতে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, *ওঁকার* হচ্ছে পরমতত্ত্ব এবং সেই সত্য সমস্ত মহাজন ও আচার্যরা স্বীকার করে গেছেন। *ওঁকার* অনাদি, অবিকারী, পরম এবং সব রকম জড় কলুষ ও বিকার থেকে মুক্ত। *ওঁকার* হচ্ছে সব কিছুরই আদি, মধ্য ও অন্ত এবং যিনি এভাবেই ওঁকারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি *ওঁকারের* মাধ্যমে পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করেন। সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত *ওঁকার* হচ্ছেন ঈশ্বর, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*। *ওঁকার* বিষ্ণু থেকে অভিন্ন, কেন না *ওঁকার* বিষ্ণুরই মতো সর্বব্যাপ্ত। যিনি বুঝেছেন যে, *ওঁকার* ও শ্রীবিষ্ণু অভিন্ন, তিনি শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। যিনি *ওঁকার* উচ্চারণ করেন, তিনি আর শূদ্র থাকেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হন। কেবলমাত্র *ওঁকার* উচ্চারণ করার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। *ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ*—"পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু তবুও তিনি তা থেকে ভিন্ন। তাঁর থেকেই এই জড় সৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করে তা বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যাবে।" (*ভাগবত* ১/৫/২০)। যারা অজ্ঞ তারা তা বুঝতে পারে না, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম *ওঁকার* উচ্চারণ করার মাধ্যমে তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

তা বলে মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু সর্বশক্তিমান, তাই তাঁকে প্রকাশ করার জন্য আমরা অ, উ এবং ম—এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয় তৈরি করেছি। প্রকৃতপক্ষে, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম *ওঁকার* যদিও অ, উ এবং ম—এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়, তবুও তা চিন্ময় শক্তি সমন্বিত এবং যিনি এই *ওঁকার* উচ্চারণ করেন, তিনি অচিরেই বুঝতে পারেন যে, *ওঁকার* এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন, *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*—"সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে আমি হচ্ছি প্রণব 'ওঁ'।" (*গীঃ* ৭/৮) তাই বুঝতে হবে যে, ভগবানের অসংখ্য অবতারের মধ্যে *ওঁকার* হচ্ছে শব্দব্রহ্মরূপে

তাঁর অবতার। সেই কথা সমস্ত *বেদে* স্বীকার করা হয়েছে। সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, ভগবানের দিব্যনাম ও ভগবান স্বয়ং অভিন্ন (*অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ*)। যেহেতু *ওঁকার* হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব, তাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার পূর্বে *ওঁকার* উচ্চারণ করা হয়। *ওঁকার* ব্যতীত কোন বৈদিক মন্ত্র সফল হয় না। তাই গোস্বামীরা ঘোষণা করে গিয়েছেন যে, প্রণব (*ওঁকার*) হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ এবং তাঁরা আক্ষরিকভাবে *ওঁকার*-এর বিশ্লেষণ করেছেন—

অ-কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্বলোকৈকনায়কঃ ।
উ-কারেণোচ্যতে রাধা ম-কারো জীববাচকঃ ॥

ওঁকার হচ্ছে অ, উ এবং ম—এই তিনটি অক্ষরের সমন্বয়। *অ-কারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ*—*অ-কার* শ্রীকৃষ্ণকে বোঝায়, যিনি হচ্ছেন *সর্বলোকৈকনায়কঃ*, অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীবের ঈশ্বর। তিনি হচ্ছেন পরম নায়ক (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। *উ-কার* শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীকে ইঙ্গিত করে এবং *ম-কার* জীবকে ইঙ্গিত করে। এভাবেই 'ওঁ' হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শক্তি এবং তাঁর নিত্য সেবকদের পূর্ণ সমন্বয়। পক্ষান্তরে, *ওঁকার* বলতে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর নাম, যশ, লীলা, পরিকর, প্রকাশ, ভক্তশক্তি আদি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকেই বোঝায়। যেমন, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন, *সর্ববিশ্ব-ধাম*—*ওঁকার* হচ্ছেন সব কিছুরই আশ্রয়স্থল, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়স্থল (*ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্*)।

মায়াবাদীরা অনেক বৈদিক মন্ত্রকে মহাবাক্য বা মুখ্য বৈদিক মন্ত্র বলে মনে করে, যেমন *তত্ত্বমসি* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/৮/৭), *ইদং সর্বং যদয়মাত্মা* এবং *ব্রহ্মেদং সর্বম্* (*বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ২/৫/১), *আত্মৈবেদং সর্বম্* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৭/২৫/২) এবং *নেহ নানাস্তি কিঞ্চন* (*কঠ উপনিষদ* ২/১/১১)। ই সমস্ত বাক্যগুলিকে *মহাবাক্য* বলা একটি বিশেষ ভ্রম। *ওঁকারই* একমাত্র *মহাবাক্য*। অন্যান্য যে সমস্ত মন্ত্রগুলিকে মায়াবাদীরা *মহাবাক্য* বলে গ্রহণ করে, সেগুলি কেবল প্রাসঙ্গিক। সেগুলিকে *মহাবাক্য* বা মহামন্ত্র বলে গ্রহণ করা যায় না। *তত্ত্বমসি* বাক্যটি *প্রাদেশিক* মাত্র, কেন না তার দ্বারা যা উপদিষ্ট হয় তা কেবল *বেদের* আংশিক উপলব্ধি, কিন্তু *ওঁকারে* সমস্ত বৈদিক জ্ঞান নিহিত রয়েছে। তাই অপ্রাকৃত শব্দ *ওঁকার* (*প্রণব*) হচ্ছে *মহাবাক্য*। সুতরাং, *প্রণব* ছাড়া আর কোন *মহাবাক্য* হতে পারে না।

শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা *ওঁকারকে* বাদ দিয়ে যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রকে *মহাবাক্য* বলে মনে করছে তার কোনটিই *মহাবাক্য* নয়। তারা কেবল মন্তব্য করছে। শঙ্করাচার্য কিন্তু কখনও মহাবাক্য *ওঁকার*-এর উচ্চারণ বা কীর্তনের ব্যাপারে কোন রকম জোর দেননি। তিনি কেবল *তত্ত্বমসি*-কেই মহাবাক্য বলে স্বীকার করেছেন। জীবকে ভগবান বলে কল্পনা করে তিনি *বেদান্তসূত্রের* সব কয়টি মন্ত্রের কদর্থ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে,

জীব ও পরমেশ্বর ভগবানের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে জনৈক রাজনীতিবিদের *ভগবদ্‌গীতার* মাধ্যমে অহিংস নীতি প্রমাণ করার প্রচেষ্টার মতো। শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের সংহারকারী, তাই শ্রীকৃষ্ণকে অহিংস বলে প্রমাণ করা শ্রীকৃষ্ণকে অস্বীকার করারই সামিল। *ভগবদ্‌গীতার* এই ধরনের বিশ্লেষণ যেমন অযৌক্তিক, তেমনই শঙ্করাচার্যের *বেদান্ত-সূত্রের* ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং কোন প্রকৃতিস্থ, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তা গ্রহণ করবে না। বর্তমানে কেবল তথাকথিত বৈদান্তিকেরাই *বেদান্তসূত্রের* কদর্থ করছে না, তা ছাড়া এক ধরনের অবিবেকী লোকেরাও যারা এত অধঃপতিত যে, তারা প্রচার করছে সন্ন্যাসীরাও মাছ, মাংস, ডিম আদি অখাদ্য ভক্ষণ করতে পারে, তারাও *বেদান্তসূত্রের* কদর্থ করছে। এভাবেই শঙ্করাচার্যের তথাকথিত অনুগামী মায়াবাদীরা গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই ধরনের অধঃপতিত মানুষেরা কিভাবে সমস্ত *বেদের* সারাতিসার *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যা করবে?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন, *মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।* *ভগবদ্‌গীতায়* (১৫/১৫) বর্ণনা করা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। কিন্তু মায়াবাদ দর্শন সকলকে কৃষ্ণ থেকে বিমুখ করেছে। তাই এই অধঃপতন থেকে সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের প্রবল প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রতিটি প্রকৃতিস্থ ও বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মায়াবাদ দর্শন বর্জন করে বৈষ্ণব আচার্যদের ভাষ্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। *বেদের* যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টায় *ভগবদ্‌গীতা যথাযথ* পাঠ করা উচিত।

শ্লোক ১২৯

সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রণব বা ওঁকার-এর দ্বারা সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে বেদের আংশিক অর্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তাৎপর্য

তত্ত্বমসি মানে হচ্ছে 'তুমিই সেই চিৎস্বরূপ'।

শ্লোক ১৩০

'প্রণব, মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন ।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রণব (ওঁকার) হচ্ছে বেদের মহাবাক্য (মহামন্ত্র)। সেই মহাবাক্যকে আচ্ছাদন করে

শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা কোন রকম যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই তত্ত্বমসিকে মহাবাক্যরূপে স্থাপন করে।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা *তত্ত্বমসি, সোঽহম্* আদি শ্রুতিমন্ত্রের উপর জোর দেয়, কিন্তু প্রকৃত মহামন্ত্র *প্রণব* (*ওঁকার*)-এর উল্লেখ করে না। তাই, যেহেতু তারা বৈদিক জ্ঞানের কদর্থ করে, সেহেতু তারা হচ্ছে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে বড় অপরাধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলেছেন, *মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী*—"মায়াবাদীরা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সব চাইতে বড় অপরাধী।" শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥

"যারা বিদ্বেষী, ক্রূর ও নরাধম, তাদের আমি এই সংসারে বারবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।" (ভঃ গীঃ ১৬/১৯) মায়াবাদীরা কৃষ্ণবিদ্বেষী, তাই মৃত্যুর পরে তারা অসুরযোনি লাভ করবে। *ভগবদ্‌গীতায়* (৯/৩৪) শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"তোমার মন দিয়ে সর্বক্ষণ আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর এবং আমার পূজা কর।" তখন একজন আসুরিক পণ্ডিত কৃষ্ণের এই উক্তি বিশ্লেষণ করে বলছে যে, কৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে না বা কৃষ্ণের শরণাগত হতে হবে না, সকলের মধ্যে যে অব্যক্ত বস্তু রয়েছে, তার কথা চিন্তা করতে হবে। এই পণ্ডিতটি এই জীবনে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং এই জীবনে যদি তার দুঃখকষ্টের মেয়াদ না শেষ হয়, তা হলে তাকে আবার পরবর্তী জীবনে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে, যাতে আমরা ভগবৎ-বিদ্বেষী না হয়ে পড়ি। তাই, পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে *বেদের* উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৩১

সর্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ও সূত্রে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন বেদ্য, কিন্তু শঙ্করাচার্যের অনুগামীরা বিকৃতভাবে বেদের অর্থ বিশ্লেষণ করে মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত করেছেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥

"*রামায়ণ, পুরাণ* ও *মহাভারত* আদি বৈদিক শাস্ত্রে আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সর্বত্রই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমাই কীর্তিত হয়েছে।"

শ্লোক ১৩২

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ হচ্ছে সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি, কিন্তু সেই শাস্ত্রের যদি মনগড়া অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে তার স্বতঃপ্রমাণতা নষ্ট হয়।

তাৎপর্য

আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য আমরা বৈদিক প্রমাণের উদ্ধৃতি দিই। কিন্তু সেই বেদের যদি মনগড়া অর্থ করা হয়, তা হলে বৈদিক শাস্ত্র ভ্রান্ত ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বলা যায়, বৈদিক উক্তির মনগড়া অর্থ করলে বৈদিক প্রমাণের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কেউ যখন বৈদিক শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেয়, তখন তা প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয়। সেই প্রামাণিকতা কিভাবে নিজের আয়ত্তাধীনে আনা যায়?

শ্লোক ১৩৩

এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া ।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই মায়াবাদীরা বৈদিক সূত্রের সহজ অর্থ বর্জন করে তাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কল্পনাপ্রসূত গৌণ অর্থ ব্যাখ্যা করেছে।"

তাৎপর্য

দুর্ভাগ্যবশত, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের দ্বারা প্রায় সমগ্র পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাই বৈদিক শাস্ত্রের সহজ, সরল ও স্বাভাবিক অর্থ প্রচার করার প্রবল প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই কারণেই আমরা *ভগবদ্‌গীতা যথাযথ* রচনা করে সেই কাজ শুরু করেছি এবং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ প্রচার করার পরিকল্পনা করেছি।

শ্লোক ১৩৪

এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এভাবেই শঙ্করাচার্যের বেদান্তসূত্রের ভাষ্যের ভুলগুলি দেখিয়ে দিলেন, তখন সমস্ত সন্ন্যাসীরা চমৎকৃত হলেন।

শ্লোক ১৩৫

সকল সন্ন্যাসী কহে,—'শুনহ শ্রীপাদ ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বললেন, "শ্রীপাদ! আপনি যে এভাবেই সমস্ত অর্থ খণ্ডন করলেন, তা বিবাদ নয়, কেন না আপনি সূত্রগুলির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১৩৬

আচার্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সভে জানি ।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমরা জানি যে, এই সমস্ত বাক্যবিন্যাস হচ্ছে শঙ্করাচার্যের কল্পিত অর্থ। কিন্তু যদিও তা আমাদের সন্তুষ্টি বিধান করে না, তবুও সম্প্রদায়ের অনুরোধে তা আমরা মানি।"

শ্লোক ১৩৭

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল ।'
মুখ্যার্থে লাগাল প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা তখন বললেন, "আপনি কিভাবে মুখ্য অর্থ অনুসারে এই সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, তা আমরা দেখতে চাই।" সেই কথা শুনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্তসূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩৮

বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্‌' ।
ষড়্‌বিধৈশ্বর্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর বস্তু যে ব্রহ্ম, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং পূর্ণজ্ঞানের আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, তিনভাবে পরম-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতস্থ পরমাত্মা এবং চরমে পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সর্বভূতে বিরাজমান

পরমাত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ। ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং তাঁর সেই ছয়টি ঐশ্বর্য হচ্ছে—বৈভব, বীর্য, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। যেহেতু তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তাই ভগবান হচ্ছেন পরম জ্ঞানের চরম তত্ত্ব।

শ্লোক ১৩৯

স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"তাঁর স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান মায়িক জগতের সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত চিৎ-ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাই, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বেদের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৪০

তাঁরে 'নির্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই পরমেশ্বরকে যখন নির্বিশেষ বলে বর্ণনা করা হয়, তখন তাঁর চিন্ময় শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে, সত্যের অর্ধাংশ যদি না স্বীকার করা হয়, তা হলে পূর্ণস্বরূপ জানা যায় না।

তাৎপর্য

উপনিষদে বলা হয়েছে—

> *ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।*
> *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥*

ঈশোপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও অন্যান্য *উপনিষদে* বর্ণিত এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তিনি অদ্বিতীয় তত্ত্ব, কেন না তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধীশ্বর। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে বৃহত্তম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন বৃহত্তম থেকেও বৃহত্তর, ঠিক যেমন সূর্যমণ্ডল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত সূর্যকিরণ থেকে মহত্তর। যদিও অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত সূর্যকিরণকে বিরাট বলে মনে হয়, কিন্তু সেই সূর্য কিরণ থেকেও বৃহত্তর হচ্ছে সূর্যমণ্ডল এবং সেই সূর্যমণ্ডল থেকেও মহত্তর হচ্ছেন সূর্যদেব। তেমনই, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে যদিও বিরাট বলে মনে হয়, কিন্তু তা বৃহত্তম নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের দেহ-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সর্বভূতস্থ পরমাত্মা থেকেও মহত্তর। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে যখনই ব্রহ্ম শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে যে, তা পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝাচ্ছে।

ভগবদ্গীতায় ভগবানকে পরমব্রহ্ম বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। মায়াবাদী এবং অল্পজ্ঞ মানুষেরা কখনও কখনও ব্রহ্মের অর্থ বুঝতে ভুল করে, কেন না জীবও হচ্ছে ব্রহ্ম। তাই শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে যখনই 'ব্রহ্ম' বা 'পরব্রহ্ম' শব্দ দুটির উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই বুঝতে হবে যে, তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে তাদের প্রকৃত অর্থ। যেহেতু সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ ভগবানকে আশ্রয় করে বিরাজ করে। তাই, যদিও প্রাথমিক উপলব্ধি হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, তবুও *ঈশোপনিষদের* বর্ণনা অনুসারে, সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে পরম পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হতে হবে এবং সেটিই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। *ভগবদ্গীতাতেও* (৭/১৯) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।* বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞানের মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে জানার প্রচেষ্টার পর কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন এবং তাঁর শরণাগত হন, তখন তাঁর জ্ঞান অর্জনের সমস্ত প্রচেষ্টা সার্থক হয়।

নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরম-তত্ত্বের আংশিক উপলব্ধিতে ভগবানের পূর্ণৈশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। এটি পরম-তত্ত্বের এক বিপজ্জনক উপলব্ধি। পরম-তত্ত্বের সমস্ত রূপ—যথা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতস্থ পরমাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবানকে স্বীকার না করা হলে, সেই জ্ঞান পূর্ণ হয় না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তাঁর *বেদার্থ-সংগ্রহে* বলেছেন, *জ্ঞানেন ধর্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতম্, ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি কথমিদং অবগম্যতে।* তিনি এভাবেই ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরম-তত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণ করতে হবে। কেবল পূর্ণ জ্ঞানময়রূপে পরম-তত্ত্বকে জানা যথেষ্ট নয়। বৈদিক শাস্ত্রে (*মুণ্ডক উপঃ* ১/১/৯) বলা হয়েছে *যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ*, অর্থাৎ পরমতত্ত্ব সব কিছুই পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু *বেদের* বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—তিনি কেবল সর্বজ্ঞই নন, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে ক্রিয়াও করেন। তেমনই, ব্রহ্মকে পূর্ণ চিন্ময়রূপে জানাও যথেষ্ট নয়। আমাদের এও জানতে হবে যে, কিভাবে তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে চিন্ময় ক্রিয়া করেন। মায়াবাদ দর্শনে পরমতত্ত্ব যে চিন্ময় কেবল তার বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু পূর্ণ চিন্ময়রূপে তিনি কিভাবে ক্রিয়া করেন, সেই সম্বন্ধে কোন বর্ণনা নেই। সেটিই হচ্ছে সেই দর্শনের ত্রুটি।

শ্লোক ১৪১

ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রবণ আদি নবধা ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে পাওয়া যায়। তাঁকে পাওয়ার সেটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মকে সমস্ত জ্ঞানের সমষ্টিরূপে জেনেই মায়াবাদীরা সন্তুষ্ট, কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অবগতই নন, কিভাবে তাঁকে পাওয়া যায়, সেই উপায়ও তাঁরা জানেন। শ্রবণ আদি সেই নবধা ভক্তির পন্থা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্ণনা করেছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

(ভাগবত ৭/৫/২৩)

নবধা ভক্তি হচ্ছে—কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা, কৃষ্ণকথা কীর্তন করা, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করা, শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করা, শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করা এবং সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। এই নবধা ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়, তার মধ্যে ভগবানের কথা শ্রবণ হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্রবণের পন্থার উপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত অনুকূলভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর এই পন্থা অনুসারে মানুষ যদি কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তা হলে নিশ্চিতভাবেই তাদের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। *শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/১০৭)। ভগবৎ-প্রেম সকলের মধ্যেই সুপ্তভাবে রয়েছে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ পায়, তা হলে অবশ্যই সেই প্রেম বিকশিত হবে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। আমরা কেবল মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করার সুযোগ দান করি, আর তাদের ভগবৎ-প্রসাদ সেবন করতে দিই এবং তার ফলে পৃথিবীর মানুষ এই পন্থায় সাড়া দিচ্ছে এবং শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তে পরিণত হচ্ছে। আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে শত শত কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি, যাতে মানুষ কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে পারে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করতে পারে। এই দুটি পন্থা যে কেউই গ্রহণ করতে পারে, এমন কি একটি শিশু পর্যন্ত। ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করে এবং কৃষ্ণপ্রসাদ সেবন করে, নিঃসন্দেহে ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারে।

শ্লোক ১৪২

সেই সর্ববেদের 'অভিধেয়' নাম ।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে এই বৈধীভক্তি সাধন করার ফলে, অবশ্যই সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের উদ্গম হয়। এই পন্থাকে বলা হয় অভিধেয়।

তাৎপর্য

শ্রবণ, কীর্তন আদির মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে, বদ্ধ জীবের কলুষিত হৃদয় নির্মল হয় এবং তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারেন। সেই নিত্য সম্পর্কের বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*—"প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস।" কেউ যখন এই সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনি সেই *সম্বন্ধ* স্থাপনে তৎপর হন। তাকে বলা হয় *অভিধেয়*। তার পরবর্তী স্তর হচ্ছে *প্রয়োজন-সিদ্ধি* বা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং সেই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তৎপর হন, তখন আপনা থেকেই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়। মায়াবাদীরা আত্মজ্ঞান লাভের এই প্রাথমিক স্তরটি পর্যন্ত লাভ করতে পারে না, কেন না ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তিনি হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, যিনি সমস্ত জীবের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু মায়াবাদ দর্শনে সেই জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তাই ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জ্ঞান পর্যন্ত মায়াবাদীদের নেই। তারা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে, সকলেই ভগবান অথবা সকলেই ভগবানের সমান। তাই, জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে যেহেতু তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, তা হলে পরমার্থের পথে তারা অগ্রসর হবে কিভাবে? যদিও তারা নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হওয়ার ফলে, মায়াবাদীরা অচিরেই অধঃপতিত হয়। তাকে বলা হয় *পতন্ত্যধঃ*—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(ভাগবত ১০/২/৩২)

এখানে বলা হয়েছে যে, যে-সমস্ত মানুষ নিজেদের মুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ না জানার ফলে ভক্তিপরায়ণ নয়, তারা নিঃসন্দেহে বিপথগামী। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক অবগত হয়ে অবশ্যই তাঁর সেবাপরায়ণ হতে হবে। তা হলেই কেবল জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব।

শ্লোক ১৪৩

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-পরায়ণ হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অনুরক্ত হন, তা হলে ধীরে ধীরে অন্য সব কিছুর প্রতি তাঁর আসক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতির এটি একটি লক্ষণ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৪২) বলা হয়েছে, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ*—"ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি অনুভব করেন, তখন তিনি অন্য সব কিছুর প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে বিরক্ত হন।" মায়াবাদীরা যদিও মুক্তির পথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন বলে মনে করা হয়, কিন্তু আমরা দেখি যে কিছুদিন পরে আবার তারা রাজনীতি বা জনসেবার কাজ করার জন্য নেমে আসে। বড় বড় সন্ন্যাসী যাদের মুক্ত বলে ধারণা করা হয়, এই জগৎকে মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করার পরেও, আবার তাদের জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য নেমে আসতে দেখা গেছে। কিন্তু ভক্ত যখন ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবায় লিপ্ত হন, তখন আর তাঁর এই ধরনের জনহিতকর কার্যের প্রতি আসক্তি থাকে না। কেবল ভগবানের সেবাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সারা জীবন কেবল ভগবানের সেবাই করে যান। এটিই হচ্ছে বৈষ্ণবের সঙ্গে মায়াবাদীর পার্থক্য। তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থা হচ্ছে বাস্তব-সম্মত, কিন্তু মায়াবাদীর পন্থা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা মাত্র।

শ্লোক ১৪৪

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন ।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবৎ-প্রেম এমনই এক অমূল্য সম্পদ যে, তাকে মানব-জীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ বলে বিবেচনা করা হয়। ভগবৎ-প্রেম বিকশিত করার ফলে মাধুর্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া যায় এবং এই জন্মেই সেই রস আস্বাদন করা যায়।

তাৎপর্য

মায়াবাদীরা মনে করে যে, জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে মুক্তি, যা হচ্ছে চতুর্বর্গের চতুর্থ স্তর। মানুষ সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধেই অবগত, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির স্তর মুক্তিরও ঊর্ধ্বে। পক্ষান্তরে বলা যায়, কেউ যখন যথাযথভাবে মুক্ত হন, তখনই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, *কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত*—"কোটি কোটি মুক্ত পুরুষদের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়াও দুষ্কর।"

সব চাইতে উচ্চস্তরের মায়াবাদী মুক্তির স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি এই মুক্তির স্তরেরও ঊর্ধ্বে। সেই সম্বন্ধে শ্রীল ব্যাসদেব (*শ্রীমদ্ভাগবতে* ১/১/২) বলেছেন—

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ।

"জড় বাসনাযুক্ত সব রকমের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে এই *ভাগবত পুরাণ* পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে, যা কেবল সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম সত্য হচ্ছে মায়া থেকে পৃথক পরম মঙ্গলময় বাস্তব বস্তু। সেই সত্যকে জানতে পারলে ত্রিতাপ-দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয়।" *বেদান্তসূত্রের* ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* তাঁদেরই জন্য যাঁরা *পরমো নির্মৎসরাণাম্*, অর্থাৎ যাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষা থেকে মুক্ত। মায়াবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তাই *বেদান্তসূত্র* তাদের জন্য নয়। তারা *বেদান্তসূত্রে* অনর্থক নাক গলাতে চায়, কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই। *বেদান্তসূত্রের* প্রণেতা তাঁর ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করেছেন যে, *বেদান্তসূত্র* কেবল তাঁদেরই জন্য, যাঁদের হৃদয় নির্মল হয়েছে (*পরমো নির্মৎসরাণাম্*)। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, তা হলে সে *বেদান্তসূত্র* বা *শ্রীমদ্ভাগবত* বুঝবে কি করে? মায়াবাদীদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও তথাকথিত দার্শনিক প্রতিবাদ করেছে, আমাদের যাঁর প্রতি শরণাগত হতে হবে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ নন'। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। যেহেতু সমস্ত মায়াবাদীরাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ,' তাই *বেদান্তসূত্রের* অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার কোন সম্ভাবনা তাদের নেই। এমন কি তারা যদি মুক্তও হয়, যা তারা মিথ্যা দাবি করে, তবুও এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে, কৃষ্ণপ্রেম মুক্তিরও অতীত।

শ্লোক ১৪৫

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মহত্তম থেকে মহত্তর যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি ভক্তির প্রভাবে তাঁর অতি নগণ্য ভক্তেরও অধীন হয়ে পড়েন। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব মাধুর্য, যার প্রভাবে অসীম যে পরমেশ্বর তিনি অতি নগণ্য জীবের অধীন হয়ে পড়েন। ভগবানের সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ের ফলে, ভক্ত কৃষ্ণের সেবা-সুখরস আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া ভক্তের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। *মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্* (*কৃষ্ণকর্ণামৃত* ১০৭)। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন যে, হৃদয়ে যখন ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়, তখন মুক্তি স্বয়ং তাঁর নগণ্য দাসীর মতো তাঁকে সেবা করার জন্য উন্মুখ হন। করজোড়ে ভক্তের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে মুক্তি তখন ভক্তের সব রকম সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন।

মায়াবাদীদের মুক্তি ভক্তের কাছে অত্যন্ত নগণ্য, কেন না ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান পর্যন্ত তাঁর বশীভূত হয়ে পড়েন। তার একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন এবং যখন তাঁকে উভয় পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে রথ নিয়ে যেতে বলেন (*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*), শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। এমনই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক। যদিও ভগবান মহত্তম থেকে মহত্তর, তবুও তিনি তাঁর ভক্তের শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে তাঁর সেবা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ১৪৬

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম ।
এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্যবসান ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য এবং জীবনের পরম প্রয়োজন (কৃষ্ণপ্রেম)—এই তিনটি বিষয় বেদান্তসূত্রের প্রতিটি সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কারণ, সমস্ত বেদান্ত-দর্শন এই তিনটি তত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) বলা হয়েছে—

পরাভবস্তাবদবোধজাতো
যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্ ॥

"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ ব্যর্থ হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।" এই জিজ্ঞাসা নিয়েই *বেদান্তসূত্রের* সূচনা—*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।* মানুষের জানবার চেষ্টা করা উচিত—সে কে, এই জগৎ কি, ভগবান কে এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি রকম। কুকুর ও বিড়ালেরা এই সমস্ত প্রশ্ন করতে পারে না। এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয় যথার্থ মানুষের হৃদয়ে। নিজের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ভগবান সম্বন্ধে এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে—এই চারটি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানকে বলা হয় *সম্বন্ধ-জ্ঞান।* পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে সেই সম্বন্ধ অনুসারে কার্য করা। তাকে বলা হয় *অভিধেয়। অভিধেয়* সম্পাদন করার ফলে যখন জীবের পরম উদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়, তখন তিনি *প্রয়োজন-সিদ্ধি* লাভ করেন। *ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রে* এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই, এই তত্ত্ব অনুসারে যে *বেদান্তসূত্র* হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে কেবল তার সময়ের অপচয় করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৮) সেই কথাই বলা হয়েছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

কেউ মস্ত বড় পণ্ডিত হতে পারেন এবং খুব ভালভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু না হন এবং তাঁর মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে উৎসুক না হন, তা হলে তিনি যা করেছেন তা সবই সময়ের অপচয় মাত্র। মায়াবাদীরা, যারা জড় জগতের সঙ্গে এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা অবগত নয়, তারা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে এবং তাদের দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার কোন মূল্য নেই।

শ্লোক ১৪৭

এইমত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া ।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সমস্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যখন সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শুনলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি যথার্থই বেদান্ত-দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা বৈষ্ণব আচার্যকৃত ভক্তিযোগের মাধ্যমে *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যা শুনে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সমস্ত সন্ন্যাসীরা বিনীতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ১৪৮

বেদময়-মূর্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হে প্রভু! তুমি বৈদিক জ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। পূর্বে তোমার নিন্দা করে আমরা যে অপরাধ করেছি, আমাদের সেই অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।"

তাৎপর্য

ভক্তি লাভের পন্থা সম্পূর্ণভাবে দৈন্য ও বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর *বেদান্তসূত্রের* ব্যাখ্যা শ্রবণ করে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত বিনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর বাধ্য হয়েছিলেন। *বেদান্তসূত্র* অধ্যয়ন না করে তিনি যে নৃত্য-কীর্তন করেছিলেন, সেই জন্য তাঁকে নিন্দা করার অপরাধের জন্য তাঁরা তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছি।

আমরা *বেদান্তসূত্রের* পণ্ডিত না হতে পারি এবং তার অর্থ না বুঝতে পারি, কিন্তু আমরা পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি এবং যেহেতু আমরা কঠোরভাবে ও বিনম্রভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাই বুঝতে হবে যে, আমরা *বেদান্তসূত্রের* মর্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছি।

শ্লোক ১৪৯

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার পর থেকেই মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে তাঁরাও নিরন্তর 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!' নাম গ্রহণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সহজিয়ারা কখনও কখনও মত পোষণ করে যে, প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান বৈষ্ণব ভক্ত, কিন্তু কাশীর মায়াবাদীদের নেতা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন ভিন্ন ব্যক্তি। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রবোধানন্দ সরস্বতী *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, সঙ্গীতমাধব, বৃন্দাবনশতক, নবদ্বীপশতক* আদি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর পরিচয় হয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর দুই ভ্রাতার নাম বেঙ্কট ভট্ট ও তিরুমলয় ভট্ট। এঁরা ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। গোপাল ভট্ট গোস্বামী ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করছিলেন ১৪৩৩ শকাব্দে চাতুর্মাস্যের সময় এবং তখন তাঁর সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সাক্ষাৎকার হয়। তা হলে তার দুই বছর পরে ১৪৩৫ শকাব্দে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরূপে সেই একই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় কি করে? এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী এক ব্যক্তি বলে যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের ধারণা, সেটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্লোক ১৫০

এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তাঁদের কৃষ্ণনাম দান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের পরম করুণাময় অবতার। তাঁকে শ্রীল রূপ গোস্বামী *মহাবদান্যাবতার* বা সব চাইতে উদার অবতার বলে সম্বোধন করেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী আরও বলেছেন, *করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ*—তাঁর অপার করুণা বিতরণ করার জন্য তিনি এই কলিযুগে অবতরণ করেছেন। এখানেই তা প্রমাণিত হল। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলে, মহাপ্রভু তাদের মুখ দর্শন করতে চাননি। কিন্তু এখানে তিনি তাদের সকলকে ক্ষমা করলেন *(তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ)*। প্রচারের এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। *আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যে, প্রচার করার সময় যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে, তারা সকলেই কৃষ্ণবিদ্বেষী অপরাধী। কিন্তু প্রচারকের কর্তব্য হচ্ছে, তাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সম্বন্ধে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রত্যয় উৎপাদন করিয়ে, তাদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করা। নানা রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হচ্ছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এমন কি আফ্রিকাতেও মানুষেরা এই নাম-সংকীর্তনের পন্থা অবলম্বন করছেন। ভগবৎ-বিদ্বেষীদেরও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সাফল্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং তা হলে আমাদের প্রচেষ্টায় আমরা যে সফল হব, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ১৫১

তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সভে, মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর সমস্ত সন্ন্যাসীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের মাঝখানে বসিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করেননি, এমন কি কথাও বলেননি। কিন্তু এখন তিনি তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে প্রসাদ সেবন করছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন, তখন তাঁরা পবিত্র হয়েছিলেন। তাই, তাঁদের সাথে একসঙ্গে বসে আহার করতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না, যদিও

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে, সেই আহার্য বস্তুগুলি ভগবানকে নিবেদন করা হয়নি। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন না, আর যদিও বা করেন, তবে তাঁরা শিবের পূজা করেন অথবা পঞ্চোপাসনা (বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ ও সূর্যের উপাসনা) করেন। এখানে আমরা কোন দেব-দেবীর অথবা বিষ্ণুর উল্লেখ পাই না, কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বসে আহার করেছিলেন, কেন না তাঁরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিলেন এবং তিনি তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫২

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর ।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মায়াবাদীদের সঙ্গে একত্রে আহার করে, গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর বাসায় ফিরে গেলেন। এভাবেই মহাপ্রভু তাঁর বিচিত্র লীলা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ১৫৩

চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, আর সনাতন ।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কিভাবে যুক্তির মাধ্যমে মায়াবাদীদের পরাস্ত করেছেন, সেই কথা শুনে চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র ও সনাতন গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সন্ন্যাসী যে কিভাবে প্রচার করবে, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে যান, তখন তিনি সেখানে একলাই গিয়েছিলেন, দলবল নিয়ে যাননি। কিন্তু সেখানে তিনি চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন এবং সনাতন গোস্বামীও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে এসেছিলেন। তাই, যদিও সেখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব ছিল না, কিন্তু প্রচারের ফলে এবং স্থানীয় মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের তর্কে পরাস্ত করার ফলে, তিনি সেই অঞ্চলে প্রভূত যশ অর্জন করেছিলেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৫৪

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী ।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই ঘটনার পর বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখতে এসেছিলেন এবং সমস্ত বারাণসী নগরী মহাপ্রভুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ১৫৫

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পুরীসহ সর্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারাণসী নগরীতে এলেন এবং সেই নগরীর সমস্ত লোক সেই জন্য নিজেদের মহাধন্য বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৬

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক আসতে লাগল। ফলে গৃহের দরজায় ভীষণ ভিড় হল এবং তারা গৃহে প্রবেশ করতে পারল না।

শ্লোক ১৫৭

প্রভু যবে যা'ন বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যান, তখন তাঁকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে সমবেত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরকে (শিবকে) দর্শন করতে যেতেন। বৈষ্ণবেরা সাধারণত দেবতাদের মন্দিরে যান না, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিতভাবে বারাণসীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যেতেন। সাধারণত মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও শৈব পার্ষদেরা বারাণসীতে থাকে, কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরূপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেন বিশ্বেশ্বর মন্দিরে গেলেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, বৈষ্ণবেরা দেবতাদের অশ্রদ্ধা করেন না। বৈষ্ণব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তবে তিনি কখনও দেব-দেবীদের পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বলে স্বীকার করেন না।

ব্রহ্ম-সংহিতায় শিব, ব্রহ্মা, সূর্য, গণেশ ও বিষ্ণুর প্রণাম-মন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীরা পঞ্চোপাসনায় এঁদের সকলের পূজা করেন। নির্বিশেষবাদীরা তাদের মন্দিরে বিষ্ণু, শিব, সূর্য, দুর্গা, গণেশ এবং কখনও কখনও ব্রহ্মারও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্তমান যুগে হিন্দুধর্মের নামে সেই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। বৈষ্ণবেরাও অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবীদের পূজা করতে পারেন, কিন্তু কেবল *ব্রহ্মসংহিতার* ভিত্তিতে, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেছেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, সূর্য ও গণেশের পূজার জন্য যে মন্ত্রসমূহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা এখানে আলোচনা করছি—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"স্বরূপশক্তি বা চিৎ-শক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনকারী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁর ইচ্ছা অনুসারে ক্রিয়া করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৪)

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"দুধ যেমন বিকার-বিশেষের যোগে দই হয়ে যায়, তবু কারণরূপ দুধ থেকে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেরূপ যিনি কার্যবশত শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৫)

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সূর্য যেমন সূর্যকান্ত আদি মণিসমূহে নিজ তেজ কিছু পরিমাণে প্রকট করেন, তেমনই বিভিন্ন অংশস্বরূপ ব্রহ্মা যাঁর থেকে শক্তি প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৯)

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করার উদ্দেশ্যে শক্তি লাভের জন্য যাঁর পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫০)

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রে আরূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫২)

সমস্ত দেব-দেবীরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসী; তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ নন। তাই কেউ যদি পূর্বোক্ত *পঞ্চোপাসনার* মন্দিরে যান, তা হলে নির্বিশেষবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেখানকার দেব-দেবীদের দর্শন করা উচিত নয়। তাঁরা সকলেই হচ্ছেন সবিশেষ দেব-দেবী, কিন্তু তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারে তাঁর সেবা করেন। যেমন, শঙ্করাচার্য হচ্ছেন শিবের অবতার, সেই কথা *পদ্ম পুরাণে* বর্ণিত হয়েছে। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে মায়াবাদ দর্শন প্রচার করেন। সেই বিষয়ে আমরা এই পরিচ্ছেদের ১১৪ শ্লোকে আলোচনা করেছি—*তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস ।* "বেদের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করেছেন বলে শঙ্করাচার্যের কোন দোষ হয়নি। ভগবানের নির্দেশেই তিনি তা করেছেন।" যদিও ব্রাহ্মণরূপে (শঙ্করাচার্যরূপে) শিব মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র প্রচার করেছেন, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, যেহেতু তিনি পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তা করেছিলেন, তাই তাঁর কোন দোষ নেই (*তাঁর দোষ নাহি*)।

সমস্ত দেব-দেবীদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি একটি পিপীলিকাকে পর্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে, তা হলে দেব-দেবীদের করবে না কেন? তবে একটি কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, দেব-দেবীরা পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বা ভগবান থেকে বড় নন। *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*— "একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, গণেশ ও দেবতারা তাঁর ভৃত্য।" সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করছেন, আর আমাদের মতো নগণ্য জীবদের কি কথা? আমরা অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস। মায়াবাদ দর্শন অনুসারে দেব-দেবী, জীব ও পরমেশ্বর ভগবান সবই সমপর্যায়ভুক্ত। তাই, এটি হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের সব চাইতে মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ১৫৮

স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে ।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন স্নান করার জন্য গঙ্গাতীরে যেতেন, তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হত।

শ্লোক ১৫৯

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি ।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্য ভরি' ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাহু তুলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বলতেন, "বল হরি! হরি!" তখন স্বর্গ-মর্ত্য ভরে মানুষ হরিধ্বনি দিতেন।

শ্লোক ১৬০

লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন ।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই অসংখ্য মানুষকে উদ্ধার করে মহাপ্রভুর বারাণসী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হল। তাই, সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করে, তিনি তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠালেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বারাণসীতে থাকবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁকে শিক্ষা দান করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মথুরা থেকে বারাণসীতে ফিরে যান, তখন সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়; সেখানে দুই মাস ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব-আচরণ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে, তিনি তাঁকে তাঁর আদেশ পালন করার জন্য বৃন্দাবনে পাঠান। সনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে যান, তখন সেখানে কোন মন্দির ছিল না। সেই নগরীটি তখন একটি ফাঁকা মাঠের মতো অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিল। সনাতন গোস্বামী যমুনার তীরে বাস করছিলেন এবং তার কিছুকাল পরে তিনি ধীরে ধীরে সেখানকার প্রথম মন্দির গড়ে তোলেন; তারপর অন্যান্য মন্দির গড়ে উঠতে থাকে এবং এখন সেই শহরটি প্রায় পাঁচ হাজার মন্দিরে পূর্ণ।

শ্লোক ১৬১

রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল ।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু বারাণসী নগরী সর্বদাই অত্যন্ত কোলাহল মুখর, তাই সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে তিনি জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসেন।

শ্লোক ১৬২

এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

আমি এখানে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করলাম, পরে আমি বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৬৩

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে কৃষ্ণনামরূপ প্রেম বিতরণ করে সমস্ত বিশ্বকে ধন্য করলেন।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে যে, সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বকে ধন্য করেছিলেন। পাঁচশো বছর আগে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করেছিলেন। কেউ যদি আচার্যের নির্দেশ পালন করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐকান্তিকভাবে তাঁর সেবা করার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করতে সফল হবেন। কিন্তু কিছু মূর্খ লোক বলে যে, ইউরোপীয়ান ও আমেরিকানরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত বিশ্ব জুড়ে এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিলেন। প্রচার করার জন্য সন্ন্যাসীদের নিতান্তই প্রয়োজন। যে সমস্ত সমালোচকেরা মনে করে যে, কেবল ভারতবাসীরাই অথবা হিন্দুরাই প্রচারের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে, প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। সন্ন্যাসী ছাড়া প্রচারকার্য ব্যাহত হবে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে এবং তাঁর পার্ষদদের আশীর্বাদে এই বিষয়ে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের প্রচার করার শিক্ষা দান করে সন্ন্যাস দিতে হবে, যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে পারে। আমরা মূর্খের সমালোচনায় কর্ণপাত করি না। আমরা কেবল পঞ্চতত্ত্ব সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদের উপর নির্ভর করে আমাদের কাজ চালিয়ে যাব।

শ্লোক ১৬৪

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দুই সেনাপতি শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য বৃন্দাবনে পাঠালেন।

তাৎপর্য

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন বৃন্দাবনে যান, তখন সেখানে কোন মন্দির ছিল না। কিন্তু তাঁদের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে তাঁরা বিভিন্ন মন্দির তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেমনই, তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধারমণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী শ্রীশ্রীগোকুলানন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বহু মন্দির গড়ে ওঠে। ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য মন্দির তৈরি করার প্রয়োজন। গোস্বামীরা কেবল গ্রন্থই রচনা করেননি, তাঁরা মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কেন না ভগবানের বাণী প্রচারের জন্য দুই-ই প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়। এখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, তাই এই সংস্থার সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কেবল ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠাই নয়, ভগবৎ-তত্ত্ব সমন্বিত যে সমস্ত গ্রন্থাবলী লেখা হয়েছে, সেগুলি বিতরণ করা। গ্রন্থ বিতরণ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা দুটিরই গুরুত্ব রয়েছে এবং এই দুটি যেন সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

শ্লোক ১৬৫

নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে ।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যেমন তিনি মথুরায় পাঠালেন, তেমনই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য তিনি গৌড়দেশে (বাংলায়) পাঠালেন।

তাৎপর্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম বঙ্গদেশে অতি প্রসিদ্ধ। অবশ্য, যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানে, সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও জানে। কিন্তু কিছু তত্ত্বজ্ঞানহীন ভক্ত রয়েছে, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বেশি গুরুত্ব দেন। এটি ঠিক নয়। তেমনই আবার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়াও উচিত নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৃহত্যাগ করেছিলেন, কেন না তাঁর ভাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে হেয় করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বড়, না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বড়, না শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু বড়, সেই বিচার না করে পঞ্চতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। সমানভাবে তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা করা উচিত—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সমস্ত ভক্তরাই পূজনীয়।

শ্লোক ১৬৬

আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন এবং প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কৃষ্ণনাম প্রচার করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৭

সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে সেতুবন্ধ পর্যন্ত সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছিলেন এবং এভাবেই তিনি সকলকে উদ্ধার করেছিলেন।

শ্লোক ১৬৮

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা করলাম, তা শ্রবণের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে হলে, পঞ্চতত্ত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজিয়ারা পঞ্চতত্ত্বের গুরুত্ব বুঝতে না পেরে, *ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে*

রাম অথবা *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ*—এই ধরনের মনগড়া ছড়া তৈরি করে। এগুলি ভাল কবিতা হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন করা যায় না। তাদের এই জপে অনেক তত্ত্বগত ভুলভ্রান্তি রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চতত্ত্বের নাম কীর্তন করার সময়, পূর্ণ প্রণতি নিবেদন করে অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে বলা উচিত—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ*। এই কীর্তনের ফলে নিরপরাধে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের যোগ্যতা লাভের আশীর্বাদ লাভ করা যায়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময়েও পূর্ণরূপে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।** মূর্খের মতো কোন কল্পনাপ্রসূত ছড়ার কীর্তন করা উচিত নয়। কেউ যদি কীর্তন করার প্রকৃত ফল লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে নিষ্ঠাভরে মহান আচার্যদের অনুসরণ করতে হবে। সেই সম্বন্ধে *মহাভারতে* বলা হয়েছে, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—"মহাজনেরা ও আচার্যরা যে পথে গমন করেছেন, পরমার্থ সাধনে সেই পথই অবলম্বন করা উচিত।"

শ্লোক ১৬৯

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন ।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের নাম উচ্চারণ করা অবশ্য কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৭০

সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই বারবার পঞ্চতত্ত্বের শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি দণ্ডবৎপ্রণাম নিবেদন করে, আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস কিছুটা বর্ণনা করছি।

শ্লোক ১৭১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রেম বিতরণ করে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তাঁর প্রকটকালে তিনি সংকীর্তন আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই জন্যই তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামীকে ও সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তিনি দক্ষিণ ভারতে গমন করেছিলেন। এভাবেই তিনি কৃপাপূর্বক পৃথিবীর বাকি অংশ জুড়ে সেই প্রচারকার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের উপর অর্পণ করলেন। এই সংস্থার সদস্যদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা যদি চারটি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করে আচার্যের নির্দেশ অনুসারে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, তা হলে অবশ্যই তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করবেন এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁদের প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হবে।

ইতি—'পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থকারের কৃষ্ণ, গুরু ও বৈষ্ণবের আজ্ঞা গ্রহণ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* অষ্টম পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেছেন। এই অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করলেও নামাপরাধ থাকলে প্রেমধন লাভ হয় না। এতে বুঝতে হবে যে, নামাপরাধীর সাত্ত্বিক বিকারাদি কেবল ছল মাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁর হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করেন। তখন তাঁর কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্‌গম হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকৃত *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হতে বাকি ছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায় এবং শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হয়ে কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

শ্লোক ১

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া ।
প্রসভং নর্ত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **চৈতন্য-দেবম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **তম্**—তাঁকে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যদিচ্ছয়া**—যাঁর ইচ্ছার প্রভাবে; **প্রসভম্**—হঠাৎ; **নর্ত্যতে**—নৃত্য করে; **চিত্রম্**—আশ্চর্যজনকভাবে; **লেখরঙ্গে**—গ্রন্থ রচনা কার্যে; **জড়ঃ**—জড়সদৃশ; **অপি**—হয়েও; **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

যে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ এবং জড়বৎ হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ এই গ্রন্থ রচনারূপ নৃত্যকার্য আরম্ভ করেছি, তাঁকে আমি বন্দনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি গৌরচন্দ্র নামেও পরিচিত তাঁর জয় হোক! পরম আনন্দময় নিত্যানন্দ প্রভুরও জয় হোক!

শ্লোক ৩

জয় জয়াদ্বৈত আচার্য কৃপাময় ।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

কৃপাময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় হোক! এবং গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের জয় হোক!

শ্লোক ৪

জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্য সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক! প্রণত হয়ে আমি তাঁদের সবার চরণে বন্দনা করি।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর প্রভু ও শ্রীবাস ঠাকুর—এই পঞ্চতত্ত্বকে এবং অন্যান্য সমস্ত ভক্তদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়। পঞ্চতত্ত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার এই পন্থা নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করতে হবে। পঞ্চতত্ত্বকে বন্দনা করার মন্ত্র হচ্ছে—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥* প্রতিটি প্রচার অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং বিশেষ করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করার আগে, এই পঞ্চতত্ত্বের নাম উচ্চারণ করে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ৫

মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে ।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চতত্ত্বের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে মূক কবিতে পরিণত হয়, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে এবং অন্ধ আকাশে তারকারাজি দর্শন করতে পারে।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে সিদ্ধ জীব তিন রকম, যথা—সাধনসিদ্ধ, অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেছেন, নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ কখনই শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত না হওয়ার মাধ্যমে যে সিদ্ধ অবস্থা এবং কৃপাসিদ্ধ, অর্থাৎ বৈষ্ণব অথবা গুরুদেবের কৃপার প্রভাবে যিনি সিদ্ধ হয়েছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এখানে

কৃপাসিদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। গুরুদেব ও কৃষ্ণের কৃপা ভক্তের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। এই কৃপার প্রভাবে, ভক্ত মূক হলেও চমৎকারভাবে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করতে পারেন, পঙ্গু হলেও গিরি লঙ্ঘন করতে পারেন এবং অন্ধ হলেও আকাশের তারা দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ৬

এ-সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল ।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই সমস্ত উক্তি তথাকথিত যে সমস্ত পণ্ডিতেরা মানে না, তাদের বিদ্যাপাঠ ভেকের কোলাহলের মতো।

তাৎপর্য

বর্ষাকালে মাঠেঘাটে, বনেবাদাড়ে প্রবলভাবে ব্যাঙের ডাক শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই ডাক সাপকে ডেকে আনে। অন্ধকারে এই ব্যাঙের ডাক শুনে সাপ এসে ব্যাঙগুলিকে খেয়ে ফেলে। তেমনই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমার্থিক জ্ঞানবিহীন অধ্যাপকগণের বিদ্যাপাঠ ব্যাঙের কোলাহলের মতো।

শ্লোক ৭

এই সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি ।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

যে পঞ্চতত্ত্বের মহিমা স্বীকার করে না অথচ ভক্তির ভান করে, সে কখনই কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারে না এবং তার অন্য কোন গতিও নেই।

তাৎপর্য

কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হন, তা হলে তিনি অবশ্যই আচার্য প্রবর্তিত বিধি-নিষেধগুলি অনুশীলন করতে প্রস্তুত থাকবেন এবং তিনি অবশ্যই তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবগত থাকবেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ* (*মহাভারত, বনপর্ব* ৩১৩/১১৭)। কৃষ্ণভাবনামৃতের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কেউ যদি পূর্বতন আচার্যদের নির্দেশ পালন করেন এবং পরম্পরার ধারায় গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন। এছাড়া এই পথে অন্য কোনভাবে সাফল্য লাভ হতে পারে না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই সম্বন্ধে বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পাএাছে কেবা*—"গুরুদেব ও আচার্যদের সেবা না করে কখনও মুক্তি লাভ করা যায় না।" তিনি আরও বলেছেন—

এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস ।
তাঁ' সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥

"যিনি এই ছয় গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, আমি তাঁর দাসত্ব বরণ করি এবং তাঁদের চরণধূলি হচ্ছে আমার পঞ্চগ্রাস।"

শ্লোক ৮

পূর্বে যৈছে জরাসন্ধ-আদি রাজগণ ।
বেদ-ধর্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

পুরাকালে জরাসন্ধের (কংসের শ্বশুর) মতো রাজারাও নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক ধর্ম পালন করে বিষ্ণুর পূজা করত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কেউ যদি শ্রীগৌরসুন্দর অথবা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হন, কিন্তু পঞ্চতত্ত্বের (*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।*) গুরুত্ব না দেন, তা হলে তার ফলে অপরাধ হয়, অথবা শ্রীল রূপ গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে তা হচ্ছে উৎপাত। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর অথবা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার পূর্বে পঞ্চতত্ত্বকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে প্রস্তুত হতে হবে।

শ্লোক ৯

কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি ।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে না মানে, তবে সে একটি দৈত্য। তেমনই, যে শ্রীচৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে মানতে না চায়, তাকেও একটি দৈত্য বলেই জানতে হবে।

তাৎপর্য

পুরাকালে জরাসন্ধ প্রমুখ রাজারা যদিও বৈদিক ধর্ম নিষ্ঠাভরে অনুষ্ঠান করত, দান-ধ্যান-যজ্ঞ-তপস্যা করত এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় গুণাবলীতে বিভূষিত ছিল ও ব্রহ্মণ্য ধর্মে অনুগত ছিল, কিন্তু তারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেনি। জরাসন্ধ বহুবার কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল এবং প্রতিবারই অবশ্য সে পরাজিত হয়েছিল। যে মানুষ জরাসন্ধের মতো বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে না, তা হলে তাকে একটি অসুর বলে বিবেচনা করতে হবে। তেমনই, যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে স্বীকার করে না, সেও একটি অসুর। সেটিই হচ্ছে প্রামাণিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই কৃষ্ণভক্তি বিনা গৌরসুন্দরের প্রতি তথাকথিত ভক্তি এবং গৌরসুন্দরের প্রতি ভক্তি বিনা তথাকথিত কৃষ্ণভক্তি ভক্তি নয়। কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির মার্গে সাফল্য অর্জন করতে চান, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে অবগত হতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হতে হবে। শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধে অবগত হওয়া মানে, *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ*— এই সম্বন্ধেও অবগত হওয়া। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, কৃষ্ণভাবনায় সিদ্ধি লাভের এই তত্ত্বের গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন।

শ্লোক ১০

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ ।
ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিবেচনা করেছিলেন, "আমাকে যদি লোকে না মানে, তা হলে তাদের সর্বনাশ হবে।" তাই করুণাময় ভগবান সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫১) বলা হয়েছে, *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*— "কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে বা শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে, জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।" এই কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে হয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মাধ্যমে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদদের করুণা সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায় বলে স্বীকার না করলে, কৃষ্ণভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না। তা বিচার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, কেন না তা হলে মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করবে এবং অচিরেই কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় স্তরে উন্নীত হতে পারবে। যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন, তাই তাঁর কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না।

শ্লোক ১১

সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার ।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি আমাকে একজন সন্ন্যাসী মনে করেও প্রণাম করে, তা হলে তার জড়-জাগতিক দুঃখ দূর হবে এবং সে মুক্তি লাভ করতে পারবে।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি সব সময়ই চিন্তা করছেন, কিভাবে বদ্ধ জীবদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (৪/৭) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত (অর্জুন)! যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।" কৃষ্ণ সর্বদাই জীবগণকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করেন। সেই জন্য তিনি নিজে আসেন, তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের পাঠান এবং তিনি *ভগবদ্‌গীতা* আদি শাস্ত্র রেখে যান। কেন? যাতে মানুষ তাঁর সেই কৃপার সুযোগ নিয়ে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন যাতে মূর্খ মানুষেরাও তাঁকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী বলে মনে করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে পারে, তা হলে তার জড়-জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি হবে এবং চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মিলিত তনু (*মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ—নহে অন্য*)। তাই মূর্খ লোকেরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে একজন সামান্য মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অশ্রদ্ধা করতে লাগল, তখন করুণাময় ভগবান সেই সমস্ত অপরাধীদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, যাতে তারা তাঁকে অন্তত একজন সন্ন্যাসী বলে মনে করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়। সাধারণ মানুষেরা, যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ বলে বুঝতে পারে না, তাঁদের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষণ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১২

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

এই রকম কৃপাময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যে ভজনা করে না, সে যদি মানব-সমাজে অতি সম্মানিত ব্যক্তিও হয়, তাকে অসুর বলেই গণনা করতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই সম্পর্কে বলেছেন—"ওহে জীবগণ! কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* এই কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শনের শিক্ষা দান করে এই বাণী প্রচার করেছেন এবং তিনি বলেছেন, *ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।* তাই যারা তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না অথবা তাঁর করুণা দর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে পারে না, সে একটি

অসুর, অথবা মানব-সমাজে সে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হলেও বিষ্ণুভক্তির বিরোধী হওয়ার ফলে, সে একটি অসুর। যারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিরোধী, তারাই অসুর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভজনা না করলে কৃষ্ণভক্তি ব্যর্থ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের ভজনা না করলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি ভক্তি ব্যর্থ হয়। সেই ধরনের ভক্তি হচ্ছে কলির কারসাজি। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, নাস্তিক স্মার্ত বা পঞ্চোপাসকেরা কোন বিষয়ভোগে স্বল্প সাফল্য লাভের জন্য বিষ্ণুর উপাসনা করে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা তাদের নেই। তারা তাঁকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণে ভেদ দর্শন করে। এই প্রকার ধারণাও আসুরিক এবং আচার্যদের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। এই প্রকার সিদ্ধান্ত হচ্ছে কলিজাত কল্পনা মাত্র।

শ্লোক ১৩

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্ধ্ববাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আবার বলছি—হে মানবসকল! কুতর্ক ছেড়ে দিয়ে দয়া করে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ভজনা কর।

তাৎপর্য

যে মানুষ কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ অথচ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানে না, সে কেবল তার সময়ের অপচয় করছে। তাই, গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করতে অনুরোধ করেছেন। তিনি সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, যিনি এরূপ করবেন, তাঁর কৃষ্ণভক্তি সফল হবে।

শ্লোক ১৪

যদি বা তার্কিক কহে,—তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার্কিকেরা বলে, "যতক্ষণ পর্যন্ত না যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে লাভ হচ্ছে, ততক্ষণ কিভাবে বোঝা যাবে যে, আরাধ্য বস্তুটি কি?"

শ্লোক ১৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তুমি যদি সত্যি সত্যি যুক্তি-তর্কের প্রতি আসক্ত হও, তা হলে দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা বিচার কর। তা বিচার করলে দেখবে যে, তা কি অপূর্ব দয়া এবং তার ফলে তোমার চিত্ত চমৎকৃত হবে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, সংকীর্ণচেতা মানুষেরা বিভিন্ন রকমের দয়ার আদর্শ সৃষ্টি করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে দয়া তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে সমস্ত নৈয়ায়িক কেবল যুক্তি ও তর্কের প্রমাণকেই প্রমাণ বলে মনে করে, তারা যুক্তি-তর্ক ছাড়া পরমতত্ত্বকে স্বীকার করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, এই সমস্ত তার্কিকেরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা গ্রহণ না করে এই পথ অবলম্বন করে, তখন তারা যুক্তি-তর্কের স্তরেই থেকে যায় এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে না। কিন্তু কোন যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ যদি তার যুক্তি-তর্কের মূল বৃত্তিকে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা চিন্ময় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে ব্যবহার করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারবেন যে, জাগতিক যুক্তির সীমিত জ্ঞানের দ্বারা পরতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, যা হচ্ছে সমস্ত জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত অধোক্ষজ বস্তু। তাই *মহাভারতে* বলা হয়েছে—*অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।* (*মহাভারত, ভীষ্মপর্ব* ৫/২২) যা কল্পনা অথবা জড় ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির অতীত, তর্কের দ্বারা তাকে কিভাবে জানা যাবে? চিন্ময় স্তরে যুক্তি-তর্কের পরিধি অত্যন্ত সীমিত এবং চিন্ময় তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়ে যদি তার প্রয়োগ করা হয়, তা হলে তা সর্বদাই ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। জড় যুক্তির প্রয়োগের পরতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সর্বদাই ভ্রান্ত হয়। সেভাবেই পরতত্ত্বের সিদ্ধান্তের ফলে অধঃপতিত হয়ে পরজন্মে শৃগাল-শরীর প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু তা হলেও কেউ যদি যথার্থই যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন বিচার করতে উৎসুক হন, তিনি তা করতে পারেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাদের সম্বোধন করে বলেছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা আপনারা বিচার করে দেখুন এবং আপনি যদি যথার্থই বিচার করেন, তা হলে দেখবেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো দয়া কেউ কখনও করেননি।" তার্কিক নৈয়ায়িকেরা জগতের সমস্ত দয়ার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার তুলনা করে দেখুন। তাঁদের বিচার যদি নিরপেক্ষ হয়, তা হলে তারা বুঝতে পারবেন যে, কোন দয়ার সঙ্গে মহাপ্রভুর দয়ার তুলনা হতে পারে না।

সকলেই দেহের ভিত্তিতে জনহিতকর কার্য করছে। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* (২/১৮) থেকে আমরা জানতে পারি, *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*—"এই জড় দেহের চরম পরিণতি হচ্ছে বিনাশ, কিন্তু চিন্ময় আত্মা নিত্য।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়া সম্পাদিত হয় নিত্য আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে। দেহের মঙ্গলের জন্য যত চেষ্টাই করা হোক না কেন, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং কর্ম অনুসারে তাকে আবার আর একটি শরীর ধারণ করতেই

হবে। তাই কেউ যদি দেহান্তরের বিজ্ঞান উপলব্ধি না করে এবং নিজেকে দেহসর্বস্ব বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার বুদ্ধিমত্তা খুব একটা উন্নত নয়। দেহের প্রয়োজনগুলি বর্জন না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অস্তিত্ববাদী ও বস্তুবাদী মানব-সমাজকে পবিত্র করার জন্য চিন্ময় জ্ঞান দান করেছিলেন। তাই কোন যুক্তিবাদী যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মহাবদান্য অবতার। তিনি সব চাইতে মহানুভব এবং শ্রীকৃষ্ণের থেকেও উদার। শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছিলেন তাঁর শরণাগত হওয়ার জন্য, কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো উদারভাবে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেননি। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করে প্রার্থনা করেছেন, *নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে / কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।* শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র *ভগবদ্গীতা* প্রদান করেছেন, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে যথাযথভাবে জানা যায়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছেন।

শ্লোক ১৬

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

দশবিধ নাম-অপরাধযুক্ত ব্যক্তি যদি বহুজন্ম শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তবুও কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, চৈতন্য-চরণ আশ্রয় না করে যদি কেউ শ্রবণ, কীর্তন এবং ভক্তির আশ্রয় করেন, তা হলে বহু জন্মেও তার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। *শিক্ষাষ্টকে* (৩) প্রদত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ কঠোরভাবে পালন করা অবশ্যই কর্তব্য—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"যারা তৃণ থেকেও সুনীচ তরুর থেকেও সহাগুণ-বিশিষ্ট, স্বয়ং অমানী হয়ে অপরকে মান দান করে প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না, তারা দশ অপরাধের হস্ত থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করতে সক্ষম হন ও প্রেম লাভ করেন।"

ভগবানের নাম ও ভগবান স্বয়ং যে অভিন্ন, তা বুঝতে হবে। নিরপরাধে নাম গ্রহণ না করলে এই উপলব্ধি হয় না। জড় বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, নাম ও নামী ভিন্ন, কিন্তু চিৎ-জগতে পরমতত্ত্ব সর্বদাই পূর্ণতত্ত্ব। তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সব তাঁরই মতো পূর্ণতত্ত্ব। কেউ যদি নিজেকে ভগবানের নামের দাস বলে মনে করে সারা

পৃথিবী জুড়ে নাম বিতরণ করেন, তবেই তিনি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের নিত্যদাস। অপরাধ মুক্ত হয়ে, এই মনোভাব সহকারে ভগবানের নাম গ্রহণ করা হলে, নাম যে স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন, সেই উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। নাম কীর্তনের মাধ্যমে নামের সঙ্গ করা হচ্ছে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করা। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ*—"কেউ যখন নামপ্রভুর সেবায় যুক্ত হন, তখন নামপ্রভু আপনা থেকেই তার কাছে প্রকাশিত হন।" বিনম্রভাবে এই সেবা শুরু হয় জিহ্বার মাধ্যমে। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ*—জিহ্বাকে নামপ্রভুর সেবায় যুক্ত করতে হবে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি ভক্তকে নামপ্রভুর সেবায় যুক্ত করতে চেষ্টা করি। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নাম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কৃষ্ণভক্তেরা কেবল নিরপরাধে ভগবানের নামই করেন না, যে আহার্য বস্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়নি, সেই আহার্য বস্তু তাঁরা তাঁদের জিহ্বার দ্বারা আস্বাদনও করেন না। ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি আমাকে ভক্তি সহকারে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল অথবা একটু জলও নিবেদন করে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করি।" (*ভঃ গীঃ* ৯/২৬) তাই সারা পৃথিবী জুড়ে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বহু মন্দির রয়েছে এবং প্রতিটি মন্দিরে গভীর অনুরাগ সহকারে ভগবানকে এই সমস্ত ভোগ নিবেদন করা হয়। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভক্তরা নিরপরাধে ভগবানের নাম গ্রহণ করেন এবং ভগবানকে নিবেদন না করে তারা কোন কিছুই আহার করেন না। ভক্তিযোগে জিহ্বার কাজ হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা করা।

শ্লোক ১৭

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানতঃ—জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা; **সুলভা**—সহজ লভ্য; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **ভুক্তিঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **যজ্ঞ-আদি**—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান; **পুণ্যতঃ**—পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা; **সা**—সেই; **ইয়ম্**—এই; **সাধন-সাহস্রৈঃ**—শত সহস্র সাধনার দ্বারা; **হরিভক্তিঃ**—হরিভক্তি; **সুদুর্লভা**—অত্যন্ত দুর্লভ।

অনুবাদ

"জ্ঞানের দ্বারা আত্মতত্ত্ব লাভ করে মুক্ত হওয়া যায় এবং যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের দ্বারা স্বর্গলোকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি এতই দুর্লভ যে, শত সহস্র

বৎসর ধরে এই ধরনের যাগযজ্ঞ, তপস্যা আদি অনুষ্ঠান করেও তা লাভ করা যায় না।"

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।

(ভাগবত ৭/৫/৩০)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(ভাগবত ৭/৫/৩২)

এই শ্লোকগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। তাদের তাৎপর্য হচ্ছে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না। শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হতে হয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গান করেছেন, ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পাএগছে কেবা। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত না হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করার কোন সম্ভাবনা নেই। এটিই হচ্ছে গূঢ় রহস্য। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (*পূর্ব* ১/৩৬) থেকে উদ্ধৃত এই তত্ত্ববচনটি এই বিষয়ে একটি আদর্শ পথনির্দেশক।

শ্লোক ১৮

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

কোন ভক্ত যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা মুক্তি চান, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তা দান করেন। কিন্তু প্রেমভক্তি তিনি লুকিয়ে রাখেন, সহজে দান করেন না।

শ্লোক ১৯

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৯ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **পতিঃ**—অধীশ্বর; **গুরুঃ**—উপদেষ্টা; **অলম্**—নিশ্চয়ই; **ভবতাম্**—

তোমাদের; **যদূনাম্**—যদুগণের; **দৈবম্**—ইষ্টদেব; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **কুলপতিঃ**—কুলপতি; **ক্ব**—কখনও কখনও; **চ**—ও; **কিঙ্করঃ**—আজ্ঞাবহ; **বঃ**—তোমাদের; **অস্তু**—আছে; **এবম্**—এভাবেই; **অঙ্গ**—যাই হোক; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভজতাম্**—যাঁরা ভক্তিযোগে তাঁর ভজনা করেন; **মুকুন্দঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **মুক্তিম্**—মুক্তি; **দদাতি**—দান করেন; **কর্হিচিৎ**—কখনও কখনও; **স্ম**—অবশ্যই; **ন**—না; **ভক্তিযোগম্**—ভগবদ্ভক্তি।

অনুবাদ

[দেবর্ষি নারদ বললেন—] "হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তোমাদের সহায়। তিনি কখনও তোমাদের পতি, কখনও গুরু, কখনও ইষ্টদেব, কখনও প্রিয় বন্ধু, কখনও কুলপতি, আবার কখনও কিঙ্কর হন। তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, কেন না এই সম্পর্ক কেবল ভক্তিযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। ভগবান অনায়াসে মুক্তি দান করতে পারেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ সহজে দান করেন না। কারণ, তার ফলে তিনি ভক্তের কাছে বাঁধা পড়ে যান।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/৬/১৮) থেকে উদ্ধৃত। শুকদেব গোস্বামী যখন ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণনা করছিলেন, তখন ভক্তিযোগের সঙ্গে মুক্তির পার্থক্য নিরূপণ করে তিনি এই শ্লোকটি উল্লেখ করেছিলেন। যদু এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাঁদের পতিরূপে, কখনও তাঁদের উপদেষ্টারূপে, কখনও তাঁদের বন্ধুরূপে, কখনও তাঁদের কুলপতিরূপে, আবার কখনও তাঁদের কিঙ্কররূপে আচরণ করতেন। এক সময় শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের পত্রবাহক হয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় দুর্যোধনের কাছে যেতে হয়েছিল। তেমনই, তিনি অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন। এভাবেই দেখা যায় যে, ভক্তিযোগে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ভক্তের একটি সুসম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মাধ্যমে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্ত যদি কেবল মুক্তি চান, তা হলে ভগবানের কাছ থেকে অনায়াসে তিনি তা লাভ করেন। সেই সম্বন্ধে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন, *মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্*—"ভক্তের কাছে মুক্তি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেন না মুক্তি সর্বদাই মুকুলিতাঞ্জলি হয়ে কোন না কোনভাবে ভক্তের সেবা করার জন্য তাঁর দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করেন।" ভক্তদের তাই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদদের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে, যারা কোন না কোন সম্পর্কের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত। সেখানকার ভূমি, জল, গাভী, বৃক্ষ ও ফুল শান্তরসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন, শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্যেরা দাস্যরসে তাঁর সেবা করছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গোপসখারা সখ্যরসে তাঁর সেবা করছেন। তেমনই বয়স্ক গোপ ও গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা ও গুরুস্থানীয় আত্মীয়-আত্মীয়ারূপে তাঁর সেবা করছেন এবং যুবতী গোপিকারা মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করছেন।

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময়, এই অপ্রাকৃত রসের কোন একটির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের

সেবার প্রতি অবশ্যই আসক্ত হতে হবে। সেটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত সাফল্য। মুক্তি লাভ করা ভক্তদের পক্ষে কঠিন নয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম মানুষেরাও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারেন। তাকে বলা হয় সাযুজ্য মুক্তি। বৈষ্ণবেরা কখনও এই সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না, তবে স্বারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চার রকমের কোন একটি গ্রহণ করলেও করতে পারেন। শুদ্ধ ভক্ত অবশ্য কখনও কোন প্রকার মুক্তি গ্রহণ করেন না। তিনি কেবল চিন্ময় সম্পর্কে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান। এটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের পরম পূর্ণতা। মায়াবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়, যদিও এই প্রকার মুক্তি ভক্তরা সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর *কৈবল্য* নামক এই প্রকার মুক্তির কথা বর্ণনা করে বলেছেন, *কৈবল্যং নরকায়তে*—"ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া বা কৈবল্য দশা প্রাপ্ত হওয়া নরকে যাওয়ারই মতো।" তাই সাযুজ্য মুক্তিরূপ মায়াবাদ আদর্শ ভক্তের কাছে নারকীয় ব্যাপার; তিনি কখনও তা গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীরা জানেন না যে, ভগবানের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায় লীন হয়ে গেলেও, তা তাদের পরম আশ্রয় দান করতে পারবে না। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ব্রহ্মজ্যোতিতে একটি স্বতন্ত্র আত্মা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তাই, কিছুকাল পরে সে আবার সক্রিয় হতে বাসনা করে। কিন্তু যেহেতু সে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবগত নয় এবং যেহেতু সে চিন্ময় স্তরে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারে না, তাই তাকে আবার সক্রিয় হওয়ার জন্য এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) বলা হয়েছে—

> *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ*
> *পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ।*

যেহেতু ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা সম্বন্ধে মায়াবাদীদের কোন জ্ঞানই নেই, তাই জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের পরে ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের আবার স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল আদি খোলার জন্য বা এই ধরনের জনহিতকর কার্য করার জন্য এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয়।

শ্লোক ২০

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা ।
জগাই মাধাই পর্যন্ত—অন্যের কা কথা ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই কৃষ্ণপ্রেম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে সেখানে দান করেছেন। এমন কি জগাই-মাধাইয়ের মতো সব চাইতে অধঃপতিত মানুষদেরও তিনি তা দান করেছেন। সুতরাং যারা পুণ্যবান এবং পারমার্থিক মার্গে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাদের কথা আর কি বলব?

তাৎপর্য

মানব-সমাজে অন্যান্যদের দানের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দানের পার্থক্য হচ্ছে যে, তথাকথিত জনহিতকর সমাজসেবীরা মানুষের দৈহিক দুঃখকষ্টের কিছুটা উপশম করেছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেম দান করার মাধ্যমে মানুষকে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করেছেন। কোন সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষ যদি সর্বতোভাবে এই দুটি দানের তুলনামূলক বিচার করেন, তা হলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। সেই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

"তুমি যদি সত্যি সত্যি যুক্তি-তর্কের প্রতি আসক্ত হও, তা হলে দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা বিচার কর। তা বিচার করলে দেখবে, তা কি অপূর্ব দয়া এবং তার ফলে তোমার চিত্ত চমৎকৃত হবে।" (*চৈঃ চঃ আদি ৮/১৫*)

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই ।

কলিযুগের মহাপাপীদের চরম দৃষ্টান্ত হচ্ছে জগাই ও মাধাই। এই দুই ভাই ছিল সমাজে সব চাইতে বড় উৎপাত, কেন না তারা ছিল মাংসাহারী, মদ্যপ, নারীধর্ষক, পাষণ্ড ও চোর। তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং যাঁরা সংযমী, পুণ্যবান, ভক্তিপরায়ণ ও বিবেকবান তাঁদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে। *ভগবদ্গীতাতেও* বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন ভক্ত ও রাজর্ষিরা (*কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা*) যখন শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে আসার ফলে কৃষ্ণভাবনামৃত অবলম্বন করেন, তখন তাঁরা ভগবৎ-ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) ভগবান ঘোষণা করেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ! পাপের ফলে নীচকুলোদ্ভূত স্ত্রী, বৈশ্য, এমন কি শূদ্রও যদি আমার শরণাগত হয়, তা হলে তারাও পরাগতি প্রাপ্ত হবে।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত অধঃপতিত দুটি ভ্রাতা জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু আজকের পৃথিবী অসংখ্য জগাই ও মাধাই-এ পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে বলা যায়, নারীধর্ষক, মাংসাহারী, জুয়াড়ী, মদ্যপ, তস্কর আদি দুরাত্মায় পরিপূর্ণ, যারা সমাজে নানা রকম উৎপাতের সৃষ্টি করে। এই ধরনের মানুষদের কার্যকলাপ আজকাল সর্বদাই দেখা যায়। আজকাল আর সমাজে মদ্যপ, নারীধর্ষক, মাংসাহারী অথবা দুরাত্মাদের ঘৃণ্য বলে

মনে করা হয় না, কেন না তাদের এই সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপ সকলের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই সমস্ত মানুষদের অসৎ গুণগুলি সমাজকে মায়ার কবল থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে, সেগুলি মানুষকে আরও বেশি করে প্রকৃতির কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। জীবের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*)। মানুষ যেহেতু তমোগুণ ও রজোগুণের সঙ্গ করছে এবং সত্ত্বগুণের সঙ্গে তার কোন রকম সংস্পর্শ নেই বললেই চলে, তাই প্রায়ই তাদের কাম ও লোভ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেন না রজ ও তমোগুণের প্রভাবই হচ্ছে এর কারণ। *তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে*—"প্রকৃতির দুটি নিকৃষ্ট গুণ—রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে মানুষ কামুক ও লোভী হয়ে যায়।" (*ভাগবত ১/২/১৯*) প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক মানব-সমাজে সকলেই কামুক ও লোভী। তাই, মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন, যা জগাই-মাধাইয়ের মতো সমস্ত মানুষকে সত্ত্বগুণের সর্বোচ্চ শিখরে বা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির স্তরে উন্নীত করতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৮-১৯) বর্ণনা করা হয়েছে—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

মানব-সমাজের এই সংকটজনক অবস্থা বিবেচনা করে কেউ যদি সত্যি সত্যি শান্তি ও সমৃদ্ধি আশা করেন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দিতে হবে এবং নিরন্তর ভাগবতধর্মে যুক্ত হতে হবে। ভাগবতধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে রজ ও তমোগুণের সমস্ত প্রভাব দূর হয়। তখন কাম ও লোভ বিদূরিত হয়। কাম ও লোভ থেকে মুক্ত হলে মানুষ ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জন করেন এবং ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন মানুষ যখন আরও উন্নত হন, তখন তিনি বৈষ্ণব স্তরে অধিষ্ঠিত হন। এই বৈষ্ণব স্তরেই কেবল সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম উদয় করা সম্ভব এবং যখন তা হয়, তখন তাঁর জীবন সার্থক হয়।

বর্তমান মানব-সমাজে বিশেষ করে তমোগুণেরই প্রাধান্য, যদিও তাতে রজোগুণের প্রভাব কিছুটা রয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই কাম ও লোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শূদ্রে পরিণত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কিছু বৈশ্যও রয়েছে এবং ধীরে ধীরে তারা সকলেই শূদ্রে পরিণত হচ্ছে। সাম্যবাদ (Communism) হচ্ছে শূদ্রদের আন্দোলন আর পুঁজিবাদ (Capitalism) হচ্ছে বৈশ্যদের জন্য। শূদ্র ও বৈশ্যদের এই সংগ্রামে সমাজের অত্যন্ত জঘন্য অবস্থার প্রভাবে সাম্যবাদের প্রভাব বিস্তার হতে থাকবে এবং তখন সমাজে যেটুকু ভাল অবশিষ্ট রয়েছে, সেটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্যবাদের প্রতি মানুষের

প্রবণতাকে প্রতিহত করতে পারে একমাত্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন, যা এমন কি কমিউনিস্টদের কাছেও আদর্শ সাম্যবাদের পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। সাম্যবাদের দর্শন অনুসারে সব কিছুই হচ্ছে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সেই ধারণাটিকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করে ভগবানকে সব কিছুরই অধীশ্বর বলে গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষ সেই কথা বুঝতে পারে না, কেন না তাদের ভগবান সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাদের ভগবানকে জানতে সাহায্য করতে পারে এবং সব কিছু যে ভগবানের সম্পত্তি তা বুঝতে যাহায্য করতে পারে। যেহেতু সব কিছুই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি এবং প্রতিটি জীব—কেবল মানুষই নয়, এমন কি পশু, পাখি, গাছপালা সকলেই হচ্ছে ভগবানের সন্তান, তাই সকলেরই ভগবৎ-ভাবনাময় হয়ে ভগবানের রাজত্বে বাস করার অধিকার রয়েছে। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা।

শ্লোক ২১

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম-নিগূঢ়ভাণ্ডার ।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান। তাই যদিও ভগবৎ-প্রেম হচ্ছে সব চাইতে নিগূঢ় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, তবুও তিনি নির্বিচারে যাকে তাকে সেই প্রেম বিতরণ করলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের অবদান। কেউ যদি কোন না কোনভাবে এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন, তা তিনি শূদ্র হোন বা বৈশ্য হোন, জগাই-মাধাই হোন বা তার থেকেও নিকৃষ্ট হোন না কেন, তিনি পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হয়ে ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা পৃথিবী জুড়ে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের প্রভাবেই এই ধরনের বহু অধঃপতিত মানুষ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জগতের গুরুরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি অপরাধী এবং সরল বিশ্বাসীর মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না। *কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে*—"তিনি নির্বিচারে সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম দান করেন।" পরবর্তী শ্লোকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২২

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয় ।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয় ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

অপরাধীই হোন বা নিরপরাধই হোন, এখনও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ নাম গ্রহণ করেন, তা হলেই তিনি তৎক্ষণাৎ আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। তখন তাঁর সারা দেহ পুলকিত হয় এবং চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে।

তাৎপর্য

যে সমস্ত প্রাকৃত সহজিয়ারা *নিতাই গৌর রাধে শ্যাম* কীর্তন করে, তাদের ভাগবত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই এবং তারা বৈষ্ণব আচার পালন করে না। কিন্তু তবুও যেহেতু তারা ভজ *নিতাই গৌর* কীর্তন করে, তাই তৎক্ষণাৎ তাদের চোখে জল আসে এবং আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা যায়। যদিও তারা বৈষ্ণব-দর্শনের তত্ত্ব জানে না এবং খুব একটা শিক্ষিতও নয়, তবুও এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা তারা বহু মানুষকে তাদের অনুগামী হতে আকৃষ্ট করে। তাদের আনন্দাশ্রু অবশ্যই ভবিষ্যতে তাদের সাহায্য করবে, কেন না যখন তারা শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে আসবে, তখন তাদের পারমার্থিক প্রয়াস সফল হবে। যেহেতু তারা *নিতাই-গৌর*-এর নাম গ্রহণ করে, তাই তাদের দ্রুত গতিতে ভগবদ্ভক্তির মার্গে উন্নতি সাধন প্রবলভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

শ্লোক ২৩

'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর কথা বলার ফলে তাঁদের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। তাঁদের সর্বাঙ্গ আনন্দে উদ্বেলিত হয় এবং গঙ্গার ধারার মতো তাঁদের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে।

শ্লোক ২৪

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার ।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণনাম অপরাধীর বিচার করে। তাই কেবল হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলেও অপরাধীর চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয় না।

তাৎপর্য

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার পূর্বে *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ* এই নাম উচ্চারণ করা অত্যন্ত হিতকর, কেন না এই দুটি দিব্যনাম (*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ*) কীর্তনের প্রভাবে মানুষ আনন্দে মগ্ন হন এবং তারপর যদি তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হন।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণে দশটি নাম-অপরাধ রয়েছে। প্রথম অপরাধটি হচ্ছে, যে সমস্ত মহাত্মা ভগবানের নাম বিতরণ করছেন তাঁদের নিন্দা করা। শাস্ত্রে (*চৈঃ চঃ অন্ত্য* ৭/১১) বলা হয়েছে, *কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট না হলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করা যায় না। তাই, যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের নাম প্রচার করছেন, তাঁদের নিন্দা করা উচিত নয়।

পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথম্ উ সহতে তদ্বিগর্হাম্ ।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা প্রচার করছেন যে সমস্ত মহাত্মা, তাঁদের নিন্দা করা নামপ্রভুর চরণে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা প্রচারকারী ভক্তের সমালোচনা করা কখনই উচিত নয়। যদি কেউ তা করেন, তা হলে তিনি হচ্ছেন অপরাধী। নামপ্রভু, যিনি কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তিনি কখনই এই ধরনের নিন্দনীয় কার্যকলাপ সহ্য করবেন না। এমন কি লোকে যাদেরকে মহাভক্ত বলে জানে, তাদেরকেও নয়।

দ্বিতীয় নাম-অপরাধের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি-সকলং
-ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ।

এই জড় জগতে বিষ্ণুর নাম সর্ব মঙ্গলময়। বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা সবই চিন্ময় পরতত্ত্ব। তাই, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম অথবা তাঁর চিন্ময় রূপ, গুণ ও লীলাসমূহকে জড় বলে মনে করে তাদের ভগবান থেকে ভিন্ন করার চেষ্টা করে, তা হলে সেটি হচ্ছে একটি অপরাধ। তেমনই, শিব আদি দেবতাদের নাম শ্রীবিষ্ণুর নামের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা, অথবা শিব আদি দেবতাদের ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে শ্রীবিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা, তা হলে সেটিও একটি অপরাধ। এটি হচ্ছে নামপ্রভুর চরণে দ্বিতীয় অপরাধ।

নামপ্রভুর চরণে তৃতীয় অপরাধকে বলা হয় *গুরোরবজ্ঞা*। শ্রীগুরুদেবকে এই জড় জগতের একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর উন্নত পদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া। চতুর্থ অপরাধ হচ্ছে (*শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্*) *চতুর্বেদ* ও *পুরাণ* আদি শাস্ত্রের নিন্দা করা। পঞ্চম অপরাধ হচ্ছে (*অর্থবাদঃ*) হরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বলে মনে করা। তেমনই, ষষ্ঠ অপরাধ হচ্ছে (*হরিনাম্নি কল্পনম্*) ভগবানের নামকে কাল্পনিক বলে মনে করা।

সপ্তম অপরাধের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রভাবে যেহেতু সমস্ত পাপ মোচন হয়, তাই কেউ যদি নাম বলে পাপাচরণ করতে থাকে, তা হলে সেটি একটি মস্ত বড় অপরাধ এবং যম, নিয়ম, ধ্যান-ধারণা আদি কৃত্রিম যোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই অপরাধীর অপরাধ মোচন হয় না।

অষ্টম অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব-
শুভ-ক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ ।

ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ বা মোহ আদি প্রাকৃত শুভ কর্মের সঙ্গে অপ্রাকৃত নাম গ্রহণকে সমান বা তুল্য জ্ঞান করাও একটি অপরাধ।

নবম অপরাধের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ।

শ্রদ্ধাহীন বা নাম শ্রবণে বিমুখ মানুষদের কাছে নামের মহিমা প্রচার করা অপরাধজনক। এই ধরনের মানুষদেরকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করার এবং কীর্তন করার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু শুরুতে তাদের কাছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। নিরন্তর ভগবানের নাম শ্রবণের ফলে তাদের হৃদয় নির্মল হবে এবং তখন ভগবানের নামের অপ্রাকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

দশম অপরাধটি হচ্ছে—

শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ ।
অহংমমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥

নামের অপূর্ব মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি "এই দেহটি হচ্ছে আমার স্বরূপ এবং এই দেহ সম্পর্কে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার (*অহং মমেতি*)"—এই রকম দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়ে সেই নাম গ্রহণ এবং নাম শ্রবণে প্রীতি বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, তবে সে নাম-অপরাধী।

শ্লোক ২৫

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৫ ॥

তৎ—তা; **অশ্ম-সারম্**—লোহার মতো কঠিন; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **বত**—হায়; **ইদম্**—এই; **যৎ**—যা; **গৃহ্যমাণৈঃ**—গ্রহণ করা সত্ত্বেও; **হরিনাম-ধেয়ৈঃ**—হরিনামের ধ্যান করে; **ন**—না; **বিক্রিয়েত**—পরিবর্তন; **অথ**—এরূপে; **যদা**—যখন; **বিকারঃ**—বিকার; **নেত্রে**—চক্ষে; **জলম্**—অশ্রু; **গাত্র-রুহেষু**—দেহের রোমকূপে; **হর্ষঃ**—রোমাঞ্চ।

অনুবাদ

"হরিনাম গ্রহণ করলে যার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তার হৃদয় লোহার মতোই কঠিন। নামপ্রভুর চরণে অপরাধের ফলেই এই অবস্থা হয়।"

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত (২/৩/২৪) থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, অনেক সময় মহাভাগবতদের রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু আদি অপ্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করতে দেখা যায় না, অথচ কখনও কখনও কনিষ্ঠ অধিকারীদের কৃত্রিমভাবে তা প্রকাশ করতে দেখা যায়। তার অর্থ এই নয় যে, কনিষ্ঠ অধিকারী মহাভাগবত থেকে অধিক উন্নত। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে হৃদয় যে প্রকৃতই পরিবর্তন হয়, তার পরীক্ষা হচ্ছে জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্তি। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত পরিবর্তন। *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ* (*ভাগবত* ১১/২/৪২)। ভগবদ্ভক্তির উদয় হলে, অন্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি আপনা থেকেই বিরক্তি আসে। যদিও কখনও কখনও দেখা যায় যে, কোন কনিষ্ঠ অধিকারী হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে কৃত্রিমভাবে অশ্রু বর্ষণ করছে অথচ জড় বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আসক্ত, তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি। প্রকৃত কার্যকলাপের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন প্রকাশ পাবে।

শ্লোক ২৬

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

নিরপরাধে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। তার ফলে ভগবদ্ভক্তি যা প্রেমের কারণ, তা প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

পাপমুক্ত না হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) বলা হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত মানুষ পূর্বজন্মে ও এই জন্মে পুণ্যকর্ম করেছেন, যাঁরা সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছেন এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই নিষ্ঠা সহকারে আমার ভজনা করেন।" যে মানুষ সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছেন, তিনি দ্বন্দ্ব-মোহ থেকে মুক্ত হয়ে অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হতে পারেন। এই কলিযুগে যদিও অধিকাংশ মানুষই পাপী, তবুও কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তারা পাপমুক্ত হতে

পারেন। *'এক' কৃষ্ণনামে*—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনের ফলেই তা সম্ভব। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১) বলা হয়েছে—*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ চলতেন, তখন তিনি কীর্তন করতেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ॥

কেউ যদি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন, তা হলে ক্রমশ তিনি সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন, যদি তিনি নিরপরাধে নাম করেন এবং নাম বলে আর পাপাচরণ না করেন। এভাবেই হৃদয় নির্মল হয় এবং ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ হয়। পাপমুক্ত হয়ে নিরপরাধে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে জীবন পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তখন পঞ্চম পুরুষার্থ বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত হওয়া যায় (*প্রেমা পুমর্থো মহান্*)।

শ্লোক ২৭

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার ।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তখন স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু ও স্বরভঙ্গ আদি প্রেমের বিকারগুলি প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

যখন ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তখন দেহের এই সমস্ত বিকারগুলি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। কৃত্রিমভাবে সেগুলি অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের রোগ হচ্ছে জড় বিষয়-বাসনা; আমরা পরমার্থের পথে অগ্রসর হওয়ার সময়েও নাম এবং যশের আকাঙ্ক্ষা করি। এই রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে। শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্*—'সব রকম জড় অভিলাষ থেকে মুক্ত'। উত্তম ভক্তের দেহে নানা রকম বিকার প্রকাশিত হতে দেখা যায়, যা হচ্ছে প্রেমানন্দের লক্ষণ। তবে জনসাধারণের কাছ থেকে সস্তা নাম কেনার জন্য তাদের অনুকরণ করা উচিত নয়। কেউ যদি যথার্থই উত্তম স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন আপনা থেকেই এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবে; সেগুলি অনুকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ২৮

অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন ।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে পারমার্থিক জীবনে প্রভূত উন্নতি হয় এবং তার ফলে ভববন্ধন মোচন হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। এই কৃষ্ণনামের এতই বল যে, এক কৃষ্ণনামের ফলে এই সমস্ত চিন্ময় সম্পদ লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৯-৩০

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

বারবার এই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি কৃষ্ণপ্রেমের উদয় না হয় এবং চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে না পড়ে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার প্রচুর অপরাধ রয়েছে, তাই কৃষ্ণনামের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে না।

তাৎপর্য

কেউ যদি অপরাধযুক্ত হয়ে কৃষ্ণনাম করেন, তা হলে ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না। তাই, চতুর্বিংশতি শ্লোকে বর্ণিত অপরাধগুলি খুব সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে।

শ্লোক ৩১

চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার ।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু কেউ যদি একটু শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম গ্রহণ করেন, তা হলে অচিরেই তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। ফলে যখন তিনি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করবেন, তখন তিনি ভগবৎ-প্রেম অনুভব করবেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়বে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরণাগত হন এবং তাঁদের নির্দেশ অনুসারে তৃণের থেকেও সুনীচ এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে ভগবানের নাম কীর্তন করেন, তা হলে অচিরেই

তিনি ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন এবং তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়বে। কৃষ্ণনাম অপরাধীর বিচার করেন, কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের কোনই বিচার নেই। তাই, কেউ যদি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন কিন্তু তার কার্যকলাপ যদি পাপযুক্ত হয়, তা হলে তার পক্ষে ভগবৎ-প্রেম লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি গৌর-নিত্যানন্দের নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি অতি শীঘ্রই অপরাধ থেকে মুক্ত হবেন। অতএব, প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরণাগত হয়ে অথবা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আরাধনা করে, তারপর শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের শিষ্যদের প্রথমে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উপাসনা করতে উপদেশ দেওয়া হয় এবং তারপর কিছুটা উন্নত হলে, তখন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তখন তারা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করতে শুরু করে।

চরমে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করার জন্য প্রথমে গৌর-নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এই সম্পর্কে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর ।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর ক'বে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

প্রথমে অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম গ্রহণ করতে হবে। তার ফলে বিষয়-বাসনা মুক্ত হয়ে হৃদয় নির্মল হবে। তখন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করা যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ না করলে বৃন্দাবনে গিয়ে কোন লাভ নেই। হৃদয় নির্মল না হলে বৃন্দাবনে গেলেও বৃন্দাবন দর্শন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনে যাওয়া মানে হচ্ছে ষড় গোস্বামী রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব* আদি গ্রন্থাবলী পাঠ করে তাঁদের শরণাগত হওয়া। এভাবেই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা যায়। *কবে হাম বুঝব সে যুগলপিরীতি*। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কোন সাধারণ মানুষের কার্যকলাপ নয়; তা পূর্ণ চিন্ময়। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হলে, তাঁদের আরাধনা করতে হলে এবং তাঁদের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড় গোস্বামীদের শরণাগত হতে হবে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অথবা পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা করা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা থেকে সহজ। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান না হলে সরাসরি শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করা যায় না। যে কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত যথেষ্টভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তার পক্ষে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করা অথবা হরে কৃষ্ণ

মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত নয়। তিনি যদি তা করেনও, তা হলে ঈপ্সিত ফল লাভ হবে না। তাই নিতাই-গৌরের নাম করতে হয় এবং অহঙ্কারশূন্য হয়ে তাঁদের আরাধনা করতে হয়। যেহেতু এই জড় জগতের প্রায় সকলেই কম-বেশি পাপকর্মের দ্বারা প্রভাবিত, তাই প্রথমে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ভজনা করে তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করা অবশ্যই প্রয়োজন, কেন না তা হলে এই সমস্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও অচিরেই শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করার যোগ্যতা লাভ হবে।

এই সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে, কৃষ্ণনাম ও গৌরসুন্দরের নাম অভিন্ন, তাই একটি নামকে আর একটি নাম থেকে শক্তিশালী বলে মনে করা উচিত নয়। তবে এই যুগের মানুষদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম কীর্তন করা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার থেকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সব চাইতে উদার অবতার এবং তাঁর করুণা অতি সহজেই লাভ করা যায়। তাই প্রথমে *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥* —কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হতে হবে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা করার ফলে বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করার যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্লোক ৩২

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভজনা না করলে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভজনা করতে হলে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনা ত্যাগ করতে হয় না। কেবল শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভজনা করলে পরমার্থের পথে এগোন যায় না। ষড় গোস্বামীদের নির্দেশ অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত, কেন না তাঁরা হচ্ছেন আচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপিরীতি ॥

ষড় গোস্বামীদের অনুগত হওয়া উচিত এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর ধারায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, এভাবেই গুরু-পরম্পরার ধারা অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। তাঁদের নির্দেশ অনুসরণ না করে, শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরাধনা করার কল্পনা করাও

এক মহা অপরাধ। সেই অপরাধের ফলে নরকের পথ প্রশস্ত হয়। কেউ যদি ষড় গোস্বামীদের নির্দেশ অবহেলা করে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের তথাকথিত ভক্ত হন, তবে তিনি কেবল শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যথার্থ ভক্তদের সমালোচনাই করেন। তাঁর জল্পনা-কল্পনার ফলে তিনি মনে করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর হচ্ছেন একজন সাধারণ ভক্ত এবং তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবায় উন্নতি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৩

ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

হে মূর্খগণ! চৈতন্যমঙ্গল পাঠ কর, এই গ্রন্থ পাঠ করলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানতে পারবে।

তাৎপর্য

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত *শ্রীচৈতন্য-ভাগবত* প্রথমে *শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল* নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর যখন *শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করলেন, তখন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করেন, যা এখন *শ্রীচৈতন্য-ভাগবত* নামে পরিচিত। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যা উল্লেখ করেননি, তাঁর *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে তিনি তারই বর্ণনা করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যেভাবে *শ্রীচৈতন্য-ভাগবত* গ্রহণ করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে তাঁর গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পারমার্থিক গ্রন্থের গ্রন্থকারেরা কখনও পূর্বতন আচার্যদের অতিক্রম করার চেষ্টা করেন না।

শ্লোক ৩৪

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যাসদেব যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করেছেন, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ঠিক সেভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৫

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সব অমঙ্গল ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ শ্রবণ করলে সব রকম অমঙ্গল নষ্ট হয়ে যায়।

শ্লোক ৩৬

চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল পাঠ করলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং কৃষ্ণভক্তির চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রামাণিক গ্রন্থ হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত*, কিন্তু যেহেতু তা অত্যন্ত বিশাল, তাই মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষই কেবল তার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *বেদান্তসূত্রের* প্রকৃত ভাষ্য, যাকে *ন্যায়-প্রস্থান* বলা হয়। যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তা রচিত হয়েছিল এবং তাই তার প্রকৃত ভাষ্য *শ্রীমদ্ভাগবত* অত্যন্ত বিস্তারিত। পেশাদারী *ভাগবত* পাঠকেরা একটি ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* কেবল শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলারই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাসলীলার বর্ণনা করা হয়েছে কেবল দশম স্কন্ধে একোনত্রিংশতি থেকে ত্রয়স্ত্রিংশতি পর্যন্ত এই পাঁচটি অধ্যায়ে। এভাবেই তারা পাশ্চাত্যের জনসাধারণের কাছে শ্রীকৃষ্ণকে একজন লম্পটরূপে প্রতিপন্ন করেছে এবং তাই প্রচার করার সময় মানুষ আমাদের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা রকম ভ্রান্ত প্রশ্ন করে থাকে। *শ্রীমদ্ভাগবত* হৃদয়ঙ্গম করার পথে আর একটি প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পেশাদারী পাঠকদের ভাগবত-সপ্তাহ বা এক সপ্তাহ ধরে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ। তারা এক সপ্তাহেই *শ্রীমদ্ভাগবত* শেষ করতে চায়। যদিও *শ্রীমদ্ভাগবত* এতই গভীর যে, তার এক একটি শ্লোক তিন মাসে ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না। তাই জনসাধারণের পক্ষে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের *শ্রীচৈতন্য-ভাগবত* শ্রবণ করা অত্যন্ত মঙ্গলপ্রদ, কেন না তার ফলে তারা যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জানতে পারবে। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"*উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র* আদি বৈদিক শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলি অবহেলা করে যে তথাকথিত ভগবদ্ভক্তি সম্পাদিত হয়, তা মানব-সমাজে এক অবাঞ্ছিত উৎপাত মাত্র।" *শ্রীমদ্ভাগবত* সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাবশত মানুষ কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের *শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল* শ্রবণ করার ফলে মানুষ অনায়াসে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

শ্লোক ৩৭

ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিক তত্ত্ব উল্লেখ করে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে (পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নামে পরিচিত) ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্তের সারাংশ বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপাষণ্ডী বা যবনও যদি শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি এক মহাবৈষ্ণবে পরিণত হন।

শ্লোক ৩৯

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এত গভীর যে, কোন মানুষের পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব নয়। তাই মনে হয় যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *হরিভক্তিবিলাস* গ্রন্থে লিখেছেন—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥

"দুধ অত্যন্ত উপাদেয় বস্তু; তা সেবন করলে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। কিন্তু সেই দুধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হলে যেমন তা দুধের ক্রিয়া না করে বিষেরই ক্রিয়া করে, তেমনই পবিত্র হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু অবৈষ্ণব অপরাধী ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশ আদি বাহ্য আকারে হরিকথার মতো মনে হলেও তা নাম-অপরাধ মাত্র। সেই নাম-অপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্তব্য নয়। তা শ্রবণ করলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুধের মতো তার দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হয়।"

বৈদিক তত্ত্ব এবং *পুরাণ* ও *পঞ্চরাত্র-বিধির* সিদ্ধান্তের অনুগামী শাস্ত্র কেবল শুদ্ধ ভক্তই প্রণয়ন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন না তাঁর গ্রন্থ কার্যকরী হবে না। তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত হতে পারেন এবং খুব সুন্দর ভাষায় রচনা করতে তিনি দক্ষ হতে পারেন, কিন্তু তা পারমার্থিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষকে সাহায্য করে না। পক্ষান্তরে, ভগবদ্ভক্ত যদি ভুল ভাষায়ও তা রচনা করেন, তা হলে তা গ্রহণীয়। কিন্তু জড়বাদী পণ্ডিতের দ্বারা রচিত, এমন কি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিবেশিত তথাকথিত পারমার্থিক গ্রন্থও গ্রহণযোগ্য নয়। ভক্তের রচনার রহস্য হচ্ছে যে, তিনি যখন ভগবানের লীলা বর্ণনা করেন, তখন ভগবান তাঁকে সাহায্য করেন; তিনি নিজে তা রচনা করেন না। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) ভগবান বলেছেন, *দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। ভক্ত যেহেতু ভগবানের সেবার মনোভাব নিয়ে লেখেন, তাই ভগবান তাঁর অন্তর থেকে তাঁকে বুদ্ধি দেন, যেন তিনি ভগবানের সামনে বসে লেখেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রতিপন্ন করেছেন যে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যা লিখেছেন তা প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরই কথা এবং তিনি কেবল তার পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। এই সত্য *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* লেখেন, তখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অথর্ব। কিন্তু এটি এমনই এক মহান গ্রন্থ যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন, "*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করার জন্য একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলা ভাষা শিখবে।" আমরা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করছি, জানি না এই কার্যে আমি কতটা সফল হব। তবে কেউ যদি বাংলা ভাষায় মূল *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* পাঠ করেন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির অমৃত আস্বাদন করতে পারবেন।

শ্লোক ৪০

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার ।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আমি অনন্ত কোটি প্রণতি নিবেদন করি। জগতের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য এই রকম অপূর্ব গ্রন্থ আর কেউ রচনা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪১

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

নারায়ণী নিত্যকাল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। তাঁর গর্ভে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

কবিকর্ণপূর রচিত *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা* গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদেরা পূর্ব লীলায় কে ছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে নারায়ণীর সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে—

অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীল-কিলিম্বিকা ।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা ॥

"শৈশব-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অম্বিকা নামক এক ধাত্রীর দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কিলিম্বিকা নামক এক ভগ্নী ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় এই কিলিম্বিকা মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করতেন। সেই কিলিম্বিকা হচ্ছেন শ্রীবাস ঠাকুরের ভাগ্নী নারায়ণী।" পরবর্তীকালে তাঁর গর্ভে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বিখ্যাত হন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত তাঁর সেবার মাধ্যমে; এভাবেই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নারায়ণীর পুত্ররূপে পরিচিত হয়েছেন। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষের পরিচয় বৈষ্ণবের পরিচয়ে আবশ্যক নয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন ।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা তিনি কি অপূর্ব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ত্রিভুবনে যে-ই তা শ্রবণ করে, সে-ই পবিত্র হয়।

শ্লোক ৪৩

অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি বিনীতভাবে সকলের কাছে নিবেদন করি, তাঁরা যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রদত্ত ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেন। তার ফলে সংসার-দুঃখ থেকে তাঁরা মুক্ত হবেন এবং চরমে ভগবৎ-প্রেমানন্দ লাভ করবেন।

শ্লোক ৪৪

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্য-মঙ্গল' ।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৫

সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন ।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে তিনি সূত্রের আকারে মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণনা করেছেন এবং তারপর সেই সকল সূত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৬

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার। তাই, সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা করতে করতে গ্রন্থটি বিরাট হয়ে উঠল।

শ্লোক ৪৭

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বিস্তার দেখে তাঁর মনে একটু সঙ্কোচ হল, তাই সূত্রধৃত কোন কোন লীলা তিনি বর্ণনা করলেন না।

শ্লোক ৪৮

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বর্ণনা করার সময় তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে সেই লীলা বর্ণনা করলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষ লীলা অব্যক্তই রয়ে গেল।

শ্লোক ৪৯

সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সমস্ত লীলার বর্ণনা শুনতে বৃন্দাবনবাসী সকল ভক্তের মন উৎকণ্ঠিত হল।

শ্লোক ৫০

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন ।
মহা-যোগপীঠ তাঁহা, রত্ন-সিংহাসন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে এক সুবর্ণ-সদন রয়েছে, তা হচ্ছে মহা যোগপীঠ এবং সেখানে একটি রত্ন-সিংহাসন রয়েছে।

শ্লোক ৫১

তাতে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
'শ্রীগোবিন্দ-দেব' নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রত্ন-সিংহাসনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দদেব বসে আছেন। তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কামদেব।

শ্লোক ৫২

রাজ-সেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার ।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

সেখানে দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র ও দিব্য অলঙ্কার দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের রাজকীয় সেবা হয়।

শ্লোক ৫৩

সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ ।
সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গোবিন্দজীর মন্দিরে হাজার হাজার সেবক ভক্তি সহকারে গোবিন্দজীর সেবা করেন। এমন কি সহস্র বদনেও সেই সেবা বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ৫৪

সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস ।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্বজগতে প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মন্দিরের প্রধান সেবক হচ্ছেন হরিদাস পণ্ডিত। তাঁর গুণ ও যশ সর্বজগতে বিদিত।

তাৎপর্য

গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্য এবং তাঁর শিষ্য ছিলেন হরিদাস পণ্ডিত।

শ্লোক ৫৫

সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর ।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি ছিলেন সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর, তাঁর বাণী ছিল মধুর এবং তাঁর আচরণ ছিল মহাধীর।

শ্লোক ৫৬

সবার সম্মান-কর্তা, করেন সবার হিত ।
কৌটিল্য-মাৎসর্য-হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি ছিলেন সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তিনি সকলের হিতসাধন করতেন। কুটিলতা, মাৎসর্য এবং হিংসার লেশও তাঁর হৃদয়ে ছিল না।

শ্লোক ৫৭

কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণের যে সাধারণ পঞ্চাশটি গুণ, তা সবই তাঁর শরীরে প্রকাশিত ছিল।

তাৎপর্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ হচ্ছে সাধারণ (*অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ* প্রভৃতি) এবং স্বল্প পরিমাণে এই সমস্ত গুণগুলি শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের শরীরে বর্তমান ছিল। যেহেতু প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, তাই শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটি সদ্গুণ স্বল্প পরিমাণে প্রতিটি জীবের মধ্যেই মূলত বর্তমান। জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে বদ্ধ জীবের মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলি দেখা যায় না। কিন্তু কেউ যখন শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন এই সমস্ত গুণগুলি আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* (৫/১৮/১২) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৮

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৮ ॥

যস্য—যাঁর; **অস্তি**—আছে; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **অকিঞ্চনা**—নিষ্কাম; **সর্বৈঃ**—সমস্ত; **গুণৈঃ**—গুণাবলী; **তত্র**—সেখানে; **সমাসতে**—প্রকাশিত হয়; **সুরাঃ**—সমস্ত দেবতাসহ; **হরৌ**—শ্রীহরির প্রতি; **অভক্তস্য**—যে ভগবদ্ভক্ত নয়; **কুতঃ**—কোথায়; **মহৎ-গুণাঃ**—মহৎ গুণাবলী; **মনঃ-রথেন**—মনোরথের দ্বারা; **অসতি**—জড় জগৎ; **ধাবতঃ**—ধাবিত হয়; **বহিঃ**—বহির্মুখী।

অনুবাদ

"যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভক্তিসম্পন্ন, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সমস্ত দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু যিনি হরিভক্তি-বিহীন তার মধ্যে কোন সদ্গুণই নেই, কেন না তিনি মনোরথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগতের প্রতি নিরন্তর ধাবিত হচ্ছেন।"

শ্লোক ৫৯

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য ।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব-আর্য ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত আচার্য ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। তাঁর শ্রীঅঙ্গ অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সর্বতোভাবে উত্তম।

শ্লোক ৬০

তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহ—পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত আচার্য ছিলেন সমস্ত সদ্গুণের আধার। তাঁর মাহাত্ম্য বিচার করার ক্ষমতা কারও ছিল না। এই হরিদাস পণ্ডিত ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীঅনন্ত আচার্য হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ। পূর্বে কৃষ্ণলীলায় অনন্ত আচার্য ছিলেন অষ্ট

সখীর একজন সুদেবী নাম্নী সখী। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৬৫) তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *অনন্তাচার্য-গোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে*—"অনন্ত আচার্য গোস্বামী পূর্বলীলায় ছিলেন ব্রজের সুদেবী নাম্নী গোপী।" জগন্নাথপুরী বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গঙ্গামাতা মঠ নামক একটি মঠ রয়েছে এবং সেটি অনন্ত আচার্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের গুরু-পরম্পরায় ইনি বিনোদ মঞ্জরী বলে উক্ত আছেন। তাঁর এক শিষ্য হচ্ছেন হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী, যিনি শ্রীরঘু গোপাল ও রাস মঞ্জরী নামে পরিচিত। তাঁর শিষ্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন পুটিয়ার রাজকন্যা গঙ্গামাতার মাতুলানী। গঙ্গামাতা জয়পুরের কৃষ্ণ মিশ্রের কাছ থেকে শ্রীরসিক রায় নামক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এনে জগন্নাথপুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীঅনন্ত আচার্যের পঞ্চম অধস্তন হচ্ছেন শ্রীবনমালী; ষষ্ঠ অধস্তন হচ্ছেন শ্রীভগবান দাস, যিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী; সপ্তম অধস্তন হচ্ছেন মধুসূদন দাস, তিনি ছিলেন ওড়িয়া; অষ্টম অধস্তন হচ্ছেন নীলাম্বর দাস; নবম অধস্তন হচ্ছেন শ্রীনরোত্তম দাস; দশম অধস্তন হচ্ছেন পীতাম্বর দাস এবং একাদশ অধস্তন হচ্ছেন শ্রীমাধব দাস। তাঁর দ্বাদশ অধস্তন এখন গঙ্গামাতা মঠের মহান্ত।

শ্লোক ৬১

চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের পরম বিশ্বাস ছিল। তাই, তাঁদের লীলায় ও তাঁদের গুণাবলীতে তাঁর পরম উল্লাস ছিল।

শ্লোক ৬২

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি সর্বদা বৈষ্ণবের সদ্‌গুণগুলি দর্শন করতেন এবং কখনও তাঁদের দোষ দেখতেন না। কায়মনোবাক্যে তিনি বৈষ্ণবদের সন্তুষ্টি বিধান করতেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবদের একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি *অদোষদর্শী*—তিনি কখনও কারও দোষ দেখেন না। প্রতিটি মানুষেরই অবশ্য গুণ ও দোষ দু-ই রয়েছে। তাই বলা হয়, *সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ*—সকলের মধ্যেই দোষ ও গুণ দু-ই রয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব ও সাধু-সজ্জনগণ মানুষের গুণটিই দর্শন করেন, আর পামরেরা শুধু দোষ দর্শন করেন। মাছি ঘা খোঁজে, আর মৌমাছি মধু খোঁজে। হরিদাস পণ্ডিত কখনও মানুষের দোষ দর্শন করতেন না, পক্ষান্তরে তিনি তাদের সদ্‌গুণগুলিই দর্শন করতেন।

শ্লোক ৬৩

নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি নিরন্তর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-পাঠ শ্রবণ করতেন এবং তাঁর কৃপায় অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণবেরাও তা শুনতেন।

শ্লোক ৬৪

কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্য-মঙ্গল পাঠ করে পূর্ণচন্দ্রের মতো তিনি বৈষ্ণব-সভা উজ্জ্বল করতেন এবং তাঁর গুণামৃতের দ্বারা তিনি বৈষ্ণবদের আনন্দ বর্ধন করতেন।

শ্লোক ৬৫

তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা কৈলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত কৃপাপূর্বক তিনি আমাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন।

শ্লোক ৬৬

কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর সেবক গোবিন্দ গোসাঞি ছিলেন কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য। তাঁর থেকে অধিক প্রিয় সেবক শ্রীগোবিন্দজীর আর কেউ ছিলেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে বর্ণনা করেছেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে অবস্থানকালে কাশীশ্বর গোসাঞি ছিলেন তাঁর পার্ষদ। কাশীশ্বর গোসাঞি যিনি কাশীশ্বর পণ্ডিত নামেও পরিচিত, তিনি ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি কাঞ্জিলাল

কানুবংশোদ্ভূত বাৎস্য গোত্রীয় বাসুদেব ভট্টাচার্যের পুত্র। তাঁর উপাধি ছিল চৌধুরী। তাঁর ভাগিনা ছিলেন বল্লভপুরের শ্রীরুদ্র পণ্ডিত। শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে চাতরা গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। কাশীশ্বর গোস্বামী অত্যন্ত বলবান ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শনে যেতেন, তখন তিনি অগ্রবর্তী হয়ে লোকের ভীড় ঠেলে পথ সুগম করে দিতেন এবং ভীড় থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আগলে রাখতেন। তাঁর আর একটি সেবা ছিল কীর্তনান্তে ভক্তদের প্রসাদ পরিবেশন করা।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর চাতরার মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় মন্দিরের সেবাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী এবং তিনি কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতৃবংশীয়। এই স্থানে সেবার জন্য প্রত্যহ নয় কিলোগ্রাম করে চাল, শাক-সবজি ও অন্যান্য ভোগের দ্রব্যসামগ্রীর বন্দোবস্ত ছিল। গ্রামের সন্নিকটেই পূর্বকাল থেকে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সম্পত্তির বন্দোবস্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত কাশীশ্বর গোস্বামীর ভ্রাতৃবংশীয়গণ এই সমস্ত সম্পত্তি রাজদ্বারে নষ্ট করে ফেলেছেন, তাই এখন আর সেবার ভাল বন্দোবস্ত নেই।

শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় বর্ণিত আছে যে, বৃন্দাবনে যিনি কৃষ্ণভৃত্য ভৃঙ্গার, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় কাশীশ্বর গোস্বামীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমার গার্হস্থ্য-জীবনে আমিও চাতরার মন্দির দর্শন করে সেখানে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়েছি। এই মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেব অপূর্ব সুন্দর। চাতরার কাছেই জগন্নাথদেবের একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে। কখনও কখনও আমরা জগন্নাথদেবের মন্দিরেও প্রসাদ পেতাম। এই দুটি মন্দিরই কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর থেকে এক মাইলের মধ্যে।

শ্লোক ৬৭

যাদবাচার্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী ।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গী শ্রীযাদবাচার্য গোসাঞি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণে ও কীর্তনে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।

শ্লোক ৬৮

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভুগর্ভ গোসাঞি ।
গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভুগর্ভ গোসাঞি নিরন্তর গৌরকথা শ্রবণ-কীর্তনে মগ্ন থাকতেন। তা ছাড়া তিনি আর অন্য কিছু জানতেন না।

শ্লোক ৬৯

তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ পূজক চৈতন্যদাস ।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

গোবিন্দের পূজক চৈতন্যদাস, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী ও মহান ভগবৎ-প্রেমিক কৃষ্ণদাস ছিলেন তাঁর শিষ্য।

শ্লোক ৭০

আচার্যগোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্তী শিবানন্দ ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্ত আচার্যের এক শিষ্য ছিলেন শিবানন্দ চক্রবর্তী যাঁর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিরন্তর বিরাজ করতেন।

শ্লোক ৭১

আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনে আরও অনেক মহান ভক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা শ্রবণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।

শ্লোক ৭২

মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া ।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা সবাই করুণা করে আমাকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের আদেশেই আমি নির্লজ্জের মতো শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার চেষ্টা করছি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বর্ণনা করা কোন সাধারণ কাজ নয়। পূর্বতন আচার্য বা উত্তরসূরী বৈষ্ণবদের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট না হলে ভগবানের লীলা সমন্বিত অপ্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করা যায় না। এই সমস্ত গ্রন্থ সর্বতোভাবে সব রকম সন্দেহের অতীত, অর্থাৎ তাতে বদ্ধ জীবের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব আদি কোন ভ্রান্তির অবকাশ নেই। শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী বহনকারী গুরু-পরম্পরা যথার্থই প্রামাণিক।

ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে চিন্ময় সাহিত্য রচনা এক মহা গৌরবের বিষয়। একজন বিনীত বৈষ্ণবরূপে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এভাবেই ভগবৎ-শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছিলেন।

শ্লোক ৭৩

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে ।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

বৈষ্ণবের আজ্ঞা পেয়ে চিন্তিত অন্তরে আমি মদনগোপালের মন্দিরে গিয়েছিলাম তাঁর আদেশ ভিক্ষা করার জন্য।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব সর্বদাই শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ পালন করেন। তাঁদেরই কৃপায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনা করেছিলেন। পূর্ববর্ণিত সমস্ত ভক্তদের শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গুরু বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং মদনগোপাল (শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ) হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। এভাবেই তিনি উভয়েরই আদেশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যখন তিনি গুরু ও কৃষ্ণ উভয়েরই কৃপা লাভ করেছিলেন, তখন তিনি এই মহান গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্তব্য। যিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু লিখবার প্রয়াস করেন, তাঁকে অবশ্যই সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশ গ্রহণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান এবং শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন তাঁর বহিরঙ্গা প্রকাশ। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে ও বাইরে বিরাজমান। প্রথমে গভীর নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করে এবং প্রতিদিন ষোল মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে হবে এবং তারপর যখন বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তখন শ্রীগুরুদেবের আদেশ গ্রহণ করতে হয় এবং সেই আদেশ যেন অন্তরস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদিত হয়। তারপর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও শুদ্ধ হলে পদ্যের আকারে অথবা গদ্যের আকারে অপ্রাকৃত সাহিত্য রচনা করা যায়।

শ্লোক ৭৪

দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন ।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

আমি যখন মন্দিরে মদনমোহন দর্শন করতে গেলাম, তখন পূজারী গোসাঞিদাস ভগবানের শ্রীচরণের সেবা করছিলেন। তখন আমিও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা নিবেদন করলাম।

শ্লোক ৭৫

প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল ।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমি যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম, তখন তাঁর গলা থেকে একটি মালা খসে পড়ল।

শ্লোক ৭৬

সব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল ।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত বৈষ্ণবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!" এবং পূজারী গোসাঞি দাস সেই মালাটি এনে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।

শ্লোক ৭৭

আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আজ্ঞামালা পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমি এই গ্রন্থ রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলাম।

শ্লোক ৭৮

এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন' ।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আমি লিখিনি, শ্রীমদনমোহন আমাকে দিয়ে তা লিখিয়েছিলেন। আমার লেখা ঠিক শুক পক্ষীর (তোতা পাখির) পুনরাবৃত্তির মতো।

তাৎপর্য

সমস্ত ভক্তের এই রকম মনোভাব হওয়া উচিত। ভগবান যখন কোন ভক্তকে অঙ্গীকার করেন, তখন তিনি তাঁকে বুদ্ধি দেন এবং বলে দেন কিভাবে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারেন। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) বর্ণিত হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যিনি সতত সেবাপরায়ণ হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁকে বুদ্ধিযোগ দান করি, যার ফলে তিনি আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার অধিকার সকলেরই রয়েছে, কেন না প্রতিটি জীবই তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য সেবক। ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। কিন্তু যেহেতু সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তাই সে মনে করে যে, সেটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সে যদি সদ্গুরুর শরণাগত হয় এবং ঐকান্তিকভাবে গুরুর আদেশ পালন করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তাকে নির্দেশ দেন কিভাবে তাঁর সেবা করতে হবে (*দদামি বুদ্ধিযোগং তম্*)। ভগবান নিজে এই নির্দেশ দেন এবং তার ফলে ভক্তের জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে। শুদ্ধ ভক্ত যা কিছুই করেন না কেন, তা করেন ভগবানের নির্দেশ অনুসারে। এভাবেই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকারের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তিনি যা লিখেছিলেন তা মদনমোহনই তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৯

সেই লিখি, মদনগোপাল যে লিখায় ।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাজিকর যেভাবে কাঠের পুতুলকে নাচায়, ঠিক সেভাবেই শ্রীমদনগোপাল আমাকে দিয়ে এই গ্রন্থ লিখিয়েছেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব। নিজে নিজে কোন কিছু চেষ্টা করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিত। তা হলে চৈত্যগুরুরূপে বা অন্তরস্থিত গুরুদেবরূপে তিনি তাঁকে পরিচালিত করেন। পরমেশ্বর ভগবান ভক্তকে অন্তরে ও বাইরে পরিচালিত করেন। অন্তর্যামীরূপে তিনি তাঁকে অন্তর থেকে পরিচালিত করেন এবং গুরুরূপে তিনি বাইরে থেকে তাঁকে পরিচালিত করেন।

শ্লোক ৮০

কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন ।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সনাতন ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদনমোহন হচ্ছেন আমার কুলের অধিদেবতা, যাঁর সেবক হচ্ছেন রঘুনাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী।

শ্লোক ৮১

বৃন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান ।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করে, তাঁর আজ্ঞা অনুসারে আমি এই কল্যাণকর গ্রন্থ লিখবার চেষ্টা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কেবল বৈষ্ণবদের ও শ্রীমদনমোহনের আদেশই গ্রহণ করেননি, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ব্যাসদেব শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আদেশও গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮২

চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন-দাস ।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় ব্যাসদেব। তাই, তাঁর কৃপা ছাড়া এই সমস্ত লীলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৮৩

মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস ।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি মূর্খ, নীচকুলোদ্ভূত নগণ্য এবং বিষয়ে লালসা-পরায়ণ; কিন্তু তবুও বৈষ্ণবদের আজ্ঞার বলে আমি এই অপ্রাকৃত সাহিত্য রচনা করতে সাহস করছি।

শ্লোক ৮৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল ।
যার স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিতসকল ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীচরণের এমনই বল যে, তা স্মরণে সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৮৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'গ্রন্থকারের কৃষ্ণ, গুরু ও বৈষ্ণবের আজ্ঞা গ্রহণ' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

নবম পরিচ্ছেদ

ভক্তি-কল্পতরু

নবম পরিচ্ছেদের কথাসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে* বলেছেন—নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণনা করে গ্রন্থকার একটি রহস্যের উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গকে মূল বৃক্ষরূপে বিবেচনা করে ভক্তিবৃক্ষের মালাকার এবং তার ফলের দাতা ও ভোক্তা বলে বর্ণনা করেছেন। শ্রীনবদ্বীপ ধামে সেই ফলবৃক্ষ রোপণের আরম্ভ, পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন আদি অন্যান্য স্থানেও সেই প্রেমফলের উদ্যান বাড়ানো হয়েছিল। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তাঁর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী সেই অঙ্কুর পুষ্ট করেছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মালী হয়ে আবার তাঁর অচিন্ত্য শক্তিবলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দ পুরী আদি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল স্কন্ধের ওপর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ আরও দুটি স্কন্ধ হল। সেই স্কন্ধ দুটি থেকে নানা প্রকার শাখা-উপশাখা বেরিয়ে জগৎকে বেষ্টন করল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্বত্র যাকে তাকে দান করা হল। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করে তার ফল আস্বাদন করিয়ে সমস্ত জগৎকে মাতাল করলেন। এই বর্ণনাটি একটি রূপক বলে মনে রাখতে হবে।

শ্লোক ১

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥

তম্—তাঁকে; **শ্রীমৎ**—সর্ব ঐশ্বর্যসম্পন্ন; **কৃষ্ণ-চৈতন্য-দেবম্**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে; **বন্দে**—আমি বন্দনা করি; **জগৎ-গুরুম্**—সমগ্র জগতের গুরু; **যস্য**—যাঁর; **অনুকম্পয়া**—করুণার প্রভাবে; **শ্বা অপি**—একটি কুকুর পর্যন্ত; **মহা-অব্ধিম্**—মহাসাগর; **সন্তরেৎ**—সাঁতার কেটে পার হতে পারে; **সুখম্**—অনায়াসে।

অনুবাদ

যাঁর কৃপা লাভ করে একটি কুকুরও অনায়াসে মহাসাগর সাঁতার কেটে পার হতে পারে, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

তাৎপর্য

কখনও কখনও দেখা যায়, একটি কুকুর জলের মধ্যে সাঁতার কেটে একটু দূর গিয়ে তারপর আবার পাড়ে ফিরে আসে। কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কুকুরও সাঁতার কেটে মহাসাগর পার হতে পারে। তেমনই, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজের অসহায় অবস্থার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁর কোন ব্যক্তিগত ক্ষমতা নেই। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা—বৈষ্ণব ও শ্রীল মদনমোহন বিগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনারূপ অপ্রাকৃত সমুদ্র পার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

গৌরচন্দ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক!

শ্লোক ৩

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ ।
সর্বাভীষ্ট-পূর্তি-হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয় হোক! আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমি তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করি।

তাৎপর্য

গ্রন্থকার *আদিলীলার* সপ্তম পরিচ্ছেদে যেভাবে পঞ্চতত্ত্বের বন্দনা করেছেন, এখানেও ঠিক সেভাবেই সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করছেন।

শ্লোক ৪

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও দাস রঘুনাথ—এই ছয় গোস্বামীকেও আমি স্মরণ করি।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার পন্থা। বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীবিহীন ভাবুকেরা চিন্ময় শাস্ত্র রচনা করতে পারে না। বহু মূর্খ রয়েছে যারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে শিল্পকলার বিষয় বলে মনে করে এবং অশ্লীলভাবে গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় ছবি আঁকে অথবা গ্রন্থ রচনা করে। এই ধরনের মূর্খরা কৃষ্ণলীলাকে তাদের সুখভোগের উপকরণ বলে মনে করে। কিন্তু যারা পারমার্থিক জীবনের জন্য উন্নতি লাভের প্রয়াসী, তাদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই সমস্ত সাহিত্যশিল্প বর্জন করতে হবে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যেভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁর পার্ষদ ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সেভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবদের দাস না হতে পারলে, চিন্ময় শাস্ত্র রচনা করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫

এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ ।
জানি বা না জানি, করি আপন-শোধন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও গুণ বর্ণনা করে এই গ্রন্থ রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি জানি বা না জানি, নিজের শোধনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করছি।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে চিন্ময় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার মূল কথা। তাঁকে অবশ্যই শুচিতা, বিনয় ও নম্রতাযুক্ত বৈষ্ণব হতে হবে। আত্মাকে পবিত্র করার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করা উচিত, নাম কেনার জন্য নয়। ভগবানের লীলা সম্বন্ধে লেখার মাধ্যমে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ হয়। "আমি একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক হব। আমি নাম করা লেখক হব।" এই ধরনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কখনই পোষণ করা উচিত নয়। কারণ এগুলি হচ্ছে জড় বাসনা। নিজেকে পবিত্র করার জন্য লিখতে চেষ্টা করা উচিত। তা প্রকাশিত হতে পারে, অথবা তা প্রকাশিত নাও হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কেউ যদি যথার্থ নিষ্ঠা সহকারে তা লেখেন, তা হলে তাঁর সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ হবে। লেখক হিসেবে নাম হল কি হল না তা নৈমিত্তিক। নাম কেনার জন্য কখনই চিন্ময় বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৬

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্ ।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

মালাকারঃ—মালী; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **প্রেম**—প্রেম; **অমর**—অপ্রাকৃত; **তরুঃ**—বৃক্ষ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দাতা**—দাতা; **ভোক্তা**—ভোক্তা; **তৎ-ফলানাম্**—সেই বৃক্ষের সমস্ত ফল; **যঃ**—যিনি; **তম্**—তাঁকে; **চৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **আশ্রয়ে**—আশ্রয় করি।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই হচ্ছেন কৃষ্ণপ্রেমরূপ অপ্রাকৃত তরু, তার মালাকার এবং সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি আশ্রয় করি।

শ্লোক ৭

প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি ।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবলেন, "আমার নাম বিশ্বম্ভর, অর্থাৎ 'সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা'। সেই নাম সার্থক হয়, যদি ভগবৎ-প্রেমে আমি সমগ্র বিশ্ব ভরে দিতে পারি।"

শ্লোক ৮

এত চিন্তি' লৈলা প্রভু মালাকার-ধর্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চিন্তা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মালাকার ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং নবদ্বীপে এক উদ্যান রচনার কাজ আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি-কল্পতরু পৃথিবীতে আনয়ন করে তার মালাকার হলেন। তিনি সেই বীজ রোপণ করে তাতে ইচ্ছারূপ বারি সিঞ্চন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তিকে অনেক সময় একটি লতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ে রোপণ করতে হয়। নিয়মিত শ্রবণ ও কীর্তনের ফলে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে তা বর্ধিত হতে থাকে এবং তারপর তাতে ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল উৎপন্ন হয়, যা হৃদয়রূপ উদ্যানের মালাকার উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ১০

জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণভক্তির আধার শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর জয় হোক। তিনি হচ্ছেন একটি ভক্তি-কল্পতরু এবং তাঁর মধ্যেই ভক্তিলতার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী যিনি শ্রীমাধব পুরী নামেও পরিচিত, তিনি মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত এক মহান সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর তৃতীয় অধস্তন শিষ্য। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবানের আরাধনা সম্পাদিত হত বিধিমার্গে এবং তাতে প্রেমভক্তির

কোন লক্ষণ ছিল না। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী প্রথম প্রেমভক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত *অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ*—"হে পরম দয়াময় পরমেশ্বর ভগবান" শ্লোকে মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির তত্ত্ব বীজরূপে ছিল।

শ্লোক ১১

শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঈশ্বর পুরীরূপে ভক্তি-কল্পতরুর পরবর্তী বীজ অঙ্কুরিত হল এবং তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং মালীরূপে ভক্তি-কল্পতরুর মূল স্কন্ধ হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন, "শ্রীঈশ্বর পুরী ছিলেন কুমারহট্টের বাসিন্দা। সেখানে কামারহাটি নামে বর্তমানে একটি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে এবং তার কাছেই হালিসহর নামে আর একটি স্টেশনও রয়েছে। সেই স্টেশনটি পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত, যে পথে কলকাতার পূর্বাঞ্চল থেকে যাতায়াত করা চলে।"

শ্রীঈশ্বর পুরী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সব চাইতে প্রিয় শিষ্য। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* শেষাংশে (*অন্ত্য* ৮/২৮-৩১) বর্ণনা করা হয়েছে—

ঈশ্বরপুরী গোসাঞি করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন' ॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।

"শেষ জীবনে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী অথর্ব হয়ে পড়েন এবং চলাফেরা করতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। ঈশ্বর পুরী তখন এমনভাবে তাঁর সেবা করেন যে, তিনি তাঁর মল-মূত্র আদি পর্যন্ত পরিষ্কার করেন। তিনি নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতেন এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করাতেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী সব চাইতে ভালভাবে তাঁর সেবা করেন। তাই তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী তাঁকে আশীর্বাদ করেন, 'বৎস, আমি কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার প্রতি প্রসন্ন হন'। এভাবেই তাঁর গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর কৃপার প্রভাবে ঈশ্বর পুরী কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন এবং ভগবৎ-প্রেমের সাগরে এক মহান ভক্তরূপে পরিণত হন।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর *গুর্বষ্টকম্*-এ বলেছেন,

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি—"গুরুদেবের কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করা যায়। কিন্তু গুরুদেব যদি অপ্রসন্ন হন, তা হলে আর অন্য কোন গতি থাকে না।" গুরুদেবের কৃপার প্রভাবেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যায়। সেই দৃষ্টান্ত এখানে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণবকে ভগবান সর্বদাই রক্ষা করেন, কিন্তু যখন তাকে অক্ষম বা অথর্ব বলে মনে হয়, সেটি হচ্ছে তাঁর শিষ্যদের তাঁকে সেবা করতে দেওয়ার জন্য তাঁরই প্রদত্ত একটি সুযোগ। ঈশ্বর পুরী তাঁর গুরুসেবার দ্বারা গুরুদেবকে প্রসন্ন করেছিলেন এবং তাঁর গুরুদেবের আশীর্বাদের ফলে তিনি এমনই এক মহাপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন।

শ্রীল ঈশ্বর পুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তিনি নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েক মাস বাস করেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁর রচিত *কৃষ্ণলীলামৃত* শুনিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেন। *চৈতন্য-ভাগবতের আদি খণ্ডের* একাদশ অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

কিভাবে সদ্‌গুরুর বিশ্বস্ত শিষ্য হতে হয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুমারহট্টতে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জন্মস্থানের মাটি সংগ্রহ করেন। সেই মাটি তিনি খুব সাবধানতার সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন এবং প্রতিদিন তিনি একটুখানি করে সেই মাটি খেতেন। *চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* সপ্তদশ অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেখানে গিয়ে সেই স্থানের মাটি সংগ্রহ করা ভক্তদের কাছে একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়েছে।

শ্লোক ১২

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয় ।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভগবান একাধারে সেই বৃক্ষের মালী ও স্কন্ধ। সেই স্কন্ধ হচ্ছে সমস্ত শাখার মূল আশ্রয়।

শ্লোক ১৩-১৫

পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী ।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ ১৩ ॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১৪ ॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে ।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীবিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনৃসিংহ তীর্থ ও সুখানন্দ পুরী—এই নয় জন সন্ন্যাসী হচ্ছেন সেই বৃক্ষের কাণ্ড থেকে প্রকাশিত নয়টি মূল। এভাবেই নয়টি মূলের ওপর ভর করে সেই বৃক্ষ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান ছিল।

তাৎপর্য

পরমানন্দ পুরী—পরমানন্দ পুরী উত্তর প্রদেশের ত্রিহুৎ জেলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন তাঁর গুরুদেব। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর সম্পর্কে পরমানন্দ পুরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের* অন্ত্যখণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে—

সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ।
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র ॥
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপুরী ।
সন্ন্যাসী-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন ।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন ।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন ॥
যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে ।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে ॥

"মাধবেন্দ্র পুরীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে ঈশ্বর পুরী ও পরমানন্দ পুরী তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এভাবেই পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদরের মতো যিনি ছিলেন আর একজন সন্ন্যাসী, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন পরমানন্দ পুরী তাঁকে দণ্ডদান করেছিলেন। পরমানন্দ পুরী নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং শ্রীস্বরূপ দামোদর নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে মগ্ন থাকতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে তাঁর গুরুদেব শ্রীল ঈশ্বর পুরীকে শ্রদ্ধা করতেন, পরমানন্দ পুরী এবং স্বরূপ দামোদরকেও তিনি সেভাবেই শ্রদ্ধা করতেন।" *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* তৃতীয় অধ্যায়ে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পরমানন্দ পুরীকে প্রথম দর্শন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন—

আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য জন্ম ।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব ধর্ম ॥
প্রভু বলে—"আজি মোর সফল সন্ন্যাস ।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হৈলা প্রকাশ ॥"

"আমার চক্ষু, আমার জন্ম, আমার ধর্ম এবং আমার সন্ন্যাস গ্রহণ আজ সার্থক হয়েছে, কেন না শ্রীপরমানন্দ পুরীরূপে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী আজ আমার সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছেন।"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আরও বলা হয়েছে—

কথোক্ষণে অন্যোহন্যে করেন প্রণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্যের প্রেম-ধাম ॥

"এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীকে প্রণতি নিবেদন করলেন, যিনি ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।" পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে পরমানন্দ পুরী একটি ছোট্ট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে তিনি জলের জন্য একটি কূপ খনন করেন। কিন্তু সেই জল ছিল অত্যন্ত তিক্ত, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, সেই জলকে সুমিষ্ট করার জন্য গঙ্গা যেন সেখানে আসেন। শ্রীজগন্নাথদেব যখন তাঁর সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত ভক্তদের বলেছিলেন যে, সেদিন থেকে পরমানন্দ পুরীর কূপের জল যেন গঙ্গাজল থেকে অভিন্ন জ্ঞানে সম্মান করা হয়, কেন না কোন ভক্ত যদি সেই জল পান করেন অথবা সেই জলে স্নান করেন, তা হলে তিনি গঙ্গাজল পান ও গঙ্গাস্নানের সমান ফল লাভ করবেন। তিনি অবশ্যই শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ করবেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*অন্ত্য* ৩/২৫৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

প্রভু বলে,—"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন, 'আমি যে এই পৃথিবীতে রয়েছি, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার প্রতি শ্রীপরমানন্দ পুরীর অপূর্ব প্রীতি।'" *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১১৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা*—"পূর্বে যিনি ছিলেন উদ্ধব, এখন তিনি পরমানন্দ পুরী।" উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু ও খুল্লতাত এবং শ্রীচৈতন্যলীলায় সেই উদ্ধব হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্ধু এবং দীক্ষাসূত্রে তাঁর কাকাগুরু।

কেশব ভারতী—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরী মঠের অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীকেশব ভারতী যিনি তখন কাটোয়ায় একটি আশ্রমে বাস করছিলেন, তিনি ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কোন কোন প্রামাণিক মত অনুসারে, কেশব ভারতী যদিও শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু পূর্বে তিনি জনৈক বৈষ্ণব কর্তৃক দীক্ষিত ছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে দীক্ষিত হওয়ার ফলে তিনি একজন বৈষ্ণব ছিলেন বলে অনুমান করা হয়, কেন না কেউ কেউ বলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। কেশব ভারতী যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বিগ্রহ আরাধনা শুরু করেছিলেন, তা আজও খাটুন্দি নামক গ্রামে বর্তমান। সেই গ্রামটি বর্ধমানের কান্দরা ডাকঘরের অন্তর্ভুক্ত। মঠের অধ্যক্ষদের মতানুসারে, সেখানকার পূজারীরা হচ্ছেন কেশব ভারতীর বংশধর এবং কেউ কেউ বলেন যে, সেই বিগ্রহের পূজারীরা হচ্ছেন কেশব ভারতীর পুত্রদের বংশধর। গৃহস্থ-আশ্রমে নিশাপতি ও ঊষাপতি নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন সেই মন্দির দর্শন করতে যান, শ্রীনকড়িচন্দ্র বিদ্যারত্ন নামক নিশাপতির জনৈক বংশধর সেই মন্দিরের প্রধান পূজারী ছিলেন। কারও কারও মতে সেই মন্দিরের পূজারীরা কেশব ভারতীর ভাইয়ের বংশধর। কারও কারও মতে আবার তাঁরা হচ্ছেন মাধব ভারতী নামক কেশব ভারতীর এক শিষ্যের বংশধর। মাধব ভারতীর শিষ্য বলভদ্র, যিনি পরবর্তীকালে ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হন। তাঁর পূর্বাশ্রমে মদন ও গোপাল নামক দুই পুত্র ছিল। মদনের পারিবারিক উপাধি ছিল ভারতী, তিনি আউরিয়া নামক গ্রামে বাস করতেন এবং গোপালের পারিবারিক উপাধি ছিল ব্রহ্মচারী, তিনি দেনদুড় নামক গ্রামে বাস করতেন। এই উভয় পরিবারের বহু বংশধর আজও বেঁচে আছেন।

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৫২) বর্ণনা করা হয়েছে—

মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ।
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূৎ অদ্য কেশবভারতী ॥

"সান্দীপনি মুনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে যজ্ঞ-উপবীত প্রদান করেছিলেন, তিনিই পরে কেশব ভারতীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস প্রদান করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১১৭) আরও বলা হয়েছে, *ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রূরঃ কেশবভারতী*—"কোন কোন মহাজনের মত অনুসারে কেশব ভারতী হচ্ছেন অক্রূরের অবতার।" ১৪৩২ শকাব্দে (১৫১০ খ্রীঃ) কাটোয়ায় কেশবভারতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। তা *বৈষ্ণব-মঞ্জুষায়* দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

ব্রহ্মানন্দ পুরী—মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে তাঁর সংকীর্তন-লীলা প্রকাশ করেছিলেন, তখন শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী ছিলেন তাঁর একজন পার্ষদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে যান, তখন তিনিও সেখানে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মানন্দ নামটি কেবল মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাই গ্রহণ করেন না, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরাও গ্রহণ করেন। কিছু অল্পজ্ঞ মানুষ মনে করে যে, ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামটি মায়াবাদী সন্ন্যাসীর নাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ব্রহ্মানন্দ শব্দটি সব সময় নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই দ্যোতক নয়। পরব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণভক্তের নামও ব্রহ্মানন্দ হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী পার্ষদ শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী তার একটি দৃষ্টান্ত।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি মৃগচর্ম পরিধান করতেন। তা দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, মৃগচর্ম পরিধান তিনি পছন্দ করেন না। তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগচর্ম পরিধান পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের মতো গৈরিক বহির্বাস গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কিছুকাল জগন্নাথ-পুরীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
অষ্ট দিকে অষ্ট মূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

মধ্যমূল হচ্ছেন মহাধীর পরমানন্দ পুরী, আর তাঁর আট দিকে আটটি মূল চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিবৃক্ষকে শক্ত করে ধরে রাখল।

শ্লোক ১৭

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল ।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

স্কন্ধের উপর বহু শাখার উৎপত্তি হল এবং সেই শাখাগুলির উপর আরও অসংখ্য শাখা উৎপন্ন হল।

শ্লোক ১৮

বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল ।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চৈতন্য-বৃক্ষের শাখাগুলি একটি মণ্ডল তৈরি করল এবং তার মহা মহা শাখাগুলি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে ফেলল।

তাৎপর্য

আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ চৈতন্য-বৃক্ষের একটি শাখা।

শ্লোক ১৯

একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত ।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এক একটি শাখা থেকে শত শত উপশাখা জন্মায়। এভাবেই যে কত শাখা হল, তা কেউ গুনে শেষ করতে পারে না।

শ্লোক ২০

মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন ।
আগে ত' করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি মুখ্য মুখ্য অগণিত শাখার নাম বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। দয়া করে এখন চৈতন্য-বৃক্ষের বর্ণনা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ২১

বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ' ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

বৃক্ষের উপরের স্কন্ধ থেকে দুটি শাখা হল, তার একটি হলেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এবং অপরটি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

শ্লোক ২২

সেই দুইস্কন্ধে বহু শাখা উপজিল ।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুটি স্কন্ধ থেকে বহু শাখা ও উপশাখা সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেলল।

শ্লোক ২৩

বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা ।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

এর শাখা, উপশাখা এবং তার উপশাখা এত অসংখ্য হল যে, কারও পক্ষে তা লেখা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৪

শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শিষ্য, প্রশিষ্য ও উপশিষ্যে জগৎ ছেয়ে গেল এবং কত যে তার সংখ্যা হল, তা গণনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্লোক ২৫

উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে ।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

একটি বৃহৎ ডুমুর বৃক্ষের সর্ব অঙ্গে যেমন ফল ধরে, তেমনই ভক্তিবৃক্ষের সর্ব অঙ্গেও ফল ধরে।

তাৎপর্য

এই ভক্তিবৃক্ষ জড় জগতের বস্তু নয়। এই বৃক্ষ বর্ধিত হয় চিৎ-জগতে, যেখানে দেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের কোনও পার্থক্য নেই। এটি অনেকটা মিছরির বৃক্ষের মতো, কেন না সেই বৃক্ষের যে অঙ্গেরই আস্বাদন করা হোক না কেন, তা সুমধুর। ভক্তিবৃক্ষের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, পাতা ও ফল রয়েছে, কিন্তু সে সবেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। ভগবদ্ভক্তির নয়টি অঙ্গ রয়েছে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*), কিন্তু সেই সবেরই একমাত্র উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা। তাই, শ্রবণ হোক, কীর্তন হোক, স্মরণ হোক, অথবা অর্চনই হোক, সব একই ফল প্রসব করে। কোন বিশেষ ভক্তের পক্ষে এই অঙ্গগুলির কোন্‌টি সব চাইতে বেশি উপযুক্ত হবে, তা নির্ভর করে সেই ভক্তের রুচির উপর।

শ্লোক ২৬

মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে ।
লাগিলা যে প্রেমফল,—অমৃতকে জিনে ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, তাই তার শাখায় এবং উপশাখায় যে ফল ফলল, তার স্বাদ অমৃতের থেকেও মধুর।

শ্লোক ২৭

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর ।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

ফলগুলি পেকে অমৃতের থেকেও মধুর হল। মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন মূল্য না নিয়ে সেগুলি বিতরণ করলেন।

শ্লোক ২৮

ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি ।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিজগতের সমস্ত ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য একত্রিত করলেও তার মূল্য ভক্তিবৃক্ষের একটি অমৃত ফলের সমতুল্য হতে পারে না।

শ্লোক ২৯

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র ।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

কে তা চাইল আর কে চাইল না, কে তা গ্রহণে সমর্থ বা অসমর্থ, সে সমস্ত বিবেচনা না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিবৃক্ষের ফল বিতরণ করলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের সারমর্ম। কে এই সংকীর্তন আন্দোলনে যোগদান করতে সক্ষম, আর কে সক্ষম নয়, সেই রকম কোন বিচার নেই। তাই কোন রকম বিভেদ বা বৈষম্যের বিচার না করে, এই আন্দোলন প্রচার করা উচিত। সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচারকদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন রকম ভেদাভেদের অপেক্ষা না করে প্রচার করে যাওয়া। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন।

শ্লোক ৩০

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দিশে ।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

অপ্রাকৃত মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অঞ্জলি ভরে চতুর্দিকে সেই ফল বিতরণ করলেন, আর দরিদ্র, ক্ষুধার্তরা যখন সেই ফল খেলেন, তখন তা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মালাকার হাসলেন।

শ্লোক ৩১

মালাকার কহে,—শুন, বৃক্ষ-পরিবার ।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তিবৃক্ষের শাখা-উপশাখাদের সম্বোধন করে মালাকার বললেন—

শ্লোক ৩২

অলৌকিক বৃক্ষ করে, সর্বেন্দ্রিয়-কর্ম ।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু ভক্তিবৃক্ষ অলৌকিক, তাই তার প্রতিটি অঙ্গ অন্য সমস্ত অঙ্গের কর্ম সম্পাদন করতে পারে। বৃক্ষ যদিও স্থাবর, তবুও তা জঙ্গমের ধর্ম অবলম্বন করেছে।

তাৎপর্য

জড় জগতে দেখা যায় যে, বৃক্ষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু চিৎ-জগতে বৃক্ষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। তাই চিৎ-জগতের সব কিছুকে বলা হয় *অলৌকিক* বা অপ্রাকৃত। এই বৃক্ষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তা সর্বভাবে ক্রিয়া করতে পারে। জড় জগতে বৃক্ষের মূল মাটির নীচে প্রবিষ্ট হয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু চিৎ-জগতের বৃক্ষের উপর অংশের ডালপালা, ফুল ও পাতা মূলেরই মতো ক্রিয়া করতে পারে।

শ্লোক ৩৩

এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন ।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গ চিন্ময় সত্ত্বাবিশিষ্ট এবং সেগুলি বর্ধিত হয়ে সমস্ত জগৎ জুড়ে বিস্তৃত হল।

শ্লোক ৩৪

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব ।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি হচ্ছি একমাত্র মালাকার। একা একা আমি কত জায়গায় যেতে পারি? কত ফলই বা পেড়ে বিলাতে পারি?

তাৎপর্য

এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইঙ্গিত করেছেন যে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণের কার্য সমবেতভাবে সম্পাদন করতে হবে। যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি অনুশোচনা করছেন, "আমি একলা কিভাবে এই বিরাট কার্য সম্পাদন করব? একা একা কত ফলই বা আমি পাড়ব, আর সমস্ত জগৎ জুড়ে কিভাবেই বা তা বিতরণ করব?" এর থেকে বোঝা যায় যে, স্থান, কাল ও পাত্রের বিচার না করে সকল শ্রেণীর ভক্তকে একত্রিত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করতে হবে।

শ্লোক ৩৫

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম ।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"একা একা সেই ফলগুলি পেড়ে বিতরণ করা অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ কাজ। তার ফলে কেউ সেগুলি পায়, কেউ সেগুলি পায় না বলেই আমার মনে হয়।

শ্লোক ৩৬

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে ।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করে সর্বত্র তা বিতরণ করার জন্য আমি এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আদেশ দিলাম।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া ।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥

মায়ান্ধকার নাশ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন। মায়ার প্রভাবে এই জড় জগতে সকলেই মনে করছে যে, সে জড় পদার্থজাত এবং তাই জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তার নানা রকম কর্তব্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়—সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময় হওয়ার এক চিন্ময় প্রয়োজন তার রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করার ফলে, সে কখনও নিজেকে একটি মানুষ, কখনও একটি পশু, কখনও একটি বৃক্ষ, কখনও একটি মৎস্য, কখনও একটি দেবতা আদি বলে মনে করছে। এভাবেই দেহের পরিবর্তনের ফলে সে বিভিন্ন ধরনের চেতনা প্রাপ্ত হচ্ছে এবং তার ফলে নিরন্তর এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়ে সে জড় জগতের বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সে অতীত অথবা ভবিষ্যতের কথা বিচার না করে ক্ষণস্থায়ী বর্তমান জীবনটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছে। এই মায়া নাশ করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলনরূপী মহৌষধ নিয়ে এসেছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করার জন্য এবং বিতরণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করছেন। যিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকৃত অনুগামী, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে অবশ্যই তাঁর নির্দেশ পালন করবেন এবং তাঁর কাছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ভিক্ষা করবেন। কেউ যদি ভগবানের কাছ থেকে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র ভিক্ষা করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়।

শ্লোক ৩৭

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি একলা মালাকার। এই ফল যদি আমি বিতরণ না করি, তা হলে আমি সেগুলি নিয়ে কি করব? আমি একলা কত ফল খাব?

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তির এত ফল উৎপাদন করলেন যে, সারা পৃথিবী জুড়ে যদি সেগুলি বিতরণ না করা হয়, তা হলে তিনি একা সেই সমস্ত ফল কিভাবে আস্বাদন করবেন? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূল কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারাণীর প্রেম হৃদয়ঙ্গম করা এবং আস্বাদন করা। ভক্তিবৃক্ষের এই ফল অসংখ্য এবং তাই তিনি নির্বিচারে সকলকে তা বিতরণ করতে চেয়েছিলেন। অতএব শ্রীল রূপ গোস্বামী লিখেছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

ভগবানের বহু অবতার রয়েছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো এত উদার, করুণাময় ও মহাবদান্য অবতার আর নেই, কেন না তিনি ভগবদ্ভক্তির সর্বোত্তম উজ্জ্বল রস রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্যপ্রেম দান করেছেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ কামনা করছেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর সমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে বিরাজ করুন, কেন না তা হলে তাঁরা শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মহিমা অনুভব করতে পারবেন এবং আস্বাদন করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৮

আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর ।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় ইচ্ছার প্রভাবে সেই বৃক্ষে জল সিঞ্চন করেন এবং তার ফলে তাতে অসংখ্য প্রেমফল ফলে।

তাৎপর্য

ভগবান অসীম এবং তাঁর ইচ্ছাও অসীম। এই অসংখ্য ফলের দৃষ্টান্ত জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতেও সমীচীন, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এত খাদ্যশস্য, ফলমূল উৎপন্ন হয় যে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তাদের ক্ষমতার দশগুণ বেশি খেয়েও তা শেষ করতে পারে না। এই জড় জগতে প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুরই অভাব নেই, অভাব একমাত্র কৃষ্ণভক্তির। পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত করুণার প্রভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভক্তি

অবলম্বন করেন, তা হলে এত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে যে, মানুষের কোন রকম অর্থনৈতিক সমস্যা থাকবে না। তা খুব সহজেই বোঝা যায়। খাদ্যশস্য ও ফলমূলের উৎপাদন আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার উপর। যদি তিনি প্রসন্ন হন, তা হলে তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণে ফলমূল আদি সরবরাহ করতে পারেন। কিন্তু মানুষ যদি ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকে পরিণত হয়, তা হলে তাঁর ইচ্ছায় প্রকৃতি খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতবর্ষের কতগুলি অঞ্চলে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কখনও কখনও বৃষ্টিপাতের অভাবের ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই সম্বন্ধে তথাকথিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদেরা কিছুই করতে পারে না। তাই, সমস্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার মাধ্যমে ভগবানের কৃপা লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।

শ্লোক ৩৯

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে ।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিতরণ কর। যাকে তাকে এই ফল দান কর, যাতে তারা বার্ধক্য ও মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না যিনি তা অবলম্বন করেন, তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হয়ে অমরত্ব লাভ করেন। মানুষ বুঝতে পারে না যে, জীবনের প্রকৃত ক্লেশ হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। তারা এতই মূর্খ যে, তারা এই চার রকমের দুঃখকষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারা জানে না যে, সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার মহৌষধ হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলে, মানুষ এই আন্দোলনের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যথার্থ সেবক, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে এই আন্দোলনের প্রচার করে মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন করছেন। নিম্নস্তরের পশুরা অবশ্য এই আন্দোলনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। কিন্তু যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষও ঐকান্তিকভাবে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করে, তা হলে তাঁদের উচ্চ সংকীর্তনের প্রভাবে সমস্ত জীব, এমন কি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও গাছপালা পর্যন্ত উপকৃত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীল হরিদাস

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মনুষ্যেতর প্রাণীদের কল্যাণ সাধন হবে কি করে, তখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর উত্তর দেন যে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এতই শক্তিশালী যে, তা যদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করা হয়, তা হলে সমস্ত মানব-সমাজ, এমন কি নিম্নস্তরের জীবেরা পর্যন্ত তার ফলে উপকৃত হবে।

শ্লোক ৪০

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি ।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্তি ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ফল যদি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিতরণ করা হয়, তা হলে আমার পুণ্য খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হবে এবং মহা আনন্দে সমস্ত মানুষ আমার মহিমা কীর্তন করবে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণী এখন যথার্থই সার্থক হয়েছে। ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও প্রচারের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জগৎ জুড়ে প্রসারিত হয়েছে এবং যে সমস্ত মানুষ বিভ্রান্ত, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করছিল, তারা এখন দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়েছে। এই সংকীর্তনের মাধ্যমে তারা যথার্থ শান্তি খুঁজে পেয়েছে এবং তাই তারা এই আন্দোলনের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখন প্রকৃতই সার্থক হয়েছে এবং যাঁরা ধীর ও বিবেকবান, তাঁরা এই মহান আন্দোলনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারছেন।

শ্লোক ৪১

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"যারা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের জন্ম সার্থক করে পর-উপকার করা।

তাৎপর্য

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকটিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঔদার্য প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই সেই সূত্রে প্রতিটি বাঙ্গালীর তাঁর প্রতি এক বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্য করেই এই কথা বলেননি, তিনি সমস্ত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যেই এই কথা বলেছেন। ভারতবর্ষেই কেবল মানব-সভ্যতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব।

মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করা। সেই সম্বন্ধে *বেদান্তসূত্রে* বলা হয়েছে—*অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।* যিনি ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তিনি বৈদিক সভ্যতার যথার্থ সুযোগ গ্রহণ করার বিশেষ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি স্বাভাবিকভাবেই পারমার্থিক জীবনের মৌলিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভারতবর্ষের প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই, এমন কি গ্রামের সাধারণ কৃষক এবং অশিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস করে, কর্মফলে বিশ্বাস করে, ভগবানে বিশ্বাস করে এবং স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধির পূজা করতে চায়। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার ফলে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি স্বাভাবিকভাবেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ হয়। ভারতবর্ষে গয়া, বারাণসী, মথুরা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, রামেশ্বরম্ ও জগন্নাথপুরী আদি বহু তীর্থস্থান রয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন সেই সমস্ত তীর্থস্থানে যায়। যদিও আধুনিক ভারতবর্ষের নেতারা জনসাধারণকে ভগবৎ-বিমুখ হতে প্রভাবিত করছে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতে নিষেধ করছে, পাপ ও পুণ্যকর্মে বিশ্বাস করতে নিষেধ করছে এবং তাদের মদ্যপান করতে, মাংসাহার করতে ও তথাকথিতভাবে সভ্য হতে শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু তবুও মানুষ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মাংসাহার, নেশা ও দ্যূতক্রীড়া—এই চারটি পাপকে ভয় করে—এবং যখনই কোন ধর্মোৎসব হয়, তখন তারা হাজারে হাজারে সেখানে যোগদান করে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, যখনই কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ আদি বড় বড় শহরে আমরা সংকীর্তন মহোৎসবের আয়োজন করি, তখন লক্ষ লক্ষ লোক সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। কখনও কখনও আমরা ইংরেজীতে ভাষণ দিই, আর সাধারণ মানুষ যদিও ইংরেজী ভাষা বুঝতে পারে না, তবুও তারা আমাদের কথা শুনতে আসে। এমন কি, ভণ্ড অবতারেরাও যখন প্রবচন দেয়, তখনও হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপরায়ণ হয় এবং পারমার্থিক জীবন যাপনের শিক্ষা লাভ করে; তাদের প্রয়োজন কেবল বৈদিক তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে একটু শিক্ষা লাভ করা। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলেছেন, *জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার*—ভারতবাসীরা যদি বৈদিক তত্ত্বদর্শনের শিক্ষা লাভ করে, তা হলে তারা সমস্ত পৃথিবীর পরম কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

বর্তমানে কৃষ্ণভাবনার বা ভগবৎ-চেতনার অভাবে সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং মানুষ মাংসাহার, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও সুরাপানে মত্ত হয়েছে। এই সমস্ত পাপকার্য থেকে মানুষকে বিরত করার জন্য প্রবলভাবে কৃষ্ণভাবনার প্রচার করা প্রয়োজন। তার ফলে জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা হবে; চোর, বদমাশ ও লম্পটের সংখ্যা আপনা থেকেই কমে যাবে এবং সমস্ত মানব-সমাজ ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে।

সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের ফলে,আজ সব চাইতে অধঃপতিত লম্পটেরাও সব চাইতে উচ্চস্তরের মহাত্মায় পরিণত হচ্ছেন। এটি কেবল একজন ভারতীয়ের ক্ষুদ্র সেবার ফল। আজ যদি সমস্ত ভারতবাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ

অনুসারে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তা হলে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর এক মহা উপকার সাধন করবে এবং তার ফলে ভারতবর্ষ মহিমান্বিত হবে। আজ সমস্ত পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষ এক দারিদ্রগ্রস্ত, অনাহারক্লিষ্ট দেশ বলে পরিচিত। আজ আমেরিকা বা অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী দেশের লোকেরা যখন ভারতবর্ষে যায়, তখন তারা দেখে যে বহু মানুষ ফুটপাতে শুয়ে আছে, যাদের দুবেলা দুমুঠো অন্নেরও সংস্থান নেই। বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলি দরিদ্র মানুষের সেবা করার নামে পৃথিবীর সর্বত্র টাকা সংগ্রহ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সেই টাকা ব্যয় করছে। এখন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং এই আন্দোলন থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তাই নেতৃস্থানীয় ভারতবাসীদের কর্তব্য হচ্ছে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে, ভারতবাসীদেরকে বিদেশে গিয়ে এই বাণী প্রচার করতে শিক্ষা দেওয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এটি গ্রহণ করবে। প্রবাসী ভারতীয়রা ও পৃথিবীর অন্যান্য মানুষেরা যদি এই কাজে সহযোগিতা করবার জন্য এগিয়ে আসেন, তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনা প্রচার হবে। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তিত হবে, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে, কেবল এই জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও, কেন না *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন, তা হলে তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারবেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে তাই অনুরোধ করেছেন, তাঁর বাণী প্রচার করে তাঁরা যেন জগৎকে বিপজ্জনক বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করেন।

এটি কেবল ভারতবাসীদেরই কর্তব্য নয়, এটি সকলেরই কর্তব্য। আজ আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান ছেলে-মেয়েরা যে আন্তরিকভাবে এই আন্দোলনকে সহযোগিতা করছে, সেই জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। মানুষকে জানতে হবে যে, মানব-সমাজের সব চাইতে বড় উপকার হচ্ছে, মানুষের ভগবৎ-চেতনার বা কৃষ্ণচেতনার বিকাশ করা। তাই, সকলেরই কর্তব্য এই আন্দোলনে সহযোগিতা করা। এই কথা *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২২/৩৫) থেকে উদ্ধৃত *চৈতন্য-চরিতামৃতে* পরবর্তী শ্লোকটিতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৪২ ॥

এতাবৎ—এই পর্যন্ত; **জন্ম**—জন্ম; **সাফল্যম্**—সাফল্য; **দেহিনাম্**—প্রতিটি জীবের; **ইহ**—এই জগতে; **দেহিষু**—দেহধারী জীবদের প্রতি; **প্রাণৈঃ**—জীবনের দ্বারা; **অর্থৈঃ**—অর্থের দ্বারা; **ধিয়া**—বুদ্ধির দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **শ্রেয়ঃ**—নিত্য মঙ্গল অনুষ্ঠান; **আচরণম্**—ব্যবহারিকভাবে আচরণ করে; **সদা**—নিরন্তর।

অনুবাদ

" 'প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য হচ্ছে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা অপরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করা। তা হলেই তাঁর জন্ম সফল হয়।'

তাৎপর্য

দুই প্রকার কার্যকলাপ রয়েছে—*শ্রেয়* বা যে সমস্ত কার্যকলাপ চরমে লাভজনক ও মঙ্গলজনক এবং *প্রেয়* বা যে সমস্ত কার্যকলাপ আপাতদৃষ্টিতে লাভজনক ও কল্যাণকর, কিন্তু চরমে দুঃখদায়ক। যেমন, শিশুরা খেলতে ভালবাসে। তারা স্কুলে গিয়ে পড়াশুনা করতে চায় না এবং তারা মনে করে যে, সারা দিন ও সারা রাত ধরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস কালে আমরা দেখেছি যে, তিনি যখন বাল্যলীলা প্রদর্শন করছিলেন, তখন তিনি তাঁর সমবয়সী গোপসখাদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসতেন। তিনি খাওয়ার জন্য বাড়িতে পর্যন্ত যেতে চাইতেন না। জোর করে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য মা যশোদাকে আসতে হত। শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা না করে, অন্য কোন কিছুর কথা বিবেচনা না করে সারা দিন খেলা করা। এটি হচ্ছে *প্রেয়*-এর একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু, তেমনই *শ্রেয়* হচ্ছে সেই সমস্ত কার্যকলাপ, যা চরমে মঙ্গলজনক। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবৎ-চেতনা লাভ করা। তাকে জানতে হবে ভগবান কি, এই জড় জগৎ কি, তার পরিচয় কি এবং ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। একে বলা হয় *শ্রেয়*, বা পরম মঙ্গলময় কার্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এই *শ্রেয়*-এর আকাঙ্ক্ষী হওয়া। জীবনের পরম উদ্দেশ্য *শ্রেয়* লাভ করার জন্য বা পরম মঙ্গল সাধন করার জন্য তাঁর প্রাণ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি, বাক্য আদি সব কিছুই কেবল তাঁর নিজের জন্যই নয়, অন্য সকলের পরম উপকারার্থে নিয়োগ করা উচিত। নিজে *শ্রেয়* সাধনের আকাঙ্ক্ষী না হলে, অন্যের মঙ্গলের জন্য *শ্রেয়* বিষয়ে প্রচার করা যায় না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্ত এই শ্লোকটি মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পশুদের ক্ষেত্রে নয়। পূর্ববর্তী শ্লোকেও *মনুষ্য-জন্ম* কথাটির উল্লেখের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, এই নির্দেশ কেবল মানুষদের জন্য। দুর্ভাগাবশত, মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই তাদের আচার আচরণে পশুর থেকেও অধম হয়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে না; তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নতিরও প্রয়োজন রয়েছে; বৈদিক সমাজে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—মানব-জীবনের এই সব কয়টি প্রয়োজনের কথাই বিবেচনা করা হয়েছে। তবে মানব-জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম আচরণ করতে হলে অবশ্যই ভগবানের নির্দেশ পালন করতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগে মানুষ ধর্মকে বর্জন করেছে এবং তারা

কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাতেই ব্যস্ত। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য তারা যে কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য চুরি করে বা প্রতারণা করে অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না; জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু অর্থের কেবল প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক সমাজের মানুষ যেহেতু ধর্মভাব বর্জিত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েছে, তাই মানুষ অর্থের জন্য লোভী, কামুক ও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তারা কেবল রজ ও তমোগুণেরই বৃদ্ধি সাধন করছে। সত্ত্বগুণের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই সমস্ত মানব-সমাজে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি সভ্য মানুষের এমনভাবে আচরণ করা উচিত, যার ফলে সমগ্র মানব-সমাজ জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হতে পারে। *বিষ্ণু পুরাণ* (৩/১২/৪৫) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে সেই কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৩

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ ।
কর্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩ ॥

প্রাণিনাম্—সমস্ত জীবের; **উপকারায়**—উপকারের জন্য; **যৎ**—যা; **এব**—অবশ্যই; **ইহ**—এই জগতে অথবা এই জীবনে; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **চ**—এবং; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **তৎ**—তা; **এব**—অবশ্যই; **মতিমান্**—বুদ্ধিমান; **ভজেৎ**—অবশ্য কর্তব্য।

অনুবাদ

' "কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণীদের যাতে উপকার হয়, তাই বুদ্ধিমান লোক আচরণ করেন।'

তাৎপর্য

দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ মানুষ জানে না যে, তার পরবর্তী জীবনে কি হবে। পরবর্তী জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার সাধারণ জ্ঞান থাকা মানুষের কর্তব্য এবং সেটি হচ্ছে বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে সারা পৃথিবীর মানুষ পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করে না। এমন কি প্রভাবশালী অধ্যাপক এবং শিক্ষকেরাও বলে যে, দেহটি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। এই নাস্তিক দর্শন মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করছে। সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ সব রকমের পাপকার্যে লিপ্ত হচ্ছে এবং শিক্ষার নাম করে তথাকথিত সমস্ত নেতারা এভাবেই মানব-জীবনের সুন্দর সম্ভাবনাটিকে মানুষের কাছ থেকে অপহরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই জীবনটি যে পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি তা বাস্তব সত্য। বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করতে করতে বিবর্তনের মাধ্যমে চেতনার বিকাশের পর মানবজন্ম লাভ হয় এবং এই মানবজন্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী

জীবনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে গড়ে তোলা। এই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) বলা হয়েছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

"যারা দেবতাদের আরাধনা করে তারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়; যারা ভূত-প্রেত পূজা করে; তারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়; যারা পিতৃপুরুষের পূজা করে, তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়; আর যারা আমার আরাধনা করে, তারা আমার কাছে ফিরে আসে।" সুতরাং, দেবতাদের আলয় স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়, পিতৃলোকে উন্নীত হওয়া যায়, এই পৃথিবীতে থাকা যায়, অথবা আমাদের আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া যায়। এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) আরও বলা হয়েছে—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।* যিনি তত্ত্বগতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পেরেছেন, তাঁকে পুনরায় এই জগতে ফিরে এসে আর একটি জড় দেহ ধারণ করতে হয় না, পক্ষান্তরে তিনি ভগবানের কাছে ফিরে যান। শাস্ত্রে এই সমস্ত তথ্য রয়েছে এবং মানুষকে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দেওয়া উচিত। এই জন্মে ভগবৎ-ধামে ফিরে না যেতে পারলেও বৈদিক সংস্কৃতি অন্ততপক্ষে পশুজীবনে অধঃপতিত হওয়ার পরিবর্তে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দান করে। বর্তমানকালে মানুষ যথাযথভাবে শিক্ষা পাচ্ছে না বলে এই মহৎ বিজ্ঞান তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। আধুনিক যুগের মানব-সমাজের এমনই সংকটজনক অবস্থা। তাই, বুদ্ধিমান মানুষদের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে পরিচালিত করার একমাত্র ভরসা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন।

শ্লোক ৪৪

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন ।
ফল-ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জন ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি কেবল একজন সাধারণ মালী মাত্র। আমার রাজ্য নেই, ধনসম্পদও নেই। আমার রয়েছে কেবল কিছু ফল আর ফুল, তাই সেগুলি নিবেদন করে আমি পুণ্য অর্জন করতে চাই।

তাৎপর্য

মানব-সমাজের উপকার সাধনকল্পে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে ধন-সম্পদহীন ব্যক্তিরূপে উপস্থাপন করে দেখিয়ে গেছেন যে, মানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে মানুষকে ধনী বা প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হতে হবে না। অনেক সময় ধনী মানুষেরা মানব-সমাজের কিছু উপকার সাধন করে গর্বিত বোধ করেন যে, তাঁরাই কেবল মানুষের উপকার করতে পারেন, অন্যরা পারেন না। তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, বৃষ্টির অভাবে

ভারতবর্ষে যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন কিছু ধনী লোক সরকারের সাহায্য নিয়ে বিরাট আয়োজন করে অত্যন্ত গর্বভরে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেন, যেন তাঁদের এই কার্যকলাপের ফলে মানুষের পরম মঙ্গল সাধিত হবে। কিন্তু খাদ্যশস্যই যদি না থাকে, তা হলে ধনী লোকেরা কি বিতরণ করবে? খাদ্যশস্যের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। যদি বৃষ্টি না হয়, তা হলে শস্য উৎপন্ন হবে না এবং তখন তথাকথিত ধনী লোকেরা মানুষকে খাদ্যশস্য বিতরণ করতে পারবে না।

তাই, জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, ভগবদ্ভক্তি এমনই মঙ্গলপ্রদ যে, তা প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ও হিতসাধন করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন যে, মানব-সমাজে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করতে হলে ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির প্রয়োজন নেই। এই কৌশলটি যদি কেউ জানেন, তা হলে তিনি মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার সাধন করতে পারবেন। মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব একটা ধনী নন, তবুও তাঁর কাছে ফল ও ফুল রয়েছে। যে কেউই একটু ফল ও ফুল সংগ্রহ করে ভক্তি সহকারে ভগবানকে তা নিবেদন করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেন। সেই নির্দেশ *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) দেওয়া হয়েছে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

ষড়ৈশ্বর্য বা বড় বড় উপাধির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায় না, কিন্তু একটু ফল, ফুল, পাতা ও জল দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ভগবান বলেছেন, কেউ যদি ভক্তি সহকারে সেগুলি তাঁকে নিবেদন করে, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং আহার করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন আহার করেন, তখন সমস্ত জগৎ সন্তুষ্ট হয়। *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আহার করার মাধ্যমে দুর্বাসা মুনির ষাট হাজার শিষ্য তৃপ্ত হয়েছিলেন। তাই আমাদের জীবনের দ্বারা (*প্রাণৈঃ*), ধন-সম্পদের দ্বারা (*অর্থৈ*), বুদ্ধির দ্বারা (*ধিয়া*) অথবা বাক্যের দ্বারা (*বাচা*) আমরা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত জগৎ সুখী হবে। তাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে আমাদের কর্মের দ্বারা, অর্থের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। এটি অত্যন্ত সহজ। এমন কি কারও যদি ধনসম্পদ না থাকে, তাতে কিছু যায় আসে না, কেন না ধনসম্পদ ছাড়াই সকলের কাছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করা যায়। আমরা যে কোন জায়গায় যেতে পারি, যে কোন বাড়িতে যেতে পারি এবং সকলকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে অনুরোধ করতে পারি। এভাবেই সমস্ত জগতে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

শ্লোক ৪৫

মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে ।
সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও আমি মালী, তবুও আমি বৃক্ষ হতে ইচ্ছা করলাম, কেন না বৃক্ষ থেকে সমস্ত প্রাণীর উপকার হয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন মানব-সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকারী ব্যক্তি, কেন না তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে কিভাবে জীবকে সুখী করা যায়। জীবগণকে দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্যই তাঁর সংকীর্তন আন্দোলন। তিনি নিজে বৃক্ষ হতে ইচ্ছা করেছেন, কেন না বৃক্ষ হচ্ছে সব চাইতে পরোপকারী প্রাণী। *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/২২/৩৩) থেকে উদ্ধৃত পরবর্তী শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৃক্ষের প্রশংসা করেছেন।

শ্লোক ৪৬

অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্ ।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৪৬ ॥

অহো—আহা, দেখ; **এষাম্**—এই বৃক্ষসমূহের; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **জন্ম**—জন্ম; **সর্ব**—সমস্ত; **প্রাণি**—জীবদের; **উপজীবিনাম্**—যিনি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরবরাহ করেন; **সুজনস্য ইব**—মহান ব্যক্তিদের মতো; **যেষাম্**—যার কাছ থেকে; **বৈ**—অবশ্যই; **বিমুখাঃ**—বিমুখ; **যান্তি**—চলে যায়; **ন**—কখনও না; **অর্থিনঃ**—যে কোন কিছু প্রার্থনা করে।

অনুবাদ

" 'দেখ, কিভাবে এই বৃক্ষসমূহ প্রতিটি জীবের পালন পোষণ করছে। তাদের জন্ম সফল। তাদের আচরণ ঠিক একজন মহাপুরুষের মতো, কেন না বৃক্ষের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে কেউ নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না।"

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে ক্ষত্রিয়দের মহাপুরুষ বলে বিবেচনা করা হত, কেন না ক্ষত্রিয় রাজার কাছে কেউ কোন কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি কখনও বিমুখ করতেন না। সেই সমস্ত মহান ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা করা হয়েছে, কেন না বৃক্ষের কাছ থেকে সকলেই সব রকমের উপকার লাভ করে—কেউ তার কাছ থেকে ফল গ্রহণ করে, কেউ ফুল গ্রহণ করে, কেউ পাতা গ্রহণ করে, কেউ ডালপালা গ্রহণ করে এবং কেউ গাছটিকে কেটেও ফেলে, কিন্তু তবুও কোন রকম প্রতিবাদ না করে বৃক্ষ সকলকে সব কিছু দান করে।

মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতার আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে কোন রকম বিবেচনা না করে গাছ কেটে ফেলা। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হচ্ছে মিলে কাগজ তৈরি করার জন্য, আর সেই কাগজ দিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্য অর্থহীন সমস্ত বই, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ছাপা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত, যদিও কাগজের মিলের মালিকেরা হয়ত এখন

বেশ সুখেই আছে, কিন্তু তারা জানে না যে, অনর্থক এই সমস্ত বৃক্ষগুলিকে হত্যা করার ফল তাদের ভোগ করতে হবে।

বস্ত্রহরণ লীলান্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা গোপবালকদের সঙ্গে বহু দূর গমন করে গাছের তলায় বসে যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন বৃক্ষসমূহের পরোপকার ও সহিষ্ণুতা দর্শন করে তিনি তাঁর সখাদের এই কথাগুলি বলেছিলেন। এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরাও যেন বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু ও পরোপকারী হই। অভাবগ্রস্ত লোক যখন বৃক্ষের তলায় এসে প্রার্থনা করে, তখন সে সব কিছুই প্রদান করে। বৃক্ষের কাছ থেকে এবং অন্যান্য পশুদের কাছ থেকে মানুষ অনেক উপকার গ্রহণ করে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে যে, তারা সেই সমস্ত উপকারী বৃক্ষগুলিকে কেটে ফেলছে এবং সমস্ত পশুগুলিকে হত্যা করছে। এগুলি তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার পাপের কতকগুলি নিদর্শন।

শ্লোক ৪৭

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার ।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে এই আজ্ঞা পেয়ে বৃক্ষের বংশধরেরা (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা) পরম আনন্দিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা হচ্ছে যে, আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপে জগতের পরম মঙ্গল সাধনকারী যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা যেন সমস্ত জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তথাকথিত বহু অনুগামী রয়েছে, যারা একটি মন্দির বানিয়ে, ভাল করে খাবার জন্য আর ঘুমোবার জন্য বিগ্রহ দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট থাকে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কিন্তু নিজেরা সেই কর্ম সম্পাদন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হলেও, অন্য কাউকে সে কাজ করতে দেখলে তারা ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আধুনিক অনুগামীদের এমনই দুর্দশা। কলিযুগের প্রভাব এতই প্রবল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তথাকথিত অনুগামীরা পর্যন্ত তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা, কেন না সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা। তৃণের থেকে সুনীচ হয়ে এবং তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ৪৮

যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল ।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবৎ-প্রেমের ফল এতই সুস্বাদু যে, ভগবদ্ভক্তেরা যেখানেই এবং যার কাছেই তা বিতরণ করেন, সেই ফল আস্বাদন করে মানুষ তৎক্ষণাৎ মত্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক ভগবৎ-প্রেমের অপূর্ব ফল বিতরণ করার বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা নিজেরাও দেখেছি যে, কেউ যখন এই ফল গ্রহণ করে ঐকান্তিকভাবে তার স্বাদ আস্বাদন করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সব রকম বদভ্যাস ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দানের প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে থাকেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* বর্ণনা এতই ব্যবহারিক যে, যে কেউই তা আস্বাদন করে দেখতে পারেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** প্রচারের মাধ্যমে ভগবৎ-প্রেমরূপ মহা ফল বিতরণ করার সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৪৯

মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায় ।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদত্ত প্রেমফল এমনই এক মহামাদক যে, কেউ যখন পেট ভরে তা খায়, তৎক্ষণাৎ তার প্রভাবে সে মাতাল হয়ে যায় এবং সে আপনা থেকেই কীর্তন করে, নৃত্য করে, হাসে এবং গান করে।

শ্লোক ৫০

কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার ।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

উন্মত্ত হয়ে কেউ গড়াগড়ি যায়, কেউ হুঙ্কার করে, তা দেখে মহান মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দিত হয়ে হাসেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মনোভাব কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারকারী কৃষ্ণভক্তদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি রবিবার

আমরা রবিবাসরীয় প্রীতিভোজের আয়োজন করি। আমরা যখন দেখি যে, মানুষ সেখানে আসছে, কীর্তন করছে, নৃত্য করছে, প্রসাদ গ্রহণ করছে এবং আনন্দিত হয়ে গ্রন্থাবলী কিনছে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এই ধরনের অপ্রাকৃত কার্যকলাপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্যই উপস্থিত রয়েছেন এবং তা দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হচ্ছেন ও আনন্দিত হচ্ছেন। তাই, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে এই আন্দোলনকে আরও বেশি করে প্রসারিত করা, যাতে মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাবদান্য দান গ্রহণ করতে পারে। তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হয়ে মৃদু হাস্য সহকারে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন এবং তাঁর কৃপা বর্ষণ করবেন। তার ফলে এই আন্দোলন সফল হবে।

শ্লোক ৫১

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল ।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

মহান মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সেই প্রেমফল খান এবং তার ফলে তিনি নিরন্তর মত্ত হয়ে থাকেন, যেন তিনি সম্পূর্ণ অসহায় ও বিহ্বল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার* (*চৈঃ চঃ আদি* ৪/৪১)। প্রথমে নিজেকে আচরণ করতে হবে এবং তারপর শিক্ষা দিতে হবে। সেটিই হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য। যে বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন, সেই বিষয় সম্বন্ধে নিজেই যদি না জানেন, তা হলে তার শিক্ষা কার্যকরী হবে না। তাই কেবল চৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে জানলেই হবে না, ব্যবহারিকভাবে জীবনে তার প্রয়োগও করতে হবে।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও কখনও মূর্ছিত হয়ে পড়তেন এবং বহুক্ষণ অচেতন হয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* (৭) প্রার্থনা করেছেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

"হে গোবিন্দ! তোমার বিরহে এক নিমেষকে আমার এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। বর্ষার ধারার মতো আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে এবং সমস্ত জগৎ আমার কাছে শূন্য বলে মনে হচ্ছে।" এটিই হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার এবং ভগবৎ-প্রেমের ফল ভক্ষণ করার চরম অবস্থা, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করে গিয়েছেন। কৃত্রিমভাবে এই অবস্থার অনুকরণ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, নিষ্ঠাভরে ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ভক্তির বিধিগুলির অনুসরণ করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত, তা হলেই যথাসময়ে

এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হবে। চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠবে, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাবার ফলে স্পষ্টভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করা যাবে না এবং গভীর আনন্দে হৃদয় উদ্বেলিত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, তা অনুকরণ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করা, তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি আপনা থেকেই তাঁর শরীরে প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ৫২

সর্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান ।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনের দ্বারা সকলকেই তাঁর মতো মত্ত করে তুললেন। আমরা এমন কোন লোককে খুঁজে পেলাম না, যে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়নি।

শ্লোক ৫৩

যে যে পূর্বে নিন্দা কৈল, বলি' মাতোয়াল ।
সেহো ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত মানুষ পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মাতাল বলে সমালোচনা করেছিল, তারাও সেই ফল খেয়ে নাচতে লাগল আর বলতে লাগল, "খুব ভাল! খুব ভাল!"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেন, তখন মায়াবাদী, নাস্তিক এবং মূর্খরা তাঁকেও অনর্থক সমালোচনা করেছিল। সেই ধরনের মানুষেরা যে আমাদেরকেও সমালোচনা করছে, সেটি স্বাভাবিক। এই ধরনের মানুষ সব সময় থাকবে এবং তারা সব সময়ই মানব-সমাজের যথার্থ কল্যাণ সাধনকারীদের সমালোচনা করবে। কিন্তু সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচারকদের এই ধরনের সমালোচনার দ্বারা ব্যথিত হলে চলবে না। এই ধরনের মূর্খদের ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করার পন্থা হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে কীর্তন করার জন্য নিমন্ত্রণ জানানো। এটিই আমাদের কৌশল হওয়া উচিত। আমাদের এই আন্দোলনে যে যোগদান করতে আসে, তাকে অবশ্যই পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক হতে হবে, তবেই এই প্রকার ব্যক্তি কেবলমাত্র আমাদের সান্নিধ্যে এসে, আমাদের সঙ্গে কীর্তন করে, নৃত্য করে এবং প্রসাদ গ্রহণ করে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে, এই আন্দোলন সত্যিই অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু যে জাগতিক সুখ-সুবিধা লাভের আশায় অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করে, সে কখনই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ৫৪

এই ত' কহিলুঁ প্রেমফল-বিতরণ ।
এবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

এতক্ষণ আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমফল বিতরণের বর্ণনা করলাম। এখন আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী বৃক্ষের বিভিন্ন শাখার বর্ণনা করব, দয়া করে আপনারা তা শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৫৫

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'ভক্তি-কল্পতরু' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যবৃক্ষের মূল স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যবৃক্ষের শাখাসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্য—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **পদাম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম; **মধুপেভ্যঃ**—মধুপানকারী মৌমাছিদেরকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **কথঞ্চিৎ**—কোন প্রকারে; **আশ্রয়াৎ**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **যেষাম্**—যাঁর; **শ্বা**—কুকুর; **অপি**—ও; **তৎ-গন্ধ**—সেই পদ্মফুলের গন্ধ; **ভাক্**—অংশীদার; **ভবেৎ**—হতে পারে।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের মধুপানকারী মৌমাছিসদৃশ ভক্তদের আমি পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি। কুকুরসদৃশ অভক্তেরা যদি কোনক্রমে এই ধরনের ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে সেও সেই পাদপদ্মের গন্ধ আস্বাদন করতে পারে।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে একটি কুকুরের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কুকুর সাধারণত কোন অবস্থাতেই ভক্ত হতে পারে না। কিন্তু তবুও দেখা যায় যে, ভক্তের কুকুর ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করছে। আমরা দেখি যে, কুকুর তুলসীবৃক্ষের প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। কুকুর সাধারণত তুলসীবৃক্ষে মূত্র ত্যাগ করে। তাই, কুকুর হচ্ছে সব চাইতে বড় অভক্ত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের এমনই ক্ষমতা যে, কুকুরসদৃশ অভক্তেরা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে ভক্তে পরিণত হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান গৃহস্থভক্ত শিবানন্দ সেন জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথে একটি কুকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই কুকুরটি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে এবং অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে যায় এবং মুক্ত হয়। তেমনই, শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের কুকুর-বিড়ালেরা পর্যন্ত মুক্তি লাভ করেছিল। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য পশুরা ভক্তে পরিণত হবে তা আশা করা যায় না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের প্রভাবে তারাও উদ্ধার পায়।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রের জয় হোক এবং শ্রীবাস আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয় হোক।

শ্লোক ৩

এই মালীর—এই বৃক্ষের অকথ্য কথন ।
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম-বিবরণ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

মালাকাররূপে ও বৃক্ষরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অচিন্ত্য তত্ত্ব। এখন সেই বৃক্ষের মুখ্য শাখাগুলির নাম ও বিবরণ শ্রবণ করুন।

শ্লোক ৪

চৈতন্য-গোসাঞির যত পারিষদচয় ।
গুরু-লঘু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু পার্ষদ, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তা বিচার করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫

যত যত মহান্ত কৈলা তাঁ-সবার গণন ।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত মহান ব্যক্তিরা তাঁদের গণনা করলেন, কিন্তু কেউ বিচার করতে পারলেন না কে বড় এবং কে ছোট।

শ্লোক ৬

অতএব তাঁ-সবারে করি' নমস্কার ।
নাম-মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

আমি দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার প্রণতি নিবেদন করি। আমি তাঁদের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন আমার কোন অপরাধ না নেন।

শ্লোক ৭

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্ ।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥ ৭ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **প্রেম-অমর-তরোঃ**—প্রেমামৃত কল্পবৃক্ষের; **প্রিয়ান্**—প্রিয় ভক্তদের; **শাখা-রূপান্**—শাখারূপী; **ভক্ত-গণান্**—সমস্ত ভক্তদের; **কৃষ্ণ-প্রেমফল-প্রদান্**—কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল প্রদানকারী।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফলদাতা শাখারূপ সমস্ত ভক্তদের আমি বন্দনা করি।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উচ্চ-নীচ বিচার না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকারী ভক্তদের প্রণতি নিবেদন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বলে নিজেদের পরিচয় প্রদানকারী কিছু মূর্খ লোক বড়-ছোট বিচার করে। যেমন, 'প্রভুপাদ' উপাধিটি গুরুদেবকে দেওয়া হয়, বিশেষ করে বিশিষ্ট গুরুদেবকে, যেমন—শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ অথবা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ। তেমনই, আমাদের শিষ্যরা যখন তাদের গুরুদেবকে প্রভুপাদ বলে সম্বোধন করতে চায়, তখন কিছু মূর্খ লোক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা বলে, যেহেতু তাদের গুরু-মহারাজকে তারা প্রভুপাদ বলে সম্বোধন করে, তাই আর কেউ এই উপাধিটি গ্রহণ করতে পারবেন না। সারা পৃথিবী জুড়ে যে কিভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার হয়েছে এই কথা বিচার না করে, কেবল মাৎসর্যের বশবর্তী হয়ে এই সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা একটি দল তৈরি করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে হেয় করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত মূর্খদের তিরস্কার করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টভাবে বলেছেন, *কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম*। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারক, তাঁদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাপরায়ণ হতে হবে। একজন প্রচারককে বড় বলে মনে করে এবং আর একজন প্রচারককে ছোট বলে মনে করে, ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। এই ভেদবুদ্ধি জড়-জাগতিক এবং চিন্ময় স্তরে এই ধরনের ভেদবুদ্ধির কোন অবকাশ নেই। তাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারকদের চৈতন্যবৃক্ষের শাখারূপে বর্ণনা করে, তাঁদের সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এই চৈতন্যবৃক্ষের একটি শাখা এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তদের উচিত এই শাখাটির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া।

শ্লোক ৮

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত ।
দুই ভাই—দুই শাখা, জগতে বিদিত ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত, এই দুই ভাই হচ্ছেন চৈতন্যবৃক্ষের দুটি শাখা, যা সমস্ত জগতে বিদিত।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৯০) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীবাস পণ্ডিত হচ্ছেন নারদ মুনির অবতার এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত হচ্ছেন নারদ মুনির এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু পর্বত মুনির অবতার। শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রী মালিনী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যদানকারী অম্বিকা নাম্নী ধাত্রীর অবতার বলে পরিচিত। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের* গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা নারায়ণী হচ্ছেন কৃষ্ণলীলায় অম্বিকার ভগ্নী। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের* বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিত খুব সম্ভবত মহাপ্রভুর বিরহে নবদ্বীপ ত্যাগ করে কুমারহট্টে বসতি স্থাপন করেন।

শ্লোক ৯-১০

শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর ।
চারি ভাইর দাস-দাসী, গৃহ-পরিকর ॥ ৯ ॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন ।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সংকীর্তন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীপতি ও শ্রীনিধি হচ্ছেন তাঁর আর দুজন সহোদর। এই চার ভাইয়ের দাস-দাসী, গৃহ-পরিবার সেই দুটি শাখার উপশাখা বলে গণনা করা হয়। এই শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিরন্তর সংকীর্তন করেন।

শ্লোক ১১

চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা ।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

এই চার ভাই সবংশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেন। গৌরচন্দ্র ছাড়া তাঁরা আর অন্য কোন দেব-দেবীকে জানেন না।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *অন্য-দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই, এই ভক্তি পরম-কারণ*—কেউ যদি ভগবানের একনিষ্ঠ, শুদ্ধ ভক্ত হতে চান, তা হলে তাঁর অন্য কোন দেব-দেবীর শরণাগত হওয়া উচিত নয়। মূর্খ মায়াবাদীরা বলে যে, দেব-দেবীদের

পূজা করা আর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা এক, কিন্তু সেই কথা সত্য নয়। এই দর্শন মানুষকে নিরীশ্বরবাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। যারা ভগবান সম্বন্ধে কিছুই জানে না তারাই মনে করে যে, যে কোন একটি কল্পিত রূপ বা যে কোন মূর্খ পাষণ্ডীকে ভগবান বলে গ্রহণ করা যায়। এই ধরনের সস্তা ভগবান অথবা ভগবানের অবতারকে গ্রহণ করা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতা। তাই বুঝতে হবে যে, যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে অথবা ভুঁইফোড় অবতারদের পূজা করে, তারা সকলেই নাস্তিক। *ভগবদ্গীতার* (৭/২০) বর্ণনা অনুসারে তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—"জড়-জাগতিক কামনা বাসনার প্রভাবে যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাগত হয়।" দুর্ভাগ্যবশত, যারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করেনি এবং যথাযথভাবে বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেনি, তারাই যে কোন পাষণ্ডীকে ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করে এবং তাদের মতবাদ হচ্ছে যে, কেবলমাত্র দেব-দেবীর পূজা করেই ভগবানের অবতার হওয়া যায়। হিন্দু-ধর্মের নামে সমস্ত জগাখিচুড়ি চলছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তা সমর্থন করে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা তার তীব্র নিন্দা করি। এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজাকে এবং তথাকথিত সমস্ত অবতারের পূজাকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে এক বলে মনে করা কখনই উচিত নয়।

শ্লোক ১২

'আচার্যরত্ন' নাম ধরে বড় এক শাখা ।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

আর এক বড় শাখা হচ্ছেন আচার্যরত্ন এবং তাঁর পরিকরেরা হচ্ছেন সেই শাখার উপশাখা।

শ্লোক ১৩

আচার্যরত্নের নাম 'শ্রীচন্দ্রশেখর' ।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্যরত্নের আর একটি নাম হচ্ছে শ্রীচন্দ্রশেখর। তাঁর গৃহে এক নাটকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্মীদেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস কালে নাটকেরও অভিনয় হত। তবে সেই নাটকের সমস্ত অভিনেতা ছিলেন শুদ্ধ ভক্ত এবং বাইরের লোকেরা তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তদের উচিত এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা। যখন তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে নাটকের অভিনয় করেন,

তখন অভিনেতা অবশ্যই শুদ্ধ ভক্ত হতে হবে। পেশাদারী অভিনেতা ও নাট্যকারদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই এবং তাই তারা খুব ভাল অভিনেতা হলেও, তাদের অভিনয় সম্পূর্ণ প্রাণহীন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ধরনের অভিনেতাদের বলতেন *যাত্রাদলে নারদ*। কখনও কখনও যাত্রা দলের কোন অভিনেতা নারদ মুনির ভূমিকায় অভিনয় করে, যদিও তার ব্যক্তিগত আচরণ কোনমতেই নারদ মুনির মতো নয়, কেন না সে ভক্ত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধীয় নাটকে এই ধরনের অভিনেতাদের কোন প্রয়োজন নেই।

অদ্বৈত প্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর ও অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাটক অভিনয় করতেন। যে স্থানে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি ছিল, সেই জায়গাটি এখন ব্রজপত্তন নামে পরিচিত। সেখানে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মঠের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য তা জানতে পারেন এবং তাই কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছ থেকে মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই প্রথম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বহু গুরুত্বপূর্ণ লীলায় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি চৈতন্যবৃক্ষের দ্বিতীয় শাখা।

শ্লোক ১৪

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড়শাখা জানি ।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় বড় শাখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নাম নিয়ে কখনও কখনও কাঁদতেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৫৪) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে কৃষ্ণলীলায় শ্রীমতী রাধারাণীর পিতা মহারাজ বৃষভানু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পিতা ছিলেন বাণেশ্বর, আবার অন্য কারও মতে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, আর তাঁর মাতার নাম ছিল গঙ্গাদেবী। কারও মতে বাণেশ্বর ছিলেন শ্রীশিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশধর। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পিতা ঢাকা জেলার বাঘিয়া গ্রামনিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর বিপ্র ছিলেন বলে সেখানকার রাঢ়ীয় বিপ্রসমাজ তাঁকে গ্রহণ করেননি। সেই জন্যই তাঁর বংশধরেরা একঘরে হয়ে সমাজের একঘরে লোকেদেরই যাজন করে আসছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন, "এই পরিবারের এক বংশধর সরোজানন্দ গোস্বামী নাম ধারণপূর্বক বৃন্দাবনে অবস্থান করছেন। এই বংশের একটি বিশেষত্ব এই যে, ভ্রাতাদের মধ্যে একজনেরই পুত্র জন্মায়। অন্যান্য ভ্রাতাদের হয়ত কন্যা জন্মগ্রহণ করে, নয়তো আদৌ সন্তান আদি হয় না। এই জন্য এই বংশটি তত বিস্তৃতি লাভ করেনি। চট্টগ্রামের ছয় ক্রোশ উত্তরে হাটহাজারি নামে একটি থানা আছে। তার এক ক্রোশ পূর্বে মেখলা গ্রামে তাঁর পূর্ব নিবাস ছিল। চট্টগ্রাম শহর থেকে স্থলপথে ঘোড়ায় চড়ে বা গরুর গাড়িতে চড়ে, অথবা জলপথে নৌকা বা স্টীমারযোগে মেখলা গ্রামে যাওয়া যায়। স্টীমার যাবে অন্নপূর্ণার ঘাট পর্যন্ত এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্মস্থান অন্নপূর্ণার ঘাট থেকে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি যে মন্দির তৈরি করেছেন, সেটি এখন অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণ। সংস্কার না হলে এই মন্দিরটি অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে। মন্দিরের গায়ে ইটের ফলকে দুটি শ্লোক খোদিত আছে, কিন্তু সেগুলি এত প্রাচীন যে, তা পড়া যায় না। এই মন্দির থেকে দক্ষিণে প্রায় দুশো গজ দূরে আর একটি মন্দির রয়েছে এবং প্রবাদ আছে যে, সেটি হচ্ছে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি কর্তৃক নির্মিত পুরাতন মন্দির।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'পিতা' বলতেন এবং তিনি তাঁকে প্রেমনিধি উপাধি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গদাধর পণ্ডিতের গুরু হয়েছিলেন এবং স্বরূপ দামোদরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিলেন। গদাধর পণ্ডিত প্রথমে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে একজন বিষয়ী বলে ভুল করেছিলেন। কিন্তু পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সেই ভুল সংশোধন করেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির লীলার আর একটি সুন্দর ঘটনা হচ্ছে জগন্নাথ মন্দিরের পূজারীদের তিনি সমালোচনা করেছিলেন এবং সেই জন্য জগন্নাথদেব স্বয়ং তাঁকে তিরস্কার করেন, তাঁর গালে চাপড় মারেন। *চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* দশম অধ্যায়ে সেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আমাদের বলেছেন যে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দুজন বংশধর এখনও বর্তমান আছেন। তাঁদের নাম হরকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার। আরও অধিক তথ্যের জন্য *বৈষ্ণবমঞ্জুষা* নামক অভিধান আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৫

বড় শাখা,—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি ।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্থ শাখা গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তাঁর সমান কেউ নেই।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৪৭-৫৩) বর্ণনা করা হয়েছে, "পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বৃন্দাবনেশ্বরী নামে পরিচিতা ছিলেন, এখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীগদাধর পণ্ডিতরূপে প্রকাশিত হয়েছেন।" শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী দ্বারা নির্ণীত হয়েছে যে,

লক্ষ্মীরূপা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি পূর্বে শ্যামসুন্দর-বল্লভা নামে ভগবানের অতি প্রিয়া ছিলেন। সেই শ্যামসুন্দর-বল্লভা এখন শ্রীচৈতন্যলীলায় গদাধর পণ্ডিতরূপে বিরাজ করছেন। পূর্বে শ্রীললিতা সখীরূপে তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর অত্যন্ত অনুগতা ছিলেন। এভাবেই শ্রীগদাধর পণ্ডিত যুগপৎভাবে শ্রীমতী রাধারাণীর ও ললিতা সখীর অবতার। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার* দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য,—তাঁর উপশাখা ।
এইমত সব শাখা-উপশাখার লেখা ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শিষ্য ও উপশিষ্যেরা হচ্ছেন তাঁর উপশাখা। এভাবেই সমস্ত শাখা-উপশাখার বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয় ভৃত্য ।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চম শাখা বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। তিনি একভাবে বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে নৃত্য করতে পারতেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৭১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বক্রেশ্বর পণ্ডিত হচ্ছেন বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন)-এর অন্তর্গত অনিরুদ্ধের অবতার। তিনি বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে অপূর্ব সুন্দরভাবে নৃত্য করতে পারতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন মুখ্য নর্তক এবং তিনি একভাবে বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীগোবিন্দ দাস নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক উড়িয়া ভক্ত *গৌরকৃষ্ণোদয়* নামক গ্রন্থে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন। উড়িষ্যায় বক্রেশ্বর পণ্ডিতের বহু শিষ্য রয়েছে এবং তাঁরা উড়িয়া হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত। তাঁর এই শিষ্যদের মধ্যে শ্রীগোপালগুরু এবং তাঁর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোসাঞি বিখ্যাত।

শ্লোক ১৮

আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে ।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নৃত্যকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং গান করেছিলেন। তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়ে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৯

"দশসহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ' চন্দ্রমুখ ।
তারা গায়, মুঞি নাচোঁ—তবে মোর সুখ ॥" ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"হে চন্দ্রমুখ! দয়া করে আমাকে দশ সহস্র গন্ধর্ব দাও। তারা গান করুক আর আমি নাচি, তা হলেই আমি মহা সুখী হব।"

তাৎপর্য

গন্ধর্বেরা হচ্ছেন স্বর্গীয় গায়ক। স্বর্গলোকে যখন উৎসব হয়, তখন গন্ধর্বদের গান করার জন্য ডেকে আনা হয়। গন্ধর্বেরা একভাবে বহুদিন ধরে গান করতে পারে, তাই বক্রেশ্বর পণ্ডিত চেয়েছিলেন, তারা গান করুক এবং তিনি নাচবেন।

শ্লোক ২০

প্রভু বলে—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা ।
আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তদুত্তরে বলেছিলেন, "তুমি হচ্ছ আমার একটি পাখা, আমার যদি আর একটি পাখা থাকত, তা হলে আমি অবশ্যই আকাশে উড়তে পারতাম!"

শ্লোক ২১

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের ষষ্ঠ শাখা জগদানন্দ পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণস্বরূপ। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার অবতার বলে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর এবং বিশেষ করে শ্রীবাস পণ্ডিত ও চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর সমস্ত লীলায় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

শ্লোক ২২

প্রীত্যে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন ।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

জগদানন্দ পণ্ডিত (সত্যভামার অবতাররূপে) সব সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখতেন। কিন্তু মহাপ্রভু যেহেতু সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই জগদানন্দ পণ্ডিতের দেওয়া ঐশ্বর্য তিনি গ্রহণ করতেন না।

শ্লোক ২৩

দুইজনে খট্‌মটি লাগায় কোন্দল ।
তাঁর প্রীত্যের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও মনে হত তাঁরা যেন ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছেন, কিন্তু তাঁদের সেই প্রীতির কথা আমি পরে বর্ণনা করব।

শ্লোক ২৪

রাঘব-পণ্ডিত—প্রভুর আদ্য-অনুচর ।
তাঁর এক শাখা মুখ্য,—মকরধ্বজ কর ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদি অনুচর রাঘব পণ্ডিত হচ্ছেন সপ্তম শাখা। তাঁর থেকে প্রকাশিত একটি মুখ্য উপশাখা হচ্ছেন মকরধ্বজ কর।

তাৎপর্য

মকরধ্বজের উপাধি ছিল কর। বর্তমানে এই উপাধিটি কায়স্থদের মধ্যে দেখা যায়। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৬৬) বর্ণনা করা হয়েছে—

ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্‌ব্রজেঽমিতাম্ ।
সৈব সাম্প্রতং গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ ॥

"কৃষ্ণলীলায় রাঘব পণ্ডিত ছিলেন ব্রজের ধনিষ্ঠা নামক এক অন্তরঙ্গা গোপী। এই গোপী ধনিষ্ঠা সব সময় কৃষ্ণের ভোগ্যসামগ্রী তৈরি করতেন।"

শ্লোক ২৫

তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী ।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তী ছিলেন মহাপ্রভুর প্রিয় দাসী। তিনি বারো মাস বিভিন্ন ভোগ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য রান্না করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "*গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৬৭) বলা হয়েছে, *গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা*—'গুণমালা নামক ব্রজের গোপিকা এখন রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী দময়ন্তীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন।' শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সোদপুর স্টেশন, সেখান থেকে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটী গ্রামে রাঘব পণ্ডিত বাস করতেন। সেখানে রাঘব পণ্ডিতের সমাধির উপর লতাকুঞ্জে বেষ্টিত একটি উচ্চ বেদি বাঁধানো হয়েছে। যেখানে সমাধি, তারই উত্তর দিকে একটি ভগ্নপ্রায় জীর্ণ গৃহে সেবিত শ্রীমদনমোহন বিগ্রহ বিরাজমান। পাণিহাটীর বর্তমান জমিদার শ্রীশিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে এই সেবার বন্দোবস্ত চলছে। মকরধ্বজ করও পাণিহাটীর অধিবাসী ছিলেন।"

শ্লোক ২৬

সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া ।
রাঘব লইয়া যা'ন গুপত করিয়া ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন, তখন দময়ন্তী তাঁর জন্য যা রান্না করতেন, তা একটি ঝুলিতে করে সকলের অগোচরে রাঘব পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিয়ে যেতেন।

শ্লোক ২৭

বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার ।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

সারা বছর ধরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করতেন। সেই ঝুলি আজও 'রাঘবের ঝালি' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্লোক ২৮

সে-সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

রাঘব পণ্ডিতের সমস্ত সামগ্রীর কথা আমি পরে বর্ণনা করব। সেই বর্ণনা শুনে ভক্তরা সাধারণত কাঁদেন এবং তাঁদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে *রাঘবের ঝালির* সুন্দর বর্ণনা রয়েছে।

শ্লোক ২৯

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত গঙ্গাদাস ।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ববন্ধ-নাশ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় গঙ্গাদাস পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যবৃক্ষের অষ্টম শাখা, যাঁকে স্মরণ করলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩০

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য পুরন্দর ।
পিতা করি' যাঁরে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

নবম শাখা শ্রীআচার্য পুরন্দর ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করতেন।

তাৎপর্য

চৈতন্য-ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখনই রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে যেতেন, তখন তিনি পুরন্দর আচার্যের গৃহেও যেতেন। পুরন্দর আচার্য সব চাইতে ভাগ্যবান, কেন না ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করে গভীর অনুরাগ সহকারে আলিঙ্গন করতেন।

শ্লোক ৩১

দামোদরপণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড ।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের দশম শাখা দামোদর পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি প্রেম এত প্রবল ছিল যে, তিনি এক সময় কঠোর বাক্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শাসন করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শাসন করতেন, সেই কথা পরে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। তার সেই বাক্যদণ্ডে অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দামোদর পণ্ডিত, পূর্বলীলায় যিনি ছিলেন বৃন্দাবনের শৈব্যা, তিনি শচীমাতার কাছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তা বহন করে নিয়ে যেতেন এবং রথযাত্রা মহোৎসবের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে শচীমাতার বার্তা বহন করে নিয়ে আসতেন।

শ্লোক ৩৩

তাঁহার অনুজ শাখা—শঙ্করপণ্ডিত ।
'প্রভু-পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের একাদশ শাখা হচ্ছেন দামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শঙ্কর পণ্ডিত। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদুকা নামে বিখ্যাত ছিলেন।

শ্লোক ৩৪

সদাশিবপণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের দ্বাদশ শাখা সদাশিব পণ্ডিত সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকতেন। তাঁর পরম সৌভাগ্যের ফলে নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে তাঁর গৃহে বাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের নবম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সদাশিব পণ্ডিত ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত এবং নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর গৃহে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী ।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'নৃসিংহানন্দ' করি' ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োদশ শাখা হচ্ছেন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। তিনি নৃসিংহদেবের উপাসক ছিলেন, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নাম দিয়েছিলেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত ছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁর নাম পরিবর্তন করে নৃসিংহানন্দ নাম রেখেছিলেন। পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি থেকে শিবানন্দের বাড়ি যাওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাই, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী তিনটি বিগ্রহের জন্য ভোগ সংগ্রহ করতেন, যথা—জগন্নাথ, নৃসিংহদেব ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায়* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৮ থেকে ৭৮ শ্লোকে তা বর্ণিত হয়েছে। কুলিয়া থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে যাচ্ছেন শুনে, নৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত একটি পথ প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে যায় এবং তিনি অন্যান্য ভক্তদের বলেন যে, এবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে না গিয়ে কানাই-এর নাটশালা নামক একটি জায়গা পর্যন্ত যাবেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার* প্রথম পরিচ্ছেদে ১৫৫ থেকে ১৬২ পর্যন্ত শ্লোকে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৭৪) বর্ণনা করা হয়েছে, *আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকে*—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্র বা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর নাম পরিবর্তন করে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নাম রাখলেন, কেন না তাঁর হৃদয়ে নৃসিংহদেব প্রকাশিত হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, নৃসিংহদেব সরাসরিভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

শ্লোক ৩৬

নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার ।
চৈতন্যচরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্দশ শাখা নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত উদার ভক্ত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ব্যতীত আর কোন আশ্রয়ের কথা তিনি জানতেন না।

তাৎপর্য

নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন শ্রীবাস ঠাকুরের একজন পার্ষদ। *চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* অষ্টম অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের ভাই শ্রীরাম পণ্ডিতসহ জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা—প্রভুর নিজ ভৃত্য ।
দেউটি ধরেন, যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চদশ শাখা হচ্ছেন শ্রীমান পণ্ডিত, যিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ। মহাপ্রভু যখন নৃত্য করতেন, তখন তিনি মশাল ধরতেন।

তাৎপর্য

শ্রীমান পণ্ডিত ছিলেন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম কীর্তনের সঙ্গী। দেবীভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন এবং নবদ্বীপের রাস্তায় নৃত্য করতেন, তখন শ্রীমান পণ্ডিত মশাল ধরেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্ ।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

ষোড়শ শাখা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কাছ থেকে খাবার ভিক্ষা করতেন, কখনও কখনও তিনি তাঁর কাছ থেকে জোর করে খাবার ছিনিয়ে নিয়ে খেতেন।

তাৎপর্য

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম কীর্তনের সঙ্গী। দীক্ষা গ্রহণের পর গয়া থেকে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর গৃহে ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে কৃষ্ণের কথা শুনবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নবদ্বীপবাসীদের কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করতেন, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সেই অন্ন পরমানন্দে ভোজন করতেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৯১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় তিনি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করে, সেই লীলারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

নন্দন-আচার্য-শাখা জগতে বিদিত ।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের সপ্তদশ শাখা নন্দন আচার্য ছিলেন নবদ্বীপবাসী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনের সঙ্গী। কোন এক সময়ে প্রভুদ্বয় (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু) নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপে কীর্তন-লীলাসঙ্গীদের মধ্যে শ্রীনন্দন আচার্য ছিলেন অন্যতম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবধূতরূপে নানা তীর্থ ভ্রমণের পর, তাঁরই গৃহে প্রথমে এসে উপস্থিত হন। সেখানেই তিনি প্রথমে মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন। মহাপ্রকাশের দিন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নন্দন আচার্যের গৃহ থেকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে নিয়ে আসার জন্য রামাই পণ্ডিতকে পাঠিয়েছিলেন। সর্বান্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি নন্দন আচার্যের গৃহে লুকিয়ে আছেন। মহাপ্রভুও একদিন তাঁর গৃহে লুকিয়েছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* ষষ্ঠ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে সেই সকল কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪০

শ্রীমুকুন্দ-দত্ত শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী ।
যাঁহার কীর্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহপাঠী মুকুন্দ দত্ত ছিলেন চৈতন্যবৃক্ষের আর একটি শাখা। তাঁর কীর্তনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাচতেন।

তাৎপর্য

শ্রীমুকুন্দ দত্তের জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত ছনহরা গ্রামে। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট মেখলা গ্রাম থেকে কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৪০) বর্ণনা করা হয়েছে—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠমধুব্রতৌ ।
মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥

"বৃন্দাবনে মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামক দুজন সুগায়ক ছিলেন। চৈতন্যলীলায় তাঁরা মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনে গান করতেন।" বিদ্যাশিক্ষা কালে সহপাঠী মুকুন্দের সঙ্গে নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি নিয়ে কোন্দল করতেন। এই প্রসঙ্গ *চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। গয়া থেকে ফিরে আসার পর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মুকুন্দ *ভাগবতের* শ্লোক পড়ে আনন্দ দান করতেন। তাঁরই চেষ্টার ফলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* সপ্তম অধ্যায়ে সেই কথা বর্ণিত হয়েছে। মুকুন্দ দত্ত যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করতেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন নাচতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন একুশ ঘণ্টা ধরে *সাত-প্রহরিয়া* নামক ভাব প্রকাশ করেন, তখন মুকুন্দ দত্ত অভিষেক গেয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও কখনও *খড়জাঠিয়া বেটা* বলে মুকুন্দ দত্তকে তিরস্কার করতেন, কেন না তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর অভক্তদের অনুষ্ঠানে যেতেন। সেই কথা *চৈতন্য-ভাগবতের* মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন লক্ষ্মীবেশে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে নৃত্য করেন, তখন মুকুন্দ দত্ত প্রথমে গান ধরেছিলেন।

মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনার কথা নিত্যানন্দ প্রভুকে বলার পর, তিনি মুকুন্দ দত্তের গৃহে গিয়ে সেই কথা বলেন, তা শুনে মুকুন্দ দত্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কিছুদিন

নবদ্বীপে সংকীর্তন-লীলা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই কথা *চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* ষড়বিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা প্রথমে গদাধর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ দত্তকে বলেছিলেন। তখন তাঁরা কাটোয়ায় গিয়ে কীর্তন ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁরা সকলে মহাপ্রভুকে অনুসরণ করেছিলেন, বিশেষ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর ও গোবিন্দ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র পর্যন্ত তাঁর পেছন পেছন গিয়েছিলেন। সেই কথা *চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। জলেশ্বর নামক স্থানে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের দণ্ড ভেঙ্গে ফেলে দেন। মুকুন্দ দত্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বছর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য তিনি জগন্নাথপুরীতে যেতেন।

শ্লোক ৪১

বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয় ।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব দত্ত হচ্ছেন চৈতন্যবৃক্ষের উনবিংশতিতম শাখা। তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তি এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। সহস্র বদনে তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না।

তাৎপর্য

মুকুন্দ দত্তের ভ্রাতা বাসুদেব দত্তও চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। *চৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে, *যাঁর স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়*—বাসুদেব দত্ত শ্রীকৃষ্ণের এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁর কাছে বিক্রীত হয়েছিলেন। বাসুদেব দত্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেছিলেন। *চৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তের প্রতি এত সন্তুষ্ট ও স্নেহশীল ছিলেন যে, তিনি বলতেন, "আমি বাসুদেবের, আমার এই শরীর বাসুদেব দত্তের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং সে আমাকে যেখানে সেখানে বিক্রি করতে পারে।" তিনি সত্য করে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন এবং কেউ যেন তা অবিশ্বাস না করে। তিনি বলেছিলেন, "*সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল। এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল* ॥" বাসুদেব দত্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু যদুনন্দন আচার্যকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই বর্ণনা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১৬১ শ্লোকে রয়েছে। বাসুদেব দত্তের ব্যয়-বাহুল্যের প্রবৃত্তি দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তাঁর সরখেল বা সেক্রেটারি হয়ে তাঁর অর্থব্যয় সংযত করতে আদেশ দেন। বাসুদেব দত্ত জীবের প্রতি এত করুণাময় ছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবের পাপ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে উদ্ধার করে দেন। এই প্রসঙ্গে *চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার* পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ১৫৯ শ্লোক থেকে ১৮০ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন, "নবদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশনের অনতিদূরে পূর্বস্থলী নামক একটি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে এবং সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে মামগাছি বলে একটি গ্রাম আছে, যা হচ্ছে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মস্থান। সেখানে বাসুদেব দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল মন্দির রয়েছে।" গৌড়ীয় মঠের ভক্তরা এখন সেই মন্দিরের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন এবং সেখানে সেবাপূজা খুব ভাল মতো চলছে। প্রতি বছর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় তীর্থযাত্রীরা মামগাছিতে যান। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন থেকে নবদ্বীপ পরিক্রমা শুরু করেছেন, তখন থেকে এই মন্দিরের পরিচালনা খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

শ্লোক ৪২

জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা ।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর এই পৃথিবীর সমস্ত জীবের পাপকর্ম গ্রহণ করে, সেই পাপের ফল ভোগ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা পাপমুক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪৩

হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত ।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের বিংশতিতম শাখা হচ্ছেন হরিদাস ঠাকুর। তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনি প্রতিদিন অপতিতভাবে তিন লক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতেন।

তাৎপর্য

প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করা সত্যি খুব অদ্ভুত ব্যাপার। কোন সাধারণ মানুষ এত নাম গ্রহণ করতে পারে না এবং কারও পক্ষেই কৃত্রিমভাবে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করা উচিত নয়। তবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম গ্রহণ করবার সংকল্প করে নাম করা প্রয়োজন। তাই আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমাদের এই সংস্থার প্রতিটি ভক্তকে অন্তত করে ষোল মালা জপ করতে হবে। এই নাম নিরপরাধভাবে গ্রহণ করতে হবে। যন্ত্রের মতো নাম গ্রহণ করা অপরাধশূন্য হয়ে নাম গ্রহণের মতো এত শক্তিশালী নয়। *চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বূঢ়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে কিছুকাল থাকার পর তিনি শান্তিপুরের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মুসলমান কাজীর অত্যাচারের ঘটনা থেকে জানা যায়,

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কত বিনীত ছিলেন এবং কিভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করেছিলেন। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে মহাপ্রভু যে নাটক অভিনয় করেছিলেন, তাতে হরিদাস ঠাকুর কোতোয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি যখন বেনাপোলে হরিভজন করছিলেন, তখন এক সুন্দরী বেশ্যা তাঁকে পরীক্ষা করতে এসেছিল। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার* একাদশ পরিচ্ছেদে হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বূঢ়ন গ্রামে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল কি না সেই সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। পূর্বে এই গ্রামটি চব্বিশ পরগণা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত ছিল।

শ্লোক ৪৪

তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র ।
আচার্য গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের গুণ অন্তহীন। এখানে তাঁর সেই অন্তহীন গুণের একটি অংশ মাত্র আমি বর্ণনা করেছি। তিনি এমনই শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর পিতার শ্রাদ্ধে প্রথম ভোজনের থালা তাঁকে নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর গুণের তরঙ্গ প্রহ্লাদ মহারাজের মতো। যবনেরা যখন তাঁর উপর অত্যাচার করেছিল, তখন তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি।

শ্লোক ৪৬

তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে ।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের দেহত্যাগের পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর দেহ কোলে নিয়ে গভীর অনুরাগ সহকারে নৃত্য করেছিলেন।

শ্লোক ৪৭

তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে অত্যন্ত সাবলীলভাবে হরিদাস ঠাকুরের লীলা বর্ণনা করেছেন। যা বর্ণনা করা হয়নি, তা আমি এই গ্রন্থের পরবর্তী অংশে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪৮

তাঁর উপশাখা,—যত কুলীনগ্রামী জন ।
সত্যরাজ-আদি—তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

হরিদাস ঠাকুরের আর একটি উপশাখা হচ্ছেন কুলীন গ্রামের অধিবাসীরা। তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন সত্যরাজ খান বা সত্যরাজ বসু। তিনি হরিদাস ঠাকুরের সমগ্র কৃপাভাজন ছিলেন।

তাৎপর্য

সত্যরাজ খান ছিলেন গুণরাজ খানের ছেলে এবং রামানন্দ বসুর পিতা। চাতুর্মাস্যের সময় হরিদাস ঠাকুর কুলীন গ্রামে বাস করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের ভজনা করেছিলেন এবং বসুবংশীয়দের কৃপা বিতরণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতি বছর জগন্নাথের রথযাত্রার সময় রেশমের দড়ি নিয়ে আসার জন্য সত্যরাজ খানকে কৃপাপূর্বক আদেশ দিয়েছিলেন। গৃহস্থ ভক্তদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা *মধ্যলীলার* পঞ্চদশ ও ষোড়শ পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাওড়া থেকে বর্ধমানের নিউকর্ড লাইনে জৌগ্রাম স্টেশন থেকে দুই মাইল দূরে কুলীন গ্রাম অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কুলীন গ্রামের অধিবাসীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, কুলীন গ্রামের কুকুর পর্যন্ত তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ৪৯

শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা—প্রেমের ভাণ্ডার ।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যাঁর ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের একবিংশতি শাখা মুরারি গুপ্ত হচ্ছেন ভগবৎ-প্রেমের ভাণ্ডার। তাঁর বিনয় ও দৈন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীমুরারি গুপ্ত *শ্রীচৈতন্য-চরিত* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীহট্টের বৈদ্য-বংশজাত এবং পরে তিনি নবদ্বীপবাসী হয়েছিলেন। তিনি বয়সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

থেকে বড় ছিলেন। *চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীমুরারি গুপ্তের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বরাহরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন *মহাপ্রকাশ* রূপ প্রদর্শন করেন, তখন মুরারি গুপ্তের কাছে তিনি শ্রীরামচন্দ্র রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে একত্রে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন মুরারি গুপ্ত প্রথমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করেন এবং তারপর নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণতি নিবেদন করেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ, তাই মর্যাদা লঙ্ঘন করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে তিরস্কার করেন। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় মুরারি গুপ্ত নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তার পরদিন তিনি প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণতি নিবেদন করেন এবং পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে তাঁর চর্বিত তাম্বুল প্রদান করেছিলেন। এক সময় মুরারি গুপ্ত অতিরিক্ত ঘি দিয়ে তৈরি অন্ন-ব্যঞ্জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে খেতে দেন। তার ফলে মহাপ্রভুর অজীর্ণ হয় এবং তিনি তখন চিকিৎসার জন্য মুরারি গুপ্তের কাছে যান। 'মুরারির জল পাত্রের জলই এর ওষুধ', এই বলে মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের জলপাত্র থেকে জল পান করেন এবং তার ফলে তাঁর রোগ সেরে যায়।

শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন চতুর্ভুজরূপ ধারণ করেন, মুরারি গুপ্ত তখন গরুড়ভাবে আবিষ্ট হন এবং মহাপ্রভু তখন তাঁর স্কন্ধে আরোহণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পূর্বে দেহত্যাগ করার জন্য মুরারি গুপ্তের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তা করতে নিষেধ করেন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* বিংশতিতম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বরাহভাবে আবিষ্ট হয়ে মুরারি গুপ্তের গৃহে আসেন, তখন মুরারি গুপ্ত তাঁর স্তুতি করেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার* পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে ১৩৭ থেকে ১৫৭ শ্লোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫০

প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন ।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব ভরণ ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল মুরারি গুপ্ত কখনও কোন বন্ধুর কাছ থেকে দান গ্রহণ করেননি এবং কারও কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেননি। তাঁর বৃত্তি অনুসারে চিকিৎসা করে, তিনি আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ করতেন।

তাৎপর্য

গৃহস্থদের কখনও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করা উচিত নয়। উচ্চবর্ণের প্রতিটি গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যরূপে স্বীয় বৃত্তি অবলম্বন করা

এবং কখনও কারও অধীনে চাকরি গ্রহণ না করা, কেন না সেটি হচ্ছে শূদ্রের বৃত্তি। স্বীয় বৃত্তি অনুসারে যা উপার্জন হয়, সেটি গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণের বৃত্তি হচ্ছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ব্রাহ্মণের বিষ্ণুর আরাধনা করা উচিত এবং অন্যান্যদের বিষ্ণুর আরাধনা করতে উপদেশ দেওয়া উচিত। ক্ষত্রিয় কোন ভূমিখণ্ডের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে, সেই ভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের উপর কর নির্ধারণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। মুরারি গুপ্ত যেহেতু বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি বৈদ্যের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। তা থেকে তাঁর যা রোজগার হত, তাই দিয়ে তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বৃত্তি অনুসারে কর্ম করে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। সেটিই হচ্ছে জীবনের পূর্ণতা। এই পন্থাকে বলা হয় দৈব-বর্ণাশ্রম। মুরারি গুপ্ত ছিলেন একজন আদর্শ গৃহস্থ, কেন না তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত। চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এটিই হচ্ছে আদর্শ গৃহস্থের জীবন।

শ্লোক ৫১

চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয় ।
দেহরোগ ভবরোগ,—দুই তার ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

সদয় হয়ে মুরারি গুপ্ত যারই চিকিৎসা করতেন, তাঁর কৃপার প্রভাবে তাদের দেহরোগ ও ভবরোগ, উভয়েরই নিরাময় হত।

তাৎপর্য

মুরারি গুপ্ত দেহরোগ ও ভবরোগ উভয়েরই চিকিৎসা করতে পারতেন, কেন না তাঁর বৃত্তি ছিল চিকিৎসা এবং তিনি ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত। এটি মানব-সেবার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। সকলেরই জানা উচিত যে, মানব-সমাজে দুই রকমের রোগ রয়েছে। একটি রোগ হচ্ছে দেহের এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মার। জীব নিত্য, কিন্তু কোন না কোন কারণবশত জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির আবর্তে পতিত হয়েছে। এই যুগের চিকিৎসকদের মুরারি গুপ্তের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা লাভ করা উচিত। আধুনিক যুগের চিকিৎসকেরা বড় বড় সমস্ত হাসপাতাল খুলছে, কিন্তু আত্মার ভবরোগ নিরাময়ের জন্য কোন হাসপাতাল নেই। এই রোগটির নিরাময় করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ তাতে খুব একটা সাড়া দিচ্ছে না, কেন না এই রোগটি যে কি তা তারা জানে না। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই প্রয়োজন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ভবরোগগ্রস্ত মানুষদের

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনরূপ ঔষধ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ-রূপ পথ্য দান করছে। দেহের রোগ নিরাময়ের জন্য বহু হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় রয়েছে, কিন্তু আত্মার ভবরোগ নিরাময়ের জন্য এই রকম কোন হাসপাতাল নেই। কেবল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিই হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ ভবরোগ নিরাময়ের একমাত্র হাসপাতাল।

শ্লোক ৫২

শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান ।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের দ্বাবিংশতিতম শাখা শ্রীমান সেন ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত সেবক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত তিনি আর অন্য কোন কিছু জানতেন না।

তাৎপর্য

শ্রীমান সেন ছিলেন নবদ্বীপের বাসিন্দা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ।

শ্লোক ৫৩

শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্বোপরি ।
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োবিংশতিতম শাখা শ্রীগদাধর দাস ছিলেন সর্বোচ্চ শাখা, কেন না তিনি সমস্ত মুসলমান কাজীদেরকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

তাৎপর্য

কলকাতা থেকে প্রায় আট বা দশ মাইল দূরে গঙ্গার তীরে এঁড়িয়াদহ গ্রাম। শ্রীগদাধর দাস ছিলেন সেই গ্রামের অধিবাসী (*এঁড়িয়াদহ-বাসী গদাধর দাস*)। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থের সপ্তম তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীগদাধর দাস নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় গিয়েছিলেন। তারপর তিনি এঁড়িয়াদহ গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁকে শ্রীমতী রাধারাণীর দেহকান্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যেমন শ্রীমতী রাধারাণীর অবতার, তেমনই শ্রীগদাধর দাস হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর অঙ্গকান্তি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কখনও কখনও *রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত* বা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি সমন্বিত বলে বর্ণনা করা হয়। শ্রীগদাধর দাস হচ্ছেন সেই *দ্যুতি* (অঙ্গকান্তি)। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৫৪) তাঁকে শ্রীমতী রাধারাণীর বিভূতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই পার্ষদ বলে গণ্য হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদেরা ব্রজের মধুর রসের রসিক এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদেরা শুদ্ধ ভক্তিপ্রধান সখ্য রসের রসিক। শ্রীগদাধর দাস নিত্যানন্দ

প্রভুর গণ হলেও সখ্যভাবময় গোপবালক নন, তিনি মধুর রসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি কাটোয়ায় শ্রীগৌরসুন্দরের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৪৩৪ শকাব্দে (১৫১২ খৃঃ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বঙ্গভূমিতে 'সংকীর্তন আন্দোলন' প্রচার করতে বলেন, তখন শ্রীগদাধর দাস ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একজন প্রধান সহকারী। শ্রীগদাধর দাস সকলকে হরিনাম করতে উপদেশ দিয়ে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করছিলেন। শ্রীগদাধর দাসের প্রচার করার এই সহজ পদ্ধতিটি যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থাতেই অনুসরণ করতে পারেন। প্রতিটি মানুষের কেবল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাবান সেবক হয়ে দ্বারে দ্বারে এই সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করা উচিত।

শ্রীগদাধর দাস যখন হরিকীর্তন প্রচার করছিলেন, তখন সেই গ্রামের কাজী প্রবলভাবে তাঁকে বাধা দেন, কেন না তিনি ছিলেন সংকীর্তন আন্দোলনের বিরোধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, শ্রীগদাধর দাস একদিন রাত্রে কাজীর গৃহে গিয়ে তাঁকে হরিনাম করতে অনুরোধ করেন। কাজী উত্তর দেন, "ঠিক আছে, আগামীকাল থেকে আমি হরিনাম করব।" সেই কথা শুনে শ্রীল গদাধর দাস প্রভু আনন্দে নৃত্য করতে করতে বলেন, *"আর কালি কেনে? এইত বলিলা 'হরি' আপন-বদনে।"*

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (শ্লোক ১৫৪-৫৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা ব্রজে ।
স শ্রীগৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেব-প্রিয়াগ্রণী ।
সাপি কার্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্ ॥

"শ্রীগদাধর দাস হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর বিভূতিরূপা চন্দ্রকান্তি এবং বলরামের অত্যন্ত প্রিয় সখী পূর্ণানন্দা এই দুজনের মিলিত রূপ। এভাবেই শ্রীগদাধর দাস প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই পার্ষদ।"

এক সময় শ্রীগদাধর দাস প্রভু যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরী থেকে বঙ্গদেশে ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে দধি বিক্রয়ে রত ব্রজবালাদের মতো কথা বলতে শুরু করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তা লক্ষ্য করেছিলেন। কখনও শ্রীগদাধর দাস প্রভু গোপীভাবে বিভোর হয়ে গঙ্গাজলপূর্ণ কলসি মাথায় বহন করতেন, যেন তিনি দুধ বিক্রয় করছেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসেন, তখন শ্রীগদাধর দাস প্রভু তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি এতই প্রসন্ন হন যে, তিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর মস্তকে রেখেছিলেন। শ্রীগদাধর দাস প্রভু যখন এঁড়িয়াদহ গ্রামে বাস করছিলেন, তখন তিনি সেখানে বালগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর দাসের সাহায্যে শ্রীমাধব ঘোষ শ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে *দানখণ্ড* নামক একটি নাটক অভিনয় করেন। *চৈতন্য-ভাগবতে* (অন্ত্য ৫/৩১৮-৯৪) তা বর্ণনা করা হয়েছে।

এঁড়িয়াদহ গ্রামে শ্রীগদাধর দাস প্রভুর সমাধিটি সংযোগী বৈষ্ণবদের অধিকারে ছিল। কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজের নির্দেশে কলকাতার নারকেল ডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক পরিবারের মধুসূদন মল্লিক ১২৫৬ বঙ্গাব্দে সেখানে একটি পাটবাড়ি (আশ্রম) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থাও করেন। তাঁর পুত্র শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক ১৩১২ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌর-নিতাইয়ের একটি সেবা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মন্দিরের সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। সিংহাসনের নীচে একটি প্রস্তর খণ্ডে একটি সংস্কৃত শ্লোক খোদিত রয়েছে। একটি গোপেশ্বর শিবলিঙ্গও সেখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটি প্রস্তর ফলকে উপরোক্ত কথাগুলি খোদিত আছে।

শ্লোক ৫৪

শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ ।
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের চতুর্বিংশতি শাখা শিবানন্দ সেন ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক। যাঁরাই জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যেতেন, তাঁদের সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা শ্রীশিবানন্দ সেনের শরণাপন্ন হতেন।

শ্লোক ৫৫

প্রতিবর্ষে প্রভুগণ সঙ্গেতে লইয়া ।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতি বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য বঙ্গদেশ থেকে একদল ভক্তকে জগন্নাথপুরীতে নিয়ে যেতেন। তিনি নিজেই পথে পুরো দলটির ভরণ-পোষণ করতেন।

শ্লোক ৫৬

ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন স্বরূপে ।
'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' আর 'আবির্ভাব'-রূপে ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের উপর তাঁর অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করেন তিনটি স্বরূপে—নিজে সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়ে (সাক্ষাৎ), কারও মধ্যে তাঁর শক্তি সঞ্চার করে (আবেশ) এবং নিজে আবির্ভূত হয়ে (আবির্ভাব)।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *সাক্ষাৎ* রূপ হচ্ছে তাঁর নিজের উপস্থিতি। *আবেশ* হচ্ছে কোন বিশেষ ভক্তের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করা। যেমন, নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে কখনও কখনও তিনি আবিষ্ট হতেন। *আবির্ভাব* হচ্ছে তিনি কোন স্থানে না থাকলেও সেখানে আচম্বিত উপস্থিত হতেন। যেমন, শচীমাতা যখন গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আহার্য বস্তু নিবেদন করতেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু দূরে জগন্নাথ-পুরীতে থাকলেও, সেখানে এসে তা গ্রহণ করতেন। সেই আহার্য বস্তু নিবেদন করার কিছুক্ষণ পর শচীমাতা যখন তাঁর চোখ খুলতেন, তখন দেখতেন যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সত্যি সত্যি তা খেয়ে গেছেন। তেমনই, শ্রীবাস ঠাকুর যখন সংকীর্তন করতেন, তখন সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতি অনুভব করতেন, যদিও তিনি তখন সেখান থেকে বহু দূরে রয়েছেন। এটি আবির্ভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৫৭

'সাক্ষাতে' সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ ।
নকুল ব্রহ্মচারি-দেহে প্রভুর 'আবেশ' ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

'সাক্ষাতে' সমস্ত ভক্তরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি ঠিক যেমন, তেমনভাবে দর্শন করতেন। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব 'আবেশ' এর একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৫৮

'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল ।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

আগে নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নাম রেখেছিলেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্লোক ৫৯

তাঁহাতে হইল চৈতন্যের 'আবির্ভাব' ।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর দেহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'আবির্ভাব' হয়েছিল। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বহু অলৌকিক লীলাবিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৭৩-৭৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে, নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *আবেশ* এবং প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর *আবির্ভাব* হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শত-সহস্র ভক্ত রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু কোন ভক্তের মধ্যে যখন কোন বিশেষ শক্তি সঞ্চার হতে দেখা যায়, তখন তাকে বলা হয় *আবেশ*। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করেছিলেন এবং তিনি প্রতিটি ভারতবাসীকে সারা পৃথিবী জুড়ে সেই আন্দোলন প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছেন, বুঝতে হবে যে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। শ্রীশিবানন্দ সেন এই রকম আবেশের লক্ষণ নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে দেখেছিলেন এবং তিনি অবিকল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দিব্যনাম প্রচার করা এবং সেই নামের প্রচার কেবল তার পক্ষে সম্ভব, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। ভক্তের মধ্যে যখন এই শক্তির সঞ্চার হয়, তখন তাকে বলা হয় *আবেশ*, অথবা *শক্ত্যাবেশ*।

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী পূর্বে কালনার পিয়ারীগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* তৃতীয় অধ্যায়ে ও নবম অধ্যায়ে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর বর্ণনা রয়েছে।

শ্লোক ৬০

আস্বাদিল এ সব রস সেন শিবানন্দ ।
বিস্তারি' কহিব আগে এসব আনন্দ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীশিবানন্দ সেন এই সমস্ত রস আস্বাদন করেছিলেন। পরে ওই আনন্দের বিষয় আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীশিবানন্দ সেন সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেছেন— "তিনি ছিলেন কুমারহট্ট বা হালিসহরের অধিবাসী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত। কুমারহট্ট থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়া নামক আর একটি গ্রাম রয়েছে, যেখানে শিবানন্দ সেন গৌর-গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দির এখনও বর্তমান। শিবানন্দ সেন ছিলেন পরমানন্দ সেনের পিতা, যিনি পুরীদাস বা কবিকর্ণপুর নামেও পরিচিত। পুরীদাস তাঁর *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৭৬) লিখেছেন যে, বীরা ও দূতী নামক বৃন্দাবনের এই দুই গোপীর মিলিত তনু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ

শ্রীশিবানন্দ সেন। বঙ্গদেশের ভক্তরা যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথপুরীতে যেতেন, তখন শিবানন্দ সেন তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন এবং পথে তাঁদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। সেই কথা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার* ষোড়শ পরিচ্ছেদে ১৯ থেকে ২৭ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্য দাস, রামদাস ও পরমানন্দ নামক শ্রীশিবানন্দ সেনের তিনটি পুত্র ছিল। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ পরবর্তীকালে কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হন এবং তিনি *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার* রচয়িতা। শিবানন্দ সেনের পুরোহিত শ্রীনাথ পণ্ডিত ছিলেন তাঁর গুরু। বাসুদেব দত্তের ব্যয়বাহুল্য দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক রূপে থাকবার জন্য আদেশ করেছিলেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *সাক্ষাৎ, আবেশ* ও *আবির্ভাব*—এই তিনভাবে ভক্তদের কৃপা করেছিলেন। এই তিনটি রস শিবানন্দ সেন পরীক্ষা করে আস্বাদন করেন। সেই কথা *অন্ত্যলীলার* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। একবার জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথে তিনি একটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে চলেন, পরে সেই কুকুরটি মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সেই কথা *অন্ত্যলীলার* প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস, পরবর্তীকালে যিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তাঁর বাড়ি থেকে পালিয়ে যান, তখন তাঁর পিতা রঘুনাথের সংবাদ জানার জন্য শিবানন্দ সেনের কাছে পত্র লেখেন। শিবানন্দ সেন তখন সবিস্তারে তাঁকে তাঁর পুত্রের সংবাদ দিয়েছিলেন। পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা তাঁর পুত্রের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য শিবানন্দ সেনের কাছে পাচক, ভৃত্য ও প্রভূত অর্থ পাঠিয়েছিলেন। একবার শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করে এমন গুরুতরভাবে ভোজন করিয়েছিলেন যে, মহাপ্রভু কিছুটা অসুস্থ বোধ করেন। তার পরের দিন তাঁর পুত্র চৈতন্য দাস মহাপ্রভুকে হজম-কারক খাদ্যদ্রব্য ভোজন করান এবং তাতে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হন। সেই কথা *অন্ত্যলীলার* দশম পরিচ্ছেদে ১৪২-১৫১ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

এক সময় জগন্নাথ পুরী যাওয়ার পথে বাসস্থান না পেয়ে ভক্তদের একটি গাছের নীচে থাকতে হয়। তখন নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষুধার্ত ও ক্রুদ্ধ হওয়ার অভিনয় করে 'শিবানন্দের তিন পুত্র মরুক' বলে অভিশাপ দেন। তাতে শিবানন্দ সেনের পত্নী অকল্যাণ আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি মনে করেছিলেন যেহেতু নিত্যানন্দ প্রভু অভিশাপ দিয়েছেন, তাই তাঁর তিন পুত্র নিশ্চয়ই মারা যাবে। শিবানন্দ সেন ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে বলেন, "তুমি কাঁদছ কেন? শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর যদি তাই ইচ্ছা হয়, তা হলে আমরা সকলেই মরতে প্রস্তুত আছি।" এই বলে তিনি তাঁর ভাগ্যের প্রশংসা করতে থাকেন। শিবানন্দ সেন ফিরে এসেছে দেখে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে পদাঘাত করে তাঁর কাছে অনুযোগের সুরে বললেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং কেন কোন রকম আহারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এমনই আচরণ। শ্রীনিত্যানন্দ

প্রভু একজন সাধারণ ক্ষুধার্ত মানুষের মতোই আচরণ করছিলেন, যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে শিবানন্দ সেনের ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

শিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত তা দেখে অভিমান করে একাকী জগন্নাথ-পুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যান এবং মহাপ্রভু তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন। সেবারই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীদাসের মুখে তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ দেন। পুরীদাস তখন একটি শিশু। মহাপ্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ আস্বাদন করে পুরীদাস প্রথমে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে শুরু করেন। শিবানন্দ সেনের পরিবারের সঙ্গে এই ভুল বোঝাবুঝির সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট পায়। *অন্ত্যলীলার* দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ৫৩ শ্লোকে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬১

শিবানন্দের উপশাখা, তাঁর পরিকর ।
পুত্র-ভৃত্য-আদি করি' চৈতন্য-কিঙ্কর ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের পুত্র, ভৃত্য ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা হচ্ছেন তাঁর উপশাখা। তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভৃত্য।

শ্লোক ৬২

চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর ।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র চৈতন্য দাস, রামদাস ও কর্ণপূর ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ ভক্ত।

তাৎপর্য

শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্য দাস *কৃষ্ণকর্ণামৃত* গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ভাষ্যসহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ *শ্রীসজ্জন-তোষণী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞদের মতে, ইনিই *চৈতন্য-চরিত* নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রণেতা কবিকর্ণপূর নন। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, কবিকর্ণপূর বলতে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত আছে, তিনি সেই ধারণা অনুযায়ী কবিকর্ণপূর ছিলেন না। শ্রীরামদাস ছিলেন শিবানন্দ সেনের দ্বিতীয় পুত্র। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৪৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে কৃষ্ণলীলার দুটি শুক কবিকর্ণপূরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৈতন্য দাস ও রামদাসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শিবানন্দ সেনের তৃতীয় পুত্র পরমানন্দ দাস বা পুরীদাস বা কবিকর্ণপূর অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিতের কাছ থেকে দীক্ষা

গ্রহণ করেছিলেন। কবিকর্ণপূর *আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কার-কৌস্তভ, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা* ও *চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক* আদি বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর জন্ম হয় ১৪৪৮ শকাব্দে। ১৪৮৮ থেকে ১৪৯৮ শকাব্দ পর্যন্ত দশ বছর ধরে তিনি নিরন্তর গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্লোক ৬৩

শ্রীবল্লভসেন, আর সেন শ্রীকান্ত ।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবল্লভ সেন এবং শ্রীকান্ত সেনও ছিলেন শিবানন্দ সেনের উপশাখা, কেন না তাঁরা কেবল তাঁর ভাগিনা ছিলেন না, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তও ছিলেন।

তাৎপর্য

পুরী যাওয়ার পথে যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শিবানন্দ সেনকে তিরস্কার করেন, তখন শিবানন্দ সেনের দুই ভাগিনা সেই দল ত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই দুটি বালকের মনোভাব অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শিবানন্দ সেন না আসা পর্যন্ত তাঁদের দুজনকে যেন প্রসাদ দেওয়া হয়। রথযাত্রার সময় এই দুই ভাই মুকুন্দ দত্তের কীর্তন দলে থাকতেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাত্যায়নী নামক গোপী শ্রীকান্ত সেন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৬৪

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত ।
প্রভুর কীর্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য বৃক্ষের পঞ্চবিংশতিতম এবং ষড়বিংশতিতম শাখা গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনের সঙ্গী। গোবিন্দ দত্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তন দলের মুখ্য কীর্তনীয়া।

তাৎপর্য

গোবিন্দ দত্ত খড়দহের সন্নিকটে সুখচর গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৫

শ্রীবিজয়দাস-নাম প্রভুর আখরিয়া ।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্তবিংশতিতম শাখা শ্রীবিজয় দাস ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লিপিকার। তিনি স্বহস্তে মহাপ্রভুকে অনেক পুঁথি লিখে দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে ছাপাখানা ছিল না এবং মুদ্রিত আকারে গ্রন্থও ছিল না। তখন সমস্ত গ্রন্থই হাতে লেখা হত। মূল্যবান গ্রন্থগুলি পাণ্ডুলিপির আকারে মন্দিরে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাখা হত এবং কেউ যদি সেই গ্রন্থের বিষয়ে উৎসাহী হতেন, তা হলে তাঁকে হাতে লিখে নিতে হত। বিজয় দাস ছিলেন লিপিকার এবং তিনি বহু গ্রন্থ হাতে লিখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৬

'রত্নবাহু' বলি' প্রভু থুইল তাঁর নাম ।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিজয় দাসের নাম রেখেছিলেন-রত্নবাহু, কেন না তিনি হাতে লিখে বহু গ্রন্থ তাঁকে দিয়েছিলেন। অষ্টবিংশতিতম শাখা কৃষ্ণদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। তিনি অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত ছিলেন।

তাৎপর্য

অকিঞ্চন শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'এই জগতে যাঁর কোন সহায়-সম্বল নেই।'

শ্লোক ৬৭

খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস ।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

ঊনত্রিংশতিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীধর, যিনি কলার খোলা ও পাতা বিক্রি করতেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় সেবক। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সঙ্গে সব সময় নানা রকম পরিহাস করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীধর ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যিনি কলাগাছের বাকল দিয়ে খোলা তৈরি করে সেগুলি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খুব সম্ভবত তাঁর একটি কলার বাগান ছিল এবং সেখান থেকে তিনি প্রতিদিন পাতা, খোলা ও মোচা বাজারে বিক্রি করতেন। তাঁর উপার্জনের অর্ধাংশ দিয়ে তিনি গঙ্গাপূজা করতেন এবং বাকি অর্ধাংশ দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কাজীর বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন করেন,

তখন শ্রীধর আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করেছিলেন। কাজী দমনের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধরের গৃহে গিয়ে তাঁর ভাঙ্গা জলপাত্র থেকে জলপান করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীধর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে রান্না করে খাওয়ানোর জন্য শচীমাতাকে একটি লাউ দিয়েছিলেন। প্রতি বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যেতেন। শ্রীধর ছিলেন বৃন্দাবনের কুসুমাসব নামক এক গোপবালক। কবি কর্ণপূর তাঁর *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৩৩) বর্ণনা করেছেন—

খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ ।
আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকরো যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥

"কৃষ্ণলীলার কুসুমাসব নামক গোপবালক নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় খোলাবেচা শ্রীধর হয়েছেন।"

শ্লোক ৬৮

প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচা-ফল ।
যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন পরিহাসছলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধরের কাছ থেকে থোড়, মোচা ও ফল নিতেন এবং তিনি তাঁর ভাঙ্গা লৌহপাত্র থেকে জলপান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৯

প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত ।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিংশতিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীভগবান পণ্ডিত। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি প্রিয় সেবক এবং পূর্বেও তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের এক মহান ভক্ত, যাঁর হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন।

শ্লোক ৭০

জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয় ।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

একত্রিংশতিতম শাখা হচ্ছেন জগদীশ পণ্ডিত এবং দ্বাত্রিংশতিতম শাখা হচ্ছেন হিরণ্য মহাশয়, যাঁদেরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শৈশবে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে কৃষ্ণলীলায় জগদীশ পণ্ডিত ছিলেন চন্দ্রহাস নামক নর্তক। হিরণ্য পণ্ডিত সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এক সময় নিত্যানন্দ প্রভু বহু অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে তাঁর গৃহে বাস করছিলেন, তখন এক দস্যুপতি সারা রাত ধরে সেই রত্ন-অলঙ্কার চুরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। পরে সে নিত্যানন্দ প্রভুর শরণাগত হয়।

শ্লোক ৭১

এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী দিনে ।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুজনের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একাদশীর দিন বিষ্ণুর নৈবেদ্য চেয়ে খেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একাদশীর দিন ভক্তরা উপবাস করেন; তবে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করতে কোন বাধা নেই। বিষ্ণুতত্ত্বরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই দিন বিষ্ণুর নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭২

প্রভুর পড়ুয়া দুই,—পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয় ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়স্ত্রিংশতিতম এবং চতুস্ত্রিংশতিতম শাখা হচ্ছেন পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুজন ছাত্র, যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত মহান।

তাৎপর্য

এই দুজন পড়ুয়া ছিলেন নবদ্বীপের অধিবাসী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনের প্রথম সঙ্গী। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুরুষোত্তম সঞ্জয় ছিলেন মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র। কিন্তু *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুরুষোত্তম ও সঞ্জয়কে দুজন পৃথক ব্যক্তি বলে বর্ণনা করে, সেই ভুল সংশোধন করেছেন।

শ্লোক ৭৩

বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে ।
সোণার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের পঞ্চত্রিংশতিতম শাখা বনমালী পণ্ডিত এই জগতে অত্যন্ত বিখ্যাত। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর হাতে সুবর্ণের হল ও গদা দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনমালী পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলরামের ভাবে আবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করেছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* নবম অধ্যায়ে এই লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭৪

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্ ।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

ষট্‌ত্রিংশতিতম শাখা বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। তিনি সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই তাঁকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান সেবক বলে গণনা করা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন নবদ্বীপের অধিবাসী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধনবান ভক্ত। তিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিবাহের আয়োজন করেছিলেন এবং বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। মহাপ্রভুর যখন বায়ুব্যাধি হয়, তখন তিনি তাঁর চিকিৎসা করান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনে তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মহালক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি তখন তাঁর বস্ত্র ও ভূষণ আদি সংগ্রহ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে ছিলেন, তখন রথযাত্রার সময় তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৭৫

গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল ।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্তত্রিংশতিতম শাখা গরুড় পণ্ডিত নিরন্তর ভগবানের নাম গ্রহণ করতেন। নামের বলে সাপের বিষ পর্যন্ত তাঁর উপর ক্রিয়া করতে পারেনি।

তাৎপর্য

গরুড় পণ্ডিতকে একবার এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে সেই বিষ তাঁর উপর ক্রিয়া করতে পারেনি।

শ্লোক ৭৬

গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস ।
অক্রূর বলি' প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টত্রিংশতিতম শাখা গোপীনাথ সিংহ ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি বিশ্বস্ত সেবক। অক্রূর বলে সম্বোধন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে পরিহাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১১৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন অক্রূর।

শ্লোক ৭৭

ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে ।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

দেবানন্দ পণ্ডিত ছিলেন পেশাদারী ভাগবত পাঠক, কিন্তু বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি ভাগবতের ভক্তি-অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে একবিংশতিতম শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবানন্দ পণ্ডিত ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা বিশারদ মহেশ্বর একই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত ছিলেন পেশাদারী *ভাগবত* পাঠক, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *ভাগবতের* ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হননি। বর্তমান নবদ্বীপ শহর, পূর্বে যা কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল, সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি করুণা প্রদর্শন করলে তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* মায়াবাদী বিশ্লেষণ বন্ধ করে দিয়ে ভক্তির মাধ্যমে *শ্রীমদ্ভাগবত* বিশ্লেষণ করার শিক্ষা লাভ করেন। পূর্বে, দেবানন্দ যখন এক সময় মুক্তি লাভের আশায় *ভাগবত পাঠ* করছিলেন, তখন একবার শ্রীবাস ঠাকুর সেখানে ছিলেন এবং *ভাগবত* শ্রবণপূর্বক তিনি যখন কাঁদছিলেন, তখন দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যগণ তাঁকে বাইরে রেখে আসে, তাতে দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদের কিছুই বলেননি। কিছুদিন পরে মহাপ্রভু ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় দেবানন্দকে *ভাগবত* ব্যাখ্যা করতে দেখে ক্রোধবশে বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন দেবানন্দকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। কারণ তখনও দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু তার কিছুদিন পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন, তখন আর দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচয় সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না। এভাবেই দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা অবগত হন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভক্তি-ব্যাখ্যা করতে অনুপ্রাণিত করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১০৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন ব্রজের নন্দ মহারাজের সভাপণ্ডিত ভাগুরি মুনি।

শ্লোক ৭৮-৭৯

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৮ ॥
এই সব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম ।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ ও তাঁর পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন ঊনচত্বারিংশতিতম শাখা, নরহরি ছিলেন চত্বারিংশতিতম শাখা, চিরঞ্জীব ছিলেন একচত্বারিংশতিতম শাখা এবং সুলোচন ছিলেন দ্বিচত্বারিংশতিতম শাখা। তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ কৃপাবৃক্ষের বড় বড় এক একটি শাখা। তাঁরা ভগবৎ-প্রেমের ফুল-ফল সর্বত্র বিতরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমুকুন্দ দাস ছিলেন নারায়ণ দাসের পুত্র এবং নরহরি সরকারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম ছিল মাধব দাস এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল রঘুনন্দন দাস। রঘুনন্দন দাসের বংশধরেরা এখনও কাটোয়া থেকে চার মাইল পশ্চিমে শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে বাস করেন, যেখানে রঘুনন্দন দাস বাস করতেন। রঘুনন্দন দাসের কানাই নামক একটি পুত্র ছিল, তাঁর দুই পুত্র—নরহরি ঠাকুরের শিষ্য মদন রায় ও বংশীবদন। এই বংশে এখনও পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক চারশত ব্যক্তি জাত হয়েছেন। তাঁদের ধারাবাহিক বংশ-প্রণালী শ্রীখণ্ডে আছে। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৭৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৃন্দাদেবী শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ দাসরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। *মধ্যলীলার* পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, তাঁর অতি আশ্চর্য রকমের কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করা হয়েছে। *ভক্তিরত্নাকরের* অষ্টম তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিগ্রহ সেবা করতেন।

নরহরি দাস সরকার ছিলেন একজন বিখ্যাত ভক্ত। *চৈতন্য-মঙ্গলের* গ্রন্থকার লোচন দাস ঠাকুর ছিলেন তাঁর শিষ্য। *চৈতন্য-মঙ্গলে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীগদাধর দাস ও নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* শ্রীখণ্ডবাসীদের সেই রকম সবিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চিরঞ্জীব ও সুলোচন উভয়েই ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। তাঁদের স্থান আজও শ্রীখণ্ডে দেখা যায়। তাঁদের বংশধরেরা এখনও সেখানে রয়েছেন। চিরঞ্জীব সেনের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ হচ্ছেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ দাস কবিরাজ ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। চিরঞ্জীব সেনের পত্নীর নাম ছিল সুনন্দা এবং তাঁর শ্বশুর ছিলেন দামোদর সেন কবিরাজ। চিরঞ্জীব সেন পূর্বে গঙ্গার তীরে কুমারনগর গ্রামে বাস করতেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (২০৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বে তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের চন্দ্রিকা।

শ্লোক ৮০

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

সত্যরাজ, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর ও বিদ্যানন্দ—এই সমস্ত কুলীন-গ্রামবাসী ছিলেন বিংশতিতম শাখার অন্তর্ভুক্ত।

শ্লোক ৮১

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন ।
সবেই চৈতন্যভৃত্য,—চৈতন্য-প্রাণধন ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

বাণীনাথ বসু আদি সমস্ত কুলীন-গ্রামবাসী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভৃত্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন তাঁদের প্রাণধন।

শ্লোক ৮২

প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর ।
সেই মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "অন্যদের কথা দূরে থাক, কুলীনগ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ৮৩

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায় ।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায় ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"কুলীনগ্রামের সৌভাগ্য কেউ বর্ণনা করতে পারে না। তা এমনই মহিমান্বিত যে, শূকর চরায় যে ডোম সে পর্যন্ত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে।"

শ্লোক ৮৪

অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন ।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্বোত্তম ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

পশ্চিম দিকে রয়েছে চৈতন্যবৃক্ষের ত্রিচত্বারিংশতিতম, চতুশ্চত্বারিংশতিতম এবং পঞ্চচত্বারিংশতিতম শাখা—শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও অনুপম। তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম।

তাৎপর্য

শ্রীঅনুপম ছিলেন শ্রীজীব গোস্বামীর পিতৃদেব এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। পূর্বে তাঁর নাম ছিল বল্লভ, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর, মহাপ্রভু তাঁর নাম দেন অনুপম। মুসলমান নবাবের অধীনে কাজ করতেন বলে, তিন ভাই মল্লিক উপাধি লাভ করেছিলেন। আমাদের পরিবারও কলকাতার মহাত্মা গান্ধী রোডের মল্লিক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শৈশবে আমি প্রায়ই তাঁদের শ্রীরাধা-গোবিন্দ মন্দিরে শ্রীরাধা-গোবিন্দজীকে দর্শন করতে যেতাম। আমরা একই পরিবারভুক্ত। আমাদের গোত্র হচ্ছে গৌতম গোত্র অর্থাৎ গৌতম মুনির শিষ্য-পরম্পরা এবং আমাদের উপাধি হচ্ছে দে। কিন্তু মুসলমান সরকারের জমিদারী গ্রহণ করার ফলে, তাঁরা মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। তেমনই, রূপ সনাতন এবং বল্লভও মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মল্লিক মানে হচ্ছে 'মালিক'। ঠিক যেমন ইংরেজ সরকারের 'লর্ড', তেমনই মুসলমান নবাবেরা তাঁদের সঙ্গে সরকারি কার্যে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিকে মল্লিক উপাধি দিতেন। মল্লিক উপাধি কেবল সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় না, মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। এই উপাধিটি কোন বিশেষ পরিবারকে দেওয়া হত না, বিভিন্ন পরিবার ও জাতিকে দেওয়া হত। এই উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্যতা ছিল ধন-সম্পদ এবং খ্যাতি।

সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয়, অর্থাৎ তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির বংশধর ছিলেন অথবা শিষ্য-পরম্পরায় ছিলেন। ঠিক যেমন আমরা, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের ভক্তরা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্য-পরম্পরায় রয়েছি এবং তার ফলে আমরা সারস্বত নামে পরিচিত। তাই আমাদের গুরু প্রণতিতে আমরা বলি, *নমস্তে সারস্বতে দেবে*—"আমরা সারস্বত পরিবারের সদস্যকে প্রণতি নিবেদন করি," যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা (*গৌরবাণী-প্রচারিণে*) এবং নির্বিশেষবাদী ও শূন্যবাদীদের পরাস্ত করা (*নির্বিশেষ-শূন্যবাদী-পাশ্চাত্যদেশ-তারিণে*)। সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী এবং অনুপম গোস্বামীর লক্ষ্যও ছিল তাই।

সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী এবং বল্লভ গোস্বামীর পূর্বপুরুষ, সর্বগুণযুক্ত মহাত্মা সর্বজ্ঞ বারশো শকাব্দে কর্ণাটদেশে এক অতি ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামক দুই পুত্র ছিল। কিন্তু তাঁরা উভয়েই রাজ্য থেকে বঞ্চিত হলে জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর শিখরভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটি নামক গ্রামে বাস করতে শুরু করেন এবং তাঁর পাঁচটি পুত্র হয়। তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহা সদাচারী কুমারদেব হচ্ছেন সনাতন, রূপ ও অনুপমের পিতৃদেব। কুমারদেব বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তখনকার যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ নামক স্থানে তাঁর আলয় ছিল। তাঁর পুত্রদের মধ্যে তিনজন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীবল্লভ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় শ্রীরূপ ও সনাতন কর্ম উপলক্ষ্যে বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপ থেকে মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে এসে

বাস করতেন। এই গ্রামেই শ্রীবল্লভের পুত্ররূপে শ্রীল জীব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। মুসলমান নবাবের অধীনে কাজ করতেন বলে এই তিন ভাই মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রামকেলি গ্রামে যান, তখন সেখানে বল্লভের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর, শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন নবাবের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন, তখন বল্লভ তাঁর সঙ্গী হন। প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ গোস্বামী এবং বল্লভের মিলন *মধ্যলীলার* উনবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি (*রূপ-অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা*) থেকে জানা যায় যে, শ্রীরূপ ও অনুপম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশেই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা মথুরায় যান, তখন সুবুদ্ধি রায় মথুরা নগরীতে শুকনো কাঠ বিক্রয় করে নিজের পোষণ ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের পরিচর্যা করতেন। শ্রীরূপ ও অনুপম তাঁর কাছে গেলে, তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে করে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করেছিলেন। এভাবেই একমাস বৃন্দাবনে বাস করার পর তাঁরা পুনরায় সনাতন গোস্বামীর খোঁজে গঙ্গাতীরের পথে প্রয়াগে গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীসনাতন ভিন্ন পথ দিয়ে মথুরায় যাওয়ার ফলে তাঁর সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি। মথুরায় পৌঁছে সনাতন গোস্বামী সুবুদ্ধি রায়ের কাছে রূপ গোস্বামী ও অনুপমের কথা জানতে পেরেছিলেন। অনুপম ও শ্রীরূপ উভয়েই কাশীতে এসে মহাপ্রভুর কাছে সমস্ত কথা শুনে কয়েকদিন পরে গৌড়ে যাত্রা করেন। সেখানে বৈষয়িক ব্যবস্থা সমাধান করে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করার জন্য নীলাচলে যাত্রা করেন।

১৪৩৬ শকাব্দে পথে গঙ্গাতীরে অনুপমের শ্রীরামচন্দ্রের ধাম প্রাপ্তি হয়। জগন্নাথপুরীতে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুপমের অপ্রকট সংবাদ দেন। অনুপম ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত; তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত মত অনুসারে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজনের পথ সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র বলে জানতেন। *ভক্তিরত্নাকর* (১ম তরঙ্গ ৬৬৫—৬৬৭) গ্রন্থে অনুপমের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর।
'অনুপম'-নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর ॥
রঘুনাথ বিনা যেঁহ অন্য নাহি জানে।
সদা মত্ত রঘুনাথ বিগ্রহ-সেবনে ॥
সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য গোসাঞি।
আপনা' মানয়ে ধন্য ঐছে প্রভু পাই ॥

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৮০) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীরূপ গোস্বামী হচ্ছেন শ্রীরূপ-মঞ্জরী। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত গ্রন্থের তালিকা রয়েছে। নিম্নলিখিত ষোলটি গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়—(১) *হংসদূত*, (২) *উদ্ধব-সন্দেশ*, (৩)

কৃষ্ণজন্ম-তিথিবিধি, (৪ ও ৫) *গণোদ্দেশ-দীপিকা, বৃহৎ ও লঘু,* (৬) *স্তবমালা,* (৭) *বিদগ্ধমাধব,* (৮) *ললিতমাধব,* (৯) *দানকেলিকৌমুদী,* (১০) *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* (এই গ্রন্থটি সব চাইতে প্রসিদ্ধ), (১১) *উজ্জ্বল-নীলমণি,* (১২) *আখ্যাত-চন্দ্রিকা,* (১৩) *মথুরা-মহিমা,* (১৪) *পদ্যাবলী,* (১৫) *নাটক-চন্দ্রিকা* ও (১৬) *লঘুভাগবতামৃত।* শ্রীরূপ গোস্বামী সর্বতোভাবে বিষয় ত্যাগ করে ত্যাগীর জীবন অবলম্বন করেন এবং তাঁর সঞ্চিত ধন-সম্পদের অর্ধাংশ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দান করেন, এক চতুর্থাংশ কুটুম্বদের দান করেন এবং এক চতুর্থাংশ ভবিষ্যতে কোন সংকটের সময় লাগতে পারে বলে একজন ব্যবসায়ীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। জগন্নাথপুরীতে তিনি হরিদাস ঠাকুরের কুটিরে উপস্থিত হন এবং সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীর হস্তাক্ষরের প্রশংসা করতেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব অনুযায়ী শ্লোক রচনা করতে পারতেন এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি *ললিতমাধব* ও *বিদগ্ধমাধব* গ্রন্থ দুটি রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন, সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী, এই দুই ভাই যেন বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হলে, তিনি তাঁকেও বৃন্দাবন যেতে আদেশ দেন।

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৮১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন পূর্বলীলায় রতি-মঞ্জরী অথবা নামভেদে লবঙ্গ-মঞ্জরী। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সনাতন গোস্বামীর গুরুদেব বিদ্যাবাচস্পতি কখনও কখনও রামকেলি গ্রামে বাস করতেন এবং সনাতন গোস্বামী তাঁর কাছে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর গুরুর প্রতি এত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বৈদিক প্রথা অনুসারে যবন দর্শন হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু সনাতন গোস্বামী সব সময় মুসলমান নবাবের সঙ্গ করতেন। বৈদিক নিষেধের গুরুত্ব না দিয়ে তিনি মুসলমান নবাবের গৃহে যেতেন এবং তাই তিনি নিজেকে মুসলমান বলে মনে করতেন। তিনি অত্যন্ত বিনীত ও নম্র ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমি সব সময় নিম্নস্তরের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং আমার ব্যবহারও অত্যন্ত জঘন্য।" প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন বলে মনে করতেন, তাই তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলামেশা করার পরিবর্তে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গেই মেলামেশা করতেন। তিনি *হরিভক্তি-বিলাস* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের টীকা *বৈষ্ণব-তোষণী* রচনা করেন। ১৪৭৬ শকাব্দে তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্য *বৃহৎ-বৈষ্ণবতোষণী* রচনা করেন। ১৫০৪ শকাব্দে তিনি *লঘুতোষণী* সমাপ্ত করেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর চারজন মুখ্য অনুগামীর দ্বারা চারটি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন। রামানন্দ রায়ের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, ভক্ত কিভাবে কামদেবের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে পারেন। কামদেবের প্রভাব হচ্ছে যে, সুন্দরী রমণী দর্শন

করা মাত্র তার সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত হওয়া। শ্রীরামানন্দ রায় কামদেবের দর্প নাশ করেছিলেন। *জগন্নাথ-বল্লভ-নাটক* পরিচালনা করবার সময় তিনি অপূর্ব সুন্দরী যুবতীদের নৃত্যকলা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও তাদের যৌবনের সৌন্দর্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তিনি নিজে তাদের স্নান করাতেন, স্পর্শ করতেন, নিজের হাত দিয়ে তাদের অঙ্গ মার্জনা করতেন, কিন্তু তবুও তিনি অন্তরে কোন রকম বিকার অনুভব করেননি, যা উত্তম অধিকারী ভগবদ্ভক্তের পক্ষেই কেবল সম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন যে, সেটি কেবল রামানন্দ রায়ের পক্ষেই সম্ভব। তেমনই, স্বরূপ দামোদরের দ্বারা নিরপেক্ষতার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি প্রয়োজন হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। এটিও অন্য কারও পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। হরিদাস ঠাকুরের মাধ্যমে তিনি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়েছেন। নবাবের জল্লাদেরা যদিও বাইশ বাজারে তাঁকে চাবুক দিয়ে অমানুষিকভাবে প্রহার করেছিল, তবুও তিনি তার প্রতিবাদ করেননি। তেমনই, শ্রীসনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে তিনি দৈন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দীন ও বিনয়ী।

মধ্যলীলার উনবিংশতিতম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে সনাতন গোস্বামী রাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নবাবকে জানান যে, অসুস্থ থাকার ফলে তিনি রাজকার্যে যোগ দিতে পারছেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তিনি তখন গৃহে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করছিলেন। রাজবৈদ্যের কাছ থেকে সেই খবর পেয়ে নবাব তৎক্ষণাৎ তাঁর অভিসন্ধি কি, তা জানার জন্য তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন। নবাব সনাতন গোস্বামীকে তাঁর সঙ্গে উড়িষ্যা অভিযানে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, নবাব তখন তাঁকে বন্দী করতে আদেশ দেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী গৃহত্যাগ করার সময় একটি চিরকুট লিখে সনাতন গোস্বামীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, একজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছে তিনি কিছু টাকা গচ্ছিত রেখে গেছেন। কারাধ্যক্ষকে সেই টাকা উৎকোচ দিয়ে সনাতন গোস্বামী যেন মুক্ত হন। তারপর ঈশান নামক এক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তাঁরা একটি সরাইখানায় রাত্রি যাপন করেন এবং সেই সরাইখানার মালিক এক গণৎকারের মাধ্যমে জানতে পারে যে, ঈশানের কাছে কিছু স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। সে ঠিক করেছিল যে, রাত্রে সনাতন গোস্বামী ও ঈশানকে হত্যা করে সে সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলি হরণ করবে। কিন্তু তখন সনাতন গোস্বামী লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেই সরাইখানার মালিক যদিও তাঁদের চিনত না, তবুও সে বিশেষভাবে তাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনের চেষ্টা করছে। তাই তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, ঈশান নিশ্চয়ই গোপনে কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং সরাইখানার মালিক তা জানতে পেরে সেগুলি নেওয়ার জন্য তাঁদের হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। ঈশানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সনাতন গোস্বামী জানতে পেরেছিলেন যে, সত্যি তার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলি সরাইখানার মালিককে দিয়ে দিতে নির্দেশ

দেন এবং তাকে অনুরোধ করতে যে, সে যেন জঙ্গল পার হতে তাঁদের সাহায্য করে। এভাবেই এই অঞ্চলের ডাকাতদের সর্দার সেই সরাইখানার মালিকের সহায়তায় দুর্গম বনপথ পার হয়ে তাঁরা হাজিপুরে এসেছিলেন। এই হাজিপুর এখন হাজারিবাগ নামে পরিচিত। সেখানে তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীকান্ত তাঁকে সেখানে কিছুদিন থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামী তাঁর সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তবে বিদায় নেওয়ার আগে শ্রীকান্তের দেওয়া অত্যন্ত মূল্যবান একখানি কম্বল তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বারাণসীতে পৌঁছে চন্দ্রশেখরের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন গোস্বামী মস্তক মুণ্ডন করেন এবং ভিক্ষুক বেশ বা বাবাজীর বেশ গ্রহণ করেন। তিনি তখন মিশ্রের পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিধান করেন এবং জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসাদ সেবন করেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে তত্ত্বজিজ্ঞাসা করলে, তিনি স্বয়ং সনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে সব কিছু শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি সনাতন গোস্বামীকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করতে নির্দেশ দেন এবং বৈষ্ণব আচার-আচরণ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করতে ও বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে আদেশ দেন। সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করার জন্য মহাপ্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করেন এবং আত্মারাম শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করেন।

সনাতন গোস্বামী রাজপথ দিয়ে বৃন্দাবনে ফিরে যান এবং মথুরায় সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবন থেকে ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়ে জগন্নাথপুরীতে যাওয়ার সময় তাঁর গায়ে এক রকম ঘা হয়। সেই জন্য তিনি সংকল্প করেছিলেন যে, জগন্নাথের রথের চাকার তলায় পড়ে তিনি দেহত্যাগ করবেন। কিন্তু অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথা জানতে পেরে, তাঁকে তিরস্কার করে সেই কর্ম থেকে নিরস্ত করেন। তারপর সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে যখন হরিদাস ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি অনুপমের অপ্রকট সংবাদ পান। পরে সনাতন গোস্বামী হরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করেন। জগন্নাথদেবের বিধিমার্গীয় সেবকদের স্পর্শভয়ে তিনি সমুদ্রতীরের উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যান। তা দেখে মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। জগদানন্দের কথায় তিনি বৃন্দাবন ফিরে যেতে মনস্থ করেন এবং সেই জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ প্রার্থনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর চরিত্রের প্রশংসা করেন এবং সনাতন গোস্বামীর অপ্রাকৃত দেহ প্রীতিভরে আলিঙ্গন করেন, তাঁর ফলে সনাতন গোস্বামী দিব্যদেহ প্রাপ্ত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে এক বছর জগন্নাথপুরীতে থাকতে বলেন। তারপর তিনি যখন বৃন্দাবনে ফিরে যান, তখন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলন হয় এবং দুই ভাই বৃন্দাবনে বাস করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী পূর্বে যেখানে বাস করতেন, সেই রামকেলি গ্রাম এখন একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে এবং তার নাম গুপ্ত বৃন্দাবন। তা ইংরেজ বাজার থেকে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেখানে নিম্নলিখিত স্থানগুলি আছে—

(১) শ্রীসনাতন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ, (২) কেলিকদম্ব বৃক্ষ—এই বৃক্ষের নীচে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে রাত্রিবেলায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় এবং (৩) রূপসাগর—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সরোবর। এই সরোবরটির সংস্কার ও শ্রীরামকেলি পাটের লুপ্তকীর্তি উদ্ধারের জন্য মালদহে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রামকেলি সংস্কার সমিতি নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্লোক ৮৫

তাঁর মধ্যে রূপ-সনাতন—বড় শাখা।
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত শাখার মধ্যে রূপ ও সনাতন হচ্ছেন প্রধান। অনুপম, জীব গোস্বামী ও রাজেন্দ্র আদি অন্যান্য অনেকে হচ্ছেন তাঁদের উপশাখা।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৯৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীল জীব গোস্বামী হচ্ছেন বিলাস-মঞ্জরী নাম্নী গোপী। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* গভীর অনুরাগী ছিলেন। পরে সংস্কৃত শিক্ষা লাভের জন্য তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করেন। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার পর তিনি কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতির কাছে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তারপর বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। *শ্রীভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীল জীব গোস্বামী অন্তত পঁচিশটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সব কয়টি গ্রন্থই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ এবং সেগুলি হচ্ছে—(১) *হরিনামামৃত-ব্যাকরণ*, (২) *সূত্রমালিকা*, (৩) *ধাতুসংগ্রহ*, (৪) *কৃষ্ণার্চাদীপিকা*, (৫) *গোপালবিরুদাবলী*, (৬) *রসামৃতশেষ*, (৭) *শ্রীমাধব-মহোৎসব*, (৮) *শ্রীসঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ*, (৯) *ভাবার্থসূচক-চম্পূ*, (১০) *গোপালতাপনী-টীকা*, (১১) *ব্রহ্ম-সংহিতার টীকা*, (১২) *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা*, (১৩) *উজ্জ্বল-নীলমণির টীকা*, (১৪) *যোগসার-স্তবের টীকা*, (১৫) *অগ্নি পুরাণ*-এর বর্ণনা অনুসারে *গায়ত্রী-মন্ত্রের* ভাষ্য, (১৬) *পদ্ম পুরাণোক্ত* শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের বর্ণনা, (১৭) *শ্রীমতী রাধারাণীর করপদস্থিত* চিহ্নের বর্ণনা, (১৮) *গোপালচম্পূ* (পূর্ব ও উত্তর বিভাগ) এবং (১৯-২৫) সাতটি সন্দর্ভ—*ক্রম, তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি সন্দর্ভ*। বৃন্দাবনে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীল জীব গোস্বামী বাংলা, উড়িষ্যা ও সমগ্র পৃথিবীর বৈষ্ণব সমাজের আচার্য হন এবং সকলকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারিত ভগবদ্ভক্তির পথে পরিচালিত করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে আমার ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমেরিকায় আসার আগে পর্যন্ত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্রীল জীব গোস্বামীর প্রকটকালেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনা করেন। কিছুকাল পরে শ্রীল জীব

গোস্বামী গৌড়দেশ থেকে আগত শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য', 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করে যাবতীয় গোস্বামী শাস্ত্রগ্রন্থ সহ গৌড়দেশে নামপ্রেম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেন। প্রথমে বিষ্ণুপুরের নিকটে সেই সমস্ত গ্রন্থরত্ন অপহরণের সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন এবং পরে আবার সেই গ্রন্থসমূহ উদ্ধারের সংবাদও পান। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র সেনকে এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর প্রকটকালে শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী, তাঁর কয়েকজন ভক্তসহ বৃন্দাবনে এসেছিলেন। গৌড়দেশ থেকে আগত বৈষ্ণবদের প্রতি শ্রীল জীব গোস্বামী অত্যন্ত দয়াপরবশ ছিলেন। গৌড়দেশ থেকে ভক্তরা এলে, তিনি তাঁদের প্রসাদসেবা ও থাকবার ব্যবস্থা করে দিতেন। তাঁর শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস অধিকারী তাঁর গ্রন্থে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীগণের গ্রন্থের তালিকা প্রদান করেছেন।

প্রাকৃত সহজিয়ারা শ্রীল জীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে তিনটি অপবাদ প্রচার করে। এই কারণে তাদের কৃষ্ণ-বৈমুখ্যহেতু গুরু-বৈষ্ণবের চরণে অপরাধের ফলে, তাদের সর্বনাশের পথই কেবল প্রশস্ত হয়। তাদের প্রথম অভিযোগটি হচ্ছে—এক সময় জড় প্রতিষ্ঠা লোলুপ এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিষ্কিঞ্চন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের কাছ থেকে জয়পত্র লিখিয়ে নিয়ে গুরুবর্গের (শ্রীরূপ-সনাতনের) মূর্খতা জ্ঞাপন করে শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখে দিতে বলেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী তা দিতে অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে, তিনি সেই দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করেন। এভাবেই গুরুবর্গের অপবাদকারী অসৎ পণ্ডিতকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা শ্রীজীব গোস্বামীর পক্ষে সংগত আচরণই হয়েছে। কিন্তু মূর্খ সহজিয়ারা গুরুদেবের মর্যাদা যে কি বস্তু, তা না জেনে এই বিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তাঁর এই আচরণহেতু তৃণাদপি সুনীচতা ও অমানিত্ব ধর্ম অবলম্বনে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। তারা জানে না যে, নিজের মান খর্ব হলে তা সহ্য করা হচ্ছে অমানিত্ব। কিন্তু যখন হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, তখন প্রতিবাদ না করার যে কপট বিনয়, তা বৈষ্ণবোচিত আচরণ নয়, তা হচ্ছে কাপুরুষতা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* (৩) বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

"নিজেকে পথের পাশে পড়ে থাকা তৃণের থেকেও দীন বলে মনে করে, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, অমানী হয়ে এবং অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে নিরন্তর ভগবানের নাম করা উচিত।" কিন্তু তা সত্ত্বেও, মহাপ্রভু যখন জানতে পারেন যে, জগাই ও মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আঘাত করেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি ক্রোধে অগ্নিশিখার মতো উদ্দীপ্ত হয়ে সেখানে এসেছিলেন এবং তাদের সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের ব্যবহারের মাধ্যমে এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ

করে গেছেন। নিজের বিরুদ্ধে সমস্ত নিন্দা ও অপবাদ সহ্য করতে হবে। কিন্তু যখন গুরুবর্গের ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে নিন্দা বা অপবাদ হবে, তখন বিনয় অথবা বিনীত হওয়া উচিত নয়। তখন তার বিরুদ্ধে সিংহ-বিক্রমে রুখে দাঁড়াতে হবে। এটিই হচ্ছে গুরু ও বৈষ্ণবের সেবকের কর্তব্য। যে মানুষ গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য দাসত্বের তত্ত্ব জানেন, তিনি সেই তথাকথিত পণ্ডিতের, তাঁর গুরুবর্গ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে পরাজিত করার গর্ব যেভাবে খর্ব করেছিলেন, তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মানসে প্রাকৃত সহজিয়ারা একটি গল্প তৈরি করেছে যে, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* রচনা করার পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন তাঁর পাণ্ডুলিপিটি জীব গোস্বামীকে দেখান, তখন জীব গোস্বামী তাঁর পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে করে সেটি একটি কূপের মধ্যে ফেলে দেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করেন। সৌভাগ্যবশত *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* একটি প্রতিলিপি মুকুন্দ নামে এক ব্যক্তির কাছে ছিল, তাই পরবর্তীকালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এই গল্পটি গুরু-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদ রটানোর এক জঘন্য দৃষ্টান্ত। এই ধরনের গল্প কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়।

শ্রীল জীব গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রাকৃত সহজিয়াদের অন্য একটি অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি ব্রজগোপীদের পরকীয়া-রস স্বীকার না করে স্বকীয়া-রস অনুমোদন করে দেখিয়েছেন যে, রাধা-কৃষ্ণ সামাজিকভাবে বিবাহিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জীব গোস্বামীর প্রকটকালে তাঁর কয়েকজন অনুগামী ব্রজগোপিকাদের পরকীয়া-রস অপছন্দ করেন। তাদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী স্বকীয়া-রসের সমর্থন করেছিলেন, কেন না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সহজিয়ারা পরকীয়া-রসের অজুহাত দেখিয়ে নোংরামি করবে, যা তারা বর্তমানে করছে। দুর্ভাগ্যবশত, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে সহজিয়ারা পরকীয়া-রসে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার নাম করে অবৈধভাবে স্ত্রীসঙ্গ করে। ভবিষ্যতে যে এটা হবে তা দর্শন করে শ্রীল জীব গোস্বামী স্বকীয়া-রস সমর্থন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আচার্যেরা তা অনুমোদন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী কখনই ব্রজের অপ্রাকৃত পরকীয়া-রসের বিরোধী ছিলেন না এবং অন্য কোন বৈষ্ণবও তা অননুমোদন করেননি। শ্রীল জীব গোস্বামী ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পূর্বতন বৈষ্ণবাচার্য ও গুরুবর্গ শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁকে অন্যতম শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৮৬

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

পরম মালীর ইচ্ছার প্রভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শাখা প্রবলভাবে বর্ধিত হল এবং বাড়তে বাড়তে তা সমস্ত পশ্চিম দেশ আচ্ছাদিত করল।

শ্লোক ৮৭

আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয় ।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত এবং হিমালয় পর্বতের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে তা বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার আদি সমস্ত তীর্থসহ সারা ভারত জুড়ে বিস্তার লাভ করল।

শ্লোক ৮৮

দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল ।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুটি শাখার ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল প্রচুরভাবে বিতরিত হল এবং এই ফল আস্বাদন করে সমস্ত মানুষ উন্মত্ত হয়ে গেল।

শ্লোক ৮৯

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার ।
তাহাঁ প্রচারিল দোঁহে ভক্তি-সদাচার ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা সাধারণত বুদ্ধিমান নয় এবং আচারশীল নয়, কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রভাবে তারা ভগবদ্ভক্তি ও সদাচার সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করল।

তাৎপর্য

এমন নয় যে কেবল পশ্চিম ভারতের মানুষেরা মুসলমানদের সঙ্গ প্রভাবে কলুষিত হয়েছিল, তবে ভারতবর্ষের যত পশ্চিমে যাওয়া যায়, দেখা যায় যে মানুষ তত বেশি বৈদিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকালে বৈদিক সংস্কৃতি সর্বত্রই প্রচারিত ছিল। কিন্তু মানুষ ধীরে ধীরে অবৈদিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল আচরণ বর্জন করেছে। অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী পশ্চিম ভারতে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর প্রচারকেরা

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করছেন এবং বৈষ্ণব-আচার শিক্ষা দিচ্ছেন। এভাবেই তাঁরা ম্লেচ্ছ ও যবনদের কলুষমুক্ত করছেন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আমাদের সমস্ত ভক্তরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, নেশা, আমিষ আহার ও দ্যূতক্রীড়া আদি সব রকমের পুরানো বদ অভ্যাসগুলি বর্জন করেছে। পাঁচশো বছর আগে এই সমস্ত আচরণগুলি পূর্ব ভারতের মানুষদের কাছে বিশেষ করে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ সারা ভারতবর্ষ এই সমস্ত অবৈদিক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যা অনেক সময় সরকারও সমর্থন করে।

শ্লোক ৯০

শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্তি-সেবার প্রচার ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শাস্ত্রপ্রমাণের ভিত্তিতে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনের সমস্ত লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেছিলেন এবং শ্রীমূর্তি-সেবার প্রচার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখন যেখানে আমরা শ্রীরাধাকুণ্ড দেখতে পাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় সেটি ছিল একটি ধানক্ষেত। একটি ছোট্ট জলাশয় সেখানে ছিল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই জলে স্নান করেন এবং ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন যে, সেই স্থলেই রাধাকুণ্ড অবস্থিত। তাঁর নির্দেশ অনুসারে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাধাকুণ্ড পুনরুদ্ধার করেন। গোস্বামীগণ যে কিভাবে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করেছিলেন এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তেমনই, গোস্বামীগণের প্রচেষ্টার ফলেই বৃন্দাবনের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোস্বামীগণ প্রথমে বৃন্দাবনের সাতটি মুখ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, যথা—শ্রীমদনমোহন মন্দির, শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির, শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধা-দামোদর মন্দির ও শ্রীগোকুলানন্দজীর মন্দির।

শ্লোক ৯১

মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথদাস ।
সর্ব ত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের ষট্‌চত্বারিংশত্তিতম শাখা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ভৃত্য। তাঁর সমস্ত জাগতিক সম্পদ ত্যাগ করে তিনি সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বলেছেন, "শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জন্ম হয় খুব সম্ভবত ১৪১৬ শকাব্দে কায়স্থ জমিদার হিরণ্য মজুমদারের ভ্রাতা গোবর্ধন মজুমদারের পুত্ররূপে। যে গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তার নাম শ্রীকৃষ্ণপুর। কলকাতা থেকে বর্ধমানের রেললাইনে ত্রিশবিঘা (এখন তার নাম আদিসপ্তগ্রাম) নামক একটি স্টেশন আছে। সেই স্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম। সেখানে ছিল শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পূর্বপুরুষদের নিবাস। তাঁর পূর্বাশ্রমের পিতা শ্রীগোবর্ধন দাসের প্রতিষ্ঠিত বলে প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে বিরাজ করছেন। সেই মন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ রয়েছে, কিন্তু কোন নাটমন্দির নেই। হরিচরণ ঘোষ নামক কলকাতার সিমলা অঞ্চলের এক ধনী ব্যক্তি সেই মন্দিরটির সংস্কার করেছেন। মন্দির প্রাঙ্গণটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। যে গৃহে শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করছেন, তারই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রস্তর নির্মিত একটি ছোট্ট বেদি রয়েছে। সেখানে বসে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন করতেন। মন্দিরের পাশেই রয়েছে মৃতপ্রায় সরস্বতী নদী।"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বৈষ্ণব এবং যথেষ্ট ধনী। তাঁর গুরু ছিলেন যদুনন্দন আচার্য। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যদিও সংসারী ছিলেন, কিন্তু জমিদারী ও স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। তাঁর গৃহত্যাগ করার প্রবণতা দেখে তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত তাঁকে চোখে চোখে রাখার জন্য বিশেষ দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাদের ফাঁকি দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য জগন্নাথপুরীতে চলে যান। সেই ঘটনাটি ঘটে ১৪৩৯ শকাব্দে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী *স্তবমালা* অথবা *স্তবাবলী, দানচরিত* ও *মুক্তাচরিত* নামক তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দীর্ঘকাল প্রকট ছিলেন এবং তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি রাধাকুণ্ডে বাস করেছিলেন। যেই স্থানে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভগবদ্ভজন করতেন, রাধাকুণ্ডের তীরে সেই স্থানটি এখনও বিরাজমান। তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবে আহার ত্যাগ করেছিলেন, তাই তার শরীর অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি কেবল ভগবানের নাম গ্রহণেই নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতেন। ধীরে ধীরে তিনি নিদ্রা হ্রাস করে অবশেষে প্রায় নিদ্রাই যেতেন না। কথিত আছে যে, তাঁর চক্ষু সর্বদা অশ্রুপূর্ণ থাকত। শ্রীনিবাস আচার্য যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে দেখতে যান, তখন তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করেন। গৌড়দেশে প্রচার করার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৮৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী হচ্ছেন রস-মঞ্জরী। কখনও কখনও বলা হয় যে, তিনি হচ্ছেন রতি-মঞ্জরী।

শ্লোক ৯২

প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে ।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যান, তখন মহাপ্রভু তাঁকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করেন। এভাবেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুপ্তসেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

গুপ্তসেবা বলতে বোঝানো হয়েছে, যে সমস্ত সেবাকার্যে বাইরের লোকের কোন অধিকার নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর স্নান, ভোজন, বিশ্রাম ও অঙ্গমর্দন আদি সেবা করতেন এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁকে সাহায্য করতেন। এভাবেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯৩

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন ।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি জগন্নাথপুরীতে ষোল বছর ধরে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অন্তর্ধানের পর, তিনি জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবনে যান।

শ্লোক ৯৪

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া ।
গোবর্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংকল্প করেছিলেন যে, বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করবেন এবং তারপর গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করবেন।

তাৎপর্য

সাধুদের মধ্যে গোবর্ধন পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দেহত্যাগ করার প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বরূপ দামোদরের অপ্রকটের পর, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে তাঁদের বিরহ বেদনা এতই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তিনি বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বত থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। তবে তা করার আগে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯৫

এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে ।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সংকল্প করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে এলেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করে তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৯৬

তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল ।
নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই ভাই তাঁকে মরতে দিলেন না। তাঁকে তাঁদের তৃতীয় ভাই করে তাঁদের কাছে রেখে দিলেন।

শ্লোক ৯৭

মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর ।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন দামোদরের সহকারী, তাই তিনি মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বহু লীলাবিলাসের কথা জানতেন। দুই ভাই রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী নিরন্তর তাঁর মুখে সেই সমস্ত লীলা শ্রবণ করতেন।

শ্লোক ৯৮

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন ।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ধীরে ধীরে অন্নজল ত্যাগ করলেন এবং একদিন দুই দিন অন্তর কেবল কয়েক ফোঁটা মাঠা খেতেন।

শ্লোক ৯৯

সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম ।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন তিনি ভগবানকে এক হাজার বার দণ্ডবৎ-প্রণাম করতেন এবং অন্ততপক্ষে এক লক্ষ নাম গ্রহণ করতেন এবং দুই হাজার বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করতেন।

শ্লোক ১০০

রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন ।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

দিন-রাত তিনি মানসে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবা করতেন এবং প্রতিদিন তিনি মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম অনুসরণ করে, ভগবদ্ভজন সম্বন্ধে আমাদের বহু কিছু জানবার রয়েছে। সমস্ত গোস্বামীরা যে কিভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা করতেন, সেই কথা শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামী-অষ্টকে বর্ণনা করেছেন—*কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী*। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়, বিশেষ করে ভগবানের নাম কীর্তন করতে হয়।

শ্লোক ১০১

তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিদিন তিনবার রাধাকুণ্ডে স্নান করতেন এবং ব্রজবাসী বৈষ্ণব দেখলেই তাঁকে আলিঙ্গন করতেন এবং বহু সম্মান প্রদর্শন করতেন।

শ্লোক ১০২

সার্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে ।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রতিদিন তিনি সাড়ে বাইশ ঘণ্টারও অধিক সময় ভগবদ্ভক্তি সাধন করতেন এবং দুই ঘণ্টারও কম সময় নিদ্রা যেতেন এবং কোন কোন দিন তাও সম্ভব হত না।

শ্লোক ১০৩

তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার ।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যেভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেছিলেন, তা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী হচ্ছেন আমার প্রভু।

তাৎপর্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তাঁর বিশেষ পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে তিনি বলেছেন, *শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ/চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।* কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত কেউ কেউ মনে করেন যে, এই রঘুনাথ শব্দে তিনি রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করেছেন, কেন না স্থানান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই কথা স্বীকার করেননি। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু ছিলেন, তা তিনি স্বীকার করেন না।

শ্লোক ১০৪

ইঁহা-সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত ভক্তরা কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তা আমি বিস্তারিতভাবে পরে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১০৫

শ্রীগোপাল ভট্ট এক শাখা সর্বোত্তম।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্তচত্বারিংশতিতম শাখা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হচ্ছেন সর্বোত্তম। তিনি নিরন্তর শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ছিলেন শ্রীরঙ্গমের ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র। তিনি পূর্বে রামানুজ বৈষ্ণব ছিলেন এবং পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব হন। ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছিলেন, তখন চাতুর্মাস্যের সময় তিনি ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করেন। সেই সময় গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রাণভরে তাঁর সেবা করার সুযোগ পান। পরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁর পিতৃব্য সন্ন্যাসীপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন

অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেন না তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় সর্বতোভাবে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে বৃন্দাবনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করে তাঁরা দেহত্যাগ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন জানানো হয় যে, গোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে গেছেন এবং শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীকে পত্রে উপদেশ দেন যে, তাঁরা যেন গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে তাঁদের ছোট ভাইয়ের মতো মনে করে তাঁর দেখাশুনা করেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রতি গভীর স্নেহের বশবর্তী হয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী *হরিভক্তি-বিলাস* নামক এক মহান বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেটি তাঁর নামে প্রকাশ করেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর নির্দেশে গোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনের সাতটি মুখ্য বিগ্রহের অন্যতম শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ মন্দিরের সেবাইতরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করার পূর্বে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন সমস্ত বৈষ্ণবদের অনুমতি ভিক্ষা করেন, তখন গোপাল ভট্ট গোস্বামীও তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে অনুরোধ করেন যে, সেই গ্রন্থে তিনি যেন তাঁর নাম উল্লেখ না করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারেননি, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* দু-একটি জায়গাতেই কেবল তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। *তত্ত্বসন্দর্ভের* শুরুতে শ্রীল জীব গোস্বামী লিখেছেন, "শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর অত্যন্ত প্রিয় সুহৃৎ এবং দাক্ষিণাত্যবাসী দ্বিজকুলোদ্ভূত শ্রীগোপাল ভট্ট একখানি গ্রন্থ লেখেন। তাতে কোথাও ক্রমভাবে, কোথাও ক্রমভঙ্গভাবে, কোথাও খণ্ড খণ্ডভাবে যা লিখিত ছিল, তা ক্ষুদ্র জীব আমি শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি গুরু-পরম্পরাভুক্ত বৈষ্ণব আচার্যদের লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করে, তা ক্রমানুসারে যথাযথভাবে লিখছি।" *ভগবৎ-সন্দর্ভের* শুরুতেও শ্রীল জীব গোস্বামী একই রকম কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী *সৎক্রিয়াসার-দীপিকা* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং *হরিভক্তি-বিলাস* সম্পাদনা করেন। তিনি *ষট্‌সন্দর্ভের* একটি কারিকা এবং *কর্ণামৃতের* টীকা রচনা করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৮৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণলীলার অনঙ্গ-মঞ্জরী। কখনও তাঁকে গুণ-মঞ্জরীর অবতার বলেও বর্ণনা করা হয়। শ্রীনিবাস আচার্য ও গোপীনাথ পূজারী হচ্ছেন তাঁর দুজন শিষ্য।

শ্লোক ১০৬

শঙ্করারণ্য—আচার্য-বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র,—উপশাখা লেখা ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্য শঙ্করারণ্য হচ্ছেন বৃক্ষের অষ্টচত্বারিংশতিতম শাখা। তাঁর থেকে মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র আদি উপশাখা প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শঙ্করারণ্য হচ্ছেন বিশ্বম্ভরের (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর) অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নাম। ১৪৩২ শকাব্দে তিনি সোলাপুর জেলার পাণ্ডেরপুর নামক তীর্থে অপ্রকট হন। সেই কথা *মধ্যলীলার* নবম পরিচ্ছেদে ২৯৯ ও ৩০০ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন, "মুকুন্দ বা মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি পাঠশালা খুলেছিলেন এবং মুকুন্দের পুত্র পুরুষোত্তম তাঁর ছাত্র ছিলেন। কাশীনাথ ছিলেন বিশ্বম্ভরের বিবাহের সংযোগকর্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তিনি রাজপণ্ডিত সনাতনকে তাঁর কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর বিবাহ দেবার পরামর্শ দেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৫০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাশীনাথ হচ্ছেন কুলক নামক ব্রাহ্মণের অবতার, যাঁকে সত্রাজিৎ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সত্যভামার বিবাহের আয়োজন করতে পাঠিয়েছিলেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৩৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, রুদ্র বা শ্রীরুদ্ররাম পণ্ডিত পূর্বে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা বরূথপ। মাহেশের এক মাইল উত্তরে বল্লভপুরে শ্রীরুদ্ররাম পণ্ডিতের দ্বারা নির্মিত একটি বৃহৎ মন্দিরে তাঁর স্থাপিত শ্রীরাধাবল্লভজী বিরাজ করছেন। তাঁর ভাই যদুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরেরা চক্রবর্তী ঠাকুর নামে পরিচিত এবং তাঁরা শ্রীরাধাবল্লভজীর বর্তমান সেবাইত। পূর্বে রথযাত্রার সময় মাহেশ থেকে শ্রীজগন্নাথদেব বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভজীর মন্দিরে আসতেন। কিন্তু বাংলা ১২৬২ সাল থেকে সেই দুটি মন্দিরের সেবাইতদের মনোমালিন্যের ফলে সেই প্রথা উঠে গেছে।"

শ্লোক ১০৭

শ্রীনাথ পণ্ডিত—প্রভুর কৃপার ভাজন ।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

উনপঞ্চাশত্তম শাখা শ্রীনাথ পণ্ডিত ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাভাজন। তাঁর কৃষ্ণসেবা দেখে ত্রিভুবনের প্রতিটি জীব আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন, "কুমারহট্ট থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ সেনের বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেখানে আর একটি সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীনাথ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরায় নামক শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতিবৃহৎ সেই মন্দিরটি প্রস্তুত করেন

কলকাতার পাথুরিয়া-ঘাটের নিমাই মল্লিক নামক এক বড় জমিদার। সেই মন্দিরটির সম্মুখে এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ রয়েছে এবং সেখানে ভোগরন্ধনের গৃহ এবং অতিথিশালা প্রভৃতিও রয়েছে। প্রাঙ্গনটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই মন্দিরটি মাহেশের মন্দির থেকেও বড়। মন্দিরের সম্মুখে একটি অনুষ্টুপ শ্লোকে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম, তার পিতার নাম, পিতামহের নাম ও তারিখ খোদিত রয়েছে। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত ছিলেন শিবানন্দ সেনের তৃতীয় পুত্র যিনি পরমানন্দ কবিকর্ণপুর নামে পরিচিত, তাঁর গুরুদেব। অনুমান করা হয় যে, কবিকর্ণপুরের সময় শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রকাশিত হয়েছেন। কিং বদন্তী রয়েছে যে, মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভদ্র প্রভু একটি অত্যন্ত সুন্দর সুবিশাল প্রস্তর নিয়ে আসেন এবং সেটি থেকে বল্লভপুরের শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ, খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ ও কাঁচড়াপাড়ার শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রকাশিত হয়েছেন। শিবানন্দ সেনের প্রাচীন বাস ছিল কাঁচড়াপাড়ায় গঙ্গার তীরে, সেখানে ভগ্নপ্রায় একটি ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। শুনা যায়, নিমাই মল্লিক কাশী যাওয়ার পথে এখানে নেমে শ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরের ভগ্ন অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে বর্তমান সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন।"

শ্লোক ১০৮

জগন্নাথ আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস ।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের পঞ্চাশত্তম শাখা শ্রীজগন্নাথ আচার্য ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় সেবক। চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে তিনি গঙ্গাতীরে বাস করতে মনস্থ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১১১) বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্ব লীলায় জগন্নাথ আচার্য ছিলেন নিধুবনের দুর্বাসা।

শ্লোক ১০৯

কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত-শেখর ।
কবিচন্দ্র, আর কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের একপঞ্চাশৎ, দ্বিপঞ্চাশৎ, ত্রিপঞ্চাশৎ ও চতুস্পঞ্চাশত্তম শাখা হচ্ছেন যথাক্রমে কৃষ্ণদাস বৈদ্য, পণ্ডিত শেখর, কবিচন্দ্র ও মহান কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৭১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীনাথ মিশ্র ছিলেন চিত্রাঙ্গী এবং কবিচন্দ্র ছিলেন মনোহরা গোপী।

শ্লোক ১১০

শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান ।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চপঞ্চাশত্তম শাখা হচ্ছেন শ্রীনাথমিশ্র, ষট্‌পঞ্চাশত্তম শাখা হচ্ছেন শুভানন্দ, সপ্তপঞ্চাশত্তম শাখা হচ্ছেন শ্রীরাম, অষ্টপঞ্চাশত্তম শাখা হচ্ছেন ঈশান, একোনষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীনিধি, ষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীগোপীকান্ত এবং একষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন মিশ্র ভগবান।

তাৎপর্য

শুভানন্দ হচ্ছেন পূর্বলীলায় ব্রজের মালতী। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের সময়, রথাগ্রে নর্তনকারী সাতটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ দলের অন্যতম গায়ক ছিলেন এবং তিনি ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত ফেনা পান করেছিলেন। ঈশান ছিলেন শ্রীমতী শচীদেবীর ভৃত্য এবং শচীমাতা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্লোক ১১১

সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন ।
মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বিষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন সুবুদ্ধি মিশ্র, ত্রিষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন হৃদয়ানন্দ, চতুঃষষ্টিতম শাখা কমলনয়ন, পঞ্চষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন মহেশ পণ্ডিত, ষট্‌ষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীকর এবং সপ্তষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীমধুসূদন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "সুবুদ্ধি মিশ্র হচ্ছেন বৃন্দাবনের গুণচূড়া। তিনি শ্রীখণ্ড থেকে তিন মাইল পশ্চিমে বেলগাঁ নামক গ্রামে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বর্তমান বংশধরের নাম শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী।"

শ্লোক ১১২

পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস ।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের অষ্টষষ্টিতম শাখা হচ্ছেন পুরুষোত্তম, একোনসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীগালীম, সপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন জগন্নাথ দাস, একসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য এবং দ্বিসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন দ্বিজ হরিদাস।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "এই দ্বিজ হরিদাস *অষ্টোত্তর-শতনামের* রচয়িতা কি না সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। শ্রীদাম ও গোকুলানন্দ নামক তাঁর দুই পুত্র শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্য ছিল। তাদের গ্রাম কাঞ্চনগড়িয়া মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ হতে পঞ্চম স্টেশন বাজারসাউ স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত।"

শ্লোক ১১৩

রামদাস, কবিচন্দ্র, শ্রীগোপালদাস ।
ভাগবতাচার্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রিসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন রামদাস, চতুঃসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন কবিচন্দ্র, পঞ্চসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীগোপাল দাস, ষট্‌সপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন ভাগবতাচার্য এবং সপ্তসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন ঠাকুর সারঙ্গ দাস।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "*গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (২০৩) বর্ণনা করা হয়েছে, 'ভাগবতাচার্য *শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়।' শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বরাহনগরে যান, তখন তিনি এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়েছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* মহান পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখা মাত্রই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* পড়তে লাগলেন। ভক্তিযোগ সমন্বিত তাঁর *ভাগবত* ব্যাখ্যা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবৎ-প্রেমানন্দে আবিষ্ট হন। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'আমি পূর্বে কাউকে *শ্রীমদ্ভাগবতের* এমন সুন্দর বিশ্লেষণ করতে শুনিনি। তাই আমি তোমাকে ভাগবতাচার্য নাম দিলাম। এখন থেকে তোমার একমাত্র কার্য হচ্ছে *শ্রীমদ্ভাগবত* আবৃত্তি করা, এছাড়া তোমার আর কোন কাজ নেই। এটিই হচ্ছে আমার নির্দেশ।' তাঁর প্রকৃত নাম ছিল রঘুনাথ। কলকাতার প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে তাঁর বরাহ নগরের শ্রীপাট এখনও বর্তমান। শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের একজন শিষ্য এই শ্রীপাটটির দেখাশুনা করছেন। তবে বর্তমানে এই শ্রীপাটটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ এবং বাবাজী মহারাজ থাকাকালে যেভাবে তার পরিচালনা হচ্ছিল এখন ততো সুষ্ঠভাবে পরিচালনা হচ্ছে না।

"ঠাকুর সারঙ্গ দাসের আর একটি নাম হচ্ছে শার্ঙ্গঠাকুর। কেউ কেউ তাঁকে শার্ঙ্গপাণি বা শার্ঙ্গধরও বলেন। ইনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুম-দ্বীপে বাস করে গঙ্গাতীরে নির্জনে ভজন করতেন। তিনি কোন শিষ্য গ্রহণ করতে চাননি, কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বারবার তাঁকে শিষ্য গ্রহণ করার জন্য প্রেরণা দিতে থাকেন। তাই একদিন তিনি ঠিক করেন যে, পরের দিন সকালবেলায় যার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হবে তাকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন। পরের দিন সকালবেলায় তিনি যখন গঙ্গায় স্নান করছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে তাঁর পাদদেশে একটি মৃতদেহ সংলগ্ন হয়। তাকেই পুনর্জীবন প্রদান করে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই শিষ্যটি পরবর্তীকালে শ্রীঠাকুর মুরারি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর অনুগগণ বংশ-পরম্পরায় সম্প্রতি শর্ নামক গ্রামে বাস করছেন। শ্রীসারঙ্গ নামের সঙ্গে মুরারি কথাটি সংশ্লিষ্ট হয়েছে। তাই সারঙ্গমুরারি বলে তাঁর প্রসিদ্ধি এখনও সর্বত্র শোনা যায়। মামগাছি গ্রামে একটি মন্দির রয়েছে, যেটি শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বলে অনুমান করা হয়। অল্পদিন হল সেখানে একটি বকুল গাছের সম্মুখে একটি মন্দির তৈরি হয়েছে এবং সেটি গৌড়ীয় মঠের ভক্তরা পরিচালনা করছেন। মন্দিরের অবস্থা এখন পূর্বের থেকে অনেক ভাল হয়েছে। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৭২) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর হচ্ছেন ব্রজের নান্দীমুখী নাম্নী গোপী। কোন কোন ভক্ত বলেন যে, পূর্বে তিনি প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন। কিন্তু কবিকর্ণপূর বলেন, তাঁর পিতা শিবানন্দ সেন তা স্বীকার করেননি।"

শ্লোক ১১৪

জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ ।
গোপাল আচার্য, আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

মূলবৃক্ষের অষ্টসপ্ততিতম শাখা হচ্ছেন জগন্নাথ তীর্থ, একোনাশীতিতম শাখা হচ্ছেন বিপ্র শ্রীজানকীনাথ, অশীতিতম শাখা হচ্ছেন গোপাল আচার্য এবং একঅশীতিতম শাখা হচ্ছেন বিপ্র বাণীনাথ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "জগন্নাথ তীর্থ ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নয় জন প্রধান সন্ন্যাসী পার্ষদের মধ্যে অন্যতম। বাণীনাথ বিপ্র ছিলেন বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানা ও সমুদ্রগড় ডাকঘরের অন্তর্গত চাঁপাহাটি নামক গ্রামের অধিবাসী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী [শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিষ্য] মন্দিরটি সংস্কার করে সেবাপূজার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন এবং মন্দিরের পরিচালনার ভার শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠের উপর ন্যস্ত করেছেন। এই মন্দিরে শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের বিগ্রহদ্বয় শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে নিষ্ঠাভরে পূজিত হচ্ছেন। চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ উভয় ষ্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে।"

শ্লোক ১১৫

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব,—তিন ভাই ।
যাঁ-সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিন ভাই গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব হচ্ছেন যথাক্রমে দ্বিঅশীতিতম, ত্রিঅশীতিতম ও চতুরশীতিতম শাখা। তাঁদের কীর্তনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নাচতেন।

তাৎপর্য

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—এই তিন ভাই উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভূত ছিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে বাস করতেন এবং সেখানে তিনি শ্রীগোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মাধব ঘোষ ছিলেন সুদক্ষ কীর্তনীয়া। পৃথিবীতে তাঁর মতো কীর্তনীয়া আর কেউ ছিল না। তিনি বৃন্দাবনের গায়ক নামে পরিচিত ছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, এই তিন ভাই যখন সংকীর্তন করতেন, তখনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার* (১৮৮) বর্ণনা অনুসারে এই তিন ভাই হচ্ছেন যথাক্রমে কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণতুঙ্গা, যাঁরা শ্রীবিশাখা দেবী রচিত গীত গাইতেন। জগন্নাথপুরীতে রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে যে সাতটি কীর্তন দল কীর্তন করতেন, এই তিন ভাই তার একটি দলে থাকতেন। তাঁদের দলে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ছিলেন মুখ্য নর্তক। *মধ্যলীলার* ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ৪২ ও ৪৩ শ্লোকে তা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১১৬

রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি ।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরসে মগ্ন ছিলেন। তিনি ষোলটি গাঁটযুক্ত একটি বাঁশ দিয়ে একটি বাঁশি তৈরি করে তা বাজিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রামদাস অভিরাম ছিলেন খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী।

শ্লোক ১১৭

প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা ।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রচার করার জন্য বঙ্গদেশে ফিরে এলেন, তখন তিনজন ভক্তও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন।

শ্লোক ১১৮

রামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই তিনজন হচ্ছেন রামদাস, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ। গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে ছিলেন এবং তার ফলে পরম আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

শ্লোক ১১৯

ভাগবতাচার্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন ।
মাধবাচার্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ভাগবতাচার্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন, মাধবাচার্য, কমলাকান্ত ও শ্রীযদুনন্দন—এঁরা সকলেই হচ্ছেন চৈতন্যবৃক্ষের শাখা।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "শ্রীমাধবাচার্য ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা শ্রীমতী গঙ্গাদেবীর স্বামী। তিনি নিত্যানন্দের গণ পুরুষোত্তমের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে যে, গঙ্গাদেবীর বিবাহ কালে নিত্যানন্দ প্রভু মাধবাচার্যকে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ পাঁজিনগর দান করেন। পূর্ব রেলওয়ের জীরাট স্টেশনের সন্নিকটে তাঁর শ্রীপাট অবস্থিত। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৬৯) বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীমাধবাচার্য হচ্ছেন ব্রজের মাধবী গোপী। কমলাকান্ত হচ্ছেন অদ্বৈত প্রভুর গণের অন্তর্গত। তাঁর পুরো নাম ছিল কমলাকান্ত বিশ্বাস।"

শ্লোক ১২০

মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই, মাধাই ।
'পতিতপাবন' নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের একোননবতিতম ও নবতিতম শাখা জগাই ও মাধাই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাকৃপা পাত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 'পতিতপাবন' নামের সাক্ষী হচ্ছেন এই দুই ভাই।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১১৫) বর্ণিত হয়েছে যে, জগাই ও মাধাই নামক দুই ভাই পূর্বে জয় ও বিজয় নামক বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল ছিলেন, যাঁরা পরে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জগাই ও মাধাই উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তারা দস্যুবৃত্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার পাপকর্ম, বিশেষ করে নারীধর্ষণ, সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতিতে লিপ্ত ছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হরিনাম লাভ করে দুজন মহাভাগবত হন। মাধাইয়ের বংশধরেরা এখনও রয়েছে এবং তাঁরা কুলীন ব্রাহ্মণ। কাটোয়ার এক মাইল দক্ষিণে ঘোষহাট বা মাধাইতলা গ্রামে জগাই ও মাধাইয়ের সমাধি আছে। শোনা যায় যে, শ্রীগোপীচরণ দাসবাবাজী প্রায় ২০০ বছর আগে সেখানে শ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্লোক ১২১

গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন ।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

আমি সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড়ীয় ভক্তদের কথা বর্ণনা করলাম। বস্তুতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত অনন্ত, অতএব গণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ১২২

নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে ।
দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল নানা-রঙ্গে ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

আমি বিশেষভাবে এই সমস্ত ভক্তদের কথা বর্ণনা করলাম, কেন না তাঁরা বাংলাদেশ ও উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন এবং নানাভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধিকাংশ ভক্তরাই বাংলাদেশ ও উড়িষ্যায় বাস করতেন। তাই তাঁদের গৌড়ীয় ও উড়িয়া বলা হয়। বর্তমানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর এই বাণী সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে এবং খুব সম্ভবত ভবিষ্যতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের ইতিহাসে ইউরোপবাসী, আমেরিকাবাসী, কানাডাবাসী, অস্ট্রেলিয়াবাসী, দক্ষিণ আমেরিকাবাসী, এশিয়াবাসী এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশবাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরূপে বিখ্যাত হবেন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) ইতিমধ্যেই নবদ্বীপের শ্রীধাম মায়াপুরে একটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্তরা এসে সমবেত হচ্ছেন।

শ্লোক ১২৩

কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব কথন ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে যে ভক্তগণ ছিলেন, তাঁদের কথা আমি এখন সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

শ্লোক ১২৪-১২৬

নীলাচলে প্রভুসঙ্গে যত ভক্তগণ ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম দুইজন ॥ ১২৪ ॥
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১২৫ ॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস ।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যে সমস্ত ভক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজন—পরমানন্দ পুরী ও স্বরূপ দামোদর ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণস্বরূপ। অন্য ভক্তরা হচ্ছেন গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ বৈদ্য ও রঘুনাথ দাস।

তাৎপর্য

চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পানিহাটীতে বসবাস করছিলেন, তখন রঘুনাথ বৈদ্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি ছিলেন এক মহান ভক্ত এবং সর্বগুণে গুণান্বিত। *চৈতন্য-ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন বলরামের পত্নী রেবতী। তিনি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন, তার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হত। তিনি জগন্নাথপুরীতে সমুদ্রতীরে বাস করতেন এবং *স্থান-নিরূপণ* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১২৭

ইত্যাদিক পূর্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ ।
নীলাচলে রহি' করে প্রভুর সেবন ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত ভক্তরা প্রথম থেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন এবং যখন

জগন্নাথপুরীতে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন, তখন তাঁরা তার সঙ্গে সেখানেই থেকে গেলেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে তাঁর সেবা করতেন।

শ্লোক ১২৮

আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী ।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

গৌড়দেশবাসী সমস্ত ভক্তরা প্রতি বছর জগন্নাথপুরীতে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতেন।

শ্লোক ১২৯

নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন ।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে যে সমস্ত ভক্তের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথমে মিলন হয়, এখন আমি তাঁদের বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৩০

বড়শাখা এক,—সার্বভৌম ভট্টাচার্য ।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

চৈতন্যবৃক্ষের একটি বড় শাখা হচ্ছেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তাঁর ভগ্নীপতি হচ্ছেন শ্রীগোপীনাথ আচার্য।

তাৎপর্য

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রকৃত নাম ছিল বাসুদেব ভট্টাচার্য। তাঁর জন্মস্থান বিদ্যানগর নবদ্বীপ স্টেশন থেকে অথবা চাঁপাহাটী স্টেশন থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। তাঁর পিতা মহেশ্বর বিশারদ খুব নামকরা লোক ছিলেন। কথিত আছে যে, তদানীন্তন ভারতের সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক এবং বিহারের অন্তর্গত মিথিলার বিখ্যাত ন্যায়-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্র, যিনি তাঁর নিজের ন্যায়শাস্ত্রের বিষয়বস্তু কাউকে নকল করে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যেতে দিতেন না, তাঁর কাছে থেকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করেন এবং নবদ্বীপে ফিরে এসে একটি ন্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে তা এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। সেই সময় থেকে নবদ্বীপ মিথিলাকে গৌরবহীন করে আজও সমগ্র ভারতের প্রধান ন্যায়-বিদ্যাপীঠ বলে পরিচিত। কারও কারও মতে সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন তাঁর ছাত্র।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করে গার্হস্থ্য-আশ্রমে থেকেও বহু সন্ন্যাসীকে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করান।

তিনি পুরীতে একটি বেদান্ত-দর্শনের বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর কাছ থেকে বেদান্ত-দর্শন শিক্ষা লাভ করার উপদেশ দেন। কিন্তু পরে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে *বেদান্তের* প্রকৃত অর্থ অবগত হন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ রূপ দর্শন করেছিলেন। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে একটি ষড়্‌ভুজ বিগ্রহ এখনও রয়েছে। মন্দিরের এই অংশে প্রতিদিন সংকীর্তন হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মিলন *মধ্যলীলার* ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য *চৈতন্য-শতক* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের একশোটি শ্লোকের মধ্যে *বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ* ও *কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ*—শ্লোকদুটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১১৯) বর্ণিত হয়েছে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য হচ্ছেন বৃহস্পতির অবতার।

গোপীনাথ আচার্য ছিলেন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী। তিনি ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৭৮) বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্বে কৃষ্ণলীলায় তিনি ছিলেন রত্নাবলী নামক গোপী। কারও কারও মতে তিনি ছিলেন ব্রহ্মার অবতার।

শ্লোক ১৩১

কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় ভবানন্দ ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীর ভক্তের তালিকায় (পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর, সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও গোপীনাথ আচার্য), কাশী মিশ্র হচ্ছেন পঞ্চম, প্রদ্যুম্ন মিশ্র হচ্ছেন ষষ্ঠ এবং ভবানন্দ রায় হচ্ছেন সপ্তম। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কাশী মিশ্র ছিলেন রাজ-পুরোহিত। জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর গৃহে বাস করেছিলেন। পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত সেই স্থান লাভ করেন এবং তারপর তাঁর শিষ্য গোপাল গুরু গোস্বামী সেই স্থান প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ স্থাপন করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৯৩) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কাশী মিশ্র ছিলেন ব্রজের কৃষ্ণবল্লভা নাম্নী গোপী। উড়িষ্যাবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত। উড়িষ্যার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। আর জন্ম বিচারে রামানন্দ রায় ছিলেন অব্রাহ্মণ। কিন্তু তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দ রায়ের কাছ

থেকে হরিকথা শ্রবণ করতে উপদেশ দেন। সেই ঘটনা *অন্ত্যলীলার* পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

ভবানন্দ রায় ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়ের পিতা। তাঁর বসতি ছিল পুরী থেকে পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকটে। তিনি জাতিতে ছিলেন করণ বর্ণজাত। এঁদের কখনও কায়স্থ এবং কখনও শূদ্র বলে গণনা করা হয়।

শ্লোক ১৩২

আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন ।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি হচ্ছ পাণ্ডু এবং তোমার পঞ্চ পুত্র হচ্ছে পঞ্চপাণ্ডব।"

শ্লোক ১৩৩

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র হচ্ছেন রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও নায়ক বাণীনাথ।

শ্লোক ১৩৪

এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র ।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে বললেন, "তোমার পঞ্চ পুত্র আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। রামানন্দ রায় আর আমি এক, আমাদের দেহ মাত্র ভিন্ন।"

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১২০-২৪) বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বলীলায় রায় রামানন্দ ছিলেন অর্জুন। তাঁকে ললিতাদেবীর অবতারও বলা হয়। আবার কারও কারও মতে তিনি হচ্ছেন বিশাখাদেবীর অবতার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে তাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "যদিও আমি সন্ন্যাসী, তবুও প্রকৃতি দর্শনে আমার চিত্ত কখনও কখনও বিচলিত হয়। কিন্তু রায় রামানন্দ এতই সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন যে, নারীর অঙ্গ স্পর্শ করলেও তাঁর চিত্তে কোন বিকার হত না।" এভাবেই নারীর অঙ্গ স্পর্শ করার অধিকার একমাত্র রায় রামানন্দেরই আছে; অন্য কারওই তাঁকে

অনুকরণ করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশত, কিছু পাষণ্ডী রায় রামানন্দের কার্যকলাপের অনুকরণ করে। তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শেষলীলায় রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহযুক্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করার জন্য নিরন্তর *শ্রীমদ্ভাগবত* ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উপযুক্ত শ্লোক আবৃত্তি করতেন। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে যান, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন, কেন না শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপিকাদের মাধুর্যপ্রেম তাঁর মতো এত গভীরভাবে আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময় গোদাবরী নদীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁদের সুদীর্ঘ আলোচনায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষার্থীর ভূমিকা অবলম্বন করে প্রশ্ন করেন, আর রায় রামানন্দ তার উত্তর দেন। তাঁদের সেই আলোচনার চরমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, "রামানন্দ, তুমি আমি উভয়ই হচ্ছি উন্মাদ, তাই আমরা সমতুল্য।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে রাজকার্য ত্যাগ করে জগন্নাথপুরীতে যেতে নির্দেশ দেন। প্রতাপরুদ্র রাজা বলে যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন দান করতে অস্বীকার করেন, তবুও রামানন্দ রায় একটি বৈষ্ণব পরিকল্পনার মাধ্যমে মহাপ্রভুর সঙ্গে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার ঘটান। সেই বর্ণনা *মধ্যলীলার* দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ৪১থেকে ৫৭ শ্লোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রথযাত্রার দিন কীর্তনান্তে জলকেলির সময় রায় রামানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সমান বৈরাগ্য ভাবাপন্ন বলে মনে করতেন, কেন না রায় রামানন্দ যদিও ছিলেন রাজকর্মচারী গৃহস্থ আর সনাতন গোস্বামী ছিলেন জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন সন্ন্যাসী, তবুও তাঁরা দুজনেই ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের সেবক এবং তাঁরা যা কিছু করতেন তা সবই ছিল কৃষ্ণকেন্দ্রিক। ভগবৎ-প্রেমের সব চাইতে নিগূঢ় তত্ত্ব যে সাড়ে তিনজন ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আলোচনা করতেন, রায় রামানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রায় রামানন্দের কাছ থেকে কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুবল যেভাবে সর্বদা কৃষ্ণলীলায় রাধা-কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করতেন, রায় রামানন্দ ঠিক তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণবিরহে সহায়তা করতেন। রায় রামানন্দ ছিলেন *জগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের* রচয়িতা।

শ্লোক ১৩৫-১৩৬

প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওঢ্র কৃষ্ণানন্দ ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওঢ্র শিবানন্দ ॥ ১৩৫ ॥
ভগবান্ আচার্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ।
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে অবস্থানকালে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র, উড়িয়া ভক্ত কৃষ্ণানন্দ ও শিবানন্দ এবং পরমানন্দ মহাপাত্র, ভগবান আচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতি ও মুরারি মাহিতি তাঁর সঙ্গী ছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন গঙ্গবংশীয় (গজপতি) উৎকল সম্রাট। কটকে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি মহাপ্রভুর গুণাবলী শ্রবণ করে দীনবেশে অনেক সেবা ও উৎকণ্ঠার পর রামানন্দ রায় ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সাহায্যে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১১৮) বর্ণিত হয়েছে যে, হাজার হাজার বছর পূর্বে যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনিই পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় পুনরায় তাঁরই বংশে মহারাজ প্রতাপরুদ্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তেজ ও বীর্যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের মতো। তাঁরই তত্ত্বাবধানে *চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকটি* রচিত হয়।

চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে পরমানন্দ মহাপাত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—"উৎকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যত অনুচর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁদের প্রাণেশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পরমানন্দ মহাপাত্র অন্যতম। ভগবৎ-প্রেমানন্দে তিনি সর্বদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করতেন।" ভগবান আচার্য ছিলেন হালিসহরের অধিবাসী এবং এক মহাপণ্ডিত। কিন্তু তিনি সব কিছু ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য জগন্নাথপুরীতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সখ্যরসের সম্পর্ক ছিল, ঠিক বৃন্দাবনের গোপবালকদের মতো। তিনি সর্বদা স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর প্রতি সখ্যভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমল আশ্রয় করেছিলেন। তিনি কখনও কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে গৃহে নিমন্ত্রণ করতেন।

ভগবান আচার্য ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সরল। তাঁর পিতা শতানন্দ খাঁ যেমন ভয়ানক বিষয়ী ছিলেন, তাঁর অনুজ গোপাল ভট্টাচার্য তেমনই মায়াবাদী ছিলেন। তিনি কাশীতে মায়াবাদ-ভাষ্য অধ্যয়ন করে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান আচার্যের কাছে এলে, ভগবান আচার্য স্নেহবশত তাঁর কাছে মায়াবাদ শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ভক্তির বিরুদ্ধ বলে স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁকে নিবারিত করেন। একদিন ভগবান আচার্যের পূর্ব পরিচিত একজন বাঙ্গালী কবি একটি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী নাটক রচনা করে এনে, তাঁর বাসায় অবস্থান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তা শোনাতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাতে অনুমতি না দিয়ে, পরে যখন সেই নাটকের প্রস্তাবনাতেই প্রচুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রদর্শন করান, তখন সেই বঙ্গদেশীয় কবি তার ভুল বুঝতে পেরে স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর শরণাগত হন এবং তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেন। সেই ঘটনা *অন্ত্যলীলার* পঞ্চম পরিচ্ছেদে ৯১-১৫৮ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৮৯) উল্লেখ করা আছে যে, শিখি মাহিতি ছিলেন রাগলেখা নামক শ্রীমতী রাধারাণীর দাসী। তাঁর ভগ্নী মাধবী ছিলেন কলাকেলী নামক শ্রীমতী রাধারাণীর সহচরী। শিখি মাহিতি, মাধবী এবং তাঁদের ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনন্য ভক্ত, যাঁরা এক পলকের জন্যও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভুলে থাকতে পারতেন না। উড়িয়া ভাষায় *চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য* নামক একটি গ্রন্থ আছে, তাতে শিখি মাহিতি সম্বন্ধে বহু বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনায় তাঁর এক স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। শিখি মাহিতি সর্বদা মানসে ভগবানের সেবা করতেন। একদিন রাত্রে তিনি এভাবেই সেবা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন। রজনীশেষে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, গৌরপাদপদ্ম দর্শনকারী অনুজেরা তাঁকে জাগরিত করছেন। এই আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শনে জাগ্রত হয়ে তিনি তাঁর ভ্রাতা ও ভগিনীকে দেখতে পেয়ে অতি আনন্দিত অন্তরে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। তাতে তাঁরা সকলেই বিস্মিত হলেন। শিখি মাহিতি তখন তাঁদের বললেন, "ভাই, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা তা শ্রবণ কর, তা অতি বিচিত্র। শ্রীশচীসুতের মহিমা যে অপ্রমেয় আজই কেবল আমি তা জানতে পারলাম। দেখলাম গৌরসুন্দর নীলাচলচন্দ্র শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করে তাঁর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ করছেন এবং পুনঃপুনঃ বাইরে এসে আবার তাঁকে দেখছেন। কি আশ্চর্য! আমি এখনও পরমেশ্বর গৌরসুন্দরকে সেই অবস্থাতেই দেখছি। আমার দৃষ্টি কি ভ্রান্ত হয়েছে? হায়, সেই অসীম কৃপাসিন্ধু গৌরসুন্দর আমাকে জগন্নাথদেবের সামনে দেখে আমার নাম ধরে ডেকে তাঁর দীর্ঘ উন্নত ললিত বাহুর দ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করলেন।" এভাবেই পুলকিত অন্তরে শিখি মাহিতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রেমে গদ্‌গদ কণ্ঠে সেই কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুরারি ও মাধবী তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনে তাঁকে প্রভুর দর্শনের জন্য জগন্নাথ দর্শনে যেতে বললেন। তখন তিন জনই নীলাচল-পতিকে দর্শন করার জন্য গমন করলেন। মুরারি ও মাধবী প্রভুকে জগমোহনে দর্শন করে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। কিন্তু অগ্রজ শিখি মাহিতি প্রভুকে স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন, চতুর্দিকে গৌরসুন্দরকে ঠিক তেমন ভাববিশিষ্ট দর্শন করায় তিনি প্রেমে উৎফুল্ল হলেন। মহাবদান্য মহাপ্রভুও তাঁকে, "তুমি মুরারির অগ্রজ!" এই বলে আলিঙ্গন করলেন এবং শিখি মাহিতিও গৌরসুন্দরের আলিঙ্গন পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। সেই থেকে শিখি মাহিতি গৌরপাদপদ্ম গন্ধে সব কিছু ভুলে গিয়ে অভিষ্টদেব শ্রীগৌরের সেবা করতে লাগলেন। শিখি মাহিতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরারি মাহিতির কথা *মধ্যলীলার* দশম পরিচ্ছেদের ৪৪ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩৭

মাধবী-দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী ।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান ভক্তদের অন্যতমা মাধবীদেবী ছিলেন শিখি মাহিতির কনিষ্ঠা ভগিনী। তিনি ছিলেন শ্রীমতী রাধারাণীর দাসীদের মধ্যে অন্যতমা।

তাৎপর্য

অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১০৪ থেকে ১০৬ শ্লোকে মাধবীদেবীর বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীমতী রাধারাণীর একজন দাসী বলে গণনা করতেন। এই জগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাড়ে তিনজন অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন হচ্ছেন স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীরামানন্দ রায় ও শিখি মাহিতি এবং শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবীদেবী স্ত্রীলোক বলে অর্ধরূপে গণনা করা হয়েছে। এই সূত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাড়ে তিন জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন।

শ্লোক ১৩৮

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন ঈশ্বর পুরীর শিষ্য এবং গোবিন্দ ছিলেন তাঁর আর একজন প্রিয় শিষ্য।

তাৎপর্য

গোবিন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিজ সেবক। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৩৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বৃন্দাবনে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুর নামক দুজন সেবক কাশীশ্বর ও গোবিন্দরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গোবিন্দ সর্বদাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত থাকতেন এবং অপরাধের ভয় থাকলেও তিনি সেই ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করতেন না।

শ্লোক ১৩৯

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা ।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

নীলাচলে প্রধান ভক্তদের তালিকায় কাশীশ্বর গোস্বামী ছিলেন অষ্টাদশতম এবং গোবিন্দ ছিলেন ঊনবিংশতিতম। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী এই জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময়, তাঁদেরকে নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশ পেয়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৪০

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে ।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

কাশীশ্বর ও গোবিন্দ দুজনেই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুভ্রাতা এবং তাঁরা আসা মাত্রই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর পুরী তাঁদের আদেশ দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করার জন্য, তাই মহাপ্রভু তাঁদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ১৪১

**অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ।
জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর ॥ ১৪১ ॥**

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে তাঁর অঙ্গসেবা করতে দিলেন, আর কাশীশ্বরকে জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার সময়, তাঁর সম্মুখের ভিড় ঠেলে তাঁর যাওয়ার পথ করে দেওয়ার ভার দিলেন।

শ্লোক ১৪২

**অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে ।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে ॥ ১৪২ ॥**

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন, তখন যাতে কেউ তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে, সেই জন্য অত্যন্ত বলবান কাশীশ্বর হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যাওয়ার পথ করে দিতেন।

শ্লোক ১৪৩

**রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর ।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ ১৪৩ ॥**

শ্লোকার্থ

রামাই ও নন্দাই জগন্নাথপুরীর প্রথম ভক্তদের মধ্যে বিংশতিতম ও একবিংশতিতম ভক্ত। তাঁরা নিরন্তর গোবিন্দকে সাহায্য করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতেন।

শ্লোক ১৪৪

**বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই ।
গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥ ১৪৪ ॥**

শ্লোকার্থ

রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল ভরে আনতেন, আর নন্দাই গোবিন্দের আজ্ঞা অনুসারে সেবা করতেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৩৯) বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্বলীলায় যে দুজন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দুধ ও জল সরবরাহ করতেন, তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় রামাই ও নন্দাইরূপে এসেছেন।

শ্লোক ১৪৫

**কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈলা দক্ষিণ গমন ॥ ১৪৫ ॥**

শ্লোকার্থ

দ্বাবিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন কৃষ্ণদাস নামক এক শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি কৃষ্ণদাসকে তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মধ্যলীলার সপ্তম ও নবম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জলপাত্র বহন করার জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। মালাবার প্রদেশে ভট্টথারিগণ তাঁকে স্ত্রীলোক দেখিয়ে মোহিত করে অবদ্ধ করার চেষ্টা করে। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জগন্নাথপুরীতে ফিরে আসার পর তিনি কৃষ্ণদাসকে বিদায় দেন, কেন না যে সকল ভক্ত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাদের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিরূপ ছিলেন। এভাবেই কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪৬

**বলভদ্র ভট্টাচার্য—ভক্তি অধিকারী ।
মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী ॥ ১৪৬ ॥**

শ্লোকার্থ

এক আদর্শ ভক্ত বলভদ্র ভট্টাচার্য ছিলেন ত্রয়োবিংশতিতম পার্ষদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মথুরা গমনকালে ব্রহ্মচারীরূপে তাঁর সেবা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বলভদ্র ভট্টাচার্য ব্রহ্মচারীরূপে বা সন্ন্যাসীর ব্যক্তিগত সেবকরূপে মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। সন্ন্যাসীর রন্ধন করা উচিত নয়। সাধারণত সন্ন্যাসী গৃহস্থের গৃহে প্রসাদ পান এবং সেই বিষয়ে ব্রহ্মচারী তাঁকে সাহায্য করেন। সন্ন্যাসী হচ্ছেন গুরু এবং ব্রহ্মচারী হচ্ছেন শিষ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মথুরা ও বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন বলভদ্র ভট্টাচার্য ব্রহ্মচারীরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেন।

শ্লোক ১৪৭

বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস ।
দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস ছিলেন নীলাচলের ভক্তদের মধ্যে চতুর্বিংশতিতম এবং পঞ্চবিংশতিতম ভক্ত। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সুদক্ষ কীর্তনীয়া এবং সব সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাশে পাশে থাকতেন।

তাৎপর্য

ছোট হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত্যাগ করেছিলেন। সেই ঘটনা *অন্ত্যলীলার* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৪৮

রামভদ্রাচার্য, আর ওঢ্র সিংহেশ্বর ।
তপন আচার্য, আর রঘু, নীলাম্বর ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথপুরীতে যে সমস্ত ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তার মধ্যে রামভদ্র আচার্য ছিলেন ষড়্‌বিংশতিতম ভক্ত, সিংহেশ্বর ছিলেন সপ্তবিংশতিতম ভক্ত, তপন আচার্য ছিলেন অষ্টবিংশতিতম ভক্ত, রঘুনাথ ছিলেন একোনত্রিংশতিতম ভক্ত এবং নীলাম্বর ছিলেন ত্রিংশতিতম ভক্ত।

শ্লোক ১৪৯

সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ ।
গৌড়ে পূর্ব ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

সিঙ্গাভট্ট ছিলেন একত্রিংশতিতম ভক্ত, কামাভট্ট ছিলেন দ্বাত্রিংশতিতম ভক্ত, শিবানন্দ ছিলেন ত্রয়োত্রিংশতিতম ভক্ত এবং কমলানন্দ ছিলেন চতুস্ত্রিংশতিতম ভক্ত। তাঁরা পূর্বে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁরা বঙ্গদেশ ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গ লাভের জন্য জগন্নাথপুরীতে চলে যান।

শ্লোক ১৫০

অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য-তনয় ।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চত্রিংশতিতম ভক্ত অচ্যুতানন্দ ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের পুত্র। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে নীলাচলে থাকতেন।

তাৎপর্য

আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ১৩ শ্লোকে অচ্যুতানন্দ সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে।

শ্লোক ১৫১

নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস ।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস ছিলেন জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে বসবাসকারী ভক্তদের মধ্যে ষট্‌ত্রিংশতিতম ও সপ্তত্রিংশতিতম ভক্ত।

শ্লোক ১৫২-১৫৪

বারাণসী-মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন ।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥ ১৫২ ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য—মিশ্রের নন্দন ।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন ॥ ১৫৩ ॥
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস ।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিনজন প্রধান ভক্ত হচ্ছেন চন্দ্রশেখর বৈদ্য, তপন মিশ্র এবং তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য। বৃন্দাবন দর্শন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে আসেন, তখন দুই মাস তিনি চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে বাস করেন এবং তপন মিশ্রের ঘরে দুই মাস প্রসাদ পান।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বঙ্গদেশে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে প্রভুর নিকট হতে হরিনাম লাভ করেন। পরে প্রভুর আজ্ঞায় কাশী বাস করেন। কাশীতে বসবাসকালে প্রভু তাঁরই গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করতেন।

শ্লোক ১৫৫

রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন ।
উচ্ছিষ্ট-মার্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ তাঁর বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেন এবং তাঁর পাদ-সম্বাহন করেন।

শ্লোক ১৫৬

বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে ।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

বড় হয়ে রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য নীলাচলে যান এবং সেখানে আট মাস থাকেন। তখন কোন কোন দিন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসাদ সেবন করাতেন।

শ্লোক ১৫৭

প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা ।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীল রূপ গোস্বামীর আশ্রয়ে সেখানেই অবস্থান করেন।

শ্লোক ১৫৮

তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত ।
প্রভুর কৃপায় তেঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গী ছিলেন, তখন তিনি ভাগবত পাঠ করে তাঁকে শোনাতেন। এভাবেই ভাগবত পাঠ করার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তিনি নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাকতেন ।

তাৎপর্য

ষড়্‌গোস্বামীর অন্তর্গত রঘুনাথ ভট্টাচার্য বা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ছিলেন তপন মিশ্রের পুত্র। আনুমানিক ১৪২৫ শকাব্দে তাঁর জন্ম হয়। *ভাগবত* শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। *অন্ত্যলীলার* ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রন্ধনেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি যা রান্না করতেন তা অমৃতের মতো সুস্বাদু হত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরম তৃপ্তি সহকারে তা ভোজন করতেন, আর রঘুনাথ ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ সেবন করতেন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য আট মাস জগন্নাথপুরীতে ছিলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে শ্রীল রূপ গোস্বামীর কাছে যেতে নির্দেশ দেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং নিরন্তর

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করতে বলেছিলেন। তাই তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে থাকাকালে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামীকে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করে শোনাতেন। তিনি *ভাগবত* পাঠে এত সুদক্ষ ছিলেন যে, তিনি প্রতিটি শ্লোক তিন-চার রকম বিভিন্ন রাগে আবৃত্তি করতে পারতেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে ছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে চোদ্দ হাত দীর্ঘ জগন্নাথের প্রসাদী তুলসী-মালা ও ছুটাপান দান করেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নির্দেশে তাঁর এক শিষ্য শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির তৈরি করেন। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী সেই গোবিন্দজীর সমস্ত ভূষণ ও অলঙ্কার করিয়ে দেন। তিনি কখনও বৈষয়িক বিষয় নিয়ে কথা বলতেন না, চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা স্মরণ করতেন এবং কৃষ্ণপূজা করতেন। তিনি কখনও বৈষ্ণবের নিন্দা শুনতেন না। এমন কি নিন্দা করার কারণ থাকলেও তিনি বলতেন যে, সমস্ত বৈষ্ণবেরা যেহেতু ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তিনি তাঁদের দোষ দর্শন করেন না। পরে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী রাধাকুণ্ডের এক ছোট্ট কুটিরে থাকতেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৮৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী হচ্ছেন রাগমঞ্জরী।

শ্লোক ১৫৯

এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ ।
দিঙ্‌মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত অসংখ্য, আমি কেবল এভাবেই দিগদর্শন করছি। সম্যকরূপে তাঁদের সকলের কথা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৬০

একৈক-শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল ।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

এক একটি শাখা থেকে শিষ্য-উপশিষ্যরূপ কোটি কোটি উপশাখা বিস্তৃত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর এই সংকীর্তন আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হোক। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধারায় বহু শিষ্য গ্রহণ করার প্রবল প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর এই সংকীর্তন আন্দোলন কেবল বাংলার কয়েকটি গ্রামে অথবা ভারতবর্ষে প্রসারিত হলেই হবে না, সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করতে হবে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছেন, সেই জন্য কিছু কর্মবিমুখ তথাকথিত ভক্ত তাঁদের সমালোচনা করে, এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, কৃষ্ণভক্তি যেন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই ইচ্ছার কথা বারবার ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁদের সেই ইচ্ছার প্রভাবে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত, তাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এই ব্যাপক প্রচারের নিন্দা না করে বরং গর্ব বোধ করবেন।

শ্লোক ১৬১

সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে ।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

এই বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-উপশাখা অসংখ্য প্রেমরূপ ফল ও ফুলে ভরে আছে এবং কৃষ্ণপ্রেমের জলে তা ত্রিভুবন ভাসাল।

শ্লোক ১৬২

এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা ।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের এক একটি শাখার অনন্ত মহিমা। সহস্রবদনেও তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

শ্লোক ১৬৩

সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র-বদন' ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। সহস্রবদন শেষও পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করতে পারেন না।

শ্লোক ১৬৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'চৈতন্যবৃক্ষের মূল স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিত্যানন্দ স্কন্ধ ও শাখা

দশম পরিচ্ছেদে যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শাখা-প্রশাখার বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই এই একাদশ পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্ ।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর; পদ-অম্ভোজ—শ্রীপাদপদ্ম; ভৃঙ্গান্—ভ্রমর; প্রেম—ভগবৎ-প্রেমের; মধু—মধুর দ্বারা; উন্মদান্—উন্মত্ত; নত্বা—প্রণতি নিবেদন করে; অখিলান্—তাঁদের সকলকে; তেষু—তাঁদের মধ্যে; মুখ্যাঃ—মুখ্য; লিখ্যন্তে—বর্ণিত হয়েছে; কতিচিৎ—তাঁদের কয়েকজন; ময়া—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের মধুপানে উন্মত্ত ভ্রমররূপী ভক্তদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি তাঁদের মধ্যে মুখ্য কয়েকজন ভক্তদের কথা বর্ণনা করবার চেষ্টা করছি।

শ্লোক ২

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! যিনি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি ধন্য।

শ্লোক ৩

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় নিত্যানন্দ ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্বভক্তবৃন্দ ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! জয় হোক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের!

শ্লোক ৪

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ ।
ঊর্ধ্বস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ৪ ॥

তস্য—তাঁর; **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু; **সৎ-প্রেম**—নিত্য ভগবৎ-প্রেমের; **অমর**—অবিনশ্বর; **শাখিনঃ**—বৃক্ষের; **ঊর্ধ্ব**—অতি উচ্চ; **স্কন্ধ**—স্কন্ধ; **অবধূত-ইন্দোঃ**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর; **শাখারূপান্**—বিভিন্ন শাখারূপী; গণান্—ভক্তদের; **নুমঃ**—আমি প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

নিত্য ভগবৎ-প্রেমের অবিনশ্বর বৃক্ষ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, আর সেই বৃক্ষের সর্বোচ্চ স্কন্ধ হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু। সেই সর্বোচ্চ স্কন্ধের সমস্ত শাখা-প্রশাখাদেরকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৫

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর ।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য-বৃক্ষের অত্যন্ত গুরুতর একটি স্কন্ধ। তার থেকে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে।

শ্লোক ৬

মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছারূপ জলের দ্বারা এই সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলি অন্তহীনভাবে বর্ধিত হতে লাগল এবং প্রেমযুক্ত ফুলে-ফলে তা ভুবন ছেয়ে ফেলল।

শ্লোক ৭

অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন ।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই শাখা-প্রশাখারূপ ভক্তদের সংখ্যা অগণিত ও অন্তহীন। কে তা গণনা করতে পারেন? তবুও নিজেকে পবিত্র করার জন্য আমি তাঁদের মধ্যেকার মুখ্য কয়েকজন ভক্তের কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক লাভ, পূজা অথবা প্রতিষ্ঠার জন্য পারমার্থিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা উচিত নয়। ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা কোন মহাজনের নির্দেশ অনুসারে অথবা তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক

গ্রন্থ রচনা করা অবশ্য কর্তব্য, কেন না কোন জড় উদ্দেশ্য নিয়ে তা রচিত হয় না। কেউ যদি মহাজনের তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন, তা হলে তিনি পবিত্র হন। সমস্ত কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপ নিজেকে শোধন করার জন্য সম্পাদন করা উচিত, কোন রকম জাগতিক লাভের আশায় তা করা উচিত নয়।

শ্লোক ৮

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা ।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর পর তাঁর সব চাইতে বড় শাখা হচ্ছেন শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি। তাঁর অসংখ্য শাখা ও উপশাখা রয়েছে, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন, "শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র এবং জাহ্নবাদেবীর শিষ্য। তাঁর মাতা হচ্ছেন বসুধাদেবী। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৬৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার। তাই বীরভদ্র গোসাঞি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে অভিন্ন। হুগলী জেলার ঝামটপুর গ্রামে যদুনাথাচার্য নামক শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির এক শিষ্য ছিলেন। তাঁর কন্যা শ্রীমতী ও পালিতা কন্যা নারায়ণীর সঙ্গে বীরভদ্র প্রভুর বিবাহ হয়। সেই কথা *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থের ত্রয়োদশ তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র নামে বীরভদ্র গোসাঞির তিন শিষ্য তাঁর পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করতেন; তিনি শুদ্ধ শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় এবং তাঁর পদবি ছিল বটব্যাল। তাঁর পরিবারের সদস্যেরা খড়দহের গোস্বামী নামে পরিচিত। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ বর্ধমান জেলার মানকরের কাছে লতা গ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েশপুর গ্রামে বাস করতেন।" শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, এই তিনজন শিষ্যের গোত্র ও পদবি যেহেতু ভিন্ন এবং তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বাস করতেন, তাই তাঁরা বীরভদ্র গোস্বামীর ঔরসজাত ছিলেন না। রামচন্দ্রের চারপুত্র; তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামাধব, যাঁর তৃতীয় তনয় যাদবেন্দ্র, তাঁর পুত্র নন্দকিশোর, তাঁর পুত্র নিধিকৃষ্ণ, তাঁর পুত্র চৈতন্যচাঁদ, তাঁর পুত্র কৃষ্ণমোহন, তাঁর পুত্র জগন্মোহন, তাঁর পুত্র ব্রজনাথ এবং তাঁর পুত্র শ্যামলাল গোস্বামী। এভাবেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বীরভদ্র গোসাঞির বংশতালিকা প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৯

ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত ।
বেদধর্মাতীত হঞা বেদধর্মে রত ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও বীরভদ্র গোসাঞি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি একজন মহান ভক্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত বেদধর্মের অতীত, তবুও তিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক ধর্ম অনুশীলন করেছেন।

শ্লোক ১০

অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দন্ত ।
চৈতন্যভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিমণ্ডপে তিনি হচ্ছেন মূল স্তম্ভস্বরূপ। অন্তরে তিনি জানতেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কিন্তু বাইরে তিনি কোন প্রকার দম্ভ প্রকাশ করতেন না।

শ্লোক ১১

অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে ।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির কৃপা-মহিমার প্রভাবে আজ সারা জগতের মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম কীর্তন করার সুযোগ পাচ্ছে।

শ্লোক ১২

সেই বীরভদ্র-গোসাঞির লইনু শরণ ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি, যাতে তাঁর কৃপার প্রভাবে আমার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করার বাসনা পূর্ণ হয়।

শ্লোক ১৩

শ্রীরামদাস আর, গদাধর দাস ।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস নামক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুজন ভক্ত সর্বদা শ্রীবীরভদ্র গোসাঞির সঙ্গে থাকতেন।

তাৎপর্য

শ্রীরামদাস, পরবর্তীকালে যিনি অভিরাম ঠাকুর নামে পরিচিত হন, তিনি ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গোপসখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১২৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীরামদাস ছিলেন ব্রজের শ্রীদাম সখা। *ভক্তিরত্নাকরে* চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে অভিরাম ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিধর্মের প্রচারক ও আচার্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন এবং অভক্তেরা তাঁকে ভীষণ ভয় পেত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশে তিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত থাকতেন এবং তিনি অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় ছিলেন। কথিত আছে যে, শালগ্রাম শিলা বা বিষ্ণুর অর্চামূর্তি ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্তিকে তিনি প্রণাম করলে, তা তৎক্ষণাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "হাওড়া-আমতা লাইনে চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দ্বারকেশ্বরী নদী পার হয়ে হুগলী জেলার একটি ছোট শহর খানাকুল-কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মন্দির রয়েছে। বর্ষাকালে পথ জলমগ্ন হয় বলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে কোলাঘাট থেকে স্টীমারে রাণীচক। সেখান থেকে সাড়ে সাত মাইল উত্তরে খানাকুল। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত বলে খানাকুল-কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত। মন্দিরের বাইরে একটি বকুল বৃক্ষ রয়েছে। এই স্থানটি সিদ্ধবকুল-কুঞ্জ নামে অভিহিত। কথিত আছে যে, অভিরাম ঠাকুর যখন সেখানে প্রথম আসেন, তখন তিনি এই বৃক্ষটির নীচে বসেন। চৈত্র মাসে কৃষ্ণ-সপ্তমীর দিন খানাকুল-কৃষ্ণনগরে প্রতি বছর এক বিরাট মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ লোক সেই মেলায় সমবেত হন। অভিরাম ঠাকুরের মন্দিরের এক অতি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। সেই মন্দিরে শ্রীগোপীনাথজীর বিগ্রহ রয়েছে। মন্দিরের সন্নিকটে বহু সেবাইত পরিবার বাস করেন। কথিত আছে যে, অভিরাম ঠাকুরের 'জয়মঙ্গল' নামক একটি চাবুক ছিল এবং যাকে তিনি সেই চাবুক দিয়ে স্পর্শ করতেন, তৎক্ষণাৎ তারই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হত। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু অভিরাম ঠাকুরের অতীব উল্লেখযোগ্য প্রিয় পাত্র ছিলেন, তবে তিনি তাঁর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন কি না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে।"

শ্লোক ১৪-১৫

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে ।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥ ১৪ ॥
অতএব দুইগণে দুঁহার গণন ।
মাধব-বাসুদেব ঘোষেরও এই বিবরণ ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রচার করার জন্য গৌড়বঙ্গে যেতে আদেশ দেন, তখন এই দুজন ভক্তকেও (শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাস) তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে আদেশ দেন। তাই কখনও কখনও তাঁদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গণ, আবার কখনও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গণ বলে গণনা করা হয়। তেমনই, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উভয়েরই গণ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও পাটুলির নিকটে অগ্রদ্বীপ নামক স্থানে গোপীনাথজীর বিগ্রহ বিরাজমান। এই বিগ্রহ গোবিন্দ ঘোষকে পিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন। আজও এই বিগ্রহ গোবিন্দ ঘোষের অপ্রকট দিবসে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর কৃষ্ণনগরের রাজবংশের তত্ত্বাবধানে এই বিগ্রহের সেবা সম্পাদন হচ্ছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বারদোলের সময় গোপীনাথজীর বিগ্রহ কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসা হয়। অপর এগারটি বিগ্রহসহ এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় এবং গোপীনাথজী দোলের পর পুনরায় অগ্রদ্বীপের মন্দিরে নীত হন।"

শ্লোক ১৬

রামদাস—মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি ।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি' কৈল বাঁশী ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মুখ্য শাখা রামদাস সখ্যপ্রেমে পূর্ণ ছিলেন। তিনি ষোলটি গাঁটযুক্ত একটি বাঁশকে বাঁশিতে পরিণত করে তা বাজিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগদাধর দাস সর্বদা গোপীভাবে পূর্ণ আনন্দে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ প্রভু দানকেলি নাটক অভিনয় করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্তনীয়াগণে ।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমাধব ঘোষ ছিলেন একজন মুখ্য কীর্তনীয়া। তিনি যখন গান করতেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু নাচতেন।

শ্লোক ১৯

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে ।
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাসুদেব ঘোষ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বর্ণনা করে কীর্তন করতেন, তখন তা শুনে কাঠ এবং পাথরও গলে যেত।

শ্লোক ২০

মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা ।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত মুরারি বহু অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেছিলেন। আনন্দে মগ্ন হয়ে কখনও তিনি বাঘের গালে চড় মারতেন, আবার কখনও তিনি বিষধর সর্পের সঙ্গে খেলা করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "মুরারি-চৈতন্য দাস বর্ধমান জেলার গলশী স্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে সর-বৃন্দাবনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি নবদ্বীপ ধামের মোদদ্রুম বা মামগাছি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় তাঁর নাম হয় শার্ঙ্গ বা সারঙ্গ মুরারি-চৈতন্য দাস। তাঁর বংশধরেরা এখনও সরের পাটে বাস করেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

'বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে ।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যান বনের ভিতরে ॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে ।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে ॥
মহা অজগর সর্প লই' নিজ কোলে ।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয় ।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥

চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্বথা ।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥
দুই তিন দিন মজ্জি' জলের ভিতরে ।
থাকেন, কোথাও দুঃখ না হয় শরীরে ॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত-সর্ব-ব্যবহার ।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার ॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার ।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার ॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত ।
যাঁর বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত ॥' "

শ্লোক ২১

নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা ।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর আশ্রিত ভক্তরা সকলেই ব্রজের সখ্য-রসাশ্রিত এবং তাঁদের সকলেই গোপালবেশ। তাঁদের হাতে শৃঙ্গ ও বেত্র, আর তাঁদের মাথায় ময়ূরের পাখা।

তাৎপর্য

জাহ্নবা-মাতাও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৬৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন ব্রজের অনঙ্গ-মঞ্জরী। জাহ্নবা-মাতার আশ্রিত ভক্তরাও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গণ বলে গৃহীত হন।

শ্লোক ২২

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয় ।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

রঘুনাথ বৈদ্য, যিনি উপাধ্যায়-নামেও পরিচিত, তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর এমনই একজন মহান পার্ষদ ছিলেন যে, কেবল তাঁর দর্শনে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হত।

শ্লোক ২৩

সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম ।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আর একটি শাখা সুন্দরানন্দ ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবক। তাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু ব্রজলীলা-বিলাস করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন, "*শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুন্দরানন্দ ছিলেন ভগবৎ প্রেমরসের সমুদ্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান পার্ষদ। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১২৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণলীলার সুদামা। অর্থাৎ, ব্রজের বলরাম যখন নিত্যানন্দ প্রভুরূপে এই জগতে লীলাবিলাস করতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে যে বারোজন গোপসখা এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁদের অন্যতম। মহেশপুর নামক যে গ্রামে সুন্দরানন্দ প্রভু বাস করতেন, তা বানপুর লাইনের মাজদিয়া রেলওয়ে-স্টেশন থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল পূর্বে। এই গ্রামটি এখন বাংলাদেশের যশোহর জেলায় অবস্থিত। এই স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ একমাত্র সুন্দরানন্দের জন্মভিটা ছাড়া আর কিছু নেই। গ্রামের প্রান্তে শ্রীপাটে জনৈক বাউল বাস করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ আদি অল্প দিনের বলে মনে হয়। বর্তমানে মহেশপুরে শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবা হয়। তার কাছেই বেত্রবতী নদী।

"সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন, সেই জন্য তাঁর কোন বংশধর নেই। জাতি-ভ্রাতাদের এবং শিষ্য-সেবাইতদের বংশধরেরা বর্তমানে সেখানেই আছেন। বীরভূম জেলার মঙ্গলডিহি গ্রামে সুন্দরানন্দের জ্ঞাতি-বংশধর আছেন। সেখানে শ্রীশ্রীবলরামজীর সেবা হয়। সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের আদি বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহকে বহরমপুরের অন্তর্গত সৈদাবাদের গোস্বামীরা নিয়ে যান এবং তার পরে বর্তমান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন মহেশপুরের জমিদারেরা তাঁর সেবাইত। মাঘী-পূর্ণিমার দিন সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় বহু লোক সেই উৎসবে সমবেত হন।"

শ্লোক ২৪

কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত ।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

কমলাকর পিপ্পলাই ছিলেন তৃতীয় গোপাল। তাঁর আচার-আচরণ ও ভগবৎ-প্রেম ছিল অলৌকিক এবং এভাবেই তিনি সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "*গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১২৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কমলাকর পিপ্পলাই ছিলেন তৃতীয় গোপাল। কৃষ্ণলীলায় তিনি ছিলেন মহাবল। শ্রীরামপুরে মাহেশের জগন্নাথ বিগ্রহ কমলাকর পিপ্পলাই প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর স্টেশন থেকে মাহেশ গ্রাম প্রায় আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত। কমলাকর পিপ্পলাই-এর বংশতালিকা অনুসারে তাঁর পুত্রের নাম চতুর্ভুজ এবং চতুর্ভুজের

দুই পুত্র নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ, তাঁর পুত্র রাজীবলোচন। তাঁর সময়ে জগন্নাথদেবের সেবার অর্থাভাব হয়। তখন ঢাকার নবাব শাহ সুজা ১০৬০ বঙ্গাব্দে জগন্নাথদেবকে ১,১৮৫ বিঘা জমি দান করেন। মাহেশের তিন মাইল পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে ওই জমি আছে। জগন্নাথদেবের নাম অনুসারে ওই গ্রামের নাম হয়েছে জগন্নাথপুর। কথিত আছে যে, কমলাকর পিপ্পলাই যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতি পিপ্পলাই অনুসন্ধান করতে করতে মাহেশে এসে তাঁকে দেখতে পান। তিনি কোন প্রকারে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিতে সমর্থ না হলে, অবশেষে তাঁর নিজের পরিবার ও তাঁর ভাইয়ের পরিবারবর্গের সঙ্গে মাহেশে এসে বসবাস করতে লাগলেন। কমলাকর পিপ্পলাইয়ের বংশধরেরা এখনও মাহেশ গ্রামে বাস করেন। তাঁদের উপাধি অধিকারী এবং তাঁরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ।

"মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস হচ্ছে ধ্রুবানন্দ নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব জগন্নাথপুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে দর্শন করতে যান এবং নিজের হাতে পাক করে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দেবার প্রবল ইচ্ছা করেন। তখন একদিন রাত্রে জগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, তিনি যেন গঙ্গাতীরে মাহেশ গ্রামে গিয়ে জগন্নাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁকে নিত্য নিজ হস্তে ভোগ রন্ধন করে তা নিবেদন করে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে গিয়ে গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে ভাসতে দেখেন এবং সেই তিনটি বিগ্রহ জল থেকে তুলে গঙ্গাতীরে কুটির নির্মাণ করে তাঁদের সেবা করতে থাকেন। তাঁর অপ্রকটকালে জগন্নাথদেবের উপযুক্ত সেবক কে হবেন, এই চিন্তা তাঁর হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ প্রাপ্ত হন যে, সুন্দরবনের নিকট খালিজুলি গ্রামনিবাসী শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই নামক শ্রীজগন্নাথদেবের একজন পরম ভক্ত বৈষ্ণব-শিরোমণি পরদিন প্রাতে মাহেশে আগমন করলে তাঁকে যেন সেবার ভার দেওয়া হয়। ধ্রুবানন্দ পরদিন কমলাকর পিপ্পলাই-এর সাক্ষাৎ লাভ করা মাত্র তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাকার্য সমর্পণ করেন। এভাবেই সেবার অধিকার লাভ করার পর কমলাকর পিপ্পলাই অধিকারী পদবী লাভ করেন, যার অর্থ হচ্ছে 'ভগবানকে সেবার্চনা করার মতো ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া।' রাঢ়ীয় শ্রেণীর এই অধিকারীগণ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত। পাঁচ প্রকারের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পিপ্পলাই পদবীর দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকেন।"

শ্লোক ২৫

সূর্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস ।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

সূর্যদাস সরখেল ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস সরখেল উভয়েরই নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা ছিলেন ভগবৎ-প্রেমের নিবাস।

তাৎপর্য

ভক্তিরত্নাকরে (দ্বাদশ তরঙ্গে) বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবদ্বীপ থেকে কয়েক মাইল দূরে শালিগ্রাম নামক স্থানে সূর্যদাস সরখেলের নিবাস ছিল। তিনি তৎকালীন মুসলমান সরকারের সচিব ছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সূর্যদাসের চার ভাই এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব। বসুধাদেবী ও জাহ্নবাদেবী ছিলেন সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা।

শ্লোক ২৬

গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি ।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

গৌরীদাস পণ্ডিত ছিলেন সর্বোচ্চ ভগবদ্ভক্তির প্রতীক। কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ করার এবং কৃষ্ণপ্রেম দান করার মহাশক্তি তাঁর ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "কথিত আছে যে, গৌরীদাস পণ্ডিত হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসের পৃষ্ঠপোষিত ছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিত মুড়াগাছা স্টেশন থেকে কিছু দূরে শালিগ্রামে বাস করতেন এবং পরে তিনি অম্বিকা-কালনায় বসতি স্থাপন করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১২৮) বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্বে তিনি ছিলেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরামের অতি অন্তরঙ্গ সুবল সখা। গৌরীদাস পণ্ডিত সূর্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক অম্বিকা কালনায় গঙ্গার তীরে বসতি স্থাপন করেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখার কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হল—(১) শ্রীনৃসিংহ চৈতন্য, (২) কৃষ্ণদাস, (৩) বিষ্ণুদাস, (৪) বড় বলরাম দাস, (৫) গোবিন্দ, (৬) রঘুনাথ, (৭) বড়ু গঙ্গাদাস, (৮) আউলিয়া গঙ্গারাম, (৯) যাদবাচার্য, (১০) হৃদয়চৈতন্য, (১১) চান্দ হালদার, (১২) মহেশ পণ্ডিত, (১৩) মুকুট রায়, (১৪) ভাতুয়া গঙ্গারাম, (১৫) আউলিয়া চৈতন্য, (১৬) কালিয়া কৃষ্ণদাস, (১৭) পাতুয়া গোপাল, (১৮) বড় জগন্নাথ, (১৯) নিত্যানন্দ, (২০) ভাবি, (২১) জগদীশ, (২২) রাইয়া কৃষ্ণদাস ও (২২॥) অন্নপূর্ণা। গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ পুত্র (বড়) বলরাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ। রঘুনাথের পুত্র হচ্ছেন মহেশ পণ্ডিত ও গোবিন্দ। গৌরীদাস পণ্ডিতের কন্যার নাম অন্নপূর্ণা।

"শান্তিপুরের অপর পারে গঙ্গার তীরে পূর্ব-রেলওয়ের কালনাকোর্ট স্টেশন থেকে প্রায় দুই মাইল পূর্বদিকে অম্বিকা-কালনা গ্রাম। বর্ধমানের রাজা অম্বিকা-কালনায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের মন্দিরের সামনে একটি বিরাট তেঁতুল গাছ রয়েছে। এই গাছের তলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে গৌরীদাস পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। যে স্থানে মন্দিরটি রয়েছে তাকে অম্বিকা বলা হয় এবং সেই অঞ্চলটি কালনা,

তাই সেই গ্রামটির নাম অম্বিকা-কালনা। কথিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বহস্তে লিখিত *ভগবদ্গীতা* এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত বাহিত বৈঠা এখনও মন্দিরে বর্তমান। সেই কথা *ভক্তিরত্নাকরের* সপ্তম তরঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।"

শ্লোক ২৭

নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি ।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রাণপতিরূপে বরণ করে গৌরীদাস পণ্ডিত জাতিকুল সহ সব কিছু নিত্যানন্দ প্রভুকে সমর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়—পণ্ডিত পুরন্দর ।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর ত্রয়োদশতম প্রধান ভক্ত ছিলেন পণ্ডিত পুরন্দর, যিনি ভগবৎ-প্রেমের সমুদ্রে মন্দার পর্বতের মতো বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য

খড়দহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পণ্ডিত পুরন্দরের সাক্ষাৎ হয়। নিত্যানন্দ প্রভু যখন সেই গ্রামে যান, তখন তিনি অলৌকিকভাবে নৃত্য করেছিলেন এবং তাঁর নৃত্য পুরন্দর পণ্ডিতকে মোহিত করেছিল। পণ্ডিত একটি বৃক্ষের উপর বসেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নাচতে দেখে তিনি লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় হনুমানের পার্ষদ অঙ্গদ বলে পরিচয় দেন।

শ্লোক ২৯

পরমেশ্বরদাস—নিত্যানন্দৈক-শরণ ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর দাস হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ-কমলে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত কৃষ্ণলীলার পঞ্চম গোপাল। যিনি তাঁর নাম স্মরণ করেন, তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন, "পরমেশ্বর দাস বা পরমেশ্বরী দাস সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে—

নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস ।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥

তিনি খড়দহে বাস করতেন এবং সর্বদাই গোপভাবে আবিষ্ট থাকতেন। পূর্বে তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সখা অর্জুন। তিনি হচ্ছেন দ্বাদশ গোপালের পঞ্চম গোপাল। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর খেতুরি মহোৎসবে গমনকালে তিনি তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। *ভক্তিরত্নাকরে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর নির্দেশে তিনি হুগলী জেলায় আটপুর গ্রামে একটি মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। হাওড়া-আমতা লাইনে আটপুর স্টেশন। আটপুরে মিত্র পরিবার প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রীরাধা-গোবিন্দ মন্দির রয়েছে। মন্দিরের সামনে দুটি বকুল গাছ ও কদম্ব গাছের মাঝখানে এক অপূর্ব সুন্দর স্থানে পরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি রয়েছে এবং তার উপরে একটি তুলসীমঞ্চ রয়েছে। কথিত আছে যে, সেই কদম্ব গাছে প্রতি বছর একটি মাত্র কদম্ব ফুল ফোটে। তা দিয়ে শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে পূজা হয়।

"পরমেশ্বরী ঠাকুর বৈদ্যকুলোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর ভ্রাতৃবংশীয়গণ শ্রীপাটের বর্তমান সেবাইত। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা ডাকঘরের সন্নিকটে তাঁদের কেউ কেউ এখনও বর্তমান। পরমেশ্বরী ঠাকুরের বংশধরদের বহু ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। কিন্তু তারা যখন ধীরে ধীরে বৈদ্যব্যবসা অবলম্বন করলেন, তখন ব্রাহ্মণ-বংশীয় সকলেই তাঁদের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করেন। পরমেশ্বরী ঠাকুরের বংশধরদের উপাধি অধিকারী ও গুপ্ত। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর বংশধরেরা নিজেদের সাধারণ বৈদ্য অভিমান করে ভাড়া করা ব্রাহ্মণদের দিয়ে ঠাকুর পূজা করান। মন্দিরে একই সিংহাসনে শ্রীবলদেব ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ অবস্থান করছেন। সম্ভবত বলদেব বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত হন। তত্ত্বগত বিচারে বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারাণী এক সিংহাসনে থাকতে পারেন না। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।"

শ্লোক ৩০

জগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ-পাবন ।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগামী পঞ্চদশ শাখা হচ্ছেন জগদীশ পণ্ডিত, যিনি জগৎ উদ্ধার করেছিলেন। বর্ষার জলধারার মতো তাঁর থেকে কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "*চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলার* চতুর্দশ পরিচ্ছেদে জগদীশ পণ্ডিতের বর্ণনা রয়েছে। নদীয়া জেলার চাকদহ রেল স্টেশনের অনতিদূরে যশড়া গ্রামে তিনি বাস করতেন। তাঁর পিতা ছিলেন ভট্ট নারায়ণের পুত্র কমলাক্ষ। তাঁর পিতা ও

মাতা উভয়েই ছিলেন মহান বিষ্ণুভক্ত। তাঁদের মৃত্যুর পর জগদীশ তাঁর পত্নী দুঃখিনী ও ভ্রাতা মহেশকে নিয়ে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস করে বৈষ্ণবসঙ্গ করার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকটে বসতি স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যেতে আদেশ করেন। জগন্নাথপুরী থেকে ফিরে আসার পর তিনি জগন্নাথদেবের আদেশে যশড়া গ্রামে জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে, জগদীশ পণ্ডিত নীলাচল থেকে এই জগন্নাথের মূর্তি যশড়া গ্রামে একটি যষ্টিতে বহন করে নিয়ে আসেন। মন্দিরের সেবাইতরা 'জগন্নাথ বিগ্রহ আনা যষ্টি' বলে এখনও একটি যষ্টি প্রদর্শন করেন।"

শ্লোক ৩১

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর যোড়শতম সেবক হচ্ছেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। তিনি বিষয়ের প্রতি সর্বদাই উদাসীন ছিলেন এবং সব সময় কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, "পণ্ডিত ধনঞ্জয় ছিলেন কাটোয়ার নিকট শীতল-গ্রামের অধিবাসী। তিনি ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা* (১২৭) অনুসারে পূর্বে তাঁর নাম ছিল বসুদাম। শীতল-গ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার ও কৈচর ডাকঘরের অন্তর্গত। বর্ধমান-কাটোয়া রেল লাইনের কাটোয়া থেকে নয় মাইল দূরে এবং কৈচর স্টেশনে নেমে এক মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে শীতল-গ্রাম। মন্দিরটি খড়ের ছাউনি এবং তার দেওয়াল মাটির তৈরি। কিছুদিন আগে বাজারবন কাবাশী গ্রামের জমিদার মল্লিকেরা পাকা মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় পঁয়ষট্টি বছর হল, সেই মন্দির ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনও বর্তমান। মন্দিরের সন্নিকটে একটি তুলসীমঞ্চ রয়েছে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। কথিত আছে যে, ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সংকীর্তন করে শীতল-গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখান থেকে শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শনের জন্য গমন করেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বে বর্তমান মেমারী স্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে সাঁচড়া-পাঁচড়া নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। কখনও কখনও এই গ্রামটিকে 'ধনঞ্জয়ের পাট' বলেও বর্ণনা করা হয়। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর তাঁর সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রীসেবা প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়ে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবন থেকে শীতল গ্রামে ফিরে আসার পর তিনি মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত ধনঞ্জয়ের বংশধরেরা এখনও শীতল-গ্রামে বাস করেন এবং মন্দিরের শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন।"

শ্লোক ৩২

মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল ।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

মহেশ পণ্ডিত ছিলেন দ্বাদশ গোপালের সপ্তম গোপাল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগবশত ঢাকের বাজনার সঙ্গে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "মহেশ পণ্ডিতের গ্রাম পালপাড়া নদীয়া জেলার চাকদহ স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। পূর্বে জিরাটের পূর্বপারে মসিপুর বা যশীপুর নামক স্থানে মহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু মসিপুর গঙ্গাগর্ভে লীন হওয়ায়, সেখান থেকে সুখসাগরের নিকটবর্তী বেলেডাঙ্গায় মহেশ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন, পরে গঙ্গার ভাঙ্গনে বেলেডাঙ্গাও ধ্বংস হয়। তখন শ্রীবিগ্রহ পালপাড়ায় নিয়ে আসা হয়। পালপাড়া পাঁচনগর পরগণার অন্তর্গত। বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া আদি চোদ্দটি মৌজা পাঁচনগরে থাকায় তাকে কেউ কেউ 'নাগরদেশ' বলেন। পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর মহোৎসবে মহেশ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। *ভক্তিরত্নাকরের* অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায় যে, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করেন, তখন মহেশ পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মহেশ পণ্ডিতের মন্দিরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিগ্রহগণ রয়েছেন এবং একটি শালগ্রাম শিলাও রয়েছে।"

শ্লোক ৩৩

নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয় ।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম পণ্ডিত ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অষ্টম গোপাল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দিব্যনাম শ্রবণ করা মাত্র তিনি মহাপ্রেমে উন্মত্ত হতেন।

তাৎপর্য

চৈতন্য-ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষোত্তম পণ্ডিত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত এবং দ্বাদশ গোপালের অন্যতম স্তোককৃষ্ণ।

শ্লোক ৩৪

বলরাম দাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী ।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

বলরাম দাস সর্বদাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমের রস আস্বাদন করতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর নাম শ্রবণ করে তিনি পরম উন্মত্ত হতেন।

শ্লোক ৩৫

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র ।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

যদুনাথ কবিচন্দ্র ছিলেন মহাভাগবত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বদা তাঁর হৃদয়ে নৃত্য করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রত্নগর্ভ আচার্য নামক জনৈক মহদাশয় ব্যক্তি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতার বন্ধু ছিলেন। তাঁরা উভয়েই একচক্রা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। রত্নগর্ভ আচার্যের কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র নামক তিন পুত্র ছিল।

শ্লোক ৩৬

রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর ।
শ্রীনিত্যানন্দের তেঁহো পরম কিঙ্কর ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

বঙ্গদেশে নিত্যানন্দ প্রভুর একবিংশতিতম ভক্ত ছিলেন কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ এবং তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পরম অনুগত ভৃত্য।

তাৎপর্য

বঙ্গদেশের যে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হয়নি, তাকে বলা হয় রাঢ়দেশ।

শ্লোক ৩৭

কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান ।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনু নাহি জানে আন ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বাবিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন কালা কৃষ্ণদাস, যিনি হচ্ছেন নবম গোপাল। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং নিত্যানন্দ প্রভু ছাড়া তিনি আর কিছুই জানতেন না।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৩২) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কৃষ্ণদাস বা কালিয়া কৃষ্ণদাস হচ্ছেন লবঙ্গ নামক গোপাল। তিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন যে, "কালিয়া কৃষ্ণদাসের শ্রীপাট আকাইহাট গ্রাম বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা ও ডাকঘরের অন্তর্গত এবং কাটোয়া থেকে নবদ্বীপ-কাটোয়া রাজপথের ধারে অবস্থিত। আকাইহাট যেতে হলে ব্যান্ডেল-জংশন থেকে কাটোয়া রেল স্টেশন যেতে হয় এবং তারপর সেখান থেকে আরও দুমাইল পথ অথবা দাঁইহাট স্টেশনে নেমে সেখান থেকে প্রায় এক মাইল পথ। আকাইহাট গ্রামটি খুব ক্ষুদ্র বলে সেখানে খুব বেশি লোকজনের বসতি নেই। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে বারুণীর দিন এখানে শ্রীকালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি দিবস পালন করা হয়।"

শ্লোক ৩৮

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয় ।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনয় ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান ভক্তদের মধ্যে ত্রয়োবিংশতিতম ও চতুর্বিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন সদাশিব কবিরাজ ও তাঁর পুত্র পুরুষোত্তম দাস, যিনি ছিলেন দশম গোপাল।

শ্লোক ৩৯

আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ-সনে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

জন্ম থেকেই পুরুষোত্তম দাস নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় মগ্ন ছিলেন এবং তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাল্যলীলায় মগ্ন থাকতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "পিতা সদাশিব কবিরাজ এবং পুত্র নাগর পুরুষোত্তম *চৈতন্য-ভাগবতে* মহা-ভাগ্যবান বলে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁরা বৈদ্য-কুলোদ্ভূত ছিলেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৫৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, সদাশিব কবিরাজ হচ্ছেন চন্দ্রাবলী নামক শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় গোপিকা। ১৪৯ ও ২০০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সদাশিব কবিরাজের পিতা কংসারি সেন হচ্ছেন ব্রজের রত্নাবলী নামক গোপিকা। সদাশিব কবিরাজের পরিবারে সকলেই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহান ভক্ত। পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর মাঝে মাঝে চাকদহ ও শিমুরালি রেল-স্টেশনের নিকটে সুখসাগর নামক স্থানে বাস করতেন। পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণ পূর্বে বেলেডাঙ্গা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর

শ্রীবিগ্রহগণকে সুখসাগরে নিয়ে আসা হয়। সেই মন্দিরটিও যখন গঙ্গাগর্ভে লীন হয়ে যায়, তখন শ্রীজাহ্নবা-মাতার শ্রীবিগ্রহগণের সঙ্গে পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের বিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়িগ্রামে আনীত হন। সেই স্থানটিও ধ্বংস হলে বিগ্রহগণকে তখন পালপাড়া থেকে প্রায় এক মাইল দূরে চাঁদুড়ে-গ্রামে আনা হয়।"

শ্লোক ৪০

তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর ।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত সম্মানিত ভদ্রলোক শ্রীকানু ঠাকুর ছিলেন পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের পুত্র। তিনি এত মহান ভক্ত ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর দেহে বিরাজ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "কানু ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল বোধখানা। ঝিকরগাছা ঘাট স্টেশনে নেমে কপোতাক্ষ-নদ দিয়ে নৌকাপথে অথবা স্থলপথে দুই বা আড়াই মাইল দূরে শ্রীপাট বোধখানা। সদাশিবের পুত্র ছিলেন পুরুষোত্তম ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র হচ্ছেন কানু ঠাকুর। কানু ঠাকুরের বংশধরেরা পুরুষোত্তম ঠাকুরকে নাগর পুরুষোত্তম থেকে পৃথক ব্যক্তি বলে থাকেন। তাঁরা বলেন, দাস পুরুষোত্তম বলে যিনি *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* উল্লিখিত হয়েছেন এবং যিনি ব্রজলীলায় স্তোককৃষ্ণ, তিনি কানু ঠাকুরের পিতা। কিন্তু *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* বৈদ্য বংশোদ্ভূত সদাশিবের পুত্র পুরুষোত্তমই নাগর পুরুষোত্তম বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই নাগর পুরুষোত্তম ব্রজলীলার দাম নামক সখা। কথিত আছে যে, কানু ঠাকুরের জন্মের ঠিক পরেই তাঁর মাতা জাহ্নবা অপ্রকট হন। যখন তাঁর বয়স মাত্র বারো দিন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু শিশুটিকে স্বীয় ভবন খড়দহে নিয়ে যান। কানু ঠাকুরের বংশীয়দের মতানুসারে ৯৪২ বঙ্গাব্দে রথযাত্রার দিন কানু ঠাকুরের জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই তাঁর কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণতা দেখে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর নাম দিয়েছিলেন শিশু কৃষ্ণদাস। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তিনি ঈশ্বরী জাহ্নবা-মাতার সঙ্গে বৃন্দাবনে যান এবং শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ ব্রজবাসীগণ তাঁর ভাবাদি দর্শন করে তাঁকে কানাই ঠাকুর নাম প্রদান করেন।

"কানু ঠাকুরের পরিবারে প্রাণবল্লভ নামক শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ সেবিত হয়ে আসছেন। কথিত আছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্ব থেকে তাঁর পরিবারে এই শ্রীবিগ্রহ পূজিত হচ্ছেন। মারাঠীরা যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করে, তখন কানু ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সন্তানগণ ব্যতীত বংশীবদন প্রমুখ অন্যান্য পুত্ররা বোধখানা ত্যাগ করে পলায়ন করেন এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট নামক গ্রামে গিয়ে বাস করেন। কানু ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে হরিকৃষ্ণ গোস্বামী নামে জনৈক ব্যক্তি বর্গীর হাঙ্গামা মেটাবার পর বোধখানায় আসেন। ইনি প্রাণবল্লভ নামে আর একটি নতুন বিগ্রহ স্থাপন করেন। এখনও

বোধখানা গ্রামে কানাই ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সন্তানের বংশধরদের মধ্যে প্রাচীন শ্রীপ্রাণবল্লভ এবং কনিষ্ঠ পুত্রের বংশদের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত প্রাণবল্লভের সেবা হচ্ছে। খেতুরির উৎসবে জাহ্নবাদেবী ও বীরভদ্র প্রভুর সঙ্গে কানু ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কানু ঠাকুরের পরিবারভুক্ত মাধবাচার্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। পুরুষোত্তম ঠাকুর ও কানু ঠাকুর উভয়েরই বহু ব্রাহ্মণ-শিষ্য ছিল। কানু ঠাকুরের অধিকাংশ শিষ্যই মেদিনীপুর জেলার শিলাবতী নদীর ধারে গড়বেতা নামক গ্রামে বাস করেন।"

শ্লোক ৪১

মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বাদশ গোপালের একাদশতম গোপাল উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান ভক্ত। তিনি সর্বতোভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "*গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১২৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর হচ্ছেন ব্রজের সুবাহু নামক গোপবালক। উদ্ধারণ দত্তের নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা স্টেশনের নিকটবর্তী সরস্বতী নদীর তটস্থিত সপ্তগ্রামে। পূর্বে সপ্তগ্রাম ছিল বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—এই সাতটি গ্রাম নিয়ে একটি মস্ত বড় শহর।"

ইংরেজদের রাজত্বকালে প্রভাবশালী বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা, বিশেষ করে সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা কলকাতা শহরের উন্নয়ন হয়। তাঁরা কলকাতার সর্বত্র তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং গৃহ নির্মাণ করেন। তাঁরা কলকাতার সপ্তগ্রামী বণিক সম্প্রদায় বলে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মল্লিক অথবা শীল-বংশোদ্ভূত। কলকাতা শহরের অর্ধেকেরও বেশি ছিল তাঁদের দখলে। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এই বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষও সেই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁরাও সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কলকাতার মল্লিকেরা শীল ও দে, এই দুটি শাখায় বিভক্ত। সমস্ত মল্লিক ও দে পরিবারই মূলত একই বংশ ও গোত্রসম্ভূত। পূর্বে আমরাও দে পরিবারভুক্ত ছিলাম, যাঁরা মুসলমান শাসকবর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ছিলেন অত্যন্ত উদার এক মহান বৈষ্ণব। তিনি জন্ম থেকেই নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার অধিকার লাভ করেছিলেন। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিছুদিন খড়দহে

থেকে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর পার্ষদসহ সপ্তগ্রামে এসেছিলেন এবং ত্রিবেণীর তীরে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে বাস করেছিলেন। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর যে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব সম্প্রদায়। তাঁরা ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। পূর্বে বল্লাল সেনের সঙ্গে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য হয়। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ে গৌরী সেন নামে এক ধনপতি ছিলেন, যাঁর থেকে বল্লাল সেন টাকা ধার করতেন। কিন্তু সেই টাকা শোধ করতে না পারায়, গৌরী সেন বল্লাল সেনকে টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে বল্লাল সেন চক্রান্ত করে সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়কে জাতিচ্যুত করে তার প্রতিশোধ নেন। তখন থেকে সুবর্ণবণিকেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের বহির্ভূত হয়ে একঘরে হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় পুনরায় উচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। *চৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণিত হয়েছে—

যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে ।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥

সমস্ত সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাবে পবিত্র হল, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এবং স্বহস্তে সেবিত মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্তি রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং বামে শ্রীগদাধর প্রভু বিরাজ করছেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দ মূর্তি, শ্রীশালগ্রাম ও সিংহাসন-বেদির নিম্নে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য পূজিত হচ্ছেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ নাটমন্দির রয়েছে এবং নাটমন্দিরের সামনে রয়েছে একটি মাধবীলতার গাছ। মন্দিরটি সুশীতল ছায়াপূর্ণ পরিবেশে অবস্থিত। ১৯৬৭ সালে যখন আমি আমেরিকা থেকে ফিরে আসি, তখন মন্দিরের পরিচালকমণ্ডলী আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণ করেন এবং কয়েকজন আমেরিকান শিষ্যসহ সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পূর্বে বাল্যকালে আমি আমার পিতা-মাতার সঙ্গে সেই মন্দিরে গিয়েছি, কেন না সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সমস্ত সদস্যই শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের এই মূর্তিটি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* আরও উল্লেখ করেছেন, "১২৮৩ সালে নিতাই দাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধক শ্রীপাটের জন্য বারো বিঘা জমি সংগ্রহ করেন। তারপর কারও কারও বিশেষ চেষ্টায় শ্রীপাটের সেবা কিছুদিন চললেও ক্রমশ সেবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পরে ১৩০৬ সালে হুগলির ভূতপূর্ব সাবজজ বলরাম মল্লিক ও কলকাতাবাসী বহু ধনী সুবর্ণবণিকের সমবেত চেষ্টায় সম্প্রতি শ্রীপাটের সেবার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জগমোহন দত্ত নামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের এক বংশধর মন্দিরে শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি দারুময়ী শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেই শ্রীমূর্তি এখন আর নেই; বর্তমানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি আলেখ্য পূজিত হচ্ছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পূর্বের শ্রীমূর্তি এখন হুগলির

হুগলিনিবাসী শ্রীমদন দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ওই গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

"উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কাটোয়ার দেড়-মাইল উত্তরে নৈহাটির বিখ্যাত জমিদারের দেওয়ান ছিলেন। দাঁইহাট স্টেশনের কাছে এখনও সেই রাজবংশের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সেই জমিদারের দেওয়ান ছিলেন, তাই সেই স্থানটি এখন উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত। উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ বনওয়ারীবাদ নামক জমিদার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর আজীবন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীকর দত্ত, তাঁর মাতার নাম ছিল ভদ্রাবতী এবং তাঁর পুত্রের নাম ছিল শ্রীনিবাস দত্ত।"

শ্লোক ৪২

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী ।
পূর্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী' ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মুখ্য ভক্তদের মধ্যে সপ্তবিংশতিতম ভক্ত আচার্য বৈষ্ণবানন্দ হচ্ছেন ভক্তির অধিকারী। পূর্বে তাঁর নাম ছিল রঘুনাথ পুরী ।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৯৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, রঘুনাথ পুরী ছিলেন পূর্বে অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত মহাতেজস্বী পুরুষ। তিনি অষ্টসিদ্ধির অন্যতম অবতার ছিলেন।

শ্লোক ৪৩

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস,—তিন ভাই ।
পূর্বে যাঁর ঘরে ছিলা ঠাকুর নিতাই ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আর কয়েকজন প্রধান ভক্ত হচ্ছেন বিষ্ণুদাস এবং তাঁর দুই ভাই নন্দন ও গঙ্গাদাস। নিত্যানন্দ প্রভু কখনও কখনও তাঁদের বাড়িতে থাকতেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস—এই তিন ভাই ছিলেন নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে কিছুদিন ছিলেন। *চৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁদের বাড়িতে ছিলেন।

শ্লোক ৪৪

নিত্যানন্দভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায় ।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায় ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরমানন্দ উপাধ্যায় ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর এক মহান সেবক। শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ কীর্তন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীপরমানন্দ উপাধ্যায় ছিলেন এক মহাভাগবত। *চৈতন্য-ভাগবতে* তাঁর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীজীব পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হাড়াই ওঝার বাল্যবন্ধু রত্নগর্ভ আচার্যের মধ্যম পুত্র। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৬৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীজীব পণ্ডিত হচ্ছেন ব্রজের ইন্দিরা নামক গোপী।

শ্লোক ৪৫

পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি ।
পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর একত্রিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন পরমানন্দ গুপ্ত, যিনি ছিলেন পারমার্থিক চেতনায় অত্যন্ত উন্নত এক মহান কৃষ্ণভক্ত। পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর গৃহে কিছুদিন বসবাসও করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমানন্দ গুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে *কৃষ্ণস্তবাবলী* নামক প্রার্থনা রচনা করেছেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৯৪ ও ১৯৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন ব্রজের মঞ্জুমেধা নামক গোপী।

শ্লোক ৪৬

নারায়ণ, কৃষ্ণদাস আর মনোহর ।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বাত্রিংশতিতম, ত্রয়োত্রিংশতিতম, চতুস্ত্রিংশতিতম ও পঞ্চত্রিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর ও দেবানন্দ, যাঁরা সর্বদাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবায় মগ্ন ছিলেন।

শ্লোক ৪৭

হোড় কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ ।
নিত্যানন্দ-পদ বিনু নাহি জানে আন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর ষট্‌ত্রিংশতিতম ভক্ত হচ্ছেন হোড় কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন তাঁর প্রাণস্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম বিনা তিনি আর কিছুই জানতেন না।

তাৎপর্য

হোড় কৃষ্ণদাস ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের বড়গাছি নামক স্থানের অধিবাসী।

শ্লোক ৪৮

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর ।
রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান ভক্তদের মধ্যে নকড়ি হচ্ছেন সপ্তত্রিংশতিতম, মুকুন্দ অষ্টত্রিংশতিতম, সূর্য একোনচত্বারিংশতিতম, মাধব চত্বারিংশতিতম, শ্রীধর একচত্বারিংশতিতম, রামানন্দ দ্বিচত্বারিংশতিতম, জগন্নাথ ত্রিচত্বারিংশতিতম এবং মহীধর চতুশ্চত্বারিংশতিতম ভক্ত।

তাৎপর্য

শ্রীধর ছিলেন দ্বাদশতম গোপাল।

শ্লোক ৪৯

শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ ।
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্তদের মধ্যে শ্রীমন্ত পঞ্চচত্বারিংশতিতম, গোকুলদাস ষট্‌চত্বারিংশতিতম, হরিহরানন্দ সপ্তচত্বারিংশতিতম, শিবাই অষ্টচত্বারিংশতিতম, নন্দাই একোনপঞ্চাশত্তম এবং পরমানন্দ ছিলেন পঞ্চাশত্তম ভক্ত।

শ্লোক ৫০

বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন ।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান ভক্তদের মধ্যে বসন্ত ছিলেন একপঞ্চাশত্তম, নবনী হোড় দ্বিপঞ্চাশত্তম, গোপাল ত্রিপঞ্চাশত্তম, সনাতন চতুষ্পঞ্চাশত্তম, বিষ্ণাই হাজরা পঞ্চপঞ্চাশত্তম, কৃষ্ণানন্দ ষট্‌পঞ্চাশত্তম এবং সুলোচন সপ্তপঞ্চাশত্তম ভক্ত।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "মনে হয় নবনী হোড় ছিলেন বড়গাছি-নিবাসী হরি হোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস হোড়। বড়গাছি বা বহিরগাছি লালগোলা লাইনে মুড়াগাছা স্টেশন থেকে দুই মাইল দূরে। পূর্বে বড়গাছির পাশ দিয়ে

গঙ্গা প্রবাহিত হত, কিন্তু এখন তা কাল্‌শির খাল নামক একটি খালে পরিণত হয়েছে। মুড়াগাছা স্টেশনের নিকটে শালিগ্রাম নামক গ্রামে রাজা কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। সেই কথা *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। কখনও কখনও বলা হয় যে, নবনী হোড় ছিলেন রাজা কৃষ্ণদাসের পুত্র। তাঁর বংশধরেরা এখনও বহিরগাছির নিকটে রুকুণপুর নামক গ্রামে বাস করেন। তাঁরা ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সংস্কারের ফলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাঁরা এখন সর্ববর্ণের মানুষদের দীক্ষা দান করেন।"

শ্লোক ৫১

কংসারি সেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান ভক্তদের মধ্যে অষ্টপঞ্চাশত্তম মহান ভক্ত হচ্ছেন কংসারি সেন, একোনষষ্টিতম ভক্ত হচ্ছেন রামসেন, ষষ্টিতম ভক্ত হচ্ছেন রামচন্দ্র কবিরাজ এবং একষষ্টিতম, দ্বিষষ্টিতম ও ত্রিষষ্টিতম ভক্ত হচ্ছেন যথাক্রমে গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ ও মুকুন্দ এই তিনজন কবিরাজ।

তাৎপর্য

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ছিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও সুনন্দার পুত্র এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। তিনি ছিলেন নরোত্তম দাস ঠাকুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর জন্মে জন্মে তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করেছেন। রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন গোবিন্দ কবিরাজ। শ্রীল জীব গোস্বামী রামচন্দ্র কবিরাজের কৃষ্ণভক্তির প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন এবং তাই তিনি তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আজন্ম সংসারে বিরাগী ছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু ও নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রচারে প্রবলভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি প্রথমে শ্রীখণ্ডে বাস করতেন, কিন্তু পরে গঙ্গার তীরে কুমারনগর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

গোবিন্দ কবিরাজ ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা এবং শ্রীখণ্ডের চিরঞ্জীবের কনিষ্ঠ পুত্র। যদিও প্রথমে তিনি শক্তি বা দুর্গার উপাসক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কবিরাজও প্রথমে শ্রীখণ্ড, তারপর কুমারনগরে বসতি স্থাপন করেন, তারপর তিনি পদ্মার দক্ষিণ তীরে তেলিয়া বুধরি নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর কবিত্ব দর্শন করে শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁকেও কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি *সঙ্গীত-মাধব* নামক নাটক ও *গীতামৃত* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থের নবম তরঙ্গে তাঁর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

কংসারি সেন পূর্বে ব্রজের রত্নাবলী নামক গোপিকা ছিলেন। সেই কথা *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৯৪ ও ২০০) বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৫২

পীতাম্বর, মাধবাচার্য, দাস দামোদর ।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রধান ভক্তদের মধ্যে পীতাম্বর হচ্ছেন চতুঃষষ্টিতম, মাধবাচার্য পঞ্চষষ্টিতম, দামোদর দাস ষট্‌ষষ্টিতম, শঙ্কর সপ্তষষ্টিতম, মুকুন্দ অষ্টষষ্টিতম, জ্ঞান দাস একোনসপ্ততিতম এবং মনোহর সপ্ততিতম ভক্ত।

শ্লোক ৫৩

নর্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস ।
নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

নর্তক গোপাল হচ্ছেন একসপ্ততিতম ভক্ত, রামভদ্র দ্বিসপ্ততিতম ভক্ত, গৌরাঙ্গ দাস ত্রিসপ্ততিতম ভক্ত, নৃসিংহচৈতন্য চতুঃসপ্ততিতম ভক্ত এবং মীনকেতন রামদাস হচ্ছেন পঞ্চসপ্ততিতম ভক্ত।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৬৮) বর্ণনা করা হয়েছে যে, মীনকেতন রামদাস হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের অবতার।

শ্লোক ৫৪

বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন ।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহো করিল রচন ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থ (পরবর্তীকালে যা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ হয়) রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস ।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় ব্যাসদেব হচ্ছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর।

তাৎপর্য

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ছিলেন বেদব্যাসের অবতার এবং কৃষ্ণলীলার কুসুমাপীড় নামক জনৈক সখ্যরসাশ্রিত গোপবালক। অর্থাৎ, শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতৃদুহিতা নারায়ণীর পুত্র শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের* রচয়িতা। তিনি একাধারে ব্যাসদেব ও কুসুমাপীড় নামক গোপবালকের অবতার। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের* ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবনী বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৫৬

সর্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি ।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সমস্ত শাখার মধ্যে বীরভদ্র গোসাঞি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর যত উপশাখা তারও অন্ত নেই।

শ্লোক ৫৭

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন ।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাঙ কত জন ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত অনুগামী গণনা করে শেষ করা যায় না। আমি কেবল আত্ম-পবিত্রতার জন্য তাঁদের কয়েকজনের কথা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৫৮

এই সর্বশাখা পূর্ণ—পক্ক প্রেমফলে ।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই সমস্ত ভক্তশাখা কৃষ্ণভক্তিরূপ সুপক্ক ফলে পরিপূর্ণ। যাদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদেরই তাঁরা এই ফল বিতরণ করেছেন। এভাবেই তাঁরা কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবনে সকলকে ভাসিয়েছেন।

শ্লোক ৫৯

অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল ।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

নিরবচ্ছিন্নভাবে অবিরত কৃষ্ণপ্রেম দান করার মহাশক্তি এই সমস্ত ভক্তদের ছিল। সেই শক্তির দ্বারা তাঁরা যে কাউকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম দান করতে পারতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, *কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।* এই গানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে বৈষ্ণবের সম্পদ। তাই তিনি এই উভয় বস্তু তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যাকে-তাকে দান করতে পারেন। তাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে হলে শুদ্ধ ভক্তের কৃপা লাভ করতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি*—"গুরুদেবের কৃপার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত পারমার্থিক পথে কোন উন্নতি লাভ করা যায় না।" শুদ্ধ বৈষ্ণব অথবা সদ্গুরুর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণভক্তি এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়।

শ্লোক ৬০

সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দগণ ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্র-বদন' ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

আমি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগামী কয়েকজন ভক্তদের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। সহস্রবদন শেষনাগ পর্যন্ত এই সমস্ত অগণিত ভক্তদের কথা বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না।

শ্লোক ৬১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীনিত্যানন্দ স্কন্ধ ও শাখা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার একাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা ও উপশাখা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃত-প্রবাহ ভাষ্যে আদিলীলার* দ্বাদশ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার প্রদান করেছেন। এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুগামীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দের অনুগামীরা। অচ্যুতানন্দের এই অনুগামীদেরকে অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রদত্ত দর্শনের সার গ্রহণকারী এবং অন্যান্য তথাকথিত সকল বংশধর ও অনুগামীদেরকে অসার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে অদ্বৈত আচার্যের পুত্র গোপাল মিশ্র এবং অদ্বৈত আচার্যের ভৃত্য কমলাকান্ত বিশ্বাসের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম জীবনে গোপাল মিশ্র জগন্নাথপুরীতে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনের সময় মূর্ছিত হন এবং তার ফলে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেন। কমলাকান্ত বিশ্বাসের কাহিনীতে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ঋণ শোধ করার জন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে তিন শত টাকা ধার করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তা জানতে পেরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অনুরোধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসকে শোধন করেন। অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুগামীদের কথা বর্ণনা করার পর, এই পরিচ্ছেদে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগামীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্ ।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১ ॥

অদ্বৈত-অঙ্ঘ্রি—অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম; **অব্জ**—পদ্ম ফুল; **ভৃঙ্গান্**—ভ্রমর; **তান্**—তাঁদের সকলের; **সার-অসার**—সার ও অসার; **ভৃতঃ**—গ্রহণপূর্বক; **অখিলান্**—তাঁদের সকলকে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অসারান্**—অসার; **সার-ভৃতঃ**—যাঁরা প্রকৃত; **নৌমি**—আমি প্রণতি নিবেদন করি; **চৈতন্য-জীবনান্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন যাঁদের প্রাণস্বরূপ।

অনুবাদ

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুগামীরা দুই প্রকার—সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহী। তাঁদের মধ্যে অসারগ্রাহীদের পরিত্যাগ করে সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্য-দাসদেরকে প্রণাম করি।

শ্লোক ২

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জয় হোক! তাঁরা সকলেই ধন্য।

শ্লোক ৩

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণাননুমঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্য—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **অমর**—নিত্য; **তরোঃ**—বৃক্ষের; **দ্বিতীয়**—দ্বিতীয়; **স্কন্ধ**—বড় শাখা; **রূপিণঃ**—রূপী; **শ্রীমৎ**—অসীম ঐশ্বর্যপূর্ণ; **অদ্বৈতচন্দ্রস্য**—অদ্বৈতচন্দ্র প্রভুর; **শাখা-রূপান্**—শাখারূপী; **গণান্**—অনুগামীদিগকে; **নুমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্যরূপী অমর তরুর দ্বিতীয় স্কন্ধরূপী অসীম ঐশ্বর্যপূর্ণ অদ্বৈত প্রভুর শাখারূপ অনুগামীদেরকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য-গোসাঞি ।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হচ্ছেন সেই বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ। তাঁর এত শাখা যে, সকলের কথা লিখে বর্ণনা করা যায় না।

শ্লোক ৫

চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে ।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই বৃক্ষের মালী এবং তাঁর কৃপারূপ জল সেচনের ফলে সমস্ত স্কন্ধ ও শাখা পুষ্ট হয়ে দিনে দিনে বর্ধিত হয়ে থাকে।

শ্লোক ৬

সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল ।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্কন্ধে যত ভগবৎ-প্রেমরূপ ফল ফলল তা এত অসংখ্য যে, তার ফলে কৃষ্ণপ্রেমে সমস্ত জগৎ প্লাবিত হল।

শ্লোক ৭

সেই জল স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার ।
ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই বৃক্ষের স্কন্ধ ও শাখায় যখন জল সিঞ্চন করা হল, তখন শাখা-উপশাখাগুলি প্রচুরভাবে বর্ধিত হল এবং তা ফুলে-ফলে পূর্ণ হল।

শ্লোক ৮

প্রথমে ত' একমত আচার্যের গণ ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুগামীরা একমত অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পরে দৈবের প্রভাবে তাঁদের মধ্যে দুটি ভিন্ন মত দেখা দিল।

তাৎপর্য

দৈবের কারণ শব্দে বোঝা যাচ্ছে যে, দৈব বিপাকে ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে অদ্বৈত আচার্যের অনুগামীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্যদের মধ্যে তখন যে ধরনের মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল, এখন সেই ধরনের মতবিরোধ গৌড়ীয় মঠের সদস্যদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রকটকালে সমস্ত শিষ্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে ভগবানের সেবা করছিলেন; কিন্তু তাঁর তিরোভাবের ঠিক পরেই তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। একদল নিষ্ঠা সহকারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসরণ করতে থাকেন, কিন্তু অন্য দল তাঁদের নিজেদের ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁদের মনগড়া সমস্ত মত তৈরি করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অপ্রকটের পূর্বে তাঁর সমস্ত শিষ্যদের একটি গভর্নিং বডি বা পরিচালক-মণ্ডলী তৈরি করে সম্মিলিতভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি কোন বিশেষ একজন শিষ্যকে পরবর্তী আচার্য হওয়ার নির্দেশ দিয়ে যাননি। কিন্তু তাঁর তিরোভাবের ঠিক পরেই তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যরা আচার্যের পদ দখল করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তী আচার্য কে হবেন, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। ফলে, উভয় দলই অসার হয়ে যায়, কেন না গুরুদেবের আদেশ অমান্য করার ফলে, তাঁদের পারমার্থিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। একটি পরিচালক-মণ্ডলী তৈরি করে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁদের প্রতি গুরুদেবের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তাঁরা মামলা-মোকদ্দমা শুরু করেন এবং সেই মামলা-মোকদ্দমা আজও চলছে।

তাই, আমরা কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। এই দুটি দল গৌড়ীয় মঠের সম্পত্তি ভাগ করার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে প্রচারকার্য বন্ধ করে দিয়েছেন, তাই আমরা শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সমস্ত জগৎ জুড়ে প্রচার করার ভার গ্রহণ করেছি। পূর্বতন আচার্যদের কৃপার প্রভাবে আমাদের এই দীন প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* শ্লোক *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন*—এর ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা আমরা অনুসরণ করছি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বান্তঃকরণে গুরুদেবের আদেশ পালন করা। পারমার্থিক জীবনে সাফল্য লাভের উপায় হচ্ছে, গুরুদেবের আদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখা। *বেদে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যিনি শ্রীগুরুদেবের বাক্যে এবং পরমেশ্বর ভগবানের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযুক্ত, সমস্ত বৈদিক জ্ঞান তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।" সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে। আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা যদিও নানাভাবে এই আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তবুও আমাদের প্রচারকার্য সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে, কেন না আমরা পূর্বতন আচার্যদের কৃপাশীর্বাদ লাভ করেছি। তা ফলের মাধ্যমে কার্যের সাফল্য নিরূপণ করা যায়। স্বনির্বাচিত আচার্যদের যে সমস্ত অনুগামীরা গৌড়ীয় মঠের সম্পত্তি দখল করে বসে আছেন, তাঁরা জাগতিক দিক দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু মহাপ্রভুর বাণীর প্রচারকার্যে তাঁরা কিছুই করতে পারেননি। তাই তাঁদের কার্যকলাপের ফল দেখে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁরা অসার। কিন্তু আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন-এর সাফল্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ঘোষিত হচ্ছে, কেন না তাঁরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী সর্বান্তঃকরণে অনুসরণ করছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর চেয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সমন্বিত গ্রন্থ যত বেশি সম্ভব ছাপিয়ে, তা সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করা হোক। আমরা যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করেছি এবং তার ফলে আশাতীতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছি।

শ্লোক ৯

কেহ ত' আচার্য আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র ।
স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

কোন কোন শিষ্য গভীর নিষ্ঠা সহকারে আচার্যের আজ্ঞা অনুসরণ করেছেন, আর অন্যান্যরা দৈবী মায়ার প্রভাবে স্বকপোল-কল্পিত মত তৈরি করেছেন।

তাৎপর্য

কিভাবে দলাদলি শুরু হয় তা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। শিষ্যরা যখন গুরুদেবের আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করে, তখন তাদের মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। গুরুদেবের

মত ছাড়া ভিন্ন যে মত, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। জড়-জাগতিক ধারণার উপর নির্ভর করে পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেটিই হচ্ছে অধঃপতনের কারণ। জড়-জাগতিক ধারণার সঙ্গে পারমার্থিক প্রগতির সমন্বয় সাধন করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ১০

আচার্যের মত যেই, সেই মত সার ।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্যের যে মত, সেই মতই হচ্ছে সার। যে সেই মত লঙ্ঘন করে, সে তৎক্ষণাৎ অসার হয়ে যায়।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। যিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছাকে রূপদান করতে সক্ষম হন। কিন্তু যে গুরুদেবের আদেশ অমান্য করে বিপথগামী হয়, সে সম্পূর্ণভাবে অসার হয়ে যায়।

শ্লোক ১১

অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন ।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

যারা অসার হয়ে বসেছে, এখানে তাদের নাম উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবু আমি তাদের কথা উল্লেখ করলাম, কেবল সার্থক ভক্তদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য নিরূপণ করার জন্য।

শ্লোক ১২

ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্‌না সহিতে ।
পশ্চাতে পাত্‌না উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে ধানের সঙ্গে শুষ্ক খড়কুটো মিশ্রিত থাকে, কিন্তু পরে হাওয়ার সাহায্যে ওই খড়কুটো উড়িয়ে ধান থেকে তা আলাদা করা হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এখানে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গৌড়ীয় মঠের সদস্যদের বেলায়ও এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ প্রযোজ্য। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বহু শিষ্য রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কে সার এবং কে অসার তা বোঝা যায়, কে কতখানি নিষ্ঠা সহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করছেন, তার মাধ্যমে। শ্রীল

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভারতবর্ষের বাইরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। প্রকটকালে তিনি তাঁর শিষ্যদের ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য, কিন্তু তাঁরা কৃতকার্য হতে পারেননি, কেন না বিদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁরা নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন না। তাঁরা কেবল বিদেশে যাওয়ার খ্যাতি অর্জন করে ভারতবর্ষে বিলেত-ফেরৎ প্রচারকরূপে পরিচিতি লাভ করার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। গত আশি বছর ধরে বহু স্বামীজী বিদেশে গিয়ে প্রচারের নামে নানা রকম ভণ্ডামি করেছে, কিন্তু কেউই কৃষ্ণভাবনামৃত সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করতে পারেনি। তারা ভারতবর্ষে ফিরে এসে কপট প্রচার করেছে যে, ইউরোপ, আমেরিকার সমস্ত সাহেব-মেমদেরকে তাঁরা বৈদান্তিকে পরিণত করেছে অথবা কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছে এবং তারপর ভারতবর্ষে চাঁদা তুলে আরামে জীবন যাপন করছে। হাওয়া দিয়ে যেমন শুষ্ক খড়কুটো থেকে ধান আলগা করা হয়, তেমনই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে বোঝা যায় যে, কে যথার্থ ভগবানের বাণীর প্রচারক, আর কে তা নয়।

শ্লোক ১৩

অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তেঁহো চৈতন্য-চরণ ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর একটি বড় শাখা হচ্ছেন তাঁর পুত্র অচ্যুতানন্দ। তিনি তাঁর জন্মের প্রথম থেকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত ছিলেন।

শ্লোক ১৪

চৈতন্য গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

অচ্যুতানন্দ যখন তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু হচ্ছেন কেশব ভারতী, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

শ্লোক ১৫

জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন জগদ্গুরু, আর তুমি বলছ যে, কেশব ভারতী হচ্ছেন তাঁর গুরু, এই উপদেশ দিয়ে তুমি সমস্ত দেশকে বিভ্রান্ত করছ।

শ্লোক ১৬

চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন চতুর্দশ ভুবনের গুরু, কিন্তু তুমি বলছ যে, অন্য কেউ হচ্ছেন তাঁর গুরু। কোন শাস্ত্রে এই রকম কথা নেই।"

শ্লোক ১৭

পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য সন্তোষ অপার ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁর পাঁচ বছরের পুত্র অচ্যুতানন্দের মুখে সমস্ত সিদ্ধান্তের সারমর্ম শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই পরিচ্ছেদের ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শ্লোকের *অনুভাষ্যে* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অদ্বৈত আচার্যের বংশধরদের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। *চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অচ্যুতানন্দ ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত *অদ্বৈত-চরিত* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, "অদ্বৈত আচার্যের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল দাস নামক তিন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই সীতাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত। বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ নামক অদ্বৈত আচার্যের আরও তিনটি পুত্র ছিল। এভাবেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ছয়টি পুত্র।" এই ছয় পুত্রের মধ্যে তিনজন ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্ঠাবান অনুগামী এবং তাঁদের মধ্যে অচ্যুতানন্দই ছিলেন জ্যেষ্ঠ।

পঞ্চদশ শকাব্দের প্রথম দিকে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বিবাহ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরী থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন ১৪৩৩-৩৪ শকাব্দে অচ্যুতানন্দের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের* চতুর্থ অধ্যায়ে অচ্যুতানন্দ সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর*। সুতরাং অচ্যুতানন্দ ১৪২৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অচ্যুতানন্দের জন্মের পূর্বে মহাপ্রভুর জন্মের সময়, অদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবী মহাপ্রভুকে দেখতে এসেছিলেন। সুতরাং একুশ বছরের মধ্যে তাঁর আরও তিনটি পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা নিছক কল্পনা নয়। *নিত্যানন্দ-দায়িনী* নামক একটি অপ্রামাণিক পত্রিকায় ১৭৯২ শকাব্দে *সীতাদ্বৈত-চরিত* নামক একখানি বাংলা গ্রন্থে অচ্যুতানন্দকে মহাপ্রভুর সহপাঠী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীচৈতন্য-*

ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে, সেটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে আসেন, তখন ১৪৩১ শকাব্দ। সেই সময় অচ্যুতানন্দ তিন বছরের শিশু। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভুর দিগম্বর শিশুপুত্র চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে এসে পতিত হয়। তখন যদিও তার সারা গায়ে ধুলো লেগেছিল, তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে কোলে তুলে নেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন—

অচ্যুত, আচার্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই-ভ্রাতা ॥

নবদ্বীপে ভগবৎ-স্বরূপ প্রকাশ করার পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে নিয়ে আসার জন্য শ্রীনিবাস আচার্যের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতকে শান্তিপুরে পাঠান। তখন অচ্যুতানন্দ পিতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে—

অদ্বৈতের তনয় 'অচ্যুতানন্দ' নাম।
পরমবালক, সেহো কান্দে অবিরাম ॥

আবার অদ্বৈত প্রভু যখন ভক্তির বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা করছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁকে প্রহার করেছিলেন, তখনও অচ্যুতানন্দ বর্তমান ছিল। সুতরাং, এই সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের দুই-তিন বছর পূর্বে ঘটেছিল। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে—*অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত তনয়।* সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় যে, অচ্যুতানন্দ জন্মাবধি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন।

অচ্যুতানন্দ কখনও বিবাহ করেছিলেন, এই রকম কোন বর্ণনা কোথাও নেই। তাঁকে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর সব চাইতে বড় শাখা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *শাখানির্ণয়ামৃত* নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, অচ্যুতানন্দ ছিলেন গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং তিনি জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে ভগবৎ-সেবা করেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার* দশম পরিচ্ছেদ থেকেও জানা যায় যে, অদ্বৈত আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে ভগবৎ-সেবা করেছিলেন। গদাধর পণ্ডিতও তাঁর শেষ জীবনে জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে বাস করেছিলেন। তাই অচ্যুতানন্দ যে গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। রথযাত্রা অনুষ্ঠানের সময় রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্যের সময়কার বর্ণনায় অচ্যুতানন্দের নাম কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। *আদিলীলার* ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে—*শান্তিপুর-আচার্যের এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহাঁ আর সব গায় ॥* সেই সময় অচ্যুতানন্দের বয়স মাত্র ছয় বছর। শ্রীকবিকর্ণপূর প্রণীত *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৮৭) অচ্যুতানন্দকে গদাধরের শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারও কারও মতে তিনি হচ্ছেন শিব ও পার্বতীর পুত্র কার্তিকের অবতার এবং অন্য কারও কারও মতে তিনি হচ্ছেন অচ্যুতা নাম্নী গোপী। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৮৮) এই দুটি মতেরই

সমর্থন করা হয়েছে। নরহরি দাস রচিত *নরোত্তম-বিলাস* নামক গ্রন্থে শ্রীঅচ্যুতানন্দের খেতরি মহোৎসবে আগমন এবং যোগদানের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীনরহরি দাস বর্ণনা করেছেন যে, শেষ জীবনে শ্রীঅচ্যুতানন্দ শান্তিপুরে তাঁর বাড়িতে বাস করতেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনি গদাধর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে বাস করতেন।

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ছয় পুত্রের মধ্যে তিনজন—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল দাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ যেহেতু বিবাহ করেননি, তাই তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণ মিশ্রের রঘুনাথ চক্রবর্তী ও দোলগোবিন্দ নামক দুটি পুত্র ছিল। রঘুনাথের বংশধরেরা এখনও শান্তিপুরের অন্তর্গত মদনগোপাল পাড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গণকর, মৃজাপুর ও কুমারখালিতে বাস করেন। দোলগোবিন্দের চাঁদ, কন্দর্প ও গোপীনাথ নামক তিনটি পুত্র ছিল। কন্দর্পের বংশধরেরা মালদহের জিকাবাড়ী গ্রামে বাস করেন। গোপীনাথের শ্রীবল্লভ, প্রাণবল্লভ ও কেশব নামক তিনটি পুত্র ছিল। শ্রীবল্লভের বংশধরেরা মশিয়াডারা বা মহিষডেরা, দামুকদিয়া ও চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ থেকে তাঁদের বংশতালিকা রয়েছে। শ্রীবল্লভের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপালের বংশধরেরা এখন দামুকদিয়া, চণ্ডীপুর, শোলমারি প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। প্রাণবল্লভ ও কেশবের বংশধরেরা উখলীতে বাস করেন। প্রাণবল্লভের পুত্র ছিলেন রত্নেশ্বর, তাঁর পুত্র ছিলেন কৃষ্ণরায় এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁর পুত্র ছিলেন নবকিশোর এবং নবকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন রামমোহন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন জগবন্ধু। তাঁর তৃতীয় পুত্র বীরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহনের এই দুই পুত্র বড় প্রভু ও ছোট প্রভু নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁরা শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার প্রবর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের ধারায় অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বংশতালিকা *বৈষ্ণব-মঞ্জুষা* নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৮

কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণমিশ্র ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের পুত্র। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করতেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগোপাল ছিলেন শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আর একজন পুত্র। এখন তাঁর চরিত শ্রবণ করুন, কেন না তা অত্যন্ত অদ্ভুত।

তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীগোপাল ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের তিনজন বৈষ্ণব পুত্রের মধ্যে অন্যতম। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার* দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ১৪৩ থেকে ১৪৯ শ্লোকে তাঁর জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে ।
কীর্তনে নর্তন করে বড় প্রেম-সুখে ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং যখন জগন্নাথপুরীতে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জনা করছিলেন, তখন গোপাল গভীর প্রেমে মগ্ন হয়ে মহা আনন্দের সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নৃত্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

গুণ্ডিচা-মন্দির জগন্নাথপুরীতে অবস্থিত এবং প্রতি বছর শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী জগন্নাথ মন্দির থেকে আট দিনের জন্য সেখানে থাকতে যান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথপুরীতে বাস করছিলেন, তখন প্রতি বছর তিনি তাঁর প্রধান ভক্তদের নিয়ে নিজে সেই মন্দিরটি পরিষ্কার করতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের (মধ্য ১২) গুণ্ডিচা-মার্জন পরিচ্ছেদে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

নানা-ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্তন ।
দুই গোসাঞি 'হরি' বলে, আনন্দিত মন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি যখন অদ্ভুতভাবে নৃত্য করছিলেন, তখন তাঁর দেহে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়। তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভু অন্তরে আনন্দিত হয়ে হরিধ্বনি দিতে থাকেন।

শ্লোক ২২

নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত ।
ভূমেতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিত ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

নাচতে নাচতে গোপাল মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হন এবং তাঁর চেতনা লোপ পায়।

শ্লোক ২৩

দুঃখিত হইলা আচার্য পুত্র কোলে লঞা ।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে কোলে তুলে নেন এবং তাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নৃসিংহ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করেন।

শ্লোক ২৪

নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য, না হয় চেতন ।
আচার্যের দুঃখে বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য তখন নানা রকম মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, কিন্তু গোপালের চেতনা ফিরে এল না। তখন আচার্যের দুঃখ দেখে, সেখানে সমবেত সমস্ত বৈষ্ণবেরা ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৫

তবে মহাপ্রভু, তাঁর হৃদে হস্ত ধরি' ।
'উঠহ, গোপাল,' কৈল বল 'হরি' 'হরি' ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন গোপালের হৃদয়ে হাত রেখে তাকে বললেন, "গোপাল ওঠ এবং ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন কর।"

শ্লোক ২৬

উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি' ।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর স্পর্শ লাভ করে এবং কণ্ঠ শুনে গোপাল তৎক্ষণাৎ উঠে বসল এবং তখন মহা আনন্দে সেখানে সমবেত সমস্ত বৈষ্ণবেরা হরিধ্বনি দিতে লাগলেন।

শ্লোক ২৭

আচার্যের আর পুত্র—শ্রীবলরাম ।
আর পুত্র—'স্বরূপ'-শাখা, 'জগদীশ' নাম ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের আর অন্যান্য পুত্ররা হচ্ছেন শ্রীবলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ।

তাৎপর্য

অদ্বৈতচরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর চতুর্থ, পঞ্চম ও যষ্ঠ পুত্র। এভাবেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের ছয় পুত্র ছিল। বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ ছিলেন গৌরবিমুখ স্মার্ত বা মায়াবাদী, তাই বৈষ্ণব সমাজ তাদের পরিত্যাগ করেছিলেন। কখনও কখনও মায়াবাদীরা বিষ্ণুপূজা করে বৈষ্ণব হওয়ার ভান করে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুকে তারা পরমেশ্বর ভগবান বলে বিশ্বাস করে না, কেন না তারা মনে করে যে, শিব, দুর্গা, সূর্য ও গণেশ—এই সমস্ত দেবতারাও বিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত। তাদের বলা হয় পঞ্চোপাসক স্মার্ত এবং তাদের কখনও বৈষ্ণব বলে গণনা করা উচিত নয়।

বলরামের তিন পত্নী ও নয় পুত্র ছিল। তার প্রথম পত্নীর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম মধুসূদন গোস্বামী। তিনি ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করে স্মার্তধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, গোস্বামী ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীরাধারমণ গোস্বামী ভট্টাচার্য নাম গ্রহণ করে গৃহত্যাগীদের উপাধি *গোস্বামী* শব্দের অবমাননা করেন। সংসার-ধর্মে লিপ্ত মানুষদের গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জাতি গোস্বামীদের স্বীকৃতি দেননি, কেন না তাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ ষড় গোস্বামীদের অনুগত নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য-পরম্পরায় এই ষড় গোস্বামী হচ্ছেন—শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, গৃহস্থ-আশ্রম হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তর্পণের এক প্রকার অনুমোদন। তাই, গৃহস্থদের কখনই গোস্বামী উপাধি গ্রহণ করা উচিত নয়। আমাদের আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে কখনও কোন গৃহস্থকে গোস্বামী উপাধি দেওয়া হয়নি। কিন্তু যদিও আমাদের সংস্থার সমস্ত সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন যুবক বয়সী, আমরা তাদের স্বামী বা গোস্বামী এই ত্যাগের উপাধি দান করেছি, কেন না তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য সর্বতোভাবে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, জাত গোসাঞিরা কেবল গোস্বামী উপাধির অবমাননাই করে না, তারা স্মার্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কুশ-পুত্তলিকা দগ্ধ করে প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন করে *বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস* আদি গ্রন্থের বিরুদ্ধাচরণ করে মূর্খতা ও মহা অপরাধ প্রদর্শন করে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কখনও কখনও এই সমস্ত স্মার্ত ও জাত গোসাঞিরা বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করে অথবা শাস্ত্রের ভাষ্য লেখে, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সব সময় সেগুলি বর্জন করেন।

শ্লোক ২৮

'কমলাকান্ত বিশ্বাস'—নাম আচার্যকিঙ্কর ।
আচার্য-ব্যবহার সব—তাঁহার গোচর ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলেন কমলাকান্ত বিশ্বাস। তিনি অদ্বৈত আচার্যের সমস্ত আচার-ব্যবহার জানতেন।

তাৎপর্য

আদিলীলায় (১০/১৪৯) বর্ণিত কমলানন্দ এবং *মধ্যলীলায়* (১০/৯৪) বর্ণিত কমলাকান্ত একই ব্যক্তি। কমলাকান্ত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবক। তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ভৃত্যরূপে মহাপ্রভুর সেবায় যুক্ত ছিলেন। যখন পরমানন্দ পুরী নবদ্বীপ থেকে জগন্নাথপুরীতে যান, তখন তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাঁরা দুজনেই জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যান। *মধ্যলীলায়* (১০/৯৪) বর্ণিত হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত—ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে জগন্নাথপুরীতে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া ।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিল পাঠাইয়া ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

কমলাকান্ত বিশ্বাস যখন জগন্নাথপুরীতে ছিলেন, তখন তিনি কাউকে দিয়ে একটি চিঠি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩০

সেই পত্রীর কথা আচার্য নাহি জানে ।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুস্থানে ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিঠির কথা কেউ জানত না, কিন্তু কোন না কোনভাবে সেই চিঠিটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হস্তগত হয়।

শ্লোক ৩১

সে পত্রীতে লেখা আছে—এই ত' লিখন ।
ঈশ্বরত্বে আচার্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিঠিতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে ভগবানের অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২

কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ ।
ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত-তিন ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু তাতে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে অদ্বৈত আচার্যের তিন শত টাকা ঋণ হয়েছে এবং কমলাকান্ত বিশ্বাস সেই টাকাটা দিয়ে ঋণ শোধ করতে চান।

শ্লোক ৩৩

পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখ ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিঠিটি পড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্তরে ব্যথিত হলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল ছিল। তাই বাইরে হেসে তিনি বললেন—

শ্লোক ৩৪

আচার্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর ।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য—দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সে অদ্বৈত আচার্যকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করেছে। তাতে অবশ্য কোন দোষ নেই, কেন না প্রকৃতই তিনি ঈশ্বর।

শ্লোক ৩৫

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা ।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু সে ভগবানের অবতারকে দারিদ্র্যগ্রস্ত ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। তাই আমি তাকে দণ্ড দিয়ে তার ভুল সংশোধন করব।"

তাৎপর্য

কোন মানুষকে ভগবানের অবতার বা নারায়ণের অবতার বলে বর্ণনা করে, আবার একই সময়ে তাঁকে যদি অভাবে পীড়িত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে স্থাপন করা হয়, তা হলে তা পরস্পর-বিরোধী এবং সেটি হচ্ছে সব চাইতে বড় অপরাধ। বৈদিক সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য প্রচারকার্যে যুক্ত মায়াবাদীরা প্রচার করে যে, সকলেই ভগবান এবং দারিদ্র্যগ্রস্ত মানুষদের তারা *দরিদ্র-নারায়ণ* বলে বর্ণনা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও এই ধরনের ভ্রান্ত ও অর্থহীন ধারণা বরদাস্ত করেননি। তিনি কঠোর ভাষায় বলেছেন, *মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ*। এই ধরনের মূর্খদের দণ্ডদান করে শিক্ষা দিতে হয়।

পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর অবতারদের দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে বর্ণনা করাটা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ভগবানের অবতার বামনদেব বলি মহারাজের কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সকলেই জানে যে, বামনদেব দারিদ্র্যগ্রস্ত ছিলেন না। বলি মহারাজের কাছ থেকে তাঁর এই ভিক্ষালীলা তাঁকে করুণা করারই একটি উপায় মাত্র। বলি মহারাজ যখন সেই ভূমি তাঁকে দান করেন, তখন তিনি দুটি পদক্ষেপের দ্বারা ত্রিভুবন অধিকার করে তাঁর সর্বশক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছিলেন। তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণদের কখনই ভগবানের অবতার বলে মনে করা উচিত নয়, কেন না ভগবানের প্রকৃত অবতারের ঐশ্বর্য তারা কখনই প্রদর্শন করতে পারে না।

শ্লোক ৩৬

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—"ইঁহা আজি হৈতে ।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে ॥" ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দকে আদেশ দিয়েছিলেন, "আজ থেকে বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসকে এখানে আসতে দেবে না।"

তাৎপর্য

বাউলিয়া বা *বাউল* হচ্ছে তেরোটি অপসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি, যারা নিজেদেরকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে প্রচার করতে চেষ্টা করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভৃত্য গোবিন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তাঁর কাছে আসতে না দিতে, কেন না সে *বাউলিয়া* হয়ে গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, যদিও বাউল সম্প্রদায়, আউল সম্প্রদায়, সহজিয়া সম্প্রদায়, স্মার্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ি, চূড়াধারী ও গৌরাঙ্গ-নাগরীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে দাবি করে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাদের বর্জন করেছেন।

শ্লোক ৩৭

দণ্ড শুনি' 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত ।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য হর্ষিত ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

কমলাকান্ত বিশ্বাস যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া এই দণ্ডের কথা শুনল, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ* —"আমি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, আমি কারও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অথবা কারও প্রতি প্রীতি পরায়ণ নই।" যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, তাই কেউই তাঁর শত্রু নয় অথবা কেউই তাঁর মিত্র নয়। যেহেতু সকলেই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ বা পুত্র, তাই ভগবান কখন কাউকে শত্রু অথবা মিত্র বলে ভাবেন না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তাঁর কাছে আসার অনুমতি না দিয়ে দণ্ড দিয়েছিলেন, তখন যদিও তা ছিল অত্যন্ত কঠোর দণ্ড, তবুও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এই দণ্ডের

গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, কেন না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত বিশ্বাসকে কৃপা করেছেন। অতএব তিনি মোটেই দুঃখিত হননি। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই তাঁর প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের আচরণে সন্তুষ্ট থাকা। ভক্তের জীবনে কখনও দুঃখ-দুর্দশা আসতে পারে আবার কখনও প্রাচুর্যও আসতে পারে, কিন্তু তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরমেশ্বর ভগবানের করুণার দান বলে জেনে, সর্ব অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় আনন্দচিত্তে যুক্ত থাকা।

শ্লোক ৩৮

বিশ্বাসেরে কহে,—তুমি বড় ভাগ্যবান্ ।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

কমলাকান্ত বিশ্বাসকে দুঃখিত দেখে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেন না পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তোমাকে দণ্ড দান করেছেন।

তাৎপর্য

এটি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর যথার্থ বিচার। তিনি স্পষ্টভাবে উপদেশ দিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছায় যদি কখনও কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতেও হয়, সেই জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দান, তা সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক যাই হোক না কেন—তা গ্রহণ করে সর্বদা আনন্দিত থাকা।

শ্লোক ৩৯

পূর্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান ।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাকে তাঁর গুরুজন বলে মনে করে সর্বদা সম্মান করতেন, কিন্তু আমার তা ভাল লাগত না। তাই অন্তরে দুঃখিত হয়ে আমি একটি পরিকল্পনা করেছিলাম।

শ্লোক ৪০

মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান ।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই আমি যোগ-বাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করেছিলাম, যাতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, মুক্তি হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। সেই জন্য মহাপ্রভু আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অপমান করেছিলেন।

তাৎপর্য

যোগ-বাশিষ্ঠ নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে, যা মায়াবাদীরা খুব পছন্দ করে, কেন না তা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে নানা রকম নির্বিশেষ ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ। সেই গ্রন্থ বিষ্ণুভক্তির বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের গ্রন্থ বৈষ্ণবদের কখনও পাঠ করা উচিত নয়। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার বাসনায় *যোগ-বাশিষ্ঠ* গ্রন্থের নির্বিশেষ মতগুলি সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন। তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক আচরণ করেন।

শ্লোক ৪১

দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে শ্রীমুকুন্দ অনেক সৌভাগ্যের ফলে যে দণ্ড পেয়েছিল, সেই দণ্ড লাভ করে আমি পরম আনন্দিত হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীমুকুন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পার্ষদ। তিনি এমন অনেক জায়গায় যেতেন, যেখানকার মানুষেরা ছিল বৈষ্ণব-বিরোধী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই কথা জানতে পারলেন, তিনি তখন মুকুন্দকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করে দণ্ড দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ছিলেন কুসুমের মতো কোমল, কিন্তু তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে মুকুন্দকে আসতে দিতে সকলেই ভয় পাচ্ছিলেন। তাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মুকুন্দ একদিন তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, কোনদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর কাছে আসতে দেবেন কি না। সেই ভক্তটি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এসে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন মহাপ্রভু উত্তর দেন, "লক্ষ লক্ষ বছর পর মুকুন্দ আমার কাছে আসার অনুমতি পাবে।" সেই সংবাদ যখন মুকুন্দকে দেওয়া হয়, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নাচতে শুরু করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শোনেন যে, এই রকম ধৈর্য সহকারে লক্ষ লক্ষ বছর পর তাঁর দর্শন লাভের জন্য মুকুন্দ অপেক্ষা করছে, তিনি তৎক্ষণাৎ পুনরায় তাঁকে ফিরে আসতে বলেন। মুকুন্দের এই দণ্ডের কথা *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* দশম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪২

যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী ।
সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ

"যে রকম দণ্ড শচীমাতা পেয়েছিলেন, সেই দণ্ডপ্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্য কার আছে?"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে এমনিভাবে শচীমাতার দণ্ড লাভের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রীসুলভ কোমলতা প্রদর্শন করে শচীমাতা অদ্বৈত প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করছেন। সেই অভিযোগটিকে একটি অপরাধ বলে মনে করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শচীমাতাকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণে প্রণতি নিবেদন করে এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

এত কহি' আচার্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস ।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু-পাশ ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কমলাকান্ত বিশ্বাসকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

শ্লোক ৪৪

প্রভুকে কহেন,—তোমার না বুঝি এ লীলা ।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "প্রভু! আমি তোমার অপ্রাকৃত লীলা বুঝতে পারি না। তুমি কমলাকান্তকে আমার থেকেও বেশি কৃপা করেছ।

শ্লোক ৪৫

আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি কমলাকান্তকে যে কৃপা দেখিয়েছ, আমাকে তুমি তা কখনও দেখাওনি। আমি তোমার শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি, প্রভু! যে জন্য তুমি এভাবে আমাকে কৃপা করলে না?"

তাৎপর্য

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে মহাপ্রভু পূর্বে যে দণ্ড দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটি বলা হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন *যোগ-বাশিষ্ঠ* পড়ছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রহার করেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেননি। কিন্তু কমলাকান্তকে দণ্ড দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন যে, কখনও যেন তাঁর

কাছে না আসেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন যে, তিনি কমলাকান্ত বিশ্বাসকে তাঁর থেকেও বেশি কৃপা করেছেন, কেন না তিনি কমলাকান্তকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেছেন। যদিও অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বেলায় তিনি তা বলেননি। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসকে অদ্বৈত আচার্যের থেকেও বেশি কৃপা করেছেন বলে মনে হয়েছে।

শ্লোক ৪৬

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন এবং তৎক্ষণাৎ কমলাকান্ত বিশ্বাসকে নিয়ে আসতে বললেন।

শ্লোক ৪৭

আচার্য কহে, ইহাকে কেনে দিলে দরশন ।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "তুমি কেন এই মানুষটিকে ডেকে তোমার দর্শন দান করলে? সে আমাকে দুভাবে প্রতারণা করেছে।"

শ্লোক ৪৮

শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল ।
দুঁহার অন্তর-কথা দুঁহে সে জানিল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তাঁরা দুজনে পরস্পরের অন্তরের ভাব বুঝলেন।

শ্লোক ৪৯

প্রভু কহে,—বাউলিয়া, ঐছে কাহে কর ।
আচার্যের লজ্জা-ধর্ম-হানি সে আচর ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কমলাকান্তকে বললেন, "তুমি একটি তত্ত্বজ্ঞান রহিত বাউলিয়া। তুমি কেন এভাবে আচরণ কর? তুমি কেন অদ্বৈত আচার্যের গোপন ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করে তাঁর ধর্ম আচরণে বিঘ্ন সৃষ্টি কর?

তাৎপর্য

অজ্ঞতাবশত কমলাকান্ত বিশ্বাস উড়িষ্যার রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ঋণ শোধ করার জন্য তিন শত টাকা চেয়েছিলেন, অথচ সেই সঙ্গে তিনি অদ্বৈত আচার্যকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এটি পরস্পর-বিরোধী। ভগবানের অবতার এই জগতে কারও কাছে ঋণী হতে পারেন না। এই ধরনের ভ্রান্ত মতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও সন্তুষ্ট হন না। একে বলা হয় রসাভাস। নারায়ণকে দরিদ্র বলে প্রচার করার মতো এটিও একটি ভ্রান্ত ধারণা।

শ্লোক ৫০

প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন ।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার গুরুদেব শ্রীঅদ্বৈত আচার্য কখনই ধনী ব্যক্তি বা রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ করেননি। কারণ, গুরু যদি বিষয়ীর কাছ থেকে অন্ন অথবা অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর মন দুষ্ট হয়।

তাৎপর্য

বিষয়ী মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা বা অন্ন গ্রহণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেন না তার ফলে দান গ্রহণকারীর চিত্ত কলুষিত হয়। বৈদিক প্রথা অনুসারে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদেরকেই কেবল দান করা হয়, কেন না তার ফলে দাতা তার পাপকর্ম থেকে মুক্ত হতে পারে। পূর্বে তাই, ব্রাহ্মণেরা পুণ্যবান মানুষ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত গুরুদেবকেই এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমিষ আহার, নেশা, অবৈধ সঙ্গ ও দ্যূতক্রীড়া বর্জনে অনিচ্ছুক বিষয়ীরা কখনও কখনও আমাদের শিষ্য হতে চায়, কিন্তু আমরা তাদের দীক্ষা দিই না। বৈষ্ণবেরা পেশাদারী গুরুদের মতো সস্তা শিষ্য গ্রহণ করেন না। কেউ যদি কমপক্ষে এই চারটি নিয়ম—সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ, নেশা বর্জন, দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ ও অবৈধ সঙ্গ বর্জন করে একজন বৈষ্ণব আচার্যের শরণাপন্ন হয়, তা হলে তিনি তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন। যে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে না, তার নিকট থেকে দান অথবা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫১

মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"মন কলুষিত হলে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না; আর কৃষ্ণস্মৃতি যদি ব্যাহত হয়, তা হলে জীবন নিষ্ফল হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই সচেতন থাকেন, যাতে এক পলকের জন্যও তিনি কৃষ্ণকে ভুলে না যান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ*—ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই বিষ্ণুকে স্মরণ করা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও পরীক্ষিৎ মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন, *স্মর্তব্যো নিত্যশঃ।* *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছেন—

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥

"হে ভারত (মহারাজ ভরতের বংশধর)! যে সব রকম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে চায়, তার কর্তব্য হচ্ছে পরমাত্মা, পরম নিয়ন্তা ও সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধারকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির মহিমা শ্রবণ করা, কীর্তন করা ও স্মরণ করা।" (*ভাগবত* ২/১/৫) এটি বৈষ্ণবদের সমস্ত কার্যকলাপের সারমর্ম এবং এখানে সেই নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে (*কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন*)। শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, *অব্যর্থকালত্বম্*—বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে তার জীবনের মূল্যবান সময়ের একটি নিমেষও যাতে নষ্ট না হয়, সেই জন্য সব সময় সচেতন থাকা। সেটিই হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ। কিন্তু অর্থলিপ্সু, ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ বিষয়ীর সঙ্গ প্রভাবে মন কলুষিত হয়, তখন আর অপ্রতিহতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, *অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার*—বৈষ্ণবের এমনভাবে আচরণ করা উচিত, যাতে কখনও অভক্ত বা জড়বাদীদের সঙ্গ করতে না হয় (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২২/৮৭)। অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে এই ধরনের সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে।

শ্লোক ৫২

লোকলজ্জা হয়, ধর্ম-কীর্তি হয় হানি ।
ঐছে কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি' ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই সাধারণ মানুষের চোখে ছোট হতে হয়, কেন না তার ফলে তাঁর ধর্ম ও কীর্তির হানি হয়। বৈষ্ণবের, বিশেষ করে আচার্যের কখনও এই রকম আচরণ করা উচিত নয়। সব সময়ই সেই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।"

শ্লোক ৫৩

এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল ।
আচার্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কমলাকান্তকে এই শিক্ষা দিলেন, তখন সেখানে সমবেত সকলেই অনুভব করেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকেই সেই শিক্ষা দিলেন। অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেই সময় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

শ্লোক ৫৪

আচার্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে ।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য সমুঝে ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কেবল অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গভীর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার ।
গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই প্রস্তাবে বহু গূঢ় বিচার রয়েছে। সেই সম্বন্ধে আমি এখানে লিখছি না, কেন না আমার ভয় হচ্ছে যে, তাতে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত বড় হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ৫৬

শ্রীযদুনন্দনাচার্য—অদ্বৈতের শাখা ।
তাঁর শাখা-উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যের পঞ্চম শাখা হচ্ছেন শ্রীযদুনন্দন আচার্য। তাঁর এত শাখা-উপশাখা যে, তা লিখে শেষ করা যায় না।

তাৎপর্য

শ্রীযদুনন্দন আচার্য ছিলেন শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরু। অর্থাৎ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন যদুনন্দন আচার্য তাঁকে তাঁর গৃহে দীক্ষা দেন। পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী জগন্নাথপুরীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫৭

বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন ।
সর্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীযদুনন্দন আচার্য ছিলেন বাসুদেব দত্তের অত্যন্ত কৃপাপাত্র। তাই, তিনি সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৪০) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাসুদেব দত্ত ছিলেন ব্রজের গায়ক মধুব্রত।

শ্লোক ৫৮

ভাগবতাচার্য, আর বিষ্ণুদাসাচার্য ।
চক্রপাণি আচার্য, আর অনন্ত আচার্য ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

ভাগবত আচার্য, বিষ্ণুদাস আচার্য, চক্রপাণি আচার্য ও অনন্ত আচার্য ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শাখা।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্যে বলেছেন যে, ভাগবত আচার্য পূর্বে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুগামী ছিলেন, কিন্তু পরে গদাধর পণ্ডিত প্রভুর গণে প্রবিষ্ট হন। যদুনন্দন দাস রচিত *শাখা-নির্ণয়ামৃত* নামক গ্রন্থে ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাগবত আচার্য *প্রেম-তরঙ্গিণী* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৯৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাগবত আচার্য হচ্ছেন ব্রজের শ্বেত-মঞ্জরী। বিষ্ণুদাস আচার্য খেতরির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থের দশম তরঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অচ্যুতানন্দের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। অনন্ত আচার্য হচ্ছেন ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম সুদেবী। অদ্বৈত প্রভুর গণে থাকলেও তিনি পরে গদাধর প্রভুর শাখায় প্রবিষ্ট হন।

শ্লোক ৫৯

নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস ।
দুর্লভ বিশ্বাস, আর বনমালিদাস ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, দুর্লভ বিশ্বাস ও বনমালি দাস ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশতম শাখা।

শ্লোক ৬০

জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ ।
হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ কর, ভবনাথ কর, হৃদয়ানন্দ সেন ও ভোলানাথ দাস ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশতম শাখা।

শ্লোক ৬১

যাদবদাস, বিজয়দাস, দাস জনার্দন ।
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

যাদব দাস, বিজয় দাস, জনার্দন দাস, অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত ও নারায়ণ দাস ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ঊনবিংশতি, বিংশতি, একবিংশতি, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি ও চতুর্বিংশতিতম শাখা।

শ্লোক ৬২

শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস ।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবৎস পণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণদাস ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর পঞ্চবিংশতি, ষড়বিংশতি, সপ্তবিংশতি ও অষ্টাবিংশতিতম শাখা।

শ্লোক ৬৩

পুরুষোত্তম পণ্ডিত, আর রঘুনাথ ।
বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

পুরুষোত্তম পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী কবিচন্দ্র ও বৈদ্যনাথ ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর একোনত্রিংশতি, ত্রিংশতি, একত্রিংশতি ও দ্বাত্রিংশতিতম শাখা।

শ্লোক ৬৪

লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত ।
শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

লোকনাথ পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, শ্রীহরিচরণ ও মাধব পণ্ডিত ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ত্রয়স্ত্রিংশতি, চতুস্ত্রিংশতি, পঞ্চত্রিংশতি ও ষট্‌ত্রিংশতিতম শাখা।

শ্লোক ৬৫

বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম ।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

বিজয় পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর দুটি প্রধান শাখা। অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শাখা অসংখ্য, কিন্তু গণনা করে তাঁদের নাম উল্লেখ করার ক্ষমতা আমার নেই।

তাৎপর্য

শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন নারদ মুনির অবতার এবং শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত ছিলেন নারদ মুনির অন্তরঙ্গ বন্ধু পর্বত মুনি।

শ্লোক ৬৬

মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায় ।
সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল-ফল পায় ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যরূপ স্কন্ধ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপ মালীর দেওয়া জল সরবরাহ করেন। এভাবেই শাখা-উপশাখাগুলি পুষ্ট হয় এবং তাতে প্রচুর ফুল ও ফল হয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া জলের দ্বারা অদ্বৈত আচার্য প্রভুর যে সমস্ত শাখাগুলি পুষ্ট হয়েছিল, তাঁরা হচ্ছেন যথার্থ আচার্য। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুগামীরা পরে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়—আচার্যের যথার্থ পরম্পরার অনুসরণকারী শাখা এবং অদ্বৈত আচার্যের অনুকরণকারী শাখা। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা পুষ্ট হয়ে বর্ধিত হয়েছিলেন, আর অন্যান্যরা, যাদের কথা পরের একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা শুকিয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৬৭

ইহার মধ্যে মালী পাছে কোন শাখাগণ ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দৈব কারণ ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর, দুর্ভাগ্যবশত, কোন কোন শাখা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অস্বীকার করে বিপথগামী হয়েছিল।

শ্লোক ৬৮

সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিল ।
কৃতঘ্ন হইলা, তাঁরে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইল ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

যে মূল স্কন্ধ থেকে সম্পূর্ণ বৃক্ষটি ও তাঁর শাখা উৎপত্তি হল এবং যাঁর দ্বারা তাঁরা প্রাণ ধারণ করে বেঁচে থাকলেন, কিছু কিছু শাখা তাঁকে মানলেন না। তার ফলে মূল স্কন্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

শ্লোক ৬৯

ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে ।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রুদ্ধ হয়ে স্কন্ধ সেই শাখাগুলিকে জল সঞ্চার করলেন না এবং তার ফলে সেই শাখাগুলি শুকিয়ে মরে গেল।

শ্লোক ৭০

চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম ।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণচেতনা-বিহীন মানুষ একটি শুষ্ক কাষ্ঠ অথবা মৃত দেহের মতো। সে জীবিত অবস্থাতেই মৃতের মতো এবং মৃত্যুর পর যমরাজ তাকে দণ্ডদান করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে একোনত্রিংশতিতম শ্লোকে যমরাজ তাঁর দূতদের বললেন কি ধরনের মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, "যে মানুষের জিহ্বা কখনও পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যনাম ও মহিমা কীর্তন করেনি, যে মানুষের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে স্পন্দিত হয়নি এবং যার মস্তক কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করেনি, তাকে যেন অবশ্যই দণ্ডভোগ করার জন্য আমার কাছে নিয়ে আসা হয়।" পক্ষান্তরে, অভক্তদের দণ্ডভোগ করার জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেভাবেই জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন রকমের দেহ দান করে। মৃত্যুর পর অভক্তদের যমরাজের কাছে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। যমরাজের বিচার অনুযায়ী জড়া প্রকৃতি তাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে উপযুক্ত শরীর দান করে। এটিই হচ্ছে আত্মার এক দেহ থেকে আর এক দেহে আসার *দেহান্তর* প্রক্রিয়া। কৃষ্ণভক্তদের কিন্তু যমরাজের বিচারাধীন হতে হয় না। ভক্তদের জন্য একটি

উন্মুক্ত পথ রয়েছে এবং সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—"জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভক্তকে আর কোন জড় শরীর গ্রহণ করতে হয় না।" কারণ, তিনি তাঁর চিন্ময় শরীরে প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। যমরাজের দণ্ড তাদেরই জন্য যারা কৃষ্ণভাবনাময় নয়।

শ্লোক ৭১

কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড ।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যের বিপথগামী গণেরাই কেবল নয়, চৈতন্য-বিমুখ যে জন, সেই পাষণ্ড এবং যমরাজ তাকেও দণ্ড দান করবেন।

শ্লোক ৭২

কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি ।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

তা তিনি পণ্ডিতই হোন, মহা তপস্বী হোন, সার্থক গৃহস্থ হোন অথবা বিখ্যাত সন্ন্যাসী হোন, তিনি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরোধী হন, তা হলে তাকে যমরাজের হাতে দণ্ডভোগ করতেই হবে।

শ্লোক ৭৩

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত ।
সেই আচার্যের গণ—মহাভাগবত ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অনুগামীদের মধ্যে যাঁরা শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন মহাভাগবত।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে* লিখেছেন—"শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু ভক্তি-কল্পতরুর একটি স্কন্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মালীরূপে জল সেচন করে সেই স্কন্ধকে ও তাঁর শাখাগুলিকে পুষ্ট করেছেন। তবুও দুর্দৈববশত কোন শাখা জল সেচনকারী মালীকে না মেনে স্কন্ধকেই ভক্তি-কল্পতরুর কারণ বলে বিবেচনা করলেন। পক্ষান্তরে, অদ্বৈত আচার্যের শাখা বা বংশধরেরা অদ্বৈত আচার্য প্রভুকেই ভক্তি-কল্পতরুর মূল কারণ বলে মনে করলেন। কিন্তু যাঁরা এভাবেই চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অমান্য

করলেন বা অবহেলা করলেন, তাঁরা জল না পেয়ে শুকিয়ে মরে গেলেন। এখানে এটিও বুঝতে হবে যে, কেবলমাত্র শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শাখা বিপথগামী বংশধরেরাই যে দণ্ড ভোগ করলেন তা নয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত যে কোন মানুষ, তা তিনি বড় সন্ন্যাসীই হোন, মহাপণ্ডিতই হোন অথবা তপস্বীই হোন, তাঁরা সকলেই শুকনো কাঠের মতো অসার।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার সমর্থনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, এই বিশ্লেষণ মায়াবাদ প্রভাবে জর্জরিত হয়ে, নানা রকম মনগড়া মতের জগাখিচুড়ি বা নানা প্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধী কথাসকল তথাকথিত হিন্দুধর্মের নামে প্রচলিত হয়েছে। তথাকথিত হিন্দুধর্মের মায়াবাদীরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে অত্যন্ত ভয় পায়। তারা অভিযোগ করে যে, তা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষদের গ্রহণ করে এবং বিজ্ঞান-সম্মত দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্মে তাদের নিযুক্ত করে হিন্দুধর্মকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা পূর্বে কয়েকবার বিশ্লেষণ করেছি যে, 'হিন্দু' শব্দটি কোন বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভবত এই শব্দটি মুসলমান-প্রধান দেশ আফগানিস্থান থেকে এসেছে। আফগানিস্থানের হিন্দুকুশ পর্বতমালার গিরিপথ এখনও ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রধান পথ।

যথার্থ বৈদিক ধর্ম হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম। এই সম্বন্ধে *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্‌ ॥

(*বিষ্ণু পুরাণ* ৩/৮/৯)

বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুসরণ করা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করলে মানুষের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়, কেন না তার ফলে জীবনের পরম লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত মানব-সমাজের জন্য। যদিও মানব-সমাজে বিভিন্ন বিভাগ অথবা উপবিভাগ রয়েছে, কিন্তু তবুও মানবজাতি হচ্ছে একটি জাতি এবং তাই আমরা মনে করি যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার যোগ্যতা প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।* মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত প্রতিটি জীবেরই তার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তার ফলে তার কৃষ্ণভক্ত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই মনে করি, প্রতিটি মানুষকে কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বাস্তবিকপক্ষে পৃথিবীর সর্বত্র, প্রতিটি দেশে যেখানে আমরা সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করি, আমরা দেখতে পাই যে, মানুষ অতি সহজে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গ্রহণ করে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গ্রহণ করার ফলে যে কি হয়, তার চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছে হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের ভক্তবৃন্দ, যাঁরা তাঁদের পূর্বের সমস্ত

সংস্কার নির্বিশেষে চারটি পাপের পথ সম্পূর্ণ বর্জন করে ভগবদ্ভক্তির অতি উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

তথাকথিত হিন্দুধর্মের সমস্ত অনুগামীরাই, তা তিনি যত বড় পণ্ডিত, তপস্বী, গৃহস্থ অথবা স্বামী হওয়ার ভান করুন না কেন, তারা সকলেই হচ্ছেন বৈদিক বৃক্ষের শুষ্ক ডালের মতো অসার, তারা নির্বীর্য। মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য বৈদিক সংস্কৃতির প্রচার করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। বৈদিক সংস্কৃতির সারমর্ম হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)

ভগবদ্গীতা ও *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কৃষ্ণকথা বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় যাদের উৎসাহ নেই, তারা প্রাণশক্তি রহিত শুষ্ক কাষ্ঠের মতো। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘরূপ শাখায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং জলসিঞ্চন করছেন এবং তার ফলে তা নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ তথাকথিত হিন্দুধর্মের অসংলগ্ন শাখাগুলি শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।

শ্লোক ৭৪

সেই সেই,—আচার্যের কৃপার ভাজন ।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর কৃপাপাত্র যে সমস্ত ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা অনায়াসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করলেন।

শ্লোক ৭৫

অচ্যুতের যেই মত, সেই মত সার ।
আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাই বুঝতে হবে যে, অচ্যুতের যে মত, সেই মতই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনের সার। আর অন্য যত সমস্ত মত, সেগুলি সব ছারখার হয়ে গেল।

শ্লোক ৭৬

সেই আচার্যগণে মোর কোটি নমস্কার ॥
অচ্যুতানন্দ-প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

অচ্যুতানন্দের অনুগামী সেই সমস্ত আচার্যদের শ্রীপাদপদ্মে আমি কোটি কোটি প্রণতি নিবেদন করি, যাঁদের জীবন হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্লোক ৭৭

এই ত' কহিলাঙ আচার্য-গোসাঞির গণ ।
তিন স্কন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ গণন ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সংক্ষেপে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর তিনটি শাখার (অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল) বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৭৮

শাখা-উপশাখা, তার নাহিক গণন ।
কিছুমাত্র কহি' করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্যের অসংখ্য শাখা ও উপশাখা রয়েছে। পূর্ণরূপে তাঁদের বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি কেবল সেই সমস্ত শাখা-উপশাখার দিগ্‌দর্শন করলাম মাত্র।

শ্লোক ৭৯

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম ।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শাখা ও উপশাখা বর্ণনা করে, আমি এখন শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রধান প্রধান শাখা ও উপশাখার বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

শ্লোক ৮০

শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ।
ভাগবতাচার্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রধান শাখাগুলি হচ্ছেন (১) শ্রীধ্রুবানন্দ, (২) শ্রীধর ব্রহ্মচারী, (৩) হরিদাস ব্রহ্মচারী ও (৪) রঘুনাথ ভাগবতাচার্য।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৫২) শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী হচ্ছেন ললিতাদেবীর অবতার এবং ১৯৪ ও ১৯৯ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীধর ব্রহ্মচারী হচ্ছেন চন্দ্রলতিকা নামক জনৈকা গোপী।

শ্লোক ৮১

অনন্ত আচার্য, কবিদত্ত, মিশ্রনয়ন ।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চম শাখা হচ্ছেন অনন্ত আচার্য, ষষ্ঠ কবি দত্ত, সপ্তম নয়ন মিশ্র, অষ্টম গঙ্গামন্ত্রী, নবম মামু ঠাকুর এবং দশম কণ্ঠাভরণ।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ১৯৭ ও ২০৭ শ্লোকে কবি দত্তকে কলকণ্ঠী নাম্নী গোপী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৬ ও ২০৭ শ্লোকে নয়ন মিশ্রকে নিত্য-মঞ্জরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১৯৬ ও ২০৫ শ্লোকে গঙ্গামন্ত্রীকে চন্দ্রিকা নামক গোপী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মামু ঠাকুর, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল জগন্নাথ চক্রবর্তী, তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর ভাগিনেয় ছিলেন। পূর্ব বাংলায় ও উড়িষ্যায় মামাকে মামু বলা হয়। জগন্নাথ চক্রবর্তী মামু ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। মামু ঠাকুরের বাস ছিল ফরিদপুর জেলার মগডোবা নামক গ্রামে। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অপ্রকটের পর মামু ঠাকুর জগন্নাথপুরীর শ্রীশ্রীটোটা-গোপীনাথ মন্দিরের অধ্যক্ষরূপে সেবাকার্যাদি করেছিলেন। কোন কোন বৈষ্ণবের মতে মামু ঠাকুর ছিলেন ব্রজের শ্রীরূপ-মঞ্জরী। রঘুনাথ গোস্বামী, রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণজীবন, শ্যামসুন্দর, শান্তমণি, হরিনাথ, নবীনচন্দ্র, মতিলাল, দয়াময়ী ও কুঞ্জবিহারী মামু ঠাকুরের অনুগামী ছিলেন।

কণ্ঠাভরণ, যাঁর প্রকৃত নাম ছিল শ্রীঅনন্ত চট্টরাজ, তিনি ব্রজের গোপালী নাম্নী গোপী ছিলেন।

শ্লোক ৮২

ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবতদাস ।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর গোস্বামীর একাদশতম শাখা হচ্ছেন ভূগর্ভ গোসাঞি এবং দ্বাদশতম শাখা হচ্ছেন ভাগবত দাস। তাঁরা দুজনেই বৃন্দাবনে গিয়ে আজীবন সেখানে বাস করেন।

তাৎপর্য

ভূগর্ভ গোসাঞি ছিলেন ব্রজের প্রেম-মঞ্জরী। বৃন্দাবনের সাতটি প্রধান মন্দিরের অন্যতম গোকুলানন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। বৃন্দাবনের সাতটি প্রধান মন্দির—গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধারমণ, শ্যামসুন্দর, রাধা-দামোদর ও গোকুলানন্দ, এগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ৮৩

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয় ।

বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োদশ শাখা ছিলেন বাণীনাথ ব্রহ্মচারী এবং চতুর্দশ শাখা বল্লভচৈতন্য দাস। তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত মহৎ ছিলেন এবং তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকতেন।

তাৎপর্য

আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদের ১১৪ শ্লোকে শ্রীবাণীনাথ ব্রহ্মচারীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নলিনীমোহন গোস্বামী নামক বল্লভচৈতন্যের এক শিষ্য নবদ্বীপে শ্রীমদনগোপালের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্লোক ৮৪

শ্রীনাথ চক্রবর্তী, আর উদ্ধব দাস ।

জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চদশ শাখা হচ্ছেন শ্রীনাথ চক্রবর্তী; ষোড়শ উদ্ধব; সপ্তদশ জিতামিত্র; অষ্টাদশ জগন্নাথ দাস।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "শাখা-নির্ণয় গ্রন্থে ত্রয়োদশ শ্লোকে শ্রীনাথ চক্রবর্তীকে সমস্ত সদ্‌গুণের আশ্রয় এবং কৃষ্ণসেবায় অত্যন্ত দক্ষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনই, পঞ্চত্রিংশতি শ্লোকে উদ্ধব দাসকে ভগবৎ-প্রেম প্রদানকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (২০২) বর্ণনা করা হয়েছে যে, জিতামিত্র হচ্ছেন শ্যাম-মঞ্জরী নাম্নী গোপী। জিতামিত্র *কৃষ্ণমাধুর্য* নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। জগন্নাথ দাস ঢাকার নিকটবর্তী বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় কাষ্ঠকাটা বা কাঠাদিয়া নামক গ্রামে। তাঁর বংশধরেরা এখন আড়িয়াল, কামারপাড়া ও পাইকপাড়া গ্রামে বাস করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত যশোমাধব বিগ্রহ আড়িয়ালের গোস্বামীরা সেবা করেন। তিনি ছিলেন চতুঃষষ্টি সখীর অন্যতম এবং চিত্রাদেবীর তিলকিনী নামক

উপসখী। তাঁর বংশধরদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল—রামনৃসিংহ, রামগোপাল, রামচন্দ্র, সনাতন, মুক্তারাম, গোপীনাথ, গোলোক, হরিমোহন শিরোমণি, রাখালরাজ, মাধব ও লক্ষ্মীকান্ত। *শাখা-নির্ণয়* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জগন্নাথ দাস ত্রিপুরা রাজ্যে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার করেন।"

শ্লোক ৮৫

শ্রীহরি আচার্য, সাদি-পুরিয়া গোপাল ।

কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

ঊনবিংশতিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীহরি আচার্য; বিংশতিতম সাদিপুরিয়া গোপাল; এক-বিংশতিতম কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী; দ্বাবিংশতিতম পুষ্পগোপাল।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৯৬ ও ২০৭) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীহরি আচার্য ছিলেন কালাক্ষী নামক গোপিকা। সাদিপুরিয়া গোপাল পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী অষ্টসখীর অন্যতম গোপিকা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইন্দুলেখা। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে বাস করতেন। সেখানে রাধা-দামোদর মন্দিরে কৃষ্ণদাসের সমাধি নামক একটি সমাধি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই সমাধিটি কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর, আবার অন্য কেউ কেউ বলেন, তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি। উভয় ক্ষেত্রেই সেই সমাধি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, কেন না তাঁরা দুজনেই অধঃপতিত জীবকে ভগবৎ-প্রেম দান করেছিলেন। *শাখা-নির্ণয়* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুষ্পগোপাল ছিলেন স্বর্ণগ্রামক।

শ্লোক ৮৬

শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ।

বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োবিংশতিতম শাখা হচ্ছেন শ্রীহর্ষ; চতুর্বিংশতিতম রঘুমিশ্র; পঞ্চবিংশতিতম লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত; ষড়্‌বিংশতিতম বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস; সপ্তবিংশতিতম রঘুনাথ।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৯৫ ও ২০১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, রঘুমিশ্র হচ্ছেন ব্রজের কর্পূর-মঞ্জরী। তেমনই, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত হচ্ছেন ব্রজের রসোন্মাদা নাম্নী গোপী এবং বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস হচ্ছেন ব্রজের কালী। *শাখা-নির্ণয়* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বঙ্গবাসী চৈতন্যদাসের চক্ষুদ্বয় সর্বদা প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ থাকত এবং তাঁর শ্রীঅঙ্গ সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে

রোমাঞ্চিত ও পুলকিত থাকত। তাঁর শাখা পরম্পরা হচ্ছেন—মথুরাপ্রসাদ, রুক্মিণীকান্ত, জীবনকৃষ্ণ, যুগলকিশোর, রতনকৃষ্ণ, রাধামাধব, উষামণি, বৈকুণ্ঠনাথ ও লালমোহন বা লালমোহন শাহা শঙ্খনিধি। লালমোহন ছিলেন ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১৯৪ ও ২০০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, রঘুনাথ ছিলেন ব্রজের বরাঙ্গদা।

শ্লোক ৮৭

অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টবিংশতিতম শাখা হচ্ছেন অমোঘ পণ্ডিত; একোনত্রিংশতিতম হস্তিগোপাল; ত্রিংশতিতম চৈতন্যবল্লভ; একত্রিংশতিতম যদু গাঙ্গুলি; দ্বাত্রিংশতিতম মঙ্গল বৈষ্ণব।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* উল্লেখ করেছেন, "শ্রীমঙ্গল বৈষ্ণব ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার টিটকণা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা কিরীটেশ্বরী-দেবীর উপাসক শাক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, মঙ্গল বৈষ্ণব ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। পরে ময়নাডাল গ্রামের অধিবাসী তাঁর শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর বংশধরেরা কাঁদড়ার ঠাকুর বলে প্রসিদ্ধ। কাঁদড়া বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম। মঙ্গল বৈষ্ণবের বংশে ছত্রিশ ঘর পরিবার রয়েছে। মঙ্গল ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন প্রাণনাথ অধিকারী, কাঁদড়া গ্রামের পুরুষোত্তম চক্রবর্তী ও নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র, যাঁদের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক। সুধাকৃষ্ণ মিত্র ও নিকুঞ্জবিহারী মিত্র উভয়ে ছিলেন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক। পুরুষোত্তম চক্রবর্তীর পরিবারে রয়েছেন কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী ও রাধাবল্লভ চক্রবর্তীর মতো প্রসিদ্ধ পুরুষ, যাঁরা এখন বীরভূম জেলার অধিবাসী। তাঁরা শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গান করেন। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশ থেকে জগন্নাথপুরী পর্যন্ত মঙ্গল ঠাকুর যখন একটি পথ নির্মাণ করছিলেন, তখন তিনি একটি দীঘি খনন করতে গিয়ে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ যুগলবিগ্রহ লাভ করেছিলেন। সেই সময় তিনি রাণীপুর গ্রামের কাঁদড়া অঞ্চলে বাস করতেন। কাঁদড়া গ্রামে মঙ্গল ঠাকুরের পূজিত শালগ্রাম শিলা এখনও বর্তমান। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূজার জন্য একটি মন্দির তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র—রাধিকাপ্রসাদ, গোপীরমণ ও শ্যামকিশোর। এই পুত্রদের বংশ এখনও বর্তমান।

শ্লোক ৮৮

চক্রবর্তী শিবানন্দ সদা ব্রজবাসী ।
মহাশাখা-মধ্যে তেঁহো সুদৃঢ় বিশ্বাসী ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়ত্রিংশতিতম শাখা শিবানন্দ চক্রবর্তী যিনি সর্বদা বৃন্দাবনে বাস করতেন, তাঁর ভগবৎ-বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত গূঢ়। তাঁকে গদাধর পণ্ডিতের এক মহাশাখা বলে বিবেচনা করা হয়।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৮৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিবানন্দ চক্রবর্তী ছিলেন ব্রজের লবঙ্গ-মঞ্জরী। যদুনন্দন দাস রচিত *শাখা-নির্ণয়* গ্রন্থেও গদাধর পণ্ডিতের অন্য শাখাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে—(১) মাধব আচার্য, (২) গোপাল দাস, (৩) হৃদয়ানন্দ, (৪) বল্লভ ভট্ট (বল্লভ সম্প্রদায় বা পুষ্টিমার্গ সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ), (৫) মধু পণ্ডিত (এই মহান ভক্ত খড়দহ স্টেশন থেকে দুই মাইল পূর্বে সাঁইবোনা গ্রামে বাস করতেন। তিনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপীনাথজীর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন), (৬) অচ্যুতানন্দ, (৭) চন্দ্রশেখর, (৮) বক্রেশ্বর পণ্ডিত, (৯) দামোদর, (১০) ভগবান্ আচার্য, (১১) অনন্ত আচার্য, (১২) কৃষ্ণদাস, (১৩) পরমানন্দ ভট্টাচার্য, (১৪) ভবানন্দ গোস্বামী, (১৫) চৈতন্য দাস, (১৬) লোকনাথ ভট্ট (এই মহান ভক্ত যশোর জেলার তালখড়ি গ্রামে বাস করতেন। ইনি ছিলেন ভূগর্ভ গোস্বামীর বন্ধু এবং নরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু মহারাজ। রাধাবিনোদ মন্দিরটি ইনিই নির্মাণ করেন), (১৭) গোবিন্দ আচার্য, (১৮) অক্রূর ঠাকুর, (১৯) সংকেত আচার্য, (২০) প্রতাপাদিত্য, (২১) কমলাকান্ত আচার্য, (২২) যাদবাচার্য ও (২৩) নারায়ণ পড়িহারী (ইনি ছিলেন জগন্নাথপুরীর অধিবাসী)।

শ্লোক ৮৯

এই ত' সংক্ষেপে কহিলাঙ্ পণ্ডিতের গণ ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সংক্ষেপে আমি গদাধর পণ্ডিতের শাখা ও উপশাখার বর্ণনা করলাম। যা আমি এখানে বর্ণনা করলাম না, এই রকম আরও অনেক শাখা আছে।

শ্লোক ৯০

পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য ।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিতের সমস্ত অনুগামীরা হচ্ছেন মহাভাগবত, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁরা তাঁদের জীবনস্বরূপ বলেই জানেন।

শ্লোক ৯১

এই তিন স্কন্ধের কৈলুঁ শাখার গণন ।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

(নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং গদাধরের) এই সব শাখা ও উপশাখাগণের স্মরণ করলে ভববন্ধন মোচন হয়।

শ্লোক ৯২

যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

এই সমস্ত বৈষ্ণবদের স্মরণ করলেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করা যায়। শুধুমাত্র তাঁদের পবিত্র নাম স্মরণ করলেই সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৯৩

অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ ।
চৈতন্য-মালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই, আমি সমস্ত বৈষ্ণবদের চরণে প্রণতি নিবেদন করে, আমি মালীরূপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ক্রমানুসারে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৯৪

গৌরলীলামৃতসিন্ধু— অপার অগাধ ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা-সমুদ্র অপরিমেয় ও অগাধ। এমন কেউ আছে কি, যার সেই বিশাল সমুদ্রের পরিমাপ করার সাহস আছে?

শ্লোক ৯৫

তাহার মাধুর্য-গন্ধে লুব্ধ হয় মন ।
অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই গভীর সমুদ্রে ডুব দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এর সুমিষ্ট সুগন্ধ আমাকে আকর্ষণ করে। তাই আমি সমুদ্র তীরেই তা আস্বাদনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু তার সবটুকু আস্বাদন করতে পারি না, এক ফোঁটা আস্বাদন করি মাত্র।

শ্লোক ৯৬

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীঅদ্বৈত আচার্য এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা ও উপশাখা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মলীলা

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র *আদিলীলা* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা এবং *অন্ত্যলীলায়* তাঁর সন্ন্যাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। *অন্ত্যলীলার* প্রথম ছয় বছর *মধ্যলীলা* নামে খ্যাত। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করে বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসেন এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন।

উপেন্দ্র মিশ্র নামে শ্রীহট্টনিবাসী এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের পিতা ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে নীলাম্বর চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করতে আসেন এবং তারপর নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করে নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। শ্রীমতী শচীদেবীর প্রথমে আটটি কন্যা হয়। সেই কন্যাগুলি জন্মের পর পরলোক গমন করলে নবম গর্ভে বিশ্বরূপের জন্ম হয়। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাবেলায় সিংহ-লগ্নে, সিংহ-রাশিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের কথা শুনে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণেরা নানা রকম উপহার নিয়ে সেই নবজাতক শিশুটিকে দর্শন করতে আসেন। মহান জ্যোতির্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুটির কোষ্ঠীর ফল গণনা করে দেখতে পান যে, এই শিশুটি হচ্ছেন একজন মহাপুরুষ। এই অধ্যায়ে সেই মহাপুরুষের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥

সঃ—তিনি; **প্রসীদতু**—তাঁর কৃপা বর্ষণ করুন; **চৈতন্যদেবঃ**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; **যস্য**—যাঁর; **প্রসাদতঃ**—কৃপার প্রভাবে; **তৎ-লীলা**—তাঁর লীলা; **বর্ণনে**—বর্ণনায়; **যোগ্যঃ**—সমর্থ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **স্যাৎ**—সম্ভব হয়; **অধমঃ**—সব চাইতে অধঃপতিত; **অপি**—যদিও; **অয়ম্**—আমি।

অনুবাদ

যাঁর কৃপার প্রভাবে অত্যন্ত অধঃপতিত জনও তাঁর লীলা বর্ণনে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা আমি প্রার্থনা করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করতে হলে অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন হয়, যা হচ্ছে ভগবানের কৃপা ও আশীর্বাদ। এই কৃপা ও আশীর্বাদ ব্যতীত অপ্রাকৃত

গ্রন্থ রচনা করা যায় না। ভগবানের কৃপার প্রভাবে অশিক্ষিত মানুষও অপূর্ব সুন্দরভাবে চিন্ময় তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারে। যিনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে আবিষ্ট, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণনা করতে পারেন। *কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন* (*চৈঃ চঃ অন্ত্য* ৭/১১)। পরমেশ্বর ভগবানের করুণার দ্বারা অভিষিক্ত না হলে, ভগবানের নাম, যশ, গুণ, পরিকর আদি বর্ণনা করা যায় না। তাই দেখতে হবে যে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* বর্ণনা হচ্ছে গ্রন্থকারের উপর ভগবানের বিশেষ করুণার প্রকাশ, যদিও তিনি নিজেকে সব চাইতে অধঃপতিত বলে মনে করেছেন। নিজেকে অধঃপতিত বলেছেন বলে আমাদের তা মনে করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, যিনি এমন সুন্দর অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনা করতে পারেন, তিনি আমাদের কাছে অবশ্যই পূজনীয়।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হোক! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হোক! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয় হোক!

শ্লোক ৩

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস ।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীগদাধর প্রভুর জয় হোক! শ্রীবাস ঠাকুরের জয় হোক! মুকুন্দ প্রভু ও বাসুদেব প্রভুর জয় হোক! হরিদাস ঠাকুরের জয় হোক!

শ্লোক ৪

জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত ।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের জয় হোক! এই সমস্ত দীপ্তিমান চন্দ্র একত্রে উদিত হয়ে এই জড় জগতের অন্ধকার দূর করেছেন।

শ্লোক ৫

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সমস্ত ভক্ত চন্দ্রগণের জয় হোক। তাঁদের কিরণরূপী প্রেম-জ্যোৎস্নায় ত্রিভুবন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, চন্দ্রকে বহুবচনে *চন্দ্রগণ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বহু চন্দ্র রয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২১) ভগবান বলেছেন, *নক্ষত্রাণামহং শশী*— "নক্ষত্রদের মধ্যে আমি হচ্ছি চন্দ্র।" সমস্ত নক্ষত্রগুলি হচ্ছে চন্দ্রের মতো। পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিদেরা মনে করেন যে, নক্ষত্রগুলি হচ্ছে সূর্যের মতো। কিন্তু বৈদিক জ্যোতির্বিদেরা বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করে বিবেচনা করেন যে, নক্ষত্রগুলি হচ্ছে চন্দ্রের মতো। সূর্যের অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে কিরণ বিকিরণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং চন্দ্র সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে, তাই তাকে উজ্জ্বল দেখায়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে কৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পরম শক্তিমান হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর ভক্তরাও উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়, কেন না তাঁরা পরম সূর্যকে প্রতিফলিত করেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৩১) বর্ণনা করা হয়েছে—

কৃষ্ণ— সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, আর মায়া হচ্ছে অন্ধকার। যখন সূর্যের উদয় হয়, তখন মায়ারূপ অন্ধকার আর থাকতে পারে না।" তেমনই, এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূর্য কৃষ্ণরূপ প্রতিফলন করার ফলে উজ্জ্বল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রেম-জ্যোৎস্নায় কলিযুগের অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও ত্রিভুবন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণ কেবল কলিযুগের অন্ধকার দূর করতে পারেন এবং এই যুগের মানুষের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে পারেন। অন্য কেউ তা পারেন না। তাই আমি আশা করি, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত ভক্তরা যেন এই পরম সূর্যকে প্রতিফলিত করার মাধ্যমে সমগ্র জগতের অন্ধকার দূর করেন।

শ্লোক ৬

এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আমি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে মুখবন্ধ বর্ণনা করলাম। এখন আমি ক্রমানুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করব।

শ্লোক ৭

প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন ।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে আমি সূত্রের আকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাসমূহ বর্ণনা করব। তারপর আমি সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৮

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি ।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতরণ করেন এবং আটচল্লিশ বছর প্রকট থেকে তাঁর লীলাবিলাস সাঙ্গ করেন।

শ্লোক ৯

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

১৪০৭ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন এবং ১৪৫৫ শকাব্দে তিনি এই জগৎ থেকে অপ্রকট হন।

শ্লোক ১০

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস ।
নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ-কীর্তন-বিলাস ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে চব্বিশ বছর ছিলেন। তখন তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন বিলাস করেন।

শ্লোক ১১

চব্বিশ বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস ।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

চব্বিশ বছরের শেষে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং আর চব্বিশ বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে বাস করেন।

শ্লোক ১২

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শেষ চব্বিশ বছরের প্রথম ছয় বছর তিনি কখনও দক্ষিণ ভারতে, কখনও বঙ্গে, কখনও বৃন্দাবনে নিরন্তর ভ্রমণ করেন।

শ্লোক ১৩

অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে ।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসা'ল সকলে ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

বাকি আঠারো বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে বাস করেন। অমৃতময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সকলকে ভাসিয়েছেন।

শ্লোক ১৪

গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—'আদি'-লীলাখ্যান ।
'মধ্য'-'অন্ত্য'-লীলা—শেষলীলার দুই নাম ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর গার্হস্থ্যলীলা আদিলীলা নামে খ্যাত। তাঁর শেষলীলা মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা নামে পরিচিত।

শ্লোক ১৫

আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত ।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

আদিলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যত লীলা, তা সব সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত লিখে রেখেছেন।

শ্লোক ১৬

প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপ-দামোদর ।
সূত্র করি' গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শেষলীলা (মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা) স্বরূপ দামোদর গোস্বামী সূত্রের আকারে তাঁর একটি গ্রন্থে লিখে রেখেছেন।

শ্লোক ১৭

এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া ।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই দুই মহাপুরুষের সূত্র দেখে শুনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ভক্তরা ক্রম অনুসারে তাঁর লীলা সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

শ্লোক ১৮

বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন,—চারি ভেদ ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর আদিলীলায় চারটি বিভাগ রয়েছে—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন।

শ্লোক ১৯

সর্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্ ।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ব—সমস্ত; সৎ—শুভ; গুণ—গুণ; পূর্ণাম্—পূর্ণ; তাম্—সেই; বন্দে—আমি বন্দনা করি; ফাল্গুন—ফাল্গুন মাসের; পূর্ণিমাম্—পূর্ণিমার সন্ধ্যায়; যস্যাম্—যে; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; অবতীর্ণঃ—অবতীর্ণ হয়েছিলেন; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের; নামভিঃ—দিব্যনাম সহ।

অনুবাদ

আমি ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকে বন্দনা করি, যে সর্ব সুলক্ষণযুক্ত শুভক্ষণে কৃষ্ণনাম সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ২০

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় ।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়, তখন দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

শ্লোক ২১

'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা ।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সকলে ভগবানের দিব্যনাম—'হরি! হরি!' উচ্চারণ করতে থাকে এবং এভাবেই প্রথমে তাঁর নাম অবতরণ করিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হলেন।

শ্লোক ২২

জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে ।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর জন্মের সময়, তাঁর শৈশবে, পৌগণ্ডে, কৈশোরে ও যুবাকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে নানা প্রকার কৌশলে হরিনাম (হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র) গ্রহণ করালেন।

শ্লোক ২৩

বাল্যভাব ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি' রহয়ে রোদন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বাল্যাবস্থায় মহাপ্রভু যখন কাঁদতেন, তখন কৃষ্ণ ও হরি নাম শুনলেই তাঁর কান্না বন্ধ হয়ে যেত।

শ্লোক ২৪

অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব বন্ধুজন ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

তাই শিশু যখন কাঁদতেন, তখন তাঁকে দেখতে এসে বন্ধু ভাবাপন্ন সমস্ত মহিলারা 'হরি! হরি!' বলতেন।

শ্লোক ২৫

'গৌরহরি' বলি' তারে হাসে সর্ব নারী ।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি' ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

এই মজার ব্যাপার দেখে সমস্ত মহিলারা হাসতেন এবং তাঁকে 'গৌরহরি' বলে ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকে তাঁর নাম 'গৌরহরি'।

শ্লোক ২৬

বাল্য বয়স—যাবৎ হাতে খড়ি দিল ।
পৌগণ্ড বয়স—যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর হাতে খড়ি পর্যন্ত তাঁর বাল্য বয়স এবং বাল্য বয়স থেকে তাঁর বিবাহ না করা পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় পৌগণ্ড।

শ্লোক ২৭

বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন ।
সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্তন ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বিবাহের পর যৌবনের আরম্ভ এবং তাঁর যৌবনাবস্থায় তিনি সর্বত্রই সকলকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করালেন।

শ্লোক ২৮

পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে ।
সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

পৌগণ্ড বয়সে তিনি পড়তেন এবং শিষ্যদেরকেও পড়াতেন। তখন তিনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন।

শ্লোক ২৯

সূত্র-বৃত্তি-পাঁজি-টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য ।
শিষ্যের প্রতীত হয়,—প্রভাব আশ্চর্য ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর শিষ্যদেরকে ব্যাকরণ পড়াতেন, তখন তিনি সব কিছুর মধ্য দিয়েই তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন। পড়ার সমস্ত বিষয় ছিল কৃষ্ণকেন্দ্রিক এবং তাঁর শিষ্যরা অনায়াসে তা বুঝতে পারতেন। এভাবেই তাঁর প্রভাব ছিল আশ্চর্যজনক।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর *লঘু-হরিনামামৃত-ব্যাকরণ* ও *বৃহৎ-হরিনামামৃত-ব্যাকরণ* নামে দুভাগে বিভক্ত একটি *ব্যাকরণ* গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কেউ যদি এই দুটি ব্যাকরণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তা হলে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহান কৃষ্ণভক্ত হওয়ার শিক্ষাও লাভ করেন।

চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান ।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম ॥
প্রভু বলে,—সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম ।
সর্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন ॥
হর্তা কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর ।
অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে ।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন ।
সর্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ব্যাকরণের সূত্র কৃষ্ণের দিব্যনামের মতোই নিত্য। যেমন, *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।* সমস্ত *বেদের* একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। তাই, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাখ্যা করেন, তা হলে অর্থহীন প্রচেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করে তার সময় নষ্ট হয় এবং তার জীবন ব্যর্থ হয়। যদি কেউ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময়ে কৃষ্ণের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা না করেন, তবে সে একটি নরাধম। সেই প্রসঙ্গে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) বলা হয়েছে—*নরাধমাঃ মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ।* শাস্ত্রের মর্ম না জেনে কেউ যদি অধ্যাপনা করে, তা হলে তার সেই অধ্যাপনা গর্দভের চিৎকারের মতোই বিরক্তিকর।

শ্লোক ৩০

যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছাত্রাবস্থায় যাকেই দেখতেন, তাকেই কৃষ্ণনাম করতে বলতেন। এভাবেই তিনি কৃষ্ণনামে সারা নবদ্বীপ নগরকে প্লাবিত করেন।

তাৎপর্য

বর্তমানে যাকে নবদ্বীপ-ধাম বলা হয়, তা হচ্ছে পূর্ণ নবদ্বীপের একটি অংশ মাত্র। নবদ্বীপ মানে হচ্ছে 'নয়টি দ্বীপ'। এই নয়টি দ্বীপ বত্রিশ বর্গমাইল স্থান জুড়ে বর্তমান এবং তা গঙ্গার বিভিন্ন শাখার দ্বারা পরিবৃত। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ নববিধা ভক্তি লাভ করার স্থান। নববিধা ভক্তির বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/২৩) বলা হয়েছে—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

এই নববিধা ভক্তি অনুশীলনের পৃথক স্থানস্বরূপ দ্বীপগুলি হচ্ছে—(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫) কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ,

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ ও (৯) রুদ্রদ্বীপ। সেটেলমেন্টের মানচিত্র অনুসারে আমাদের ইস্কন-এর মন্দির রুদ্রদ্বীপে অবস্থিত। রুদ্রদ্বীপের ঠিক পাশেই হচ্ছে অন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বাস করতেন। এই সমস্ত দ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবীন বয়সে ভক্তগণ সহ সংকীর্তন করতেন। এভাবেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় সমস্ত নবদ্বীপকে প্লাবিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন ।
রাত্র-দিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

কিশোর বয়সে তিনি সংকীর্তন-আন্দোলন শুরু করেন। দিন-রাত কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে, তিনি তাঁর ভক্তগণ সহ নৃত্য-কীর্তন করতেন।

শ্লোক ৩২

নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া ।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

সংকীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু নগরে নগরে ভ্রমণ করতেন। এভাবেই প্রেমভক্তি বিতরণ করে তিনি সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করেন।

তাৎপর্য

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল নবদ্বীপে কীর্তন করেছিলেন, তা হলে ত্রিভুবন প্লাবিত হন কি করে? তার উত্তর এই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়ই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয় এবং ভগবানই তাকে সক্রিয় করেন। অনুরূপভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছার প্রভাবে আজ থেকে পাঁচ শত বছর আগে সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা এই আন্দোলন যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে তারই বিস্তার এবং তা আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত হয়েছে। এভাবেই তা ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে প্রতিটি জীব কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

শ্লোক ৩৩

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে ।
লওয়াইলা সর্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে চব্বিশ বছর বাস করেন এবং তিনি প্রতিটি মানুষকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস ।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

বাকি চব্বিশ বছর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর ভক্তদের নিয়ে জগন্নাথপুরীতে বাস করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর ।
নৃত্য, গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চব্বিশ বছরের মধ্যে ছয় বছর নীলাচলে (জগন্নাথপুরীতে) তিনি নিরন্তর নৃত্য করে ও কীর্তন করে প্রেমভক্তি দান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৬

সেতুবন্ধ, আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন ।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই ছয় বছর তিনি সেতুবন্ধ থেকে গৌড়বঙ্গ হয়ে বৃন্দাবন পর্যন্ত নৃত্য-গীতের মাধ্যমে নামপ্রেম প্রচার করে সারা ভারত ভ্রমণ করেন।

শ্লোক ৩৭

এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম ।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণকালের লীলাবিলাস হচ্ছে তাঁর মুখ্যলীলা। সেই লীলা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলা নামে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ অষ্টাদশ বর্ষের লীলা অন্ত্যলীলা নামে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

আঠারো বছরের মধ্যে ছয় বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে থেকে ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে নৃত্য-কীর্তনের মাধ্যমে প্রেমভক্তি লাভে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে ।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-চ্ছলে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

বাকি বারো বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে থেকে, নিজে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করে সকলকে শিক্ষা দিলেন কিভাবে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করতে হয়।

তাৎপর্য

ভক্তিমার্গের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ভক্ত সর্বদা কৃষ্ণবিরহ অনুভব করেন, কেন না এই বিরহের অনুভূতি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের অনুভূতি থেকেও গভীর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে তাঁর লীলাবিলাসের শেষ বারো বছর জগন্নাথপুরীতে থেকে এই জগতের মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিভাবে বিরহের অনুভূতির মাধ্যমে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করতে হয়। এই ধরনের বিরহ অথবা মিলনের অনুভূতি ভগবৎ-প্রেমের বিভিন্ন স্তরবিশেষ। কোনও মানুষ যখন নিষ্ঠাভরে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হন, তখন যথাসময়ে এই অনুভূতিগুলির বিকাশ হয়। সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় প্রেমভক্তি, তবে সাধনভক্তি অনুশীলন করার ফলে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। নিষ্ঠাভরে সাধনভক্তি অনুশীলন না করে কৃত্রিমভাবে প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রেমভক্তি হচ্ছে রস আস্বাদনের স্তর, আর সাধনভক্তি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি বিকাশের স্তর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নিজের জীবনে এই ভক্তির পন্থা পূর্ণরূপে অনুশীলন করার মাধ্যমে জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই বলা হয়েছে, *'আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণভক্তরূপে তিনি সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন কিভাবে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হয় এবং তার ফলে যথাসময়ে প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

দিন-রাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ অনুভব করতেন। সেই বিপ্রলম্ভ ভাবের লক্ষণগুলি প্রকাশ করে তিনি উন্মাদের মতো কখনও কাঁদতেন, কখনও প্রলাপ বলতেন।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

উদ্ধবকে দেখে শ্রীমতী রাধারাণী যেমন প্রলাপ বলেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনই শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়ে রাত-দিন উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনে উদ্ধবকে দেখে শ্রীমতী রাধারাণী যেভাবে স্বগতোক্তি করেছিলেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তেমনভাবেই ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রলাপ বকতেন। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষায় ঈর্ষা ও উন্মাদনার ফলে অভিভূত হয়ে শ্রীমতী রাধারাণী একটি ভ্রমরকে তিরস্কার করতে শুরু করেন। তখন তিনি ঠিক একজন উন্মাদিনীর মতো কথা বলেছিলেন। তাঁর লীলার শেষদিকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভগবৎ-প্রেমের এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেছিলেন। এই সম্পর্কে *আদিলীলার* চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১০৭ ও ১০৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ৪২

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত ।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থাবলী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঠ করতেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে তাঁদের গীত আস্বাদন করতেন।

তাৎপর্য

বিদ্যাপতি ছিলেন রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনকারী বিখ্যাত কবি। তিনি ছিলেন মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ। হিসেব করে দেখা গেছে যে, রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছিমাদেবীর রাজত্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশ শক শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি গীত রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় একশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর দ্বাদশ অধস্তন বংশধরেরা এখনও বেঁচে আছেন। তাঁর রচিত কৃষ্ণগীতসমূহ গভীর বিপ্রলম্ভভাবে পূর্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে আবিষ্ট হয়ে সেই সমস্ত গীত আস্বাদন করেছিলেন।

একাদশ অথবা দ্বাদশ শক শতাব্দীতে মহারাজ লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে জয়দেবের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম ছিল বামাদেবী। বঙ্গদেশের

তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপ নগরে তিনি বহুদিন বাস করেন। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর জন্মস্থান ছিল। কারও কারও মতে তাঁর জন্ম হয় উড়িষ্যায় এবং অন্য কারও মতে তাঁর জন্ম হয় দক্ষিণ ভারতে। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি জগন্নাথপুরীতে অতিবাহিত করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে *গীতগোবিন্দ*, যা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবে পূর্ণ। রাসনৃত্যের পূর্বে ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভব করেছিলেন, সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে এবং *গীতগোবিন্দ* গ্রন্থে সেই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। বহু বৈষ্ণব *গীতগোবিন্দের* ভাষ্য রচনা করেছেন।

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। কথিত আছে যে, তাঁর জন্ম হয় চতুর্দশ শক শতাব্দীর প্রথমদিকে। সম্ভবত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল, কেন না তাঁদের লেখায় অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস প্রচুর ব্যক্ত হয়েছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁদের লেখায় যে ভাব বর্ণনা করেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভাব প্রদর্শন করেছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি সেই সমস্ত রস আস্বাদন করেছেন এবং সেই লীলায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই দুজন অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপ্রভুকে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হতে অত্যন্ত সাহায্য করতেন।

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গ্রন্থাবলী থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে বিপ্রলম্ভ রস আস্বাদন করেছিলেন, তাতে কেবল শ্রীরামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের মতো পরমহংসদেরই অধিকার রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনুকরণ করে সাধারণ মানুষদের এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তিবিহীন, ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ তথাকথিত শিক্ষিত মানুষদের এবং জড়-জাগতিক কবিতার সমালোচক ছাত্রদের এই অতি উচ্চস্তরের অপ্রাকৃত সাহিত্য পাঠ করা উচিত নয়। যে সমস্ত মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি লালায়িত, তাদের রাগানুগা-ভক্তির অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেব তাঁদের কবিতায় পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করেছেন। জড় বিষয়াসক্ত সমালোচকেরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গীতিসমূহের যে আলোচনা করেন, তার ফলে জনসাধারণ লম্পটে পরিণত হয় এবং জগতে ব্যভিচার ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পায়। রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামক্রীড়া বলে মনে করে ভুল করা উচিত নয়। নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত কামক্রীড়া অত্যন্ত জঘন্য। তাই, যারা দেহাত্ম-বুদ্ধিযুক্ত ও ইন্দ্রিয়তর্পণে রত, তাদের ক্ষেত্রে রাধা-কৃষ্ণের লীলার যে কোন রকম আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ৪৩

কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত ।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জনিত প্রেমরস আস্বাদন করলেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারাণীর প্রেম আস্বাদন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি রাধারাণীর প্রেমানুভূতি যে কেমন, শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণরূপে তা বুঝতে পারেননি। তাই, তিনি রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে সেই অনুভূতি আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধারাণীর ভাব সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ; পক্ষান্তরে, তিনি হচ্ছেন রাধা-কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ। তাই বলা হয়েছে, *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য*। কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আরাধনা করার মাধ্যমে রাধারাণী ও কৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন করা যায়। তাই সরাসরিভাবে রাধা-কৃষ্ণকে জানার চেষ্টা না করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তদের মাধ্যমে তাঁদের জানতে হয়। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি*—"শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করার আকুলতা আমার কবে হবে এবং তার ফলে কবে আমি রাধা-কৃষ্ণের যুগলপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব?"

শ্লোক ৪৪

অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা ।
কে বর্ণিতে পারে, তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত। আমার মতো একটি ক্ষুদ্র জীব কিভাবে সেই অপ্রাকৃত লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারে?

শ্লোক ৪৫

সূত্র করি' গণে যদি আপনে অনন্ত ।
সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

অনন্তশেষ স্বয়ং যদি সূত্রের আকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করতে চায়, তা হলে সহস্র মুখ থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে তাঁর অন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ৪৬

দামোদর-স্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি ।
মুখ্যমুখ্যলীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি' ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখ্য মুখ্য লীলাগুলি বিচার করে সূত্রের আকারে লিখে গেছেন।

শ্লোক ৪৭

সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়চার ভিত্তিতে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করছি। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সেই সূত্রগুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৮

চৈতন্য-লীলার ব্যাস,—দাস বৃন্দাবন ।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রামাণিক বর্ণনাকারী হচ্ছেন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীল ব্যাসদেব থেকে অভিন্ন। তিনি মধুর থেকে মধুরতর ভাবে মহাপ্রভুর লীলাসমূহ বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৪৯

গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থান ।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

গ্রন্থটি অত্যন্ত বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি কোন কোন স্থান বিশদভাবে বর্ণনা করেননি। আমি যতদূর সম্ভব সেই স্থানগুলি পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

শ্লোক ৫০

প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন ।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের অমৃত আস্বাদন করেছেন। আমি কেবল তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট চর্বণ করছি।

শ্লোক ৫১

আদিলীলা-সূত্র লিখি, শুন, ভক্তগণ ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

হে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণ! আমি এখন সংক্ষেপে আদিলীলার সূত্র লিখছি, কেন না পূর্ণরূপে সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫২

কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি' ব্রজেন্দ্রকুমার ।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মনের কোন এক বিশেষ বাসনা পূর্ণ করার জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ গভীরভাবে বিচার করে এই লোকে অবতীর্ণ হতে মনস্থ করেন।

শ্লোক ৫৩

আগে অবতারিলা যে যে গুরু-পরিবার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর পরিবারের গুরুজনদের পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। আমি সংক্ষেপে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করছি, কেন না পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫৪-৫৫

শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী ।
কেশব ভারতী, আর শ্রীঈশ্বর পুরী ॥ ৫৪ ॥
অদ্বৈত আচার্য, আর পণ্ডিত শ্রীবাস ।
আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে শ্রীমতী শচীদেবী, জগন্নাথ মিশ্র, মাধবেন্দ্র পুরী, কেশব ভারতী, ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, আচার্যরত্ন, বিদ্যানিধি ও ঠাকুর হরিদাস—এঁদের তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে অবতীর্ণ হতে অনুরোধ করেন।

শ্লোক ৫৬

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নাম ।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ-প্রধান ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীবিষ্ণুর মহান ভক্ত, পণ্ডিত, ধনী এবং সমস্ত সদ্‌গুণের আধার।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৩৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, উপেন্দ্র মিশ্র ছিলেন পর্জন্য নামক গোপাল। যিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ, তিনিই উপেন্দ্র মিশ্ররূপে শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে আবির্ভূত হন। তাঁর সাতটি পুত্র ছিল। সেই স্থানের বহু বাসিন্দা এখনও নিজেদের উপেন্দ্র মিশ্রের অধস্তন বলে পরিচয় দেন।

শ্লোক ৫৭-৫৮

সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র—সপ্ত ঋষীশ্বর ।
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর ॥ ৫৭ ॥
জগন্নাথ, জনার্দন, ত্রৈলোক্যনাথ ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

উপেন্দ্র মিশ্রের সাতটি পুত্র ছিল ঋষিতুল্য ও অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তাঁরা হচ্ছেন—(১) কংসারি, (২) পরমানন্দ, (৩) পদ্মনাভ, (৪) সর্বেশ্বর, (৫) জগন্নাথ, (৬) জনার্দন ও (৭) ত্রৈলোক্যনাথ। পঞ্চম পুত্র জগন্নাথ নদীয়ায় গঙ্গার তীরে বাস করতে মনস্থ করেন।

শ্লোক ৫৯

জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর' ।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্‌গুণ-সাগর ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্রের পুরন্দর উপাধি ছিল। নন্দ মহারাজ এবং বসুদেবের মতো তিনিও সমস্ত সদ্‌গুণের আকর ছিলেন।

শ্লোক ৬০

তাঁর পত্নী 'শচী'-নাম, পতিব্রতা সতী ।
যাঁর পিতা 'নীলাম্বর' নাম চক্রবর্তী ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পত্নী শ্রীমতী শচীদেবী পতিব্রতা সতী ছিলেন। শচীদেবীর পিতার নাম ছিল নীলাম্বর এবং তাঁর পদবি চক্রবর্তী।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন, "*গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১০৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্বলীলায় নীলাম্বর চক্রবর্তী ছিলেন গর্গমুনি। নীলাম্বর চক্রবর্তীর কিছু বংশধর এখন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মগডোবা নামক গ্রামে বাস করেন। তাঁর ভাগিনেয় ছিলেন জগন্নাথ চক্রবর্তী বা মামু ঠাকুর, যিনি পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং জগন্নাথপুরীতে টোটা-গোপীনাথ মন্দিরের সেবক ছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপে বেলপুকুরিয়াতে বাস করতেন। *প্রেমবিলাস* গ্রন্থে সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তিনি চাঁদ কাজীর বাড়ির কাছে থাকতেন, তাই চাঁদ কাজীকে গ্রাম সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতুল বলা হয়। কাজী নীলাম্বর চক্রবর্তীকে 'কাকা' বলে ডাকতেন। বামনপুকুরে চাঁদ কাজীর সমাধি এখনও রয়েছে এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে কাজীর বাসগৃহ ছিল। পূর্বে সেই স্থানটি বেলপুকুরিয়া নামে পরিচিত ছিল এবং এখন তাকে বামনপুকুর বলা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে তা নিরূপিত হয়েছে।"

শ্লোক ৬১

রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

রাঢ়দেশে অর্থাৎ বাংলার যে অংশে গঙ্গা প্রবাহিত হয় না সেখানে নিত্যানন্দ প্রভু, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত ও মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *রাঢ়দেশ* বলতে বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামকে নির্দেশ করা হয়েছে। বর্ধমান রেল স্টেশনের পর আর একটি শাখা লাইন রয়েছে, যাকে বলা হয় পূর্ব রেলের লুপলাইন এবং সেই লাইনে মল্লারপুর বলে একটি স্টেশন রয়েছে। এই রেল স্টেশনের আট মাইল পূর্বে একচক্রা গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় আট মাইল দীর্ঘ। বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর একচক্রার সীমানার মধ্যে অবস্থিত। বীরভদ্র গোস্বামীর নাম অনুসারে সেই স্থান বীরচন্দ্রপুর বা বীরভদ্রপুর নামে খ্যাত।

১৩৩১ সালে একচক্রা গ্রামের মন্দিরে বজ্রপাত হয়। তার ফলে মন্দিরটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। তার পূর্বে কখনও শ্রীমন্দিরের উপর এই রকম দৈব দুর্বিপাক হয়নি। মন্দিরে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ রয়েছেন। সেই বিগ্রহের নাম বঙ্কিম রায় বা বাঁকা রায়।

বঙ্কিম রায়ের দক্ষিণ দিকে জাহ্নবাদেবীর বিগ্রহ এবং তাঁর বাম দিকে শ্রীমতী রাধারাণীর বিগ্রহ আছেন। মন্দিরের সেবায়েতেরা বলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্কিম রায়ের শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হয়েছেন বলে পরবর্তীকালে তাঁর দক্ষিণে জাহ্নবা মাতা স্থাপিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে শ্রীমন্দিরে আরও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছেন। শ্রীমন্দিরের অন্য একটি সিংহাসনে মুরলীধর ও রাধা-মাধব শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। অন্য আর একটি সিংহাসনে মনোমোহন, বৃন্দাবনচন্দ্র ও গৌর-নিতাই বিগ্রহ রয়েছেন। তবে বঙ্কিম রায়ের বিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রবাদ আছে যে, মন্দিরের পূর্বদিকে কদম্বখণ্ডীর ঘাটে যমুনার জলে শ্রীবঙ্কিম রায়ের বিগ্রহ ভাসছিলেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সেই বিগ্রহকে জল থেকে উঠিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর, বীরচন্দ্রপুর থেকে প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে ভড্ডাপুর নামক স্থানে একটি নিমগাছের তলায় শ্রীমতী রাধারাণী প্রকাশিতা হন। সেই জন্য অনেকে বঙ্কিম রায়ের রাধারাণীকে ভড্ডাপুরের ঠাকুরাণী নামে অভিহিত করতেন। শ্রীমন্দিরে অন্য এক সিংহাসনে বাঁকা রায়ের দক্ষিণ দিকে যোগমায়ার বিগ্রহ অবস্থিত।

শ্রীমন্দির ও জগমোহন উচ্চ পাকা ভিটার উপরে অবস্থিত এবং সম্মুখেই নাতিবৃহৎ নাটমন্দির। শোনা যায় যে, শ্রীবাঁকা রায়ের মন্দিরের উত্তর দিকে ভাণ্ডীশ্বর শিব ছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতা হাড়াই পণ্ডিত সেই বৈষ্ণবরাজ শিবের আরাধনা করতেন। এখন সেই শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত হয়েছেন এবং সেই স্থানে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কোনও মন্দির নির্মাণ করেননি। মন্দির নির্মিত হয় বীরভদ্র প্রভুর সময়ে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে মন্দির ভগ্ন হলে শিবানন্দ স্বামী নামক জনৈক ব্রহ্মচারী সেই মন্দির সংস্কার করেন।

সেখানে প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য সতের সের চাল এবং উপযুক্ত তরিতরকারির বন্দোবস্ত আছে। বর্তমান সেবায়েতেরা নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগামী শ্রীগোপীজন-বল্লভানন্দের শাখাবংশ। সেবার জন্য গোস্বামীদের নামে জমিদারীর বন্দোবস্ত আছে এবং তা থেকেই সেবা চলে। গোস্বামীদের তিন শরিক পালাক্রমে বিগ্রহসেবা করে থাকেন। মন্দির থেকে কিছু দূরে বিশ্রামতলা নামক স্থান রয়েছে। কথিত আছে যে, এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বাল্যকালে তাঁর সখাদের সঙ্গে নানাবিধ ব্রজলীলা ও রাসলীলার অভিনয় করতেন।

মন্দিরের কাছেই রয়েছে আমলীতলা নামক স্থান। সেখানে একটি বিশাল তেঁতুল গাছ রয়েছে বলে ওই স্থানটির এই নামকরণ করা হয়েছে। নেড়াদি সম্প্রদায় এই স্থানের সম্বন্ধে নানাবিধ গল্পের সৃষ্টি করেছে। তারা বলে যে, বীরভদ্র প্রভু বারো শত নেড়ার সাহায্যে শ্বেতগঙ্গা নামক একটি দীঘি খনন করেছিলেন। কিছু দূরে গোস্বামীদের সমাধিস্তম্ভ আছে এবং সেখানে মৌড়েশ্বর নামক একটি ছোট্ট নদী প্রবাহিতা হয়েছে, যাকে যমুনা বলা হয়। সেই ছোট্ট নদীটি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সূতিকা-মন্দির অবস্থিত। সূতিকা-মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীন নাটমন্দির অবস্থিত ছিল, কিন্তু

পরবর্তীকালে তা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। এখন তা বিস্তৃত বটবৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালে সেই প্রাঙ্গণে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে এবং তার মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ বিরাজ করছেন। মন্দিরটি নির্মাণ করেন স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার কারফর্মা। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি প্রস্তর ফলক বসানো হয়।

নিত্যানন্দ প্রভু যেখানে আবির্ভূত হন, সেই স্থানকে গর্ভবাস নামে অভিহিত করা হয়। সেখানকার মন্দিরের সেবার জন্য তেতাল্লিশ বিঘা জমির বন্দোবস্ত আছে। তার মধ্যে কুড়ি বিঘা জমি নিষ্কর, তা দিনাজপুরের মহারাজা দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, গর্ভবাসের কাছে হাড়াই পণ্ডিতের টোলগৃহ ছিল। ঐ স্থানের সেবায়েতদের নাম—(১) শ্রীরাঘবচন্দ্র, (২) জগদানন্দ দাস, (৩) কৃষ্ণদাস, (৪) নিত্যানন্দ দাস, (৫) রামদাস, (৬) ব্রজমোহন দাস, (৭) কানাই দাস, (৮) গৌরদাস, (৯) শিবানন্দ দাস, (১০) হরিদাস। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের চিড়িয়া কুঞ্জে ছিলেন। তাঁর তিরোভাব তিথি কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী। চিড়িয়া-কুঞ্জ এখন বৃন্দাবনের শৃঙ্গার ঘাটের গোস্বামীরা তত্ত্বাবধান করেন। খুব সম্ভবত কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের জন্য তাঁরাও শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ বলে পরিচিত।

গর্ভবাস মন্দিরের নিকটে রয়েছে বকুলতলা নামক স্থান, যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর সখাদের সঙ্গে ঝাল-ঝপেটা নামক খেলা খেলতেন। সেই বকুল গাছটি অত্যন্ত অদ্ভুত, কেন না সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি ঠিক সাপের মুখের মতো ফণাবিশিষ্ট। বোধ হয় নিত্যানন্দের ইচ্ছাতেই অনন্তদেব এভাবেই নিজে প্রকাশিত হয়েছেন। সেই বৃক্ষটিও খুব প্রাচীন। শোনা যায়, পূর্বে সেই বৃক্ষটির দুটি ডাল পৃথক ছিল, কিন্তু খেলার সময় সখাদের এক ডাল থেকে অন্য ডালে গমনাগমন করতে কষ্ট হয় দেখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শাখা দুটিকে একত্র করে দিয়েছিলেন।

নিকটেই রয়েছে হাঁটুগাড়া নামক আর একটি স্থান। কথিত আছে যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত তীর্থস্থানকে ওই স্থানে এনে উপস্থিত করেছিলেন। তাই, সেই অঞ্চলের অধিবাসীরা গঙ্গা আদি তীর্থে না গিয়ে ওই তীর্থেই স্নান করে থাকেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ওই স্থানে দধি-চিড়া মহোৎসব করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি এই স্থানে হাঁটুগেড়ে বসে দধি-চিড়া ভোজন করেছিলেন বলে এই স্থানটির নাম হয় হাঁটুগাড়া। সেখানে একটি পবিত্র কুণ্ডে বারো মাস জল থাকে। কার্তিক মাসে গোষ্ঠাষ্টমীর সময় এই স্থানে একটি বিরাট মেলা হয় এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম-উৎসবের সময়ও বীরচন্দ্রপুরে একটি বিরাট মেলা হয়। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (৫৮-৬৩) বর্ণনা করা হয়েছে যে, হলায়ুধ, বলদেব, বিশ্বরূপ ও সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ অবধূতরূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৬২

অসংখ্য ভক্তের করাইলা অবতার ।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অসংখ্য ভক্তদেরকে অবতরণ করিয়ে, অবশেষে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন।

শ্লোক ৬৩

প্রভুর আবির্ভাবপূর্বে যত বৈষ্ণবগণ ।
অদ্বৈত-আচার্যের স্থানে করেন গমন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপের সমস্ত বৈষ্ণবেরা অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে সমবেত হতেন।

শ্লোক ৬৪

গীতা-ভাগবত কহে আচার্য-গোসাঞি ।
জ্ঞান-কর্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

বৈষ্ণবদের সেই সভায়, অদ্বৈত আচার্য প্রভু ভগবদ্গীতা ও ভাগবত পাঠ করতেন। জ্ঞানমার্গ ও কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে, তিনি ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য স্থাপন করতেন।

শ্লোক ৬৫

সর্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান ।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম নাহি মানে আন ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই কৃষ্ণভক্তগণ জ্ঞান, যোগ, তপশ্চর্যা ও তথাকথিত ধর্ম আদির কোন অপেক্ষা করেন না। তাঁরা ভক্তি ছাড়া আর কোন পন্থাই স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই পন্থা অনুসরণ করে। আমরা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিমার্গ ব্যতীত অন্য কোন পন্থা স্বীকার করি না। যারা জ্ঞান, যোগ, তপস্যা আদির অনুশীলন করে, তারা অনেক সময় আমাদের সমালোচনা করে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাদের সঙ্গে কোন রকম আপোষ করতে আমরা অক্ষম। আমরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করে সারা পৃথিবীতে কেবল সেই কথাই প্রচার করি।

শ্লোক ৬৬

তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসংকীর্তন ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে সমস্ত বৈষ্ণবেরা নিরন্তর কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে আনন্দে মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই আদর্শের ভিত্তিতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা, কৃষ্ণপূজা এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নেই।

শ্লোক ৬৭

কিন্তু সর্বলোক দেখি' কৃষ্ণবহির্মুখ ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি' পায় দুঃখ ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু সমস্ত মানুষকে কৃষ্ণ-বহির্মুখ হয়ে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে লিপ্ত হতে দেখে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু গভীর দুঃখ অনুভব করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত সারা পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখে সর্বদা ব্যথিত হন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন, "এই পৃথিবীতে কোন কিছুর অভাব নেই। অভাব কেবল কৃষ্ণভক্তির।" সেটিই হচ্ছে সমস্ত শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি। কৃষ্ণভক্তির অভাবের ফলে বর্তমান মানব-সমাজ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও অজ্ঞানের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে এত দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। পৃথিবীর এই অবস্থা দেখে কৃষ্ণভক্তগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হন।

শ্লোক ৬৮

লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন ।
কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

পৃথিবীর এই অবস্থা দেখে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন যে, কিভাবে এই সমস্ত মানুষ মায়ার হাত থেকে উদ্ধার লাভ করবে।

শ্লোক ৬৯

কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার ।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু মনে মনে ভাবলেন, "যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ভগবদ্ভক্তি বিতরণ করেন, তা হলেই কেবল সমস্ত মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।"

তাৎপর্য

অপরাধী ব্যক্তি যেমন রাজা বা রাষ্ট্রপতির বিশেষ কৃপার প্রভাবে রেহাই পেতে পারে, তেমনই কলিযুগের অধঃপতিত মানুষেরাও কেবল পরমেশ্বর ভগবানের, অথবা কেবল তাঁর বিশেষ প্রতিনিধির কৃপার প্রভাবে নিস্তার পেতে পারে। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু তাই চেয়েছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান যেন এই যুগের অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হন।

শ্লোক ৭০

কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করাবার প্রতিজ্ঞা করে, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা দিয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

তুলসীপাতা, গঙ্গাজল আর যদি সম্ভব হয় একটু চন্দনই পরমেশ্বর ভগবানের পূজার যথেষ্ট উপকরণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"কেউ যদি ভক্তি সহকারে আমাকে একটি পাতা, একটি ফুল, একটি ফল ও একটু জল দেয়, তা হলে আমি তা গ্রহণ করি।" ভগবানের সেই নির্দেশ অনুসারে অদ্বৈত আচার্য প্রভু তুলসীপাতা আর গঙ্গাজল দিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

শ্লোক ৭১

কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার ।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

হুঙ্কার করে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করতে আহ্বান করতে লাগলেন এবং তাঁর এই পুনঃপুনঃ আহ্বানে ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আকৃষ্ট হলেন।

শ্লোক ৭২

জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে ।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল, জন্মি' জন্মি' মরে ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীমাতার গর্ভে একে একে আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মের পরেই তাদের মৃত্যু হয়।

শ্লোক ৭৩

অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ।
পুত্র লাগি' আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই একে একে তাঁর সমস্ত সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাই এক পুত্র কামনা করে, তিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ আরাধনা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৭৪

তবে পুত্র জনমিলা 'বিশ্বরূপ' নাম ।
মহা-গুণবান্ তেঁহ—'বলদেব'-ধাম ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর বিশ্বরূপ নামে জগন্নাথ মিশ্রের একটি পুত্র হয়, যিনি ছিলেন সব চাইতে বলবান ও গুণবান, কেন না তিনি ছিলেন বলদেবের অবতার।

তাৎপর্য

বিশ্বরূপ ছিলেন গৌরহরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। যখন বিশ্বরূপের বিবাহের আয়োজন করা হচ্ছিল, তখন তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাসের নাম শঙ্করারণ্য। ১৪৩১ শকাব্দে শোলাপুর জেলার পাণ্ডারপুরে তিনি অপ্রকট হন। সঙ্কর্ষণের অবতাররূপে তিনি বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত—এই উভয় কারণ। অংশ ও অংশীরূপে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে অভিন্ন। তিনি হচ্ছেন চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণের অবতার। *গৌর-চন্দ্রোদয়* গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিশ্বরূপ তাঁর অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গে মিলিত হন।

শ্লোক ৭৫

বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ' ।
তেঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

বলদেবের প্রকাশ পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত—এই উভয় কারণ।

শ্লোক ৭৬

তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর ।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

বিরাটরূপ হচ্ছে মহাসঙ্কর্ষণের বিশ্বরূপ অবতার। তাই, বিশ্বে ভগবান ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

শ্লোক ৭৭

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৭৭ ॥

ন—না; এতৎ—এই; চিত্রম্—বিচিত্র; ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; হি—অবশ্যই; অনন্তে—অনন্তের মধ্যে; জগৎ-ঈশ্বরে—জগদীশ্বর; ওতম্—লম্বালম্বিভাবে; প্রোতম্—আড়াআড়িভাবে; ইদম্—এই ব্রহ্মাণ্ড; যস্মিন্—যাঁর মধ্যে; তন্তুষু—সুতাতে; অঙ্গ—হে রাজন্; যথা—যেমন; পটঃ—বসন।

অনুবাদ

"বসনের সুতো যেমন লম্বালম্বিভাবে ও আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত থাকে, তেমনই এই জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, তা সবই প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানে বিরাজ করছে। অনন্ত ভগবান জগদীশ্বরের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/১৫/৩৫) থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ৭৮

অতএব প্রভু তাঁরে বলে, 'বড় ভাই' ।
কৃষ্ণ, বলরাম দুই—চৈতন্য, নিতাই ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু মহাসঙ্কর্ষণ হচ্ছেন বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপে বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান, তাই তাঁকে মহাপ্রভুর বড় ভাই বলা হয়। কৃষ্ণলোকে এই দুই ভাই কৃষ্ণ ও বলরাম নামে পরিচিত, কিন্তু এখন তাঁরা হচ্ছেন চৈতন্য ও নিতাই। সুতরাং, নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন মূল সঙ্কর্ষণ বা বলদেব।

শ্লোক ৭৯

পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন ।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা বিশ্বরূপকে তাঁদের পুত্ররূপে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। এই আনন্দের ফলে, তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণের সেবা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাধারণত দেখা যায় যে, সকলেই দুঃখের সময় ভগবানের পূজা করে, কিন্তু সুখে থাকলে ভগবানকে ভুলে যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"পূর্বকৃত সুকৃতি থাকলে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার মানুষ ভগবানের ভজনা করেন।" জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা তাঁদের একে একে আটটি কন্যার পরলোক গমনের ফলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা বিশ্বরূপকে তাঁদের পুত্ররূপে পেলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা জানতেন যে, ভগবানের কৃপার প্রভাবে তাঁরা এমন ঐশ্বর্য ও আনন্দ লাভ করেছেন। তাই ভগবানকে ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে, তাঁরা আরও গভীর অনুরাগ ও আসক্তির সঙ্গে শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে শুরু করেন। সাধারণত মানুষ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হলে ভগবানকে ভুলে যায়, কিন্তু ভগবানের কৃপার প্রভাবে ভক্ত যতই ঐশ্বর্য লাভ করেন, ততই তিনি ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন।

শ্লোক ৮০

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে ।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

১৪০৬ শকাব্দের মাঘ মাসে শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার দেহে প্রবেশ করেন।

তাৎপর্য

১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, ১৪০৬ শকাব্দের মাঘ মাসে তিনি তাঁর পিতা-মাতার দেহে প্রবেশ করেন। সুতরাং, জন্মের তের মাস পূর্বে তিনি যথাক্রমে পিতা ও মাতার দেহে প্রবেশ করেছিলেন। সাধারণত মানবশিশু দশমাস মাতৃগর্ভে থাকে। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তের মাস তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন।

শ্লোক ৮১

মিশ্র কহে শচী-স্থানে,—দেখি আন রীত ।
জ্যোতির্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র শচীমাতাকে বললেন, "আমি এখন এক অদ্ভুত বস্তু দেখছি! তোমার দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে এবং মনে হচ্ছে যেন লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং আমাদের গৃহে বিরাজ করছেন।

শ্লোক ৮২

যাহাঁ তাহাঁ সর্বলোক করয়ে সম্মান ।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

"যেখানেই আমি যাই না কেন, সেখানকার সমস্ত মানুষ আমাকে সম্মান করে। না চাইতেই তারা আমার ঘরে ধন, বস্ত্র ও ধান আদি পাঠিয়ে দেয়।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ কারও দাসত্ব করে না। অন্য কারও চাকরি করা হচ্ছে শূদ্রের বৃত্তি। ব্রাহ্মণ সর্বদাই স্বতন্ত্র, কেন না তিনি হচ্ছেন সমাজের শিক্ষক, গুরু ও উপদেষ্টা। তাঁর জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সমাজের অন্যান্য মানুষেরা তা সরবরাহ করেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন, তিনি সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এই বিজ্ঞান-সম্মত বিভাগ ব্যতীত সমাজ চলতে পারে না। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের সমস্ত মানুষকে সদুপদেশ দান করা, ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে সমাজ-ব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং আইন-কানুন বজায় রাখা, বৈশ্যের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করা এবং শূদ্রের কর্তব্য হচ্ছে সমাজের উচ্চতর বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) সেবা করা।

জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন ব্রাহ্মণ; তাই তাঁর জীবন ধারণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন— যেমন অর্থ, বস্ত্র ও শস্য আদি সব কিছু সমাজের অন্যান্য মানুষেরা পাঠিয়ে দিতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন শচীমাতার গর্ভে, তখন না চাইতেই জগন্নাথ মিশ্র এই সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পাচ্ছিলেন। তাঁর পরিবারে ভগবানের উপস্থিতির ফলে, সকলেই তাঁকে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করছিলেন। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব যদি ভগবানের নিত্য সেবকরূপে ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তাঁর জীবন ধারণের অথবা পরিবার প্রতিপালনের কোন অভাব থাকতে পারে না।

শ্লোক ৮৩

শচী কহে,—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে ।
দিব্যমূর্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা একদিন তাঁর স্বামীকে বললেন, "আমি এও দেখি যে, অদ্ভুত অদ্ভুত জ্যোতির্ময় মানুষেরা যেন আকাশে আবির্ভূত হয়ে প্রার্থনা নিবেদন করছেন।"

তাৎপর্য

জগন্নাথ মিশ্র সকলের কাছে সম্মান পাচ্ছিলেন এবং না চাইতেই তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তা সবই তিনি পাচ্ছিলেন। আবার তেমনই, শচীমাতাও দেখছিলেন যে, স্বর্গের দেবতারা আকাশের উপর থেকে তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করছেন, কেন না শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করছিলেন।

শ্লোক ৮৪

জগন্নাথ মিশ্র কহে,—স্বপ্ন যে দেখিল ।
জ্যোতির্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র তখন উত্তর দিলেন, "আমি স্বপ্ন দেখলাম যে, ভগবানের জ্যোতির্ময় ধাম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল।

শ্লোক ৮৫

আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে ।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার হৃদয় থেকে তা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। তাই আমি বুঝতে পারছি যে, কোন মহাত্মা নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করবেন।"

শ্লোক ৮৬

এত বলি' দুঁহে রহে হরষিত হঞা ।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই আলোচনা করার পর, পতি-পত্নী দুজনই অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তাঁরা দুজনে একত্রে বিশেষভাবে গৃহে শালগ্রাম শিলার সেবা করতে থাকেন।

তাৎপর্য

বিশেষ করে ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণ-পরিবারের পূজার জন্য *শালগ্রাম-শিলা* রাখা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত জাতি ব্রাহ্মণদের *শালগ্রাম-শিলার* পূজা করা কর্তব্য। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগের প্রভাবে তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে অত্যন্ত গর্বিত হলেও, তাঁরা আর *শালগ্রাম-শিলার* পূজা করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনাদিকাল ধরে এই প্রথা চলে আসছে যে, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সর্ব অবস্থাতেই *শালগ্রাম-শিলার* পূজা করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কিছু সদস্য *শালগ্রাম-শিলার* পূজা প্রচলন করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু ইচ্ছা করেই আমরা সেই প্রথা প্রচলন করা থেকে আপাতত বিরত আছি, কেন না

কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের অধিকাংশ সদস্যই ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে আসে না। অতএব পরে যখন আমরা দেখব যে, তাঁরা যথাযথভাবে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে যুক্ত হয়ে বিকশিত হয়েছেন এবং ব্রাহ্মণের মতো আচরণ করছেন, তখন *শালগ্রাম-শিলা* পূজা করার প্রচলন করা হবে।

এই যুগে *শালগ্রাম-শিলার* পূজা করা ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেটিই হচ্ছে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত—*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং / কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা*। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, নিরপরাধে নাম করার ফলে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। কিন্তু তবুও অন্তরের পবিত্রতার জন্য মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করারও প্রয়োজন রয়েছে। তাই কেউ যখন পারমার্থিক চেতনায় উন্নতি লাভ করেন, অথবা পারমার্থিক স্তরে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি *শালগ্রাম-শিলা* পূজা করতে পারেন।

জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় থেকে শচীমাতার হৃদয়ে ভগবানের প্রবেশের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—"জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা হচ্ছেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তাঁদের হৃদয় সর্বদাই শুদ্ধ সত্ত্বময় এবং তাই তাঁরা কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে যান না। এই জড় জগতের সাধারণ মানুষের হৃদয় কলুষিত। তাই তাকে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে, সর্বপ্রথমে তার হৃদয়কে নির্মল করতে হয়। কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতা সেই রকম কলুষিত চিত্ত সাধারণ মানব-মানবী ছিলেন না। হৃদয় যখন সম্পূর্ণভাবে নির্মল থাকে, তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় বসুদেব। বসুদেবেই চিৎ-বিলাসী বাসুদেব বা কৃষ্ণ প্রকটিত হন।"

আমাদের বুঝতে হবে যে, একজন সাধারণ স্ত্রীলোক যেভাবে জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণের মাধ্যমে গর্ভবতী হন, শচীদেবী সেভাবে গর্ভবতী হননি। শচীমাতা একজন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গর্ভবতী হয়েছিলেন বলে মনে করা এক মহা অপরাধ। পারমার্থিক চেতনার স্তরে ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হলে, তখন শচীমাতার গর্ভ যে কি বস্তু তা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২/১৬) বর্ণনা করা হয়েছে—

> *ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ ।*
> *আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥*

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে এই বর্ণনাটি করা হয়। ভগবানের অবতার বসুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করলেন এবং তারপর দেবকীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলেন। এই সম্পর্কে শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় বলেছেন—*মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভুব; জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।* সাধারণ মানুষের মতো ভগবানের শুক্রের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামীও বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে আনকদুন্দুভি বা বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। তারপর আনকদুন্দুভির হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে প্রকট হন। এভাবেই প্রতি রাত্রে চন্দ্র যেমন ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়, ঠিক

তেমনভাবেই দেবকীর বাৎসল্যরূপ প্রেমানন্দামৃত-সমূহে লালিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই হৃদয়ে ধীরে ধীরে বর্ধিত হতে থাকেন। তারপর দেবকীর হৃদয় থেকে শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারের সূতিকাগৃহে দেবকীর শয্যায় আবির্ভূত হন। তখন যোগমায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে দেবকী মনে করেন যে, তাঁর সন্তানের জন্ম হয়েছে। এই বিষয়ে স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত বিমোহিত হন। তাই *ভাগবতে* (১/১/১) বর্ণনা করা হয়েছে, *মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ*। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর গর্ভে রয়েছেন বলে মনে করে, তাঁরা দেবকীকে বন্দনা করতে এসেছিলেন। সেই জন্য দেবতারা তখন স্বর্গলোক থেকে মথুরায় এসেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, স্বর্গলোক থেকেও মথুরা শ্রেষ্ঠ।

যশোদামায়ের নিত্য পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান। এই জড় জগতে ও চিৎ-জগতে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল তাঁর লীলাবিলাস করছেন। এই লীলায় ভগবান সব সময় নিজেকে নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র বলে মনে করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তেতাল্লিশ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, "উদার হৃদয় নন্দ বিদেশ থেকে ফিরে এসে, তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে, তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে পরমানন্দ লাভ করলেন।" তেমনই, দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের একুশ শ্লোকে বলা হয়েছে, "এই ভগবান গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের পক্ষে যেরূপ সুলভ, দেহাত্মবাদী, তপস্বী কিংবা আত্মদর্শী জ্ঞানীদের পক্ষে কখনই সেরূপ সুখলভ্য নন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের উদ্ধৃতি দিয়ে দেবকীর গর্ভস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বর্গের দেবতাদের বন্দনা সম্বন্ধে বলেছেন, "পূর্বদিক যেমন চন্দ্রের উদয় ব্যক্ত করে, তেমনই শুদ্ধ সত্ত্বময়ী দেবকী শূরসেন-পুত্র বসুদেবের কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করলেন।" *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১০/২/১৮) এই উক্তিটি থেকেও বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান আনকদুন্দুভি বা বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে 'দেবকীর হৃদয়' বলতে দেবকীর গর্ভ বোঝানো হয়েছে। কারণ, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একচল্লিশ শ্লোকে স্বর্গের দেবতারা বলেছেন, *দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্*—"হে মাতঃ! তোমার কুক্ষিতে (গর্ভে) পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত।" সুতরাং, বসুদেবের হৃদয় থেকে ভগবান দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি দেবকীর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

তেমনই, *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে, *বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ* বলতে বোঝানো হয়েছে যে, ঠিক যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয় থেকে শচীদেবীর হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের রহস্য। সেই সূত্রে মনে রাখা উচিত যে, কখনই যেন মনে করা না হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন সাধারণ জীবের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই তত্ত্বটি বোঝা একটু কঠিন, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর এই বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করা ভক্তদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

শ্লোক ৮৭

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস ।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে,—মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তের মাস হয়ে গেল, কিন্তু তবুও গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হল না। তাই, জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন।

শ্লোক ৮৮

নীলাম্বর চক্রবর্তী কহিল গণিয়া ।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

নীলাম্বর চক্রবর্তী (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ) জ্যোতিষ গণনা করে বললেন যে, সেই মাসে এক শুভক্ষণে শিশুটির জন্ম হবে।

শ্লোক ৮৯

চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন ।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভক্ষণের উদয় হল।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মকোষ্ঠী নিম্নলিখিত ভাবে প্রদান করেছেন—

শক ১৪০৭/১০/২২/২৮/৪৫

দিনম্

৭	১১	৮
১৫	৫৪	৩৮
৪০	৩৭	৪০
১৩	৬	২৩

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মকোষ্ঠী বিশ্লেষণ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন যে, মহাপ্রভুর জন্মকালে—মেষ-রাশিতে শুক্র অশ্বিণী-নক্ষত্রে; সিংহ-রাশিতে কেতু উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে; চন্দ্র পূর্বফল্গুনি-নক্ষত্রে; বৃশ্চিক-রাশিতে শনি জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে; ধনুতে বৃহস্পতি পূর্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে; মকরে মঙ্গল শ্রবণা-নক্ষত্রে; কুম্ভে রবি পূর্বভাদ্রপদে; রাহু পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রে এবং মীন-রাশিতে বুধ উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রে। সেই দিনটি ছিল সিংহ লগ্ন।

শ্লোক ৯০

সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব সুলক্ষণ ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

জ্যোতির্বেদ অনুসারে সিংহ রাশিতে, সিংহ লগ্নে, সমস্ত গ্রহগুলি যখন অতি উচ্চে অবস্থিত ছিল, তখন ষড়বর্গ, অষ্টবর্গ আদি সমস্ত সুলক্ষণ প্রকাশিত হল।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন এক মহান জ্যোতির্বিদ এবং তিনি এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—ষড়্‌বর্গের বিভাগগুলি হচ্ছে—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ। জ্যোতির্বেদ মতে লগ্নের স্পষ্টাংশ অনুসারে কথিত ষড়্‌বর্গের অধিপতি বিচার করে সুলক্ষণ স্থির করা হয়। বৃহজ্জাতক ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি জানা যায়। গ্রহের তাৎকালিক স্থান থেকে নির্দিষ্ট রেখাপাত করে শুভক্ষণ অষ্টবর্গ গণিত হয়। এই বিশেষ জ্ঞান একমাত্র হোরা-শাস্ত্রবিৎ নামে অভিহিত ব্যক্তিরাই জানেন। হোরা-শাস্ত্রের ভিত্তিতে বিচার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের শুভক্ষণ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯১

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র যখন দেখা দিলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের কি প্রয়োজন?

শ্লোক ৯২

এত জানি' রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

তা বিবেচনা করে রাহু পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করল এবং তখন 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি!' এই নামে ত্রিভুবন প্লাবিত হল।

তাৎপর্য

জ্যোতির্বেদ অনুসারে রাহুগ্রহ যখন পূর্ণচন্দ্রের সম্মুখে আসে, তখন গ্রহণ হয়। ভারতবর্ষে এটি একটি প্রথা যে, বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী ভারতবাসীরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় গঙ্গায় অথবা সমুদ্রে স্নান করেন। বৈদিক ধর্মের ঐকান্তিকভাবে অনুগমনকারী মানুষেরা গ্রহণের সময় জলে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

জন্মের সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল এবং তার ফলে মানুষ জলে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৯৩

জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন ।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত জগৎ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের উচ্চারণ ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল এবং তাই চমৎকৃত হয়ে সমস্ত লোকেরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন।

শ্লোক ৯৪

জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি' ।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সমস্ত জগতের লোক যখন পরমেশ্বর ভগবানের নাম কীর্তন করছিলেন, তখন গৌরহরি রূপে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন।

শ্লোক ৯৫

প্রসন্ন হইল সব জগতের মন ।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত জগৎ তখন প্রসন্ন হল। হিন্দুরা যখন ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করছিলেন, তখন অহিন্দু যবনেরা ঠাট্টা করে তাঁদের অনুকরণ করে 'হরি' 'হরি' বলতে লাগল।

তাৎপর্য

যদিও মুসলমানেরা অথবা অহিন্দুরা ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে চায় না, তবুও চন্দ্রগ্রহণের সময় নবদ্বীপের হিন্দুরা যখন মহামন্ত্র কীর্তন করছিলেন, তখন মুসলমানেরা তাঁদের অনুকরণে ভগবানের নাম উচ্চারণ করছিল। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় মুসলমানেরাও হিন্দুদের সঙ্গে সমবেতভাবে ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করেছিল।

শ্লোক ৯৬

'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি ।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

এই পৃথিবীতে স্ত্রীলোকেরা যখন হরিনাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি দিচ্ছিলেন, তখন স্বর্গের দেবতারা কৌতূহল সহকারে বাজনা বাজাচ্ছিলেন এবং নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ৯৭

প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল ।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন দশদিক আনন্দে মগ্ন হল, এমন কি নদীর তরঙ্গও আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। অধিকন্তু, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবই আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল।

শ্লোক ৯৮

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয় ।
পাপ-তমঃ হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সূর্য যেখানে প্রথম উদিত হয়, সেই উদয়াচলের সঙ্গে নদীয়ার তুলনা করা হয়েছে, কেন না পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এখানে উদিত হয়েছেন। তাঁর উদয়ের ফলে জগতের পাপ-অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে এবং তার ফলে ত্রিভুবন উল্লসিত হয়ে উঠেছে এবং সারা জগৎ জুড়ে হরিধ্বনি হচ্ছে।

শ্লোক ৯৯

সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে ।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শান্তিপুরে তাঁর গৃহে আনন্দিত মনে নৃত্য করছিলেন। তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়েই নৃত্য করছিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে কেন নাচছিলেন, কেউ তা বুঝতে পারছিল না।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু শান্তিপুরে তাঁর বাড়িতে ছিলেন। হরিদাস ঠাকুর প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। ঘটনাক্রমে তিনি তখন সেখানে ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের সময় তাঁরা দুজনে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শান্তিপুরের কেউই বুঝতে পারছিলেন না যে, কেন এই দুজন মহাত্মা এভাবেই নৃত্য করছেন।

শ্লোক ১০০

দেখি' উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রের গ্রহণ হতে দেখে অদ্বৈত আচার্য প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তৎক্ষণাৎ গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মহানন্দে গঙ্গায় স্নান করলেন। চন্দ্রগ্রহণের ছলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু মনোবলে ব্রাহ্মণদের নানা বস্তু দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় হিন্দুরা ব্রাহ্মণ অথবা দরিদ্রদের যথাসাধ্য দান করেন। তাই, অদ্বৈত আচার্য প্রভু ওই গ্রহণের ছলে ব্রাহ্মণদের নানান বস্তু দান করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ঠিক পরেই বসুদেব সেই শুভক্ষণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের দশ হাজার গাভী দান করেছিলেন। হিন্দুদের একটি প্রচলিত প্রথা হচ্ছে যে, শিশুর জন্মের পর, বিশেষ করে পুত্র সন্তানের জন্মের পর পিতা-মাতারা আনন্দে নানান বস্তু দান করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণ উপলক্ষেই অদ্বৈত আচার্য প্রভু তা করেছিলেন। কিন্তু মানুষেরা বুঝতে পারছিলেন না যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু কেন এমনভাবে বিবিধ বস্তু দান করছেন। চন্দ্রগ্রহণের জন্য তিনি দান করেননি, সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করার জন্য দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর বসুদেব যেভাবে দান করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তিনি দান করেছিলেন।

শ্লোক ১০১

জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্যে আছে ভাস ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত জগৎকে আনন্দময় দেখে হরিদাস ঠাকুর মনে মনে বিস্মিত হলেন এবং ঠারেঠোরে অদ্বৈত আচার্যকে বললেন, "তুমি এভাবে নাচছ ও দান করছ যে, তা দেখে আমি অত্যন্ত রোমাঞ্চ অনুভব করছি। আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার এই কার্যকলাপের পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য রয়েছে।"

শ্লোক ১০২

আচার্যরত্ন, শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসংকীর্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

আচার্যরত্ন (চন্দ্রশেখর) এবং শ্রীবাস ঠাকুর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা গঙ্গায় গিয়ে স্নান করলেন। আনন্দ বিহ্বল চিত্তে তাঁরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে মনোবলে বহু বস্তু দান করলেন।

শ্লোক ১০৩

এই মত ভক্ততিতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সংকীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সমস্ত ভক্তরা যে যেখানে ছিলেন, মনোবলের দ্বারা নৃত্য করতে লাগলেন, সংকীর্তন করতে লাগলেন এবং আনন্দে বিহ্বল চিত্তে গ্রহণের ছলে দান করতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৪

ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে থালী ভরি'
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্তি,
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

সব রকম সম্মানিত ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও নারীগণ নানা রকম উপহারে থালি পূর্ণ করে সকলে সেখানে যৌতুক নিয়ে এলেন। নবজাত শিশুটি, যাঁর অঙ্গকান্তি ছিল কাঁচা সোনার মতো উজ্জ্বল, তাঁরা সকলে আনন্দিত অন্তরে তাঁকে দেখে আশীর্বাদ করলেন।

শ্লোক ১০৫

সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ ।
নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করে দরশন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, শিবপত্নী গৌরী, নৃসিংহদেবের পত্নী সরস্বতী, ইন্দ্রপত্নী শচী, বশিষ্ঠ ঋষির পত্নী অরুন্ধতী, স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা এবং অন্য সমস্ত দেবনারীগণ ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে, নানা দ্রব্যে পাত্র ভরে, নবজাত শিশুটিকে দর্শন করতে এলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের পরেই প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা, যাঁরা অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণপত্নী, তাঁরা তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণপত্নী বেশে সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী আদি স্বর্গের দেবীরা নবজাত শিশুটিকে দেখতে এসেছিলেন। সাধারণ মানুষেরা তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণপত্নী বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন স্বর্গের দেবী।

শ্লোক ১০৬

অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত ।
নর্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

অন্তরীক্ষে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণ—এঁরা সকলে স্তুতি করতে লাগলেন এবং বাদ্য-গীত সহকারে নৃত্য করতে লাগলেন। তেমনই নবদ্বীপের সমস্ত নর্তক, বাদক ও ভাট সকলে এসে মহা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গে যেমন গায়ক, নর্তক এবং স্তুতিকার রয়েছে, তেমনই ভারতবর্ষে এখনও পেশাদার নর্তক, গায়ক ও ভাট রয়েছে। এই ভাটরা আশীর্বাদ দান করেন। গৃহে কোন উৎসব হলে, বিশেষ করে বিবাহ ও জন্মোৎসবে, তাঁরা সকলে এসে সমবেত হন। এই সমস্ত পেশাদারী মানুষেরা হিন্দুগৃহের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। হিজড়ারাও এক রকমভাবেই উৎসবের সুযোগে দান গ্রহণ করে। সেটিই হচ্ছে তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। এই ধরনের মানুষেরা কখনও চাকরি করে না অথবা

চাষবাস বা ব্যবসাও করে না; তারা কেবল প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। *ভাটরা* হচ্ছেন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যাঁরা এই ধরনের অনুষ্ঠানে গিয়ে বৈদিক শাস্ত্রের উল্লেখপূর্বক শ্লোক রচনা করে আশীর্বাদ দান করেন।

শ্লোক ১০৭

কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল ।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

কে আসছিল এবং কে যাচ্ছিল, কে নাচছিল আর কেই বা গান করছিল, তা কেউ বুঝতে পারছিল না। কে যে কি বলছিল, তাও তারা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু তার ফলে সমস্ত দুঃখ-শোক তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল এবং সমস্ত মানুষ পরম আনন্দে মগ্ন হয়েছিল। এভাবেই জগন্নাথ মিশ্রও আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ১০৮

আচার্যরত্ন, শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

চন্দ্রশেখর আচার্য ও শ্রীবাস ঠাকুর উভয়েই জগন্নাথ মিশ্রের কাছে এসে নানাভাবে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। তাঁরা বৈদিক শাস্ত্রবিধি অনুসারে জাতকর্ম সম্পাদন করলেন। তখন জগন্নাথ মিশ্রও নানা প্রকার বস্তু দান করলেন।

শ্লোক ১০৯

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র যা কিছু যৌতুক পেয়েছিলেন, আর তাঁর ঘরে যা কিছু ছিল, তা সব তিনি ব্রাহ্মণ, নর্তক, গায়ক, ভাট ও দরিদ্রদের দান করলেন। এভাবেই ধন দান করে তিনি তাঁদের সকলকে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

শ্লোক ১১০

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে ।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরের পত্নী মালিনী চন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের পত্নী ও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নারকেল প্রভৃতি দিয়ে শিশুটির পূজা করার জন্য মহা আনন্দে সেখানে এলেন।

তাৎপর্য

তৈল মিশ্রিত সিন্দুর, খই, কলা, নারকেল ও হরিদ্রা—এই সকল হচ্ছে উৎসবের মঙ্গলময় উপকরণ। খই-কলা হচ্ছে অত্যন্ত মঙ্গলময় উপকরণ। তেমনই তৈল মিশ্রিত হরিদ্রা ও সিন্দুর নবজাত শিশুর অঙ্গে লেপন করা হয়। এগুলি হচ্ছে মঙ্গলময় ক্রিয়া। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের সময় এই ধরনের ক্রিয়াগুলি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হত, কিন্তু বর্তমানে সচরাচর এই অনুষ্ঠানগুলি হতে দেখা যায় না। আজকাল সাধারণত প্রসূতি-মাতাকে হাসপাতালে পাঠান হয় এবং শিশুর জন্মের ঠিক পরে তাকে অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ধোয়ানো হয় এবং এ ছাড়া আর কিছু করা হয় না।

শ্লোক ১১১

অদ্বৈত-আচার্য-ভার্যা, জগৎপূজিতা আর্যা,
নাম তাঁর 'সীতা ঠাকুরাণী' ।
আচার্যের আজ্ঞা পাঞা, গেল উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের কয়েকদিন পর, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সমস্ত জগতের পরম আরাধ্যা সীতাদেবী অদ্বৈত আচার্যের অনুমতি নিয়ে নানা রকম উপহার সহ সেই বালক শিরোমণিকে দেখতে গেলেন।

তাৎপর্য

মনে হয় অদ্বৈত আচার্যের দুটি বাড়ি ছিল, একটি শান্তিপুরে এবং আর একটি নবদ্বীপে। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়, তখন অদ্বৈত আচার্য তাঁর নবদ্বীপের বাড়িতে ছিলেন না, তখন তিনি শান্তিপুরের বাড়িতে বাস করছিলেন। তাই পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে

(শ্লোক ৯৯) যে, শান্তিপুরে অদ্বৈতের পিতৃপুরুষের গৃহে (*নিজালয়*) থেকে সীতাদেবী নবজাত শিশু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নানা রকম উপহার দেওয়ার জন্য নবদ্বীপে এসেছিলেন।

শ্লোক ১১২

সুবর্ণের কড়ি-বঔলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবন্ধ,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি হাতের বালা, অঙ্গদ, কঙ্কন, গলার হার আদি সোনার অলঙ্কার এবং পাশুলি ও মলবন্ধ আদি রূপার অলঙ্কার নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১১৩

ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সোনায় বাঁধানো বাঘের নখ, রেশমী সুতার কটিবন্ধ, হাত ও পায়ের নানা রকম আভরণ, সুন্দরভাবে ছাপানো রেশমি শাড়ি এবং বুনা রেশমের পাড়বিশিষ্ট শিশুর পোষাক, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং ধনরত্ন নিয়ে এসে, তিনি সেই শিশুটিকে উপহার দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অদ্বৈতপত্নী সীতা ঠাকুরাণীর দেওয়া উপহারগুলি থেকে বোঝা যায় যে, অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত ধনী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যদিও সাধারণত সমাজের ধনী সম্প্রদায় নন, কিন্তু শান্তিপুরের ব্রাহ্মণদের নেতা শ্রীঅদ্বৈত আচার্য খুবই অবস্থাপন্ন ছিলেন। তাই, তিনি শিশু চৈতন্য মহাপ্রভুকে নানা রকম অলংকার উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভুর ঋণ শোধ করার জন্য কমলাকান্ত বিশ্বাস যে জগন্নাথ পুরীর রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে তিনশো টাকা চেয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, এই রকম একজন ধনী ব্যক্তি, যিনি নানা রকম মূল্যবান অলংকার, শাড়ি প্রভৃতি উপহার দিতে পারেন, অথচ তাঁর পক্ষে তিনশো টাকার ঋণ শোধ করাও বেশ কঠিন ছিল। অতএব বুঝতে হবে যে, সেই সময় টাকার মূল্য এখনকার থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি ছিল। এখন তিনশো টাকার ঋণ শোধ করতে কেউই অসুবিধা বোধ করেন না, আর সাধারণ মানুষেরাও এত সমস্ত মূল্যবান অলংকার বন্ধুর পুত্রকে উপহার দেন না। তখনকার তিনশো টাকা হয়ত এখনকার ত্রিশ হাজার টাকার মতো ছিল।

শ্লোক ১১৪

দুর্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি' সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

দুর্বা, ধান, গোরোচন, হরিদ্রা, কুমকুম, চন্দন আদি নানা রকম মঙ্গল দ্রব্যে পাত্র ভরে এবং বহুবিধ বস্ত্র ও অলংকার একটি বড় বাক্সে ভরে, কাপড়ে ঢাকা পাল্কিতে চড়ে, দাসীসহ সীতা ঠাকুরাণী জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে এলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বস্ত্র-গুপ্ত দোলা* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা পাল্কিতে চড়ে নিকটবর্তী স্থানে যেতেন। পাল্কি কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকত এবং জনসাধারণ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দেখতে পেতেন না। গ্রামাঞ্চলে এখনও এই প্রথা প্রচলিত রয়েছে। সংস্কৃত *অসূর্যম্পশ্যা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা সূর্য পর্যন্ত দেখতে পান না। প্রাচ্য সংস্কৃতিতে এই প্রথাটি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের সম্ভ্রান্ত মহিলারাই নিষ্ঠাভরে তা অনুশীলন করতেন। আমাদের শৈশবে আমরা দেখেছি যে, আমাদের মা পাশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থেও পায়ে হেঁটে যেতেন না; তিনি গাড়িতে অথবা পাল্কিতে যেতেন। পাঁচশো বছর আগে এই প্রথা নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হত এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত অদ্বৈত আচার্যের পত্নী প্রচলিত সমাজবিধি যথাযথভাবে পালন করেছিলেন।

শ্লোক ১১৫

ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত ।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সীতা ঠাকুরাণী যখন নানাবিধ আহার্য, বসন-ভূষণ ও অন্যান্য উপহার নিয়ে শচীদেবীর গৃহে এলেন, তখন নবজাত শিশুটিকে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন, কেন না তিনি দেখলেন যে, অঙ্গের বর্ণ ব্যতীত সেই শিশুটি ঠিক গোকুলের কৃষ্ণের মতো দেখতে।

তাৎপর্য

পেটারি হচ্ছে এক প্রকার বড় সাজি বা ডালা। একটি দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটি সাজি লাগানো

থাকে এবং তা কাঁধে করে বহন করা হয়। যারা এই ভার বহন করে, তাদের বলা হয় ভারী। ভারীর ভার বহন করার এই পদ্ধতি এখনও ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে প্রচলিত রয়েছে। আমি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এই পদ্ধতিটি প্রচলিত থাকতে দেখেছি।

শ্লোক ১১৬

সর্ব অঙ্গ—সুনির্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময় ।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শিশুটির প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে গঠিত, সর্বাঙ্গ সুলক্ষণযুক্ত এবং তাঁর অঙ্গকান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো—ঠিক যেন একটি সোনার প্রতিমা। সেই জ্যোতির্ময় শিশুটিকে দেখে সীতা ঠাকুরাণী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বাৎসল্য রসে পূর্ণ হয়ে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হল।

শ্লোক ১১৭

দুর্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই ।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শিশুটির মস্তকে ধান-দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা দুভাই চিরজীবী হও।" ডাকিনী, শাঁখিনীরা এই শিশুটির কোনও অনিষ্ট করতে পারে বলে মনে ভয় পেয়ে, তিনি সেই শিশুটির নাম রাখলেন নিমাই।

তাৎপর্য

ডাকিনী ও *শাঁখিনী* হচ্ছে শিব ও তাঁর পত্নীর দুই সহচরী এবং তারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে বলে অত্যন্ত অমঙ্গলকারিণী। এই সমস্ত অশুভ জীবেরা নিমগাছের কাছে যেতে পারে না বলে মনে করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হয় যে, নিমগাছের প্রবল বীজাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে এবং পূর্বকালে গৃহে নিমগাছ লাগানোর প্রথা ছিল। ভারতবর্ষে বড় বড় রাস্তার পাশে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে হাজার হাজার নিমগাছ দেখা যায়। নিমগাছের পচন নিবারণ ক্ষমতা এত যে, আয়ুর্বেদি শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের জন্য তা ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা নিমগাছের নির্যাস আহরণ করার উপায়

উদ্ভাবন করেছেন। এই নির্যাসকে বলা হয় মারগোসিক অ্যাসিড (Margosic Acid)। বিভিন্নভাবে নিমের ব্যবহার হয়, বিশেষ করে দাঁত মাজার জন্য। ভারতের গ্রামগুলিতে শতকরা প্রায় নব্বইজন মানুষ নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজে। নিমগাছের সব রকম পচন নিবারণ এবং বীজাণুনাশক ক্ষমতার জন্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু নিমগাছের নীচে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই সীতা ঠাকুরাণী তাঁর নাম রেখেছিলেন নিমাই। পরবর্তীকালে তাঁর যৌবনে তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে সকলেই তাঁকে সেই নামে ডাকত, যদিও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বম্ভর।

শ্লোক ১১৮

পুত্রমাতা-স্নানদিনে, ছিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি' ।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

যে দিন মাতা ও পুত্র স্নান করে সূতিকাগৃহ ত্যাগ করলেন, সেই দিন সীতা ঠাকুরাণী তাঁদের নানা রকম বস্ত্র ও অলংকার দান করেছিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রকে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের পূজা গ্রহণ করে, অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে তিনি ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিশুর জন্মের পাঁচ দিন পরে অথবা নয় দিন পরে মাতা গঙ্গায় স্নান করেন অথবা অন্য কোন পবিত্র স্থানে স্নান করেন। এটিকে বলা হয় নিষ্ক্রামণ বা সূতিকাগৃহ থেকে বের হওয়ার অনুষ্ঠান। আজকাল সূতিকাগৃহ হচ্ছে হাসপাতাল, কিন্তু পূর্বে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত গৃহে একটি ঘর আলাদা করে রাখা হত, সেখানে প্রসূতি সন্তান প্রসব করতেন এবং শিশুর জন্মের নয় দিন পর মাতা নিষ্ক্রামণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি সংস্কার হচ্ছে নিষ্ক্রামণ। পূর্বে, বিশেষ করে বঙ্গে, উচ্চবর্ণের মানুষেরা শিশুর জন্মের চার মাস পর্যন্ত পৃথকভাবে থাকতেন। চার মাস পর মাতা প্রথমে সূর্যোদয় দর্শন করতেন। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের লোকেরা, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এই প্রথাটিকে সংক্ষিপ্ত করে একুশ দিন এবং শূদ্রদের জন্য ত্রিশ দিন করা হয়। কর্তাভজা ও সতীমা সম্প্রদায়ে সংকীর্তন সহকারে হরিলুট দিলে মাতা ও শিশু তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। পুত্রসহ শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রকে সীতা ঠাকুরাণী সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। তেমনই সীতা ঠাকুরাণী যখন গৃহে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র তাঁর পূজা করেছিলেন। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেটিই ছিল প্রথা।

শ্লোক ১১৯

ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই লক্ষ্মীপতি নারায়ণকে তাঁদের পুত্ররূপে পেয়ে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তাঁদের গৃহ সর্বদা ধন-ধান্যে পূর্ণ থাকত। সকলের পূজ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দিনে দিনে বর্ধিত হতে দেখে তাঁদের আনন্দও বর্ধিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই সকলেই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করত। এমন কি স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের বেশে সেখানে এসে, তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী তাঁদের অপ্রাকৃত পুত্রের সম্মান দর্শন করে অন্তরে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২০

মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি ছিলেন শান্ত, সংযত, শুদ্ধ ও দান্ত। তাই জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না। তাঁর অপ্রাকৃত পুত্রের প্রভাবে যা কিছু ধন-সম্পদ আসত, তা সবই তিনি শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রাহ্মণদের দান করতেন।

শ্লোক ১২১

লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মলগ্ন বিচার করে নীলাম্বর চক্রবর্তী গোপনে জগন্নাথ মিশ্রকে বললেন যে, শিশুটির জন্মলগ্নে ও দেহে মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণগুলি দেখা যাচ্ছে। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই শিশুটি জগৎ উদ্ধার করবে।

শ্লোক ১২২

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিনি তাঁর এই জন্মলীলা শ্রবণ করেন, তাঁর প্রতি দয়াময় গৌরপ্রভু অত্যন্ত সদয় হন এবং সেই ব্যক্তি তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেন।

শ্লোক ১২৩

পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

মনুষ্যজন্ম পাওয়া সত্ত্বেও যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন না করে, তার জন্ম ব্যর্থ হয়। অমৃতধুনী হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির অমৃতধারা। মনুষ্যজন্ম পাওয়া সত্ত্বেও সেই অমৃত পান না করে জড় সুখরূপ বিষগর্তের জল যে পান করে, তার পক্ষে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই, বরং তাঁর জন্য মরাই ভাল।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর *চৈতন্য-চন্দ্রামৃতে* (৩৭, ৩৬, ৩৪) নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি রচনা করেছেন—

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্ ।
ন বিদুঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥

"এই জড় জগৎ অচৈতন্যময়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন কৃষ্ণভাবনামৃতের মূর্ত বিগ্রহ। তাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অথবা বৈজ্ঞানিক যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বুঝতে না পারে, তা হলে অবশ্যই সে অর্থহীনভাবে এই জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

প্রসারিত-মহাপ্রেমপীযূষরস-সাগরে ।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকাশের ফলে যে মহা প্রেমামৃত রস সাগরের প্রসার হয়েছে, তাতে যে নিমজ্জিত হল না, সে অবশ্যই দীনতম থেকেও দীনতর।"

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে ।
সুপ্রকাশিত রত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণ ঠিক ভগবৎ-প্রেমামৃতের সাগরের মতো। সেই সাগর থেকে মূল্যবান মণিরত্ন যিনি সংগ্রহ করেন না, তিনি অবশ্যই দীন থেকেও দীনতর।"

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১৯, ২০, ২৩) বর্ণনা করা হয়েছে—

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু ।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥

"কৃষ্ণভাবনা-বিহীন কোন ব্যক্তি তথাকথিত মানব-সমাজে মহান ব্যক্তি বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে একটি বড় পশুর থেকে মঙ্গলকর নয়। এই ধরনের বড় পশুরা সাধারণত কুকুর, শূকর, উট ও গাধাদের দ্বারা পূজিত হয়। যে মানুষ তার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে না, বুঝতে হবে যে, তার কর্ণরন্ধ্র-দুটি মাঠের মধ্যে দুটি গর্তের মতো। তার জিহ্বা ঠিক ব্যাঙের জিহ্বার মতো, যা অর্থহীন কোলাহল সৃষ্টি করে মৃত্যুরূপী সর্পকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনে। তেমনই, যে মানুষ মহাভাগবতের চরণরেণু গ্রহণ করে না এবং ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীদলের ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, সে জীবিত অবস্থায়ও মৃত।"

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১/৪) বর্ণনা করা হয়েছে—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥

"পশুঘাতী বা আত্মঘাতী ছাড়া কে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করবে না? জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত পুরুষেরা ভগবানের এই মহিমা-কীর্তন শ্রবণ করে আনন্দিত হন।"

তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৩/২৩/৫৬) বর্ণনা করা হয়েছে, *ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ*—"কেউ যদি মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের সেবা না করে, তা হলে আপাতদৃষ্টিতে তাকে জীবিত বলে মনে হলেও বুঝতে হবে যে, সে মৃত।"

শ্লোক ১২৪

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

আমার নিজধন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, আচার্য অদ্বৈতচন্দ্র, স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে ধারণ করে, আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মলীলা বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, স্বরূপ দামোদর, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং তাঁদের সমস্ত অনুগামীদের স্বীকার করেছেন। যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তিনি ভগবান এবং উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তদের শ্রীপাদপদ্মকে তাঁর নিজ ধন বলে মনে করেন। জড় বিষয়াসক্ত মানুষদের জড় ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য সবই মায়িক। প্রকৃতপক্ষে তা সম্পদ নয়, তা হচ্ছে বন্ধন, কেন না জড় জগৎকে ভোগ করতে গিয়ে বদ্ধ জীব গভীর থেকে গভীরতর ভাবে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত, বদ্ধ জীব যে-সম্পত্তি আহরণ করতে গিয়ে তাকে ঋণগ্রস্ত হতে হয়েছে, সেটি তার নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে এবং সে এই ধরনের সম্পত্তি সংগ্রহে অত্যন্ত ব্যগ্র। কিন্তু ভক্ত এই ধরনের সম্পত্তিকে প্রকৃত সম্পত্তি বলে মনে না করে, এগুলিকে কেবল জড় জগতের বন্ধন বলে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করে নেন, যে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৮/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ*—"আমার ভক্তকে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আমি তার সমস্ত জড় সম্পদ হরণ করে নিই।" তেমনই, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

ধন মোর নিত্যানন্দ, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
সেই মোর প্রাণধন ।

"আমার প্রকৃত সম্পদ হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীচরণ।" তিনি তাঁর প্রার্থনায় আরও বলেছেন, "হে ভগবান! দয়া করে তুমি আমাকে এই সম্পদ দান কর, তোমার শ্রীপাদপদ্মরূপ সম্পদ ছাড়া আমি যেন আর কিছু না চাই।" শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর অনেক জায়গায় গেয়েছেন যে, তাঁর প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা অনিত্য সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাই প্রকৃত সম্পদকে অবহেলা করছি (*অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু*)।

স্মার্তরা কখনও কখনও রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শূদ্র বলে মনে করে। কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—*স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।* তাই যিনি রঘুনাথ দাসের অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্ম সব রকম সমাজ-ব্যবস্থার অতীত বলে জানেন, তিনিই প্রকৃত চিন্ময় আনন্দের ধন উপভোগ করেন।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মলীলা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* এই পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করে লিখেছেন—"*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* এই চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হামাগুড়ি দিয়ে, ক্রন্দন করে, মাটি খেয়ে, তাঁর মাকে বুদ্ধি দিয়ে, অতিথি ব্রাহ্মণকে কৃপা করে, দুটি চোরের স্কন্ধে আরোহণ করে এবং তাদের পথ ভুলিয়ে আবার তাঁর নিজের বাড়ির সামনে নিয়ে এসে এবং রোগের ছলে একাদশীর দিনে হিরণ্য ও জগদীশের নিবেদিত বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করে তাঁর বাল্যলীলা বিলাস করেছিলেন। এই পরিচ্ছেদে আরও বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে তিনি এক দুরন্ত বালকরূপে লীলাবিলাস করেছিলেন, কিভাবে তাঁর মা মূর্ছা গেলে তিনি তাঁর মাথায় করে তাঁকে নারকেল এনে দিয়েছিলেন, কিভাবে তিনি গঙ্গার তীরে সমবয়সী বালিকাদের সঙ্গে পরিহাস করেছিলেন, কিভাবে তিনি শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিভাবে তিনি উচ্ছিষ্ট ফেলার স্থানে বসে তাঁর মাকে দিব্যজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, কিভাবে মায়ের আদেশে তিনি সেই অশুচি স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কিভাবে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর পিতার সঙ্গে আচরণ করেছিলেন।"

শ্লোক ১

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ॥ ১ ॥

কথঞ্চন—কোন না কোনভাবে; **স্মৃতে**—স্মরণ করার ফলে; **যস্মিন্**—যাঁকে; **দুষ্করম্**—দুষ্কর; **সুকরম্**—সহজসাধ্য; **ভবেৎ**—হয়; **বিস্মৃতে**—তাঁকে ভুলে গেলে; **বিপরীতম্**—বিপরীত; **স্যাৎ**—হয়; **শ্রীচৈতন্যম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **নমামি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তম্**—তাঁকে।

অনুবাদ

যাঁকে কোন না কোনভাবে স্মরণ করলে অত্যন্ত কঠিন কাজও সহজসাধ্য হয় এবং যাঁকে ভুলে গেলে ঠিক তার উল্টো হয়, অর্থাৎ অত্যন্ত সহজ কাজও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, "ভগবানের অতি অল্প কৃপা লাভ করলেও জীব এত উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হন যে, তখন তিনি জ্ঞানীদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিরও পরোয়া করেন না। তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত স্বর্গ লাভকেও নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে করেন। তিনি সব রকমের যোগসিদ্ধিকে হেলা ভরে পরিত্যাগ করেন,

কেন না তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিষদাঁত ভাঙা সর্পের মতো।" বিষদাঁত আছে বলে সাপ অত্যন্ত ভীতিজনক ও ভয়ংকর, কিন্তু তার বিষদাঁত যদি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তা হলে আর কোন ভয় থাকে না। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করা, কেন না ইন্দ্রিয়গুলি বিষধর সর্পের মতো ভয়ংকর। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর ইন্দ্রিয়রূপ সর্পের বিষদাঁতগুলি ভেঙ্গে গেছে। সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা।

হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করার ফলে অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও সহজবোধ্য হয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিস্মৃত হলে অত্যন্ত সহজবোধ্য বিষয়ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এই উক্তির সত্যতা আমরা উপলব্ধি করি যখন দেখি যে, তথাকথিত সমস্ত বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা, যারা জনসাধারণের চোখে অত্যন্ত মহান, তারা বুঝতে পারে না যে, জীবন আসে জীবন থেকে। কারণ, তারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা প্রচার করতে চায় যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, যদিও তাদের সেই অনুমান তারা শত চেষ্টা করেও প্রমাণ করতে পারে না। আধুনিক সভ্যতা তাই ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে। তার ফলে কেবল সমস্যারই সৃষ্টি হচ্ছে, যা তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা সমাধান করতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হয়েছেন যাতে তিনি তাঁর বাল্যলীলা বর্ণনা করতে পারেন, কেন না অনুমান করে অথবা কল্পনা করে এই ধরনের অপ্রাকৃত সাহিত্য রচনা করা যায় না। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে লেখেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেছেন। কেবল বইপড়া বিদ্যা দিয়ে এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়।

শ্লোক ৩

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র ।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে শচীমাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন, তাঁর এই জন্মলীলা আমি সূত্রের আকারে বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর এই বর্ণনা প্রতিপন্ন করে বলেছেন যে, এখন যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শচীমাতার পুত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন—

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।

শচীমাতার পুত্র নিমাই হচ্ছেন নন্দ মহারাজ ও যশোদা মায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, আর নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন বলরাম।"

শ্লোক ৪

সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম ।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

আমি ক্রম অনুসারে সংক্ষেপে জন্মলীলা বর্ণনা করেছি। এখন আমি সূত্রের আকারে তাঁর বাল্যলীলা বর্ণনা করব।

শ্লোক ৫

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্ ।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ৫ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; **চৈতন্য-কৃষ্ণস্য**—যিনি হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **বাল্য-লীলাম্**—বাল্যলীলা; **মনোহরাম্**—যা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর; **লৌকিকীম্**—যা সাধারণ বলে মনে হয়; **অপি**—যদিও; **তাম্**—সেগুলি; **ঈশ-চেষ্টয়া**—পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা; **বলিত-অন্তরাম্**—ভিন্নরূপে প্রতিভাত হলেও যথার্থভাবে উপযুক্ত।

অনুবাদ

আমি শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বাল্যলীলা বন্দনা করি। যদিও এই সমস্ত লীলাবিলাস একজন সাধারণ শিশুর কার্যকলাপের মতো প্রতিভাত হয়, তবুও বুঝতে হবে যে, সেগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অলৌকিক লীলাবিলাস।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) বলা হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥

"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খরা আমাকে অবজ্ঞা করে। সব কিছুর পরম ঈশ্বররূপে আমার পরম ভাব তারা জানে না।" পরমেশ্বর ভগবান এই পৃথিবীতে

অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলাবিলাস করার জন্য একজন সাধারণ মানুষের মতো বা একটি মানবশিশুর মতো নিজেকে প্রকাশ করেন, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর পরম ঈশ্বরত্ব বজায় রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ একটি সাধারণ মানবশিশুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু একটি শিশুরূপেও তাঁর কার্যকলাপ ছিল অলৌকিক। পূতনা রাক্ষসীকে বধ করা অথবা গিরি গোবর্ধন ধারণ করা সাধারণ শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও একজন সাধারণ মানবশিশুর মতো তাঁর বাল্যলীলা বিলাস করলেও, সেই ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করা কোন মানব-শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কথা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৬

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন ।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর প্রথম বাল্যলীলায় ভগবান যখন বিছানায় শুয়ে উপুড় হওয়ার লীলা করেছিলেন, তখন সেই লীলার ছলে তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে তাঁর চরণচিহ্ন প্রদর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

উত্তান শব্দে 'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাকে বোঝায় অথবা উপুড় হয়ে শোওয়াকে বোঝায়।' কোথাও কোথাও *উত্থান* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'উঠে দাঁড়ানো'। তাঁর বাল্যলীলায় ভগবান দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু একটি সাধারণ শিশু যেমন সেই চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যায়, তেমনই ভগবানও পড়ে যেতেন এবং পড়ে গিয়ে শুয়ে থাকতেন।

শ্লোক ৭

গৃহে দুই জন দেখি লঘুপদ-চিহ্ন ।
তাহে শোভে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের শৈশব লীলায় কখনও কখনও তাঁদের ঘরে তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর চরণের ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র ও মীন সমন্বিত ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখতে পেতেন।

শ্লোক ৮

দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময় ।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেগুলি কার পায়ের ছাপ এই কথা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তার ফলে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়ে, কিভাবে এই পায়ের ছাপ তাঁদের ঘরে এল, তা তাঁরা ভাবতে লাগলেন।

শ্লোক ৯

মিশ্র কহে,—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে ।
তেঁহো মূর্তি হঞা ঘরে খেলে, জানি, রঙ্গে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র বললেন, "শালগ্রাম শিলার সঙ্গে বালগোপাল রয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই মূর্ত হয়ে ঘরে খেলা করেছেন।"

তাৎপর্য

শালগ্রাম শিলা অথবা কাঠ, পাথর, ধাতু কিংবা যে কোন বস্তু দিয়ে তৈরি ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন বলে জানতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেও আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্ত জড় উপাদানগুলি হচ্ছে ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। যেহেতু ভগবানের শক্তি ও ভগবান স্বয়ং অভিন্ন, তাই ভগবান সর্বদাই তাঁর শক্তিতে বিরাজমান, তবে ভক্তের বিশেষ বাসনার ফলে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন। ভগবান যেহেতু সর্ব শক্তিমান, তাই তিনি তাঁর শক্তিতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। শ্রীবিগ্রহের পূজা অথবা শালগ্রাম শিলার পূজা মূর্তিপূজা নয়। শুদ্ধ ভক্তের গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং ভগবানের মতোই আচরণ করে থাকেন।

শ্লোক ১০

সেই ক্ষণে জাগি' নিমাঞি করয়ে ক্রন্দন ।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা আর জগন্নাথ মিশ্র যখন বিস্মিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন শিশু নিমাই জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেন, তাই শচীমাতা তাঁকে কোলে নিয়ে স্তন পান করান।

শ্লোক ১১

স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল ।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি' মিশ্রে বোলাইল ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা যখন শিশুটিকে স্তন পান করাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর পুত্রের চরণে সেই সমস্ত চিহ্নগুলি দেখতে পেলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রকে ডেকে সেই চিহ্নগুলি দেখালেন।

শ্লোক ১২

দেখিয়া মিশ্রের হইল আনন্দিত মতি ।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্তী ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পুত্রের পায়ে সেই চিহ্নগুলি দর্শন করে জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গোপনে নীলাম্বর চক্রবর্তীকে ডাকলেন।

শ্লোক ১৩

চিহ্ন দেখি' চক্রবর্তী বলেন হাসিয়া ।
লগ্ন গণি' পূর্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই চিহ্নগুলি দেখে মৃদু হেসে নীলাম্বর চক্রবর্তী বললেন, "লগ্ন গণনা করে পূর্বেই আমি সব লিখে রেখেছি।

শ্লোক ১৪

বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ ।
এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাপুরুষের অঙ্গে বত্রিশটি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় এবং এই শিশুটির অঙ্গেও আমি সেই সব কয়টি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

শ্লোক ১৫

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ১৫ ॥

পঞ্চ-দীর্ঘঃ—পাঁচটি দীর্ঘ; **পঞ্চ-সূক্ষ্মঃ**—পাঁচটি সূক্ষ্ম; **সপ্ত-রক্তঃ**—সাতটি রক্তবর্ণ; **ষট্-উন্নতঃ**—ছয়টি উন্নত; **ত্রি-হ্রস্ব**—তিনটি ছোট; **পৃথু**—তিনটি প্রশস্ত; **গম্ভীরঃ**—তিনটি গম্ভীর; **দ্বা-ত্রিংশৎ**—এভাবেই বত্রিশটি; **লক্ষণঃ**—লক্ষণ; **মহান্**—মহাপুরুষের।

অনুবাদ

" 'মহাপুরুষের অঙ্গে বত্রিশটি লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলি হচ্ছে—তাঁর দেহের পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ, পাঁচটি সূক্ষ্ম, সাতটি রক্তবর্ণ, ছয়টি উন্নত, তিনটি হ্রস্ব, তিনটি প্রশস্ত এবং তিনটি গম্ভীর।'

তাৎপর্য

মহাপুরুষের দেহের পাঁচটি দীর্ঘ অঙ্গ হচ্ছে নাসিকা, বাহু, চিবুক, চক্ষু ও হাঁটু। পাঁচটি সূক্ষ্ম অঙ্গ হচ্ছে ত্বক, অঙ্গুলিপর্ব, দাঁত, লোম ও চুল। সাতটি রক্তিম অঙ্গ হচ্ছে চক্ষু, পায়ের তালু, হাতের তালু, নখ, অধর ও ওষ্ঠ। ছয়টি উন্নত অঙ্গ হচ্ছে বুক, কাঁধ, নখ, নাক, কোমর ও মুখ। তিনটি হ্রস্ব অঙ্গ হচ্ছে গলা, উরু ও উপস্থ। তিনটি প্রশস্ত অঙ্গ

হচ্ছে কোমর, ললাট ও বক্ষ। তিনটি গম্ভীর অঙ্গ হচ্ছে নাভি, কণ্ঠস্বর ও সত্তা। এগুলি হচ্ছে মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ। *সামুদ্রিক* শাস্ত্র থেকে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৬

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ ।
এই শিশু সর্ব লোকে করিবে তারণ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শিশুটির শ্রীহস্ত ও চরণে নারায়ণের চিহ্নসমূহ রয়েছে। এই শিশুটি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করবে।

শ্লোক ১৭

এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার ।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শিশুটি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করবে এবং তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল উদ্ধার করবে।

তাৎপর্য

স্বয়ং নারায়ণ অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি ছাড়া কেউই বৈষ্ণবধর্ম বা ভগবদ্ভক্তি প্রচার করতে পারে না। যখন কোন বৈষ্ণবের জন্ম হয়, তখন তিনি তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল উদ্ধার করেন।

শ্লোক ১৮

মহোৎসব কর, সব বোলাহ ব্রাহ্মণ ।
আজি দিন ভাল,—করিব নামকরণ ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"মহোৎসবের আয়োজন কর এবং ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ কর। আজ আমি এঁর নামকরণ করব, কেন না আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা হচ্ছে নারায়ণ ও ব্রাহ্মণকে কেন্দ্র করে উৎসব করা। শিশুর নামকরণ দশবিধ সংস্কারের একটি সংস্কার এবং সেদিন নারায়ণের পূজা করে ও প্রসাদ বিতরণ করে, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিয়ে উৎসব পালন করা হয়।

যখন নীলাম্বর চক্রবর্তী, শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র মহাপ্রভুর পায়ের চিহ্নগুলি চিনতে পারলেন, তখন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিশু নিমাই কোন সাধারণ শিশু নয়, তিনি হচ্ছেন নারায়ণের অবতার। অতএব তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, সেই শুভ দিনটিতে

তাঁরা তাঁর নামকরণ উপলক্ষে মহোৎসব করবেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে তাঁর দেহের লক্ষণের মাধ্যমে, তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ভগবানের অবতার চেনা যায়। বিশেষ প্রমাণের দ্বারাই ভগবানের অবতারকে চিনতে হয়, মূর্খদের স্বীকৃতি অথবা খামখেয়ালীর বশে একজনকে ভগবান বললেই সে ভগবান হয়ে যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে বহু নকল অবতারের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু নিরপেক্ষ ভক্ত বা শিক্ষিত মানুষেরা বুঝতে পারেন যে, কতকগুলি মূর্খ লোকের কথায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকৃতি লাভ করেননি। যথার্থ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রপ্রমাণের মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন, তাঁরা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। প্রথমে তাঁর পরিচয় নিরূপিত হয় নীলাম্বর চক্রবর্তীর মতো তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতের মাধ্যমে এবং পরে শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রমুখ মহান পণ্ডিতেরা শাস্ত্রপ্রমাণের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন। ভগবানের অবতার তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই ভগবান। এমন নয় যে, যোগ অভ্যাস করার ফলে হঠাৎ কেউ ভগবানের অবতার হয়ে যায়। এই ধরনের অবতারেরা মূর্খদের দ্বারাই পূজিত হয়, কোন বিচক্ষণ মানুষ কখনও তাদের স্বীকৃতি দেয় না।

শ্লোক ১৯

সর্বলোকের করিবে ইহঁ ধারণ, পোষণ ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"ভবিষ্যতে এই শিশুটি সমস্ত জগৎকে রক্ষা করবে এবং পালন করবে। তাই তাঁর নাম বিশ্বম্ভর।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর আবির্ভাবের ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত জগৎকে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করেছিলেন, ঠিক যেমন পূর্বে নারায়ণ বরাহরূপে এই পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। যেহেতু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই কলিযুগে পৃথিবীকে রক্ষা করছেন এবং পালন করছেন, তাই তাঁর নাম হচ্ছে বিশ্বম্ভর, অর্থাৎ যিনি সমগ্র বিশ্বকে পালন করেন। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, আজ তা সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার ফল আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের প্রভাবে মানুষ রক্ষা পাচ্ছে, আশ্রয় লাভ করছে এবং পালিত হচ্ছে। হাজার হাজার অনুগামী, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের যুব-সম্প্রদায় এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে এবং তারা যে কত সুখী ও কত নিরাপত্তা অনুভব করছে, তা বোঝা যায় আমার কাছে লেখা তাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হাজার হাজার চিঠির মাধ্যমে। *অথর্ববেদ-সংহিতায়ও* (৩/৩/১৬/৫) বিশ্বম্ভর নামটির উল্লেখ রয়েছে—*বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা।*

শ্লোক ২০

শুনি' শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল ।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি' মহোৎসব কৈল ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের মনে মহা আনন্দ হল এবং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁরা মহোৎসব করলেন।

তাৎপর্য

জন্মদিন, বিবাহ-অনুষ্ঠান, নামকরণ-অনুষ্ঠান, হাতেখড়ি প্রভৃতি উপলক্ষে ব্রাহ্মণদের ডেকে এনে মহোৎসব করা একটি বৈদিক প্রথা। সমস্ত উৎসবে প্রথমে ব্রাহ্মণদের ভোজন করানো হয় এবং ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হলে তাঁরা বৈদিক মন্ত্র বা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

শ্লোক ২১

তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ ।
নানা চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

তার কয়েকদিন পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন এবং নানা রকম আশ্চর্য বিষয় দর্শন করালেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

জানু-গতি চলে প্রভু পরম-সুন্দর ।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥
পরম-নির্ভয়ে সর্ব-অঙ্গনে বিহরে ।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাই ধরে ॥
একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায় ।
ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক-লীলায় ॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া ।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া ॥
আথে-ব্যথে সবে দেখি' 'হায়, হায়' করে ।
শুনিয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥
'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে সর্বজন ।
পিতামাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥
চলিলা 'অনন্ত' শুনি সবার ক্রন্দন ।
পুনঃ ধরিবারে যা'ন শ্রীশচীনন্দন ॥

শ্লোক ২২

ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম ।
নারী সব 'হরি' বলে,—হাসে গৌরধাম ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রন্দনের ছলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত নারীদের দিয়ে হরিনাম করালেন এবং তাঁরা যখন হরিনাম করছিলেন, তখন মহাপ্রভু হাসছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন ।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ ॥
পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন ।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥
প্রভু যেই কান্দে, সেইক্ষণে নারীগণ ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্তন ॥
শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে ।
বিশেষে সকল-নারী হরিধ্বনি করে ॥
নিরবধি সবার বদনে হরিনাম ।
ছলে বোলায়েন প্রভু,—হেন ইচ্ছা তান ॥

শ্লোক ২৩

তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ ।
শিশুগণে মিলি' কৈল বিবিধ খেলন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার কয়েকদিন পর মহাপ্রভু তাঁর পদ সঞ্চালন করে হাঁটতে শুরু করলেন এবং অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি বিবিধ খেলা খেলতে লাগলেন।

শ্লোক ২৪

একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া ।
বাটা ভরি' দিয়া বৈল,—খাও ত' বসিয়া ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন মহাপ্রভু যখন অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিলেন, তখন শচীমাতা একটি বাটিতে করে খই ও সন্দেশ নিয়ে এসে তাঁকে বসে খেতে বললেন।

শ্লোক ২৫

এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম করিতে ।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু এই বলে শচীমাতা যখন গৃহকর্ম করতে গেলেন, তখন শিশুটি লুকিয়ে লুকিয়ে মাটি খেতে লাগলেন।

শ্লোক ২৬

দেখি' শচী ধাঞা আইলা করি' 'হায়, হায়' ।
মাটি কাড়ি' লঞা কহে 'মাটি কেনে খায়' ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

তা দেখে শচীমাতা 'হায়, হায়' করতে করতে সেখানে ছুটে এলেন এবং মহাপ্রভুর হাত থেকে মাটি কেড়ে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি মাটি খাচ্ছেন।

শ্লোক ২৭

কান্দিয়া বলেন শিশু,—কেনে কর রোষ ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

কাঁদতে কাঁদতে শিশু নিমাই তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা! তুমি কেন আমার ওপর রাগ করছ? তুমিই তো আমাকে মাটি খেতে দিলে। তাতে আমার কি দোষ?

শ্লোক ২৮

খই-সন্দেশ-অন্ন, যতেক—মাটির বিকার ।
এহো মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"খই, সন্দেশ অথবা যে কোন খাদ্যদ্রব্যই তো মাটির বিকার। এও মাটি, আর সেও মাটি। সুতরাং তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্লোক ২৯

মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি' ।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই দেহ হচ্ছে মাটির বিকার এবং খাদ্যদ্রব্যও মাটির বিকার। এই সম্বন্ধে দয়া করে একটু বিচার করে দেখ। কোন রকম বিচার না করেই তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ। সুতরাং আমি আর কি বলতে পারি?"

তাৎপর্য

এটি হচ্ছে মায়াবাদীদের দর্শন, যাতে সব কিছুকেই এক বলে মনে করা হয়। দেহের প্রয়োজনগুলি, যথা—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পারমার্থিক জীবনে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কেউ যখন চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন, তখন আর দেহের প্রয়োজনগুলি থাকে না, আর দেহকেন্দ্রিক যে সমস্ত কার্যকলাপ, তাতে পারমার্থিক বিচার থাকে না। পক্ষান্তরে, যত বেশি করে খাওয়া হয়, ঘুমানো হয়, মৈথুন করা হয় এবং আত্মরক্ষা করা হয়, ততই বেশি করে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত, মায়াবাদীরা ভগবদ্ভক্তিকে দেহের কার্যকলাপ বলে মনে করে। তারা *ভগবদ্গীতার* (১৪/২৬) সরল বিশ্লেষণটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"কেউ যখন নিষ্কামভাবে ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন এবং তখন তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই চিন্ময় বা অপ্রাকৃত।" এখানে *ব্রহ্মভূয়ায়* বলতে ব্রহ্মভূত (চিন্ময়) কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে। মায়াবাদীরা যদিও ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়, তবুও তাদের কার্যকলাপ ব্রহ্মভূত নয়। তাদের মতে ব্রহ্মভূত কার্যকলাপ হচ্ছে বেদান্তপাঠ ও সাংখ্য-দর্শনের আলোচনা, কিন্তু তাদের সেই বিষয়ের বিশ্লেষণগুলি হচ্ছে নীরস জল্পনা-কল্পনা মাত্র। কেবলমাত্র বেদান্ত অথবা সাংখ্যদর্শন আলোচনা করে তারা দীর্ঘকাল সেই স্তরে থাকতে পারে না, কেন না তাতে চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই।

জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা। জীব স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দ চায়। সেই কথা *বেদান্তসূত্রে* (১/১/১২) বলা হয়েছে—*আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ*। ভগবদ্ভক্তিতে সমস্ত কার্যকলাপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/২) বলা হয়েছে—সমস্ত রকমের ভগবদ্ভক্তি অত্যন্ত সহজসাধ্য *(সুসুখং কর্তুম্)* এবং তা নিত্য ও চিন্ময় *(অব্যয়ম্)*। যেহেতু মায়াবাদীরা সেই কথা বুঝতে পারে না, তাই তারা মনে করে যে, ভক্তদের কার্যকলাপ (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্* প্রভৃতি) জড় এবং সেহেতু তা মায়া। তারা মনে করে যে, এই জগতে কৃষ্ণের অবতরণ এবং তাঁর লীলাবিলাসও মায়া। সুতরাং, যেহেতু তারা সব কিছুকে মায়া বলে মনে করে, তাই তাদেরকে মায়াবাদী বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, সদ্গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সম্পাদিত সমস্ত কার্যকলাপই চিন্ময়। কিন্তু যে মানুষ গুরুর নির্দেশ অবজ্ঞা করে নিজের খেয়ালখুশি

তা কার্য করে এবং মনে করে যে, তার অর্থহীন কার্য-কলাপগুলি পারমার্থিক, সেটি হ মায়া। সদ্গুরুর কৃপার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করতে হয়। তাই প্রথমে গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করতে হয় এবং তিনি প্রসন্ন হলে, পরমেশ্বর ভগবানও প্রসন্ন হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। কিন্তু গুরুদেব যদি আমাদের ক্রিয়াকলাপে অপ্রসন্ন তা হলে সেই সমস্ত ক্রিয়া চিন্ময় নয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই সম্বন্ধে লেছেন—*যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি*। যে সমস্ত কার্যকলাপ গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধান করে তা অবশ্যই চিন্ময় এবং বুঝতে হবে যে, সেই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে।

পরম গুরুদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে মায়াবাদ দর্শনের কথা বলেছিলেন। দেহ মাটি এবং খাদ্যদ্রব্যও মাটি, এই কথা বলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, সব কিছুই মায়া। এটিই হচ্ছে মায়াবাদ দর্শন। মায়াবাদীদের দর্শন ভ্রান্ত, কেন না তাদের বিচারে তাদের অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া আর সবই মায়া। সব কিছুই মায়া বলে মনে করে মায়াবাদীরা ভগবানের সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার ফলে তাদের সর্বনাশ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, *মায়াবাদি ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৬/১৬৯)। কেউ যদি মায়াবাদ দর্শন গ্রহণ করে, তা হলে তার পারমার্থিক প্রগতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।

শ্লোক ৩০

অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে ।
"মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শিশুকে এভাবেই মায়াবাদ দর্শনের কথা বলতে দেখে, শচীমাতা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোকে এই মাটি খাওয়ার জ্ঞানযোগ কে শেখাল?"

তাৎপর্য

মা ও ছেলের মধ্যে যখন এই দার্শনিক আলোচনা হচ্ছিল, তখন ছেলে বলেছিলেন, নির্বিশেষবাদীরা বলে যে সব কিছুই এক, কিন্তু মা উত্তর দিয়েছিলেন, "সব কিছুই যদি এক হয়, তা হলে মানুষ মাটি না খেয়ে মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য খায় কেন?"

শ্লোক ৩১

মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয় ।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শিশু দার্শনিকের মায়াবাদ সম্বন্ধে ধারণার কথা শুনে শচীমাতা উত্তর দিলেন, "মাটির বিকার অন্ন খেয়ে আমাদের দেহের পুষ্টি হয়। কিন্তু মাটি খেলে, দেহ পুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে শুধু রোগগ্রস্তই হয় এবং তার ফলে দেহ ক্ষয় হয়ে যায়।

শ্লোক ৩২

মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি ।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি' যায় পানি ॥" ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"মাটির বিকার ঘটে আমরা জল ভরে আনি। কিন্তু মাটির পিণ্ডে যদি জল ঢালা হয়, তা হলে তা জল শুষে নেয় এবং তার ফলে আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়।"

তাৎপর্য

শচীমাতা স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর এই সরল দর্শন মায়াবাদীদের সমস্ত অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে তাদের পরাস্ত করেছে। মায়াবাদ দর্শনের ত্রুটি হচ্ছে যে, তারা বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একান্ত দরকার। শচীমাতা দৃষ্টান্ত দিলেন যে, যদিও মাটির ঘট আর মাটির পিণ্ড একই বস্তু, কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োগ অনুসারে মাটির ঘটটি প্রয়োজনীয় এবং মাটির পিণ্ড নিষ্প্রয়োজন। অনেক সময় বৈজ্ঞানিকেরা তর্ক করে যে, জড় ও চেতন এক এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বাস্তবিকপক্ষে, উচ্চতর বিচারে জড় ও চেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে আমাদের বুঝতে হবে যে, জড় পদার্থ নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু চেতন উৎকৃষ্ট হওয়ার ফলে আনন্দময়। এই সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভাগবতে* দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, মাটি ও অগ্নি প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন। মাটি থেকে গাছ জন্মায় এবং সেই গাছের কাঠ থেকে আগুন ও ধোঁয়া পাওয়া যায়। তবুও, আগুন থেকেই তাপ পাওয়া যায়—মাটি, কাঠ অথবা ধোঁয়া থেকে নয়। সুতরাং, জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চরম উপলব্ধির জন্য আমরা চেতন আত্মার সম্পর্ক খুঁজি, শুষ্ক কাঠ অথবা জড় মৃত্তিকার নয়।

শ্লোক ৩৩

আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে ।
"আগে কেন ইহা, মাতা, না শিখালে মোরে ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "মা আগে কেন এই তত্ত্ব তুমি আমাকে শেখাওনি?

তাৎপর্য

জীবনের শুরু থেকেই যদি দ্বৈতবাদ সমন্বিত বৈষ্ণব দর্শন শেখানো হয়, তা হলে অদ্বৈতবাদ তাকে বিচলিত করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে, সব কিছুই পরম উৎস (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মূল শক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক যেমন সূর্যের মূল শক্তি সূর্যকিরণ আলোক ও তাপের বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। যদিও আলোক

ও তাপকে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তবুও কেউ বলতে পারে না যে, তাপ হচ্ছে আলোক অথবা আলোক হচ্ছে তাপ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন হচ্ছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব, অর্থাৎ অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদতত্ত্ব। তাপ ও আলোকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও, তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তেমনই, যদিও সমস্ত জড় সৃষ্টিই হচ্ছে ভগবানের শক্তি, তবুও সেই শক্তি বিবিধ বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

এবে সে জানিলাঙ, আর মাটি না খাইব ।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥" ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আমি যখন এই তত্ত্ব বুঝতে পেরেছি, তখন আমি আর মাটি খাব না। যখনই আমার খিদে পাবে, তখন আমি তোমার স্তন পান করব।"

শ্লোক ৩৫

এত বলি' জননীর কোলেতে চড়িয়া ।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা বলে মহাপ্রভু তাঁর মায়ের কোলে চড়ে ঈষৎ হেসে তাঁর স্তন পান করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৬

এইমতে নানা-ছলে ঐশ্বর্য দেখায় ।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই নানা ছলে শ্রীভগবান বাল্যলীলায় তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন এবং এই প্রকার ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার পর তিনি তাঁর স্বরূপ লুকিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার ।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় মহাপ্রভু তিন তিনবার এক ব্রাহ্মণ অতিথির ভগবানকে নিবেদিত ভোগ খেয়ে ফেলেছিলেন এবং তারপর গোপনে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

সেই ব্রাহ্মণটি কিভাবে মুক্ত হয়েছিল, তা বর্ণিত হচ্ছে। এক ব্রাহ্মণ, যিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি এক সময় নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের অতিথি হন। জগন্নাথ মিশ্র তাঁকে রন্ধন করার সমস্ত সামগ্রী দেন এবং ব্রাহ্মণ তখন রন্ধন করেন। সেই ব্রাহ্মণ যখন ধ্যানে শ্রীবিষ্ণুকে ভোগ নিবেদন করছিলেন, তখন শিশু নিমাই সেখানে এসে ভোগ খেতে শুরু করেন এবং তার ফলে ব্রাহ্মণ মনে করেন যে, সেই নৈবেদ্য নষ্ট হয়ে গেছে। তাই, জগন্নাথ মিশ্রের অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার রন্ধন করেন, কিন্তু তিনি যখন ধ্যানে সেই ভোগ ভগবানকে নিবেদন করছিলেন, তখন শিশু নিমাই সেখানে এসে আবার সেই অন্ন খেতে শুরু করেন এবং তার ফলে পুনরায় তিনি সেই নৈবেদ্য নষ্ট করে দেন। বিশ্বরূপের অনুরোধে ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার রন্ধন করেন এবং মহাপ্রভুকে যদিও অর্গলবদ্ধ অবস্থায় একটি ঘরে রাখা হয়েছিল এবং সকলেই তখন ঘুমিয়েছিলেন, তবুও মহাপ্রভু সেখানে এসে সেই নৈবেদ্য খেতে শুরু করেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে 'হায়, হায়' করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণকে এভাবেই বিচলিত হতে দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বললেন, "পূর্বে আমি ব্রজে যশোদাদুলাল ছিলাম। তখন তুমি এক সময় নন্দ মহারাজের গৃহে আতিথ্য বরণ করেছিলে এবং আমি তখন তোমাকে এভাবেই বিরক্ত করেছিলাম। তোমার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, তাই তোমার নিবেদিত খাদ্য আমি খাচ্ছি।" ভগবান যে তাঁকে কিভাবে কৃপা করেছেন তা বুঝতে পেরে ব্রাহ্মণ তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে সেই ব্রাহ্মণ পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ঘটনার কথা কাউকে না বলতে ওই ব্রাহ্মণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা *চৈতন্য-ভাগবতের* আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া ।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শৈশবে এক সময় দুটি চোর মহাপ্রভুকে বাইরে পেয়ে তাঁকে চুরি করে নিয়ে যায়। মহাপ্রভু সেই চোরদের কাঁধে চড়েন এবং তারা যখন মনে করছিল যে, নির্বিঘ্নে সেই শিশু মহাপ্রভুকে নিয়ে তারা তাঁর গায়ের সমস্ত গয়নাগুলি চুরি করবে, তখন মহাপ্রভু তাদের এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করেন যে, তাদের নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার পরিবর্তে চোরেরা জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়।

তাৎপর্য

বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নানা রকম স্বর্ণ অলংকারে ভূষিত থাকতেন। একদিন তিনি যখন বাড়ির বাইরে খেলা করছিলেন, তখন দুটি চোর তাঁর গায়ের গয়নাগুলি চুরি করার লোভে তাঁকে কাঁধে তুলে নেয় এবং তাঁকে সন্দেশ খাওয়াবার প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে। চোর দুটি মনে করেছিল যে, তারা শিশুটিকে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে মেরে ফেলবে এবং তাঁর গায়ের গয়নাগুলি নিয়ে নেবে। কিন্তু ভগবান তাঁর মায়ার প্রভাবে চোর দুটিকে এমনভাবে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেন যে, তারা তাঁকে বনে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁর বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয়। যখন তারা তাঁর বাড়ির সামনে আসে, তখন তারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, কেন না জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ির সকলে এবং প্রতিবেশীরা তখন শিশু নিমাইকে খুঁজছিলেন। চোর দুটি ভাবল যে, এখন সেখানে থাকা বিপজ্জনক, তাই তাঁদের সম্মুখে শিশুটিকে রেখে তারা পালিয়ে যায়। তখন নিমাইকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন শচীমাতার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁকে দেখে শচীমাতা আশ্বস্ত হন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* তৃতীয় অধ্যায়ে এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯

ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে ।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

ব্যাধির ছলে মহাপ্রভু একাদশীর দিনে হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিতের নিবেদিত বিষ্ণুনৈবেদ্য খেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে একাদশীর দিনে মহাপ্রভুর হিরণ্য ও জগদীশ পণ্ডিতের গৃহে নিবেদিত বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করার কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একাদশীর দিনেও শ্রীবিষ্ণুকে অন্নভোগ নিবেদন করা হয়, যদিও একাদশীর দিন ভক্তদের উপবাস করার বিধি রয়েছে। এই উপবাস করার বিধি ভগবানের জন্য নয়। এক সময় একাদশীর দিন জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়িতে শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করার জন্য বিশেষভাবে ভোগ রান্না করা হচ্ছিল এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই নৈবেদ্য খাবার আশায় তাঁর পিতাকে হিরণ্য-জগদীশের বাড়িতে পাঠান। জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ি জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে ছিল। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরোধ অনুসারে জগন্নাথ মিশ্র যখন প্রসাদ নেওয়ার জন্য তাঁদের বাড়িতে এলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর জন্য বিশেষ নৈবেদ্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই কথা শিশু নিমাই কিভাবে জানল? তাঁরা তখন অনুমান করেছিলেন যে, শিশু নিমাইয়ের নিশ্চয় অলৌকিক শক্তি রয়েছে। তাই তাঁরা সেই নৈবেদ্য বালকের খাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। শরীরের পীড়া হয়েছে, বিষ্ণুনৈবেদ্য খেলে সেই পীড়া আরোগ্য হবে, এই ছল করে মহাপ্রভু নৈবেদ্য আনিয়েছিলেন। আনীত সেই নৈবেদ্য তিনি বন্ধুদের খাইয়েছিলেন এবং নিজেও কিছু খেয়েছিলেন; তাতে তাঁর ব্যাধি ভাল হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৪০

শিশু সব লয়ে পাড়া-পড়সীর ঘরে ।
চুরি করি' দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর শিশুসাথীদের নিয়ে তিনি প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে খাবার চুরি করে খেতেন। কখনও কখনও অন্য বালকদের সঙ্গে ঝগড়া হলে, তিনি তাদের মারতেন।

শ্লোক ৪১

শিশু সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন ।
শুনি' শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শিশুরা যখন শচীমায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে নিমাইয়ের চুরি করার কথা ও তাদের প্রহার করার কথা বলে দেয়, তখন তা শুনে শচীমাতা তাঁর পুত্রকে তিরস্কার করেন।

শ্লোক ৪২

"কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে ।
কেনে পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥" ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বললেন, "তুমি কেন অন্যের জিনিস চুরি কর? তুমি কেন অন্য বালকদের মার? তুমি কেন অন্যের বাড়ি যাও? তোমার নিজের ঘরে কিসের অভাব?"

তাৎপর্য

বেদান্তসূত্র অনুসারে (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, সবই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিরাজ করে, তাই এই জড় জগতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই, তা সবই চিৎ-জগতে রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তা হলে তিনি কেন চুরি করেছেন এবং বালকদের সঙ্গে মারামারি করেছেন? তাঁর এই চুরি চোরের চুরি করার মতো নয় অথবা তাঁর এই মারামারি শত্রুতাপ্রসূত নয়, তা প্রীতিপূর্ণ, বন্ধু ভাবাপন্ন। তিনি চুরি করেছেন একটি শিশুর মতো। তাঁর এই চুরি অভাববশত নয়, তা স্বাভাবিক প্রবণতা-প্রসূত। এই জড় জগতে কোন কোন শিশু শত্রুতা বা অসৎ বাসনার বশবর্তী না হয়েও প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়ে চুরি করে এবং কখনও কখনও তারা যুদ্ধ করে। কৃষ্ণও তাঁর শৈশবে অন্য শিশুদের মতো এই রকম আচরণ করেছেন। চিৎ-জগতে চুরি করার প্রবণতা অথবা লড়াই করার প্রবণতা না থাকলে, এই জড় জগতে তার প্রকাশ হতে পারত না। জড় জগৎ ও চিৎ-জগতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, চিৎ-

জগতে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সহকারে চুরি করা হয় এবং লড়াই করা হয়, কিন্তু এই জগতে শত্রুতা ও মাৎসর্যতার ফলে চুরি ও লড়াই হয়। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, চিৎ-জগতেও এই সমস্ত কার্যকলাপ রয়েছে, কিন্তু সেখানে কোন রকম বিরূপ ভাব নেই, কিন্তু এই জড় জগতের সমস্ত কার্যকলাপ দুর্দশায় পূর্ণ।

শ্লোক ৪৩

শুনি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর-ভিতর যাঞা ।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল, ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই মাতা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে ক্রুদ্ধ নিমাই ঘরের ভিতরে গিয়ে সমস্ত ভাণ্ড ভেঙে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

তবে শচী কোলে করি' করাইল সন্তোষ ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি' নিজ-দোষ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শচীমাতা তাঁর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে শান্ত করেন এবং মহাপ্রভু তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বালকসুলভ চপলতার কথা *চৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের* তৃতীয় অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, শিশু নিমাই পাড়া-পড়শীদের ঘর থেকে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য চুরি করতেন। কারও বাড়ি থেকে দুধ চুরি করে তিনি তা পান করতেন, আবার কারও বাড়ি থেকে অন্ন চুরি করে খেতেন। কারও বাড়িতে রন্ধনের পাত্র ভেঙ্গে ফেলতেন এবং কারও বাড়িতে ছোট শিশুকে চিমটি কেটে কাঁদাতেন। এক সময় একজন প্রতিবেশী শচীমাতার কাছে এসে অভিযোগ করেন, "তোমার নিমাই আমার ছোট শিশুর কানে জল ঢেলে দিয়ে তাকে কাঁদিয়েছে।"

শ্লোক ৪৫

কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন ।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় শিশু নিমাই মৃদুহস্তে তাঁর মাকে আঘাত করেন এবং শচীমাতা তখন মূর্চ্ছিত হবার ভান করেন। তা দেখে মহাপ্রভু কাঁদতে শুরু করেন।

শ্লোক ৪৬

নারীগণ কহে,—"নারিকেল দেহ আনি' ।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥" ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

তখন প্রতিবেশী রমণীরা তাঁকে বললেন, "তুমি যদি একটি নারকেল নিয়ে আস, তা হলে তোমার মা সুস্থ হবেন।"

শ্লোক ৪৭

বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল ।
দেখিয়া অপূর্ব হৈল বিস্মিত সকল ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি তৎক্ষণাৎ বাড়ির বাইরে গিয়ে দুটি নারকেল নিয়ে এলেন। সেই অপূর্ব কার্য দেখে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৪৮

কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে ।
কন্যাগণ আইলা তাহাঁ দেবতা পূজিতে ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্য শিশুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন এবং প্রতিবেশী বালিকারাও বিভিন্ন দেবতার পূজা করার জন্য সেখানে আসত।

তাৎপর্য

বৈদিক রীতি অনুসারে দশ-বারো বছরের বালিকারা ভাল বর পাওয়ার জন্য গঙ্গাস্নানের পর গঙ্গার তীরে শিবপূজা করে। বিশেষ করে তারা শিবের মতো বর চায়, কেন না শিব অত্যন্ত শান্ত অথচ সব চাইতে শক্তিশালী। তাই পূর্বে হিন্দু পরিবারের ছোট ছোট মেয়েরা, বিশেষ করে বৈশাখ মাসে শিবপূজা করত। গঙ্গায় স্নান করা সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক, তা কেবল বয়স্করাই নয়, শিশুরাও সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করে।

শ্লোক ৪৯

গঙ্গাস্নান করি' পূজা করিতে লাগিলা ।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

গঙ্গায় স্নান করে বালিকারা যখন বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতে শুরু করল, তখন শিশু মহাপ্রভু তাদের মাঝখানে এসে বসলেন।

শ্লোক ৫০

কন্যারে কহে,—আমা পূজ, আমি দিব বর ।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

বালিকাদেরকে সম্বোধন করে মহাপ্রভু বলতেন, "আমার পূজা কর, তা হলে আমি তোমাদের বর প্রদান করব। গঙ্গা ও দুর্গা হচ্ছে আমার দাসী। অন্যান্য দেবতাদের কি কথা, এমন কি শিব হচ্ছে আমার কিঙ্কর।"

তাৎপর্য

অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের, বিশেষ করে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারা বলে যে, হিন্দুধর্মে বহু ঈশ্বরের পূজা হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই ধারণাটি ভুল। ভগবান এক, তবে বহু শক্তিশালী দেবতা রয়েছেন, যাঁরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা করেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আজ্ঞা-পালনকারী দাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শৈশবে সেই তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। অজ্ঞতাবশত, মানুষ কখনও কখনও বর লাভের আশায় বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হয় এবং তাঁর আরাধনা করে, তখন আর তাকে বর লাভের আশায় দেব-দেবীদের কাছে যেতে হয় না, কেন না ভগবানের কৃপায় সে সব কিছুই লাভ করে। তাই, *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০, ২৮) বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার নিন্দা করে বলা হয়েছে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥

"কামনা-বাসনার প্রভাবে উন্মত্ত হওয়ার ফলে যে সমস্ত মানুষের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই কেবল তাদের স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে চালিত হয়ে, সেই সেই সংকীর্ণ নিয়ম পালন করে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে।"

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"কিন্তু যে সমস্ত মানুষ সব রকমের পাপকর্ম, দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে তারা দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে আমার (পরমেশ্বর ভগবানের) ভজনা করে।" অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে। যারা যথার্থ বুদ্ধিমান, তাঁরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন।

অনেক সময় কিছু মানুষ অভিযোগ করে যে, আমরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অনুমোদন করি না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ যখন তা অনুমোদন করেননি, তখন আমরা তা অনুমোদন করব কি

করে? কিভাবে আমরা মানুষদের *মূঢ়* ও *হৃতজ্ঞান* হতে দিতে পারি? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষদের জড় ও চেতনের পার্থক্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করা এবং সমস্ত চেতনার উৎস পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করা। এ ছাড়া আমাদের আর কোন কিছু করার উদ্দেশ্য নেই। আমরা কিভাবে মানুষকে এই জড় জগতের জড় দেহ সমন্বিত দেব-দেবীদের পূজা করার ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে পারি? সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই কৃষ্ণের পূজা করেন। শত শত দেব-দেবীর পূজা করার নিরর্থকতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শৈশবেই প্রতিপন্ন করেছিলেন। সেই সম্পর্কে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম-কারণ ।

"অন্য সমস্ত অভিলাষ ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের নিষ্ঠাবান শুদ্ধ ভক্ত হতে হলে, অন্য দেব-দেবীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়। এই রকম অবিচলিত ভাবই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ।"

শ্লোক ৫১

আপনি চন্দন পরি' পরেন ফুলমালা ।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খা'ন—সন্দেশ, চাল, কলা ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

বালিকাদের অনুমতি না নিয়েই মহাপ্রভু তাদের বাটা চন্দন তাঁর অঙ্গে লেপন করেন, তাদের গাঁথা ফুলের মালা গলায় পরেন এবং তাদের হাত থেকে সন্দেশ, চাল ও কলার নৈবেদ্য কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক পূজার বিধি অনুসারে গৃহের বাইরে রান্না করা নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় না, তাই সাধারণত চাল, কলা ও সন্দেশ নিবেদন করা হয়। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, মহাপ্রভু বালিকাদের নৈবেদ্য কেড়ে নিয়ে খেতেন এবং দেব-দেবীর পূজা না করে তাঁর পূজা করতে বলতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

"যাঁর মুখে সর্বদা কৃষ্ণনাম, যার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত (পঞ্চতত্ত্ব—ভগবান স্বয়ং, তাঁর পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর প্রভু ও শ্রীবাস ঠাকুর) সেই পরমেশ্বর ভগবানকে এই কলিযুগে যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষেরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন এবং সম্ভব হলে প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে আরাধনা করেন।"

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের আরাধনার প্রকৃত পন্থা প্রচার করছে। এই সংস্থার সদস্যেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিগ্রহ নিয়ে নগরে নগরে এবং গ্রামে গ্রামে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে এবং জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করার মাধ্যমে এই যুগে ভগবানের আরাধনা করতে হয়।

শ্লোক ৫২

ক্রোধে কন্যাগণ কহে—শুন, হে নিমাঞি ।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভুর এই আচরণে বালিকারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে বলল, "নিমাই! গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমাদের সকলের ভায়ের মতো।

শ্লোক ৫৩

আমা সবাকার পক্ষে ইহা করিতে না যুয়ায় ।
না লহ দেবতা সজ্জ, না কর অন্যায় ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই তোমার পক্ষে এই রকম আচরণ করা উচিত নয়। আমাদের দেবতাদের পূজা করার উপকরণগুলি তুমি এভাবে নিয়ে নিও না। এভাবেই তুমি অন্যায় আচরণ করো না।"

শ্লোক ৫৪

প্রভু কহে,—"তোমা সবাকে দিল এই বর ।
তোমা সবার ভর্তা হবে পরম সুন্দর ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "প্রিয় বোনেরা, আমি বর দিচ্ছি যে, তোমরা পরম সুন্দর পতি লাভ করবে।

শ্লোক ৫৫

পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্ ।
সাত সাত পুত্র হবে—চিরায়ু, মতিমান্ ॥" ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তারা হবে পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবক ও প্রচুর ধন-সম্পদশালী। শুধু তাই নয়, তোমাদের সকলের সাত সাতটি করে পুত্র হবে এবং তারা হবে দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান।"

তাৎপর্য

সাধারণত যুবতী মেয়েরা আশা করে যে, তাদের স্বামী হবে অত্যন্ত সুন্দর, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, যুবক ও ধন-সম্পদশালী। বৈদিক সমাজে ধন-সম্পদের প্রতীক হচ্ছে খাদ্যশস্য ও গাভী। *ধান্যেন ধনবান্ গবয়া ধনবান্*—"যাঁর অনেক ধান আছে তিনি ধনবান এবং যাঁর অনেক গাভী আছে তিনি ধনবান।" মেয়েরা বহু সন্তানও কামনা করে, বিশেষ করে বুদ্ধিমান ও দীর্ঘায়ু-সম্পন্ন পুত্র। এখন কেবল একটি বা দুটি সন্তান উৎপাদন করার এবং অন্যগুলিকে গর্ভনিরোধ প্রক্রিয়ায় হত্যা করে ফেলার কথা প্রচার করা হচ্ছে, কেন না মানব-সমাজ আজ অত্যন্ত অধঃপতিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মেয়েদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে বহু সন্তানের জননী হওয়া।

পূজার নৈবেদ্য জোর করে কেড়ে নেওয়ার পরিবর্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বালিকাদের আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলেন, যাতে তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পূজা করার মাধ্যমে ভাল পতি লাভ করে, ধন-সম্পদ লাভ করে, খাদ্যশস্য লাভ করে এবং বহু সন্তান লাভ করে মানুষ সুখী হতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁর ভক্তদের তাঁকে অনুসরণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। গৃহে থেকে গৃহস্থজীবন যাপন করা যায়, কিন্তু অবশ্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত হতে হবে। তা হলেই মানুষ ধনসম্পদ লাভ করে, সুসন্তান সমন্বিত সুন্দর গৃহ ও সতীসাধ্বী স্ত্রীরত্ন লাভ করে এবং সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে যথার্থ সুখভোগ করতে পারে। তাই, শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* (*ভাগবত* ১১/৫/৩২)। তাই প্রতিটি বুদ্ধিমান গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে গৃহে গৃহে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করে সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন যাপন করা এবং পরবর্তী জীবনে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়া।

শ্লোক ৫৬

বর শুনি' কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি' মিথ্যা রোষ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া সেই বর শুনে, সমস্ত বালিকারা অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত আনন্দিত হল, কিন্তু বাইরে নারীসুলভ রোষ প্রকাশ করে তারা মহাপ্রভুকে ভর্ৎসনা করল।

তাৎপর্য

এই ধরনের কপটতা নারীদের স্বাভাবিক প্রকৃতি। তারা যখন অন্তরে সন্তুষ্ট হয়, তখন তারা বাহ্যিকভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে। যে সমস্ত ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, তাদের কাছে এই রকম স্ত্রীসুলভ আচরণ অত্যন্ত প্রীতিকর।

শ্লোক ৫৭

কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি' কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

কোন কোন বালিকা তাদের নৈবেদ্য নিয়ে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করল, মহাপ্রভু তাদের ডেকে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

শ্লোক ৫৮

যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্তা হবে, আর চারি চারি সতিনী ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

"কৃপণতা করে যদি তোমরা আমাকে তোমাদের নৈবেদ্য না দাও, তা হলে তোমাদের পতি হবে বৃদ্ধ এবং তোমাদের চার চারজন করে সতিনী থাকবে।"

তাৎপর্য

তখনকার দিনে ভারতবর্ষে, এমন কি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও বহু বিবাহ অনুমোদিত ছিল। যে কোন উচ্চবর্ণের মানুষ—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বিশেষ করে ক্ষত্রিয়—একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ করতে পারত। *মহাভারতে* বা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, ক্ষত্রিয় রাজারা সাধারণত বহু বিবাহ করতেন। বৈদিক সভ্যতায় এই বিষয়ে কোন রকম বাধা নেই এবং পঞ্চাশোত্তর বৃদ্ধও বিবাহ করতে পারতেন। তবে, যে মানুষ বহু বিবাহ করেছে, তার সঙ্গে বিবাহিত হওয়াটা খুব একটা সুখকর পরিস্থিতি নয়, কেন না সেক্ষেত্রে পতির ভালোবাসা অন্য সতিনদের সঙ্গে ভাগ করতে হয়। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরিহাস ছলে তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যারা তাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করবে না, তাদের চার চারজন করে সতিন থাকবে। একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ করার যে সামাজিক অনুমোদন, তা এভাবেই সমর্থন করা যায়। সাধারণত প্রতিটি সমাজেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি। তাই সব মেয়েদের বিবাহ দিতে হলে, বহু বিবাহ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মেয়েদের যদি বিবাহ না হয়, তা হলে ব্যভিচারের সম্ভাবনা থাকে, আর যে সমাজে ব্যভিচার অনুমোদন করা হয়, সেই সমাজ শান্তিপূর্ণ অথবা বিশুদ্ধ হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সমাজে আমরা সব রকমের অবৈধ যৌনজীবন বর্জন করেছি। প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য একটি করে পতি পাওয়া খুবই দুষ্কর। তাই আমরা বহু বিবাহ অনুমোদন করি, অবশ্য যদি পতি একাধিক পত্নীর যথাযথভাবে ভরণ-পোষণ করতে পারে।

শ্লোক ৫৯

ইহা শুনি' তা-সবার মনে হইল ভয় ।
কোন কিছু জানে, কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আপাত অভিশাপ শুনে মেয়েদের মনে ভয় হল। তারা ভাবল, হয়ত কোন দেবতা তাঁর উপর ভর করেছে।

শ্লোক ৬০

আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল ।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

বালিকারা তখন তাদের নৈবেদ্য মহাপ্রভুর সম্মুখে এনে রাখল। তিনি সেই নৈবেদ্য খেয়ে তাদের মনোবাসনা অনুসারে বর দিলেন।

শ্লোক ৬১

এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায় ।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তিনি এক চপল বালকের মতো লীলাবিলাস করেছিলেন। তার ফলে কিন্তু কারও মনে কোন রকম দুঃখ হত না। বরং, সকলেই তাতে সুখ পেতেন।

শ্লোক ৬২

একদিন বল্লভাচার্য-কন্যা 'লক্ষ্মী' নাম ।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী গঙ্গায় স্নান করে দেবতাদের পূজা করতে এলেন।

তাৎপর্য

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (৪৫) বর্ণনা করা হয়েছে যে, লক্ষ্মী হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী জানকী এবং দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী। সেই লক্ষ্মীদেবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন।

শ্লোক ৬৩

তাঁরে দেখি' প্রভুর হইল সাভিলাষ মন ।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীত পাইল প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করে মহাপ্রভু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন, আর লক্ষ্মীদেবীও মহাপ্রভুকে দর্শন করে অন্তরে অত্যন্ত প্রীত হলেন।

শ্লোক ৬৪

সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয় ।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তভু হইল নিশ্চয় ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

পরস্পরের প্রতি তাঁদের স্বাভাবিক প্রেম উদিত হল এবং যদিও তা বাল্যভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তবুও তাঁরা যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তা সহজেই বোঝা গেল।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী হচ্ছেন নিত্য পতি-পত্নী। তাই তাঁদের পরস্পরের প্রতি যে প্রেমের উদয় হয়েছিল তা স্বাভাবিক। তাঁদের সাক্ষাতের পর তাঁদের স্বাভাবিক অনুভূতি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্লোক ৬৫

দুঁহা দেখি' দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস ।
দেবপূজা ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁরা পরস্পরকে দর্শন করে অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন এবং দেবপূজার ছলে তাঁরা তাঁদের অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ৬৬

প্রভু কহে,—'আমা' পূজ, আমি মহেশ্বর ।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বললেন, "আমার পূজা কর, কেন না আমি হচ্ছি পরম ঈশ্বর। তুমি যদি আমার পূজা কর, তা হলে তুমি তোমার অভীপ্সিত বর লাভ করবে।"

তাৎপর্য

এই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় পেয়ো না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) মানুষ এই কথা বুঝতে পারে না। তারা সমস্ত দেব-দেবীর তোষামোদ করে, মানুষের তোষামোদ করে, এমন কি কুকুর-বেড়ালের পর্যন্ত তোষামোদ করে, কিন্তু যখন তাদের ভগবানের পূজা করতে অনুরোধ করা হয়, তখন তারা তা করতে চায় না। একেই বলে মায়া। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের পূজা করে, তা হলে তাকে আর অন্য কারও পূজা করতে হয় না। যেমন, একটি গ্রামে এক একটি কূপে মানুষের স্নান, কাপড় কাচা আদি কর্ম পৃথক পৃথকভাবে করা হয়, কিন্তু নিরন্তর প্রবহমান নদীতে গেলে সমস্ত কাজই তার জল দিয়ে সুন্দরভাবে করা যায়। সেই নদী থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা যায়, সেই জলে কাপড় ধোয়া যায়, স্নান করা যায়। তেমনই, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তা হলে তার সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতা*—"কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই কেবল বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/২০)

শ্লোক ৬৭

লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প-চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেই কথা শুনে, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী তৎক্ষণাৎ তাঁর অঙ্গে পুষ্প ও চন্দন দিয়ে এবং তাঁর গলায় মল্লিকার মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁর বন্দনা করলেন।

শ্লোক ৬৮

প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা।
শ্লোক পড়ি' তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা পূজিত হয়ে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে তিনি লক্ষ্মীদেবীর অন্তরের আবেগ অঙ্গীকার করলেন।

তাৎপর্য

মহাপ্রভু *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের পঞ্চবিংশতি শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন। ব্রজের গোপিকারা দুর্গাদেবীর বা কাত্যায়নীদেবীর পূজা করে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যেন তাঁরা পতিরূপে লাভ করতে পারেন। পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের অন্তরের ঐকান্তিক বাসনার কথা জানতে পেরেছিলেন এবং তাই তিনি বস্ত্রহরণ-লীলা বিলাস করেছিলেন। গোপিকারা যখন যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদের অঙ্গের বসন নদীর তীরে রেখে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। পতি যেভাবে তাঁর পত্নীকে নগ্ন অবস্থায় দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন ঠিক সেভাবেই সেই বালিকাদের দর্শন করার জন্য তাঁদের বস্ত্র হরণ করে একটি গাছের উপরে গিয়ে বসেন। গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে পেতে চেয়েছিলেন এবং যেহেতু পতির সম্মুখেই স্ত্রী নগ্না হতে পারে, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রার্থনা অনুসারে, তাঁদের বস্ত্রহরণ-লীলা বিলাস করার মাধ্যমে তাঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু নির্বোধ ও অসৎ লোকেরা ভগবান ও গোপিকাদের লীলার যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাদের মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তার কদর্থ করে থাকে। গোপিকারা যখন তাঁদের বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ফেরত পেয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নীচের শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন।

শ্লোক ৬৯

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্ ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৯ ॥

সংকল্পঃ—বাসনা; **বিদিতঃ**—জানা হয়েছে; **সাধ্ব্যঃ**—হে সতীগণ; **ভবতীনাম্**—তোমাদের সকলের; **মৎ-অর্চনম্**—আমাকে পূজা করার জন্য; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অনুমোদিতঃ**—স্বীকৃত; **সঃ**—তা; **অসৌ**—সেই সংকল্প বা বাসনা; **সত্যঃ**—সফল; **ভবিতুম্**—হওয়ার জন্য; **অর্হতি**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

"হে গোপীগণ! আমাকে তোমাদের পতিরূপে পাওয়ার এবং সেভাবেই আমাকে পূজা করার যে বাসনা তোমরা করেছ, তা আমি অনুমোদন করেছি, কেন না তোমরা তার উপযুক্ত।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী গোপিকারা ছিলেন প্রায় তাঁরই সমবয়সী। তাঁরা অন্তরে অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জাবশত তাঁরা তাঁদের সেই মনোবাসনা ব্যক্ত করতে পারেননি। তাই পরে, তাঁদের বস্ত্র হরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বলেছিলেন, "আমি তোমাদের মনের কথা জানি এবং তা আমি অনুমোদন করেছি। তোমাদের বস্ত্র হরণ করার পর, তোমরা সম্পূর্ণ নগ্না অবস্থায় আমার সামনে এসেছ, যার অর্থ হচ্ছে যে, আমি তোমাদের সকলকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি।" কখনও কখনও মূর্খ পাষণ্ডীরা শ্রীকৃষ্ণ অথবা গোপিকাদের উদ্দেশ্য না জেনে, শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের মতো একজন কামার্ত লম্পট বলে মনে করে তাঁর এই লীলাবিলাসের অনর্থক সমালোচনা করে। কিন্তু বস্ত্রহরণ-লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানের শ্রীমুখোক্ত এই শ্লোকটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭০

এইমত লীলা করি' দুঁহে গেলা ঘরে ।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই পরস্পরের কাছে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী তাঁদের গৃহে ফিরে গেলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গম্ভীর লীলা কে বুঝতে পারে?

শ্লোক ৭১

চৈতন্য-চাপল্য দেখি' প্রেমে সর্বজন ।
শচী-জগন্নাথে দেখি' দেন ওলাহন ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চপল ব্যবহার দেখে, তাঁর প্রতি তাঁদের প্রেমবশত প্রতিবেশীরা শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন।

শ্লোক ৭২

একদিন শচী-দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া ।
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শচীমাতা তাঁর পুত্রকে ভর্ৎসনা করে তাঁকে ধরতে গেলেন, কিন্তু তাঁর পুত্রটি তখন সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

শ্লোক ৭৩

উচ্ছিষ্ট-গর্তে ত্যক্ত-হাণ্ডীর উপর ।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব-বিশ্বম্ভর ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

যদিও তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের পালনকর্তা, তবু তিনি উচ্ছিষ্ট ফেলার গর্তে পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপর গিয়ে বসলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন নতুন পাত্রে ভোগ রান্না করে শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করতেন। সেই প্রথা এখনও জগন্নাথপুরীর মন্দিরে প্রচলিত রয়েছে। তখন নতুন মাটির পাত্রে রান্না করা হত এবং রান্নার পর সেই পাত্রগুলি ফেলে দেওয়া হত। সাধারণত বাড়ির পাশে একটি বড় গর্তে সেই পাত্রগুলি ফেলে দেওয়া হত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুখে সেই পাত্রগুলির উপর গিয়ে বসলেন।

শ্লোক ৭৪

শচী আসি' কহে,—কেনে অশুচি ছুঁইলা ।
গঙ্গাস্নান কর যাই'—অপবিত্র হইলা ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র উচ্ছিষ্ট পাত্রের উপর গিয়ে বসেছেন, তখন তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, "তুমি কেন এই উচ্ছিষ্ট পাত্র স্পর্শ করলে? তুমি এখন অপবিত্র হয়ে গেছ। গঙ্গায় গিয়ে স্নান কর।"

শ্লোক ৭৫

ইহা শুনি' মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান ।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল স্নান ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও শচীমাতা তা শুনে বিস্মিতা হয়েছিলেন, তবুও তিনি তাঁকে জোর করে স্নান করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* বর্ণনা করেছেন—"প্রভু বললেন, 'মা! এটি পবিত্র এবং ওটি অপবিত্র, এই ধারণা একটি ভিত্তিহীন জাগতিক বোধ মাত্র। এই পাত্রে তুমি বিষ্ণুর ভোগ রান্না করেছ এবং সেই ভোগ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেছ। তা হলে এই পাত্রগুলি অপবিত্র হয় কি করে? শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কে সম্পর্কিত সব কিছুই বিষ্ণুশক্তির প্রকাশ। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পূর্ণশুদ্ধ এবং নিত্য পরমাত্মা। তা হলে এই পাত্রগুলির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বিচার হয় কি করে?' এই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ শুনে শচীমাতা অত্যন্ত বিস্মিতা হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে জোর করে স্নান করিয়েছিলেন।"

শ্লোক ৭৬

কভু পুত্রসঙ্গে শচী করিলা শয়ন ।
দেখে, দিব্যলোক আসি' ভরিল ভবন ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও কখনও শচীমাতা তাঁর পুত্রকে নিয়ে যখন শয়ন করতেন, তখন দেখতেন যে, স্বর্গের দেবতাতে বাড়ি ভরে গেছে।

শ্লোক ৭৭

শচী বলে,—যাহ, পুত্র, বোলাহ বাপেরে ।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় শচীমাতা মহাপ্রভুকে বললেন, "যাও, তোমার পিতাকে ডেকে আন।" মায়ের এই আজ্ঞা পেয়ে মহাপ্রভু তাঁর পিতাকে ডেকে আনতে বাইরে গেলেন।

শ্লোক ৭৮

চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্‌ঝন্ ।
শুনি' চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যখন বাইরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে নূপুরের ধ্বনি উত্থিত হল। সেই শব্দ শুনে পিতা-মাতার মন চমকিত হল।

শ্লোক ৭৯

মিশ্র কহে,—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী ।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র বললেন, "এটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। আমার শিশুর পায়ে তো কোন নূপুর নেই, তা হলে কোত্থেকে এই শব্দ হচ্ছে?"

শ্লোক ৮০

শচী কহে,—আর এক অদ্ভুত দেখিল ।
দিব্য দিব্য লোক আসি' অঙ্গন ভরিল ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বললেন, "আমি তো আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। স্বর্গলোক থেকে দিব্য দিব্য লোক এসে অঙ্গনে ভিড় করল।

শ্লোক ৮১

কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি ।
কাহাকে বা স্তুতি করে—অনুমান করি ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"তারা যে কি কোলাহল করছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি অনুমান করেছিলাম যে, তারা হয়ত বা কাউকে স্তুতি করছে।"

শ্লোক ৮২

মিশ্র বলে,—কিছু হউক্, চিন্তা কিছু নাই ।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক্,—এই মাত্র চাই ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "সে যাই হোক, তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। আমি শুধু এটুকুই চাই যে, সর্বতোভাবে বিশ্বম্ভরের কল্যাণ হোক।"

শ্লোক ৮৩

একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া ।
ধর্ম-শিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন জগন্নাথ মিশ্র তাঁর পুত্রের চপলতাপূর্ণ আচরণ দেখে, তাঁকে বহু ভর্ৎসনা করে নীতিশিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৮৪

রাত্রে স্বপ্ন দেখে,—এক আসি' ব্রাহ্মণ ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেদিন রাত্রে জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ব্রাহ্মণ সামনে এসে রোষ সহকারে এই কথাগুলি বলছেন—

শ্লোক ৮৫

"মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান ।
ভর্ৎসন-তাড়ন কর,—পুত্র করি' মান ॥" ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"মিশ্র! তুমি তোমার পুত্রের তত্ত্ব কিছুই জান না। পুত্র বলে মনে করে তুমি তাঁকে তিরস্কার করছ।"

শ্লোক ৮৬

মিশ্র কহে,—"দেব, সিদ্ধ, মুনি কেনে নয় ।
যে সে বড় হউক্ মাত্র আমার তনয় ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "এই ছেলেটি দেবতা হোক, সিদ্ধযোগী হোক, মহাঋষি হোক অথবা সে যাই হোক না কেন, আমার কাছে সে কেবল আমার পুত্র।

শ্লোক ৮৭

পুত্রের লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম ।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম-মর্ম ॥" ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

"পিতার কর্তব্য হচ্ছে পুত্রকে লালন-পালন করা এবং নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া। আমি যদি তাকে না শেখাই, তা হলে সে ধর্মের মর্ম জানবে কি করে?"

শ্লোক ৮৮

বিপ্র কহে,—পুত্র যদি দৈব-সিদ্ধ হয় ।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রাহ্মণ উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমার পুত্র যদি দৈবসিদ্ধ হয় এবং তার জ্ঞান যদি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তা হলে আর তাকে শিক্ষা দেওয়ার কি প্রয়োজন?"

তাৎপর্য

স্বপ্নে ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রকে বলেছিলেন যে, তাঁর পুত্র কোন সাধারণ মানুষ নন। তিনি যদি দিব্য পুরুষ হন, তা হলে তাঁর জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এবং তার ফলে তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

শ্লোক ৮৯

মিশ্র কহে,—"পুত্র কেনে নহে নারায়ণ ।
তথাপি পিতার ধর্ম—পুত্রের শিক্ষণ ॥" ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

জগন্নাথ মিশ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার পুত্র যদি নারায়ণও হয়, তবুও পিতার ধর্ম হচ্ছে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া।"

শ্লোক ৯০

এইমতে দুঁহে করেন ধর্মের বিচার ।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই জগন্নাথ মিশ্র ও ব্রাহ্মণ স্বপ্নে ধর্মের তত্ত্ব বিচার করেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে জগন্নাথ মিশ্র এতই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি আর অন্য কিছু জানতেন না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/৪৫) বলা হয়েছে, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি *বেদে* ও *উপনিষদের* উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত হন এবং সত্ত্বগুণে সাংখ্য-যোগের মাধ্যমে মহাপুরুষেরা যাঁকে ধ্যান করেন, তাঁকে মা যশোদা ও নন্দ মহারাজ তাঁদের শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন।" তেমনই, জগন্নাথ মিশ্রও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর অতি স্নেহের শিশুপুত্র বলে মনে করেছিলেন, যদিও তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ও মহর্ষিরা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁর আরাধনা করেন।

শ্লোক ৯১

এত শুনি' দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত ।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর জগন্নাথ মিশ্র জেগে উঠে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

শ্লোক ৯২

বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্বপ্নের কথা তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই সেই কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯৩

এই মত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র ।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়ায় আনন্দ ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই গৌরহরি তাঁর শৈশব লীলাবিলাস করেছিলেন এবং দিনের পর দিন তাঁর পিতা-মাতার আনন্দ বৃদ্ধি করেছিলেন।

শ্লোক ৯৪

কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল ।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

তার কয়েকদিন পর জগন্নাথ মিশ্র তাঁর পুত্রের হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সমস্ত অক্ষর ও দ্বাদশ-ফলা শিখে ফেলেছিলেন।

তাৎপর্য

দ্বাদশ-ফলা হচ্ছে রেফ, মূর্ধন্য ণ, দান্তব্য ন, ম, য, র, ল, ব, ঋ, ৠ, ঌ ও ৡ। হাতে খড়ি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সূচনার অনুষ্ঠান। চার-পাঁচ বছর বয়সে বিষ্ণুকে পূজা করার মাধ্যমে শুভদিনে শিশুর বিদ্যারম্ভ হয়। তারপর শিক্ষক শিশুকে একটি চক পেন্সিল দেন এবং তার হাত ধরে মেঝেতে অ, আ, ই প্রভৃতি লিখতে শেখান। শিশু যখন একটু লিখতে শেখে, তখন তাকে একটি শ্লেট দেওয়া হয় এবং যুক্ত অক্ষর বা ফলা লিখতে শেখানো হয়।

শ্লোক ৯৫

বাল্যলীলা-সূত্র এই কৈল অনুক্রম ।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রম অনুসারে সূত্রের আকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনা করা হল। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পূর্বেই তাঁর চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এই সমস্ত লীলার বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৯৬

অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল ।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাই, আমি এই সমস্ত লীলা সংক্ষেপে সূত্রের আকারে লিখলাম। পুনরুক্তির ভয়ে আমি বিস্তারিতভাবে তার বর্ণনা করলাম না।

শ্লোক ৯৭

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার চতুর্দশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসার—এই পরিচ্ছেদে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে মহাপ্রভু ব্যাকরণ পড়েন এবং তখন তিনি ব্যাকরণের টীকা রচনায় প্রবীণতা লাভ করেন। তিনি মাকে একাদশীর দিন অন্ন খেতে নিষেধ করেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে আহ্বান করেন এবং তিনি তা না শুনে পিতা-মাতার সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাতে বিশ্বরূপ তাঁকে পুনরায় গৃহে পাঠিয়ে দেন, এরূপ একটি আখ্যায়িকা বলেন। এই পরিচ্ছেদে জগন্নাথ মিশ্রের পরলোক, বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ আদি বিবরণ সূত্ররূপে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

কুমনাঃ—যার মন জড় বিষয়ে আসক্ত; **সুমনস্ত্বম্**—জড় বিষয়-বাসনা রহিত ভক্ত; **হি**—অবশ্যই; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **যস্য**—যাঁর; **পদ-অব্জয়োঃ**—শ্রীপাদপদ্মে; **সুমনঃ**—সুমনঃ নামক ফুল; **অর্পণ-মাত্রেণ**—অর্পণ করা মাত্র; **তম্**—তাঁকে; **চৈতন্য-প্রভুম্**—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **ভজে**—আমি ভজনা করি।

অনুবাদ

যাঁর পাদপদ্মে সুমনঃ (চামেলি বা মালতী ফুল) অর্পণ করা মাত্র জড় ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ ঘোর বিষয়ীও ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন ।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

এখন আমি সূত্রের আকারে মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা (পাঁচ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত) বর্ণনা করব। এই বয়সে প্রভুর মুখ্য কার্যকলাপ ছিল অধ্যয়ন।

শ্লোক ৪

পৌগণ্ড-লীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা ।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ৪ ॥

পৌগণ্ড-লীলা—পৌগণ্ড বয়সের কার্যকলাপ; **চৈতন্য-কৃষ্ণস্য**—যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর; **অতি-সুবিস্তৃতা**—অতি বিশাল; **বিদ্যা-আরম্ভ**—বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ; **মুখা**—মুখ্য কার্যকলাপ; **পাণি-গ্রহণ**—বিবাহ; **অন্তা**—শেষ; **মনোহরা**—সকলের হৃদয় আকর্ষণকারী।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা অতি বিস্তৃত। তাঁর বিদ্যারম্ভ থেকে এই লীলার শুরু এবং তাঁর অতি মনোহর পাণিগ্রহণ-লীলায় তার শেষ।

শ্লোক ৫

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পড়ছিলেন, তখন শোনা মাত্রই তিনি ব্যাকরণের সূত্রবৃত্তিসমূহ কণ্ঠস্থ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, মহাপ্রভু প্রথমে বিষ্ণু ও সুদর্শন নামক দুজন শিক্ষকের কাছ থেকে সামান্য বিদ্যা উপার্জন করেন। তারপর একটু বড় হলে, তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ পড়েন। সংস্কৃত ভাষা শিখতে হলে প্রথমে ব্যাকরণ শিখতেই বারো বছর সময় লাগে। যখন খুব ভালভাবে ব্যাকরণ শেখা হয়ে যায়, তখন অতি সহজে সংস্কৃত শাস্ত্র অথবা সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়, কেন না সংস্কৃত ব্যাকরণ হচ্ছে সংস্কৃত অধ্যয়নের দ্বারস্বরূপ।

শ্লোক ৬

অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পঞ্জী-টীকা নামক ব্যাকরণের টীকা বিশ্লেষণে এত পারদর্শিতা লাভ করলেন যে, তিনি অন্য সমস্ত প্রবীণ ছাত্রদের পর্যন্ত পরাস্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, ব্যাকরণের *পঞ্জী-টীকা* নামক একটি প্রসিদ্ধ টীকা ছিল, মহাপ্রভু তা অত্যন্ত সরলভাবে বিশ্লেষণ করে টিপ্পনী প্রস্তুত করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে (পরবর্তীকালে যা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নামে পরিচিত হয়), বিস্তারিতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধ্যয়নলীলা বর্ণনা করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের আদিখণ্ডের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধ্যয়নলীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম ।
প্রভু কহে,—মাতা, মোরে দেহ এক দান ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মায়ের পায়ে প্রণতি নিবেদন করে বলেছিলেন, "মা! আমাকে কি তুমি একটি দান দেবে?"

শ্লোক ৯

মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে ।
প্রভু কহে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর মা উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব।" তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন, "দয়া করে একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করবে না।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই একাদশীর উপবাসের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর *ভক্তিসন্দর্ভে স্কন্দ পুরাণের* একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে, সে মাতা, পিতা, ভাই ও গুরুহত্যাকারী এবং সে যদি বৈকুণ্ঠলোকেও উন্নীত হয়, তবুও তার অধঃপতন হয়।" একাদশীর দিন শ্রীবিষ্ণুর জন্য সব কিছু রন্ধন করা হয়, এমন কি অন্ন এবং ডালও, কিন্তু শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেদিন বৈষ্ণবদের বিষ্ণুর প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে নিবেদিত প্রসাদ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না, কিন্তু একাদশীর দিনে বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের খাওয়া উচিত নয়। সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। একাদশীর দিন কোন রকম শস্যদানা, এমন কি তা যদি বিষ্ণুপ্রসাদও হয়, তবুও তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা ।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

শচীমাতা বলেছিলেন, "তুমি ভাল কথাই বলেছ। আমি একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করব না।" সেই দিন থেকে তিনি একাদশীর উপবাস করতে শুরু করেন।

তাৎপর্য

স্মার্ত-ব্রাহ্মণেরা বলে যে, একাদশীর দিন উপবাস করা বিধবাদের অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু সধবাদের একাদশী-ব্রত পালন করা উচিত নয়। মনে হয় মহাপ্রভুর অনুরোধের পূর্বে শচীমাতা একাদশী-ব্রত পালন করছিলেন না, কেন না তিনি ছিলেন সধবা। কিন্তু বিধবা না হলেও শাস্ত্র অনুসারে একাদশীর ব্রত পালন করার প্রথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছিলেন। একাদশীর দিন কোন রকম শস্যদানা গ্রহণ করা উচিত নয়, এমন কি তা যদি বিষ্ণুপ্রসাদও হয় তবুও গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১১

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন ।
কন্যা চাহি' বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

বিশ্বরূপ যৌবনে পদার্পণ করেছেন দেখে, জগন্নাথ মিশ্র উপযুক্ত কন্যা দেখে তাঁর বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ১২

বিশ্বরূপ শুনি' ঘর ছাড়ি পলাইলা ।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে তীর্থ পর্যটন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১৩

শুনি' শচী-মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কথা শুনে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁদের আশ্বাস দিলেন।

শ্লোক ১৪

ভাল হৈল,—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল ।
পিতৃকুল, মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "হে মাতঃ, হে পিতঃ। বিশ্বরূপ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে তাতে ভালই হয়েছে, কেন না তার ফলে সে তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল, দুই-ই উদ্ধার করল।"

তাৎপর্য

কেউ কেউ বলে যে, শাস্ত্রে কলিযুগে *সন্ন্যাস* গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *সন্ন্যাস* গ্রহণ করা অনুমোদন করেননি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥

"কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন—এই পাঁচটি প্রথা নিষিদ্ধ।" (*ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কৃষ্ণজন্ম-খণ্ড* ১৮৫/১৮০)।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং *সন্ন্যাস* গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের *সন্ন্যাস* অনুমোদন করেছিলেন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *ভাল হৈল,—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল/পিতৃকুল, মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল*। তা হলে কি আমাদের মনে করতে হবে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করেছিলেন? না, প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেননি। ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করার যে *সন্ন্যাস* তা অনুমোদিত এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সেই *সন্ন্যাস* গ্রহণ করা, কেন না সেই প্রকার *সন্ন্যাস* গ্রহণ করার ফলে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের জন্য সব চাইতে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হয়। তবে মায়াবাদ *সন্ন্যাস* গ্রহণ করা উচিত নয়, প্রকৃতপক্ষে যা হচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আমরা দেখতে পাই, বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী নিজেদের ব্রহ্ম অথবা নারায়ণ বলে মনে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সারাদিন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে যাতে তারা তাদের ক্ষুধার সময় উদরপূর্তি করতে পারে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এতই অধঃপতিত হয়েছে যে, তাদের একটি গোষ্ঠী কুকুর, শূকর আদি সব কিছু খায়। এই ধরনের অধঃপতিতকে *সন্ন্যাস* গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাসপ্রথা অত্যন্ত কঠোর ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তথাকথিত মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী হওয়া মানে নারায়ণ হয়ে যাওয়া—এই ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাবে অধঃপতিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই ধরনের *সন্ন্যাস* বর্জন করেছিলেন। কিন্তু *সন্ন্যাস* হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্মের একটি অঙ্গ। সুতরাং, তিনি তা বর্জন করবেন কি করে?

শ্লোক ১৫

আমি ত' করিব তোমা' দুঁহার সেবন ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পিতা-মাতাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁদের সেবা করবেন এবং তার ফলে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৬

একদিন নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া ।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানকে নিবেদিত সুপারি খেয়েছিলেন এবং তা মাদক দ্রব্যের মতো ক্রিয়া করার ফলে তিনি অচেতন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন।

তাৎপর্য

সুপারিও এক প্রকার মাদক দ্রব্য, তাই তা সেবন করা নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুপারি খেয়ে মূর্ছিত হওয়ার লীলা করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, সুপারি খাওয়া উচিত নয়, এমন কি তা যদি বিষ্ণুপ্রসাদও হয়, ঠিক যেমন একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মূর্ছিত হয়ে পড়ার লীলার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানরূপে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং যা ইচ্ছা তাই খেতে পারেন, কিন্তু আমাদের তাঁর লীলার অনুকরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ১৭

আস্তে-ব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিল পানি ।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পিতা-মাতা তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাঁর মুখে জল দিলেন এবং মহাপ্রভু সুস্থ হয়ে তাঁদেরকে এক অপূর্ব কাহিনী বললেন।

শ্লোক ১৮

এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা ।
সন্ন্যাস করহ তুমি, আমারে কহিলা ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "বিশ্বরূপ আমাকে এখান থেকে নিয়ে গেল এবং আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে অনুরোধ করল।

শ্লোক ১৯

আমি কহি,—আমার অনাথ পিতা-মাতা ।
আমি বালক,—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি বিশ্বরূপকে বললাম, আমার পিতা-মাতা অনাথ, আর আমিও হচ্ছি নিতান্ত বালক। সন্ন্যাস-আশ্রম সম্বন্ধে আমি কি জানি?

শ্লোক ২০

গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন ।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমি গৃহস্থ-আশ্রম অবলম্বন করে পিতা-মাতার সেবা করব এবং তার ফলে লক্ষ্মী-নারায়ণ আমার প্রতি তুষ্ট হবেন।'

শ্লোক ২১

তবে বিশ্বরূপ ইঁহা পাঠাইল মোরে ।
মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

"তখন বিশ্বরূপ আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিল এবং আমাকে বলতে বলল, 'মাকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানিও।' "

শ্লোক ২২

এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি ।
কি কারণে লীলা,—ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নানা রকম লীলাবিলাস করছিলেন, কিন্তু তিনি যে কেন তা করছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তরা যখন এই জগতে কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আসেন, তখন তাঁরা মাঝে মাঝে এমন আচরণ করেন যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।* বৈষ্ণব তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু মূর্খ লোকেরা সেই অতি উন্নত বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য না জেনে, তাঁদের সমালোচনা করে। তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈষ্ণব যা করেন তা বুঝতে না পেরে, তাঁদের সমালোচনা করা একটি মস্ত বড় অপরাধ এবং তার ফলে সমালোচনাকারীর সর্বনাশ হয়।

শ্লোক ২৩

কতদিন রহি' মিশ্র গেলা পরলোক ।
মাতা-পুত্র দুঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

তার কিছুদিন পর জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করলেন এবং মাতা ও পুত্রের অন্তরে অত্যন্ত শোকের উদয় হল।

শ্লোক ২৪

বন্ধু-বান্ধব আসি' দুঁহা প্রবোধিল ।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

বন্ধু-বান্ধবেরা এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর মাতাকে প্রবোধ দিলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যদিও তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি বৈদিক বিধি অনুসারে পিতৃক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

শ্লোক ২৫

কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন ।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তার কিছুদিন পর মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করলেন, "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি এবং যেহেতু আমি গৃহস্থ হয়েছি, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে গৃহধর্ম পালন করা।

শ্লোক ২৬

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম না হয় শোভন ।
এত চিন্তি' বিবাহ করিতে হৈল মন ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিবেচনা করলেন, "গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম যথাযথভাবে পালন হয় না।" তাই মহাপ্রভু বিবাহ করতে মনস্থ করলেন।

শ্লোক ২৭

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ২৭ ॥

ন—না; গৃহম্—গৃহ; গৃহম্—গৃহ; ইতি—এভাবে; আহুঃ—বলা হয়; গৃহিণী—গৃহপত্নী; গৃহম্—গৃহ; উচ্যতে—বলা হয়; তয়া—তার সঙ্গে; হি—অবশ্যই; সহিতঃ—সহ; সর্বান্—সমস্ত; পুরুষ-অর্থান্—মানব-জীবনের লক্ষ্য; সমশ্নুতে—পূর্ণ হয়।

অনুবাদ

গৃহকে গৃহ বলা হয় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। কেউ যখন গৃহিণী সহ গৃহে বাস করে, তখন মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

শ্লোক ২৮

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে ।
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন মহাপ্রভু যখন পাঠশালা থেকে গৃহে ফিরছিলেন, তখন দৈবক্রমে তিনি গঙ্গার পথে বল্লভাচার্যের কন্যাকে দেখতে পেলেন।

শ্লোক ২৯

পূর্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিল ।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইল ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

যখন মহাপ্রভু ও লক্ষ্মীদেবীর সাক্ষাৎ হল, তখন তাঁদের পূর্বসিদ্ধ ভাবের উদয় হল এবং দৈবযোগে বনমালী ঘটক তখন শচীমাতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

তাৎপর্য

বনমালী ঘটক ছিলেন নবদ্বীপবাসী বিপ্র। তিনি মহাপ্রভুর বিবাহের ঘটকালী করেন। *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (শ্লোক ৪৯) বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্বলীলায় যিনি ছিলেন বিশ্বামিত্র, যিনি রামচন্দ্রের বিবাহের ঘটকালী করেছিলেন এবং পরবর্তী লীলায় রুক্মিণীদেবী যে ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনিই হচ্ছেন চৈতন্যলীলার বনমালী ঘটক।

শ্লোক ৩০

শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন ।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শচীদেবীর নির্দেশ অনুসারে বনমালী ঘটক বিবাহের আয়োজন করলেন এবং এভাবেই যথাসময়ে মহাপ্রভু লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করলেন।

শ্লোক ৩১

বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন-দাস ।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র প্রকাশ ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত পৌগণ্ডলীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি কেবল সেই লীলাসমূহ সূত্রাকারে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৩২

পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার ।
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর পৌগণ্ড বয়সে মহাপ্রভু বহু লীলাবিলাস করেছিলেন এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৩

অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্বলোকে খ্যাত হৈল ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি কেবল সেই সমস্ত লীলার আভাস মাত্র দিলাম, কেন না বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে (বর্তমানে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত), সেই লীলাসমূহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার ফলে সেগুলি সমস্ত জগতে বিখ্যাত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা

এই পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এই সময় তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং বড় বড় পণ্ডিতদের পরাজিত করেন। কৈশোরলীলায় মহাপ্রভু জলকেলিও করেন। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য তিনি পূর্ববঙ্গে যান, সেখানে জ্ঞানালোচনা করেন এবং সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে তপন মিশ্রের সাক্ষাৎকার হয়, যাঁকে তিনি পারমার্থিক উন্নতি সাধনের উপদেশ দেন এবং বারাণসী যাওয়ার নির্দেশ দেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্প দংশনে বা বিরহরূপ সর্পের দংশনে পরলোক গমন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মহাপ্রভু দেখেন যে, তাঁর মাতা লক্ষ্মীদেবীর পরলোক গমনে অত্যন্ত শোকগ্রস্তা হয়ে পড়েছেন। তাই, তাঁর অনুরোধে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। এই অধ্যায়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর আলাপ এবং তাঁর গঙ্গামাহাত্ম্য-শ্লোক বিচার করে তাঁকে পঞ্চ অলংকারের গুণ ও পঞ্চ অলংকারের দোষ দেখিয়ে তাঁর গর্ব চূর্ণ করেন। সারা ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদের পরাস্তকারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী সরস্বতীর কাছে রাত্রে প্রভুর তত্ত্ব জানতে পেরে পরদিন সকাল বেলায় তাঁর শরণাপন্ন হন।

শ্লোক ১

কৃপাসুধা-সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

কৃপা-সুধা—করুণার অমৃত; **সরিৎ**—নদী; **যস্য**—যাঁর; **বিশ্বম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **আপ্লাবয়ন্তী**—প্লাবিত করে; **অপি**—যদিও; **নীচগা এব**—দরিদ্র ও অধঃপতিতদের প্রতি অধিক কৃপাময়; **সদা**—সর্বদা; **ভাতি**—প্রকাশিত; **তং চৈতন্য-প্রভুম্**—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; **ভজে**—আমি ভজনা করি।

অনুবাদ

যাঁর অমৃতময় করুণা এক মহানদীর মতো সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করেছে এবং নদীর মতো নিম্নগামী হয়ে যাঁর করুণা দরিদ্র ও অধঃপতিতদের প্রতি বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভজনা করি।

তাৎপর্য

নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।* তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণা লাভ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন, কেন না তিনি হচ্ছেন ভগবানের সব চাইতে কৃপাময় অবতার এবং তিনি আবির্ভূত হয়েছেন বিশেষ করে অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য। যে যত বেশি অধঃপতিত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভের জন্য

তার দাবি তত বেশি। তবে তাকে অত্যন্ত ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাপরায়ণ হতে হবে। এই কলিযুগের সমস্ত কলুষের দ্বারা কলুষিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তা হলে তিনি অবশ্যই তাকে উদ্ধার করবেন। তার সব চাইতে সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে জগাই ও মাধাই। এই কলিযুগে প্রায় প্রতিটি মানুষই জগাই ও মাধাই-এর মতো, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলন মহানদীর মতো প্রবাহিত হয়ে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করেছে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ অত্যন্ত সাফল্য সহকারে সমস্ত অধঃপতিত জীবদের কলুষ মুক্ত করে উদ্ধার করছে।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ ॥ ৩ ॥

জীয়াৎ—দীর্ঘজীবী হোন; কৈশোর—কিশোর বয়সে স্থিত; চৈতন্যঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; মূর্তিমত্যা—শরীরধারী; গৃহ-আশ্রমাৎ—গৃহস্থ-আশ্রম থেকে; লক্ষ্ম্যা—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা; অর্চিতঃ—আরাধিত হয়েছিলেন; অথ—তারপর; বাক্-দেব্যা—সরস্বতীদেবীর দ্বারা; দিশাম্—সমস্ত দিক; জয়ি—বিজয়ী; জয়-ছলাৎ—জয় করার ছলে।

অনুবাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৈশোর বয়স জয়যুক্ত হোক। তখন লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবী উভয়েই তাঁর আরাধনা করেছিলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁকে গৃহে অর্চনা করেছিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করার ফলে সরস্বতীদেবী তাঁকে অর্চনা করেছিলেন। যেহেতু তিনি হচ্ছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই পতি বা প্রভু, তাই আমি তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৪

এই ত' কৈশোর-লীলার সূত্র-অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ৪ ॥

শ্লোকার্থ

এগার বছর বয়সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিষ্যদের পড়াতে শুরু করেন। সেই সময় থেকে তাঁর কৈশোর বয়সের শুরু।

শ্লোক ৫

শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্বলোকের চমকিত মন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যখন অধ্যাপনা করতে শুরু করেন, তখন শত শত শিষ্য তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করতে আসে এবং তাঁর ব্যাখ্যা শুনে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়।

শ্লোক ৬

সর্বশাস্ত্রে সর্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

সমস্ত পণ্ডিতদের সব রকম শাস্ত্র আলোচনায় তিনি পরাজিত করেছিলেন, তবুও তাঁর বিনীত ব্যবহারের জন্য, পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ দুঃখ অনুভব করেননি।

শ্লোক ৭

বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

শিষ্যদের সঙ্গে তিনি নানাভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলেন এবং নানারঙ্গে জাহ্নবীতে জলকেলি করেছিলেন।

শ্লোক ৮

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায়, তাঁহা লওয়ায় নাম-সংকীর্তন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

তার কিছুদিন পর মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামী ভক্তরা সমস্ত পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের তর্কে পরাজিত করে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবুও প্রচারকরূপে তাঁদের প্রধান কাজ হচ্ছে সর্বত্র সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করা। কেবল পণ্ডিতদের ও দার্শনিকদের পরাজিত করাটাই প্রচারকদের বৃত্তি নয়। প্রচারকদের কর্তব্য হচ্ছে সেই সঙ্গে সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করা, কেন না সেটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা।

শ্লোক ৯

**বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে ।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে ॥ ৯ ॥**

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিদ্যার প্রভাব দেখে শত শত পড়ুয়া তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করার জন্য আসতে লাগল।

শ্লোক ১০

**সেই দেশে বিপ্র, নাম—মিশ্র তপন ।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন ॥ ১০ ॥**

শ্লোকার্থ

পূর্ববাংলায় তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্থির করতে পারছিলেন না জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়।

তাৎপর্য

প্রথমেই স্থির করতে হবে জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং তারপর বুঝতে হবে কিভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা হচ্ছে গোস্বামীদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা, যা সমস্ত শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে।

শ্লোক ১১

**বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় ।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥ ১১ ॥**

শ্লোকার্থ

কেউ যদি বই-এর পোকার মতো বহু গ্রন্থ বা বহু শাস্ত্র পাঠ করে, বহু ভাষ্য শ্রবণ করে এবং বহু মানুষের নির্দেশ গ্রহণ করে, তা হলে তার চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা নির্ণয় করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/১৩/৮) বলা হয়েছে, *গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্ ন ব্যাখ্যা-মুপযুঞ্জীত*—"অধিক গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয়, বিশেষ করে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে ভগবদ্ভক্তদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা উচিত নয়।" মস্ত বড় পণ্ডিত হয়ে যশ ও ধন-সম্পদ উপার্জন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা উচিত। কেউ যদি অনেক বই পড়ে, তা হলে তার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং সে ভগবানের সেবায় মনকে স্থির করতে পারে না এবং সেই সঙ্গে

শাস্ত্রের মর্মার্থও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কেন না শাস্ত্রের মর্ম অত্যন্ত গভীর। সেই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, যারা বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে, বিশেষ করে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধীয় শাস্ত্র পাঠ করে, তারা অনন্য ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়, কেন না তাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে।

মানুষের ধর্ম অনুষ্ঠান আদি সকাম কর্ম এবং মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানালোচনার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এভাবেই অনাদিকাল থেকে বিভ্রান্ত হয়ে জীব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং তার ফলে তার জীবন ব্যর্থ হয়। এভাবেই বিপথে পরিচালিত হওয়ার ফলে অনভিজ্ঞ মানুষেরা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়। তপন মিশ্র হচ্ছেন সেই রকম মানুষদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি, তা তিনি স্থির করতে পারছিলেন না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তা শোনবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তপন মিশ্রের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে সেই সমস্ত মানুষের জন্য যারা এখানে সেখানে ঘুরে নানা রকম বই সংগ্রহ করে অথচ সেগুলি পড়ে না এবং সেভাবেই জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণে বিভ্রান্ত হয়।

শ্লোক ১২

**স্বপ্নে এক বিপ্র কহে,—শুনহ তপন ।
নিমাঞিপণ্ডিত পাশে করহ গমন ॥ ১২ ॥**

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্র যখন এভাবেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, "তপন! তুমি নিমাই পণ্ডিতের কাছে যাও।

শ্লোক ১৩

**তেঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয় ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো,—নাহিক সংশয় ॥ ১৩ ॥**

শ্লোকার্থ

"তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি যে তোমাকে সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।"

শ্লোক ১৪

**স্বপ্ন দেখি' মিশ্র আসি' প্রভুর চরণে ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১৪ ॥**

শ্লোকার্থ

সেই স্বপ্ন দেখে, তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং সবিস্তারে তাঁকে তাঁর স্বপ্নের কথা নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল ।
নাম-সংকীর্তন কর,—উপদেশ কৈল ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

সন্তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তাঁকে জীবনের উদ্দেশ্য এবং তা সাধন করার পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে নাম-সংকীর্তন (হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন) করতে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উপদেশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়ম-নিষ্ঠা সহকারে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমরা আমাদের পাশ্চাত্যের শিষ্যদের প্রতিদিন কমপক্ষে ষোল মালা জপ করতে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তবুও আমরা দেখি যে, তারা ষোল মালা পর্যন্ত জপ না করে নানা রকম সমস্ত কঠিন কঠিন বই নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন রকমের উপাসনা করার পন্থা অনুশীলন করার চেষ্টা করে নানাভাবে বিচলিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথমে তপন মিশ্রকে তাঁর চিত্ত ভগবানের নামে নিবদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমাদের, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উপদেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ১৬

তাঁর ইচ্ছা,—প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি ।
প্রভু আজ্ঞা দিল,—তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তপন মিশ্রের এই ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তিনি নবদ্বীপে বাস করবেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে বারাণসী যাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন।

শ্লোক ১৭

তাঁহা আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন ।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

বারাণসীতে তাঁদের আবার সাক্ষাৎ হবে, এই বলে মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং সেই আশ্বাসবাণী শুনে তপন মিশ্র বারাণসী গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

প্রভুর অতর্ক্যলীলা বুঝিতে না পারি ।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্যলীলা আমি বুঝতে পারি না, কেন না তপন মিশ্র যদিও তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করতে চেয়েছিলেন, তবুও মহাপ্রভু তাঁকে বারাণসী যাবার জন্য আদেশ দিলেন।

তাৎপর্য

তপন মিশ্রের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যখন মিলন হয়, তখন মহাপ্রভু গৃহস্থ-আশ্রমে ছিলেন এবং ভবিষ্যতে তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু তপন মিশ্রকে বারাণসীতে যাবার নির্দেশের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, তিনি জানতেন যে, ভবিষ্যতে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় তপন মিশ্রও সেই সুযোগে জীবনের উদ্দেশ্য এবং তা সাধন করার পন্থা অবগত হতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

এই মত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত ।
'নাম' দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গের লোকদের হরিনাম দান করে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করেন এবং তাদেরকে শিক্ষাদান করার মাধ্যমে পণ্ডিতে পরিণত করে তাদের মহাকল্যাণ সাধন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বিতরণ করছে এবং সারা পৃথিবীর মানুষকে সেই মহামন্ত্র কীর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করছে। অপ্রাকৃত শাস্ত্রের এক অসীম ভাণ্ডার পৃথিবীর সব কয়টি ভাষায় অনুবাদ করে আমরা পৃথিবীর মানুষকে এক অমূল্য সম্পদ দান করছি এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সেই গ্রন্থাবলী প্রচুর সংখ্যায় বিতরিত হচ্ছে এবং সেই দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সকলে মহানন্দে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছে। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারের পন্থা। যেহেতু মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রবর্তিত এই পন্থা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হোক, তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বিনীতভাবে চেষ্টা করে চলেছে যাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়।

শ্লোক ২০

এই মত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা ।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে নানা রকম লীলাবিলাসে মগ্ন ছিলেন। এদিকে নবদ্বীপে তাঁর পত্নী লক্ষ্মীদেবী তাঁর বিরহে অত্যন্ত দুঃখিতা হলেন।

শ্লোক ২১

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ।
বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ

বিরহরূপ সর্প লক্ষ্মীদেবীকে দংশন করল এবং তার ফলে তিনি অপ্রকট হলেন। এভাবেই তিনি তাঁর স্বধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/৬) বলা হয়েছে, *যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্*—"যেভাবে মানুষ সারা জীবন চিন্তা করার অনুশীলন করে, সেভাবেই তার মৃত্যুর সময়ে চিন্তার উদয় হয় এবং সেই চিন্তা অনুসারে সে তার পরবর্তী দেহ প্রাপ্ত হয়।" এই সূত্র অনুসারে লক্ষ্মীদেবী, যিনি মহাপ্রভুর বিরহে নিরন্তর তাঁর চিন্তায় মগ্না ছিলেন, অবশ্যই তাঁর ইহজগতের লীলা শেষ হওয়ার পর তিনি বৈকুণ্ঠলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

অন্তরে জানিলা প্রভু, যাতে অন্তর্যামী ।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি' ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের কথা জানতে পেরেছিলেন, কেন না তিনি হচ্ছেন অন্তর্যামী। তাই পুত্রবধূর মৃত্যুতে শোকার্তা জননীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন।

শ্লোক ২৩

ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন-জন ।
তত্ত্ব-জ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

বহু ধন-জন সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু ঘরে ফিরে এলেন এবং তিনি শচীমাতাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করে তাঁর দুঃখ মোচন করলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/১৩) বলা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন ও জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ওই দেহী একদেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। তাই, এই পরিবর্তনে তত্ত্বজ্ঞানী ধীর ব্যক্তিরা মুহ্যমান হন না।" *ভগবদ্গীতা* অথবা অন্য যে কোন বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের শ্লোকের মাধ্যমে দেহান্তর সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই সমস্ত মূল্যবান উপদেশ আলোচনা করার মাধ্যমে, ধীর ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে অবগত হতে পারেন যে, আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না, তা এক দেহ থেকে আর এক দেহে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। একে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। এক একটি আত্মা এই জড় জগতে এসে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কই দেহটিকে কেন্দ্র করে, আত্মাকে কেন্দ্র করে নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—"যিনি ধীর তিনি এই জড় জগতের এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে বিচলিত হন না।" এই প্রকার নির্দেশাবলীকে বলা হয় তত্ত্বকথা।

শ্লোক ২৪

শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস ।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি' ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবার অধ্যাপনা শুরু করেন। বিদ্যার বলে তিনি সকলকে পরাজিত করে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর পরিণয় ।
তবে ত' করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিবাহ হয় এবং অতঃপর তিনি কেশব কাশ্মীরী নামক দিগ্বীজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন।

তাৎপর্য

বর্তমানকালে খেলাধুলায় যেমন অনেক সেরা প্রতিযোগীকে দেখা যায়, তেমনই অতীতকালে ভারতবর্ষে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। এই রকম একজন

পণ্ডিত হচ্ছেন কেশব কাশ্মীরী, যিনি কাশ্মীর প্রদেশ থেকে এসেছিলেন। সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে অবশেষে তিনি নবদ্বীপে এসেছিলেন সেখানকার বিদ্বান পণ্ডিতদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতদের পরাজিত করতে পারেননি, কেন না তিনি বালক পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এক শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। তিনি নিম্বার্কাচার্য রচিত *বেদান্ত-দর্শনের পারিজাত-ভাষ্যের* টীকাকার শ্রীনিবাস আচার্যের বেদান্ত-কৌস্তুভ টীকার কৌস্তুভপ্রভা নামক টিপ্পনী রচনা করেন।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনা করা হয়েছে—(১) শ্রীনিবাস আচার্য, (২) বিশ্ব আচার্য, (৩) পুরুষোত্তম, (৪) বিলাস, (৫) স্বরূপ, (৬) মাধব, (৭) বলভদ্র, (৮) পদ্ম, (৯) শ্যাম, (১০) গোপাল, (১১) কৃপা, (১২) দেব আচার্য, (১৩) সুন্দর ভট্ট, (১৪) পদ্মনাভ, (১৫) উপেন্দ্র, (১৬) রামচন্দ্র, (১৭) বামন, (১৮) কৃষ্ণ, (১৯) পদ্মাকর, (২০) শ্রবণ, (২১) ভুরি, (২২) মাধব, (২৩) শ্যাম, (২৪) গোপাল, (২৫) বলভদ্র, (২৬) গোপীনাথ, (২৭) কেশব, (২৮) গোকুল ও (২৯) কেশব কাশ্মীরী। *ভক্তিরত্নাকরে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেশব কাশ্মীরী ছিলেন সরস্বতী দেবীর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত। তাঁর কৃপায় তিনি ছিলেন তখনকার দিনে সমগ্র ভারতের সব চাইতে প্রভাবশালী পণ্ডিত। তাই তিনি *দিগ্বিজয়ী* উপাধি লাভ করেছিলেন, যার অর্থ হচ্ছে—"তিনি সর্বদিকের সমস্ত পণ্ডিতদের পরাজিত করেছিলেন।" কাশ্মীরের এক অতি সম্মানিত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পরবর্তীকালে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তিনি তর্কযুদ্ধে অন্য পণ্ডিতদের পরাজিত করার বৃত্তি পরিত্যাগ করেন এবং এক মহান ভক্তে পরিণত হন।

শ্লোক ২৬

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

পূর্বে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যা অত্যন্ত স্বচ্ছ, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার দোষ বা গুণের বিচার করার প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ২৭

সেই অংশ কহি, তাঁরে করি' নমস্কার ।
যা শুনি' দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, আমি মহাপ্রভুর সেই বিশ্লেষণের কথা বর্ণনা করব, যা শুনে দিগ্বিজয়ী নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে ।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এক পূর্ণিমার রাত্রে মহাপ্রভু বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে, গঙ্গার তীরে বসে বিদ্যার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

শ্লোক ২৯

হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাঁহাই আইলা ।
গঙ্গারে বন্দন করি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

ঘটনাক্রমে সেই সময় কেশব কাশ্মীরী সেখানে এলেন এবং গঙ্গাকে বন্দনা করে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

শ্লোক ৩০

বসাইলা তারে প্রভু আদর করিয়া ।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

সম্মান সহকারে মহাপ্রভু তাঁকে বসতে দিলেন, কিন্তু অত্যন্ত গর্বস্ফীত কাশ্মীরী অবজ্ঞাভরে মহাপ্রভুর সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলেন।

শ্লোক ৩১

ব্যাকরণ পড়াহ, নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম ।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ৩১ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি বললেন, "আমি শুনেছি যে, তুমি ব্যাকরণ পড়াও এবং তোমার নাম হচ্ছে নিমাই পণ্ডিত। লোকে তোমার প্রাথমিক ব্যাকরণ সম্বন্ধে খুব প্রশংসা করে।

তাৎপর্য

পূর্বে সংস্কৃত টোলে প্রথমে ব্যাপকভাবে ব্যাকরণ শেখানো হত এবং সেই প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। শিক্ষার্থীকে প্রথম বারো বছর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে

হত, কেন না সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ভালভাবে রপ্ত করতে পারলে, সমস্ত শাস্ত্র যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তাই কেশব কাশ্মীরী প্রথমে তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষার উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর নিজের বিদ্যার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন; তিনি ছিলেন ব্যাকরণ শিক্ষার বহু উর্ধ্বে এবং তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কোন তুলনাই হয় না।

শ্লোক ৩২

ব্যাকরণ-মধ্যে, জানি, পড়াহ কলাপ ।
শুনিলুঁ ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি কলাপ নামক ব্যাকরণ পড়াও এবং তোমার শিষ্যরা ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটিল প্রশ্ন বিষয়ে আলাপে বিশেষ দক্ষ।"

তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন ব্যাকরণ রয়েছে, তার মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধ হচ্ছে *পাণিনি, কলাপ* ও *কৌমুদী* ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে এবং ছাত্রদের বারো বছর ধরে সেই সমস্ত বিভাগ অধ্যয়ন করতে হত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি তখন নিমাই পণ্ডিত নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ব্যাকরণ পড়াতেন এবং তারা ব্যাকরণের ফাঁকিতে অর্থাৎ জটিল প্রশ্ন বিষয়ে আলোচনায় অত্যন্ত পারদর্শিতা লাভ করতেন। যিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে দক্ষ, তিনি শব্দের মূল অর্থ পরিবর্তন করে শাস্ত্রের বিভিন্ন রকম অর্থ করতে পারেন। ব্যাকরণের ফাঁকিতে দক্ষ বৈয়াকরণিকেরা শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে কদর্থও করতে পারেন। কেশব কাশ্মীরী পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি ব্যাকরণের মস্ত বড় অধ্যাপক, তবুও এই ধরনের ব্যাকরণের ফাঁকি দিয়ে মূল শব্দের পরিবর্তন করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। এভাবেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিলেন। কেশব কাশ্মীরীর সঙ্গে যে নিমাই পণ্ডিতের শাস্ত্র আলোচনা হবে তা পূর্বে নির্ধারিত ছিল, তাই তিনি প্রথম থেকেই মহাপ্রভুকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টা করেছিলেন। তখন মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন—

শ্লোক ৩৩

প্রভু কহে, ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি ।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "হ্যাঁ, ব্যাকরণের অধ্যাপক বলে আমার খ্যাতি রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাকরণের জ্ঞান আমি আমার শিষ্যদের বুঝাতে পারি না, আর তারাও আমাকে বুঝতে পারে না।

তাৎপর্য

কেশব কাশ্মীরী ছিলেন অত্যন্ত গর্বস্ফীত, তাই তাঁর সেই মিথ্যাগর্ব বর্ধিত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত নগণ্য বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তাঁকে নানাভাবে প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

কাঁহা তুমি সর্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ ।
কাঁহা আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"কোথায় সর্বশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন এবং কবিতা রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী আপনি, আর কোথায় নবীন পড়ুয়া শিশু আমি।

শ্লোক ৩৫

তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন ।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই আপনার কবিত্ব শুনতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। আপনি যদি কৃপা করে কিছু গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেন, তা হলে আমরা শুনতে পারি।"

শ্লোক ৩৬

শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বে বর্ণিতে লাগিলা ।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে কেশব কাশ্মীরী আরও গর্বিত হলেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করে একশোটি শ্লোক রচনা করে আবৃত্তি করলেন।

শ্লোক ৩৭

শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার ।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করে মহাপ্রভু বললেন, "আপনার মতো কবি সারা পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

শ্লোক ৩৮

তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি ।
তুমি ভাল জান অর্থ, কিংবা সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার কবিতা বোঝবার ক্ষমতা কারও নেই। আপনি অথবা সরস্বতী দেবীই মাত্র তার অর্থ জানেন।

তাৎপর্য

পরোক্ষভাবে কেশব কাশ্মীরীকে কটাক্ষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হ্যাঁ, আপনার রচনা এত সুন্দর যে, আপনি ও আপনার আরাধ্যা সরস্বতীদেবী ছাড়া তা বোঝবার ক্ষমতা আর কারওই নেই।" কেশব কাশ্মীরী ছিলেন সরস্বতীদেবীর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সরস্বতীদেবীর প্রভু, তাই পরিহাস ছলে দেবীর ভক্তের সঙ্গে কথা বলার অধিকার তাঁর রয়েছে। পক্ষান্তরে, কেশব কাশ্মীরী যদিও সরস্বতীদেবীর দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার ফলে গর্বিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি জানতেন না যে, সরস্বতীদেবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অধীন তত্ত্ব, কেন না তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩৯

এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ-মুখে ।
শুনি' সব শ্লোক তবে পাইব বড়সুখে ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কিন্তু আপনি যদি একটি শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করে শোনান, তা হলে আপনার নিজের মুখের বিশ্লেষণ শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব।"

শ্লোক ৪০

তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল ।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী তখন তাঁকে কোন্ শ্লোকের অর্থ তিনি শুনতে চান, তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মহাপ্রভু তখন কেশব কাশ্মীরীর রচিত একশোটি শ্লোকের মধ্য থেকে একটি শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা ।

দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৪১ ॥

মহত্ত্বম্—মহিমা; গঙ্গায়াঃ—গঙ্গার; সততম্—সর্বদা; ইদম্—এই; আভাতি—প্রকাশিত; নিতরাম্—অতুলনীয়ভাবে; যৎ—যেহেতু; এষা—ইনি; শ্রীবিষ্ণোঃ—শ্রীবিষ্ণুর; চরণ—চরণ; কমল—পদ্মফুল; উৎপত্তি—উৎপত্তি; সুভগা—সৌভাগ্যবতী; দ্বিতীয়—দ্বিতীয়; শ্রীলক্ষ্মীঃ—শ্রীলক্ষ্মীদেবী; ইব—মতন; সুর-নরৈঃ—দেবতা ও মানুষদের দ্বারা; অর্চ্য—উপাস্য; চরণা—চরণযুগল; ভবানী—দুর্গাদেবীর; ভর্তুঃ—পতির; যা—তিনি; শিরসি—মস্তকে; বিভবতি—সমৃদ্ধি লাভ করেছেন; অদ্ভুত—অদ্ভুত; গুণা—গুণাবলী।

অনুবাদ

" 'এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্বদা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। তিনিই সব চাইতে সৌভাগ্যবতী, কেন না তিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল থেকে উৎপন্না হয়েছেন এবং তাই তিনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের মতো দেবতা ও মানুষের দ্বারা সর্বদা পূজিতা হন। অদ্ভুত গুণসমূহের দ্বারা বিভূষিতা হয়ে তিনি ভবানীপতি মহাদেবের মস্তকে বিরাজ করার সমৃদ্ধি লাভ করেছেন।' "

শ্লোক ৪২

'এই শ্লোকের অর্থ কর'—প্রভু যদি বৈল ।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁকে এই শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করতে বললেন, তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মহাপ্রভুকে বললেন—

শ্লোক ৪৩

ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল ।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি ঝড়ের বেগে এই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেছি, তুমি কিভাবে তার মধ্য থেকে এই শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করলে?"

শ্লোক ৪৪

প্রভু কহে, দেবের বরে তুমি—'কবিবর' ।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় 'শ্রুতিধর' ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "ভগবানের কৃপায় তুমি যেমন কবিবর হয়েছ, তেমনই তাঁর কৃপায় কেউ কেউ শ্রুতিধরও হয়।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকের *শ্রুতিধর* শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *শ্রুতি* মানে 'শ্রবণ' এবং *ধর* মানে 'যিনি ধারণ করতে পারেন'। পূর্বকালে, অর্থাৎ কলিযুগ শুরু হওয়ার আগে প্রায় সকলেই, বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা *শ্রুতিধর* ছিলেন। গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে বৈদিক তত্ত্ব শ্রবণ করা মাত্র শিষ্য তা চিরকাল মনে রাখতে পারতেন। তাই তখন বই পড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং তাই তখন বই লেখাও হত না। গুরুদেব বৈদিক মন্ত্র ও তার ব্যাখ্যা শোনাতেন এবং শিষ্যরা তা চিরকাল মনে রাখতেন।

শ্রুতিধর হওয়া, অর্থাৎ একবার শ্রবণ করার মাধ্যমে স্মরণ রাখার ক্ষমতা একটি মস্ত বড় সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৪১) শ্রীভগবান বলেছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্ ॥

"যা কিছু সুন্দর, মহৎ ও শক্তিশালী তা সবই আমার বিভূতির অংশসম্ভূত।"

যখনই আমরা অসাধারণ কিছু দেখি, তখনই আমাদের বুঝতে হবে যে, সেই অসাধারণ প্রকাশটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রকাশ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেশব কাশ্মীরীকে বলেছিলেন যে, তিনি যেমন সরস্বতীদেবীর বিশেষ কৃপা লাভ করে গর্বিত হয়েছেন, তেমনই অন্য কেউ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করে *শ্রুতিধরও* হতে পারেন এবং একবার মাত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে তিনি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন।

শ্লোক ৪৫

শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ ।
প্রভু কহে—কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে, ব্রাহ্মণ (কেশব কাশ্মীরী) শ্লোকের অর্থ বিশ্লেষণ করলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন, "এখন আপনি দয়া করে এই শ্লোকের বিশেষ গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করুন।"

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ ঝড়ের বেগে একের পর এক একশোটি শ্লোক আবৃত্তি করলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল তার থেকে একটি শ্লোকের হুবহু উদ্ধৃতিই দেননি, তিনি তার দোষ-গুণ বিচার করেছিলেন। তিনি কেবল শ্লোকগুলি স্মরণই করেননি, তিনি তৎক্ষণাৎ নিখুঁতভাবে সেগুলির দোষ-গুণও বিচার করেছিলেন।

শ্লোক ৪৬

বিপ্র কহে, শ্লোকে নাহি দোষের আভাস ।
উপমালঙ্কার গুণ, কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

ব্রাহ্মণ উত্তর দিয়েছিলেন, "এই শ্লোকে দোষের কোন আভাসও নেই। পক্ষান্তরে, তাতে উপমালঙ্কার গুণ ও অনুপ্রাস রয়েছে।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন তার শেষ লাইনে ভ অক্ষরটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—*ভবানী, ভর্তু, বিভবতি* ও *অদ্ভুত*। এই ধরনের পুনরাবৃত্তিকে বলা হয় *অনুপ্রাস*। *লক্ষ্মীরিব* এবং *বিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি* হচ্ছে *উপমা-অলংকারের* দৃষ্টান্ত, কেন না সেগুলিতে উপমার সৌন্দর্য প্রদর্শিত হয়েছে। গঙ্গা হচ্ছে জল, আর লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। যেহেতু জল ও ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সমতুল্য নয়, তাই তাদের তুলনা করা একটি উপমা।

শ্লোক ৪৭

প্রভু কহেন,—কহি, যদি না করহ রোষ ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "আপনি যদি রুষ্ট না হন, তা হলে আমি আপনাকে কিছু বলব। আপনি কি বলতে পারেন, এই শ্লোকে কি কি দোষ রয়েছে?

শ্লোক ৪৮

প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে ।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণদোষে ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার কবিতা যে, কবিত্ব প্রতিভায় পূর্ণ সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই এবং তা অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করেছে। তবুও ভালমতো বিচার করলে তাতে দোষ ও গুণ উভয়ই দেখা যায়।"

শ্লোক ৪৯

তাতে ভাল করি' শ্লোক করহ বিচার ।
কবি কহে,—যে কহিলে সেই বেদসার ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তারপর বললেন, "তাই ভাল করে শ্লোকটি বিচার করুন।" কবি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, যে শ্লোকটি তুমি এখন আবৃত্তি করলে, তা সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত।

শ্লোক ৫০

ব্যাকরণিয়া তুমি নাহি পড় অলঙ্কার ।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি একজন সাধারণ ব্যাকরণের ছাত্র। অলঙ্কার সম্বন্ধে তুমি কি জান? এই কবিতা যে কবিত্বের সার, সেই সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না।"

তাৎপর্য

কেশব কাশ্মীরী এই প্রসঙ্গে তাঁর বাক্‌চাতুরীর দ্বারা চৈতন্য মহাপ্রভুকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যেহেতু তিনি উচ্চতর সাহিত্য অধ্যয়ন করেননি, তাই সব রকম উপমা ও অলঙ্কার সমন্বিত তাঁর কবিতার সমালোচনা করার যোগ্যতা তাঁর নেই। এই যুক্তির কিছুটা সত্যতা রয়েছে। ডাক্তার না হলে ডাক্তারের সমালোচনা করা যায় না। উকিল না হলে উকিলের সমালোচনা করা যায় না। তাই কেশব কাশ্মীরী প্রথমে মহাপ্রভুর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কাছে একজন ব্যাকরণের ছাত্র ছিলেন, তাই তিনি কিভাবে তাঁর মতো একজন মহাকবির লেখার সমালোচনা করতে সাহস করেন? তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অন্যভাবে সেই কবির সমালোচনা করেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, যদিও তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নন, তবুও তিনি অন্যদের কাছে এই ধরনের কবিতার সমালোচনা শুনেছেন এবং একজন *শ্রুতিধররূপে* তিনি এই ধরনের সমালোচনার পন্থা সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫১

প্রভু কহেন,—অতএব পুছিয়ে তোমারে ।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

বিনীতভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "আমি যেহেতু আপনার সমপর্যায়ভুক্ত নই, তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, এই কবিতার দোষ ও গুণগুলি আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্লোক ৫২

নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি অলঙ্কার পড়িনি, তবে আমি উচ্চতর গোষ্ঠীতে শ্রবণ করেছি এবং তার ফলে এই শ্লোকটির বিচার করে তাতে আমি বহু দোষ ও গুণ দেখতে পাচ্ছি।"

তাৎপর্য

করিয়াছি শ্রবণ উক্তিটি এই অর্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না অধ্যয়ন অথবা অনুভবের থেকেও শ্রবণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি ভালভাবে এবং যথার্থ সূত্র থেকে শ্রবণ করে, তা হলে তিনি অচিরেই পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন। এই পন্থাকে বলা হয় *শ্রৌতপন্থা* বা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা। সমস্ত বৈদিক জ্ঞান লাভ করার পন্থা হচ্ছে, সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়ে তাঁর কাছ থেকে *বেদের* প্রামাণিক জ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান লাভ করতে হলে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করতে হয় এবং যথাযথভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। এই পন্থাকে বলা হয় *অবরোহ-পন্থা*।

শ্লোক ৫৩

কবি কহে,—কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ ।
প্রভু কহেন,—কহি, শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

কবি বললেন, "তুমি তা হলে বল এতে কি গুণ আছে এবং দোষ আছে।" মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "আমি তা বলছি, দয়া করে আপনি রুষ্ট হবেন না।

শ্লোক ৫৪

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার ।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ রয়েছে এবং পাঁচটি অলঙ্কার রয়েছে। একে একে আমি সেগুলি বর্ণনা করছি। দয়া করে আপনি সেগুলি বিচার করে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

তাৎপর্য

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ এই শ্লোকে পাঁচটি অলংকার আছে, সেগুলি গুণ এবং পাঁচটি দোষ আছে। দুই স্থানে *অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ* দোষ এবং তিন স্থানে *বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি* ও *ভগ্নক্রম* দোষ আছে।

বিমৃষ্ট মানে হচ্ছে 'পরিষ্কার' এবং *বিধেয়াংশ* মানে হচ্ছে 'বিধেয়-এর অংশ'। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, প্রথমে উদ্দেশ্য এবং তারপর বিধেয় উক্ত হয়। যেমন, কেউ

যখন বলে, "এই মানুষটি বিদ্বান", সেই বাক্যটি ঠিক। কিন্তু কেউ যদি বলে, "বিদ্বান এই মানুষটি", তা হলে সেই বাক্যটি ভুল। এই ধরনের দোষকে বলা হয় *অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ* বা অপরিচ্ছন্ন বাক্য গঠনের দোষ। সেই শ্লোকের বিষয় হচ্ছে গঙ্গার মহিমা। তাই *ইদম্* ('এই') শব্দটি মহিমার পশ্চাতে প্রয়োগ না হয়ে পূর্বে হওয়া উচিত ছিল। সেই বিষয়টি জ্ঞাত, তাই অজ্ঞাত বিষয়ের পূর্বে স্থাপন করা উচিত যাতে তার অর্থ বিকৃত না হয়ে যায়।

দ্বিতীয় *অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ*-দোষটি হচ্ছে *দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব।* এই রচনায় *দ্বিতীয়* শব্দটি বিধেয় বা অজ্ঞাত। অজ্ঞাত বিষয়টি পূর্বে প্রয়োগ হওয়ার ফলে *দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব* শব্দটি আর একটি ভুল। *দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব* শব্দগুলি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে গঙ্গার তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই দোষের ফলে এই জটিল শব্দটির অর্থ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।

তৃতীয় দোষটি হচ্ছে *ভবানীভর্তুঃ* শব্দে *বিরুদ্ধমতি* দোষ। *ভবানী* হচ্ছেন ভব বা শিবের পত্নী। কিন্তু যেহেতু *ভবানী* শব্দে শিবপত্নীকে বোঝায়, তাই তাঁর *ভর্তা* বা পতি শব্দটি ব্যবহার করার ফলে তার অর্থ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, 'শিবের পত্নীর পতি', সুতরাং তা বিরুদ্ধ অর্থবাচক, কেন না তার ফলে মনে হয় যেন শিবের পত্নীর অন্য আর একজন পতি রয়েছে।

চতুর্থ দোষটি হচ্ছে *পুনরুক্তি*, অর্থাৎ *বিভবতি* ক্রিয়ায় বাক্য শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানে *অদ্ভুতগুণা* বিশেষণ দেওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হয়েছে। পঞ্চম দোষটি হচ্ছে *ভগ্নক্রম* দোষ, অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই তিন পাদে *ত* কার, *র* কার এবং ভ কার-এর অনুপ্রাস আছে, দ্বিতীয় পাদে অনুপ্রাস নেই, তাই এটি হচ্ছে *ভগ্নক্রম* দোষ।

শ্লোক ৫৫

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—দুই ঠাঞি চিহ্ন ।
'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরাত্ত',—দোষ তিন ॥ ৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্লোকে দুবার অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়েছে এবং বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম ও পুনরাত্ত দোষগুলি একবার করে রয়েছে।

শ্লোক ৫৬

'গঙ্গার মহত্ত্ব'—শ্লোকে মূল 'বিধেয়' ।
ইদং শব্দে 'অনুবাদ'—পাছে অবিধেয় ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গঙ্গার মাহাত্ম্য (মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ) হচ্ছে এই শ্লোকের মুখ্য অজ্ঞাত বিষয় বা বিধেয় এবং জ্ঞাত বিষয় হচ্ছে 'ইদম্' শব্দটি, যা অজ্ঞাত বিষয়ের পরে প্রয়োগ করা হয়েছে।

শ্লোক ৫৭

'বিধেয়' আগে কহি' পাছে কহিলে 'অনুবাদ' ।
এই লাগি' শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাধ ॥ ৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু আপনি জ্ঞাত বিষয়টি পরে এবং অজ্ঞাত বিষয়টি আগে ব্যবহার করেছেন, তাই এই রচনা দোষযুক্ত এবং তার ফলে শব্দগুলির অর্থ হানি হয়েছে।

শ্লোক ৫৮

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদম্—পরিজ্ঞাত বিষয়; **অনুক্ত্বা**—অনুক্ত; **এব**—অবশ্যই; **ন**—না; **বিধেয়ম্**—অপরিজ্ঞাত বস্তু; **উদীরয়েৎ**—উল্লেখ করা উচিত; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **অলব্ধ-আস্পদম্**—উপযুক্ত স্থান লাভ না করে; **কিঞ্চিৎ**—কিঞ্চিৎ; **কুত্রচিৎ**—কোনখানে; **প্রতিতিষ্ঠতি**—প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

অনুবাদ

"'জ্ঞাত বিষয় (অনুবাদ) প্রথমে উল্লেখ না করে, অজ্ঞাত বিষয় (বিধেয়) উল্লেখ করা উচিত নয়, কেন না তা হলে সেই বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তার প্রতিষ্ঠা হয় না।'

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *একাদশীতত্ত্ব* থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্লোক ৫৯

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী'—ইঁহা 'দ্বিতীয়ত্ব' বিধেয় ।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী'-এর দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়। এই সমাসে অর্থ গৌণ হল এবং তার ফলে প্রকৃত অর্থটি ক্ষয়প্রাপ্ত হল।

শ্লোক ৬০

'দ্বিতীয়' শব্দ—বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে ।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু 'দ্বিতীয়' শব্দটি বিধেয়, তাই সমাসে 'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ বিনষ্ট হয়েছে।

শ্লোক ৬১

'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—এই দোষের নাম ।
আর এক দোষ আছে, শুন সাবধান ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"কেবল অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষই নয়, তাতে আর একটি দোষও আছে, যা আমি আপনাকে দেখাব। দয়া করে আপনি সাবধানতার সঙ্গে তা শুনুন।

শ্লোক ৬২

'ভবানীভর্তুঃ'-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নাম এই মহা দোষ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"আর একটি বড় দোষ হচ্ছে যে, আপনি 'ভবানীভর্তুঃ' শব্দটি সন্তুষ্ট চিত্তে প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তাতে 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নামে দোষ হয়েছে।

শ্লোক ৬৩

ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী ।
তাঁর ভর্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্তা জানি ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'ভবানী' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'মহাদেবের পত্নী'। কিন্তু আপনি যখন তাঁর পতির উল্লেখ করেন, তা হলে মনে হয় যেন তাঁর আর একজন পতি রয়েছে।

শ্লোক ৬৪

'শিবপত্নীর ভর্তা' ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শিবপত্নীর ভর্তা' এই শব্দটি পরস্পর-বিরোধী শোনায়। এই ধরনের শব্দের প্রয়োগকে শাস্ত্রে বিরুদ্ধমতিকৃৎ নামক দোষ বলে বর্ণনা করা হয়।

শ্লোক ৬৫

'ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্তার হস্তে দেহ দান' ।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়ভর্তা জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"কেউ যদি বলে, 'ব্রাহ্মণ-পত্নীর পতির হস্তে দান কর', তবে তা শুনলে মনে হয় যেন ব্রাহ্মণ-পত্নীর আর একজন পতি রয়েছে।

শ্লোক ৬৬

'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ ।
'অদ্ভুতগুণা'—এই পুনরাত্ত দূষণ ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'বিভবতি' শব্দটি পূর্ণ, তাতে 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণটি যোগ করার ফলে 'পুনরুক্তি' দোষ হয়েছে।

শ্লোক ৬৭

তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম ।
এক পাদে নাহি, এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্লোকের তিনটি পাদে অত্যন্ত সুন্দর অনুপ্রাস রয়েছে, কিন্তু একটি পাদে নেই। তার ফলে ভগ্নক্রম দোষ হয়েছে।

শ্লোক ৬৮

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার ।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও এই শ্লোক পাঁচটি অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত, তবুও এই পাঁচটি দোষ শ্লোকটিকে ছারখার করে দিয়েছে।

শ্লোক ৬৯

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয় ।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"কোন শ্লোকে যদি দশটি অলঙ্কার থাকেও, কিন্তু তাতে একটি দোষ থাকলেও সেই শ্লোকটি বাতিল হয়ে যায়।

শ্লোক ৭০

সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত ।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"কারও সুন্দর শরীর নানা অলংকারে ভূষিত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে যদি শ্বেতকুষ্ঠের একটি দাগও থাকে, তা হলে সেই শরীরটি শ্রীহীন দেখায়।

তাৎপর্য

অলংকার শাস্ত্রবিৎ মহর্ষি ভরত মুনি এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শ্লোক ৭১

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্ ।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৭১ ॥

রস—শৃঙ্গার আদি রস; অলঙ্কারবৎ—অনুপ্রাস, উপমা আদি অলঙ্কার সমন্বিত; কাব্যম্—কাব্য; দোষ-যুক্—দোষযুক্ত; চেৎ—যদি; বিভূষিতম্—অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভূষিত; স্যাৎ—হয়; বপুঃ—শরীর; সুন্দরম্—সুন্দর; অপি—যদিও; শ্বিত্রেণ—শ্বেতকুষ্ঠের দ্বারা; একেন—এক; দুর্ভগম্—শ্রীহীন।

অনুবাদ

" 'নানা অলংকারে বিভূষিত সুন্দর শরীর শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত হলে যেমন শ্রীহীন হয়, তেমনই অনুপ্রাস, উপমা আদি অলংকারের দ্বারা ভূষিত কাব্যও দোষযুক্ত হলে সেই রকম হয়।'

শ্লোক ৭২

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার ।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন আপনি পাঁচটি অলঙ্কারের বিচার শুনুন। এই শ্লোকে দুটি শব্দালঙ্কার এবং তিনটি অর্থালঙ্কার রয়েছে।

শ্লোক ৭৩

শব্দালঙ্কার—তিনপাদে আছে অনুপ্রাস ।
'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনটি পাদে যে অনুপ্রাস রয়েছে, সেগুলি শব্দালঙ্কার এবং 'শ্রীলক্ষ্মী' এই সমাসটিতে পুনরুক্তবদাভাস রয়েছে।

শ্লোক ৭৪

প্রথম-চরণে পঞ্চ 'ত'-কারের পাঁতি ।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ 'রেফ'-স্থিতি ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রথম চরণে পাঁচটি 'ত'-কার রয়েছে এবং তৃতীয় চরণে পাঁচটি 'রেফ' রয়েছে।

শ্লোক ৭৫

চতুর্থ-চরণে চারি 'ভ'-কার-প্রকাশ ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"চতুর্থ চরণে চারটি 'ভ'-কার রয়েছে, তাই তা অনুপ্রাসরূপে শব্দালঙ্কারের দ্বারা শ্লোকটিকে ভূষিত করেছে।

শ্লোক ৭৬

'শ্রী'-শব্দে, 'লক্ষ্মী'-শব্দে—এক বস্তু উক্ত ।
পুনরুক্তপ্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যদিও 'শ্রী' ও 'লক্ষ্মী' শব্দ দুটি একই অর্থবাচক এবং তার ফলে অনেকটা পুনরুক্তির মতো মনে হলেও তবুও তা পুনরুক্তি নয়।

শ্লোক ৭৭

'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ ।
পুনরুক্তবদাভাস, শব্দালঙ্কার ভেদ ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

"লক্ষ্মীকে শ্রী (ঐশ্বর্য) যুক্ত বলে বর্ণনা করায় অর্থের বিভেদ এবং পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার যুক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৭৮

'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার—উপমা-প্রকাশ ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম—'বিরোধাভাস' ॥ ৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'লক্ষ্মীরিব' ('লক্ষ্মীর মতো') উপমা নামক অর্থালঙ্কার প্রকাশ করেছে। আর বিরোধাভাস নামক আর একটি অর্থালঙ্কারও রয়েছে।

শ্লোক ৭৯

'গঙ্গাতে কমল জন্মে'—সবার সুবোধ ।
'কমলে গঙ্গার জন্ম'—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সকলেই জানে যে, গঙ্গায় কমল জন্মায়। কিন্তু যদি কমলে গঙ্গার জন্ম বলা হয়, তা পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ হয়।

শ্লোক ৮০

'ইঁহা বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি' ।
বিরোধালঙ্কার ইহা মহা-চমৎকৃতি ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়। যদিও পদ্ম থেকে গঙ্গার উৎপত্তির বর্ণনা বিরুদ্ধভাব-বাচক, কিন্তু এখানে শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা এক মহা চমৎকার বিরোধালঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

শ্লোক ৮১

ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, বিরোধ-আভাস ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে গঙ্গার প্রকাশ হয়েছে, এই উক্তিতে বিরোধ নেই, যদিও তা বিরুদ্ধ বলে মনে হয়।

তাৎপর্য

বৈষ্ণব দর্শনের মূলভাব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অচিন্ত্য শক্তিকে স্বীকার করা। জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কখনও যা বিরুদ্ধ বলে মনে হয়, তা পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে স্বাভাবিক বলে বোঝা যায়। কারণ, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি যে-কোন বিরুদ্ধ কার্য সম্পাদন করতে পারেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না, কিভাবে এই বিশাল আয়তনের রাসায়নিক পদার্থগুলি জড় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের ফলে জল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, এই বিশাল পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এল কোথা থেকে এবং কিভাবে তাদের মিলনের ফলে সমস্ত মহাসাগরের জল সৃষ্টি হল? তার উত্তর তারা দিতে পারে না, কেন না তারা হচ্ছে নাস্তিক এবং তারা কখনই স্বীকার করতে চায় না যে, সব কিছুর প্রকাশ হয়েছে ভগবান থেকে। তাদের মতবাদ হচ্ছে যে, ভগবান বলে কিছু নেই এবং জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে।

এই রাসায়নিক উপাদানগুলি এল কোথা থেকে? তার উত্তর হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সেগুলির সৃষ্টি হয়েছে। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ এবং তাদের শরীর থেকে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। যেমন, লেবুগাছ একটি জীব এবং তাতে অনেক লেবু হয়, আর প্রতিটি লেবুর মধ্যে অনেকটা করে সাইট্রিক এসিড রয়েছে। তাই, একটি নগণ্য জীব, যে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, সে যদি এত রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে যে কি পরিমাণ শক্তি রয়েছে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

পৃথিবীর সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি তৈরি হল কোথা থেকে, সেই সম্পর্কে জড় বৈজ্ঞানিকেরা কিছুই বলতে পারে না। কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি মেনে নিলে যথাযথভাবে তা ব্যাখ্যা করা যায়। এই যুক্তি অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। পরমেশ্বর ভগবানের অতি ক্ষুদ্র অংশ জীবের যদি অচিন্ত্য শক্তি থাকতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি কতটা হতে পারে? *বেদে* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—"তিনি হচ্ছেন সমস্ত নিত্যবস্তুর মধ্যে পরম নিত্য এবং সমস্ত চেতন বস্তুর মধ্যে পরম চেতন।" (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩)

দুর্ভাগ্যবশত, নাস্তিক বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করতে চায় না যে, চেতন শক্তি থেকে জড় পদার্থের উদ্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা সব চাইতে মূর্খ এবং তারা যুক্তিহীন মতবাদ পোষণ করে বলে যে, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাদের গবেষণাগারগুলিতে তারা জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি করতে পারেনি, অথচ চেতন শক্তি থেকে যে জড় পদার্থের উদ্ভব হয় তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সর্বত্র রয়েছে। তাই, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি মেনে নেয়, তখন সেই মতবাদকে কেউই খণ্ডন করতে পারে না, তা তিনি যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোন বা দার্শনিকই হোন না কেন। সেই কথা পরবর্তী সংস্কৃত শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।

শ্লোক ৮২

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু ।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৮২ ॥

অম্বুজম্—পদ্মফুল; **অম্বুনি**—জলে; **জাতম্**—জন্ম হয়; **ক্বচিৎ**—কোন সময়; **অপি**—অবশ্যই; **ন**—না; **জাতম্**—উৎপন্ন; **অম্বুজাৎ**—পদ্মফুল থেকে; **অম্বু**—জল; **মুর-ভিদি**—মুরাসুর সংহারকারী শ্রীকৃষ্ণে; **তৎ-বিপরীতম্**—তার ঠিক বিপরীত; **পাদ-অম্ভোজাৎ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম থেকে; **মহা-নদী**—মহানদী (গঙ্গা); **জাতা**—উৎপন্না হয়েছে।

অনুবাদ

"সকলেই জানে যে, জলে পদ্মফুল জন্মায়, কিন্তু জল কখনও পদ্মফুল থেকে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে তার বিপরীত দেখা যায়। তাঁর পাদপদ্ম থেকে মহানদী গঙ্গা জন্ম লাভ করেছে।

শ্লোক ৮৩

গঙ্গার মহত্ত্ব—সাধ্য, সাধন তাহার ।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান' অলঙ্কার ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"গঙ্গার প্রকৃত মাহাত্ম্য হচ্ছে যে, তিনি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম থেকে উৎপন্না হয়েছেন। এটি অনুমান নামক আর একটি অলংকার।

শ্লোক ৮৪

স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার ।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি কেবল পাঁচটি স্থূল দোষ এবং পাঁচটি অলংকারের আলোচনা করলাম। কিন্তু যদি আমি সূক্ষ্মভাবে বিচার করি, তা হলে এই শ্লোকে অসংখ্য দোষ রয়েছে।

শ্লোক ৮৫

প্রতিভা, কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে ।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ-বাধে ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার আরাধ্য দেবতার কৃপায় আপনি কবিত্ব ও প্রতিভা লাভ করেছেন। কিন্তু যথাযথভাবে বিচার না করে কবিত্ব করলে তা অবশ্যই সমালোচনার বিষয় হয়।

শ্লোক ৮৬

বিচারি' কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্মল ।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"যথাযথভাবে বিচার করে কবিত্ব করলে তা অত্যন্ত নির্মল বলে বিবেচনা করা হয় এবং তা অনুপ্রাস ও উপমা আদি অলংকারে বিভূষিত হলে তার অর্থ ঝলমল করে।"

শ্লোক ৮৭

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত ।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ব্যাখ্যা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিস্মিত হলেন। তাঁর প্রতিভা স্তম্ভিত হল এবং তাঁর মুখে কোন কথা বের হল না।

শ্লোক ৮৮

কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর ।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর মুখে কোন উত্তর এল না। তখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন।

শ্লোক ৮৯

পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি লোপ ।
জানি—সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বালকটি আমার বুদ্ধি লোপ করেছে। তাই আমি বুঝতে পারছি যে, সরস্বতী আমার প্রতি রুষ্টা হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা থেকে বুদ্ধি আসে। পরমাত্মা পণ্ডিতকে এটি বোঝবার বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, যেহেতু তিনি তাঁর জ্ঞানের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সরস্বতীর মাধ্যমে তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন। সুতরাং কারওই পক্ষে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। তিনি যদি অত্যন্ত বড় পণ্ডিতও হন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করলে, তাঁর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তিনি ঠিকমতো কথা পর্যন্ত বলতে পারবেন না। আমরা সর্বতোভাবে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই, আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে অহঙ্কারে মত্ত না হয়ে সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত থাকা। সরস্বতীদেবী এই অবস্থার সৃষ্টি করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে কৃপা করেছিলেন, যাতে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করতে পারেন।

শ্লোক ৯০

যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি ।
নিমাঞি-মুখে রহি' বলে আপনে সরস্বতী ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বালকটি যে অর্থ ব্যাখ্যা করল তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, মা সরস্বতী নিশ্চয়ই এই বালকটির মুখ দিয়ে কথা বলেছেন।"

শ্লোক ৯১

এত ভাবি' কহে,—শুন, নিমাঞি পণ্ডিত ।
তব ব্যাখ্যা শুনি' আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই ভেবে পণ্ডিত বললেন, "নিমাই পণ্ডিত! দয়া করে আমার কথা শুন, তোমার ব্যাখ্যা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি।

শ্লোক ৯২

অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস ।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"তুমি অলংকার শাস্ত্র পড় না এবং শাস্ত্র অধ্যয়নেও তোমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি যে কিভাবে এই সমস্ত অর্থ প্রকাশ করলে, তা ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি।"

শ্লোক ৯৩

ইহা শুনি' মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী ।
তাঁহার হৃদয় জানি' কহে করি' ভঙ্গী ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে এবং পণ্ডিতের হৃদয়ের ভাব জেনে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঙ্গ করে উত্তর দিলেন—

শ্লোক ৯৪

শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি ।
সরস্বতী যে বলায়, সেই বলি বাণী ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"মহাশয়! কোন বিচার ভাল বা কোন বিচার মন্দ তা স্থির করার ক্ষমতা আমার নেই। সরস্বতী আমাকে দিয়ে যা বলায় আমি তাই বলি।"

শ্লোক ৯৫

ইহা শুনি' দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয় ।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিশ্চিতভাবে স্থির করলেন যে, এই শিশুটির দ্বারা দেবী তাঁকে পরাস্ত করেছেন।

শ্লোক ৯৬

আজি তাঁরে নিবেদিব, করি' জপ-ধ্যান ।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

দিগ্বিজয়ী তখন স্থির করলেন, "প্রার্থনা নিবেদন করার মাধ্যমে এবং ধ্যান করার মাধ্যমে আমি সরস্বতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করব, কেন তিনি একটি শিশুর দ্বারা আমাকে পরাস্ত করে এভাবেই অপমান করলেন।"

শ্লোক ৯৭

বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল ।
বিচার-সময় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীদেবী সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে দিয়ে শ্লোকটি অশুদ্ধভাবে রচনা করিয়েছিলেন। অধিকন্তু, সেই শ্লোকের দোষগুণের বিচার করার সময় তিনি তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিত করেছিলেন এবং তার ফলে মহাপ্রভু তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৯৮

তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল ।
তা'-সবা নিষেধি' প্রভু কবিরে কহিল ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যখন এভাবেই পরাস্ত হলেন, তখন মহাপ্রভুর সমস্ত শিষ্যরা হাসতে লাগলেন। কিন্তু তাদের এভাবেই হাসতে নিষেধ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কবিকে বললেন—

শ্লোক ৯৯

তুমি বড় পণ্ডিত, মহাকবি-শিরোমণি ।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি হচ্ছেন সব চাইতে বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং সমস্ত মহাকবিদের শিরোমণি, তা না হলে আপনার মুখ দিয়ে এই রকম সুন্দর কাব্য বের হয় কি করে?

শ্লোক ১০০

তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার ।
তোমা-সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার কবিত্ব গঙ্গাজলের ধারার মতো নিরন্তর প্রবাহিত হয়। সারা পৃথিবীতে আপনার সমকক্ষ কোন কবি আমি দেখতে পাই না।

শ্লোক ১০১

ভবভূতি, জয়দেব, আর কালিদাস ।
তাঁ-সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভবভূতি, জয়দেব ও কালিদাসের মতো মহাকবিদের কবিতায়ও দোষ রয়েছে।

শ্লোক ১০২

দোষ-গুণ-বিচার—এই অল্প করি' মানি ।
কবিত্ব-করণে শক্তি, তাঁহা সে বাখানি ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ধরনের ভুলগুলি আমি নগণ্য বলে মনে করি। এই সমস্ত কবিরা যে কিভাবে তাঁদের কবিত্ব প্রকাশ করেছেন, সেটিই বিচার করে দেখা উচিত।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১১) বলা হয়েছে—

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥

"যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা আদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দতরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্‌ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নিখুঁতভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন।" কিছু ভুলত্রুটি থাকলেও, বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য বিবেচনা করে সেই কবিতা পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। বৈষ্ণব মতে, ভগবানের মহিমা প্রচার করে যে শাস্ত্র, তা যথাযথভাবে লেখা হোক অথবা না হোক, তা সর্বোত্তম। সেই সম্বন্ধে অন্য কিছু বিচার করার অবকাশ নেই। ভবভূতি বা শ্রীকান্ত *মালতী-মাধব*, *উত্তর-চরিত*, *বীর-চরিত* এবং অন্য বহু সংস্কৃত নাটক রচনা করেছেন। ভোজরাজার রাজত্বকালে নীলকণ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস ছিলেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভার স্বনামধন্য নবরত্নের অন্যতম মহাকবি। তিনি *কুমার-সম্ভব*, *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা* ও *মেঘদূত* আদি প্রায় চল্লিশটি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটক *রঘুবংশ* বিশেষভাবে বিখ্যাত। আমরা পূর্বে, *আদিলীলার* ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জয়দেবের কথা বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১০৩

শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার ।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙ তোমার ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার শিশুসুলভ চপলতায় আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি আপনার শিষ্য হওয়ারও যোগ্য নই।

শ্লোক ১০৪

আজি বাসা' যাহ, কালি মিলিব আবার ।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"দয়া করে এখন আপনি ঘরে যান, কাল আমরা আবার মিলিত হয়ে আপনার মুখে শাস্ত্রের বিচার শ্রবণ করব।"

শ্লোক ১০৫

এইমতে নিজ ঘরে গেলা দুই জন ।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কেশব কাশ্মীরী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন এবং সেই রাত্রে কবি সরস্বতীর আরাধনা করলেন।

শ্লোক ১০৬

সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুকে জানিল ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

স্বপ্নে সরস্বতীদেবী তাঁকে জানালেন মহাপ্রভু আসলে কে এবং এভাবেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জানতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।

শ্লোক ১০৭

প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

পরের দিন সকালবেলা, কেশব কাশ্মীরী এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে কৃপা করলেন এবং তাঁর ভববন্ধন মোচন করলেন।

তাৎপর্য

এই পন্থা শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় নির্দেশ দিয়ে গেছেন—"সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও"। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই পন্থা সমর্থন করে গেছেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যখন তাঁর শরণাগত হলেন, তখন তিনি তাঁকে কৃপা করলেন। যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায় (৪/৯)* বলা হয়েছে—*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।*

শ্লোক ১০৮

ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন ।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভাগ্যবান এবং তাঁর জন্ম সার্থক, কেন না তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন *"পতিতপাবন হেতু তব অবতার / মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।"* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা হচ্ছে সব চাইতে অধঃপতিত হওয়া, কেন না পতিতদের উদ্ধার করার জন্যই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। এই যুগে প্রায় সকলেই অত্যন্ত অধঃপতিত, মাংসাহারী, মদ্যপ, জুয়াড়ী ও লম্পট। এই ধরনের মানুষেরা পণ্ডিত হওয়ার অভিনয় করলেও তারা কখনই পণ্ডিত নয়। কারণ, এই ধরনের তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা যখন দেখে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অধঃপতিত মানুষদের সঙ্গ করছেন, তখন তারা মনে করে যে, তিনি নিম্নস্তরের মানুষদের জন্য, অতএব তাঁকে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। এভাবেই সেই পণ্ডিতেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করে না। মিথ্যা বিদ্যার গর্বে অন্ধ হয়ে তারা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের অযোগ্য হয়। কিন্তু এখানে এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, কেশব কাশ্মীরী মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর বিনীত আত্মনিবেদনের জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১০৯

এ-সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
যে কিছু বিশেষ ইঁহা করিল প্রকাশ ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে আমি কেবল কয়েকটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ১১০

চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার ।
সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের ধারার মতো এবং তা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়।

শ্লোক ১১১

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৈশোরলীলা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যৌবনলীলা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর *অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে* সপ্তদশ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্তসারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ষোল বছর বয়স থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সমস্ত লীলা সূত্ররূপে লেখার তাৎপর্য এই যে, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* এই সমস্ত লীলা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে যে যে স্থানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন অংশ বাদ দিয়ে গেছেন, তারই সবিশেষ বর্ণনা এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়।

এই পরিচ্ছেদে আম্রমহোৎসব-লীলা ও চাঁদকাজির সঙ্গে মহাপ্রভুর কথোপকথন বিশেষভাবে কথিত হয়েছে। অবশেষে এই পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে যে, যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দনরূপে চতুর্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করেছেন। রাধার প্রেমরসের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অঙ্গীকার করে একান্তভাবে গোপীভাব স্বীকার করেছেন। যত রকম ভক্তভাব আছে, তার মধ্যে গোপীভাব শ্রেষ্ঠ, কেন না গোপীভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন ছাড়া আর কারও ভজনের বিষয়ে প্রকাশ নেই।

শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকক্রমে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করলে গোপীরা তাঁকে নমস্কার মাত্র করে নিরস্ত হয়েছিলেন। সাধারণ গোপীভাবে কৃষ্ণমূর্তি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত মূর্তি আদির পরিত্যাগ হয় মাত্র। গোপীশিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার ভাব সর্বাপেক্ষা উচ্চ। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে রাধারাণীকে দর্শন করেন, তখন তিনি আর তাঁর চতুর্ভুজ মূর্তি রাখতে পারলেন না এবং পুনরায় তিনি কৃষ্ণরূপ ধারণ করেন।

ব্রজের রাজা নন্দ মহারাজই নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র। তেমনই, ব্রজেশ্বরী যশোদা হচ্ছেন শচীমাতা। সুতরাং শ্রীশচীনন্দনই হচ্ছেন সাক্ষাৎ যশোদানন্দন অর্থাৎ যশোদানন্দনের প্রকাশ বা বিলাস নন, স্বয়ং যশোদানন্দন। নিত্যানন্দ প্রভুর বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য এই তিন ভাব। অদ্বৈত প্রভুর সখ্য ও দাস্য এই দুটি ভাব। আর সকলে তাঁদের পূর্ব অধিকারক্রমে মহাপ্রভুর সেবা করেন।

সেই একই পরমতত্ত্ব, যিনি বংশীবদন, গোপীজনবল্লভ, শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ, আবার কখনও তিনি দ্বিজ, কখনও সন্ন্যাসীবেশে গৌররূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই কৃষ্ণই যে গোপীভাব অবলম্বন করেছেন, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তিতে এটিও সম্ভব হয়। এই বিষয়ে তর্ক করা বৃথা, কেন না অচিন্ত্য ভাবকে তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করার চেষ্টা করা নিতান্তই মূর্খতার কার্য।

এই পরিচ্ছেদের শেষে শ্রীল ব্যাসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পৃথকভাবে *আদিলীলার* সব কয়টি পরিচ্ছেদের বিশ্লেষণ করেছেন।

শ্লোক ১

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

বন্দে—আমি বন্দনা করি; স্বৈর—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; অদ্ভুত—অসাধারণ; ঈহম্—যাঁর কার্যকলাপ; তং চৈতন্যম্—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে; যৎ—যাঁর; প্রসাদতঃ—কৃপার দ্বারা; যবনাঃ—যবনেরাও; সুমনায়ন্তে—সচ্চরিত্র হয়ে; কৃষ্ণনাম—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম; প্রজল্পকাঃ—নিষ্ঠা সহকারে কীর্তন করার ফলে।

অনুবাদ

যাঁর প্রসাদে যবনেরাও সচ্চরিত্র হয়ে কৃষ্ণনাম জপ করে, সেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অলৌকিক লীলাপরায়ণ শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

তাৎপর্য

জাতি-ব্রাহ্মণ এবং যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত শুদ্ধ বৈষ্ণব বা গোস্বামীদের মধ্যে একটি মতবৈষম্য রয়েছে। কারণ, জাতি-ব্রাহ্মণ বা স্মার্তরা মনে করে যে, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সেই সম্বন্ধে আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি, তাই বুঝতে হবে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সবই সম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মতো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই, কেউই তাঁর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তিনি যদি চান, তাঁর কৃপার প্রভাবে তিনি অনাচারী বেদবিমুখ যবনকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ সদাচার-সম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে পারেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের মাধ্যমে তা হচ্ছে। বর্তমান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অধিকাংশ সভ্যই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি, অথবা বৈদিক সংস্কৃতি অনুশীলন করেননি, কিন্তু মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁরা খুব সুন্দর কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়েছেন এবং তা সম্ভব হয়েছে কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রভাবে। তাঁরা আজ এত উন্নত স্তরের ভক্তে পরিণত হয়েছেন যে, ভারতবর্ষে পর্যন্ত তাঁরা যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই আদর্শ বৈষ্ণবরূপে সম্মানিত হচ্ছেন।

মূর্খ মানুষেরা যদিও বুঝতে পারে না, কিন্তু এটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ শক্তির প্রদর্শন। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণভক্তের শরীর বহুভাবে পরিবর্তন হয়। এমন কি আমেরিকাতেও যখন আমাদের ভক্তরা রাস্তায় হরিনাম সংকীর্তন করে, তখন আমেরিকান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা তাদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা প্রকৃতই আমেরিকান কি না, কেন না কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, আমেরিকানরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নত কৃষ্ণভক্তে পরিণত হতে পারে। এই সমস্ত খ্রিস্টান ও ইহুদি কুলোদ্ভূত ছেলে-মেয়েকে এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দিতে দেখে খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা পর্যন্ত গভীরভাবে বিস্মিত হয়েছেন। তারা এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পূর্বে কোন রকম ধর্মীয় বিধি নিষ্ঠা সহকারে পালন করেনি, কিন্তু এখন তারা ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছে। তা দেখে সর্বত্রই মানুষ বিস্মিত হয় এবং আমার শিষ্যদের এই অপ্রাকৃত আচরণ দেখে আমি গর্ব অনুভব করি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবেই কেবল এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। মহাপ্রভুর শক্তি অসাধারণ বা অলৌকিক।

শ্লোক ২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর জয়! এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়!

শ্লোক ৩

কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ৩ ॥

শ্লোকার্থ

আমি ইতিমধ্যেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৈশোর-লীলা সূত্রের আকারে বর্ণনা করেছি। এখন ক্রম অনুসারে আমি তাঁর যৌবনলীলা সূত্র আকারে বর্ণনা করব।

শ্লোক ৪

বিদ্যা-সৌন্দর্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ৪ ॥

বিদ্যা—পরমার্থ জ্ঞান; সৌন্দর্য—সৌন্দর্য; সৎ-বেশ—সুন্দর বেশ; সম্ভোগ—সম্ভোগ; নৃত্য—নৃত্য; কীর্তনৈঃ—কীর্তনের দ্বারা; প্রেমনাম—ভগবানের দিব্যনাম, যার প্রভাবে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়; প্রদানৈঃ—প্রদান করার দ্বারা; চ—এবং; গৌরঃ—শ্রীগৌরসুন্দর; দীব্যতি—উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হন; যৌবনে—তাঁর যৌবনে।

অনুবাদ

তাঁর বিদ্যা, সৌন্দর্য ও সদ্বেশ প্রদর্শনপূর্বক নৃত্য-কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের দিব্যনাম বিতরণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত করেছিলেন। এভাবেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর যৌবনে শোভাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥ ৫ ॥

শ্লোকার্থ

যৌবনে প্রবেশ করে মহাপ্রভু দিব্যবস্ত্র, দিব্যবেশ, মালা ও চন্দনের দ্বারা সজ্জিত হয়েছিলেন এবং অলংকারের দ্বারা বিভূষিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাঁহো না করে গণন ।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন ॥ ৬ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর বিদ্যার গর্বে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, কারও অপেক্ষা না করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত পণ্ডিতদের পরাজিত করে অধ্যাপনা করেছিলেন।

শ্লোক ৭

বায়ুব্যাধিচ্ছলে কৈল প্রেম পরকাশ ।
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর যৌবনে মহাপ্রভু বায়ুব্যাধির ছলে তাঁর কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করেছিলেন এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে তিনি বিবিধ লীলাবিলাস করেছিলেন।

তাৎপর্য

আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে শরীরের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি উপাদানের দ্বারা। দেহের আভ্যন্তরীণ রস নিঃসৃত হয়ে রক্ত, মূত্র ও মল আদিতে পরিণত হয়। কিন্তু দেহের ক্রিয়ায় যদি কোন গোলযোগ হয়, তখন সেই ক্ষরণ দেহের বায়ুর প্রভাবে কফে পরিণত হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে পিত্ত ও কফ যখন দেহের বায়ুকে বিচলিত করে, তখন উনষাট রকমের রোগ দেখা দিতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে উন্মাদ।

বায়ুব্যাধির ছলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদের মতো আচরণ করেছিলেন। এভাবেই তিনি কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে তাঁর ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াতে শুরু করেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ছাত্রদের জড় বিদ্যা অর্জন থেকে বিরত হতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কেন না কৃষ্ণভক্তি লাভ করাই হচ্ছে সমস্ত বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ফল। মহাপ্রভুর সেই শিক্ষার ভিত্তিতে শ্রীল জীব গোস্বামী *হরিনামামৃত-ব্যাকরণ* গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। সাধারণ মানুষ এই ধরনের বিশ্লেষণকে উন্মাদের প্রলাপ বলে মনে করে। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মাদ হওয়ার অভিনয় করে কৃষ্ণভক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন, যাতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু গ্রহণ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা *চৈতন্য-ভাগবতের মধ্য খণ্ডের* প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৮

তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন ।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥ ৮ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গয়াতে গমন করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে শ্রীল ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করার জন্য গয়ায় গিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় পিণ্ডদান। বৈদিক প্রথা অনুসারে, কোন আত্মীয়ের মৃত্যুর পর, বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর গয়াতে গিয়ে শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে হয়। তাই প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ গয়ায় গিয়ে এভাবে পিণ্ডদান করে। সেই প্রথা অনুসারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর পরলোকগত পিতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করার জন্য গয়ায় গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ হয়।

শ্লোক ৯

দীক্ষা-অনন্তরে হৈল, প্রেমের প্রকাশ ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥ ৯ ॥

শ্লোকার্থ

গয়াতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঈশ্বর পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই তিনি ভগবৎ-প্রেমের লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে শুরু করেন। দেশে ফিরে আসার পর পুনরায় তিনি সেই প্রেম-লক্ষণ প্রদর্শন করান।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর বহু শিষ্য পরিবৃত হয়ে গয়ায় যাচ্ছিলেন, তখন পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর এত প্রবল জ্বর হয়েছিল যে, তিনি তখন তাঁর শিষ্যদেরকে ব্রাহ্মণের পাদোদক নিয়ে আসতে বলেন। তা আনা হলে মহাপ্রভু তা পান করেন এবং তাতে তাঁর রোগ সেরে যায়। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অথবা তাঁর অনুগামীরা কেউই ব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের কর্তব্য হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে প্রস্তুত থাকা। তবে উপযুক্ত গুণ সমন্বিত না হয়ে কেউ যদি দাবি করে যে, সে ব্রাহ্মণ, তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীর প্রচারকেরা তা বরদাস্ত করে না। ব্রাহ্মণ পরিবারে সকলেই ব্রাহ্মণ হয়ে যায়, এই অন্ধবিশ্বাস শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা সমর্থন করেন না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার এই লীলা যথাযথভাবে বিচারপূর্বক অনুসরণ করতে হবে। কলিযুগের প্রভাবে ব্রাহ্মণ পরিবারগুলি ধীরে ধীরে অধঃপতিত হয়ে যাচ্ছে। তারা জনসাধারণের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ভুল পথে পরিচালিত করছে।

শ্লোক ১০

শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন ।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥ ১০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাতা শচীদেবীকে অদ্বৈত প্রভুর চরণে অপরাধ মুক্ত করে কৃষ্ণপ্রেম দান করেছিলেন। অতঃপর তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস প্রভুর গৃহে বিষ্ণুর সিংহাসনের উপর বসে বললেন, "আমার জননী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীচরণে বৈষ্ণব অপরাধ করেছেন। বৈষ্ণব-চরণে সেই অপরাধ ক্ষমা না হলে তিনি প্রেমভক্তি লাভ করতে পারবেন না।" সেই কথা শুনে ভক্তরা গিয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুকে সেখানে নিয়ে আসেন। মহাপ্রভুকে দেখতে আসবার সময়, শচীমাতার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে অদ্বৈত আচার্য প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তখন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে শচীদেবী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করে নিরপরাধিণী হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মায়ের এই আচরণ দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং বলেন, "এখন আমার জননী শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর চরণে যে অপরাধ করেছিলেন, তা থেকে মুক্ত হলেন, অতএব এখন তিনি অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করবেন।" এই দৃষ্টান্তটির দ্বারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে, যিনি যত বড় কৃষ্ণভক্তই হোন না কেন, বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায় না। তাই আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে, যাতে আমরা বৈষ্ণব অপরাধ না করি। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে সেই অপরাধ বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা ।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায় পাতা ॥

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫৬)

মত্ত হস্তী যেমন বাগানের সমস্ত গাছপালাগুলি ভেঙ্গে ফেলে, তেমনই বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ হলে সারা জীবনের সঞ্চিত ভগবদ্ভক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর, একদিন অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করানোর জন্য অনুরোধ করেন, যা তিনি কৃপা করে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে বিশ্বরূপ দর্শন করান।

শ্লোক ১১

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস ।
খাটে বসি' প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য প্রকাশ ॥ ১১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীবাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেক করলেন এবং বিষ্ণুখট্টায় বসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁর ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ অনুষ্ঠানকে বলা হয় *অভিষেক*। এই অনুষ্ঠানে শ্রীবিগ্রহকে পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করানো হয় এবং তারপর শৃঙ্গার সম্পাদন-পূর্বক আরাধনা করা হয়। শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে এই অভিষেক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সম্পাদন করা হয়। সমস্ত ভক্তরা তখন তাঁদের সাধ্য অনুসারে নৈবেদ্য নিবেদন করে মহাপ্রভুর আরাধনা করেছিলেন এবং তখন সেই ভক্তদের অভিলাষ অনুসারে মহাপ্রভু তাঁদের বরদান করেছিলেন।

শ্লোক ১২

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন ।
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজ-দর্শন ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে এই অনুষ্ঠানের পর নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন হয় এবং যখন তাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মিলন হয়, তখন তিনি তাঁর ষড়্ভুজ রূপ দর্শন করার সুযোগ পান।

তাৎপর্য

শ্রীগৌরসুন্দরের ছয় বাহুবিশিষ্ট ষড়্ভুজরূপ তাঁর তিনটি অবতারের প্রতীক। দুই হাতে রামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, দুই হাতে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী এবং দুই হাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দণ্ড ও কমণ্ডলু। তবে নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি তখন যে ষড়্ভুজরূপ দেখিয়েছিলেন, সেই রূপে তাঁর চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এবং অপর দুই হাতে ধনুক ও মুরলী।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হয় বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে পদ্মাবতী ও হাড়াই পণ্ডিতের পুত্ররূপে। শৈশবে তিনি বলরামভাবে আবিষ্ট হয়ে খেলা করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু একটু বড় হলে, একদিন এক সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের বাড়িতে আসেন এবং তাঁর কাছে তাঁর পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করেন। হাড়াই পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সম্মত হন এবং যদিও দুঃখে তাঁর হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, তবুও তিনি সন্ন্যাসীর হস্তে তাঁর পুত্রকে দান করেন। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে যাবার পর, মর্মান্তিক দুঃখে হাড়াই পণ্ডিত প্রাণ ত্যাগ করেন। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দ বহু দেশ ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে মথুরা-মণ্ডলে এসে অনেক দিন বাস করেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু এসেছেন বুঝতে পেরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের দ্বারা নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর স্বীয় স্থানে নিয়ে আসেন।

শ্লোক ১৩

প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গবেণুধর ॥ ১৩ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক ও মুরলীধারী তাঁর ষড়্ভুজ রূপ প্রদর্শন করান।

শ্লোক ১৪

তবে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র ।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুয়ে শঙ্খ-চক্র ॥ ১৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর ত্রিভঙ্গ চতুর্ভুজ সুন্দর রূপ প্রদর্শন করান। তাঁর দুই হাত বেণুবাদন রত এবং অপর দুই হাতে শঙ্খ ও চক্র।

শ্লোক ১৫

তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন ।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫ ॥

শ্লোকার্থ

অবশেষে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে বংশীবদন, শ্যাম-অঙ্গ ও পীতবস্ত্র পরিহিত দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দন রূপ প্রদর্শন করান।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে এই লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৬

তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাস-পূজন ।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের ব্যাসপূজা বা গুরুদেবের পূজার আয়োজন করেন। কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর ভাবে আবিষ্ট হয়ে মুষল ধারণ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে, নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ণিমার রাতে মহাপ্রভুর ব্যাসপূজার আয়োজন করেন। তিনি ব্যাসদেবের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে ব্যাসপূজা বা গুরুপূজার আয়োজন করেন। ব্যাসদেব হচ্ছেন বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশ অনুগমনকারী সকলের আদিগুরু, তাই গুরুদেবের পূজাকে ব্যাসপূজা বলা হয়। নিত্যানন্দ প্রভু ব্যাসপূজার আয়োজন করেছিলেন এবং তখন সংকীর্তন হচ্ছিল, কিন্তু যখন তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গলায় মালা দিতে যান, তখন তিনি নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে দেখতে পান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু, অথবা কৃষ্ণ ও বলরামে কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা বুঝতে পারেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ১৭

তবে শচী দেখিল, রামকৃষ্ণ—দুই ভাই ।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥ ১৭ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শচীদেবী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামরূপে দর্শন করলেন। তারপর মহাপ্রভু জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করলেন।

তাৎপর্য

এক রাত্রে শচীদেবী স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর গৃহস্থিত কৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে নৈবেদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন। পরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শচীদেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর গৃহে ভোজন করতে বলেন। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ যখন ভোজন করছিলেন, তখন শচীদেবী দেখলেন, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করছেন। তা দেখে শচীদেবী প্রেমাবেশে মূর্ছিতা হয়ে পড়েন।

জগাই ও মাধাই দুই ভাই ছিল নবদ্বীপের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের দুই পুত্র, যারা সব রকম পাপকর্মে রত ছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর তখন দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করছিলেন। সেভাবেই প্রচার করার সময় তাঁরা দুই মদ্যপ জগাই ও মাধাই-এর কোপে পড়েন। তারা উন্মত্ত হয়ে তাঁদের তাড়া করতে থাকে। পরের দিন মাধাই নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তকে কলসির কানা দিয়ে আঘাত করে এবং তার ফলে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত পড়তে শুরু করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই সংবাদ পান, তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে আসেন এবং জগাই ও মাধাইকে দণ্ড দিতে উদ্যত হন। করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগাইয়ের অনুতপ্ত আচরণ দর্শন করে তাকে প্রেমালিঙ্গন দান করেন। পরমেশ্বর ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন এবং আলিঙ্গন লাভ করার ফলে, সেই দুই পাপীর হৃদয় তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়। তখন মহাপ্রভু তাঁদের হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করেন।

শ্লোক ১৮

তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে ।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘটনার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সাত প্রহর (একুশ ঘণ্টা) ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং সমস্ত ভক্তরা তাঁর সেই বিশেষ লীলা দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের পিছনে বিগ্রহের জন্য একটি খাট থাকে। তাকে বলা হয় বিষ্ণুখট্টা। (আমাদের সব কয়টি মন্দিরে এখনই এই প্রথা প্রচলন করা উচিত। সেই খাটটি বড় না ছোট, তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। মন্দির কক্ষে যাতে অনায়াসে রাখা যায় সেই মাপের হলেই হয়, তবে একটি ছোট খাট যেন অবশ্যই থাকে।) একদিন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই বিষ্ণুখট্টায় বসেন এবং সমস্ত ভক্তরা *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ* আদি পুরুষসূক্ত-মন্ত্র পাঠ করে তাঁর পূজা করেন। সম্ভব হলে, এই বেদস্তুতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় পাঠ করার প্রথা প্রচলন করতে হবে। শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের সময়, সমস্ত পূজারী ভক্তদের এই পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করা এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা করার জন্য বিবিধ উপচার, যেমন ফুল, ফল, ধূপ, আরতির উপকরণ, নৈবেদ্য, বস্ত্র ও অলংকার নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। সমস্ত ভক্তরা এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করেছিলেন এবং সাত প্রহর বা একুশ ঘণ্টা ধরে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদের দেখিয়েছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।* পরমেশ্বর ভগবানের সব কয়টি রূপ বা বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের থেকে প্রকাশিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন এবং তার ফলে তাঁরা সকলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে সংশয়মুক্ত হন।

কোন কোন ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ভাবকে 'সাতপ্রহরিয়া ভাব' এবং অন্যরা এই ভাবকে 'মহাভাব-প্রকাশ' বা 'মহাপ্রকাশ' বলেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবত* গ্রন্থের মধ্য খণ্ডে নবম অধ্যায়ে এই 'সাতপ্রহরিয়া ভাব' সম্বন্ধে আরও বর্ণনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দুঃখী নামক দাসীকে আশীর্বাদ করে সুখী নাম দেন। তিনি খোলাবেচা শ্রীধরকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে তাঁর মহাপ্রকাশ প্রদর্শন করান। তারপর তিনি মুরারিগুপ্তকে ডেকে আনতে বলেন এবং তাঁকে তিনি তাঁর শ্রীরামচন্দ্র রূপ দেখান। তিনি হরিদাস ঠাকুরকে আশীর্বাদ করেন এবং সেই সময় তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতা* ব্যাখ্যা করতে বলেন এবং মুকুন্দ দত্তকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন।

শ্লোক ১৯

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে ।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বরাহ অবতারের ভাবে আবিষ্ট হয়ে, মুরারিগুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করেন। তখন তাঁরা উভয়েই মুরারিগুপ্তের অঙ্গনে নাচতে শুরু করেন।

তাৎপর্য

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'শূকর! শূকর!' বলে চীৎকার করতে করতে স্বয়ং বরাহরূপ ধারণ করে মুরারিগুপ্তের ভবনে প্রবেশ করেন। তখন জলপূর্ণ একটি পাত্রকে (গাড়ু) পৃথিবী উত্তোলনের মতো উঠিয়ে তিনি জল পান করেছিলেন। কোন দিন প্রভু আবার মুরারির স্কন্ধে চড়ে বহু নৃত্য করেছিলেন। এটিই হচ্ছে ভগবান বরাহদেবের লীলা।

শ্লোক ২০

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥ ২০ ॥

শ্লোকার্থ

এই ঘটনার পর মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রদত্ত অপক্ক চাল ভক্ষণ করেছিলেন এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত 'হরের্নাম' শ্লোকটির অর্থ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন নবদ্বীপের গঙ্গাতীরবাসী। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য করেছিলেন, তখন তিনি ভিক্ষালব্ধ চাউলের ঝুলিসহ সেখানে এসে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তের প্রতি এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর ঝুলিটি কেড়ে নিয়ে তা থেকে অপক্ক চাল খেতে শুরু করেন। তখন কেউ তাঁকে বাধা দেননি এবং তিনি ঝুলির সমস্ত চাল খেয়ে ফেলেছিলেন।

শ্লোক ২১

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২১ ॥

হরের্নাম—হরিনাম; **হরের্নাম**—হরিনাম; **হরের্নাম**—হরিনাম; **এব**—অবশ্যই; **কেবলম্**—একমাত্র; **কলৌ**—এই কলিযুগে; **ন অস্তি**—নেই; **এব**—অবশ্যই; **ন অস্তি**—নেই; **এব**—অবশ্যই; **ন অস্তি**—নেই; **এব**—অবশ্যই; **গতিঃ**—গতি; **অন্যথা**—অন্য কোন।

অনুবাদ

" 'এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনামই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, এ ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।'

শ্লোক ২২

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ॥ ২২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই কলিযুগে, ভগবানের দিব্যনাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। কেবলমাত্র এই দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে, যে কোন মানুষ সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। যিনি তা করেন, তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করেন। এই নামের প্রভাবেই কেবল সমস্ত জগৎ নিস্তার পেতে পারে।

শ্লোক ২৩

দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার ।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥ ২৩ ॥

শ্লোকার্থ

"হরিনামই যে কলিযুগে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় এবং এ ছাড়া যে আর কোন গতি নেই, তা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্যই 'হরের্নাম' ও 'নাস্ত্যেব' শব্দ দুটি তিনবার করে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য তিনবার পুনরুক্তি করা হয়, যেমন বলা হয়, "তোমাকে এটি করতেই হবে! তোমাকে এটি করতেই হবে! তোমাকে এটি করতেই হবে!" তাই *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* তিন সত্য করে বলা হয়েছে যে, এই কলিযুগে হরিনামই হচ্ছে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায়, যাতে মানুষ নিষ্ঠাভরে নামের আশ্রয় গ্রহণ করে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হচ্ছে। তাই আমরা আমাদের সমস্ত শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বিধি-নিষেধগুলি পালন করে নিরপরাধে অন্ততপক্ষে ষোল মালা হরিনাম মহামন্ত্র জপ করে। তার ফলে তারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক ২৪

'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ ।
জ্ঞান-যোগ-তপ কর্ম-আদি নিবারণ ॥ ২৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কেবল' শব্দে নিশ্চিতভাবে জ্ঞান, যোগ, তপশ্চর্যা, সকাম কর্ম আদি অন্য সমস্ত পন্থা নিবারণ করা হয়েছে।

তাৎপর্য

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে কেবলমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। যারা এই যুগে সিদ্ধি লাভের এই পন্থাটি মানে না, তারা অনর্থক জ্ঞানের চর্চা, যোগের অভ্যাস অথবা সকাম কর্ম ও তপশ্চর্যার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে কালক্ষয় করে। তারা নিজেদের সময় তো নষ্ট করছেই, পরন্তু তারা তাদের অনুগামীদেরও বিপথে পরিচালিত করছে। আমরা যখন সেই কথাটি অত্যন্ত সরল ভাষায় মানুষকে বলি, তখন বিরুদ্ধ গোষ্ঠীগুলির সদস্যেরা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে আমরা সেই সমস্ত তথাকথিত জ্ঞানী, যোগী, কর্মী ও তপস্বীদের সঙ্গে আপোস মীমাংসা করতে পারি না। তারা যখন বলে যে, তাদের প্রচেষ্টাগুলিও আমাদের মতো সৎ, তখন আমরা বলতে বাধ্য হই যে, আমাদের প্রচেষ্টাটিই কেবল সৎ এবং তাদেরগুলি সৎ নয়। এটি আমাদের অনমনীয়তা নয়, এটি শাস্ত্রের উক্তি। আমাদের কখনই শাস্ত্রনির্দেশ থেকে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থের পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ২৫

অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।
নাহি, নাহি, নাহি—এ তিন 'এব'-কার ॥ ২৫ ॥

শ্লোকার্থ

"এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করে, তা হলে সে কোন মতেই উদ্ধার পেতে পারে না। সেই জন্য তিনবার 'নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব', এই কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে স্থির নিশ্চিতভাবে পরমার্থ সাধনের প্রকৃত পন্থা নিরূপিত হয়েছে।

শ্লোক ২৬

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম ।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের দিব্যনাম নিরন্তর স্মরণ করতে হলে, পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণ থেকেও দীনতর হতে হবে এবং নিরভিমানী হয়ে অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

শ্লোক ২৭

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ।
ভর্ৎসন-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥ ২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবানের নাম কীর্তনে রত ভক্তকে তরুর মতো সহিষ্ণু হতে হবে। কেউ যদি তাকে ভর্ৎসনা করে অথবা তিরস্কার করে, তা হলেও তার প্রতিবাদে তার কিছু বলা উচিত নয়।

শ্লোক ২৮

কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয় ।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥ ২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"এমন কি গাছকে কেটে ফেললেও তা কখনও প্রতিবাদ করে না এবং শুকিয়ে মরে গেলেও তা কারও কাছ থেকে জল চায় না।

তাৎপর্য

এই সহিষ্ণুতার (*তরোরিব সহিষ্ণুনা*) অনুশীলন করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কেউ যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে রত হন, তখন এই সহিষ্ণুতা গুণ আপনা থেকেই বিকশিত হয়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে যিনি পারমার্থিক চেতনার উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁকে আর আলাদাভাবে এই গুণ বিকশিত করার অনুশীলন করতে হয় না। কারণ, নিয়মিতভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণগুলি আপনা থেকেই বিকশিত হয়।

শ্লোক ২৯

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব ।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাইব ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই বৈষ্ণবদের কারও কাছে চাওয়া উচিত নয়। অযাচিতভাবে কেউ যদি কিছু দেয়, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু যদি না পাওয়া যায়, তা হলে বৈষ্ণবের কর্তব্য হচ্ছে শাক, ফল যা পাওয়া যায় তা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকা।

শ্লোক ৩০

সদা নাম লইব, যথা-লাভেতে সন্তোষ ।
এইত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ॥ ৩০ ॥

শ্লোকার্থ

"গভীর নিষ্ঠা সহকারে সর্বক্ষণ নাম গ্রহণ করতে হবে এবং যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই ধরনের আচরণ করলে ভগবদ্ভক্তি পোষণ করা যায়।

শ্লোক ৩১

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩১ ॥

তৃণাদপি—সকলের পদদলিত তৃণ থেকেও; **সুনীচেন**—প্রাকৃত মর্যাদা রহিত ভাব সমন্বিত; **তরোরিব**—একটি বৃক্ষের মতো; **সহিষ্ণুনা**—সহিষ্ণু হয়ে; **অমানিনা**—মাননীয় হওয়া সত্ত্বেও যিনি সম্মানের প্রত্যাশা করেন না; **মানদেন**—সম্মানের যোগ্য না হলেও তাকে সম্মান প্রদান করা; **কীর্তনীয়ঃ**—কীর্তন করা উচিত; **সদা**—সর্বক্ষণ; **হরিঃ**—ভগবানের দিব্যনাম।

অনুবাদ

"যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, যিনি নিজে মানশূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের অধিকারী।"

তাৎপর্য

এখানে বিশেষ করে তৃণের উল্লেখ করা হয়েছে, কেন না তৃণকে সকলেই পদদলিত করে, কিন্তু তবুও তৃণ কখনও তার প্রতিবাদ করে না। এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, গুরুদেব অথবা নেতা যেন কখনও তাঁর পদগর্বে গর্বিত না হন; একজন সাধারণ মানুষ থেকেও অধিক বিনীত হয়ে, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা উচিত।

শ্লোক ৩২

উর্ধ্ববাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্বলোক ।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ

উর্ধ্ববাহু হয়ে আমি ঘোষণা করছি, "আপনারা সকলে শুনুন! এই শ্লোকটিকে নামরূপ সূত্রের দ্বারা গেঁথে কণ্ঠে ধারণ করুন, যাতে নিরন্তর তা স্মরণ করতে পারেন।"

তাৎপর্য

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার প্রাথমিক স্তরে অপরাধ হতে পারে, যাকে বলা হয় নাম-অপরাধ। তাতে জীবের পক্ষে নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তা লাভ হয় না। তাই মহাপ্রভু কৃত এই *তৃণাদপি* শ্লোকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, কীর্তন বলতে অধর, ওষ্ঠ ও জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ বোঝায়। অধর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা সহকারে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে, যাতে স্পষ্টভাবে সেই মন্ত্রটি শোনা যায়। অনেক সময় মানুষ মন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চারণ না করে যন্ত্রের মতো ফিস্ ফিস্ শব্দ করে। কীর্তন করার পন্থাটি অত্যন্ত সহজ, তবে তা নিষ্ঠা সহকারে অনুশীলন করতে হবে। তাই কবিরাজ গোস্বামী নামরূপ সূত্রের দ্বারা এই শ্লোকটিকে গেঁথে গলায় পরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৩৩

প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে নিষ্ঠাভরে এই শ্লোকটির আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অবশ্যই লাভ করতে পারবেন।

শ্লোক ৩৪

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সংকীর্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক বছর ধরে প্রতিদিন রাত্রে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন পরিচালনা করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

কপাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে ॥ ৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

তখন দ্বার বন্ধ করে পরম প্রেমাবেশে কীর্তন করা হত, যাতে পরিহাসকারী পাষণ্ডীরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।

তাৎপর্য

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সকলেই কীর্তন করতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও পাষণ্ডীরা এই কীর্তনে বাধা দিতে আসে। সেই সম্বন্ধে এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই রকম অবস্থায় মন্দিরের দরজা বন্ধ করে রাখতে হবে। যথাযথ কীর্তনকারীই কেবল সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন, অন্যরা পারবেন না। কিন্তু যখন বহু মানুষ মিলিত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র-কীর্তন করা হয়, তখন আমরা মন্দিরের দ্বার খুলে রাখি, যাতে সকলেই আসতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে এই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকরী হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

কীর্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি' পুড়ি' মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিচালনায় সেই সংকীর্তন শ্রবণ করে পাষণ্ডীরা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছিল। তাই শ্রীবাস ঠাকুরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তারা নানা রকম যুক্তি করেছিল।

শ্লোক ৩৭-৩৮

একদিন বিপ্র, নাম—'গোপাল চাপাল'।
পাষণ্ডি-প্রধান সেই দুর্মুখ, বাচাল ॥ ৩৭ ॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লঞা।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাঞা ॥ ৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন রাত্রে যখন শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে সংকীর্তন হচ্ছিল, তখন গোপাল চাপাল নামে এক কটুভাষী, বাচাল ও পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ ভবানী পূজার সামগ্রী নিয়ে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের দরজার সামনে রেখে দেয়।

তাৎপর্য

শ্রীবাস ঠাকুরকে বৈষ্ণবরূপে অভিনয়কারী শাক্ত বা ভবানীদেবীর উপাসক বলে প্রতিপন্ন করে, তাঁকে অপদস্থ করার জন্য এই ব্রাহ্মণ গোপাল চাপাল চেষ্টা করেছিল। বঙ্গদেশে কালীভক্তদের ও কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে একটি বিরোধ রয়েছে। সাধারণত যে সমস্ত বাঙালী মাংসাহারী ও মদ্যপ, তারা দুর্গা, কালী, শীতলা ও চণ্ডী পূজার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। শাক্ত বা শক্তিতত্ত্বের উপাসক এই সমস্ত মানুষেরা সর্বদাই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। যেহেতু শ্রীবাস ঠাকুর ছিলেন নবদ্বীপের একজন সুবিখ্যাত ও সম্মানীয় বৈষ্ণব, তাই গোপাল চাপাল তাঁকে শাক্ত বলে প্রমাণ করে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিল। তাই, সে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের দ্বারে ভবানীপূজার জবাফুল, কলাপাতা, রক্তচন্দন আদি উপকরণ মদ্যভাণ্ডের সঙ্গে রেখে গিয়েছিল। সকালবেলায় শ্রীবাস ঠাকুর তাঁর গৃহের দরজার সামনে সেই সমস্ত উপকরণগুলি দেখে, প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের ডেকে এনে সেগুলি দেখান এবং পরিহাস করে বলেন যে, রাত্রে তিনি ভবানীপূজা করেছেন। তখন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে সেই ভদ্রলোকেরা মেথর ডাকিয়ে সে স্থানটি পরিষ্কার করান এবং গোময় ছড়িয়ে দেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* গোপাল চাপালের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

শ্লোক ৩৯

কলার পাত উপরে থুইল ওড়-ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দূর আর রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥ ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

কলার পাতার উপর সে ওড়ফুল, হলুদ, সিন্দূর, রক্তচন্দন, চাল আদি দেবীপূজার সমস্ত সরঞ্জাম রাখল।

শ্লোক ৪০

মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল ।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ

তার পাশে সে একটি মদ্যভাণ্ড রেখে নিজের বাড়িতে গেল এবং সকালবেলায় শ্রীবাস ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে তা দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪১

বড় বড় লোক সব আনিল বোলাইয়া ।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৪১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর প্রতিবেশী সমস্ত সম্মানিত ভদ্রলোকদের ডেকে এনে মৃদু হেসে বললেন—

শ্লোক ৪২

নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন ।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥ ৪২ ॥

শ্লোকার্থ

"ভদ্রমহোদয়গণ! প্রতিদিন রাত্রে আমি ভবানীপূজা করি। যেহেতু পূজার এই সমস্ত উপকরণগুলি এখানে রয়েছে, তাই এখন ব্রাহ্মণ ও সজ্জন আপনারা আমার মহিমা দর্শন করুন।"

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণ রয়েছে এবং তার নীচে যারা রয়েছে তাদের বলা হয় অন্ত্যজ, যারা শূদ্রদের থেকেও অধম। তখন উচ্চবর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈশ্যরাও ব্রাহ্মণ-সজ্জন নামে পরিচিত হতেন। ব্রাহ্মণেরা বিশেষ করে সজ্জন বা সমাজের নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তি নামে পরিচিত ছিলেন। গ্রামে কোন বিবাদ হলে তা মীমাংসার জন্য মানুষ সজ্জন ব্রাহ্মণদের শরণাগত হতেন। এখন অবশ্য সেই রকম ব্রাহ্মণ ও সজ্জন অত্যন্ত বিরল এবং প্রতিটি শহর ও গ্রাম এমনই দুর্দশাগ্রস্ত যে, সেখানে শান্তি ও সুখ সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে। পূর্ণ সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজ-ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, এই বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণাশ্রম-ধর্ম সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচলন করতে হবে। এক শ্রেণীর মানুষ যদি ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা লাভ না করে, তা হলে মানব-সমাজে শান্তি থাকতে পারে না।

শ্লোক ৪৩

তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার ।
ঐছে কর্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥ ৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সমবেত সমস্ত ভদ্রলোকেরা বললেন, "হায়! হায়! কে এই জঘন্য কার্য করেছে? সে কোন্ দুরাচারী পাপিষ্ঠ?"

শ্লোক ৪৪

হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল ।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

তারা মেথর (হাড়ি) ডেকে সেই সমস্ত জিনিস দূরে ফেলে দিল এবং জল ও গোময় দিয়ে সেই স্থানটি লেপন করাল।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে যে সমস্ত মানুষ রাস্তা ঝাড় দেয় ও মল-মূত্র পরিষ্কার করে তাদের বলে *হাড়ি*। তারা সাধারণত অস্পৃশ্য, বিশেষ করে যখন তারা তাদের কার্যে রত থাকে। কিন্তু তা হলেও এই সমস্ত *হাড়িরাও* ভগবদ্ভক্ত হতে পারে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ! যারা আমার শরণাগত তারা স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র আদি নীচ কুলোদ্ভূত হলেও পরম গতি লাভ করতে পারে।"

ভারতবর্ষে বহু নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য রয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেই কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং তার ফলে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। জড় স্তরে সাম্য অথবা ভ্রাতৃত্ব অসম্ভব।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা* শ্লোকটির মাধ্যমে মানুষকে জড় স্তর অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে মানুষ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি তাঁর জড় দেহ নন, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা, তখন তিনি নিজেকে নিম্নবর্ণের মানুষদের থেকেও নীচ বলে মনে করেন, কেন না তিনি চিন্ময়ভাবে উন্নত। এই বিনীতভাব, যার প্রভাবে মানুষ নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন, তাকে বলা হয় 'সুনীচত্ব' এবং বৃক্ষের থেকেও অধিক সহিষ্ণু তাকে বলা হয় 'সহিষ্ণুত্ব'। জড় বিষয়ে প্রত্যাশী না হয়ে ভগবৎ-বিষয়ে অধিষ্ঠিত হওয়াকে বলা হয় 'অমানীত্ব' এবং সকলকে মান দান করার মনোভাবকে বলা হয় 'মানদ'।

মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের পবিত্র করার জন্য 'হরিজন আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই আন্দোলন সফল হয়নি, কেন না তিনি মনে করেছিলেন যে, কতকগুলি জাগতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ হরিজন বা ভগবৎ-পার্ষদে পরিণত হতে পারে। তা কখনই সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার স্বরূপে সে তার জড় দেহ নয়, তার স্বরূপে সে হচ্ছে তার চিন্ময় আত্মা, ততক্ষণ পর্যন্ত হরিজন হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, তারা জড় পদার্থ ও আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না এবং তার ফলে তাদের সমস্ত ধারণাগুলি কতকগুলি জগাখিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মায়ার অবিদ্যাজালে আবদ্ধ।

শ্লোক ৪৫

তিন দিন রহি' সেই গোপাল-চাপাল ।
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

তিনদিন পর গোপাল চাপাল কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হল এবং তার সারা শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ পড়তে লাগল।

শ্লোক ৪৬

সর্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর ।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

তার সারা শরীরের ঘাগুলিতে কীট দংশন করতে লাগল, তার ফলে গোপাল চাপাল অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল এবং দুঃখে তার অন্তর দগ্ধ হতে লাগল।

শ্লোক ৪৭

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া ।
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

যেহেতু কুষ্ঠ একটি সংক্রামক ব্যাধি, তাই গোপাল চাপালকে গ্রাম থেকে দূরে চলে যেতে হল। সে গঙ্গাতীরে একটি গাছের নীচে বসে থাকত। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে সে তাঁকে বলে—

শ্লোক ৪৮

গ্রাম-সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল ।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল ॥ ৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"গ্রাম সম্পর্কে আমি হচ্ছি তোমার মাতুল, আর তুমি হচ্ছ আমার ভাগ্নে। দয়া করে দেখ, কিভাবে আমি কুষ্ঠ ব্যাধিতে মহাকষ্ট ভোগ করছি।

শ্লোক ৪৯

লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার ।
মুঞি বড় দুখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য তুমি অবতরণ করেছ। আমিও বড় অধঃপতিত, দুঃখী। দয়া করে আমাকে উদ্ধার কর।"

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, গোপাল চাপাল যদিও ছিল পাপিষ্ঠ, বাচাল ও নিন্দুক, তা সত্ত্বেও তার সরলতা গুণ ছিল। তাই সে বিশ্বাস করেছিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য অবতরণ করেছেন। সে তখন তার নিজের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করে। সে জানত না যে, পতিত উদ্ধার মানে তাদের দেহের রোগমুক্তি নয়, যদিও ভববন্ধন থেকে মুক্ত হলে জড় দেহের সমস্ত রোগগুলি আপনা থেকেই সেরে যায়। গোপাল চাপাল তার কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার আন্তরিক আবেদন গ্রহণ করেও তাকে দুঃখ-দুর্দশার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০

এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন ।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জন-বচন ॥ ৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ক্রোধাবেশে তাকে তিরস্কার করে বললেন—

শ্লোক ৫১

আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু ।
কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ

"ওরে পাপী, ভক্তদ্বেষী, আমি তোকে উদ্ধার করব না! পক্ষান্তরে, কোটি জন্মান্তরে আমি তোকে এভাবেই কীট দিয়ে খাওয়াব।

তাৎপর্য

আমাদের বুঝতে হবে যে, রোগ, শোক আদি যত দুঃখ-দুর্দশা তা সবই হচ্ছে আমাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল। সমস্ত পাপের মধ্যে মাৎসর্যবশত শুদ্ধ বৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত পাপ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, গোপাল চাপাল যেন তার দুঃখ-দুর্দশার কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যে মানুষ ভগবানের নামের প্রচারকারী শুদ্ধ ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করে, ভগবান তাকে গোপাল চাপালের মতো দণ্ড দেন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখতে পাব, শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধী মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনুতপ্ত হয় এবং তা সংশোধন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ৫২

শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন ।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৫২ ॥

শ্লোকার্থ

"তুই শ্রীবাসকে ভবানী-পূজক সাজাবার চেষ্টা করেছিলি। সেই পাপে তোর কোটি জন্ম রৌরবে পতন হবে।

তাৎপর্য

মাংসাহার ও মদ্যপানের আশায় বহু তান্ত্রিক শ্মশানে ভবানীপূজা করে। এই সমস্ত মূর্খরা মনে করে যে, ভবানীপূজা করা এবং শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা একই ব্যাপার। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তথাকথিত সমস্ত স্বামী ও যোগীদের জঘন্য তান্ত্রিক কার্যকলাপগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, মদ্যপান ও মাংসাহার করে যে ভবানীপূজা করা হয়, তার ফলে মানুষ নরকগামী হয়। সেই পূজার পদ্ধতিটি নারকীয় এবং তার ফলও নারকীয়।

কিছু মূর্খ লোক বলে যে, যে পথই গ্রহণ করুক না কেন চরমে তা একই লক্ষ্যে উপনীত হবে এবং সেই চরম লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্ম। অথচ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ধরনের মানুষেরা কিভাবে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত, কিন্তু বিভিন্নভাবে ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রচেষ্টা বিভিন্ন ফল প্রসব করে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেভাবেই আমি তাদের ফল প্রদান করে থাকি।" মায়াবাদীরা অবশ্যই কোন বিশেষ বিশেষভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। কিন্তু মদ, মেয়েমানুষ ও মাংসরূপে ব্রহ্ম-উপলব্ধি আর কীর্তন, নর্তন ও ভগবৎ-প্রসাদ সেবনের মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তের ব্রহ্ম-উপলব্ধি এক নয়। অল্পজ্ঞ মায়াবাদীরা মনে করে যে, সব রকমের ব্রহ্ম-উপলব্ধি এক এবং তাতে কোন রকম বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু কৃষ্ণ সর্বব্যাপ্ত হলেও তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি সর্বত্র

বিরাজমান নন। এভাবেই তান্ত্রিকদের ব্রহ্ম-উপলব্ধি এবং শুদ্ধ ভক্তের ব্রহ্ম-উপলব্ধি এক নয়। ব্রহ্ম-উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তর কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত না হলে মায়ার কবলে তাকে দণ্ডভোগ করতেই হয়। কৃষ্ণভক্ত ছাড়া অন্য সকলেই স্বল্প বা অধিক মাত্রায় পাষণ্ডী বা আসুরিক এবং তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের হাতে দণ্ডনীয়। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে মহাপ্রভু বলেছেন।

শ্লোক ৫৩

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পাষণ্ডী সংহার করার জন্য আমার এই অবতার এবং পাষণ্ডী সংহার করে আমি ভগবদ্ভক্তি প্রচার করব।"

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচার ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭-৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"হে ভারত! যখনই ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি। সাধুদের পরিত্রাণ করে, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।"

এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকদের বিনাশ করা এবং ভগবদ্ভক্তদের পালন করা। তথাকথিত সমস্ত ভণ্ড অবতারদের মতো তিনি বলেননি যে, পাষণ্ডী ও ভক্ত উভয়ই সমপর্যায়ভুক্ত। প্রকৃত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ কখনই এই ধরনের মত প্রচার করেন না।

নাস্তিকদের দণ্ডভোগ করতে হয়, আর ভক্তদের ভগবান পালন করেন। সেটিই হচ্ছে ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য। তাই অবতার চেনা যায় তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে, ভোটের মাধ্যমে বা মনগড়া জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রচারের কালে বহু দুষ্কৃতকারীকে বিনাশ করেছিলেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মায়াবাদীরা হচ্ছে সব চাইতে বড় অসুর। তাই তিনি সকলকে মায়াবাদ দর্শন শুনতে নিষেধ করে গেছেন—*মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।* কেবলমাত্র মায়াবাদীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনলে সর্বনাশ হয় (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৬/১৬৯)।

শ্লোক ৫৪

এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান ।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা বলে মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করতে গেলেন, আর সেই পাপী দুঃখভোগ করতে লাগল। এই দুঃখভোগ করার জন্য তার মৃত্যু হল না।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বৈষ্ণব অপরাধী দণ্ডভোগ করে এবং সেই দণ্ড-ভোগ করার জন্য তার মৃত্যু হয় না। আমরা এক মহাবৈষ্ণব অপরাধীকে দেখেছি। সে এত কষ্ট পাচ্ছে যে, নড়তে পর্যন্ত পারে না, কিন্তু তার মৃত্যু হচ্ছে না।

শ্লোক ৫৫-৫৬

সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা ।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥ ৫৫ ॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ ।
হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥ ৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে চলে গেলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি যখন কুলিয়া গ্রামে এলেন, তখন সেই পাপী মহাপ্রভুর শরণ নিল। তখন কৃপা পরবশ হয়ে মহাপ্রভু তাকে হিত উপদেশ দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* কুলিয়া গ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন—কুলিয়া গ্রাম হচ্ছে বর্তমান নবদ্বীপ শহর। *ভক্তিরত্নাকর, চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, চৈতন্য-ভাগবত আদি* বহু প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুলিয়া গ্রাম গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। সেখানে এখনও কোলদ্বীপ নামক অঞ্চলে কুলিয়াগঞ্জ ও কুলিয়াদহ নামক স্থানদ্বয় রয়েছে। এই দুটি স্থানই বর্তমান নবদ্বীপ শহরের মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে কুলিয়া ও পাহাড়পুর নামে গ্রাম ছিল। দুটি গ্রামই বাহিরদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন গঙ্গার পূর্বতীরে অন্তর্দ্বীপ নামক স্থান নবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। শ্রীমায়াপুরে সেই স্থান এখনও দ্বীপের মাঠ নামে প্রসিদ্ধ। কাঁচরাপাড়ার নিকটে কুলিয়া নামে আর একটি স্থান রয়েছে। কিন্তু এখানে যে কুলিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি সেই কুলিয়া নয়। তা 'অপরাধ ভঞ্জন পাট' বা যেখানে অপরাধ মোচন হয়েছিল সেই স্থান নয়, কেন না তা হয়েছিল

গঙ্গার পশ্চিম তটে কুলিয়া নামক স্থানে। ব্যবসার খাতিরে বহু ভগবৎ-বিদ্বেষী মানুষ প্রকৃত স্থানটির খননকার্যে বাধা দেয় এবং কখনও কখনও তারা অপ্রামাণিক স্থানগুলিকে প্রামাণিক বলে প্রচার করে।

শ্লোক ৫৭-৫৮

শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ ।
তথা যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৭ ॥
তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন ।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "তুমি শ্রীবাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অপরাধ করেছ। তাঁর কাছে গিয়ে যদি তুমি ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং তিনি যদি তোমাকে আশীর্বাদ করেন এবং ভবিষ্যতে যদি তুমি আর কখনও ওই রকম পাপ আচরণ না কর, তা হলে তোমার এই পাপ মোচন হবে।"

শ্লোক ৫৯

তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস শরণ ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন ॥ ৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

তখন সেই ব্রাহ্মণ গোপাল চাপাল শ্রীবাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হল এবং শ্রীবাস ঠাকুরের কৃপায় তার পাপ বিমোচন হল।

শ্লোক ৬০

আর এক বিপ্র আইল কীর্তন দেখিতে ।
দ্বারে কপাট,—না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৬০ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন আর একজন ব্রাহ্মণ কীর্তন দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে পারলেন না।

শ্লোক ৬১

ফিরি' গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা ।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা ॥ ৬১ ॥

শ্লোকার্থ

দুঃখিত মনে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন, কিন্তু পরের দিন যখন গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তখন তিনি তাঁকে বললেন—

শ্লোক ৬২

শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই প্রচণ্ড দুর্মুখ ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, "আমি মনে দুঃখ পেয়েছি, তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।" এই বলে তিনি তাঁর পৈতা ছিঁড়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন।

শ্লোক ৬৩

সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ ।
শাপ শুনি' প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিলেন, "তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হোক!" সেই শাপ শুনে মহাপ্রভু অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন।

শ্লোক ৬৪

প্রভুর শাপ-বার্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্ ।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ব্রাহ্মণের সেই অভিশাপ দেওয়ার কথা শোনেন, তিনি ব্রহ্মশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন।

তাৎপর্য

সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জানা উচিত যে, ভগবান চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, কখনও কারও অভিশাপ বা আশীর্বাদের দ্বারা প্রভাবিত হন না। বদ্ধ জীবেরাই কেবল অভিশাপ এবং যমরাজের দণ্ডের অধীন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরনের দণ্ড ও আশীর্বাদের অতীত। প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে যখন কেউ তা বুঝতে পারেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ অথবা কোন মানুষের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* এই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়নি।

শ্লোক ৬৫

মুকুন্দ-দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥ ৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দ দত্তকে দণ্ড-প্রসাদ দান করলেন এবং তার চিত্তের সমস্ত অবসাদ দূর করলেন।

তাৎপর্য

মায়াবাদীদের সঙ্গ করেছিলেন বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দ দত্তকে তাঁর কাছে আনতে নিষেধ করেছিলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিন তিনি একে একে সমস্ত ভক্তদের ডেকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং মুকুন্দ দত্ত তখন দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ভক্তরা যখন মহাপ্রভুকে বললেন যে, মুকুন্দ দত্ত দ্বারের বাইরে রয়েছেন, তখন মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি মুকুন্দ দত্তের প্রতি শীঘ্রই প্রসন্ন হব না, কেন না সে ভক্তদের সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তির কথা বলে, আর মায়াবাদীদের কাছে *যোগবাশিষ্ঠ* লিখিত মায়াবাদ শোনে। তার ফলে আমি তার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছি।" বাইরে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুর এই কথা শুনে মুকুন্দ দত্ত অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যে, যদিও মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন, তবুও কোন না কোন সময় তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন। মহাপ্রভু যখন জানতে পারলেন যে, মুকুন্দ দত্ত চিরকালের জন্য মায়াবাদীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন, তখন তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং মুকুন্দ দত্তকে কাছে ডেকেছিলেন।. এভাবেই তিনি তাঁকে মায়াবাদীদের সঙ্গ থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গদান করেছিলেন।

শ্লোক ৬৬

আচার্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি ।
তাহাতে আচার্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন, তার ফলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন।

শ্লোক ৬৭

ভঙ্গী করি' জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান ।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

তাই, তিনি পরিহাস করে একদিন জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন এবং তখন মহাপ্রভু তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন।

শ্লোক ৬৮

তবে আচার্য-গোসাঞির আনন্দ হইল ।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভুর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

অদ্বৈত আচার্য প্রভু ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। সেই সূত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরী ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গুরুভ্রাতা। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ব্যবহার পছন্দ করতেন না, তিনি চাইতেন মহাপ্রভু যেন তাঁকে তাঁর নিত্যসেবক রূপে দেখেন। অদ্বৈত প্রভুর অভিলাষ ছিল মহাপ্রভুর ভৃত্য হতে, তাঁর গুরু হতে নয়। তাই মহাপ্রভুর অসন্তোষ উৎপাদনের জন্য তিনি এক পরিকল্পনা করেন। মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ গ্রহণ করার জন্য শান্তিপুরে গিয়ে তিনি কতকগুলি দুর্ভাগ্য মায়াবাদীর কাছে জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তা শুনে মহাপ্রভু ক্রোধাবিষ্ট হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করেন। সেই প্রহার লাভ করে অদ্বৈত প্রভু এই বলে নাচতে লাগলেন, "আজ আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে! মহাপ্রভু আমাকে গুরুজ্ঞান করতেন, কিন্তু আজ তিনি আমাকে তাঁর নিত্যদাস ও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। এটি আমার পুরস্কার। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এত প্রবল যে, তিনি আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্মতি থেকে রক্ষা করেছেন।" সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৬৯

মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম ।
ললাটে লিখিল তাঁর 'রামদাস' নাম ॥ ৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

মুরারিগুপ্ত ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একজন মহান ভক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তাঁর মুখ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তাঁর ললাটে 'রামদাস' [শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যসেবক] কথাটি লিখে দিলেন।

শ্লোক ৭০

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান ।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কীর্তনের পর শ্রীধরের গৃহে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাঙা লৌহপাত্র থেকে জল পান করেছিলেন। তারপর তিনি সমস্ত ভক্তদের ঈপ্সিত বাসনা অনুসারে বরদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

চাঁদকাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিরাট নগর সংকীর্তনের পর চাঁদকাজী একজন ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তনের দলসহ শ্রীধরের গৃহে আসেন এবং তখন চাঁদকাজীও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভক্তগণ সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেন এবং শ্রীধরের ভাঙা লৌহপাত্র থেকে জল পান করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই জল পান করেছিলেন, কেন না সেই পাত্রটি ছিল ভক্তের। তারপর চাঁদকাজী গৃহে ফিরে যান। যে স্থানটিতে তাঁরা বিশ্রাম করেছিলেন তা এখন মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং সেই স্থানটির নাম 'কীর্তন-বিশ্রামস্থান'।

শ্লোক ৭১

হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ ।
আচার্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘটনার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আশীর্বাদ করেন এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মাতার অপরাধ খণ্ডন করান।

তাৎপর্য

মহাপ্রকাশের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁকে বলেন যে, তিনি হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজের অবতার। বিশ্বরূপ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন শচীমাতা মনে করেছিলেন যে, অদ্বৈত আচার্য প্রভু তাঁকে প্ররোচনা দিয়েছেন। তাই তিনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং তার ফলে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে তাঁর অপরাধ হয়। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাকে বলেন, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা গ্রহণ করে যেন তিনি বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৭২

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল ।
শুনিয়া পড়ুয়া তাঁহা অর্থবাদ কৈল ॥ ৭২ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের কাছে ভগবানের দিব্যনামের মহিমা বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা শুনে কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া বলেছিল, "এই সকল নামমহিমা প্রকৃত নয়, শাস্ত্রে স্তুতিবাদ মাত্র করা হয়েছে।" এভাবেই সে নামের অর্থবাদ করেছিল।

শ্লোক ৭৩

নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ ।
সবারে নিষেধিল,—ইহার না দেখিহ মুখ ॥ ৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পড়ুয়া ভগবানের নামের মহিমাকে অতিস্তুতি বলেছে বলে জানতে পেরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং সকলকে সেই পড়ুয়াটির মুখ দর্শন না করতে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভগবানের দিব্যনাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের অপ্রাকৃত মহিমা ভক্তদের কাছে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তখন এক দুর্ভাগা পড়ুয়া মন্তব্য করেছিল যে, মানুষকে নাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শাস্ত্রে নামের মহিমা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। এভাবেই পড়ুয়াটি ভগবানের নামের মহিমার অর্থবাদ করেছিল। এই অর্থবাদ হচ্ছে দশবিধ নাম-অপরাধের একটি। বিভিন্ন রকমের অপরাধ রয়েছে, কিন্তু নাম-অপরাধ অর্থাৎ নামপ্রভুর চরণে অপরাধ সব চাইতে ভয়ংকর। তাই মহাপ্রভু সকলকে সেই অপরাধীর মুখ দর্শন করতে নিষেধ করেছিলেন। এই ধরনের নাম-অপরাধীদের বর্জন করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করেছিলেন। ভগবানের দিব্যনাম পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। সেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব। তাই যে ভগবানের সঙ্গে ভগবানের নামের পার্থক্য নিরূপণ করে, তাকে বলা হয় পাষণ্ডী বা নাস্তিক অসুর। ভগবানের নামের মহিমা পরমেশ্বর ভগবানেরই মহিমা। তাই কখনও ভগবানের নাম এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, অথবা ভগবানের দিব্যনামের মহিমাকে অতিস্তুতি বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ৭৪

সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান ।
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তগণ সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সবস্ত্রে গঙ্গাস্নান করেছিলেন এবং তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিশ্লেষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭৫

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তি-রস ॥ ৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

"দার্শনিক জ্ঞান, সকাম কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ আদির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রেমভক্তিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়।

শ্লোক ৭৬

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা ॥ ৭৬ ॥

ন—কখনই না; **সাধয়তি**—সন্তুষ্ট করতে পারে; **মাম্**—আমাকে; **যোগঃ**—ইন্দ্রিয় সংযমের পন্থা; **ন**—না; **সাঙ্খ্যম্**—পরমতত্ত্বকে জানার দার্শনিক পন্থা; **ধর্মঃ**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ন**—না; **স্বাধ্যায়ঃ**—বেদ অধ্যয়ন; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **ত্যাগঃ**—সন্ন্যাস; **যথা**—যেমন; **ভক্তিঃ**—প্রেমপূর্ণ সেবা; **মম**—আমাকে; **উর্জিতা**—বর্ধিত।

অনুবাদ

"[পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—] 'হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, অভেদ ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্যজ্ঞান, বেদ অধ্যয়ন, সব রকম তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাস আদির দ্বারা আমি সেই রকম বশীভূত হই না।' "

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও *বেদ* অধ্যয়নকারী, এরা সকলে মূল বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত না হয়ে অর্থহীন প্রচেষ্টা করে চলে, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানে না এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* (১১/১৪/২০) এই শ্লোকটির মতো যদিও সমস্ত শাস্ত্রে বারবার প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের অনুবর্তী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তবুও সেই বিশ্বাস তাদের নেই। *ভগবদ্গীতায়ও* (১৮/৫৫) ঘোষণা করা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—"ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়।" কেউ যদি যথাযথভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে চান, তা হলে অর্থহীন দার্শনিক জ্ঞানচর্চা, সকাম কর্ম, যোগ অনুশীলন, তপশ্চর্যা আদি অনুশীলন করার মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা উচিত। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৫) ভগবান আরও বলেছেন, *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্-অব্যক্তাসক্তচেতসাম্*—"যাদের চিত্ত ভগবানের অব্যক্ত, নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাঁদের পক্ষে পারমার্থিক মার্গে উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কঠিন।" যাঁরা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাঁরা বহু কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু তবুও তাঁরা পরম সত্যকে জানতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১১) বলা হয়েছে—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার পরম উৎস বলে জানতে না পারছে, ততক্ষণ সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান।

শ্লোক ৭৭

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা ।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন মুরারিকে প্রশংসা করে বলেছিলেন, "তুমি কৃষ্ণকে বশীভূত করেছ।" সেই কথা শুনে মুরারিগুপ্ত শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন।

শ্লোক ৭৮

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৮ ॥

ক্ব—কোথায়; **অহম্**—আমি; **দরিদ্রঃ**—অত্যন্ত গরীব; **পাপীয়ান্**—পাপী; **ক্ব**—কোথায়; **কৃষ্ণঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্রী-নিকেতনঃ**—লক্ষ্মীর আশ্রয়; **ব্রহ্ম-বন্ধুঃ**—ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী রহিত জাতি-ব্রাহ্মণ; **ইতি**—এভাবে; **স্ম**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **বাহুভ্যাম্**—বাহুযুগলের দ্বারা; **পরিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গিত।

অনুবাদ

" 'কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন—এটি অতি আশ্চর্যের বিষয়।' "

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *শ্রীমদ্ভাগবত* (১০/৮১/১৬) থেকে উদ্ধৃত। এটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সুদামা বিপ্রের উক্তি। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী শ্লোকটি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অত্যন্ত মহান, তাই কারও পক্ষেই তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অযোগ্য ব্যক্তির ভক্তির প্রভাবেও যখন তিনি বশীভূত হন, তখন তাঁর মহিমা প্রকাশিত হয়। সুদামা বিপ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী এক তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, তবুও তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি নিজেকে *ব্রহ্মবন্ধু* বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বশবর্তী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সুদামা বিপ্রকে আলিঙ্গন করেছিলেন। মুরারিগুপ্তকে *ব্রহ্মবন্ধু* বলা যায় না, কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল বৈদ্যকুলে এবং বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে তিনি ছিলেন শূদ্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুরারিগুপ্তের উপর এক বিশেষ করুণা বর্ষণ করেছিলেন, কেন না তিনি ছিলেন ভগবানের প্রিয় ভক্ত। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর বিশদ ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এই জড় জগতের কোন যোগ্যতাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, অথচ কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তির বিকাশের ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সদস্যেরা নিজেদের *ব্রহ্মবন্ধু* বলতে পারে না। তাই আমাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরণ করা, তিনি বলেছেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

"যার সঙ্গেই তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনাও। এভাবেই আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে এই জগতের মানুষদের উদ্ধার কর।" (*চৈঃ চঃ* মধ্য ৭/১২৮) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নির্দেশ পালন করার চেষ্টায় আমরা সারা পৃথিবীর মানুষদের কাছে *ভগবদ্গীতার* বাণী যথাযথভাবে প্রচার করছি। এই প্রচেষ্টার ফলে, আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব।

শ্লোক ৭৯

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা ।
সংকীর্তন করি' বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন করে যখন মহাপ্রভু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁরা সকলে এক স্থানে গিয়ে বসেছিলেন।

শ্লোক ৮০

এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল ।
তৎক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৮০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তখন অঙ্গনে একটি আম্রবীজ রোপণ করেছিলেন এবং সেই বীজটি তৎক্ষণাৎ অঙ্কুরিত হয়ে বর্ধিত হতে লাগল।

শ্লোক ৮১

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত ।
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিত ॥ ৮১ ॥

শ্লোকার্থ

দেখতে দেখতে বৃক্ষটি পূর্ণ আকার ধারণ করল এবং তাতে অনেক ফল হল। অচিরেই সেই ফলগুলি সুপক্ব হল। তা দেখে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮২

শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল ।
প্রক্ষালন করি' কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৮২ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু প্রায় দুশো ফল পাড়ালেন এবং সেগুলি জলে ধুয়ে তিনি কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৮৩

রক্ত-পীতবর্ণ,—নাহি অষ্ঠি-বঙ্কল ।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ফলগুলির রং ছিল লাল ও হলুদ এবং তাতে কোন আঁটি বা বাকল ছিল না, আর একটি করে ফল খেয়েই সকলের পেট ভরে যাচ্ছিল।

তাৎপর্য

ভারতে লাল ও হলুদ রঙের ছোট আঁটি ও পাতলা বাকল সমন্বিত আমকে সব চাইতে ভাল জাতের আম বলে মনে করা হয়। এই আম এত সুস্বাদু যে, একটি আম খেলেই সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হওয়া যায়। আমকে সমস্ত ফলের রাজা বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ৮৪

দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন ।
সবাকে খাওয়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আমগুলি দেখে শচীনন্দন গৌরসুন্দর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং প্রথমে নিজে একটি আম খেয়ে, সমস্ত ভক্তদের তা খাওয়ালেন।

শ্লোক ৮৫

অষ্ঠি-বঙ্কল নাহি,—অমৃত-রসময় ।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই আমের আঁটি ছিল না এবং বাকলও ছিল না। সেগুলি অমৃতের মতো মধুর রসে এমনভাবে পূর্ণ ছিল যে, এক একটি ফল খেয়েই সকলের পেট ভরে গিয়েছিল।

শ্লোক ৮৬

এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস ।
বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস ॥ ৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সারা বছর প্রতিদিন সেই গাছে ফল ফলত এবং বৈষ্ণবেরা সেই ফল খেতেন। তা দেখে মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন।

শ্লোক ৮৭

এই সব লীলা করে শচীর নন্দন ।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

শচীনন্দন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এভাবেই তাঁর গূঢ় লীলাবিলাস করেছিলেন। ভক্তরা ছাড়া অন্য কেউ তা জানতে পারে না।

তাৎপর্য

অভক্তেরা এই সমস্ত ঘটনায় বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু যেখানে সেই আম গাছটি জন্মেছিল, সেই স্থানটি এখনও মায়াপুরে রয়েছে। সেই স্থানটির নাম আম্রঘট্ট বা আমঘাটা।

শ্লোক ৮৮

এই মত বারমাস কীর্তন-অবসানে ।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই মহাপ্রভু প্রতিদিন সংকীর্তন করতেন এবং সংকীর্তন অবসানে বারো মাস ধরে প্রতিদিন আম্র-মহোৎসব করতেন।

তাৎপর্য

সংকীর্তনের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়মিত প্রসাদ বিতরণ করতেন। তেমনই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদেরও কর্তব্য হচ্ছে কীর্তনের পর শ্রোতাদের প্রসাদ বিতরণ করা।

শ্লোক ৮৯

কীর্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥ ৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন কীর্তন করছিলেন, তখন আকাশে মেঘ হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ইচ্ছার প্রভাবে, সেই মেঘগুলিকে বারিবর্ষণ করা থেকে নিবারণ করেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, একদিন মহাপ্রভু দূরভূমিতে সংকীর্তন করছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হয়। প্রভু ইচ্ছা করে সেই মেঘকে সেখান থেকে চলে যেতে আদেশ দেওয়ায়, মেঘগুলি তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়। সেই কারণে

গঙ্গার তীরবর্তী ওই ভূমিকে মেঘের চর বলা হত। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্তনের ফলে বেল পুকুরিয়া গ্রাম সেই মেঘের চরে স্থানান্তরিত হয়েছে। বেল পুকুরিয়া পূর্বে যেখানে ছিল, সে স্থানের বর্তমান নাম তারণবাস হয়েছে। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত *শ্রীচৈতন্যমঙ্গল* গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে (১৯৮-২০৫) বর্ণনা করা হয়েছে—

দিন-অবসান—সন্ধ্যা রম্য দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন-মণ্ডল ॥
ঘন ঘন গরজয়ে গম্ভীর-নিনাদে।
দেখিয়া বৈষ্ণবগণ গণিল প্রমাদে ॥
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি' সভেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তাপর-চিত ॥
মেঘগণ প্রেম-পরসাদ নিতে আইলা।
গৌরলীলা দেখি' প্রেমে গর্জ্জিতে লাগিলা ॥
তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি' করে।
নাম-গুণ-সংকীর্তন করে উচ্চস্বরে ॥
দেবলোক কৃতার্থ করিব হেন মনে।
ঊর্দ্ধ মুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥
দূরে গেল মেঘগণ—প্রকাশ আকাশ।
হরিষে বৈষ্ণবগণের বাড়িল উল্লাস ॥
নিরমল ভেল শশি-রঞ্জিত রজনী।
অনুগত গুণ গায়—নাচয়ে আপনি ॥

শ্লোক ৯০

একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল।
'বৃহৎ সহস্রনাম' পড়, শুনিতে মন হৈল ॥ ৯০ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে 'বৃহৎ সহস্রনাম' পড়তে আজ্ঞা দিলেন, কেন না তিনি তখন তা শুনতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯১

পড়িতে আইলা স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ

ভগবানের সহস্রনাম পড়তে পড়তে নৃসিংহদেবের নাম এল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নৃসিংহদেবের নাম শুনলেন, তখন তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন।

তাৎপর্য

চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে (৩৮/৪৭) এই ঘটনাটির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

পিতৃকর্ম করে সেই শ্রীবাসপণ্ডিত।
শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধচিত ॥
হেনকালে সেই ঠাঞি গেলা গৌরহরি।
শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরি ॥
শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ-আবেশ।
ক্রোধে রাঙ্গা দুনয়ান—ঊর্দ্ধ ভেল কেশ ॥
পুলকিত সব অঙ্গ—অরুণ বরণ।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার সিংহের গর্জন ॥
আচম্বিতে গদা লঞা ধাইল সত্বর।
দেখিয়া সকল লোক কাঁপিলা অন্তর ॥
পলায় সকল লোক—না বান্ধয়ে কেশ।
সহিতে না পারে প্রভুর ক্রোধ-আবেশ ॥
পলায়নপর লোক দেখি' নরহরি।
ক্ষণেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি ॥
সর্ব-অবতার-বীজ শচীর নন্দন।
যখনে যে পড়ে মনে—হয় ত' তেমন ॥
সব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বিস্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে— ॥
না জানি কি অপরাধ ভৈগেল আমার।
কিবা চিত্তে অনুমান ভেল তো-সবার ॥

শ্লোক ৯২

নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥ ৯২ ॥

শ্লোকার্থ

নৃসিংহদেবের আবেশে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাষণ্ডীদের সংহার করার জন্য হাতে গদা নিয়ে নগরের দিকে ছুটে গেলেন।

শ্লোক ৯৩

নৃসিংহ-আবেশ দেখি' মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি' ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥ ৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

নৃসিংহ আবেশে তাঁর এই মহাতেজোময় রূপ দেখে, ভয়ে লোকেরা পথ ছেড়ে পালাতে শুরু করল।

শ্লোক ৯৪

লোক-ভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল ।
শ্রীবাস-গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥ ৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই লোকদের ভীত হতে দেখে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল এবং তিনি শ্রীবাসের গৃহে গিয়ে সেই গদাটি ফেলে দিলেন।

শ্লোক ৯৫

শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ ।
লোক ভয় পায়,—মোর হয় অপরাধ ॥ ৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

বিষণ্ণ হয়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে বলেন, "আমি যখন নৃসিংহদেবের আবেশে আবিষ্ট হয়েছিলাম, তখন মানুষ খুব ভয় পেয়েছিল। লোককে ভয় দেখানো অপরাধ, তাই আমার অপরাধ হয়েছে।"

শ্লোক ৯৬

শ্রীবাস বলেন,—যে তোমার নাম লয় ।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন, "যে মানুষ তোমার দিব্যনাম স্মরণ করে, তার কোটি অপরাধ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় হয়ে যায়।

শ্লোক ৯৭

অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার ।
যে তোমা' দেখিল, তার ছুটিল সংসার ॥ ৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

"নৃসিংহদেব রূপে আবির্ভূত হওয়ার ফলে তোমার কোন পাপ হয়নি। পক্ষান্তরে, যে মানুষ তোমাকে সেভাবেই আবিষ্ট দেখেছে, সে-ই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে।"

শ্লোক ৯৮

এত বলি' শ্রীবাস করিল সেবন ।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন-ভবন ॥ ৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা বলার পর, শ্রীবাস ঠাকুর মহাপ্রভুর আরাধনা করেছিলেন এবং গভীরভাবে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁর নিজের গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯৯

আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায় ।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডমরু বাজায় ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

আর একদিন একজন শিবভক্ত শিবের মহিমা কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহে আসেন এবং গৃহের অঙ্গনে ডমরু বাজিয়ে নৃত্য করতে থাকেন।

শ্লোক ১০০

মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন ।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ১০০ ॥

শ্লোকার্থ

তখন শচীনন্দন গৌরহরি মহেশের ভাবে আবিষ্ট হয়ে, সেই শিবভক্তটির স্কন্ধে আরোহণ করে বহুক্ষণ নৃত্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিবের ভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন, কেন না তিনি হচ্ছেন শিব। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব অনুসারে শিব শ্রীবিষ্ণু থেকে অভিন্ন, কিন্তু তবুও শিব শ্রীবিষ্ণু নন, ঠিক যেমন দধি দুগ্ধই, কিন্তু তবুও তা দুগ্ধ নয়। দধি পান করলে দুগ্ধের ফল পাওয়া যায় না। তেমনই, শিবের আরাধনা করে মুক্তি লাভ করা যায় না। কেউ যদি মুক্তি পেতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করতে হবে। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ।* সব কিছুই ভগবানকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে, কেন না সব কিছুই হচ্ছে তাঁর শক্তি। কিন্তু তবুও তিনি সব কিছুতে অবস্থিত নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিবভাব অবলম্বন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তা বলে কারও মনে করা উচিত নয় যে, শিবের পূজা করা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূজা করা হয়। সেই ধারণাটি ভ্রান্ত।

শ্লোক ১০১

আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে ।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিল করিতে ॥ ১০১ ॥

শ্লোকার্থ

আর একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করার জন্য প্রভুর বাড়িতে আসে এবং মহাপ্রভুকে নাচতে দেখে, সেও নাচতে শুরু করে।

শ্লোক ১০২

প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে ।
প্রভু তারে প্রেম দিল, প্রেমরসে ভাসে ॥ ১০২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ভিক্ষুকটি পরম উল্লাসে মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য করতে লাগল এবং মহাপ্রভু তখন তাকে প্রেম দান করলেন। তখন সে প্রেমরসে ভাসতে লাগল।

শ্লোক ১০৩

আর দিনে জ্যোতিষ সর্বজ্ঞ এক আইল ।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥ ১০৩ ॥

শ্লোকার্থ

আর একদিন এক সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী সেখানে আসেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে অনেক সম্মান করে প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণেরা সাধারণত জ্যোতিষী, আয়ুর্বেদজ্ঞ বৈদ্য, শিক্ষক ও পুরোহিত হতেন। যদিও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও মর্যাদা-সম্পন্ন, কিন্তু তবুও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাঁদের জ্ঞান বিতরণ করতেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে গৃহস্থের গৃহে গিয়ে বিশেষ তিথিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে, পরিবারের লোকেরা বৈদ্যরূপে সেই ব্রাহ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করতেন এবং ব্রাহ্মণের ঔষধের নির্দেশও নিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী বলে, সাধারণ মানুষ প্রায়ই ব্রাহ্মণদেরকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন।

সেই ব্রাহ্মণটি যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহে একজন ভিক্ষুকের মতো এসেছিলেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে প্রভুত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, কেন না তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে ভূষিত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পূর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন একজন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা যদিও ভিক্ষুকের মতো দ্বারে দ্বারে যেতেন, কিন্তু তাঁদের অত্যন্ত সম্মানিত অতিথির মতোই সম্মান প্রদর্শন করা হত। আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

সময়ে হিন্দুসমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আজ থেকে একশো বছর আগে, এমন কি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আমাদের শৈশবে আমরা দেখেছি, এই ধরনের ব্রাহ্মণেরা দীন ভিক্ষুকের মতো গৃহস্থের বাড়িতে যেতেন এবং মানুষ এই ধরনের ব্রাহ্মণদের কৃপার প্রভাবে প্রবলভাবে উপকৃত হতেন। একটি মস্ত বড় লাভ হত এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া ছাড়াও, গৃহস্থেরা এই ধরনের ব্রাহ্মণদের কৃপায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত হতেন। এভাবেই সকলেই উত্তম বৈদ্য, জ্যোতিষী ও ধর্মযাজকের কৃপা থেকে বঞ্চিত হতেন না। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের ডালাস গুরুকুল বিদ্যালয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া, যেখানে শিশুরা সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে যথার্থ ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছে। তারা যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, তা হলে শঠ ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে সমাজ রক্ষা পাবে; বাস্তবিকপক্ষে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৪/১৩) সমাজের বর্ণবিভাগের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে (*চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*)। দুর্ভাগ্যবশত কিছু মানুষ কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই, কেবল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করছে। তার ফলে আজ সারা সমাজ জুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

শ্লোক ১০৪

কে আছিলুঁ আমি পূর্বজন্মে কহ গণি' ।
গণিতে লাগিলা সর্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি' ॥ ১০৪ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দয়া করে, জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গণনা করে আমাকে বলুন, পূর্বজন্মে আমি কে ছিলাম?" মহাপ্রভুর এই কথা শুনে, সেই সর্বজ্ঞ তৎক্ষণাৎ গণনা করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানা যায়। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিদদের অতীত অথবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই, এমন কি তারা বর্তমান সম্বন্ধেও সঠিকভাবে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরোধে জ্যোতিষীটি তৎক্ষণাৎ গণনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি লোক দেখাবার জন্য সেটা করেননি; তিনি প্রকৃতপক্ষে জানতেন কিভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র গণনা করার মাধ্যমে পূর্বজীবন সম্বন্ধে জানা যায়। *ভৃগু-সংহিতা* নামক এক প্রকার জ্যোতিষগণনা প্রণালী প্রচলিত রয়েছে, যার মাধ্যমে জানা যায়, পূর্বজন্মে সে কি ছিল এবং পরবর্তী জন্মে কি হবে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের মতো দ্বারে দ্বারে যেতেন, তাঁদের এই সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। এভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সমাজের সব

চাইতে দরিদ্র মানুষের কাছেও সুলভ ছিল। সব চাইতে দরিদ্র মানুষও কোন রকম টাকা পয়সা দেওয়ার চুক্তি না করেই জ্যোতিষীর কাছ থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানতে পারতেন। কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই ব্রাহ্মণ তাঁর জ্ঞান সকলকে দান করতেন এবং সেই ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব চাইতে দরিদ্র মানুষও তার বিনিময়ে একমুঠো চাল অথবা তার ক্ষমতা অনুযায়ী কিছু দিতেন। তখন আদর্শ মানব-সমাজে বিজ্ঞানের যে কোন শাখার প্রকৃত জ্ঞান—চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ধর্ম-আচরণ প্রভৃতি সমাজের সব চাইতে দরিদ্র মানুষদের কাছেও সুলভ ছিল এবং কাউকেই টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে টাকা না দিলে কেউই বিচার পায় না, চিকিৎসা পায় না, জ্যোতিষের সাহায্য পায় না এবং এমন কি পারমার্থিক জ্ঞান লাভেও সাহায্য পায় না। জনসাধারণ যেহেতু দরিদ্র, তাই এই মহান বিজ্ঞানের সুফল থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

শ্লোক ১০৫

গণি' ধ্যানে দেখে সর্বজ্ঞ,—মহাজ্যোতির্ময় ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড—সবার আশ্রয় ॥ ১০৫ ॥

শ্লোকার্থ

গণনা করে সর্বজ্ঞ ধ্যানে ভগবানের মহাজ্যোতির্ময় রূপ, যা অনন্ত বৈকুণ্ঠলোকের আশ্রয়, তাই দেখলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা বৈকুণ্ঠলোক বা চিৎ-জগতের কিছু তথ্য লাভ করছি। *বৈকুণ্ঠ* মানে 'কুণ্ঠার অতীত'। জড় জগতে সকলেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে যেখানে কোন রকম কুণ্ঠা নেই। সেই জগতের কথা *ভগবদ্গীতায়* (৮/২০) বর্ণনা করা হয়েছে—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥

"আর একটি প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের অতীত। সেই জগৎটি হচ্ছে পরা প্রকৃতিজাত এবং তার কখনও বিনাশ হয় না। এই জগতের বিনাশ হলেও সেই জগৎটি অপরিবর্তিত ভাবেই বিরাজ করে।"

এই জড় জগতে যেমন কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে, তেমনই চিৎ-জগতে লক্ষ লক্ষ বৈকুণ্ঠলোক বিরাজ করছে। এই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোক বা উৎকৃষ্ট গ্রহলোকগুলি পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মিচ্ছটার আশ্রয়ে বিরাজ করে। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে (*যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*), পরমেশ্বর ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় অসংখ্য জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক বিরাজ করে। এভাবেই এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি। সেই জ্যোতিষী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরম

পুরুষ রূপে দর্শন করেছিলেন। এর থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তিনি কত জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধনের জন্য দ্বারে দ্বারে একটি সাধারণ ভিক্ষুকরূপে ভ্রমণ করছিলেন।

শ্লোক ১০৬

পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম-ঈশ্বর ।
দেখি' প্রভুর মূর্তি সর্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম ঈশ্বররূপে দর্শন করে সর্বজ্ঞ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্মের চরম প্রকাশ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। অতএব সব কিছুর আদিতে রয়েছেন একজন পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) বর্ণনা করা হয়েছে, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—সব কিছুরই আদি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ। তাই জড় অথবা চেতন, যা কিছুই অস্তিত্বশীল, তা পরম পুরুষের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে বলে, জড়ের থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। জড় ও চেতন, উভয়ই চেতন শক্তি থেকে প্রকাশিত। দুর্ভাগ্যবশত এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি বৈজ্ঞানিকেরা জানে না, তারা তাদের তথাকথিত জ্ঞানের অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

শ্লোক ১০৭

বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল ।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥ ১০৭ ॥

শ্লোকার্থ

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সর্বজ্ঞ মৌন হয়ে রইলেন। কিন্তু প্রভু যখন তাঁকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ১০৮

পূর্বজন্মে ছিলা তুমি জগৎ-আশ্রয় ।
পরিপূর্ণ ভগবান্—সর্বৈশ্বর্যময় ॥ ১০৮ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রভু! আপনার পূর্বজন্মে আপনি ছিলেন সমস্ত জগতের আশ্রয় সর্ব ঐশ্বর্যময় পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১০৯

পূর্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ ।
দুর্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ—তোমার স্বরূপ ॥ ১০৯ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে আপনি যে-রকম ছিলেন, এখনও আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানই আছেন। আপনার পরিচয় দুর্বিজ্ঞেয় ও নিত্য আনন্দময়।"

তাৎপর্য

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের পদ পর্যন্ত নিরূপণ করা যায়। লক্ষণের মাধ্যমে সব কিছু চেনা যায়। শাস্ত্রে বর্ণিত লক্ষণের মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে চেনা যায়। এমন নয় যে, শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতীত যে কেউই ভগবান হয়ে যেতে পারে।

শ্লোক ১১০

প্রভু হাসি' কৈলা,—তুমি কিছু না জানিলা ।
পূর্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা ॥ ১১০ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বজ্ঞ যখন তাঁর সম্বন্ধে এভাবেই বললেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হেসে বললেন, "মহাশয়! আমার মনে হয় আপনি স্পষ্টভাবে জানেন না আমি কে ছিলাম, কেন না আমি জানি যে, পূর্বজন্মে আমি ছিলাম গোয়ালা।

শ্লোক ১১১

গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল ।
সেই পুণ্যে হৈলাঙ এবে ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥ ১১১ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বজন্মে গোয়ালার ঘরে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আমি গাভী ও গোবৎসদের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম। সেই পুণ্যকর্মের ফলে আমি এখন ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছি।"

তাৎপর্য

সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথায় এখানে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে যে, গোপালন ও গোরক্ষা করলে পুণ্যলাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষ এত পাষণ্ড হয়ে গেছে যে, তারা মহাজনদের কথায় কোন রকম গুরুত্বই দেয় না। মানুষ সাধারণত গোয়ালা সমাজের মানুষকে নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করে। কিন্তু এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁরা এত পুণ্যবান যে, পরবর্তী জীবনে তাঁরা ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। বৈদিক বর্ণবিভাগের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেই বৈজ্ঞানিক প্রথাটি যদি অনুসরণ

করা হয়, তা হলে মানব-সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধিত হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে গাভী ও গোবৎসদের পালন করা এবং তার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে। গাভী ও গোবৎস পালন করা হলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আধুনিক মানব-সমাজ এতই অধঃপতিত হয়ে গেছে যে, গোরক্ষা ও গোপালন করার পরিবর্তে তাদের হত্যা করছে। মানুষ যখন এই রকম পাপকার্যে লিপ্ত, তখন তারা মানব-সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধির আশা করে কি করে? তা অসম্ভব।

শ্লোক ১১২

সর্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ ।
তাহাতে ঐশ্বর্য দেখি' ফাঁফর হইলাঙ ॥ ১১২ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বজ্ঞ বললেন, "ধ্যানে আমি যে ঐশ্বর্য দর্শন করলাম, তা দেখে আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছি।

তাৎপর্য

এখানে বোঝা যায় যে, সেই সর্বজ্ঞ জ্যোতিষ-গণনার মাধ্যমে কেবল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎই জানতেন না, উপরন্তু তিনি একজন মহান ধ্যানীও ছিলেন। অতএব তিনি ছিলেন এক মহান ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ যে একই পুরুষ তা দেখতে পেরেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একই ব্যক্তি কি না তা নিয়ে তিনি ফাঁফরে পড়েছিলেন।

শ্লোক ১১৩

সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার ।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায় তোমার ॥ ১১৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আপনার রূপ এবং ধ্যানে আমি যে রূপ দর্শন করেছি, তা এক। যদি কোন পার্থক্য আমি দর্শন করে থাকি, তা হলে তা আপনারই মায়ার প্রভাব।"

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য—শুদ্ধ ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত তনু। যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন। সেই সর্বজ্ঞ যে অতি উন্নত স্তরের ভক্ত ছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে আসেন, তখন তিনি পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং তার ফলে তিনি দর্শন করেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একই পুরুষ।

শ্লোক ১১৪

যে হও, সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার ॥
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১১৪ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "আপনি যেই হোন, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে ভগবান তাকে ভগবৎ-প্রেম দান করেছিলেন এবং এভাবেই তাঁর সেবার জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

তাৎপর্য

সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু তা বলে আমরা বলতে পারি না যে, এ ঘটনাটি ঘটেনি। পক্ষান্তরে, আমাদের মেনে নিতে হবে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *চৈতন্য-ভাগবতে* যে সমস্ত লীলা বর্ণনা করা হয়নি, সেই বিশেষ বিশেষ লীলাগুলি তিনি *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ১১৫

এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া ।
'মধু আন', 'মধু আন' বলেন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন মহাপ্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, "মধু নিয়ে এস! মধু নিয়ে এস।"

শ্লোক ১১৬

নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল ।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল ॥ ১১৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবের আবেশ উপলব্ধি করতে পেরে, এক পাত্র গঙ্গাজল নিয়ে এসে তাঁর সম্মুখে রাখলেন।

শ্লোক ১১৭

জল পান করিয়া নাচে হঞা বিহ্বল ।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১৭ ॥

শ্লোকার্থ

সেই জল পান করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল হয়ে নাচতে শুরু করলেন। তখন সকলে যমুনাকর্ষণ-লীলা দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

একদিন শ্রীবলদেব যমুনা নদীকে তাঁর কাছে আসতে বলেন। যমুনা যখন তাঁর সেই আদেশ অমান্য করেন, তখন তিনি তাঁর হল নিয়ে একটি খাল কাটতে চেয়েছিলেন, যাতে যমুনা তাঁর কাছে আসতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন আদি বলদেব, তাই ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি মধু আনতে বলেন। এভাবেই, সেখানে সমবেত ভক্তরা যমুনাকর্ষণ-লীলা দর্শন করেছিলেন। এই লীলায় বলদেব গোকুলে গোপী পরিবৃত হয়ে, মধু থেকে উৎপন্ন বারুণী পান করেন এবং তারপর তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে যমুনায় স্নান করতে যান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৬৫/২৫-৩০, ৩৩) বর্ণনা করা হয়েছে যে, বলদেব যমুনাকে তাঁর কাছে আসতে বলেন এবং যমুনা ভগবানের সেই আদেশ অমান্য করেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হল দিয়ে তাঁকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে আসতে চান। যমুনা তখন অত্যন্ত ভীতা হয়ে তৎক্ষণাৎ বলদেবের কাছে আসেন এবং তাঁর অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। বলদেব তখন তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেন। এটি হচ্ছে যমুনাকর্ষণ-লীলার সারমর্ম। জয়দেব গোস্বামীর *দশাবতার-স্তোত্রে* এই ঘটনাটির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥

শ্লোক ১১৮

মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার ।
আচার্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥ ১১৮ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু যখন বলদেবভাবে আবিষ্ট হয়ে মদমত্ত ভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন আচার্য শিরোমণি শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য তাঁকে বলরামরূপে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১১৯

বনমালী আচার্য দেখে সোণার লাঙ্গল ।
সবে মিলি' নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল ॥ ১১৯ ॥

শ্লোকার্থ

বনমালী আচার্য দেখলেন যে, বলদেবের হাতে একটি সোনার লাঙ্গল এবং সমবেত সমস্ত ভক্তরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২০

এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর ।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি' সবে গেলা ঘর ॥ ১২০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই তাঁরা বারো ঘণ্টা ধরে নৃত্য করেছিলেন এবং সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা সকলে গঙ্গাস্নান করে যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১২১

নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ।
ঘরে ঘরে সংকীর্তন করিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু নবদ্বীপের সমস্ত নাগরিকদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে আদেশ দিলেন এবং তখন সকলে ঘরে ঘরে কীর্তন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২২

'হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ

[সমস্ত ভক্তরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভক্ত-জনপ্রিয় কীর্তনও গাইতে লাগলেন।] "হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ/গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।"

শ্লোক ১২৩

মৃদঙ্গ-করতাল সংকীর্তন-মহাধ্বনি ।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥ ১২৩ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই যখন সংকীর্তন আন্দোলন শুরু হল, তখন নবদ্বীপে 'হরি ! হরি!' ধ্বনি এবং মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

তাৎপর্য

এখন নবদ্বীপের শ্রীমায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের বিশ্বজনীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে যাতে চব্বিশ ঘণ্টা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন এবং সেই সঙ্গে *হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ* কীর্তনটিও করা হয়, সেদিকে এই কেন্দ্রের পরিচালকদের সচেতন থাকতে হবে, কেন না এই কীর্তনটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। তবে এই সমস্ত সংকীর্তন শুরু করতে হবে—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ*—এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্রের দ্বারা। আমরা ইতিমধ্যেই এই দুটি মন্ত্র কীর্তন করি—*শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ* এবং **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।** তারপর, *হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ/গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন*—এই দুটি পদও যুক্ত করতে হবে, বিশেষ করে মায়াপুরে। এই ছয়টি লাইন এত সুন্দরভাবে কীর্তন করতে হবে যে, কেউ যেন সেখানে ভগবানের এই দিব্যনাম কীর্তন ছাড়া অন্য কোন শব্দ না শোনে। তা হলে এই কেন্দ্রটি পারমার্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ১২৪

শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন ।
কাজী-পাশে আসি' সবে কৈল নিবেদন ॥ ১২৪ ॥

শ্লোকার্থ

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের সেই প্রচণ্ড শব্দ শুনে, স্থানীয় মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কাজীর কাছে গিয়ে নালিশ করল।

তাৎপর্য

ফৌজদার বা জেলাশাসককে বলা হত *কাজী*। পূর্বে জমিদার, রাজা বা মণ্ডলেরাই ভূমির কর আদায় করতেন। দণ্ডবিধান ও শাসন আদি পর্যালোচনা কাজীদের দ্বারা সম্পাদিত হত। জমিদার বা কাজী, এরা উভয়েই বাংলার রাজ্যপাল বা সুবাদারের অধীনে ছিলেন। নদীয়া, ইসলামপুর ও বাগোয়ান প্রভৃতি পরগণা তখন হরিহোড় বা তাঁর অধস্তন কৃষ্ণদাস হোড়ের অধীনে ছিল। কথিত আছে যে, চাঁদকাজী বাংলার নবাব হুসেন শাহের গুরু ছিলেন। কারও কারও মতে তাঁর নাম ছিল মৌলানা সিরাজুদ্দিন এবং অন্য কারও মতে তাঁর নাম ছিল হবিবর রহমান। চাঁদকাজীর বংশধরেরা এখনও মায়াপুর অঞ্চলে বর্তমান এবং চাঁদকাজীর সমাধিও বর্তমান। একটি অতি প্রাচীন গোলক-চাঁপা গাছের নীচে অবস্থিত চাঁদকাজীর সমাধি দর্শন করার জন্য মানুষ এখনও সেখানে গিয়ে থাকে।

শ্লোক ১২৫

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল ।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥ ১২৫ ॥

শ্লোকার্থ

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যাবেলায় চাঁদকাজী একটি বাড়িতে এলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সেখানে কীর্তন হচ্ছে। কীর্তনরত সেই মানুষদের হাত থেকে একটি মৃদঙ্গ ছিনিয়ে নিয়ে সেটি মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙ্গে তিনি (চাঁদকাজী) বললেন—

শ্লোক ১২৬

এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানি ।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি' ॥ ১২৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এতদিন তোমরা হিন্দুয়ানি করনি, কিন্তু এখন প্রচণ্ড উদ্যমে তোমরা তা শুরু করেছ। আমি কি জানতে পারি, কার বলে তোমরা এটি করছ?

তাৎপর্য

বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণের পর থেকে চাঁদকাজী পর্যন্ত বাংলায় হিন্দুয়ানি অত্যন্ত খর্ব হয়ে পড়েছিল, ঠিক যেমন পাকিস্তানে এখন কোন হিন্দুই স্বাধীনভাবে তাঁদের ধর্ম আচরণ করতে পারেন না। চাঁদকাজী হিন্দুসমাজের সেই অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। পূর্বে হিন্দুরা খোলাখুলিভাবে হিন্দুধর্মের আচরণ করতে পারছিলেন না, কিন্তু এখন তাঁরা নির্ভয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন। তাই নিশ্চয় কারও প্রেরণায় তাঁরা তা করতে সাহস করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, সেটি সত্য। হিন্দুরা যদিও সামাজিক রীতিনীতিগুলি অনুসরণ করছিলেন, কিন্তু তবুও নিষ্ঠাভরে ধর্ম-আচরণের কথা তাঁরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতিতে, তাঁর আদেশ অনুসারে, তাঁরা আবার বিধি-নিষেধগুলি পালন করতে শুরু করেছিলেন। মহাপ্রভুর সেই আদেশ এখনও বর্তমান এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কেউ তা অনুশীলন করতে পারেন। সেই আদেশটি হচ্ছে বৈদিক বিধি-নিষেধ পালন করে, প্রতিদিন ষোল মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম-জপ করে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে গুরু হওয়া। আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করি, তা হলে নিঃসন্দেহে আমরা পারমার্থিক শক্তি লাভ করব এবং আমরা নির্বিঘ্নে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার করতে পারব, তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

শ্লোক ১২৭

কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে ।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে ॥ ১২৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এই নগরে কেউ যেন আর সংকীর্তন না করে। আজকে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করছি এবং গৃহে ফিরে যাচ্ছি।

তাৎপর্য

পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলির রাস্তায় হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের সদস্যদের সংকীর্তন বন্ধ করার আদেশ জারি করা হয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের শতাধিক কেন্দ্র রয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের বিশেষভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের প্রায় সব কয়টি শহরেই পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করেছে। কিন্তু তবুও আমরা নিউইয়র্ক, লণ্ডন, শিকাগো, সিডনী, মেলবোর্ন, প্যারিশ, হামবুর্গ আদি গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সংকীর্তন করে যাচ্ছি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই

ধরনের ঘটনা আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেও ঘটেছিল এবং আজও যে তা ঘটছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এই সংকীর্তন আন্দোলন সত্যিই প্রামাণিক, কেন না সংকীর্তন যদি কোন নগণ্য জাগতিক ব্যাপার হত, তা হলে অসুরেরা এভাবেই বাধা দিত না। অসুরেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়েও সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই রকম অসুরেরা এখনও সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের যে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারিত হচ্ছে, তাতে তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তা থেকে প্রমাণিত হয়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের যে সংকীর্তন আন্দোলন, তা যথার্থই খাঁটি ও পবিত্র।

শ্লোক ১২৮

আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু ।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২৮ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যদি আর কাউকে এই সংকীর্তন করতে দেখি, তা হলে আমি তার সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে তাকে শুধু দণ্ডই দেব না, তাকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করব।"

তাৎপর্য

তখনকার দিনে হিন্দুকে মুসলমান বানানো খুবই সহজ ছিল। কোন মুসলমান যদি কোন হিন্দুর শরীরে জল ছিটিয়ে দিত, তা হলে সেই হিন্দুটি মুসলমান হয়ে গেছে বলে মনে করা হত। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তাতে জোর করে মুখে গরুর মাংস ঢুকিয়ে দিয়ে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে হিন্দুসমাজ এত গোঁড়া ছিল যে, কোন হিন্দুকে যদি জোর করে মুসলমান বানানো হত, তা হলে তার পক্ষে আর হিন্দুধর্মে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। এভাবেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন মুসলমানই বাইরে থেকে আসেনি; সমাজ-ব্যবস্থা হিন্দুদের মুসলমান হতে বাধ্য করেছে এবং তারা আর হিন্দুসমাজে ফিরে আসতে পারেনি। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর নামক একটি কর ধার্য করেছিল। তার ফলে, সেই করের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। এভাবেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। চাঁদকাজী সংকীর্তনকারী ভগবদ্ভক্তদের শাসিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁদের গায়ে জল ছিটানোর মতো সরল পন্থায় তাঁদের মুসলমান বানিয়ে দেবেন।

শ্লোক ১২৯

এত বলি' কাজী গেল,—নগরিয়া লোক ।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥ ১২৯ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা বলে চাঁদকাজী ঘরে ফিরে গেল এবং ভক্তরা অন্তরে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বললেন।

শ্লোক ১৩০

প্রভু আজ্ঞা দিল—যাহ করহ কীর্তন ।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥ ১৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন আদেশ দিলেন, "যাও গিয়ে সংকীর্তন কর। আজ আমি সমস্ত যবনদের সংহার করব!"

তাৎপর্য

মানুষ সাধারণত মনে করে যে, গান্ধীজি প্রথম ভারতবর্ষে অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু তার প্রায় পাঁচশো বছর আগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদকাজীর নির্দেশের বিরুদ্ধে অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কোন আন্দোলনকে বাধা প্রদানকারী বিরুদ্ধ দলকে নিরস্ত করার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, কেন না যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাদের আসুরিক মনোভাব বিনষ্ট করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে, কোন রকম বাধাবিপত্তি এলে তা যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সেই আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের দমন করা। প্রতি পদক্ষেপে যদি আমরা হিংসার আশ্রয় নিই, তা হলে সব কিছু পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। তাই, আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। তিনি চাঁদকাজীর আদেশ অমান্য করেছিলেন, কিন্তু যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাকে পরাস্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১৩১

ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্তন ।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন ॥ ১৩১ ॥

শ্লোকার্থ

ঘরে গিয়ে, নগরের লোকেরা সংকীর্তন করতে শুরু করলেন। কিন্তু কাজীর ভয়ে তাঁরা স্বচ্ছন্দে কীর্তন করতে পারছিলেন না, তাঁদের হৃদয় উৎকণ্ঠাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

শ্লোক ১৩২

তা-সভার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি ।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি' আনি' ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁদের অন্তরের উৎকণ্ঠার কথা জানতে পেরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁদের ডেকে বললেন—

শ্লোক ১৩৩

নগরে নগরে আজি করিমু কীর্তন ।
সন্ধ্যাকালে কর সভে নগর-মণ্ডন ॥ ১৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

"সন্ধ্যাবেলায় আমি নগরে নগরে কীর্তন করব। তাই তোমরা সকলে সন্ধ্যাবেলায় নগর পরিশোভিত কর।

তাৎপর্য

তখন নবদ্বীপ ছিল নয়টি ছোট শহরের সমন্বয়, তাই *নগরে নগরে* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিটি নগরে কীর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সেই উৎসবের জন্য নগর সাজাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৩৪

সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে ।
দেখ, কোন কাজী আসি' মোরে মানা করে ॥ ১৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

"সন্ধ্যাবেলায় প্রতি গৃহে মশাল জ্বালাও। আমি তোমাদের সকলকে রক্ষা করব। দেখা যাক্ কোন্ কাজী আমাদের কীর্তন বন্ধ করতে আসে।"

শ্লোক ১৩৫

এত কহি' সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায় ।
কীর্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনটি দলে সকলকে বিভক্ত করে কীর্তন শুরু করলেন।

তাৎপর্য

শোভাযাত্রা সহকারে কিভাবে কীর্তন করতে হয় তা এখানে বলা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে একুশ জন মানুষ নিয়ে একটি দল তৈরি করা হত—চারজন মৃদঙ্গ বাজাতেন, একজন কীর্তন পরিচালনা করতেন এবং ষোলজন করতাল বাজিয়ে মূল গায়কের গানের দোয়ার পুনরাবৃত্তি করতেন। যদি বহুলোক সংকীর্তনে যোগ দেন, তা হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদেরকে একাধিক দলে বিভক্ত করা যেতে পারে।

শ্লোক ১৩৬

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস ।
মধ্যে নাচে আচার্য-গোসাঞি পরম উল্লাস ॥ ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

সামনের দলটিতে হরিদাস ঠাকুর নৃত্য করছিলেন এবং মধ্যের দলটিতে পরম উল্লাসে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ১৩৭

পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র ।
তাঁর সঙ্গে নাচি' বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

পিছনের দলে নাচছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গে নাচছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু।

শ্লোক ১৩৮

বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে' ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন, প্রভু-কৃপাবলে ॥ ১৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৩৯

এই মত কীর্তন করি' নগরে ভ্রমিলা ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সভে কাজীদ্বারে গেলা ॥ ১৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই কীর্তন করতে করতে সারা নগর ভ্রমণ করে, তাঁরা অবশেষে কাজীর বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ১৪০

তর্জ-গর্জ করে লোক, করে কোলাহল ।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥ ১৪০ ॥

শ্লোকার্থ

ক্রোধে তর্জন-গর্জন করতে করতে সমস্ত লোকেরা কোলাহল করতে লাগলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তাঁরা উন্মত্তের মতো আচরণ করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

কাজী আদেশ জারি করেছিলেন যে, ভগবানের দিব্যনাম কেউ কীর্তন করতে পারবে না। কিন্তু সেই সংবাদ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেওয়া হল, তখন তিনি কাজীর সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন করতে আদেশ দেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর সমস্ত ভক্তরা অবশ্য স্বাভাবিকভাবে প্রবল উত্তেজনা হেতু চঞ্চল হয়ে তর্জন-গর্জন করে কোলাহল করছিলেন।

শ্লোক ১৪১

কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ।
তর্জন গর্জন শুনি' না হয় বাহিরে ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রবল ধ্বনি শুনে চাঁদকাজী অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন এবং তিনি একটি ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। লোকদের ক্রোধে প্রতিবাদ করে তর্জন-গর্জন করতে শুনে, কাজী তাঁর ঘর থেকে বেরোতে চাইলেন না।

তাৎপর্য

যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসাধারণ এভাবেই আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্তই কাজীর সংকীর্তন বন্ধ করার আদেশ জারি ছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নেতৃত্বে, কীর্তনকারী ভক্তরা সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে কাজীর আইন অমান্য করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিলেন এবং তর্জন-গর্জন করে প্রতিবাদ করেছিলেন। তার ফলে চাঁদকাজী স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়েও সারা পৃথিবীর মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হয়ে আজকের পৃথিবীর সব রকম পাপকার্যে লিপ্ত ভগবৎ-বিহীন সমাজের অত্যন্ত অধঃপতিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কলিযুগে কোন রকম শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন চোর, দুর্বৃত্ত এবং সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরা রাজনৈতিক নেতার আসনে বসে জনসাধারণকে শোষণ করবে। এটিই হচ্ছে কলিযুগের লক্ষণ এবং সেই লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। মানুষের জীবন ও সম্পদের কোন রকম নিরাপত্তা আজ নেই, কিন্তু তবুও তথাকথিত সরকার তাদের আসনে ভালভাবে অধিষ্ঠিত রয়েছে এবং সেই সরকারের মন্ত্রীরা সমাজের কোন রকম মঙ্গল সাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও মোটা টাকার মাহিনা পাচ্ছে। এই অবস্থার সংশোধন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, কৃষ্ণভক্তির পতাকাতলে সংকীর্তন আন্দোলন প্রচারের জন্য সমবেত হওয়া এবং পৃথিবীর সব কয়টি সরকারের পাপ-পঙ্কিল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কোন আবেগপ্রবণ ধর্ম নয়; এটি হচ্ছে মানব-সমাজের সব রকম ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার আন্দোলন। মানুষ যদি নিষ্ঠাভরে তা গ্রহণ করে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে,

তা হলে অকর্মণ্য সরকারগুলির নেতৃত্বাধীনে সারা পৃথিবী জুড়ে যে বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে, তার পরিবর্তে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। মানব-সমাজে সব সময়ই চোর, ডাকাত ও দুর্বৃত্ত থাকে এবং দুর্বল সরকার যখন তাদের কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয়, তখন এই চোর, ডাকাত ও দুর্বৃত্তেরা বেরিয়ে এসে তাদের ইচ্ছামতো অন্যায় আচরণ করতে থাকে। তার ফলে সমাজ নরকে পরিণত হয় এবং কোন ভদ্রলোক সেই সমাজে বাস করতে পারেন না। ভাল মানুষদের নিয়ে গঠিত ভগবৎ-উন্মুখী একটি সু-সরকারের অত্যন্ত প্রয়োজন। মানুষ যদি ভগবদ্ভক্ত না হয়, তা হলে তারা ভাল মানুষ হতে পারে না। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার অচিন্ত্য শক্তি আজও বর্তমান। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাভরে ও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এই আন্দোলনকে হৃদয়ঙ্গম করে সারা পৃথিবী জুড়ে তা প্রচার করা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার বর্ণনা *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্যখণ্ডের* ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

"তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে ।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগহুঁরে ॥ ধ্রু ॥"
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি-সংকীর্তন ।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥
গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় ।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥
'আপনার ঘাটে' আগে বহু নৃত্য করি' ।
তবে 'মাধায়ের ঘাটে' গেলা গৌরহরি ॥
'নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর, ভাগীরথী-তীরে তীরে' ।
'বারকোনা-ঘাটে', 'নগরিয়া-ঘাটে' গিয়া ।
'গঙ্গার নগর' দিয়া গেলা 'সিমুলিয়া' ॥
নদীয়ার একান্তে নগর 'সিমুলিয়া' ।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর ।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥
সর্ব লোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর ॥

শ্লোক ১৪২

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর-পুষ্পবন ।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৪২ ॥

শ্লোকার্থ

স্বাভাবিক ভাবেই কাজীর আদেশ জারি হেতু ক্রুদ্ধ হয়ে একদল উদ্ধত লোক কাজীর ঘর ও ফুলবাগান ভাঙতে শুরু করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ১৪৩

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা ।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥ ১৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর, কাজীর বাড়িতে পৌঁছে মহাপ্রভু তাঁর দ্বারে বসলেন এবং কাজীকে ডেকে আনতে কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিকে পাঠালেন।

শ্লোক ১৪৪

দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া ।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

অনেক দূর থেকে মাথা নীচু করে কাজী সেখানে এলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাঁকে অনেক সম্মান করে সেখানে বসতে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আইন অমান্য আন্দোলনে কিছু মানুষ তাঁদের চিত্ত সংযত করতে না পারায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন সম্পূর্ণরূপে শান্ত, নম্র ও অবিচলিত। তাই কাজী যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বসবার আসন দিয়েছিলেন, কেন না তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত রাজকর্মচারী। এভাবেই মহাপ্রভু নিজে আচরণ করে আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করার সময়ে, অনেক সময় হয়ত নানা রকম বাধা-বিপত্তি আসতে পারে, কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথাযথভাবে আচরণ করতে হবে।

শ্লোক ১৪৫

প্রভু বলেন,—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত ।
আমি দেখি' লুকাইলা,—এ-ধর্ম কেমত ॥ ১৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সৌহার্দপূর্ণভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "মহাশয়, আমি আপনার অতিথিরূপে আপনার ঘরে এলাম, কিন্তু আমাকে দেখে আপনি আপনার ঘরে লুকিয়ে রইলেন। এটি কি রকম ব্যবহার?"

শ্লোক ১৪৬

কাজী কহে—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া ।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী উত্তর দিলেন, "তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে আমার বাড়িতে এসেছ। তাই, তোমাকে শান্ত করার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে না এসে লুকিয়েছিলাম।

শ্লোক ১৪৭

এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি' মিলিলাঙ্ ।
ভাগ্য মোর,—তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ ॥ ১৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এখন তুমি শান্ত হয়েছ, তাই আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তোমার মতো অতিথি যে আমার বাড়িতে এসেছে, তা আমার পরম সৌভাগ্য।

শ্লোক ১৪৮

গ্রাম সম্বন্ধে 'চক্রবর্তী' হয় মোর চাচা ।
দেহ-সম্বন্ধে হৈতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

"গ্রাম সম্বন্ধে নীলাম্বর চক্রবর্তী ঠাকুর হচ্ছেন আমার কাকা। দেহের সম্পর্ক থেকেও এই ধরনের সম্পর্ক গভীর।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষের অজ পাড়াগাঁয়ের সমস্ত হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করত। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গুরুজনদের কাকা অথবা চাচা বলে ডাকত এবং প্রায় সমবয়সীদের দাদা বলে ডাকত। সেই সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ। মুসলমানেরা হিন্দুদেরকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করত এবং হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করত। হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পরের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে উৎসবে-পার্বণে পরস্পরের বাড়ি যেত। এমন কি আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ, ষাট বছর আগেও হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ণ এবং তাদের মধ্যে কোন গোলযোগ ছিল না। ভারতের ইতিহাসে কখনও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার উল্লেখ দেখা যায় না, এমন কি মুসলমানদের রাজত্বকালেও না। স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদেরা, বিশেষ করে বিদেশী শাসকেরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক এত খারাপ হয়ে গেছে যে, অবশেষে ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে ভাগ করতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে, কেবল হিন্দু-মুসলমানই নয়, সারা পৃথিবীর সব কয়টি দেশ ও জাতিকেই প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব।

শ্লোক ১৪৯

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা ।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নীলাম্বর চক্রবর্তী হচ্ছেন তোমার মাতামহ এবং সেই সম্পর্কে তুমি আমার ভাগ্নে।

শ্লোক ১৫০

ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৫০ ॥

শ্লোকার্থ

"ভাগ্নে যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন মামা তা সহ্য করেন এবং মামা যদি কোন অপরাধ করেন, তা হলে ভাগ্নে সেই অপরাধ গ্রহণ করেন না।"

শ্লোক ১৫১

এই মত দুঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে ।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৫১ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই চাঁদকাজী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিভিন্ন ইঙ্গিতের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং সেই আলোচনার ভিতরের অর্থ কেউই বুঝতে পারছিলেন না।

শ্লোক ১৫২

প্রভু কহে,—প্রশ্ন লাগি' আইলাম তোমার স্থানে ।
কাজী কহে,—আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে ॥ ১৫২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "মামা! আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করার জন্য আপনার বাড়িতে এসেছি।"

তার উত্তরে চাঁদকাজী বললেন, "হ্যাঁ, তোমার মনে কি প্রশ্ন আছে তা তুমি বল।"

শ্লোক ১৫৩

প্রভু কহে,—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা ।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥ ১৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "আপনি গরুর দুধ খান; সেই সূত্রে গাভী হচ্ছে আপনার মাতা। আর বৃষ অন্ন উৎপাদন করে, যা খেয়ে আপনি জীবন ধারণ করেন; সেই সূত্রে সে আপনার পিতা।

শ্লোক ১৫৪

পিতা-মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম ॥ ১৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু বৃষ ও গাভী আপনার পিতা ও মাতা, তা হলে তাদের হত্যা করে তাদের মাংস খান কি করে? এটি কোন্ ধর্ম? কার বলে আপনি এই পাপকর্ম করছেন?"

তাৎপর্য

আমরা গাভীর দুধ খাই এবং ক্ষেতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার জন্য বৃষ আমাদের সাহায্য করে, সেই কথা সকলেই জানে। তাই, যেহেতু আমাদের পিতা আমাদের খাদ্যশস্য দেন এবং মাতা দুধ দেন যা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি, তাই বৃষ ও গাভী হচ্ছে আমাদের পিতা ও মাতা। বৈদিক সভ্যতায় সাত প্রকার বিভিন্ন মাতা রয়েছেন, তাদের মধ্যে গাভী হচ্ছে একটি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুসলমান কাজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার পিতা-মাতাকে হত্যা করে তাদের মাংস খাওয়ার এ কোন্ ধর্ম আপনি পালন করেন?" কোন সভ্য সমাজে, কোন মানুষ তার পিতা-মাতাকে হত্যা করে তাদের মাংস খাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুসলমান-ধর্মকে পিতৃঘাতী ও মাতৃঘাতী ধর্ম বলে প্রমাণ করেন। খ্রিস্টানধর্মের একটি প্রধান অনুশাসন হচ্ছে 'তুমি কাউকে হত্যা করবে না' (Thou Shalt not kill)। কিন্তু তবুও, খ্রিস্টানেরা সেই অনুশাসন অমান্য করে। তারা হত্যা করার ব্যাপারে এবং কসাইখানা খোলার ব্যাপারে খুব দক্ষ। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের একটি মুখ্য বিধি হচ্ছে, সব রকম আমিষ আহার বর্জন করা। গরুর মাংস হোক, আর পাঁঠার মাংসই হোক, কৃষ্ণভক্ত কোন মাংসই আহার করে না। তবে আমরা বিশেষ করে গরুর মাংস আহার করতে সকলকে নিষেধ করি, কেন না শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, গাভী হচ্ছে আমাদের মাতা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুসলমানদের গোহত্যার প্রতিবাদ করেন।

শ্লোক ১৫৫

কাজী কহে,—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব 'কোরাণ' ॥ ১৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী উত্তর দিলেন, "তোমার যেমন বেদ, পুরাণ আদি শাস্ত্র রয়েছে, তেমনই আমাদের শাস্ত্র হচ্ছে কোরান।

তাৎপর্য

চাঁদকাজী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে শাস্ত্রের ভিত্তিতে কথা বলতে চেয়েছিলেন। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, কেউ যদি *বেদের* প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তা হলে তাঁর যুক্তি যথাযথ বলে গণ্য করা হয়। তেমনই, কোন মুসলমান যখন *কোরানের* উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেন, তখন তাঁর যুক্তিও যথাযথ বলে মনে করা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন মুসলমানদের গাভী ও বৃষ হত্যার কথা উত্থাপন করলেন, তখন চাঁদকাজী তাঁর শাস্ত্রের প্রমাণের ভিত্তিতে তার যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্লোক ১৫৬

সেই শাস্ত্রে কহে,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"কোরান অনুসারে, উন্নতি সাধনের দুটি পথ রয়েছে—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গে জীবহত্যা নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৫৭

প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥ ১৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ অনুমোদন করা হয়েছে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যদি বধ করা হয়, তা হলে কোন পাপ হয় না।

তাৎপর্য

শাস্ত্র কথাটি আসছে *শস্* ধাতু থেকে। *শস্-ধাতু* শাসন বা নিয়ন্ত্রণ বাচক। অস্ত্রের বলে যখন রাজ্যশাসন করা হয়, তাকে বলা হয় *শস্ত্র*। তাই যখন অস্ত্র বা নির্দেশের মাধ্যমে শাসন করা হয়, তার ভিত্তি হচ্ছে *শস্-ধাতু*। *শস্ত্র* (অস্ত্রের সাহায্যে শাসন) ও *শাস্ত্র* (বৈদিক নির্দেশের মাধ্যমে শাসন)-এর মধ্যে *শাস্ত্র* শ্রেয়। আমাদের বৈদিক *শাস্ত্র* মানুষের সাধারণ জ্ঞানপ্রসূত আইনের বই নয়; তা হচ্ছে জড় জগতের কল্মষ রহিত মুক্ত পুরুষদের বাণী।

শাস্ত্র সর্বদাই অভ্রান্ত হওয়া আবশ্যক। এমন নয় যে কখনও তা অভ্রান্ত কখনও তা ভ্রান্ত। বৈদিক শাস্ত্রে গাভীকে মাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব গাভী সর্ব অবস্থাতেই মাতা। এমন নয় যে, কোন কোন মূর্খ যেমন বলে, বৈদিক যুগে গাভী ছিল

মাতা, তবে এই যুগে নয়। *শাস্ত্র* যদি প্রামাণিক হয়, তা হলে গাভী সর্বদাই মাতা। বৈদিক যুগে সে ছিল মাতা এবং আজও সে হচ্ছে মাতা।

কেউ যদি *শাস্ত্রের* নির্দেশ অনুসারে আচরণ করেন, তা হলে তিনি সব রকম পাপ থেকে মুক্ত হন। যেমন, মাংসাহার, আসবপান ও যৌনক্রীড়ার প্রবণতা প্রতিটি বদ্ধ জীবের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে। সেই প্রবণতাগুলি উপভোগ করার পন্থাকে বলা হয় *প্রবৃত্তিমার্গ*। *শাস্ত্রে* বলা হয়েছে, *প্রবৃত্তিরেষাং ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা*—কলুষিত জড় জীবনের প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়; পক্ষান্তরে, শাস্ত্রবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। একটি শিশু সারাদিন খেলতে চায়, কিন্তু *শাস্ত্রের* নির্দেশ হচ্ছে যে, পিতা-মাতারা যেন তাকে শিক্ষা দানে তৎপর হন। মানব-সমাজের কার্যকলাপগুলি পরিচালিত করবার জন্য *শাস্ত্র* রয়েছে। কিন্তু যেহেতু মানুষ এই অভ্রান্ত ও নিষ্কলুষ *শাস্ত্রের* নির্দেশগুলি মানছে না, তাই তারা তথাকথিত সমস্ত শিক্ষক ও নেতাদের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে।

শ্লোক ১৫৮

তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী ।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

পণ্ডিত কাজী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, "তোমার বৈদিক শাস্ত্রে গোবধের নির্দেশ রয়েছে। সেই শাস্ত্র-নির্দেশের বলে বড় বড় মুনিরা গোমেধ-যজ্ঞ করেছিলেন।"

শ্লোক ১৫৯

প্রভু কহে,—বেদে কহে গোবধ নিষেধ ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥ ১৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

কাজীর উক্তি খণ্ডন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "বেদে স্পষ্টভাবে গোবধ নিষেধ করা হয়েছে। তাই যে কোন হিন্দু, তা তিনি যেই হোন না কেন, কখনও গোবধ করেন না।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে আমিষ আহারীদের কথাও বিবেচনা করা হয়েছে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি পশুমাংস আহার করতে চায়, তা হলে সে কালীর কাছে পাঁঠা বলি দিয়ে সেই মাংস আহার করতে পারে। কিন্তু বাজারের অথবা কসাইখানার মাংস কিনে আহার করা অনুমোদন করা হয়নি এবং মাংসাহারী মানুষদের রসনাতৃপ্তির জন্য কসাইখানা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর গোবধ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। গাভীকে যখন মাতা বলে বিবেচনা করা হয়েছে, তখন *বেদে* গোহত্যা অনুমোদন করা হবে কিভাবে? শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু দেখিয়েছিলেন যে, চাঁদকাজীর সেই উক্তিটি ভ্রান্ত। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৪) স্পষ্টভাবে গোরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্* — "বৈশ্যের কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য করা, বাণিজ্য করা এবং গাভীদের রক্ষা করা।" তাই বৈদিক শাস্ত্রে গোহত্যা অনুমোদন করা হয়েছে বলে মানুষ যে একটি ধারণা পোষণ করে, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

শ্লোক ১৬০

জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী ।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥ ১৬০ ॥

শ্লোকার্থ

"বেদ ও পুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি কোন প্রাণীকে নবজীবন দান করতে পারে, তা হলে গবেষণার উদ্দেশ্যে সে প্রাণী মারতে পারে।

শ্লোক ১৬১

অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥ ১৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই মুনি-ঋষিরা অতি বৃদ্ধ জরদ্গব পশুদের কখনও কখনও মেরে, বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে তাদের নবজীবন দান করতেন।

শ্লোক ১৬২

জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার ।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥ ১৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"এই ধরনের বৃদ্ধ ও পঙ্গু জরদ্গব পশুদের যখন এভাবেই নবজীবন দান করা হত, তাতে তাদের বধ করা হত না, পক্ষান্তরে তাদের মহা উপকার সাধন করা হত।

শ্লোক ১৬৩

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"পূর্বে মহা শক্তিশালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কার্য সাধন করতে পারতেন, কিন্তু এখন এই কলিযুগে সেই রকম শক্তিশালী কোন ব্রাহ্মণই নেই। তাই গাভী ও বৃষদের নবজীবন দান করার যে গোমেধ-যজ্ঞ, তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

শ্লোক ১৬৪

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

অশ্বমেধম্—অশ্বমেধ-যজ্ঞ; **গব-আলম্ভম্**—গোমেধ-যজ্ঞ; **সন্ন্যাসম্**—সন্ন্যাস আশ্রম; **পল-পৈতৃকম্**—পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন; **দেবরেণ**—দেবরের দ্বারা; **সুত-উৎপত্তিম্**—সন্তান উৎপাদন; **কলৌ**—কলিযুগে; **পঞ্চ**—পাঁচ; **বিবর্জয়েৎ**—বর্জনীয়।

শ্লোকার্থ

" 'এই কলিযুগে পাঁচটি কর্ম নিষিদ্ধ, যথা—অশ্বমেধ-যজ্ঞ, গোমেধ-যজ্ঞ, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ, পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে মাংস নিবেদন এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (কৃষ্ণজন্ম-খণ্ড ১৮৫/১৮০)* থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ১৬৫

তোমরা জীয়াইতে নার,—বধমাত্র সার ।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমরা মুসলমানেরা পশুকে নবজীবন দান করতে পার না, তোমরা কেবল হত্যা করতেই পার। তাই তোমরা নরকগামী হচ্ছ; সেখান থেকে তোমরা কোনভাবেই নিস্তার পাবে না।

শ্লোক ১৬৬

গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর ।
গোবধী রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গাভীর শরীরে যত লোম আছে তত হাজার বছর গোহত্যাকারী রৌরব নামক নরকে অকল্পনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে।

শ্লোক ১৬৭

তোমা-সবার শাস্ত্রকর্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল ।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥ ১৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমাদের শাস্ত্রে বহু ভুলভ্রান্তি রয়েছে। শাস্ত্রের মর্ম না জেনে, সে সমস্ত শাস্ত্রের প্রণয়নকারীরা এমন ধরনের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা বিচারের কোন ভিত্তি নেই এবং প্রমাণও নেই।"

শ্লোক ১৬৮

শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী ।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি' ॥ ১৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই কথা শুনে কাজীর সমস্ত যুক্তি স্তব্ধ হল, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। এভাবেই পরাজয় স্বীকার করে কাজী বিচারপূর্বক বললেন—

তাৎপর্য

প্রচার করার সময় বহু খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, যাঁরা বাইবেলের বাণীর উদ্ধৃতি দেন। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি, ভগবান সসীম না অসীম, তখন খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা বলে যে, ভগবান অসীম। কিন্তু আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি, ভগবান যদি অসীম হন, তা হলে তাঁর একটি মাত্র পুত্র কেন, তাঁর অসংখ্য পুত্র কেন থাকবে না? তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তেমনই, প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ও কোরানের প্রশ্নোত্তরগুলির বহুক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের খেয়ালখুশি মতো শাস্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। শাস্ত্রকে অবশ্যই মানুষের চারটি ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। প্রকৃত শাস্ত্রের নির্দেশগুলি সর্ব অবস্থাতেই অভ্রান্ত।

শ্লোক ১৬৯

তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয় ।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয় ॥ ১৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

"নিমাই পণ্ডিত! তুমি যা বললে তা সবই সত্য। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক এবং তাই তার নির্দেশগুলি দার্শনিক বিচার বা যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাৎপর্য

যবন বা মাংসাহারীদের শাস্ত্র নিত্য নয়। আধুনিক কালে তার প্রবর্তন হয়েছে এবং অনেক সময় তাদের নির্দেশগুলি পরস্পর-বিরোধী। যবনশাস্ত্র তিনটি—ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট ও কোরান। সেগুলির প্রণয়নের ইতিহাস রয়েছে; সেগুলি বৈদিক জ্ঞানের মতো নিত্য নয়। তাই তাদের যুক্তি এবং বিচারধারা থাকলেও, সেগুলি আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই রকম দৃঢ় নয়। সেই হেতু, আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনে উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা এই সমস্ত শাস্ত্রগুলি ঠিক মেনে নিতে পারেন না।

কখনও কখনও খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের অনুগামীরা আমাদের শাস্ত্র অবহেলা করে আপনাদের শাস্ত্র গ্রহণ করছে কেন?" কিন্তু আমরা যখন তাদের পাল্টা প্রশ্ন করি, "আপনাদের বাইবেলে বলা হয়েছে, 'কাউকে হত্যা করো না'

(Do not kill); তা হলে আপনারা প্রতিদিন এত পশুহত্যা করছেন কেন?" "তারা সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কেউ কেউ ভ্রান্তভাবে তার উত্তর দিয়ে বলে, পশুদের আত্মা নেই। কিন্তু আমরা যখন তাদের জিজ্ঞাসা করি, "পশুদের আত্মা নেই তা আপনারা জানলেন কি করে? পশুদের ও শিশুদের আচরণ প্রায় একই রকম। তার মানে কি শিশুদেরও আত্মা নেই?" বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, দেহের মধ্যে রয়েছে দেহের মালিক আত্মা। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) বলা হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী বা আত্মার দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা আসে, তেমনই মৃত্যুর পর আত্মা অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তনে তত্ত্বজ্ঞানী ধীর ব্যক্তিরা কখনই মুহ্যমান হন না।"

দেহে আত্মা রয়েছে বলেই দেহের এত পরিবর্তন হয়। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই দেহে একটি করে আত্মা রয়েছে এবং এই আত্মা এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, কোরান আদি যবনশাস্ত্র যথার্থ বুদ্ধিমান জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরগুলি যথাযথভাবে দিতে পারে না, তাই স্বাভাবিক ভাবেই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই সমস্ত শাস্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচনার সময় কাজী তা স্বীকার করেছিলেন। কাজী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এই বিষয়ে তিনি ভালভাবেই অবগত ছিলেন, যে-কথা পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৭০

কল্পিত আমার শাস্ত্র,—আমি সব জানি ।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি জানি যে আমাদের শাস্ত্র বহু ভ্রান্ত ধারণা ও কল্পনায় পূর্ণ, তবুও যেহেতু আমি মুসলমান, তাই সম্প্রদায়ের খাতিরে আমি সেগুলি স্বীকার করি।"

শ্লোক ১৭১

সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার ।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আর বার ॥ ১৭১ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী বললেন, "স্বাভাবিক ভাবেই যবন-শাস্ত্রের বিচার দৃঢ় নয়।" সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্মিত হেসে তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—

শ্লোক ১৭২

আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা ।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা' ॥ ১৭২ ॥

শ্লোকার্থ

"মামা! আমি আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই। দয়া করে তার যথার্থ উত্তর দেবেন। আমাকে ছলনা করে বঞ্চনা করবেন না।

শ্লোক ১৭৩

তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্তন ।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত, নর্তন ॥ ১৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার নগরে সর্বদা বাদ্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও কোলাহল সহকারে সংকীর্তন হচ্ছে।

শ্লোক ১৭৪

তুমি কাজী,—হিন্দু-ধর্ম-বিরোধে অধিকারী ।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥ ১৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি হচ্ছেন মুসলমান কাজী। হিন্দুধর্মে বাধা দেওয়ার অধিকার আপনার রয়েছে, কিন্তু এখন আপনি তাদের নিষেধ করছেন না। তার কারণ কি, তা আমি বুঝতে পারছি না।"

শ্লোক ১৭৫

কাজী বলে,—সভে তোমায় বলে 'গৌরহরি' ।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী বললেন, "সকলেই তোমাকে গৌরহরি বলে, সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করব।

শ্লোক ১৭৬

শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ ।
নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

"গৌরহরি! কোন নিভৃত স্থানে চল, তা হলে সেখানে আমি তোমাকে তার কারণটি বিশ্লেষণ করব।"

শ্লোক ১৭৭

প্রভু বলে,—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয় ।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥ ১৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "এঁরা সকলেই আমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। আপনি খোলাখুলিভাবে সব কিছু বলতে পারেন। এঁদের ভয় করার কোন কারণ নেই।"

শ্লোক ১৭৮-১৭৯

কাজী কহে,—যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া ।
কীর্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭৮ ॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর ।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী বললেন, "যেদিন আমি হিন্দুর বাড়ি গিয়ে মৃদঙ্গ ভেঙে সংকীর্তন করতে নিষেধ করেছিলাম, সেই রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে, একটি মহাভয়ঙ্কর সিংহ প্রবলভাবে গর্জন করছে; তার দেহটি ছিল মানুষের মতো এবং মুখটি সিংহের মতো ছিল।

শ্লোক ১৮০

শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি' ।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥ ১৮০ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি যখন নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, তখন সেই সিংহটি লাফ দিয়ে আমার বুকের উপর চড়ে এবং সে অট্ট অট্ট হাস্য করতে থাকে এবং দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে।

শ্লোক ১৮১

মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে ।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৮১ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার বুকের উপর নখ রেখে সেই অর্ধমানব অর্ধসিংহটি গম্ভীর স্বরে বলে, 'তুমি যে মৃদঙ্গ ভেঙেছ, তার বদলে আমি তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করব।

শ্লোক ১৮২

মোর কীর্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয় ।
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥ ১৮২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার সংকীর্তনে তুই বাধা দিয়েছিস্, তাই আমি তোকে সংহার করব!' তখন ভয়ে আমি চক্ষু মুদ্রিত করে কাঁপতে থাকি।

শ্লোক ১৮৩

ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয় ।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

"আমাকে এভাবেই ভয় পেতে দেখে সিংহটি বলল, 'তোকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোকে আমি পরাজিত করেছি, কিন্তু আমি তোর প্রতি সদয় হব।

শ্লোক ১৮৪

সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত ।
তেঞি ক্ষমা করি' না করিনু প্রাণাঘাত ॥ ১৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই দিন তুই খুব একটা উৎপাত করিস্‌নি। তাই তোকে প্রাণে হত্যা না করে আমি ক্ষমা করলাম।

শ্লোক ১৮৫

ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু ।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥ ১৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'কিন্তু তুই যদি আবার এই রকম করিস্, তা হলে আমি আর তা সহ্য করব না। তখন তোর পরিবার সহ তোকে মেরে সমস্ত যবন আমি সংহার করব।'

শ্লোক ১৮৬

এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয় ।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥ ১৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

"এই বলে সিংহটি সেখান থেকে চলে গেল, কিন্তু তাঁর ভয়ে আমি ভীষণভাবে ভীত হয়েছি। দেখ আমার বুকে তাঁর নখের চিহ্ন রয়েছে!"

শ্লোক ১৮৭

এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল ।
শুনি' দেখি' সর্বলোক আশ্চর্য মানিল ॥ ১৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

এই বলে কাজী তার বুক দেখাল। তার কথা শুনে এবং তার বুকে নখের আঁচড়ের চিহ্ন দেখে, সমস্ত লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন।

শ্লোক ১৮৮

কাজী কহে—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন আমার এক পিয়াদা আইল ॥ ১৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী আরও বললেন, "এই কথাটি আমি কাউকে বলিনি, কিন্তু সেই দিন আমার এক পেয়াদা আমার কাছে এল।

শ্লোক ১৮৯

আসি' কহে,—গেলুঁ মুঞি কীর্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥ ১৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার কাছে এসে সেই পেয়াদাটি বলল, 'আমি যখন কীর্তন করতে নিষেধ করতে গিয়েছিলাম, তখন হঠাৎ একটি অগ্নিপিণ্ড আমার মুখে এসে লাগে।

শ্লোক ১৯০

পুড়িল সকল দাড়ি, মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥ ১৯০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমার দাড়ি পুড়ে যায় এবং মুখে ফোস্কা পড়ে।' যে পেয়াদাই সেখানে গিয়েছিল, সেই এসে একই ঘটনার বর্ণনা করে।

শ্লোক ১৯১

তাহা দেখি' রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্তন না বর্জিহ, ঘরে রহোঁ ত' বসিয়া ॥ ১৯১ ॥

শ্লোকার্থ

"তা দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হয়েছি। তাই, আমি কীর্তনে বাধা না দিয়ে সকলকে ঘরে বসে থাকতে নির্দেশ দিয়েছি।

শ্লোক ১৯২

তবে ত' নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্তন।
শুনি' সব ম্লেচ্ছ আসি' কৈল নিবেদন ॥ ১৯২ ॥

শ্লোকার্থ

"তার ফলে নগরে নির্বিঘ্নে কীর্তন হতে লাগল। তখন নগরের সমস্ত ম্লেচ্ছরা এসে আমার কাছে অভিযোগ করল—

শ্লোক ১৯৩

নগরে হিন্দুর ধর্ম বাড়িল অপার।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥ ১৯৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'শহরে হিন্দুদের ধর্ম ভীষণভাবে বেড়ে যাচ্ছে। 'হরি! হরি!' ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।'

শ্লোক ১৯৪

আর ম্লেচ্ছ কহে,—হিন্দু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আর একজন ম্লেচ্ছ বলল, 'হিন্দুরা 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলে হাসছে, কাঁদছে, নৃত্য করছে, গান করছে এবং ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

শ্লোক ১৯৫

'হরি' 'হরি' করি' হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥ ১৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হরি, হরি' বলে হিন্দুরা প্রবলভাবে কোলাহল করছে। বাদশাহ যদি এই কথা শোনেন, তা হলে তিনি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেবেন।'

তাৎপর্য

পাতসাহ মানে হল রাজা। সেই সময় (১৪৯৮-১৫২১) নবাব হুসেন সাহ, যাঁর পুরো নাম ছিল আলাউদ্দীন সৈয়দ হুসেন সা, যিনি বাংলার স্বাধীন রাজা ছিলেন। পূর্বে তিনি ছিলেন হাবসী বংশীয় নিষ্ঠুর নবাব মুজঃফর খানের ভৃত্য, কিন্তু তাঁকে হত্যা করে হুসেন সাহ সিংহাসন অধিকার করেন। বাংলার মসনদে বসে তিনি নিজেকে সৈয়দ হুসেন আলাউদ্দীন সেরিফ মক্কা বলে ঘোষণা করেন। *রিয়াজ উস্-সলাতিন* নামক গ্রন্থে গোলাম হুসেন বলেছেন যে, নবাব হুসেন সাহ ছিলেন মক্কার শেরিফ বংশোদ্ভূত। তাঁর বংশের গৌরব প্রচার করার জন্য তিনি সেরিফ মক্কা নাম গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণত তিনি নবাব হুসেন সাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎসাহ

বাংলার নবাব হন (১৫২১-১৫৩৩ খৃঃ)। তিনিও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি নানাভাবে বৈষ্ণবদের উপর নির্যাতন করেছিলেন। তাঁর এই পাপের ফলে, খোজা সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁর এক ভৃত্য মসজিদে নামাজ পড়ার সময় তাঁকে হত্যা করে।

শ্লোক ১৯৬

তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল ।
হিন্দু 'হরি' বলে, তার স্বভাব জানিল ॥ ১৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি তখন সেই যবনটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হিন্দুরা যে 'হরি, হরি' বলে সেটি স্বাভাবিক।

শ্লোক ১৯৭

তুমিত যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥ ১৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হিন্দুরা 'হরি' বলে কীর্তন করে, কেন না তা হচ্ছে তাদের ভগবানের নাম। কিন্তু তুমি মুসলমান হয়ে কেন সর্বক্ষণ হিন্দুদেবতার নাম উচ্চারণ করছ?' "

শ্লোক ১৯৮

ম্লেচ্ছ কহে,—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস ।
কেহ কেহ—কৃষ্ণদাস, কেহ—রামদাস ॥ ১৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

"সেই ম্লেচ্ছ তখন উত্তর দিল, 'কখনও কখনও আমি হিন্দুদের সঙ্গে পরিহাস করি। তাদের কারও নাম কৃষ্ণদাস, কারও নাম রামদাস।

শ্লোক ১৯৯

কেহ—হরিদাস, সদা বলে 'হরি' 'হরি' ।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'তাদের মধ্যে কারও নাম হরিদাস। তারা সর্বক্ষণ 'হরি, হরি' বলে এবং তার ফলে আমি ভেবেছিলাম যে, তারা হয়ত কারও ঘর থেকে ধন-সম্পদ চুরি করবে।

তাৎপর্য

'হরি, হরি' শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে "আমি চুরি করব, আমি চুরি করব।"

শ্লোক ২০০

সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি' 'হরি' ।
ইচ্ছা নাহি, তবু বলে,—কি উপায় করি ॥ ২০০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সেই সময় থেকে আমার জিহ্বা নিরন্তর 'হরি, হরি' বলছে। তা বলার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু তবুও আমার জিহ্বা তা বলছে। আমি জানি না এখন আমি কি করব।'

তাৎপর্য

কখনও কখনও আসুরিক নাস্তিকেরা ভগবানের দিব্যনামের প্রভাব বুঝতে না পেরে বৈষ্ণবদের হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনে পরিহাস করে। এই ধরনের পরিহাসও তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সংকেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করা হলে তাকে বলা হয় নামাভাস, যা প্রায় চিন্ময় স্তরে শুদ্ধ নাম গ্রহণেরই মতো। ভগবানের নাম গ্রহণের এই নামাভাস স্তর নামাপরাধ স্তরের থেকে শ্রেয়। নামাভাসের ফলে বিষ্ণুস্মৃতির উদয় হয়। বিষ্ণুর স্মরণের ফলে জড় জগৎকে ভোগ করার দুর্বাসনার নিবৃত্তি হয়। তার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের সেবা করার প্রবণতা জন্মায় এবং চিন্ময় স্তরে শুদ্ধ নাম গ্রহণের যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্লোক২০১-২০২

আর ম্লেচ্ছ কহে, শুন—আমি ত' এইমতে ।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সে দিন হইতে ॥ ২০১ ॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জন ।
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥ ২০২ ॥

শ্লোকার্থ

"আর একজন ম্লেচ্ছ বলেছিল, 'দয়া করে আমার কথা শুনুন, যেই দিন আমি এভাবেই কয়েকজন হিন্দুকে পরিহাস করেছিলাম, সেই দিন থেকে আমার জিহ্বা নিরন্তর কৃষ্ণনাম করছে এবং আমি কিছুতেই তা বন্ধ করতে পারছি না। এই হিন্দুরা না জানি কি মন্ত্র ও অষুধ জানে।'

শ্লোক ২০৩

এত শুনি' তা'-সভারে ঘরে পাঠাইল ।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥ ২০৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত কথা শোনার পর, আমি ম্লেচ্ছদের সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে বলেছিলাম। তারপর পাঁচ-সাত জন পাষণ্ডী হিন্দু আমার কাছে এসেছিল।

তাৎপর্য

যে সমস্ত নাস্তিক সকাম কর্মে লিপ্ত এবং বহু দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করে তাদের বলা হয় *পাষণ্ডী*। *পাষণ্ডীরা* এক পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে বিশ্বাস করে না; তারা মনে করে যে, বিভিন্ন দেব-দেবীরা তাঁরই মতো শক্তিসম্পন্ন। *বৈষ্ণবতন্ত্রে পাষণ্ডী* শব্দটির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

"যে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের নারায়ণের সমকক্ষ বলে মনে করে, সেই হচ্ছে পাষণ্ডী।" (*হরিভক্তিবিলাস* ১/৭৩)

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন *অসমোর্ধ্ব;* অর্থাৎ, কেউ তাঁর উর্ধ্বে হওয়া দূরের কথা, সমকক্ষও নয়। কিন্তু পাষণ্ডীরা তা বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে যে, ভগবান বলে মনে করে যে-কোন দেব-দেবীর পূজা করলেই হল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় পাষণ্ডীরা হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের বিরোধী ছিল এবং এখনও আমরা দেখতে পাই যে, তারা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। তারা অভিযোগ করে যে, *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করে আমরা হিন্দুধর্মকে নষ্ট করে দিচ্ছি। পাষণ্ডীরা এই আন্দোলনের নিন্দা করে এবং কখনও কখনও অভিযোগ করে যে, বিদেশী বৈষ্ণবেরা প্রকৃত বৈষ্ণব নয়। এমন কি তথাকথিত বহু বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা বিষ্ণুর অনুগত জন বলে পরিচয় প্রদানকারী সম্প্রদায়গুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষদের বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবে পরিণত করাকে অশাস্ত্রীয় বলে অভিযোগ করে। এই ধরনের পাষণ্ডীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়েও ছিল এবং তারা এখনও রয়েছে। সেই পাষণ্ডীদের এই সমস্ত কার্যকলাপ সত্ত্বেও, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ— *পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হৈবে মোর নাম*—এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবেই। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার কেউই রোধ করতে পারবে না। কারণ এই আন্দোলনের উপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ রয়েছে।

শ্লোক ২০৪

আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাই ।
যে কীর্তন প্রবর্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ২০৪ ॥

শ্লোকার্থ

"আমার কাছে এসে হিন্দুরা অভিযোগ করল, 'নিমাই পণ্ডিত হিন্দুধর্মের নীতি ভঙ্গ করেছে। সে সংকীর্তন প্রবর্তন করেছে, যা কোন শাস্ত্রে আমরা পূর্বে কখনও শুনিনি।

শ্লোক ২০৫

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি' জাগরণ ।
তা'তে বাদ্য, নৃত্য, গীত,—যোগ্য আচরণ ॥ ২০৫ ॥

শ্লোকার্থ

" 'মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পূজায় আমরা যে নানা রকম বাদ্য বাজিয়ে নৃত্য, গীত আদি করে এবং রাত জেগে ব্রত পালন করি, সেটিই যোগ্য আচরণ।

শ্লোক ২০৬

পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত ।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ২০৬ ॥

শ্লোকার্থ

" 'পূর্বে নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল ছেলে ছিল, কিন্তু গয়া থেকে ফিরে আসার পর সে বিপরীতভাবে আচরণ করতে শুরু করেছে।

শ্লোক ২০৭

উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি ।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০৭ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এখন সে উচ্চৈঃস্বরে নানা রকমের গান গায়, হাততালি দেয় এবং মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দে আমাদের কানে তালা লাগে।

শ্লোক ২০৮

না জানি,—কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায় ।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥ ২০৮ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আমরা জানি না কি খেয়ে সে এভাবেই উন্মত্তের মতো নাচে, গায়, হাসে, কাঁদে, মাটিতে পড়ে যায়, লাফায় এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়।

শ্লোক ২০৯

নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্তন ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥ ২০৯ ॥

শ্লোকার্থ

" 'সারাক্ষণ এভাবেই সংকীর্তনে নগরের লোকদের পাগল করে তুলেছে। রাত্রে আমরা ঘুমাতে পারি না, সারা রাত জেগে থাকতে হয়।

শ্লোক ২১০

'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥ ২১০ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এখন সে তাঁর নিমাই নামটি ছেড়ে দিয়ে গৌরহরি নাম প্রবর্তন করেছে। সে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করে পাষণ্ডীর ধর্ম প্রবর্তন করেছে।

শ্লোক ২১১

কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২১১ ॥

শ্লোকার্থ

" 'এখন নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বারবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করছে। এই পাপের ফলে নবদ্বীপ শহর উজাড় হয়ে যাবে।

শ্লোক ২১২

হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি ॥ ২১২ ॥

শ্লোকার্থ

" 'হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ভগবানের নাম হচ্ছে সব চাইতে শক্তিশালী মহামন্ত্র। সেই মহামন্ত্র যদি সকলে শোনে, তা হলে মন্ত্রের প্রভাব নষ্ট হয়।

তাৎপর্য

নাম-অপরাধের তালিকায় বলা হয়েছে, *ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ*—ভগবানের নাম কীর্তন করাকে দান, ধ্যান, তপস্যা আদি বিবিধ পবিত্র কর্ম সম্পাদনের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা একটি অপরাধ। জড় বিচারে ধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে সমগ্র জগতের কল্যাণ হয়। জড়বাদীরা তাই তাদের বিষয়সুখ অব্যাহত রেখে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করার আশায় নানা রকম ধর্ম অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করেন। যেহেতু তারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তাই তারা মনে করে যে, ভগবান নিরাকার এবং তার সম্বন্ধে একটি ধারণা করার জন্য যে কোন একটি রূপ কল্পনা করে নিলেই চলে। তাই তারা মনে করে যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর রূপগুলিই হচ্ছে ভগবানের কল্পিত রূপের প্রকাশ। তাদের বলা হয় বহু-ঈশ্বরবাদী বা হাজার হাজার দেব-দেবীর পূজক। তাদের

মতে দেব-দেবীদের নাম কীর্তন এক প্রকার শুভ কর্ম। তথাকথিত সমস্ত বড় বড় স্বামীরা তাদের বইতে লিখেছেন যে, দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ, রাম আদি যে কোন একটি নাম কীর্তন করা যায়। কারণ, যে কোন নাম কীর্তন করা হলেই সমাজে কল্যাণকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাই এদের বলা হয় পাষণ্ডী—ভগবৎ-বিদ্বেষী বা অসুর।

এই ধরনের পাষণ্ডীরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম উচ্চারণের প্রকৃত মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ভ্রান্ত গর্বে গর্বিত হয়ে এবং সমাজে তাদের উচ্চতর পদমর্যাদার প্রভাবে তারা মনে করে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আদি বর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণোদ্ভূত। তাদের মতে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউই শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম উচ্চারণ করতে পারেন না, কেন না অন্যরা যদি ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করে, তা হলে নামের শক্তি হ্রাস হয়। তারা ভগবানের নামের মহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞ। *বৃহন্নারদীয় পুরাণে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে পারমার্থিক প্রগতি সাধনের জন্য হরিনাম ছাড়া আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই।" পাষণ্ডীরা স্বীকার করতে চায় না যে, শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম এতই মহৎ যে, সেই দিব্যনাম উচ্চারণ করার ফলে যে-কোন জীব অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, যদিও সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/৩/৫১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ*। পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন এবং দেহত্যাগের পর ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন। মূর্খ পাষণ্ডীরা মনে করে যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ যদি ভগবানের নাম কীর্তন করে, তা হলে নামের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাদের বিচারে, অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার পরিবর্তে নামের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বহু দেব-দেবীকে বিশ্বাস করে এবং ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করাকে যে-কোন মন্ত্র উচ্চারণ করার থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, এই সমস্ত পাষণ্ডীরা শাস্ত্রের বাণীতে অবিশ্বাস করে (*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*)। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর *শিক্ষাষ্টকে* বলেছেন, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—"সর্বক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের নাম কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য।" পাষণ্ডীরা কিন্তু এতই অধঃপতিত এবং ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করার গর্বে গর্বিত যে, তারা মনে করে, নিম্নবর্ণের মানুষেরা যদি সর্বক্ষণ ভগবানের নাম কীর্তন করে, তা হলে সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধারের পরিবর্তে নামের শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

২১১ শ্লোকে কৃষ্ণের কীর্তন করে *নীচ বাড় বাড়* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না যে কোন মানুষ সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। এই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) উল্লেখ করা হয়েছে—*কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ*।

এগুলি হচ্ছে সব চাইতে নিম্নস্তরের মানুষদের বর্ণ। পাষণ্ডীরা বলে যে, নিম্নবর্ণের মানুষদের যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। অন্যদেরও চিন্ময় গুণাবলীর বিকাশ হোক তা তারা চায় না। কারণ, তা হলে তাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার মর্যাদা ব্যাহত হবে এবং তখন তারা পারমার্থিক বিষয়ে আর একাধিপত্য করতে পারবে না। কিন্তু তথাকথিত হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের থেকে সব রকম বাধা পাওয়া সত্ত্বেও, আমরা শাস্ত্রের নির্দেশ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছি। এভাবেই ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে, বহু অধঃপতিত জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছে।

শ্লোক ২১৩

গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন ।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥ ২১৩ ॥

শ্লোকার্থ

" 'আপনি হচ্ছেন এই শহরের শাসনকর্তা। হিন্দু-মুসলমান সকলেই আপনার আশ্রিত জন। তাই দয়া করে নিমাই পণ্ডিতকে ডেকে তাঁকে এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিন।'

তাৎপর্য

ঠাকুর শব্দটির দুটি অর্থ—'ভগবান' অথবা 'দেবতুল্য ব্যক্তি' এবং আর একটি অর্থ হচ্ছে 'ক্ষত্রিয়'। এখানে পাষণ্ডী ব্রাহ্মণেরা কাজীকে নগরের শাসনকর্তা বিবেচনা করে *ঠাকুর* বলে সম্বোধন করেছে। সমাজের বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। ব্রাহ্মণদের বলা হয় মহারাজ, ক্ষত্রিয়দের বলা হয় *ঠাকুর*, বৈশ্যদের বলা হয় শেঠ অথবা মহাজন এবং শূদ্রদের বলা হয় চৌধুরী। এই প্রথা উত্তর-ভারতে এখনও প্রচলিত রয়েছে, সেখানে ক্ষত্রিয়দের ঠাকুর সাহেব বলে সম্বোধন করা হয়। পাষণ্ডীরা এতই হীন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন বলে তারা কাজীর কাছে গিয়ে আবেদন করেছিল, তাঁকে যেন শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্য জগতেও। সাধারণত কেউই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আমাদের শহর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য বলে না। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে সেই রকম একটি চেষ্টা হয়েছিল, তবে সেই চেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। এখন আমরা এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলন নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিশ, টোকিও, সিডনী, মেলবোর্ণ, অকল্যাণ্ড আদি পৃথিবীর সব কয়টি বড় বড় শহরে প্রচার করছি এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সব কিছুই খুব সুন্দরভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে মানুষ সুখী হচ্ছে এবং অত্যন্ত সন্তুষ্টিজনক ফল লাভ করছে।

শ্লোক ২১৪

তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে ।
সবে ঘরে যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২১৪ ॥

শ্লোকার্থ

"তাদের এই অভিযোগ শুনে আমি প্রীতিপূর্ণভাবে তাদের বলেছিলাম, 'দয়া করে এখন আপনারা ঘরে ফিরে যান। আমি নিশ্চয়ই নিমাই পণ্ডিতকে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করা থেকে বিরত করব'।

শ্লোক ২১৫

হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন ॥ ২১৫ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি জানি নারায়ণ হচ্ছেন হিন্দুদের পরম ঈশ্বর এবং আমার মনে হচ্ছে যেন তুমিই হচ্ছ সেই নারায়ণ।"

শ্লোক ২১৬

এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজিরে ছুঁইয়া ॥ ২১৬ ॥

শ্লোকার্থ

কাজীর এই মধুর বচন শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাসতে হাসতে কাজীকে স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ২১৭

তোমার মুখে কৃষ্ণনাম,—এ বড় বিচিত্র ।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র ॥ ২১৭ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনার মুখে যে কৃষ্ণনাম শুনছি তা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার—তার ফলে আপনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হলেন এবং আপনি এখন পরম পবিত্র হলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের মহিমা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত এই কথাগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলে যে মানুষ কিভাবে পবিত্র হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজী ছিলেন মুসলমান, ম্লেচ্ছ বা গোমাংসাহারী, কিন্তু কয়েকবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করার ফলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং সমস্ত

জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। আমরা জানি না, আজকাল পাষণ্ডীরা কেন অভিযোগ করে যে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করে সর্বস্তরের মানুষকে পারমার্থিক চেতনার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার ফলে আমরা নাকি হিন্দুধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করছি। এই সমস্ত মূর্খগুলি আমাদের এত প্রবলভাবে বিরোধিতা করে যে, তারা ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান বৈষ্ণবদের বিষ্ণুমন্দিরে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না। জড় বিষয় ভোগ করাকেই ধর্ম আচরণের উদ্দেশ্য বলে মনে করে তথাকথিত এই সমস্ত হিন্দুরা অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা করছে। কাজী কিভাবে পবিত্র হয়েছিলেন, সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ২১৮

'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম ।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্ ॥ ২১৮ ॥

শ্লোকার্থ

"যেহেতু আপনি 'হরি', 'কৃষ্ণ' এবং 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেছেন, তাই নিঃসন্দেহে আপনি পরম ভাগ্যবান ও পুণ্যবান।"

তাৎপর্য

প্রথমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভারতীয়-অভারতীয়, হিন্দু-অহিন্দু নির্বিশেষে কেউ যখন নিরপরাধে 'হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সব চাইতে পবিত্র স্তরে উন্নীত হন। তাই আমরা পাষণ্ডীদের অভিযোগে কর্ণপাত না করে, পৃথিবীর সর্বত্র ভগবানের নাম বিতরণ করে মানুষকে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত করছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অথবা প্রয়োজন হলে পাষণ্ডীদের মস্তকে পদাঘাত করে এই আন্দোলন প্রচার করছি।

শ্লোক ২১৯

এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি ।
প্রভুর চরণ ছুই' বলে প্রিয়বাণী ॥ ২১৯ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে কাজীর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণকমল স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—

শ্লোক ২২০

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি ।
এই কৃপা কর,—যেন তোমারে রহু ভক্তি ॥ ২২০ ॥

শ্লোকার্থ

"তোমার কৃপার প্রভাবে আমার দুষ্টমতি সংশোধিত হল। এবার তুমি আমাকে এমন কৃপা কর যেন তোমার প্রতি আমার ভক্তি সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে।"

শ্লোক ২২১

প্রভু কহে,—এক দান মাগিয়ে তোমায় ।
সংকীর্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥ ২২১ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু বললেন, "আমি কেবল আপনার কাছে একটি মাত্র দান চাই। কথা দিন যেন অন্তত এই নদীয়ায় কখনও সংকীর্তনে বাধা দেওয়া না হয়।"

শ্লোক ২২২

কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে ।
তাহাকে 'তালাক' দিব,—কীর্তন না বাধিবে ॥ ২২২ ॥

শ্লোকার্থ

কাজী বললেন, "আমি কথা দিচ্ছি যে, আমার বংশে ভবিষ্যতে যাদের জন্ম হবে তাদের কেউ যদি সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা দেয়, তা হলে সে আমার বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।"

তাৎপর্য

কাজীর এই নির্দেশ অনুসারে চাঁদকাজীর বংশধরেরা আজও কোন অবস্থাতেই সংকীর্তন আন্দোলনে বাধা দেন না। এমন কি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময়েও, চাঁদকাজীর বংশধরেরা নিষ্ঠা সহকারে তাঁর এই নির্দেশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

শ্লোক ২২৩

শুনি' প্রভু 'হরি' বলি' উঠিলা আপনি ।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি' হরি-ধ্বনি ॥ ২২৩ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'হরি! হরি!' বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে সমস্ত বৈষ্ণবেরা হরিধ্বনি দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন।

শ্লোক ২২৪

কীর্তন করিতে প্রভু করিলা গমন ।
সঙ্গে চলি' আইসে কাজী উল্লসিত মন ॥ ২২৪ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন করতে করতে ফিরে গেলেন এবং উল্লসিত কাজীও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

শ্লোক ২২৫

কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন ।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ ২২৫ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু কাজীকে তাঁর গৃহে ফিরে যেতে বললেন। তারপর শচীনন্দন নৃত্য করতে করতে তাঁর গৃহে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২২৬

এই মতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥ ২২৬ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে কৃপা করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা যিনি শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২২৭

এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥ ২২৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—এই দুই ভাই শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে নৃত্য করছিলেন।

শ্লোক ২২৮

শ্রীবাস-পুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক ।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥ ২২৮ ॥

শ্লোকার্থ

সেই সময় শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্রের মৃত্যু হল। কিন্তু তবুও শ্রীবাস ঠাকুরের চিত্তে কোন শোকের উদয় হল না।

শ্লোক ২২৯

মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন ।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥ ২২৯ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্রের মুখ দিয়ে জ্ঞানের কথা বলালেন এবং তারপর দুই ভাই গৌর ও নিতাই শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্র হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে' এই ঘটনাটির বর্ণনা করে বলেছেন—একদিন রাত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন ভক্তসঙ্গে শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে নৃত্য করছিলেন, তখন শ্রীবাস ঠাকুরের এক পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্তনানন্দে বিঘ্ন হবে বলে আশঙ্কা করে শ্রীবাস ঠাকুর তখন সকলকে শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত নৃত্য-কীর্তন হয়। কীর্তন ভঙ্গ হলে মহাপ্রভু বুঝতে পারেন যে, শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহে কোন বিপদ হয়েছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এই গৃহে নিশ্চয়ই কোন বিপদ হয়েছে।" তারপর যখন তাঁকে শ্রীবাস ঠাকুরের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়, তিনি তখন অনুশোচনা করে বলেন, "পূর্বে কেন এই সংবাদ আমাকে দেওয়া হয়নি?" তারপর তিনি শ্রীবাস ঠাকুরের মৃতপুত্রের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে বালক! তুমি শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহ ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ?" মৃত পুত্রটি তখন উত্তর দেয়, "যতদিন আমার এই গৃহে অবস্থান করার নির্বন্ধ ছিল ততদিন আমি এখানে ছিলাম। এখন সেই সময় অতিবাহিত হয়েছে, তাই আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমি অন্যত্র গমন করছি। আমি আপনার নিত্য অনুগত জীব। আপনার ইচ্ছার অতিরিক্ত আমার আর কিছুই করার নেই।" মৃত পুত্রের মুখে এই কথাগুলি শুনে শ্রীবাস ঠাকুরের পরিবারবর্গ দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তাঁদের আর কোন শোক রইল না। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) এই দিব্যজ্ঞানের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।* মৃত্যুর পর জীব আর একটি শরীর ধারণ করে; তাই তত্ত্বজ্ঞানী ধীর ব্যক্তি কখনও শোক করেন না। মৃত পুত্রের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আলোচনার পর মৃত শিশুটির সৎকার করা হয় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে আশ্বাস দেন, "আপনি একটি পুত্র হারিয়েছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু আর আমি হচ্ছি আপনার নিত্যপুত্র। আমরা কখনও আপনার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারব না।" এটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্কের একটি দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে, সখারূপে, পিতা-মাতারূপে, পুত্রাদিরূপে অথবা প্রেমিকারূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের একটি নিত্য সম্পর্ক রয়েছে। এই জড় জগতে সেই সম্পর্ক যখন বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়, তখন আমরা সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, সখা, প্রেমিক-প্রেমিকা, প্রভু-ভৃত্য আদি রূপে বিভিন্ন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করি, কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কগুলি কোন নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যায়। আর আমরা যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারি, তা হলে আমাদের সেই নিত্য সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হবে না এবং শোকেরও কোন কারণ থাকবে না।

শ্লোক ২৩০

তবে ত' করিলা সব ভক্তে বর দান ।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥ ২৩০ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সমস্ত ভক্তদের বর দান করলেন। নারায়ণীকে উচ্ছিষ্ট দান করে তিনি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করলেন।

তাৎপর্য

নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাস ঠাকুরের ভাইঝি। পরবর্তীকালে তাঁর গর্ভে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। কোন কোন চরিত্রহীন পাষণ্ড-প্রকৃতির প্রাকৃত সহজিয়ারা জঘন্যভাবে প্রচার করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট আহার করার ফলে নারায়ণী গর্ভবতী হন এবং তার ফলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। এই সমস্ত পাষণ্ড সহজিয়ারা এই ধরনের সমস্ত গল্প বানিয়ে প্রচার করে, কিন্তু তাদের কথায় কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কেন না তারা হচ্ছে বৈষ্ণবদের শত্রু।

শ্লোক ২৩১

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন ।
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন ॥ ২৩১ ॥

শ্লোকার্থ

এক যবন দর্জি শ্রীবাস ঠাকুরের বস্ত্র সেলাই করত। তার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর স্বরূপ প্রদর্শন করান।

শ্লোক ২৩২

'দেখিনু' 'দেখিনু' বলি' হইল পাগল ।
প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল ॥ ২৩২ ॥

শ্লোকার্থ

"আমি দেখেছি! আমি দেখেছি!" বলে সে ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে উন্মাদের মতো নৃত্য করতে লাগল এবং উত্তম বৈষ্ণবে পরিণত হল।

তাৎপর্য

শ্রীবাস ঠাকুরের গৃহের নিকটে একজন মুসলমান দর্জি ছিল, যে তাঁর পরিবারের জামাকাপড় সেলাই করত। একদিন সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপূর্ব নৃত্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়। তার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে তাঁর কৃষ্ণস্বরূপ প্রদর্শন করান। তখন সেই দর্জিটি "আমি দেখেছি! আমি দেখেছি!" বলে নৃত্য করতে শুরু করে। ভগবৎ-প্রেমে বিহ্বল হয়ে সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য করতে থাকে। এভাবেই সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হয়।

শ্লোক ২৩৩

আবেশেতে শ্রীবাসে প্রভু বংশী ত' মাগিল ।
শ্রীবাস কহে,—বংশী তোমার গোপী হরি' নিল ॥ ২৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

ভাবাবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে তাঁর বাঁশি দিতে বলেন। কিন্তু শ্রীবাস ঠাকুর উত্তর দেন, "তোমার বাঁশি গোপীরা চুরি করে নিয়েছে।"

শ্লোক ২৩৪

শুনি' প্রভু 'বল' 'বল' বলেন আবেশে ।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥ ২৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে প্রেমাবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে থাকেন, "বল! বল!" তখন শ্রীবাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত লীলারস বর্ণনা করেন।

শ্লোক ২৩৫

প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য বর্ণিল ।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ ২৩৫ ॥

শ্লোকার্থ

প্রথমে শ্রীবাস ঠাকুর বৃন্দাবন-লীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য বর্ণনা করলেন। তা শুনে মহাপ্রভুর অন্তরের আনন্দ বর্ধিত হল।

শ্লোক ২৩৬

তবে 'বল' 'বল' প্রভু বলে বারবার ।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥ ২৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর বারবার মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "বল! বল!" তখন শ্রীবাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে সমস্ত বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৩৭

বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ ।
তাঁ-সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥ ২৩৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন, কিভাবে গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্টা হয়ে বৃন্দাবনের বনে এসেছিলেন এবং কিভাবে তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বনবিহার করেছিলেন।

শ্লোক ২৩৮

তাহি মধ্যে ছয়ঋতু লীলার বর্ণন ।
মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলি কথন ॥ ২৩৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস পণ্ডিত ছয় ঋতুর বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করলেন। তিনি মধুপান, রাস-উৎসব, যমুনায় জলক্রীড়া এবং অন্যান্য সমস্ত লীলার বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ২৩৯

'বল' 'বল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস ।
শ্রীবাস কহেন তবে রাসরসের বিলাস ॥ ২৩৯ ॥

শ্লোকার্থ

তা শুনে গভীর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মহাপ্রভু বললেন, "বল! বল!" শ্রীবাস ঠাকুর তখন অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত রাসলীলার কথা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ২৪০

কহিতে, শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল ।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি' আলিঙ্গন কৈল ॥ ২৪০ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই প্রভুর অনুরোধ আর শ্রীবাস ঠাকুরের বর্ণনায় রাত ভোর হল এবং মহাপ্রভু শ্রীবাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন।

শ্লোক ২৪১

তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা ।
রুক্মিণী-স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥ ২৪১ ॥

শ্লোকার্থ

তারপর চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের অগ্রণী রুক্মিণীদেবীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

শ্লোক ২৪২

কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি ।
খাটে বসি' ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥ ২৪২ ॥

শ্লোকার্থ

কখনও তিনি দুর্গারূপে, কখনও লক্ষ্মীরূপে এবং কখনও যোগমায়ারূপে তিনি অভিনয় করলেন। খাটে বসে তিনি ভক্তদের প্রেমভক্তি প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৪৩

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে ।
এক ব্রাহ্মণী আসি' ধরিল চরণে ॥ ২৪৩ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য অবসানে, একজন ব্রাহ্মণী সেখানে এসে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরলেন।

শ্লোক ২৪৪

চরণের ধূলি সেই লয় বার বার ।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥ ২৪৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রাহ্মণী বারবার তাঁর পদধূলি নিতে লাগলেন, তার ফলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

তাৎপর্য

মহাপুরুষদের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করা অবশ্যই পদধূলি গ্রহণকারীর পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এভাবেই ব্যথিত হওয়ার দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, কাউকে পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া বৈষ্ণবদের উচিত নয়।

কেউ যখন কোন মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি গ্রহণ করেন, তখন তার ফলে তার পাপ সেই মহাপুরুষ গ্রহণ করেন। প্রবল শক্তিশালী না হলে, পদধূলি প্রদানকারী ব্যক্তিকে পাপের ফল ভোগ করতে হয়। তাই সাধারণত পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয়। কখনও কখনও বড় বড় সভার মানুষেরা এসে আমাদের পদস্পর্শ করার সুযোগ নেয়। তার ফলে কখনও কখনও আমাদের রোগাক্রান্ত হতে হয়। তাই যতদূর সম্ভব বাইরের কোন লোককে আমাদের পদস্পর্শ করতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪৫

সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল ।
নিত্যানন্দ-হরিদাস ধরি' উঠাইল ॥ ২৪৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই স্ত্রীলোকটির পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু আর হরিদাস ঠাকুর তাঁকে ধরে জল থেকে উঠালেন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি ভগবদ্বাণীর প্রচারক ভগবদ্ভক্তদের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। প্রতিটি প্রচারকের জানা উচিত যে, বৈষ্ণবের পদস্পর্শ করে পদধূলি গ্রহণ করাটা গ্রহণকারীর পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে, কিন্তু যাঁর পদধূলি গ্রহণ করা হচ্ছে তাঁর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তাই যতদূর সম্ভব মানুষকে পদধূলি গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে হবে। কেবলমাত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদেরই পদধূলি গ্রহণ করতে দেওয়া হবে, অন্যদের নয়। যারা পাপকর্মে লিপ্ত তাদেরকে সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে।

শ্লোক ২৪৬

বিজয় আচার্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা ।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥ ২৪৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই রাত্রে মহাপ্রভু বিজয় আচার্যের ঘরে অবস্থান করলেন। পরদিন সকালবেলায় সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন।

শ্লোক ২৪৭

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া ।
'গোপী' 'গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হঞা ॥ ২৪৭ ॥

শ্লোকার্থ

একদিন গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহে বসেছিলেন। বিরহের ফলে বিষণ্ণ হয়ে তিনি 'গোপী!' গোপী!' বলে ডাকছিলেন।

শ্লোক ২৪৮

এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে ।
'গোপী' 'গোপী' নাম শুনি' লাগিল বলিতে ॥ ২৪৮ ॥

শ্লোকার্থ

তখন একজন পড়ুয়া সেখানে এসে মহাপ্রভুকে এভাবেই 'গোপী! গোপী!' নাম ধরে ডাকতে শুনে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে বললেন—

শ্লোক ২৪৯

কৃষ্ণনাম না লও কেনে, কৃষ্ণনাম—ধন্য ।
'গোপী' 'গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥ ২৪৯ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি কেন কৃষ্ণনাম গ্রহণ না করে 'গোপী, গোপী' নাম গ্রহণ করছেন? দিব্য মহিমামণ্ডিত কৃষ্ণনাম গ্রহণ না করে গোপীদের নাম ধরে ডাকলে কি পুণ্য হবে?"

তাৎপর্য

কথিত আছে যে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে কেন *গোপীনাম* উচ্চারণ করছিলেন তা পড়ুয়া অথবা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং সেই পড়ুয়ার পক্ষে *গোপীনাম* গ্রহণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি। সেই নবীন পড়ুয়াটি অবশ্যই কৃষ্ণনামের মহিমা সম্বন্ধে অবগত ছিল, কিন্তু তার মনোভাব ছিল অপরাধে পূর্ণ। *ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ* —পুণ্যফল অর্জন করার জন্য কৃষ্ণনাম গ্রহণ করা অপরাধ। সেই পড়ুয়াটি অবশ্য তা জানত না। তাই সে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, "*গোপীনাম* গ্রহণ করার ফলে কি পুণ্য হয়?" সে জানত না যে, এখানে পাপ-পুণ্যের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কৃষ্ণনাম অথবা *গোপীনাম* গ্রহণ হয় অপ্রাকৃত প্রেমের স্তরে। যেহেতু সে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল, তাই সে এই রকম উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করেছিল। তাই মহাপ্রভু আপাতদৃষ্টিতে তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই কথা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৫০

শুনি' প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার ।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥ ২৫০ ॥

শ্লোকার্থ

সেই মূর্খ পড়ুয়ার কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মহাপ্রভু কৃষ্ণকে তিরস্কার করলেন এবং একটি লাঠি নিয়ে সেই পড়ুয়াটিকে মারতে উদ্যত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বহন করে গোপিকাদের কাছে এলেন, তখন গোপিকারা, বিশেষ করে শ্রীমতী রাধারাণী বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এই ধরনের ভর্ৎসনা কিন্তু গভীর প্রেমের অভিব্যক্তি, যা সাধারণ

মানুষ বুঝতে পারে না। মূর্খ পড়ুয়াটি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করে, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও অনুরূপভাবে গভীর প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন গোপীভাবে আবিষ্ট ছিলেন, তখন পড়ুয়াটি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁকে বলায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর এই ক্রোধ দর্শন করে, একজন সাধারণ নাস্তিক স্মার্ত-ব্রাহ্মণ সেই মূর্খ পড়ুয়াটি মহাপ্রভুকে ভুল বুঝেছিল। তাই সে অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মহাপ্রভুকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল। এই ঘটনার পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, যাতে মানুষ তাকে একজন সাধারণ গৃহস্থ বলে মনে করে তাঁর প্রতি অপরাধ না করে, কেন না ভারতবর্ষে এখনও স্বাভাবিক ভাবেই সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

শ্লোক ২৫১

ভয়ে পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায় ।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥ ২৫১ ॥

শ্লোকার্থ

ভয়ে সেই পড়ুয়াটি যখন পালিয়ে যায়, তখন মহাপ্রভু তার পিছন পিছন ছুটতে থাকেন। সেই সময়ে ভক্তরা কোনক্রমে মহাপ্রভুকে নিরস্ত করেন।

শ্লোক ২৫২

প্রভুরে শান্ত করি' আনিল নিজ ঘরে ।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥ ২৫২ ॥

শ্লোকার্থ

ভক্তরা মহাপ্রভুকে শান্ত করে তাঁর ঘরে ফিরিয়ে আনলেন এবং সেই পড়ুয়াটি তখন পালিয়ে গিয়ে অন্য সমস্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে মিলিত হল।

শ্লোক ২৫৩

পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে একঠাঞি ।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৫৩ ॥

শ্লোকার্থ

যেখানে এক সহস্র পড়ুয়া পাঠ করছিল, সেখানে গিয়ে সেই পড়ুয়াটি তাদের কাছে সেই ঘটনার কথা বর্ণনা করল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দ্বিজ* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, সেই পড়ুয়াটি ছিল ব্রাহ্মণ। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরাই কেবল বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। শাস্ত্র অধ্যয়ন

করা বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্যই। পূর্বে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রদের বিদ্যালয় ছিল না। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করার কৌশল শিক্ষা লাভ করত এবং বৈশ্যরা তাদের পিতা অথবা অন্য কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ব্যবসা শিক্ষা লাভ করত; *বেদপাঠ* করা তাদের জন্য ছিল না। আধুনিক যুগে অবশ্য সকলেই স্কুলে যাচ্ছে এবং সকলেই একই শিক্ষা লাভ করছে, যদিও কেউই জানে না তার ফল কি হবে। তার ফলটি অবশ্য অত্যন্ত অসন্তোষজনক, যা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিশেষভাবে দেখা যায়। আমেরিকায় বিশাল বিশাল বিদ্যায়তনগুলিতে সকলেই শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে, কিন্তু তার ফলে অধিকাংশ ছাত্রই হিপ্পি হয়ে যাচ্ছে।

উচ্চতর শিক্ষা সকলের জন্য নয়। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে দেওয়া উচিত। যন্ত্রপাতি তৈরির প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া বিদ্যায়তনগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, কেন না তা যথার্থ শিক্ষা নয়। যন্ত্রপাতি নিয়ে যারা কাজ করে তারা শূদ্র; যারা *বেদ* অধ্যয়ন করেন তাঁদেরই কেবল যথার্থ শিক্ষিত (পণ্ডিত) বলা যায়। ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা এবং অন্য ব্রাহ্মণদের বৈদিক জ্ঞান শিক্ষাদান করা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমাদের শিষ্যদের আমরা শিক্ষা দিচ্ছি কিভাবে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব হতে হয়। আসলে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ইংরেজী ও সংস্কৃত শিখছে এবং এই দুটি ভাষার মাধ্যমে তারা আমাদের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করতে পারবে, যেমন—*শ্রীমদ্ভাগবত*, *ভগবদ্গীতা* ও *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু*। প্রতিটি ছাত্রকে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শিক্ষা দেওয়া একটি মস্ত বড় ভুল। এক শ্রেণীর ছাত্রকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নে সক্ষম ব্রাহ্মণ না থাকলে, মানব-সমাজ সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

শ্লোক ২৫৪

শুনি' ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ ।
সবে মেলি' করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৫৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ঘটনার কথা শুনে, সমস্ত পড়ুয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, সকলে মিলে মহাপ্রভুর নিন্দা করতে শুরু করল।

শ্লোক ২৫৫

সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি ।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্মভয় নাই ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোকার্থ

তারা অভিযোগ করল, "একলা নিমাই পণ্ডিত সমস্ত দেশকে নষ্ট করল। তিনি একজন ব্রাহ্মণকে মারতে চান, তাঁর কি কোন ভয় নেই?

তাৎপর্য

তখনকার দিনেও জাতি-ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত দাম্ভিক ছিল। তারা শিক্ষক অথবা গুরুর শাসন পর্যন্ত মানত না।

শ্লোক ২৫৬

পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে ।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ॥ ২৫৬ ॥

শ্লোকার্থ

"তিনি যদি পুনরায় এই রকম নিন্দনীয় আচরণ করেন, তা হলে আমরা তাঁকে মারব। তিনি কি এমন এক বড় মানুষ এবং তিনি আমাদের কি করতে পারেন?"

শ্লোক ২৫৭

প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ ।
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিন্দা করার ফলে সেই সমস্ত পড়ুয়াদের বুদ্ধি নাশ হল। যদিও তারা ছিল শিক্ষিত পণ্ডিত, কিন্তু এই অপরাধের ফলে জ্ঞানের সারমর্ম তাদের কাছে প্রকাশিত হল না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে, *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ*—কেউ যখন নাস্তিক ভাব (*আসুরং ভাবম্*) অবলম্বন করে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়, তিনি মস্ত বড় পণ্ডিত হলেও জ্ঞানের সারমর্ম তার কাছে প্রকাশিত হয় না; পক্ষান্তরে, ভগবানের মায়ার প্রভাবে তার জ্ঞান অপহৃত হয়। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* (৬/২৩) একটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

এই শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ঐকান্তিকভাবে শ্রদ্ধা পরায়ণ হন এবং গুরুদেবের প্রতিও যদি তেমনভাবেই ভক্তি পরায়ণ হন, তবে তিনি সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সেই ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশিত হয়। সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। যিনি সদ্গুরু এবং পরমেশ্বর ভগবানের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পিত, তাঁর কাছেই বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম প্রকাশিত হয়, অন্য কারও কাছে নয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/২৪) প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে—

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

"যিনি সরাসরিভাবে ভক্তির নয়টি লক্ষণ (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি) ভগবানের সেবায় প্রয়োগ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি মহাপণ্ডিত এবং তিনি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের জ্ঞান পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কেন না বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে অবগত হওয়া।" শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় প্রতিপন্ন করেছেন যে, সর্বপ্রথমে অবশ্যই সদ্গুরুর শরণাগত হতে হবে; তারপর ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হবে। এমন নয় যে, গভীর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করলেই ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়। লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও যদি গুরুদেবের প্রতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হন, তা হলে তিনি পারমার্থিক জীবনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং *বেদের* প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন। সেই সম্পর্কে খট্বাঙ্গ মহারাজের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। যিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদিত, বুঝতে হবে যে, তিনি সমস্ত বৈদিক জ্ঞান অত্যন্ত সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। যিনি বৈদিক শরণাগতির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনি ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হন। কিন্তু যারা অত্যন্ত দাম্ভিক, তারা সদ্গুরু অথবা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। তার ফলে তারা বৈদিক শাস্ত্রের সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১১/১৮) ঘোষণা করা হয়েছে—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥

"কেউ যদি বৈদিক শাস্ত্রে পণ্ডিত হয় কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত না হয়, তা হলে তার সমস্ত প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে বলে বুঝতে হবে, তার অবস্থা ঠিক দুগ্ধহীনা গাভী পোষার মতো।"

যারা শরণাগতির পন্থা অবলম্বন না করে কেবল বিদ্যা অর্জন করতে চায়, তাদের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়। কেউ যদি *বেদ* পাঠে অত্যন্ত সুদক্ষ হয় অথচ গুরুদেব অথবা বিষ্ণুর শরণাগত না হয়, তা হলে তার সমস্ত জ্ঞানচর্চা হচ্ছে শ্রম ও সময়ের অপচয় মাত্র।

শ্লোক ২৫৮

তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয় ।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি' সে করয় ॥ ২৫৮ ॥

শ্লোকার্থ

কিন্তু তবুও সেই দাম্ভিক পড়ুয়ারা নম্র হল না। পক্ষান্তরে, তারা যেখানে সেখানে হেসে হেসে মহাপ্রভুর নিন্দা করতে লাগল।

শ্লোক ২৫৯

সর্বজ্ঞ গোসাঞি জানি' সবার দুর্গতি ।
ঘরে বসি' চিন্তে তা'-সবার অব্যাহতি ॥ ২৫৯ ॥

শ্লোকার্থ

সর্বজ্ঞ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই সমস্ত পড়ুয়াদের দুর্গতি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাই তিনি গৃহে বসে চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে তাদের উদ্ধার করবেন।

শ্লোক ২৬০

যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ ।
ধর্মী, কর্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দক, দুর্জন ॥ ২৬০ ॥

শ্লোকার্থ

মহাপ্রভু ভাবলেন, "তথাকথিত সমস্ত অধ্যাপক এবং তাদের শিষ্যরা ধর্ম, কর্ম ও তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তবুও তারা হচ্ছে নিন্দুক ও দুর্জন ।

তাৎপর্য

এখানে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ জড়বাদীদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে তাদের খুব ধার্মিক, কর্মবীর অথবা তপস্বী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তারা যদি পরমেশ্বর ভগবানের নিন্দা করে, তা হলে তারা দুর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কথা *হরিভক্তি-সুধোদয়* গ্রন্থে (৩/১১) বর্ণনা করা হয়েছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

পরমেশ্বর ভগবানে ভক্তিবিহীন মানুষ, তা তিনি যত বড় জাতীয়তাবাদী, কর্মবীর, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক হোন না কেন, তাদের সমস্ত সদ্গুণগুলি মৃতদেহের মূল্যবান ভূষণের মতো। তাদের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে যে, তারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী।

শ্লোক ২৬১

এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে ।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥ ২৬১ ॥

শ্লোকার্থ

"ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করতে আমি যদি তাদের অনুপ্রাণিত না করি, তা হলে আমাকে নিন্দা করার অপরাধে তারা কখনও ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করতে পারবে না।

শ্লোক ২৬২

নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত ।
এসব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥ ২৬২ ॥

শ্লোকার্থ

"অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য আমি এসেছি, কিন্তু এখন ঠিক তার উল্টো হল। এই সমস্ত দুর্জনেরা কিভাবে রক্ষা পাবে? কিভাবে তাদের হিত সাধিত হবে?

শ্লোক ২৬৩

আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয় ।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৬৩ ॥

শ্লোকার্থ

"এই সমস্ত দুর্জনেরা যদি আমাকে প্রণাম করে, তা হলে তাদের পাপ ক্ষয় হবে। তখন আমি যদি তাদের অনুপ্রাণিত করি, তা হলে তারা ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করবে।

শ্লোক ২৬৪

মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার ।
এসব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৬৪ ॥

শ্লোকার্থ

"যে সমস্ত অধঃপতিত জীব আমার নিন্দা করে এবং আমাকে প্রণাম করে না, আমি অবশ্যই তাদের উদ্ধার করব।

শ্লোক ২৬৫

অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ।
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৬৫ ॥

শ্লোকার্থ

"তাই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব, কেন না তা হলে এই সমস্ত মানুষেরা আমাকে সন্ন্যাসী বলে মনে করে প্রণাম করবে।

তাৎপর্য

চতুর্বর্ণের মধ্যে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ব্রাহ্মণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি অপর বর্ণগুলির শিক্ষক ও গুরু। তেমনই চতুরাশ্রমের মধ্যে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) *সন্ন্যাস* আশ্রম হচ্ছে সব চাইতে উন্নত। তাই *সন্ন্যাসী* হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমের গুরু এবং *সন্ন্যাসী* ব্রাহ্মণদেরও প্রণম্য। দুর্ভাগ্যবশত জাতি-ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদের

প্রণাম করে না। তারা এত দাম্ভিক যে, তারা এমন কি ভারতীয় *সন্ন্যাসীদেরও* প্রণাম করে না, ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান *সন্ন্যাসীদের* আর কি কথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আশা করেছিলেন যে, জাতি-ব্রাহ্মণেরাও *সন্ন্যাসীকে* প্রণাম করবে, কেন না পাঁচশো বছর আগে সামাজিক নিয়ম ছিল *সন্ন্যাসী* দেখলেই, তা তিনি পরিচিত হোন বা অপরিচিতই হোন, তৎক্ষণাৎ তাঁকে প্রণাম করা।

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের *সন্ন্যাসীরা* নিঃসন্দেহে যথার্থ *সন্ন্যাসী*। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি সদস্য যথাযথভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। *হরিভক্তিবিলাসে* শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন, *তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্*—"দীক্ষা বিধানের দ্বারা যে কোন মানুষ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন।" এভাবেই প্রথমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে হয় এবং ধীরে ধীরে তাঁরা যখন আমিষ আহার, সব রকম নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও জুয়া, পাশা আদি খেলা বর্জন করেন, তখন তাঁরা পারমার্থিক পথে উন্নত হন। কেউ যখন নিয়মিতভাবে এই চারটি নিয়ম পালন করেন, তখন তাঁকে প্রথম দীক্ষা (হরিনাম) দেওয়া হয় এবং তিনি প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ষোল মালা মহামন্ত্র জপ করেন। তার ছয় মাস বা এক বছর পর তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ দীক্ষা লাভ করে যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হন। তারপর, পারমার্থিক মার্গে তিনি যখন আরও উন্নত হন এবং এই জড় জগৎ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, তখন তাঁকে সন্ন্যাস দেওয়া হয়। তখন তিনি স্বামী অথবা গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন, যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়ের প্রভু'। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতবর্ষের চরিত্রহীন তথাকথিত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন তো করেই না, এমন কি তাঁদের যথার্থ *সন্ন্যাসী* বলেও স্বীকার করে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চেয়েছিলেন যে, তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যেন *বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদের* শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তবুও তারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক বা যথার্থ *সন্ন্যাসী* বলে স্বীকার করুক বা না করুক তাতে কিন্তু কিছু যায় আসে না, কেন না শাস্ত্রে এই ধরনের অবাধ্য জাতি-ব্রাহ্মণদের দণ্ডবিধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্ ।
নমস্কারং ন কুর্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥

"যে পরমেশ্বর ভগবানকে, মন্দিরে তাঁর শ্রীবিগ্রহকে অথবা ত্রিদণ্ডী *সন্ন্যাসীকে* প্রণতি নিবেদন করে না, তাকে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।" কেউ যদি এই ধরনের *সন্ন্যাসীকে* প্রণতি নিবেদন না করে, তা হলে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে একদিন উপবাস করা।

শ্লোক ২৬৬

প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ ক্ষয় ।
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥ ২৬৬ ॥

শ্লোকার্থ

"প্রণতি নিবেদন করার ফলে তাদের অপরাধ ক্ষয় হবে। তখন আমার কৃপার প্রভাবে তাদের নির্মল হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে।

তাৎপর্য

বৈদিক বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণেরাই কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। শঙ্কর-সম্প্রদায় (একদণ্ডি-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়) কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত জাতি-ব্রাহ্মণদেরই সন্ন্যাস দেয়। কিন্তু বৈষ্ণব ধারায় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত না হলেও *হরিভক্তিবিলাসে* বর্ণিত শাস্ত্রীয় সংস্কারের মাধ্যমে (*তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্*) মানুষ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন মানুষ যথার্থ দীক্ষাবিধির মাধ্যমে ব্রাহ্মণে পরিণত হতে পারেন। তিনি যখন আমিষাহার, নেশা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করেন, তখন তাঁকে সন্ন্যাস দেওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সমস্ত সন্ন্যাসীরা, যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভগবানের বাণী প্রচার করছেন, তাঁরা যথার্থ ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী। তাই তথাকথিত জাতি-ব্রাহ্মণদের মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা তাদের প্রণম্য নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে তাঁদের প্রণাম করার ফলে, তারা অপরাধ মুক্ত হবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করবে। বলা হয়েছে, *নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়*—নির্মল হৃদয়েই কেবল কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হয়। সন্ন্যাসীদের আমরা যতই প্রণতি নিবেদন করি, বিশেষ করে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদের, ততই আমাদের অপরাধ ক্ষয় হয় এবং আমাদের হৃদয় নির্মল হয়। নির্মল হৃদয়েই কেবল কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পন্থা।

শ্লোক ২৬৭

এসব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার ।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥ ২৬৭ ॥

শ্লোকার্থ

"এভাবেই পৃথিবীর সমস্ত পাষণ্ডী উদ্ধার হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই যুক্তিটিই সার।"

শ্লোক ২৬৮

এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে ।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ২৬৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৃহে বাস করতে লাগলেন। সেই সময় কেশব ভারতী নদীয়া নগরে এলেন।

শ্লোক ২৬৯

প্রভু তাঁরে নমস্করি' কৈল নিমন্ত্রণ ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ ২৬৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে মহাপ্রভু তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং ভোজনান্তে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে প্রচলিত রীতি হচ্ছে, যখনই কোন অপরিচিত সন্ন্যাসী গ্রামে অথবা শহরে আসেন, তখন কেউ তাঁকে তার বাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সন্ন্যাসীরা সাধারণত ব্রাহ্মণের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করেন, কেন না ব্রাহ্মণেরা নারায়ণ-শিলা বা শালগ্রাম-শিলা পূজা করেন এবং তাই তাঁদের গৃহে সন্ন্যাসীরা ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। তার ফলে মহাপ্রভু তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭০

তুমি ত' ঈশ্বর বট,—সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার মোচন ॥ ২৭০ ॥

শ্লোকার্থ

"আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাই, দয়া করে আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন।"

শ্লোক ২৭১

ভারতী কহেন,—তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী ।
যে করাহ, সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ

কেশব ভারতী তখন উত্তর দিলেন, "আপনি পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী পরমাত্মা। আমাকে দিয়ে আপনি যা করাতে চান আমি তাই করব। আমি স্বতন্ত্র নই।"

শ্লোক ২৭২

এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা ।
মহাপ্রভু তাহা যাই' সন্ন্যাস করিলা ॥ ২৭২ ॥

শ্লোকার্থ

সেই কথা বলে কেশব ভারতী কাটোয়াতে গেলেন। তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেখানে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

চব্বিশ বৎসর বয়সের শেষে যে মাঘী শুক্লপক্ষ পড়ল, সেই উত্তরায়ণ সময়ে সংক্রমণ দিনে মহাপ্রভু রাত্রিশেষে শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করে নিদয়ার ঘাট নামক স্থানে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে কণ্টকনগর বা কাটোয়া গ্রামে পৌঁছে কেশব ভারতীর কাছে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যেহেতু কেশব ভারতী ছিলেন শংকর-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই তিনি মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবের ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস দান করতে পারেননি।

মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে চন্দ্রশেখর আচার্য সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসকল সম্পাদন করেন। সমস্ত দিন কীর্তন করতে করতে দিবা অবসানে ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত হল। পরদিন সকালে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তার পূর্বে তিনি নিমাই পণ্ডিত নামে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাসীরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। কেশব ভারতী তাঁর সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৭৩

সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ।
মুকুন্দদত্ত,—এই তিন কৈল সর্ব কার্য ॥ ২৭৩ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তিনজন তাঁর সঙ্গে থেকে সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ দত্ত।

শ্লোক ২৭৪

এই আদি-লীলার কৈল সূত্র গণন ।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৭৪ ॥

শ্লোকার্থ

এভাবেই সংক্ষেপে আমি আদিলীলার ঘটনাসমূহ বর্ণনা করলাম। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর (তাঁর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে) তা সব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৭৫

যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন ।
চতুর্বিধ ভক্ত-ভাব করে আস্বাদন ॥ ২৭৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই পরমেশ্বর ভগবান যিনি যশোদানন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিই এখন শচীমাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে চতুর্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যভাব হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির চার প্রকার ভিত্তি। শান্তরসে ভগবদ্ভক্তির তটস্থ অবস্থায় কোন রকম ক্রিয়া নেই। কিন্তু শান্তরসের উপরে রয়েছে যথাক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যপ্রেম, যেগুলি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির উন্নত থেকে উন্নততর স্তর।

শ্লোক ২৭৬

স্বমাধুর্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে ।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৭৬ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম এবং তাঁর নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর *অনুভাষ্যে* লিখেছেন—"শ্রীগৌরসুন্দর হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনই গোপিকাদের ভাব ত্যাগ করেননি। তিনি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবকরূপেই আচরণ করেছেন। তিনি কখনও ভোক্তারূপে পরস্ত্রী নিয়ে মাধুর্যপ্রেমের অনুকরণ করেননি, যা সহজিয়ারা সাধারণত করে থাকে। তিনি কখনও লম্পটের মতো আচরণ করেননি। সহজিয়াদের মতো কামুক জড়বাদীরা সর্বদাই স্ত্রীসঙ্গ কামনা করে, এমন কি পরস্ত্রীসঙ্গও করে। কিন্তু তারা যখন তাদের ঘৃণ্য কামপিপাসা ও ব্যভিচার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্কন্ধে আরোপ করতে চায়, তখন তারা শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরণে অপরাধী হয়। *চৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডের* পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে—

সবে পর-স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস ।
স্ত্রী দেখি' দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥

'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরস্ত্রীর সঙ্গে পরিহাস পর্যন্ত করেননি। কোন স্ত্রীলোককে আসতে দেখলে, তিনি তৎক্ষণাৎ একপাশে সরে গিয়ে তার যাওয়ার রাস্তা করে দিতেন।' স্ত্রীসঙ্গ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কিন্তু পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ কামক্রীড়ায় লিপ্ত সহজিয়ারা নিজেদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামী বলে প্রচার করতে চায়। বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলের সঙ্গে পরিহাস করেছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও কোন পরস্ত্রীর সঙ্গে উপহাস করেননি, এমন কি তাঁর এই অবতারে তিনি কোন স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও কিছু বলেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুর গৌরাঙ্গ-নাগরী সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি

দেননি। যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সকল প্রকার প্রার্থনা নিবেদন করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও গৌরাঙ্গনাগর রূপে তাঁর আরাধনা করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত আচরণ এবং শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনা গৌরাঙ্গ-নাগরীদের মতবাদ নিরস্ত করেছে।

শ্লোক ২৭৭

গোপী-ভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭৭ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গোপিকাদের ভাব অবলম্বন করেছেন, যাঁরা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের প্রেমিকরূপে গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ২৭৮

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥ ২৭৮ ॥

শ্লোকার্থ

সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্য কারও প্রতি গোপিকাদের এই ভাব প্রকাশিত হয় না।

শ্লোক ২৭৯

শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥ ২৭৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। মাথায় তাঁর ময়ূরপুচ্ছ, গলায় তাঁর গুঞ্জামালা এবং পরনে তাঁর গোপবেশ। তাঁর দেহ তিনটি স্থানে বাঁকা আর তাঁর মুখে বাঁশি।

শ্লোক ২৮০

ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার ।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ ২৮০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁর এই স্বরূপ ত্যাগ করে অন্য কোন বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন, তা হলে গোপিকাদের চিত্তে প্রেমভাবের উদয় হয় না এবং তাঁরা তাঁর কাছে যান না।

শ্লোক ২৮১

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্ ।
আবিষ্কুর্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ২৮১ ॥

গোপীনাম্—গোপীদের; পশুপেন্দ্র-নন্দন-জুষঃ—গোপরাজ নন্দ মহারাজের পুত্রের সেবা; ভাবস্য—ভাবের; কঃ—কি; তাম্—তা; কৃতী—জ্ঞানী পুরুষ; বিজ্ঞাতুম্—হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; ক্ষমতে—সক্ষম; দুরূহ—দুর্বোধ্য; পদবী—পদ; সঞ্চারিণঃ—উদ্দীপক; প্রক্রিয়াম্—ক্রিয়াকলাপ; আবিষ্কুর্বতি—তিনি প্রকাশ করেন; বৈষ্ণবীম্—শ্রীবিষ্ণুর; অপি—অবশ্যই; তনুম্—রূপ; তস্মিন্—তাতে; ভুজৈঃ—বাহুসহ; জিষ্ণুভিঃ—অত্যন্ত সুন্দর; যাসাম্—যাঁদের (গোপিকাদের); হন্ত—হায়; চতুর্ভিঃ—চার; অদ্ভুত—অপূর্ব; রুচিম্—সুন্দর; রাগ-উদয়ঃ—প্রেমভাবের উদয়; কুঞ্চতি—সঙ্কুচিত হয়।

অনুবাদ

"এক সময় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক সহকারে তাঁর অপূর্ব সুন্দর চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি প্রকাশ করেন। অত্যন্ত সুন্দর সেই রূপ দর্শন করে গোপিকাদের অনুরাগ সংকুচিত হয়। তাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য ভাবযুক্ত গোপিকাদের প্রেমের মহিমা বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম রস সমন্বিত গোপিকাদের ভাব সব চাইতে নিগূঢ় পারমার্থিক রহস্য।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ললিতমাধব* (৬/৫৪) নাটক থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৮২

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে ।
অন্তর্ধান কৈলা সঙ্কেত করি' রাধা-সনে ॥ ২৮২ ॥

শ্লোকার্থ

বসন্তকালে যখন রাসোৎসব হচ্ছিল, তখন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে একলা থাকতে চান, এই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান।

শ্লোক ২৮৩

নিভৃতনিকুঞ্জে বসি' দেখে রাধার বাট ।
অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥ ২৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

নিভৃত কুঞ্জে বসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। কিন্তু তখন তাঁকে অন্বেষণ করতে করতে গোপিকার দল সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ২৮৪

দূর হৈতে কৃষ্ণে দেখি' বলে গোপীগণ ।
"এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" ২৮৪ ॥

শ্লোকার্থ

দূর থেকে কৃষ্ণকে দেখে গোপিকারা বললেন, "এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন রয়েছেন।"

শ্লোক ২৮৫

গোপীগণ দেখি' কৃষ্ণের হইল সাধ্বস ।
লুকাইতে নারিল, ভয়ে হৈলা বিবশ ॥ ২৮৫ ॥

শ্লোকার্থ

গোপিকাদের দেখে আর লুকিয়ে থাকতে না পেরে, শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে বিবশ হলেন।

শ্লোক ২৮৬

চতুর্ভুজ মূর্তি ধরি' আছেন বসিয়া ।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৮৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণ তখন চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি ধারণ করে সেখানে বসে রইলেন। কাছে এসে কৃষ্ণকে দেখে গোপিকারা তখন বললেন—

শ্লোক ২৮৭

'ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণমূর্তি ।'
এত বলি' তাঁরে সভে করে নতি-স্তুতি ॥ ২৮৭ ॥

শ্লোকার্থ

'ইনি কৃষ্ণ নন! ইনি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ।" এই কথা বলে তাঁরা তাঁকে প্রণতি ও স্তুতি নিবেদন করেন।

শ্লোক ২৮৮

"নমো নারায়ণ, দেব করহ প্রসাদ ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ' মোর ঘুচাহ বিষাদ ॥" ২৮৮ ॥

শ্লোকার্থ

"হে নারায়ণ! আমরা শ্রদ্ধা সহকারে আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রতি আপনি কৃপা করুন। আপনি আমাদের কৃষ্ণসঙ্গ দান করে আমাদের বিরহ-বেদনা দূর করুন।"

তাৎপর্য

গোপিকারা চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি দেখে সন্তুষ্ট হননি। কিন্তু তবুও তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভের আশীর্বাদ তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এমনই ছিল ব্রজগোপিকাদের কৃষ্ণানুরাগ।

শ্লোক ২৮৯

এত বলি নমস্করি' গেলা গোপীগণ ।
হেনকালে রাধা আসি' দিলা দরশন ॥ ২৮৯ ॥

শ্লোকার্থ

এই কথা বলে এবং প্রণতি নিবেদন করে সমস্ত গোপিকারা সেখান থেকে চলে গেলেন। তখন শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ২৯০

রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে ।
সেই চতুর্ভুজ মূর্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৯০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীকে দেখার পর, তাঁর সঙ্গে কৌতুক করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চতুর্ভুজ রূপ রাখতে চাইলেন।

শ্লোক ২৯১

লুকাইলা দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে ।
বহু যত্ন কৈলা কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে ॥ ২৯১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর সামনে কৃষ্ণ তাঁর দ্বিভুজরূপ লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি তা পারলেন না।

শ্লোক ২৯২

রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব ।
যে কৃষ্ণেরে করাইলা দ্বিভুজ স্বভাব ॥ ২৯২ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীমতী রাধারাণীর বিশুদ্ধ-ভাব এমনই অচিন্ত্য যে, তা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দ্বিভুজরূপ প্রকাশ করতে বাধ্য করল।

শ্লোক ২৯৩

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা ।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা ॥ ২৯৩ ॥

রাস-আরম্ভ-বিধৌ—রাসনৃত্য আরম্ভ উপলক্ষে; **নিলীয়**—লুকিয়ে রেখে; **বসতা**—বসেছিলেন; **কুঞ্জে**—কুঞ্জে; **মৃগা-অক্ষী-গণৈঃ**—মৃগাক্ষী গোপীকাদের দ্বারা; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট হয়ে; **গোপয়িতুম্**—লুকিয়ে রাখার জন্য; **স্বম্**—নিজেকে; **উদ্ধুর-ধিয়া**—অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে; **যা**—যা; **সুষ্ঠু**—পূর্ণরূপে; **সন্দর্শিতা**—প্রদর্শিত; **রাধায়াঃ**—শ্রীমতী রাধারাণীর; **প্রণয়স্য**—প্রণয়ের; **হন্ত**—দেখ; **মহিমা**—মহিমা; **যস্য**—যাঁর; **শ্রিয়া**—ঐশ্বর্য; **রক্ষিতুম্**—রক্ষা করার জন্য; **সা**—তা; **শক্যা**—সক্ষম; **প্রভবিষ্ণুনা**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা; **অপি**—ও; **হরিণা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **ন**—না; **আসীৎ**—ছিল; **চতুঃ-বাহুতা**—চতুর্ভুজ-রূপ।

অনুবাদ

"রাসনৃত্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, কৌতুকছলে শ্রীকৃষ্ণ একটি কুঞ্জে লুকিয়ে থাকেন। মৃগনয়না গোপিকারা যখন তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য তাঁর অপূর্ব সুন্দর চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেন। কিন্তু যখন শ্রীমতী রাধারাণী সেখানে আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টা করেও সেই চতুর্ভুজ রূপ রাখতে পারলেন না। এমনই হচ্ছে রাধাপ্রেমের আশ্চর্য মহিমা।"

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীকৃত *উজ্জ্বলনীলমণি* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

শ্লোক ২৯৪

সেই ব্রজেশ্বর—ইহঁ জগন্নাথ পিতা ।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইহঁ শচীদেবী মাতা ॥ ২৯৪ ॥

শ্লোকার্থ

সেই ব্রজরাজ নন্দ হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং ব্রজেশ্বরী মা যশোদা হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবী।

শ্লোক ২৯৫

সেই নন্দসুত—ইহঁ চৈতন্য-গোসাঞি ।
সেই বলদেব—ইহঁ নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৯৫ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নন্দসুত হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং সেই বলদেব হচ্ছেন ভাই নিত্যানন্দ।

শ্লোক ২৯৬

বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিন ভাবময় ।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায় ॥ ২৯৬ ॥

শ্লোকার্থ

সেই নিত্যানন্দ প্রভু সর্বদা বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্যভাবযুক্ত। এভাবেই তিনি সর্বদা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাহায্য করেন।

শ্লোক ২৯৭

প্রেমভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসা'ল জগতে ।
তাঁর চরিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥ ২৯৭ ॥

শ্লোকার্থ

প্রেমভক্তি দান করে সেই প্রেমবন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করলেন। তাঁর চরিত্র ও কার্যকলাপ কেউই বুঝতে পারে না।

শ্লোক ২৯৮

অদ্বৈত-আচার্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার ॥ ২৯৮ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু ভক্ত-অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করিয়ে তিনি ভগবদ্ভক্তির প্রচার করলেন।

শ্লোক ২৯৯

সখ্য, দাস্য,—দুই ভাব সহজ তাঁহার ।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥ ২৯৯ ॥

শ্লোকার্থ

তাঁর স্বাভাবিক ভাব সখ্য এবং দাস্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কখনও কখনও তাঁকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা করতেন।

শ্লোক ৩০০

শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥ ৩০০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীবাস ঠাকুর আদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা তাঁদের নিজেদের ভাব অনুসারে তাঁর সেবা করতেন।

শ্লোক ৩০১

পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস ।
সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ ॥ ৩০১ ॥

শ্লোকার্থ

গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, রূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীগণ, এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব ভাব অনুসারে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও সেই সেই রস অনুসারে তাঁদের বশীভূত।

তাৎপর্য

২৯৬ থেকে ৩০১ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং অন্যান্যদের সেবাভাব পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। স্ব স্ব ভাবের বর্ণনা করে *গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়* (১১-১৬) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যদিও ভক্তভাব অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হয়েছেন, তবুও তিনি হচ্ছেন স্বয়ং নন্দনন্দন। তেমনই, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহকারীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তবু তিনি হচ্ছেন স্বয়ং হলধর বলদেব। অদ্বৈত আচার্য প্রভু হচ্ছেন বৈকুণ্ঠের সদাশিবের অবতার। শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তরা হচ্ছেন তাঁর তটস্থা শক্তি, আর গদাধর প্রমুখ ভক্তরা তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, এঁরা সকলেই হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। যেহেতু শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন কৃপাসিন্ধু, তাই তাঁকে মহাপ্রভু বলে সম্বোধন করা হয়, আর মহাপ্রভুর দুই প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়। এভাবেই দুই প্রভু ও এক মহাপ্রভু। গদাধর গোস্বামী হচ্ছেন আদর্শ ব্রাহ্মণ-গুরু। শ্রীবাস ঠাকুর হচ্ছেন আদর্শ ব্রাহ্মণ-ভক্ত। এই পাঁচ জন পঞ্চতত্ত্ব নামে পরিচিত।

শ্লোক ৩০২

তিহঁ শ্যাম,—বংশীমুখ, গোপবিলাসী ।
ইহঁ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী ॥ ৩০২ ॥

শ্লোকার্থ

কৃষ্ণলীলায় ভগবানের অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো ঘনশ্যাম। তাঁর মুখে বংশী এবং তিনি গোপবালক রূপে তাঁর লীলাবিলাস করেছেন। এখন সেই পুরুষ তপ্তকাঞ্চনের মতো গৌরবর্ণ অবলম্বন করে, ব্রাহ্মণরূপে এবং কখনও সন্ন্যাসীরূপে লীলাবিলাস করছেন।

শ্লোক ৩০৩

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি' ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি' ॥ ৩০৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই ভগবান গোপীভাব অবলম্বন করে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে "হে প্রাণনাথ! হে প্রাণপতি!" বলে সম্বোধন করছেন।

শ্লোক ৩০৪

সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্বোধ ॥ ৩০৪ ॥

শ্লোকার্থ

তিনি শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি গোপীদের ভাব অবলম্বন করেছেন। তা কিভাবে সম্ভব? এটিই ভগবানের অচিন্ত্য চরিত্র, যা অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

তাৎপর্য

যে কোন জাগতিক বিচারে শ্রীকৃষ্ণের গোপিকাদের ভূমিকা অবলম্বন করা অবশ্যই বিসদৃশ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অচিন্ত্য চরিত্রের প্রভাবে, গোপিকাদের ভাবে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণবিরহ অনুভব করতে পারেন। এই বিরুদ্ধভাব কেবল পরমেশ্বর ভগবানেই সম্ভব, কেন না তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাই ভগবানের এই অচিন্ত্য শক্তিকে বলা হয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। গোস্বামীদের আনুগত্যে নিষ্ঠা সহকারে বৈষ্ণব-দর্শন অনুগমনকারী ভক্ত না হলে, এই ধরনের বিরুদ্ধ ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে বর্ণনা করেছেন—

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

"শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে, তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* বর্ণনা করছি।"

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর একটি গীতে গেয়েছেন—

রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥

রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য-উজ্জ্বল প্রেমকে বলা হয় যুগলপীরিতি, তা জড়বাদী পণ্ডিত, শিল্পী অথবা কবিদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, তা কেবল ষড়্‌গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ভক্তরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কখনও কখনও তথাকথিত শিল্পী বা কবিরা শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করে এবং সেই বিষয়ে সস্তায় ছবির বই বা কবিতার বই প্রকাশ করে। দুর্ভাগ্যবশত, তারা রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের ছিটেফোঁটাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা কেবল যে বিষয়ে তাদের প্রবেশ করার অধিকার নেই, সেই বিষয়ে অনধিকার প্রবেশ করার চেষ্টা করে।

শ্লোক ৩০৫

ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয় ।
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি এই মত হয় ॥ ৩০৫ ॥

শ্লোকার্থ

জাগতিক যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রের বিরুদ্ধভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই, এই বিষয়ে কোন সংশয় প্রদর্শন করা উচিত নয়। আমাদের কেবল বুঝতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অচিন্ত্য; তা না হলে এই বিরুদ্ধ ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

শ্লোক ৩০৬

অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার ।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ৩০৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাবিলাস অচিন্ত্য ও অদ্ভুত। তাঁর ভাব বিচিত্র, তাঁর গুণ বিচিত্র এবং তাঁর ব্যবহারও বিচিত্র।

শ্লোক ৩০৭

তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার ।
কুম্ভীপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার ॥ ৩০৭ ॥

শ্লোকার্থ

যে দুরাচারী ব্যক্তি জড় যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে তা মানে না, সে কুম্ভীপাকে দগ্ধ হবে, তার নিস্তার নেই।

তাৎপর্য

কুম্ভীপাক নামক নারকীয় অবস্থার কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/২৬/১৩) বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যে মানুষ তার রসনা তৃপ্তির জন্য পশু-পক্ষী রন্ধন করে, মৃত্যুর পর তাকে যমালয়ে কুম্ভীপাক নরকে দণ্ডভোগ করতে হয়। সেখানে তাকে কুম্ভীপাক নামক ফুটন্ত তেলে দগ্ধ করা হয়, যার থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। যে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ তাদের কুম্ভীপাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। যে সমস্ত মানুষ চৈতন্য-লীলার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ তারাও সেই নারকীয় অবস্থায় দণ্ডভোগ করে।

শ্লোক ৩০৮

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ৩০৮ ॥

অচিন্ত্যাঃ—অচিন্ত্য; **খলু**—অবশ্যই; **যে**—যে সমস্ত; **ভাবাঃ**—বিষয়; **ন**—না; **তান্**—তাদের; **তর্কেণ**—তর্কের দ্বারা; **যোজয়েৎ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারা; **প্রকৃতিভ্যঃ**—জড় প্রকৃতির; **পরম্**—পরম; **যৎ**—যা; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **অচিন্ত্যস্য**—অচিন্ত্যের; **লক্ষণম্**—লক্ষণ।

অনুবাদ

"যা জড় প্রকৃতির অতীত তাকে বলা হয় অচিন্ত্য, কিন্তু সমস্ত যুক্তিতর্ক হচ্ছে জাগতিক। যেহেতু জাগতিক যুক্তিতর্ক জড়াতীত বিষয়কে স্পর্শ করতে পারে না, তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে চিন্ময় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

তাৎপর্য

মহাভারতের (ভীষ্মপর্ব ৫/২২) এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে* (২/৫/৯৩) উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্লোক ৩০৯

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস ।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ পাশ ॥ ৩০৯ ॥

শ্লোকার্থ

যে সমস্ত মানুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত লীলায় সুদৃঢ় বিশ্বাস-সম্পন্ন, তাঁরাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সমীপবর্তী হতে পারেন।

শ্লোক ৩১০

প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার ।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩১০ ॥

শ্লোকার্থ

এই প্রসঙ্গে আমি ভগবদ্ভক্তির সারমর্ম বিশ্লেষণ করলাম। যিনি তা শোনেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।

শ্লোক ৩১১

লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকার্থ

যা ইতিমধ্যেই লেখা হয়েছে আমি যদি তার পুনরাবৃত্তি করি, তা হলে আমি এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য আস্বাদন করতে পারি।

শ্লোক ৩১২

দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার ।
কথা কহি' অনুবাদ করে বার বার ॥ ৩১২ ॥

শ্লোকার্থ

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীল ব্যাসদেবের আচরণ দেখতে পাই। তিনি কোন কিছু বর্ণনা করার পর বারবার তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের বাহান্নটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস সমগ্র *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রধান প্রধান অংশ ও বৈশিষ্ট্যের পুনরালোচনা করেছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীল ব্যাসদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার* সতেরটি পরিচ্ছেদের পুনরালোচনা করেছেন।

শ্লোক ৩১৩

তাতে আদি-লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন ।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈলুঁ 'মঙ্গলাচরণ' ॥ ৩১৩ ॥

শ্লোকার্থ

তাই আমি আদিলীলার পরিচ্ছেদগুলি পর পর উল্লেখ করব। প্রথম পরিচ্ছেদে আমি গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করে মঙ্গলাচরণ করেছি।

শ্লোক ৩১৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ' ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১৪ ॥

শ্লোকার্থ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৩১৫

তেঁহো ত' চৈতন্য-কৃষ্ণ—শচীর নন্দন ।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের 'সামান্য' কারণ ॥ ৩১৫ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, এখন তিনি শচীমাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর আবির্ভাবের সাধারণ কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১৬

তহিঁ মধ্যে প্রেমদান—'বিশেষ' কারণ ।
যুগধর্ম—কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩১৬ ॥

শ্লোকার্থ

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার বিশেষ কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে এই যুগের যুগধর্ম, যা হচ্ছে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের পন্থা, তার বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১৭

চতুর্থে কহিলুঁ জন্মের 'মূল' প্রয়োজন ।
স্বমাধুর্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥ ৩১৭ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাঁর আবির্ভাবের মূল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, যা হচ্ছে তাঁর স্বীয় অপ্রাকৃত মাধুর্য ও প্রেম আস্বাদন।

শ্লোক ৩১৮

পঞ্চমে 'শ্রীনিত্যানন্দ'-তত্ত্ব নিরূপণ ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩১৮ ॥

শ্লোকার্থ

পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন রোহিণীনন্দন বলরাম।

শ্লোক ৩১৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'অদ্বৈত-তত্ত্বে'র বিচার ।
অদ্বৈত-আচার্য—মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩১৯ ॥

শ্লোকার্থ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত আচার্যের তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর অবতার।

শ্লোক ৩২০

সপ্তম পরিচ্ছেদে 'পঞ্চতত্ত্বে'র আখ্যান ।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি' যৈছে কৈলা প্রেমদান ॥ ৩২০ ॥

শ্লোকার্থ

সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা সর্বত্র ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার জন্য মিলিত হয়েছেন।

শ্লোক ৩২১

অষ্টমে 'চৈতন্যলীলা-বর্ণন'-কারণ ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ ৩২১ ॥

শ্লোকার্থ

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণনামের মহিমাও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২২

নবমেতে 'ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন' ।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈলা বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩২২ ॥

শ্লোকার্থ

নবম পরিচ্ছেদে ভক্তি-কল্পবৃক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং মালী হয়ে সেই বৃক্ষ রোপণ করেছেন।

শ্লোক ৩২৩

দশমেতে মূল-স্কন্ধের 'শাখাদি-গণন' ।
সর্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩২৩ ॥

শ্লোকার্থ

দশম পরিচ্ছেদে মূলস্কন্ধের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমস্ত শাখার ফলগুলি বিতরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২৪

একাদশে 'নিত্যানন্দশাখা-বিবরণ' ।
দ্বাদশে 'অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণন' ॥ ৩২৪ ॥

শ্লোকার্থ

একাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখার বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২৫

ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর 'জন্ম-বিবরণ' ।
কৃষ্ণনাম-সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩২৫ ॥

শ্লোকার্থ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে কৃষ্ণনাম সহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩২৬

চতুর্দশে 'বাল্যলীলা'র কিছু বিবরণ ।
পঞ্চদশে 'পৌগণ্ডলীলা'র সংক্ষেপে কথন ॥ ৩২৬ ॥

শ্লোকার্থ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর বাল্যলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে মহাপ্রভুর পৌগণ্ডলীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩২৭

ষোড়শ পরিচ্ছেদে 'কৈশোরলীলা'র উদ্দেশ ।
সপ্তদশে 'যৌবনলীলা' কহিলুঁ বিশেষ ॥ ৩২৭ ॥

শ্লোকার্থ

ষোড়শ পরিচ্ছেদে আমি কৈশোরলীলার বর্ণনা করেছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে আমি বিশেষভাবে তাঁর যৌবনলীলার বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ৩২৮

এই সপ্তদশ প্রকার 'আদি-লীলা'র প্রবন্ধ ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ ॥ ৩২৮ ॥

শ্লোকার্থ

এই সপ্তদশ [illegible] আদিলীলার বিষয়, তার মধ্যে বারোটি বিষয় হচ্ছে এই গ্রন্থের মুখবন্ধ।

শ্লোক ৩২৯

পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চবয়স চরিত ।
সংক্ষেপে কহিলুঁ অতি,—না কৈলুঁ বিস্তৃত ॥ ৩২৯ ॥

শ্লোকার্থ

মুখবন্ধের পরের পাঁচটি পরিচ্ছেদে পাঁচটি বয়সের চরিত বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা না করে সংক্ষেপে সেগুলি বর্ণনা করেছি।

শ্লোক ৩৩০

বৃন্দাবনদাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে' ।
বিস্তারি' বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥ ৩৩০ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ এবং তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে সেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৩১

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত ।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥ ৩৩১ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অদ্ভুত ও অনন্ত। ব্রহ্মা, শিব, শেষনাগ পর্যন্ত তার অন্ত খুঁজে পান না।

শ্লোক ৩৩২

যে যেই অংশ কহে, শুনে সেই ধন্য ।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩৩২ ॥

শ্লোকার্থ

যিনি এই বিশাল বিষয়ের যে অংশ শ্রবণ করেন অথবা বর্ণনা করেন তিনি ধন্য। অচিরেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপা লাভ করবেন।

শ্লোক ৩৩৩

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ।
শ্রীবাস-গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

[এখানে গ্রন্থকার পুনরায় পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন।] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দ।

শ্লোক ৩৩৪

যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে ।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥ ৩৩৪ ॥

শ্লোকার্থ

বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আমি অত্যন্ত নম্র হয়ে তাঁদের শ্রীপাদপদ্ম আমার শিরে ধারণ করতে চাই।

শ্লোক ৩৩৫-৩৩৬

শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন ।
শ্রীরঘুনাথদাস, আর শ্রীজীব-চরণ ॥ ৩৩৫ ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করোঁ তাঁর আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৩৬ ॥

শ্লোকার্থ

শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী, এঁদের সকলের শ্রীপাদপদ্ম শিরে ধারণ করে, নিরন্তর তাঁদের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনা করছি।

ইতি—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যৌবনলীলা' বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অনুক্রমণিকা

(সংস্কৃত শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাদ্বয় যথাক্রমে পরিচ্ছেদ ও শ্লোকসংখ্যা জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

র

ল

শ

স

হ

অনুক্রমণিকা

(বাংলা শ্লোক)

[শ্লোকের পার্শ্বস্থিত প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা যথাক্রমে 'পরিচ্ছেদ' ও 'শ্লোক সংখ্যা' জ্ঞাপক এবং তৃতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক।]

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ড

ত

দ

ধ

ন

প

ভ

ম

য

র

ল

শ

ষ

স

শ্রীল প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম ছিল রজনী দেবী। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগারো বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এমন কি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ-রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে বসবাস করতে থাকেন এবং অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ অবদানের সূত্রপাত হয়। এখানে বসেই তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* ভাষ্যসহ আঠারো হাজার শ্লোকের অনুবাদ করেন এবং *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হল বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত

এবং বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ-প্রকাশনী সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।' শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ ইংরেজী অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় উনিশ শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এখানেই বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচারসূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত বহু গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।